রাবেতায়ে আলামে ইসলামী আয়োজিত
বিশ্বব্যাপী সীরাতুন্নবী সঃ প্রতিযোগিতায়
১১৮২টি পান্ডুলিপির মধ্যে প্রথম পুরস্কার বিজয়ী

আর রাহীকুল মাখতূম

অনন্য সাধারণ সীরাত গ্রন্থ

আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী
অনুবাদঃ খাদিজা আখতার রেজায়ী

আন্তর্জাতিক সীরাত প্রতিযোগীতায়

প্রথম পুরস্কার বিজয়ী

আর রাহীকুল মাখতূম

রসূলুল্লাহ (স.)-এর মহান জীবনী গ্রন্থ

আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী

অধ্যাপক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মদীনা মোনাওয়ারা

অনুবাদ ও প্রকাশনা

খাদিজা আখতার রেজায়ী

পরিবেশনা

আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

বাংলাদেশ সেন্টার

আর রাহীকুল মাখতূম

আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপুরী

অনুবাদ ও প্রকাশনা
খাদিজা আখতার রেজায়ী
১৯ বেকটিভ রোড, ফরেস্ট গেইট
লন্ডন ই৭ ও ডি পি

পরিবেশনা
আল কোরআন একাডেমী লন্ডন
বাংলাদেশ সেন্টার
বাড়ি ১৬ রোড ৭ বারিধারা কুটনীতিক এলাকা, ঢাকা-১২১২
ফোন: ৯৮৯ ৩৬১৪, ৯৩৩ ৯৬১৫, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৮৯ ৩৬১৪

প্রথম সংস্করণ
১৯৯৯

৯ম সংস্করণ
রবিউস সানি ১৪২৪
জুন ২০০৩
জ্যৈষ্ঠ ১৪১০

কম্পোজ
আল কোরআন কম্পিউটার

বিনিময়
১৮০ টাকা মাত্র

AR RAHEEQUL MAKHTOOM

Life of Mohammed (Sm)

ALLAMA SAFIUR RAHMAN MOBARAKPURI
PROFESSOR ISLAMIC UNIVERSITY MEDINA MONAWARA

TRANSLATION & PUBLICATION
KHADIJA AKHTER REZAYEE
19 BECTIVE ROAD, FOREST GATE
LONDON E 7 O D P

DISTRIBUTION
AL QURAN ACADEMY LONDON
BANGLADESH CENTRE
HOUSE 16 ROAD 7 BARIDHARA DIPLOMATIC ZONE, DHAKA-1212
PHONE & FAX: 9893 614, 9339 615

FIRST EDITION
1999

9TH EDITION
RABIUS SANI 1424
JUNE 2003

PRICE
Tk. 180.00

E-mail: info@alquranacademylondon.com
website: www.alquranacademylondon.com www. quransharif.com www. readthequran.org.

মিনতি আমার রাখো

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

'ইয়ুসকাওনা মির রাহীকিম মাখতুম খেতামুহু মেসকুন ওয়া ফী যালেকা ফাল ইয়াতানা ফাসিল মোতানাফেসুন'

ছিপি আঁটা (বোতল) থেকে তাদের সেদিন বিশুদ্ধতম পানীয় পান করানো হবে, (পাত্রজাত করার সময়ই) কস্তুরির সুগন্ধি দিয়ে যার মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। (মূলত এই হচ্ছে সেই লোভনীয় প্রাপ্য) যার প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হবার জন্যে প্রতিটি প্রতিযোগীরই এগিয়ে আসা উচিৎ।
(সূরা মোতাফফেফীন, আয়াত ২৫-২৬)

'আর রাহীকুল মাখতুম'—ছিপি আঁটা মূল্যবান পানীয় দিয়ে আল্লাহ তায়ালা সেদিন তার আরশে আযীমে যার জন্যে এই দস্তরখান সাজাবেন, তিনি হচ্ছেন কুল মাখলুকাতের নয়নমনি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম।

হে নবী, দুনিয়ায় সেই দুর্লভ বস্তু পাওয়ার প্রতিযোগিতায় আল্লাহ তায়ালা সম্মানিত প্রতিযোগীদের তালিকায় আমার নাম আদৌ শামিল করেছেন কিনা—আমি জানিনা, তাই সেদিনের সাজানো দস্তরখানে তোমার কাছে ঠাঁই পাওয়ার আশা আমার জন্যে দুরাশা বটে।

হে আল্লাহ 'আর রাহীকুল মাখতুম'-এর বাংলা অনুবাদের এই মেহনতটুকু তুমি আমার কাছ থেকে গ্রহণ করো।
এর বিনিময়ে কোনো জান্নাত নয়, জান্নাতের বালাখানার সাজানো সেই দস্তরখানও নয়, 'আমি যে তোমার রসূলেরই লোক' এই স্বীকৃতিটুকুই তুমি সেদিন তাকে দিতে বলো!

— খাদিজা আখতার রেজায়ী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার, যিনি সমগ্র দুনিয়া জাহানের মালিক। তিনি অসীম দয়ালু, অত্যন্ত মেহেরবান। তিনি বিচার দিনের মালিক। (হে আল্লাহ) আমরা তোমারই বন্দেগী করি এবং তোমারই সাহায্য চাই। আমাদের সরল সঠিক পথ দেখাও। তাদের পথে, যাদের ওপর তুমি অনুগ্রহ করেছো। তাদের পথে নয়, যাদের ওপর তুমি অভিশাপ দিয়েছো, এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে

(সূরা ফাতেহা)
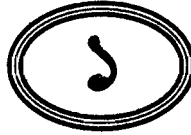
সংক্ষিপ্ত পটভূমিকা

কিছু নিজের কথা কিছু অন্যের কথা

আল্লাহ তায়ালা বলেন

অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা
নিজে ও তার ফেরেস্তারা
সবাই নবী মোহাম্মদের
ওপর দুরুদ পাঠান,
অতএব হে মানুষ,
তোমরা যারা আল্লাহর
ওপর ঈমান এনেছো——
তোমরাও তার ওপর
একনিষ্ঠ দরুদ ও
সালাম পাঠাও ।
(সূরা আহযাব ৫৬)

হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা
সাল্লাল্লাহু আলাইহে
ওয়া সাল্লাম

গ্রন্থটির পরিচয়

১৯৭৬ সালের মার্চ মাস। ১৩৯৬ হিজরীর রবিউল আউয়াল।

করাচীতে প্রথম বিশ্ব মুসলিম সীরাত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মক্কার রাবেতায়ে আলামে ইসলামী এ সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে বিশ্বের সকল লেখকের প্রতি এক অভিনব আহবান জানানো হয়। রাবেতার পক্ষ থেকে প্রচারিত এই আহ্বানে বিশ্বের জীবন্ত ভাষাসমূহে রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনী রচনার কথা বলা হয়। এ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের প্রথম পাঁচজনকে পুরস্কার দেয়া হবে বলেও জানানো হয়। পুরস্কারের পরিমাণ যথাক্রমে ৫০, ৪০, ৩০, ২০ ও ১০ হাজার সউদী রিয়াল। রাবেতায়ে আলামে ইসলামীর সরকারী মুখপত্র 'আখবার আল আলামুল' 'ইসলামী' পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় প্রতিযোগিতার ঘোষণা প্রকাশ করা হয়। আমি অবশ্য এ ঘোষণার কথা তখনো জানতে পারিনি।

বেশ কিছুদিন পরের কথা। বেনারস থেকে গ্রামের বাড়ী মোবারকপুর গেলাম। সেখানে শায়খুল হাদীস মওলানা ওবায়দুল্লাহ সাহেবের পুত্র আমার ফুফাত ভাই মাওলানা আবদুর রহমান মোবারকপুরী আমাকে কথাটি জানালেন। তিনি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আমাকে পরামর্শ দিলেন। নিজের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে আমি অক্ষমতা প্রকাশ করি। কিন্তু মাওলানা আবদুর রহমান নাছোড়বান্দা। তিনি বিনয়ের সাথে বারবার বলছিলেন যে, প্রতিযোগিতায় আপনি পুরস্কার পাবেন এ জন্য নয়; বরং আমি চাই যে এই ওছিলায় একটা ভালো কাজ হয়ে যাক। ফুফাত ভাইয়ের বারবার অনুরোধের পরও আমি চুপ করে থাকলাম। মনে মনে ভাবছিলাম যে, প্রতিযোগিতায় আমি অবশ্য অংশগ্রহণ করব না।

কয়েকদিন পর জমিয়াতে আহলে হাদীস হিন্দ এর পাক্ষিক মুখপত্রেও এ খবর প্রকাশ করা হয়। এ খবর প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে জামেয়া সালাফিয়ার সর্বস্তরের ছাত্রদের এক বিরাট অংশ আমাকে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য আবেদন জানাতে শুরু করে। মনে মনে ভাবলাম, এতো কণ্ঠের প্রতিধ্বনি সম্ভবত আল্লাহ পাকের ইচ্ছারই প্রতিফলন। তবুও প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্তে মনে মনে আমি প্রায় অটল থাকলাম। কিছুদিন পর অনুরোধ পরামর্শের তাকিদ কমে গেল। তবে কয়েকজন ছাত্র তাদের তাকিদ তখনো অব্যাহত রাখলেন। কেউ কেউ বিষয়ভিত্তিক নানা পরামর্শও দিতে লাগলেন। প্রিয়ভাজন কয়েকজন ছাত্রের অনুনয় বিনয় এবং তাকিদে কান এক সময় আমার ঝালাপালা হয়ে উঠলো।

কাজ শুরু করলাম, কিন্তু খুবই ধীরগতিতে। কাজের প্রাথমিক পর্যায়ে এসে গেল রমযানের ছুটি। এদিকে রাবেতার ঘোষণায় বলা হয়েছিল যে, পরবর্তী মহররমের প্রথম তারিখ হবে পান্ডুলিপি গ্রহণের শেষ তারিখ। সাড়ে পাঁচ মাস কেটে গেছে। হাতে সময় আছে মাত্র সাড়ে তিনমাস। এ সময়ের মধ্যেই পান্ডুলিপি তৈরী করে ডাকে দিতে হবে,

তবেই সময়মতো তা পৌঁছুবে। এদিকে সব কাজ বাকি পড়ে আছে। বিশ্বাস ছিল না যে এতো কম সময়ে পাণ্ডুলিপি তৈরী পুনরায় দেখে দেয়া এবং কপি করানোর কাজ শেষ করা যাবে। কিন্তু তাকিদ যারা দিচ্ছিলেন তারা বলছিলেন যে, কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ ছাড়াই যেন আমি কাজ চালিয়ে যাই। প্রয়োজনে যেন ছুটি নেই। ছুটির সময়কে আমি সুবর্ণ সুযোগ মনে করলাম। পুরো ছুটি স্বপ্নের মতো কেটে গেল। অনুরোধকারীরা ফিরে এসে দেখলেন যে, পাণ্ডুলিপির দুই তৃতীয়াংশ তৈরী হয়ে গেছে। রিভাইজ দেয়ার সময় না থাকায় কপি করার জন্য দিয়ে দিলাম। অবশিষ্ট অংশের মাল মসলা যোগানোর কাজে তারা সহযোগিতা করলেন। জামেয়া খোলার পর কর্মব্যস্ততা শুরু হলো। একারণে ছুটির সময়ের মতো দ্রুত লেখার কাজ অব্যাহত রাখা সম্ভব হলো না। ঈদুল আযহার সময় দিনরাত লিখছিলাম এবং মহররম মাস শুরু হওয়ার বারো তেরোদিন আগেই পাণ্ডুলিপি রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠিয়ে দিলাম।

কয়েক মাস পরের কথা। রাবেতার পক্ষ থেকে এক রেজিস্ট্রি চিঠিতে পাণ্ডুলিপির প্রাপ্তিস্বীকার করা হয় এবং জানানো হয় যে, আমার পাণ্ডুলিপি তাদের শর্তানুযায়ী হওয়ায় প্রতিযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া হয়েছে। আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

দিন কাটতে লাগলো। ইতিমধ্যে দেড়বছর কেটে গেল। রাবেতার কোন সাড়া নেই। দুটি চিঠি পাঠালাম। কি হচ্ছে জানতে চাইলাম। কিন্তু কোন জবাব পাওয়া গেলো না। এরপর ডুবে গেলাম নিজের কাজে। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম যে, সীরাতুন্নবী বিষয়ক একটি প্রতিযোগিতায় আমি অংশ নিয়েছিলাম। ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসের ৬, ৭ ও ৮ তারিখে অর্থাৎ ১৩৯৮ হিজরীর শাবান মাসে করাচীতে হয় প্রথম এশীয় ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত। এ সম্পর্কিত বিভিন্ন সংবাদ মনোযোগের সাথে পড়ছিলাম। 'ভাদুহি' স্টেশনে একদিন ট্রেনের অপেক্ষায় ছিলাম। ট্রেন একটু লেট ছিল। সেদিনের কাগজ কিনে পড়তে লাগলাম। ছোট একটি খবরে চোখ পড়লো। করাচীতে অনুষ্ঠানরত ইসলামী সম্মেলনের এক অধিবেশন সীরাতুন্নবী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে বিজয়ী পাঁচজনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এদের মধ্যে একজন ভারতীয় প্রতিযোগী রয়েছেন। এ খবর পড়ে মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠলাম। বেনারসে এসে বিস্তারিত জানার চেষ্টা করেও ব্যথ হলাম।

১৯৭৮ সালের ১০ই জুলাই সকাল বেলা। আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। গভীর রাত পর্যন্ত জামেয়ার এক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিষয়াবলী নির্ধারণসহ বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। ফজরের নামায পড়ে পুনরায় বিছানায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। হঠাৎ একদল ছাত্র শোরগোল করতে করতে ভেতরে প্রবেশ করলো। তাদের চোখ মুখে খুশীর ঝিলিক। তারা আমাকে মোবারকবাদ জানাচ্ছিল। 'কি ব্যাপার? প্রতিপক্ষ কি বিতর্কে অবতীর্ণ হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে?' 'না সে কথা নয়?' 'তবে কি?' 'সীরাতুন্নবী প্রতিযোগিতায় আপনি প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।'

হে আল্লাহ তায়ালা, তোমার শোকর। কোথায় খবর পেলেন আপনারা? আমি শায়িতাবস্থা থেকে এবার উঠে বসলাম।

মাওলানা ওয়ায়ের শামস এ খবর নিয়ে এসেছেন। কিছুক্ষণ পর সম্মেলন থেকে আগত মাওলানা শামস নিজেই আমাকে বিস্তারিত খবর শোনালেন।

১৯৭৮ সালের ২৯শে জুলাই, ১৩৯৮ হিজরীর ২২শে শাবান তারিখে রাবেতার পক্ষ থেকে রেজিস্ট্রি একটি চিঠি পেলাম। বিজয়ী হওয়ার খবরের সাথে সাথে ১৩৯৯ হিজরীর মহররম সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত রাবেতার অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে পুরস্কার গ্রহণের জন্য আমাকে আমন্ত্রণও জানানো হলো। পরে অবশ্য এ অনুষ্ঠান মহররমের পরিবর্তে রবিউস সানিতে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের ওছিলায় আমি এই প্রথমবার প্রিয় নবীর দেশ হারামাইন শরীফাইন যেয়ারতের সৌভাগ্য লাভ করি। ১০ই রবিউস সানি মক্কায় পৌছুলাম। এরপর অনুষ্ঠানে হাযির হলাম। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে প্রায় সকাল দশটায় তেলাওতে কোরআনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কাজ শুরু হয়। সউদী আরবের প্রধান বিচারপতি শেখ আবদুল্লাহ ইবনে হোমায়েদ ছিলেন অনুষ্ঠানের সভাপতি। বাদশাহ আবদুল আজিজ ইবনে সউদের পৌত্র মক্কার সহকারী গভর্ণর আমীর সউদ ইবনে আবদুল মোহসিন পুরস্কার বিতরণের জন্য প্রধান অতিথি হিসাবে আগমন করেন। তিনি পরে কিছু বক্তৃতাও দেন। এরপর রাবেতায়ে আলামে ইসলামীর নায়েবে সেক্রেটারী জেনারেল শেখ আলী আল মোখতার ভাষণ দেন। তিনি কিছুটা বিস্তারিতভাবে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। বিজয়ীদের কিভাবে বাছাই করা হয়েছে সে সব কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানান যে, রাবেতার ঘোষণার পর ১১৮২টি পাণ্ডুলিপি জমা পড়ে। প্রাথমিক বিবেচনায় নির্বাচন কমিটি ১৮৩টি পাণ্ডুলিপি প্রতিযোগিতার জন্য মনোনীত করেন। চূড়ান্ত বাছাইয়ের জন্য সুনির্বাচিত একট কমিটির ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়। এ কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী শেখ হাসান ইবনে আবদুল্লাহ আল শেখ। কমিটির সদস্যরা ছিলেন জেদ্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়ত বিভাগের শিক্ষক সীরাতুন্নবী ও ইসলামের ইতিহাস বিশেষজ্ঞ। তাদের নাম নিম্নরূপ, ডক্টর ইবরাহীম আলী সউত, ডক্টর আবদুর রহমান ফাহমি মোহাম্মদ, ডক্টর মোহাম্মদ সাঈদ সিদ্দিকী, ডক্টর ফিকরি আহমদ ওকায, ডক্টর আহমদ সাইয়েদ দারাজ, ডক্টর ফায়েক বকর সওয়াফ, ডক্টর শাকের মাহমুদ আবদুল মোনয়েম, ডক্টর আবদুল ফাত্তাহ মনসুর।

এ কমিটির বিশেষজ্ঞরা পর্যায়ক্রমিক বাছাইয়ের পর এই ৫টি পান্ডুলিপির জন্য পাঁচজনকে পুরস্কার পাওয়ার উপযুক্ত ঘোষণা করেন। ১. আর রাহীকুল মাখতুম, (আরবী) ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, জামেয়া সালাফিয়া, বেনারস, ভারত প্রথম, ২. খাতামুন নবীঈন (ইংরেজী) ডক্টর মাজেদ আলী খান, জামেয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া দিল্লী, ভারত দ্বিতীয়, ৩. পয়গাম্বরে আযম ওয়া আখের (উর্দু) ডক্টর নাসির আহমদ নাসের, ভাইস চ্যান্সেলর জামেয়া ইসলামিয়া, ভাওয়ালপুর, পাকিস্তান তৃতীয়, ৪. মোনতাকাউন নকুল ফী সিরাতে আযামির রসূল (আরবী) শেখ হামেদ মাহমুদ ইবনে মোহাম্মদ মনসুর লেমুদ, জিজাহ মিসর, চতুর্থ, ৫. সীরাতুন নবীইল হাদীইর রহমত (আরবী) ওস্তাদ আবদুস সালাম হাসেম হাফেজ, মদীনা মোনাওয়ারা সউদী আরব পঞ্চম।

নায়েবে সেক্রেটারী জেনারেল শেখ আলী আল মোখতার এ বিবরণের পর

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর আমাকে আমার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হয়। আমি আমার বক্তব্যে ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচারের জন্য রাবেতাকে কিছু কৌশল ও কর্মপন্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করি। এর ফলাফল কি হবে পরে সে সম্পর্কেও আলোকপাত করি। রাবেতার পক্ষ থেকে পরামর্শ গ্রহণের আশ্বাস দেয়া হয়। এরপর আমীর সউদ ইবনে আবদুল মোহসেন পর্যায়ক্রমে পাঁচজনকে পুরস্কারের অর্থ ও সার্টিফিকেট প্রদান করেন। পুরস্কার বিতরণ শেষে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

১৭ই রবিউসসানি মদীনায় গেলাম। পথে বদর প্রান্তর প্রত্যক্ষ করলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওযা মোবারক যেয়ারত করলাম। কয়েকদিন পর এক সকালে খায়বরে গেলাম। ঐতিহাসিক দুর্গসমূহ ভেতর ও বাইরে থেকে দেখলাম। এদিক সেদিক বেড়িয়ে বিকেলে ফিরে এলাম মদীনায়। দু' সপ্তাহ মদীনায় কাটিয়ে পুনরায় মক্কায় ফিরে এলাম। তওয়াফ ও সাঈ করলাম। এক সপ্তাহ মক্কায় কাটালাম। মক্কা ও মদীনায় পরিচিত অপরিচিত সর্বস্তরের গুণী জ্ঞানীদের সাথে অন্তরঙ্গভাবে ভাব বিনিময় করলাম। স্বপ্নের দেশ সউদী আরবে একমাস অতিবাহিত পরে পুনরায় জন্মভূমি ভারতে ফিরে এলাম।

সউদী আরব থেকে ফিরে আসার পর ভারত ও পাকিস্তানের উর্দু ভাষা-ভাষীদের পক্ষ থেকে অনেকেই গ্রন্থটির উর্দু অনুবাদের অনুরোধ জানালেন। ইতিমধ্যে কয়েকদিন কেটেও গেছে। নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। কিছুতেই সময় করে উঠতে পারছিলাম না। অনুরোধকারীদের অনেকের ক্রমাগত অনুরোধে এক সময় কাজের ব্যস্ততার মধ্যেই অনুবাদে হাত দিলাম। এক সময় আল্লাহর রহমতে অনুবাদের কাজ শেষ হলো।

পরিশেষে এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে উৎসাহ প্রদানকারী সহায়তাকারী বুযর্গানে দ্বীন, বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা জরুরী মনে করি। বিশেষ করে ওস্তাদ মোহতারাম মওলানা আবদুর রহমান রহমানী, শেখ ওযায়ের সাহেব, হাফেজ মোহাম্মদ ইলিয়াসের আন্তরিক সহযোগিতার কথা স্মরণ করছি। তাদের পরামর্শ ও উৎসাহ যথাসময়ে পাণ্ডুলিপি রচনায় আমাকে সহায়তা করেছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদের সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আল্লাহ পাক এ গ্রন্থ কবুল করুন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক নাজাতের ব্যবস্থা করুন।

ছফিউর রহমান মোবারকপুরী

১৮ই রমযানুল মোবারক

১৪০৪ হিজরী

রাবেতায়ে আলামে ইসলামীর
সেক্রেটারী জেনারেলের ভূমিকা

সুন্নতে নববী হচ্ছে এক জীবন্ত আদর্শ। এর আবেদন থাকবে কেয়ামত পর্যন্ত। এই আদর্শের বর্ণনা, এই আদর্শ সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা আল্লাহর রসূলের আবির্ভাবের সময় থেকেই শুরু হয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। প্রিয় নবীর আদর্শ মুসলমানদের জন্যে এক বাস্তব নমুনা ও ঘটনাবহুল কর্মসূচী। এর আলোকে মুসলমানদের কথা ও কাজ নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হবে এটাই স্বাভাবিক। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সাথে মানুষের সম্পর্ক, আত্মীয় স্বজন, ভাইবন্ধুদের সাথে মানুষের সম্পর্ক আল্লাহর রসূলের আদর্শ অনুযায়ী হওয়া উচিত।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক বলেন, 'নিশ্চয়ই প্রত্যেকের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। যারা আল্লাহ পাকের রহমত আশা করে এবং আখেরাত কামনা করে আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে।'

হযরত আয়েশাকে (রা.) জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্র কেমন ছিল? তিনি বলেছিলেন, পবিত্র কোরআনই ছিল তাঁর চরিত্র।

কাজেই যে ব্যক্তি দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় কাজে আল্লাহ পাকের পথের পথিক দুনিয়া থেকে মুক্তি পেতে চায়, তার জন্য আল্লাহর রসূলের অনুসরণ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এ ধরনের মানুষকে যথেষ্ট ভেবে-চিন্তে বুঝে-শুনে অবিচল বিশ্বাসের সাথে আল্লাহর রসূলের সীরাতের অনুসরণ করতে হবে। তাকে বুঝতে হবে যে, এটাই হচ্ছে পরওয়ারদেগারের সোজা পথ। আমাদের নেতা আমাদের পথ প্রদর্শক আল্লাহর রসূল জীবনের সকল দিক ও বিভাগে অনুসরণযোগ্য আদর্শ রেখে গেছেন। তাঁর আদর্শের মধ্যেই নেতা, কর্মী, শাসক শাসিত, পথ প্রদর্শক ও মোজাহেদদের জন্য হেদায়াতের আলো রয়েছে। প্রিয় নবীর আদর্শ মানুষের রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, পারস্পরিক সম্পর্ক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, তথা প্রতিটি ক্ষেত্রেই সর্বোত্তম আদর্শ।

মুসলমানরা বর্তমানে আল্লাহর রসূলের পথ থেকে দূরে সরে গিয়ে মূর্খতা ও অধঃপতনের অতল গভীরে নিমজ্জিত হয়ে গেছে। তাদের সচেতন হওয়ার সময় এসেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পাঠ্যসূচীতে বিভিন্ন সমাবেশে আলোচনা অনুষ্ঠানে সীরাতুন্নবীকে সবকিছুর শীর্ষে রাখতে হবে। বুঝতে হবে যে, এটা শুধু চিন্তার খোরাকই নয় বরং এটাই হচ্ছে আল্লাহ পাকের কাছে ফিরে যাওয়ার পথ। এই আদর্শের মধ্যেই রয়েছে মানুষের সংশোধন ও কল্যাণের উৎস। কেননা আল্লাহর রসূলের চরিত্র ও কাজই হচ্ছে আল্লাহ

প্যাকের কেতাব কোরআনে করিমের বাস্তব রূপ। এই আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে মোমেন বান্দা আল্লাহ রব্বুল আলামীন শরীয়তের অনুসারী হতে পারে। মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে কোরআনকে দিক নির্দেশকরূপে গ্রহণ করতে পারে।

'আর রাহীকুল মাখতুম' নামের এই গ্রন্থ আল্লামা শেখ ছফিউর রহমানের পরিশ্রমের চমৎকার ফসল। ১৩৯৬ হিজরীতে তিনি রাবেতায়ে আলামে ইসলামীর সীরাতুন্নবী রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন এবং এই গ্রন্থ প্রথম স্থান অধিকারের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ রাবেতার সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল শেখ মোহাম্মদ আলী আল হারাকানের লিখিত ভূমিকায় মজুদ রয়েছে।

এই গ্রন্থ অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল এবং প্রশংসা ধন্য হয়েছিল। প্রথম সংস্করণ ১০ হাজার কপি অল্পদিনেই নিঃশেষ হয়ে যায়। প্রকাশক হাসান হামুবি হেফজুল্লাহ দ্বিতীয় সংস্করণেও ১০ হাজার কপি প্রকাশ করেন।

তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশকালে প্রকাশক কিছু কথা লিখে দেয়ার জন্য আমার কাছে আবেদন জানান। একারণে আমি সামান্য কিছু কথা লিখছি। আল্লাহ পাক এই লেখাকে তার রহমত লাভের ওছিলা করুন। তিনি এই গ্রন্থের ওছিলায় মুসলমানদের যাবতীয় দুর্যোগ থেকে উদ্ধার করুন। উম্মতে মোহাম্মদী পুনরায় বিশ্ব নেতৃত্ব গ্রহণের উঁচু মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হোক। আল্লাহ পাকের এই ঘোষণা বাস্তব রূপ লাভ করুক, 'তোমরাই শ্রেষ্ঠ দল, তোমাদেরকে মানুষের কল্যাণের জন্য বাছাই করা হয়েছে। তোমারা সৎ কাজের আদেশ দেবে, মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে সর্বোপরি তোমরা আল্লাহ পাকের ওপর ঈমান আনবে।'

আল্লাহর প্রিয় রসূলের প্রতি দরুদ ও সালাম

ডক্টর আবদুল্লাহ ওমর নাসিফ
সেক্রেটারী জেনারেল
রাবেতায়ে আলমে ইসলামী
মক্কা মোকারামা

সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল

অভিমত প্রকাশ করেছেন—

আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় রসূলকে মাকামে শাফায়াত এবং উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। তাঁকে ভালোবাসার জন্যে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লাহ পাককে ভালোবাসার প্রমাণ দেয়া হবে বলে আমাদের জানিয়েছেন।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন, 'হে নবী, তুমি বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ পাককে ভালোবেসে থাকো তাহলে আমার আনুগত্য করো, আল্লাহ পাক তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুণাহসমূহ ক্ষমা করবেন।'

আল্লাহ পাকের প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ তাঁর রসূলের প্রতি ভালোবাসা। এই কারণেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অন্তরে একটা আকর্ষণ অনুভূত হয় এবং তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকেই মুসলমানরা আল্লাহর রসূলের প্রশংসা করে চলেছে এবং তাঁর পবিত্র সীরাতের প্রচার প্রসারে রীতিমত প্রতিযোগিতাসুলভ মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলেছে। আল্লাহর প্রিয় রসূলের লেখা, কাজ ও চরিত্রই হচ্ছে তাঁর সীরাত। হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, পবিত্র কোরআনই হচ্ছে তাঁর চরিত্র।

কোরআনে করিম হচ্ছে আল্লাহ পাকের কেতাব এবং আল্লাহ পাকের বাণীসমষ্টি। কাজেই যে মহান ব্যক্তিত্ব কোরআনের প্রতিচ্ছবি, তিনি অবশ্যই সকল মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং পরিপূর্ণ। তিনি সমগ্র মাখলুকের ভালোবাসা পাওয়ার সর্বাধিক উপযুক্ত।

আল্লাহর রসূলের প্রতি মুসলমানরা সব সময়েই ভালোবাসার প্রমাণ দিয়ে এসেছে। সেই প্রমাণের অংশ হিসাবেই ১৩৯৬ হিজরীতে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত প্রথম সীরাত সম্মেলনটি হয়েছে। এই সম্মেলনে রাবেতায়ে আলমে ইসলামী ঘোষণা করেছে যে, কয়েকটি শর্তাধীনে সীরাতুন্নবী সম্পর্কিত গ্রন্থ রচনায় ৫টি পুরস্কার প্রদান করা হবে। পুরস্কার হিসাবে দেড় লাখ সউদী রিয়াল নগদ অর্থ বিজয়ীদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

শর্তসমূহ হচ্ছে,

এক, সীরাতুন্নবী পূর্ণাঙ্গ হতে হবে। এতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ঘটনাকাল অনুযায়ী পর্যায়ক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করতে হবে।

দুই, রচনা উন্নতমানের হতে হবে, এমন হতে হবে যা ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়নি।

তিন, রচনায় সহায়ক গ্রন্থাবলীর যথাযথ বিবরণ উল্লেখ করতে হবে।

চার, লেখকের জীবন কথা লিপিবদ্ধ করে নিজের শিক্ষা জীবন সম্পর্কে আলোকপাত করতে হবে এবং কোন প্রকার সাহিত্য কর্ম থেকে থাকলে উল্লেখ করতে হবে।

পাঁচ, লেখা পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট হতে হবে। টাইপ করে দিলে ভালো হবে।

ছয়, রচনা আরবী এবং অন্যান্য সচল ও আধুনিক ভাষায় লেখা যাবে।

সাত, ১৩৯৬ হিজরীর ১লা রবিউস সানি থেকে পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করা হবে এবং পাণ্ডুলিপি গ্রহণের শেষ তারিখ হবে ১৩৯৭ হিজরীর ১লা মহররম।

আট, পাণ্ডুলিপি মক্কার রাবেতা আলমে ইসলামী সচিবালয়ে মুখ বন্ধ খামে করে পাঠাতে হবে। রাবেতা সেই পাণ্ডুলিপিতে একটি ক্রমিক নাম্বার লিখে রাখবে।

নয়, বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটি পান্ডুলিপি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখবেন।

রাবেতায়ে আলমে ইসলামীর এই ঘোষণার ফলে জ্ঞানপিপাসু রসূলপ্রেমিক লেখকদের মনে আগ্রহের আতিশয্য লক্ষ্য করা যায়। বহুসংখ্যক লেখক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। রাবেতায়ে আলমে ইসলামীও আরবী, ইংরেজী, উর্দুসহ অন্যান্য ভাষায় পাণ্ডুলিপি গ্রহণের জন্য অপেক্ষমান ছিল।

আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাইয়েরা বিভিন্ন ভাষায় পাণ্ডুলিপি পাঠাতে শুরু করেন। আরবী, উর্দু, ইংরেজী, ফরাসী এবং হিব্রু ভাষায় পাণ্ডুলিপি জমা পড়ে।

সংগৃহীত পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য রাবেতায়ে আলমে ইসলামী বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে। পুরস্কার প্রাপ্তদের বিবরণ নিম্নরূপ।

(১) প্রথম পুরস্কার, শেখ ছফিউর রহমান মোবারকপুরী, জামেয়া সালাফিয়া, ভারত, ৫০ হাজার সউদী রিয়াল।

(২) দ্বিতীয় পুরস্কার, ডক্টর মাজেদ আলী খান, জামেয়া মিল্লিয়া ইসলামিয়া, নয়াদিল্লী, ভারত, ৪০ হাজার রিয়াল।

(৩) তৃতীয় পুরস্কার, ডক্টর নাসির আহমদ নাসের পাকিস্তান, ৩০ হাজার রিয়াল।

(৪) চতুর্থ পুরস্কার, ওস্তাদ হামেদ মাহমুদ মোহাম্মদ মনসুর লেমুদ মিসর, ২০ হাজার রিয়াল।

(৫) পঞ্চম পুরস্কার ওস্তাদ আবদুস সালাম হাশেম হাফেজ, মদীনা মোনাওয়ারা, সউদী আরব, ১০ হাজার রিয়াল।

রাবেতায়ে আলমে ইসলামী ১৩৯৮ হিজরীতে করাচীতে অনুষ্ঠিত প্রথম এশীয় ইসলামী সম্মেলনে বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করে। সকল সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থায় এ খবর পাঠানো হয়।

পুরস্কার বিতরণের জন্য রাবেতা ১৩৯৯ হিজরীর ১২ ই রবিউস সানি সকালে মক্কায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মক্কার গভর্ণর আমীর ফাওয়ায ইবনে আবদুল আজিজের সেক্রেটারী আমীর সউদ তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে পুরস্কার বিতরণ করেন।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ঘোষণা করা হয় যে, পুরস্কারপ্রাপ্ত পাণ্ডুলিপি সমূহ পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ভাষায় ছেপে বিতরণ করা হবে। সেই ঘোষণা অনুযায়ী শেখ ছফিউর রহমান মোবারকপুরীর আরবী পাণ্ডুলিপি প্রথমে প্রকাশ করে পাঠকদের কাছে পেশ করা হয়েছে। তিনি প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য পুরস্কারপ্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিও প্রকাশ করা হবে।

আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদের আমলসমূহ তাঁরই সন্তুষ্টির জন্য নিবেদন করার তওফিক দেন এবং নেক আমল তিনি যেন কবুল করেন। নিঃসন্দেহে তিনি আমাদের উত্তম অভিভাবক উত্তম সাহায্যকারী।

শায়খ মোহাম্মদ আলী আল হারাকান
সেক্রেটারী জেনারেল
রাবেতায়ে আলামে ইসলামী
মক্কা মোকারারামা

বইটি যিনি লিখেছেন তার

নিজের পরিচয়

রাবেতা আয়োজিত প্রতিযোগিতার শর্তাবলীর মধ্যে প্রতিযোগীদের পরিচিতি সম্পর্কে আলোকপাত করতে বলা হয়েছিল। এ কারণে নীচে আমার সংক্ষিপ্ত একটি পরিচিতি তুলে ধরছি।

ছফিউর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ আকবর ইবনে মোহাম্মদ আলী ইবনে আবদুল মোমেন ইবনে যাকির উল্লাহ মোবারকপুরী আযমী। জন্ম তারিখ সার্টিফিকেটে ৬ই জুন ১৯৪৩ উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা করে দেখে গেছে যে, প্রকৃত জন্ম তারিখ ১৯৪২ সালের মাঝামাঝি। জন্মস্থান আযমগড় জেলায় হোসাইনাবাদের মোবারকপুরে।

কোরআন পাঠ করেছিলাম ১৯৪৮ সালে। মোবারকপুরেই ৬ বছর পড়াশোনা করি। আরবী ভাষা, ব্যাকরণ, সাহিত্য এবং অন্যান্য বিষয়ে পড়াশোনা করি। এরপর দু'বছর মোবারকপুর থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরের মউনাথ ভঞ্জনে লেখাপড়া শিখেছি। ১৯৫৬ সালে ভর্তি হই ফয়েযে আম মাদ্রাসায়। সেখানে পাঁচ বছর কাটিয়েছি। এ প্রতিষ্ঠানে আরবী ভাষা, ব্যাকরণ সাহিত্য ফেকাহ, উছুলে ফেকাহ তাফসীর হাদীস প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করি।

১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসে আমাকে শিক্ষা সমাপনী সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। 'ফযিলত ফিশ শরীয়ত ফযিলত ফিল উলুম' বিষয়ক সার্টিফিকেট প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষকতা করা এবং ফতোয়া প্রদানের ছাড়পত্র দেয়া হয়।

সকল পরীক্ষায় আমি ভালো ফলাফল লাভ করতে সক্ষম হই। এলাহাবাদ বোর্ডের পরীক্ষায়ও আমি অংশ নিয়েছিল। ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মৌলবী এবং ১৯৬০ সালে আলেম পরীক্ষা দিয়েছিলাম। উভয় পরীক্ষায় আমি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। দীর্ঘকাল পর ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে শিক্ষকতার সাথে সম্পর্কিত ফাযেল আদব পরীক্ষায় এবং ফাযেল দীনিয়াত পরীক্ষায় ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে অংশগ্রহণ করি। উভয় পরীক্ষায়ই প্রথম বিভাগ পেয়েছিলাম।

১৯৬১ সালে ফয়েযে আম মাদ্রাসা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে প্রথমে এলাহাবাদে পরে নাগপুরে শিক্ষকতা করি। ১৯৬৩ সালে ফয়েযে আম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আমাকে ডেকে পাঠান। সেখানে দু বছর শিক্ষকতা করি। কিন্তু পরিস্থিতির কারণে আমাকে সেখান থেকে বিদায় নিতে হয়। পরের বছর আযমগড়ের জামেয়াতুর রাসাদে এবং ১৯৬৬ সালে মহিলা মাদ্রাসা দারুল হাদীসে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করি। সেখানে কাটিয়েছি তিন বছর। সেখানে ভাইস প্রিন্সিপাল হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও পালন করেছি। এরপরে ইস্তফা দিয়ে মাদ্রাসা ফয়যুল উলুমে শিক্ষকতা শুরু করি। এ মাদ্রাসা মউনাথ ভঞ্জন থেকে ৭শ' কিলোমিটার দূরে মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী মাস থেকে শিক্ষকতা ছাড়াও মাদ্রাসার প্রশাসনিক কাজের সাথে নিয়োজিত ছিলাম। দূর দূরান্তে তাবলীগে দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। ১৯৬৯ সালের শেষের দিকে জন্মস্থান মোবারকপুরে দারুত তালিম মাদ্রাসায় শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করি। ১৯৭৪ সালে বেনারসের জামেয়া সালাফিয়ার শিক্ষকতা শুরু করি এবং এখনো এ প্রতিষ্ঠানে দ্বীনী শিক্ষা দান কাজে নিয়োজিত রয়েছি।

আমার গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা নীচে উল্লেখ করছি,

এক) তাযকেরায়ে শায়খুল ইসলাম মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব (আরবী) ১৯৭২ সাল। এ গ্রন্থের চারটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। **দুই)** তারিখে আলে সউদ (উর্দু) ১৯৭২, এ গ্রন্থের দু'টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। **তিন)** ইতহাফুল কেরাম তালিকু বুলুগিল মারাম লে ইঃ হাজার আসকালানী (আরবী) ১৯৭৪। **চার)** কাদিয়ানিয়াত আপনে আয়নে মে (উর্দু) ১৯৭৬। **পাঁচ)** ফেতনায়ে কাদিয়ানিয়াত আওর মওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী (উর্দু) ১৯৭৬। **ছয়)** আর রাহীকুল মাখতুম, (আরবী)। **সাত)** ইনকারে হাদীস হক ইয়া বাতেল (উর্দু) ১৯৭৭। **আট)** রজমে হক ও বাতেল, (উর্দু) ১৯৭৮। **নয়)** আবরাজুল হক ওয়াস সওয়াব ফি মাসআলাতে ছছফুর আল হেজাব (আরবী) ১৯৭৮। **দশ)** তাতাউরুস শুয়ুব আদ দীনিয়াত ফিল হিন্দ ওয়া মাজালুত দাওয়াতুল ইসলামিয়া ফিহা (আরবী) ১৯৭৯। **এগারো)** আল ফেরকাতুন নাজিয়া আল ফেরাকুল ইসলামিয়াতুল উখরা (আরবী) ১৯৮৮। **বারো)** ইসলাম আওর আদমে তাশাদুদ (উর্দু) ১৯৮৪, ইংরেজী ও হিন্দীতেও প্রকাশিত হয়েছে। **তেরো)** আহলে তাছাউউফ কি কারছতানিয়া (উর্দু) ১৯৮৬। **চৌদ্দ)** আল আহযাবুছ সিয়াসিয়া ফিল ইসলাম (আরবী) ১৯৮৬। বেনারসের মাসিক 'মোহাদ্দেস' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বও পালন করছি।

নতুন সংস্করণ প্রকাশে

লেখকের ভূমিকা

১৩৯৬ হিজরী সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত সীরাত সম্মেলনে রাবেতা আলামে ইসলামী সীরাত বিষয়ে গ্রন্থ রচনার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা আহবান করে। এর উদ্দেশ্য ছিল লেখকদের মধ্যে চিন্তা চেতনার ঐক্য এবং তাদের সাধনার সুবিন্যস্তকরণ। আমার মতে এটা প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। কেননা গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, সীরাতুন্নবী এবং ওসওয়ায়ে মোহাম্মদীই একমাত্র বিষয় যার মাধ্যমে মুসলিম জাহানের জীবন এবং মানব সমাজের সৌভাগ্য পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে। আল্লাহর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি হাজার হাজার দরুদ ও সালাম।

এ মোবারক প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ ছিল আমার জন্য এক বিরাট সৌভাগ্য। কিন্ত সাইয়েদুল আউয়ালিন ওয়াল আখেরিনের সুমহান জীবনের প্রতি আলোকপাত করার মতো শক্তি কি আমার ছিল? প্রকৃতপক্ষে আমি আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবিবের পুণ্যের কিছু অংশ লাভ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কেন? কারণ, আমি চেয়েছিলাম যে, অন্ধকারে পথ খুঁজে বেড়ানোর চেয়ে নবী (স.) একজন উম্মত হিসাবে তাঁর উজ্জল সুন্দর রাজপথের পথিক হয়ে জীবন যাপন করতে। এরপর একদিন সে পথের পথিক হয়েই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবো। পরলোকের জীবনে আল্লাহর রসূলের শাফায়াতের বরকতে আল্লাহ পাক আমার গুনাহসমূহ মার্জনা করবেন।

এ গ্রন্থের রচনাশৈলী সম্পর্কে কিছু কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। গ্রন্থ রচনার আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে,এটি অস্বাভাবিক দীর্ঘও করব না যাতে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে, আবার খুব সংক্ষিপ্তও করব না বরং মাঝামাঝি সাইজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখব। কিন্তু সীরাতুন্নবীর ওপর লেখা বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠে দেখা গেল যে কিছু কিছু ঘটনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট মত পার্থক্য রয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, সবদিক সামনে রেখে পর্যালোচনা করে যা নির্ভুল মনে হবে সেটাই উল্লেখ করব। বিস্তারিত যুক্তি প্রমাণ, তথ্য দলিলের উল্লেখ থেকে বিরত থাকব। যদি সব উল্লেখ করি তবে গ্রন্থের কলেবর অনেক বৃদ্ধি পাবে। সেসব ক্ষেত্রে সন্দেহ দেখা দেবে যে, আমার পর্যালোচনামূলক বক্তব্য যথেষ্ট নয়, পাঠক বিস্মিত হবেন বা যেসব ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণকারীদের বক্তব্য আমার বিবেচনায় সঠিক নয় সেসব ক্ষেত্রে শুধু যুক্তিপ্রমাণের প্রতি ইঙ্গিত দেব। কার্যত তাই করেছি।

হে আল্লাহ পাক, তুমি আমার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ নির্ধারণ করো। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল, করুণাময়। তুমি আরশে আযিমের মালিক, তুমি সুমহান তুমি সর্বশক্তিমান।

ছফিউর রহমান মোবারকপুরী
২৪ শে রজব, ১৩৯৬ হিজরী
২৩ শে জুলাই, ১৯৭৬ সাল

বাংলাভাষায় বইটির

অনুবাদ ও প্রকাশনা সম্পর্কে

আল হামদুলিল্লাহ,

এক সুদীর্ঘ প্রচেষ্টার ফলে আমরা মহানবীর বহুল আলোচিত ও প্রশংসিত জীবনী গ্রন্থ 'আর রাহীকুল মাখতূম' বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলমানদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হলাম।

❒ 'আর রাহীকুল মাখতূম' কোরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালার ব্যবহৃত একটি বাক্যাংশ, যার অর্থ ছিপি আঁটা উত্তম পানীয়। সূরা 'আল মোতাফফেফীন'-এ আল্লাহ তায়ালা তাঁর নেক বান্দাহদের পুরস্কার হিসেবে জান্নাতে এই পানীয় সরবরাহের ওয়াদা করেছেন। প্রিয়জনদের জন্যে এই পানীয় শুধু ছিপি আঁটা বোতলেই তিনি ভরে রাখেননি—পাত্রজাত করার সময় এতে কস্তুরীর সুগন্ধিও তিনি মেখে রেখেছেন।

❒ কোরআনে বর্ণিত 'আর রাহীকুল মাখতূম' মোমেনদের জন্যে সত্যিই এক শ্রেষ্ঠ পাওনা, যাদের জন্যে এই মহা আয়োজন তাদের সর্দারের জীবনী গ্রন্থ 'আর রাহীকুল মাখতূম' সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী একটি ভিন্ন স্বাদের সীরাত গ্রন্থ। এমন একটি গ্রন্থ রচনা করে সীরাতের মহান পন্ডিত আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপূরী একটি অসামান্য কাজ সম্পাদন করেছেন সন্দেহ নেই, মূলত এর মাধ্যমে তিনি যমীনের 'রাহীক'-এর সাথে আসমানের 'রাহীক'-এর এক ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করে দিয়ে গেলেন।

❒ 'আর রাহীকুল মাখতূম' বইটির বিশ্বব্যাপী আবেদন ও অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা সম্পর্কে আমি আমার নিজের থেকে আর কিছুই বলতে চাই না, মূল বইয়ের শুরুতে লেখকের মূল্যবান গ্রন্থ পরিচিতি, রাবেতায়ে আলামে ইসলামীর মতো বিশ্ব মুসলিমের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার দু' দু'জন মহাসচিবের প্রতিবেদনের পর এ বিষয়ে আসলেই আর কিছু বলার থাকে না। মূল পুস্তকের গভীরে যাওয়ার আগে একবার এই পটভূমিকার কথাগুলো পড়ে নিলে সহজেই আপনি একথাটা বুঝতে পারবেন যে, বিশ্বজোড়া প্রতিযোগিতায় প্রায় ১২০০ শত পুস্তকের মধ্যে এই বইটিকে কেন এই বিরল সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে, কোন্ সে বৈশিষ্ট যে কারণে বইটি যুগের 'সেরা সীরাত গ্রন্থের' মর্যাদা পেয়েছে। সারা দুনিয়ার নবী প্রেমিকরা মনে হয় এমন একটি সীরাত গ্রন্থের জন্যে বহুদিন ধরে অপেক্ষা করছিলো—যাকে এই বিষয়ের ওপর রচিত অতীতের সব কয়টির নির্ভরযোগ্য উপাদানের সমন্বয়ে তৈরী করা হবে, অপর কথায় যা হবে সীরাত সংক্রান্ত বিশাল পাঠাগারের একটি নির্যাস। সেদিক থেকে বিচার করলে আল্লামা ছফিউর রহমান মোবারকপূরীর এই 'মোবারক' উদ্যোগটি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। বলার অপেক্ষা রাখে না, বিশ্বের কোটী কোটী মুসলমানদের পক্ষ থেকে রাবেতায়ে আলামে ইসলামীর বইটিকে প্রথম পুরস্কার প্রদান করার মাধ্যমে এ প্রশংসারই স্বীকৃতি মিলেছে।

❒ বিদগ্ধ গবেষক মূল বইটি রচনা করেছেন আরবী ভাষায়, জানা কথাই সীরাতের ওপর রচিত হাজার হাজার বইয়ের বিশাল মৌলিক উপাদানগুলোও রয়েছে এই আরবীতে। মূল আরবী গ্রন্থের বিভিন্ন ভাষায় যখন এর অনুবাদ বেরিয়েছে তাতে যোগ্য অনুবাদকরা মূল গ্রন্থের ভাষা ও ভাবধারার মান বজায় রাখার যে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন তা আমি যথার্থই অনুভব করতে পারি, বিশেষ করে এই বইতে ব্যবহৃত সাহাবীদের নাম, তাদের গোত্র কবিলার নাম, নবী আগমনের আগে পরে আরবের সমাজ রাষ্ট্র, যুদ্ধ কলহ ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকান্ডের সাথে জড়িত অসংখ্য ব্যক্তি ও স্থানের নামগুলোকে নিজ নিজ ভাষায় লিখতে গিয়ে তারা কি সমস্যায় পড়েছেন, তাও আমি কিঞ্চিত অনুভব করি। এই

হাজার হাজার নামের যথার্থ উচ্চারণ সত্যিই একটা দুরূহ ব্যাপার বলে আমার কাছে মনে হয়েছে, তদুপুরি আরবী বর্ণমালায় বাংলা উচ্চারণ নিয়ে আমাদের আলেম ওলামা ও ভাষাবিদ গবেষকদের মাঝেও নানা এখতেলাফ রয়েছে, একজন যে বানানকে শুদ্ধ বলেন আরেকজন তাকে সম্পূর্ণ অশুদ্ধ বলে উড়িয়ে দেন। এক্ষেত্রে সহজ পদ্ধতি হিসেবে যে নামের যে উচ্চারণকে আমার কাছে মূল শব্দের কাছাকাছি মনে হয়েছে আমি তাকেই ব্যবহার করেছি। যথা সম্ভব গোটা বইতে নাম ও জায়গার ব্যাপারে একটা অভিন্ন পদ্ধতি আমি ফলো করার চেষ্টা করেছি। তারপরও একথা বলবো না যে, আমি সব ঠিক করে লিখতে পেরেছি। আল্লাহ তায়ালা আমার ভুল ত্রুটি ক্ষমা করুন।

❒ 'আর রাহীকুল মাখতূম' বইটিতে যে অসংখ্য গ্রন্থের নাম ও তার পৃষ্ঠা নম্বর দেয়া আছে সে ব্যাপারেও মনে হয় একটা কথা বলে নেয়া প্রয়োজন। যেসব পৃষ্ঠার নম্বর এখানে দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে আরবী ও উর্দু গ্রন্থের পৃষ্ঠা। এর ভেতরে এমন অনেক বইর তিনি রেফারেন্স দিয়েছেন যা এখনো বাংলায় অনূদিত হয়নি, যেগুলোর অনুবাদ হয়েছে সেখানেও এই পৃষ্ঠার নম্বর দিয়ে মূল তথ্যের কোনো সন্ধান পাওয়া যাবে না। যেমন মূল লেখক তার বই-এর বহু জায়গায় সাইয়েদ কুতুব শহীদের বিখ্যাত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন, কিন্তু সেখানে তিনি যে খন্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর দিয়েছেন তা শুধু আরবী সংস্করণের বেলায় প্রযোজ্য। বাংলা ভাষায় তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর যে অনুবাদ বেরিয়েছে স্বাভাবিকভাবেই তার খন্ড ও পৃষ্ঠার কোনোটাই এর সাথে মিলবে না। এ সমস্যা জেনেও একান্ত আমানতদারির খাতিরে আমরা মূল লেখকের দেয়া কোনো 'তথ্য সূত্র' পরিবর্তন করিনি।

❒ আপনারা জানেন, বিশ্ববাজারে এ অমূল্য সীরাতগ্রন্থটির আরবী সংস্করণগুলো প্রথম প্রকাশ করেছেন রাবেতায়ে আলামে ইসলামী স্বয়ং নিজে, রাবেতার তদারকিতেই অন্য একটি প্রতিষ্ঠান বইটি প্রকাশ করেন, পরে অবশ্য নানা প্রতিষ্ঠান নানা ভাষায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বইটির অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। আমরাও তাদের পথ অনুসরণ করে বাংলা ভাষায় এই গুরুত্বপূর্ণ বইটি প্রকাশের একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এ ভাষাভাষী মানুষের সাথে এই মহান পুস্তকটির পরিচয় করানোই ছিলো এখানে আমাদের উদ্দেশ্য। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, যে মহামানবের জীবনী গ্রন্থ আজ আমরা প্রকাশ করতে যাচ্ছি, তিনি ছিলেন এমন এক কাফেলার সর্দার যারা নিজ নিজ জাতিকে বলেছেন, **'ওয়া মা আসআলুকুম আলাইহে মিন আজরিন ইন আজরিয়া ইল্লা আ লা'রাব্বিল আলামীন'** *আমি তোমাদের কাছে এ কাজের জন্যে কোনো পারিশ্রমিক চাইনা, আমার পরিশ্রমিক তো আমার মালিকের কাছেই রয়েছে।*

সর্বশেষে 'আল কোরআন একাডেমী লন্ডন' বাংলাদেশ কার্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই, তারা বইটির পরিবেশনার দায়িত্ব না নিলে আমি লন্ডনে বসে শুধু স্বপ্নই দেখে যেতাম, বইটি বহুদিনেও হয়তো আলোর মুখ দেখতো না। বিশেষ করে শামীম ভাইয়ের সহযোগিতার কথা ভোলার নয়। তার আন্তরিক প্রচেষ্টা না থাকলে এই বিশাল পান্ডুলিপিটি এতো দ্রুত লেখা সম্ভব হতো না। এর সাথে আরো যারা বিভিন্নভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছেন, আল্লাহ তায়ালা তাদের সবাইকে স্ব-স্ব জায়গায় পুরস্কৃত করুন। আমীন।

আমার প্রিয়নবীর নামে অসংখ্য দরুদ অসংখ্য সালাম।

খাদিজা আখতার রেজায়ী
রবিউল আওয়াল, ১৪১৯ হিজরী, জুলাই ১৯৯৮
লন্ডন

চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশের মুহূর্তে

পরিবেশকের নিবেদন

● ১৯৯৯ সালে সীরাতুন্নবীর মাস ছিলো ইংরেজী জুন-জুলাই। সে হিসেবে আমরা চিন্তা করেছিলাম, নবীর স্মৃতি বিজড়িত মাসেই আমরা প্রিয় নবীর এ যুগ শ্রেষ্ঠ জীবনী গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ পরিবেশন করবো। এই মহান গ্রন্থের যিনি অনুবাদক ও প্রকাশক তার এই ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের আলোকে আমরা একাজের জন্যে আমাদের সব প্রস্তুতিও সম্পন্ন করে রেখেছিলাম, কিন্তু একটা বিশাল বইকে হস্তাক্ষর থেকে পাঠকের হাতে পৌঁছানো পর্যন্ত আরো যতোগুলো পর্যায় অতিক্রম করতে হয় তার সব কয়টির ওপর আমাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ না থাকায় আমরা সীরাতুন্নবীর মাস তথা রবিউল আওয়ালের ভেতর বইটি পরিবেশন করতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত মুদ্রণ শিল্পের সব কয়টি ঘাট পেরিয়ে বইটি যখন আলোর মুখ দেখলো তখন নবীর দুনিয়ায় আগমনের মাসটি শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা সম্ভবত এ গুনাহগার বান্দাহদের নিয়তের প্রতি তাকিয়ে তাদের নিরাশ করেননি—তাই অনন্য সাধারণ এই গ্রন্থটি তার প্রথম পরিবেশনার সুনির্দিষ্ট টার্গেট হিসেবে প্রিয় নবীর আবির্ভাবের সময়টি 'মিস' করলেও অল্প কয়েক দিনের ব্যাবধানেই তিনি আমাদের তার মদীনায় পদার্পণের স্মৃতিময় সুযোগটি এনে দিলেন।

● একই বছরের ২৪শে সেপ্টেম্বর, প্রিয় নবীর ইয়াসরাব তথা মদীনায় পদার্পণের দিন। ১৪২০টি বছরের সিঁড়ি পার হয়ে এই বরকতপূর্ণ দিনে আমরা তারই একনিষ্ঠ প্রেমীর ভালোবাসার সিঞ্চন এই অনুবাদ গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবেশন করেছিলাম। এই মোবারক গ্রন্থটির যখন আমরা তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছি তখন আমাদের সামনে ইয়াওমুল আরাফার মুহূর্তটি উপস্থিত ছিলো। এই আরাফার উপকণ্ঠে দাঁড়িয়ে এই দিনেই তিনি তাঁর প্রায় দেড় লক্ষ জাঁ-বায সাহাবীর সামনে সেই ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণ তথা মানবাধিকারের মহাসনদটি পেশ করেছিলেন, যার ওপর বলতে গেলে আজ গোটা মানব জাতির সভ্যতা সংস্কৃতির বুনিয়াদ দাঁড়িয়ে আছে।

● আজ আবার যখন আমরা এর সংশোধিত অষ্টম সংস্করণ ছাপতে শুরু করেছি তখন কোরআন নাযিলের মাস রমযানুল মোবারক আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে। আল্লাহ তায়ালা এই পবিত্র মাসে কোরআনের বাহকের এই অমূল্য জীবনী গ্রন্থটিকে কবুল করুন!

● 'আর রাহীকুল মাখতূম' যেমন বিশ্বসভায় যুগের সব রেকর্ড ভংগ করে সর্বশ্রেষ্ঠ সীরাত গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করেছে, তেমনি এই বইটির বাংলা অনুবাদও আমাদের দেশের সাহিত্য জগতের সব রেকর্ড ভংগ করে আপন মহিমায় মহিমান্বিত হয়েছে। মাত্র পঞ্চান্ন দিনের মাথায় আমরা বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছি, আল হামদু লিল্লাহ তিন বছর শেষ হবার আগেই বইটির অষ্টম সংস্করণ প্রকাশ হতে যাচ্ছে। বিষয়টি সাম্প্রতিক কালে শুধু ইসলামী সাহিত্যেই নয় গোটা বাংলা ভাষার ইতিহাসে নিসন্দেহে এক দুর্লভ সম্মান। এই দুর্লভ সম্মানের পুরোটাই আসলে নবী (সঃ)-এর প্রাপ্য—কোনো ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের এতে কৃতিত্ব নেই। এই বইয়ের লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও পরিবেশক কারোই এই কৃতিত্বে বিন্দুমাত্র পাওনা আছে বলে আমরা মনে করি না। এই গ্রন্থটির অভুতপূর্ব জনপ্রিয়তার সবটুকু তারিফ শুধু তার জন্যে—যিনি স্বয়ং নিজে তার ফেরেস্তাদের নিয়ে নবীর নামে সালাম পাঠান।

● তিন বছর আগে বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হবার পর দেশের বেশ কয়টি শীর্ষস্থানীয় দৈনিকের সাহিত্য পাতায় কয়েকজন বিদগ্ধ সুধী চিন্তাবিদ যেভাবে এর উচ্ছ্বসিত

প্রশংসা সম্বলিত পর্যালোচনা করেছেন তাতেই আমরা এই মহান গ্রন্থটির প্রতি মানুষের ভালোবাসা টের পেয়েছিলাম। এক পর্যায়ে আমাদের শুভানুধ্যায়ীরা বইটির একটি প্রকাশনা অনুষ্ঠানের কথাও বলেছিলেন, তাই আমরা অধীর আগ্রহে এর অনুবাদক প্রকাশক মোহতারামা খাদিজা আখতার রেজায়ীর ঢাকায় আগমনের অপেক্ষা করছিলাম। আল্লাহ তায়ালার শোকর, সে বছর ১৪ সেপ্টেম্বর পবিত্র ওমরা হজ্জ পালনের পথে মাত্র কয়েক দিনের জন্যে তিনি ঢাকায় এলে সে মাসের ১৮ তারিখে আমরা জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে বইটির এক শানদার প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন করি।

● প্রিয় নবীর শানে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে জাতীয় অধ্যাপক বাংলা সাহিত্যের মনীষী বুদ্ধিজীবী সৈয়দ আলী আহসান তার লিখিত প্রবন্ধে বলেন, খাদিজার অনুবাদে মাতৃভাষার দীপ্ত অহংকর ও অংগীকার দুটোই রয়েছে, খাদিজা অস্বাধারণ নৈপুন্যের সাথে এবং অনুপম বাক্য বিন্যাসে গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করেছেন, তার অনুবাদটি যেন অনুবাদ নয়—এ এক নতুন সৃষ্টি। তার এ বিরল সাফল্যের উল্লেখ করে তিনি এই মহান গ্রন্থটির বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করেন। দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম জাতীয় মসজিদের খতিব মাওলানা ওবায়দুল হক 'আর রাহীকুল মাখতূম'-এর বাংলা অনুবাদকে সীরাত সাহিত্যে অনুবাদকের একটি বড়ো ধরনের কৃতিত্ব বলে উল্লেখ করেন এবং এই অনুবাদ যেন আমাদের জীবনের পাথেয় হিসেবে কাজ করে সে জন্যে আল্লাহর রহমত কামনা করেন। আল আরাফা ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান এ জেড এম শামসুল আলম এই দুরূহ কাজের জন্যে এই প্রবাসী লেখকের মূল্যায়ন করেছেন এভাবে যে, মাত্র এক মাসে তার এ বিশাল অনুবাদ গ্রন্থের যতো পরিমাণ পর্যালোচনা পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে দেশের অন্য কোনো গ্রন্থের ব্যাপারে তা হয়নি।

প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত বিশিষ্ট সাংবাদিক দৈনিক দিনকাল সম্পাদক আখতার-উল-আলম কালের এই সেরা সীরাত গ্রন্থটির অনুবাদের ভূয়সী প্রশংসা করতে গিয়ে অনুবাদ শিল্পকে কাশমিরী শালের উল্টো পিঠের সাথে তুলনা করে প্রকাশিত গ্রন্থ 'আর রাহীকুল মাখতূম' বইটিতে কাশমিরী শালের আসল পিঠ নকল পিঠ যেন চিহ্নিতই করা যায় না বলে অভিমত প্রকাশ করেন। দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা রুহুল আমীন খান এ কালজয়ী গ্রন্থের অনুবাদ কাজটি সঠিক হাতে সম্পাদিত হয়েছে দেখে আনন্দ প্রকাশ করেন, তার মতে মোহতারামা খাদিজা আখতার রেজায়ী পাঠকদের একথা ভুলিয়ে দিয়েছেন যে, বইটি আসলেই একটি অনুবাদ গ্রন্থ। বিশিষ্ট নাট্যকার আরিফুল হক বইটিকে আল্লাহর রসূলের জীবনের একটি পূর্ণাংগ পর্যায়ক্রমিক ও ঐতিহাসিক ধারা বলে অভিহিত করেন। তিনি অনুবাদকের অনুবাদ কর্মে সৃজনের সাথে অনুসৃজনেরও যে দক্ষতা রয়েছে সেকথা উল্লেখ করেন। বিশিষ্ট অভিনেতা ওবায়দুল হক সরকার মাওলানা আকরাম খাঁর 'মোস্তফা চরিত', কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী' ও অনুদিত 'সীরাতুন্নবী' সহ আরো শত শত সীরাত গ্রন্থের পাশাপাশি 'আর রাহীকুল মাখতূম'কে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সীরাত গ্রন্থ বলে উল্লেখ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাকের সাহিত্য সম্পাদক কবি আল মুজাহিদী উপমহাদেশের কোটি কোটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষদের হাতে এমনি একটি বিরল গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ তুলে দেয়ার জন্য অনুবাদক ও পরিবেশককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এর ব্যাপক প্রসার কামনা করেন। এছাড়াও বইটির ওপর লিখিত প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের সাহসী লেখক কবি আল মাহমুদ সমকালীন বাংলা সাহিত্যের একজন প্রতিভাময়ী লেখিকা ও কথাশিল্পী মোহতারামা খাদিজা আখতার রেজায়ীর সাম্প্রতিক অনুবাদ গ্রন্থটিকে একটি নতুন নির্মাণ বলে অভিহিত করেন, পরিশেষে বিশিষ্ট লেখিকা ও প্রাক্তন সংসদ সদস্য হাফেজা আসমা

খাতুন এই গ্রন্থটির পর্যালোচনা করতে গিয়ে বইটিকে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য পুস্তক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানান।

অনুষ্ঠানের সভাপতি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাবেক প্রধান ও ইসলামী ব্যাংক লি. এর চেয়ারম্যান সচিব শাহ আবদুল হান্নান বাংলা ভাষায় বিশ্ব জোড়া খ্যাতির অধিকারী এই মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ উপহার দেয়ার জন্যে অনুবাদক ও প্রকাশকের শোকরিয়া আদায় করেন। তিনি এর পরিবেশক প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'আল কোরআন একাডেমী লন্ডন' বাংলাদেশ কার্যালয়কেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। গ্রন্থটির অনুবাদক প্রকাশক মোহতারামা খাদিজা আখতার রেজায়ী নিজেও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আগত সুধীমন্ডলীর উদ্দেশ্যে লিখিত একটি প্রবন্ধে তিনি এই গ্রন্থের সার্বিক সাফল্যের জন্যে একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই শোকর আদায় করেন। যেসব বিদগ্ধ সুধী বইটির ওপর পত্র-পত্রিকায় মূল্যবান পর্যালোচনা লিখেছেন, যারা এই মোবারক অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেছেন এবং যারা এখানে উপস্থিত হয়ে এই অনুষ্ঠানকে সফল করেছেন—তিনি তাদের সবার কৃতজ্ঞতা আদায় করেন। তার লিখিত বক্তব্য ও অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের প্রবন্ধ পাঠ করেন কবি মতিউর রহমান মল্লিক।

আমাদের এই প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বিশেষ মেহমান হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন মোফাসসেরে কোরআন হযরত মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী সাহেবেরও উপস্থিত হওয়ার কথা ছিলো। তিনি লন্ডনে অবস্থান কালে মোহতারামা খাদিজা আখতার রেজায়ীর কাছে নিজেই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার ব্যাপারে তার আন্তরিক আগ্রহের কথা ব্যাক্ত করেছিলেন। বিশেষ কারণে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে না পারলেও তিনি ব্যক্তিগতভাবে এই প্রকাশনা অনুষ্ঠানটির সাফল্য কামনা করেছেন। তাছাড়া বিগত বছরগুলোতে আমাদের প্রকাশিত তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআন' ও 'তাফসীরে ওসমানী'-কে যেভাবে তিনি পৃথিবীর আনাচে কানাচে ছড়িয়ে থাকা লক্ষ লক্ষ বাংলা ভাষা-ভাষীদের কাছে পরিচিত করেছেন, সেজন্যেও আমরা আল্লাহ তায়ালার কাছে তার জন্যে দোয়া করি। হাশরের কঠিন প্রান্তরে যখন আদম সন্তানরা এক ফোটা পানির জন্যে হাহাকার করতে থাকবে তখন মহান আল্লাহ তায়ালা 'আর রাহীকুল মাখতূম ও খেতামুহু মেসকুন' তথা ছিপি আঁটা বোতলের কস্তুরির সুগন্ধি যুক্ত পানীয় দ্বারা তাকে পরিতৃপ্ত করুন!

আমরা সত্যিই আনন্দিত যে, যখন আমরা বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ পরিবেশন করছিলাম তখন অনুবাদক প্রকাশক স্বয়ং ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। তাই তার সযত তত্ত্বাবধানে গোটা বইটিকে আমরা বলতে গেলে নতুন করে সাজিয়ে দিতে পেরেছি। এবারও আমরা তার মূল্যবান পরামর্শকে সামনে রেখেই বইটির অষ্টম সংস্করণ পেশ করছি। এখানে সেখানে যা কিছু ভুল-ভ্রান্তি ছিলো, যথাসম্ভব আমরা তাও পরিশুদ্ধ করে দিতে পেরেছি। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মোহতারামার ইচ্ছা অনুযায়ী বেশী থেকে বেশী মানুষকে প্রিয় নবীর এ মূল্যবান জীবনীগ্রন্থের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে আমরা বইটির দাম প্রায় অর্ধেক কমিয়ে দিয়েছি।

আসমান যমীনের সর্বত্র যার প্রশংসা সেই প্রিয় মানুষের নামে আমাদের লক্ষ সালাম।

'আল কোরআন একাডেমী লন্ডন'
বাংলাদেশ সেন্টার

যে ভাবে আমরা বইটিকে সাজিয়েছি

আঁধার ঘেরা পৃথিবী ঃ সোবহে সাদেকের প্রতীক্ষায়

কোন বংশে সেই সোনার মানুষ ঃ আল আমীন থেকে আর রাসূল

নিজ ঘরে তিনি পরদেশী ঃ যুলুম নিপিড়নের তেরো বছর

মহাবিজয়ের দ্বার প্রান্তে ঃ আজ কোনো প্রতিশোধ নয়

বিদায় হে আমার বন্ধু ঃ অন্তিম যাত্রার পথে মহানবী

সহায়ক গ্রন্থসমূহ ঃ যে ফুল দিয়ে গেথেছি মালা

হে আমাদের মালিক, এই বংশের মধ্যে তাদের নিজেদের মাঝ থেকেই তুমি এমন একজন রসূল পাঠাও, যে তাদের তোমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে, তাদের তোমার কেতাব ও তার জ্ঞান শিক্ষা দেবে, তাদের পরিশুদ্ধ করবে (এই দোয়া তুমি কবুল করো, কেননা) তুমি শক্তিশালী ও সর্বজ্ঞানে বিজ্ঞ

(সূরা বাকারা ১২৯)

আঁধার ঘেরা এই পৃথিবী

সোবহে সাদেকের প্রতীক্ষায়

আরবের ভৌগোলিক পরিচয় এবং বিভিন্ন জাতির অবস্থান

সীরাতে নববী প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর শেষ পয়গম্বরের বাস্তব প্রতিচ্ছবি। বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানব জাতির সামনে তা উপস্থাপন করেছিলেন। এর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোয় এবং বান্দাদের বন্দেগী থেকে বের করে আল্লাহর বন্দেগীর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লাহর পয়গাম তথা পয়গামে রব্বানী অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ব ও পরবর্তী সময়ের অবস্থার তুলনামূলক আলোচনা ছাড়া সীরাতুন্নবীর পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাই মূল বিষয়ের আলোচনা শুরুর আগে ইসলামপূর্ব আরবের বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং তাদের জীবনযাপনের অবস্থা বর্ণনা করা একান্ত প্রয়োজন। এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবকালের অবস্থা সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা পাওয়া যাবে।

'আরব' শব্দের আভিধানিক অর্থ সাহারা, বিশুষ্ক প্রান্তর বা অনুর্বর যমীন। তবে প্রাচীনকাল থেকে এ শব্দটি জাযিরাতুল আরব এবং তার অধিবাসীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে আসছে।

আরবের পশ্চিমে লোহিত সাগর এবং সায়না উপদ্বীপ, পূর্বদিকে আরব উপসাগর, দক্ষিণে ইরাকের বিরাট অংশ এবং আরো দক্ষিণে আরব সাগর। এটি প্রকৃতপক্ষে ভারত মহাসাগরের বিস্তৃত অংশ। উত্তরে সিরিয়া এবং উত্তর ইরাকের একাংশ। এর মধ্যে কিছু বিতর্কিত সীমানাও রয়েছে। মোট এলাকা দশ থেকে তেরো লাখ বর্গ মাইল।

দ্বীপসদৃশ এই আরব দেশটি প্রাকৃতিক এবং ভৌগোলিক দিক দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যন্তরীণ ও বহির্দিক থেকে এটি বহু প্রান্তর এবং মরুভূমিতে ঘেরা। এ কারণেই এ অঞ্চলটি এমন সংরক্ষিত। অন্যরা এ অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব সহজে বিস্তার করতে পারে না। তাই লক্ষ্য করা গেছে যে, জাযিরাতুল আরবের মূল ভূখন্ডের অধিবাসীরা প্রাচীনকাল থেকেই নিজেদের সকল কাজে সম্পূর্ণ স্বাধীন স্বয়ংসম্পূর্ণ। অথচ আরবের এসব অধিবাসী ছিলো তদানীন্তন বিশ্বের দু'টি বৃহৎ শক্তির প্রতিবেশী। এই প্রাকৃতিক বাধা না থাকলে সেই দুটি শক্তির হামলা প্রতিহত করার সাধ্য আরবদের কোনদিনই হতো না।

বাইরের দিক থেকে জাযিরাতুল আরব ছিলো প্রাচীনকালের সকল মহাদেশের মাঝখানে। স্থলপথ এবং জলপথ উভয় দিক থেকেই বহির্বিশ্বের সাথে আরবের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিলো সহজ। জাযিরাতুল আরবের উত্তর পশ্চিম অংশ হচ্ছে আফ্রিকা মহাদেশের প্রবেশ বা তোরণদ্বার। উত্তর পূর্ব অংশে ইউরোপ জাতি। পূর্বদিকে ইরান, মধ্য এশিয়া এবং দূর প্রাচ্যের প্রবেশ পথ। এ পথে চীন এবং ভারত পর্যন্ত যাওয়া যায়। এমনিভাবে প্রতিটি মহাদেশই আরব দেশের সাথে সম্পৃক্ত। এসকল মহাদেশগামী জাহাজ আরবের বন্দরে সরাসরি নোঙ্গর করে।

এ ধরনের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে জাযিরাতুল আরবের উত্তর ও পশ্চিম অংশ বিভিন্ন জাতির মিলনস্থল এবং ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় প্রান কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিলো।

আরব জাতিসমূহ

ঐতিহাসিকরা আরব জাতিসমূহকে তিনভাগে ভাগ করেছেন।

এক. আরব বারেবা

আরব বারেবা বলতে আরবের সেইসব প্রাচীন গোত্র এবং সম্প্রদায়ের কথা বোঝানো হয়েছে যারা সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে গেছে। এসব গোত্র ও সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিস্তারিত তথ্য এখন আর জানা যায় না। যেমন আদ, সামুদ, তাছাম, জাদিছ আমালেকা প্রভৃতি জাতি।

দুই. আরব আবেরা

এ দ্বারা সেসব গোত্রের কথা বোঝানো হয়েছে, যারা ছিলো ইয়ারুব ইবনে ইয়াশজুব ইবনে কাহতানের বংশধর। এদেরকে কাহতানি আরবও বলা হয়।

তিন. আরবে মোস্তারেবা

এরা সেসব গোত্র, যারা হযরত ইসমাইল (আ.)-এর বংশধর। এদেরকে আদনানী আরবও বলা হয়।

আরবে আরেবা অর্থাৎ কাহতানি আরবদের প্রকৃত বাসস্থান ছিলো ইয়েমেনে। এখানেই এদের পরিবার ও গোত্রের বিভিন্ন শাখা প্রসার লাভ করে। এদের মধ্যে দু'টি গোত্র বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। যথা:

(ক) হেমইয়ার: এদের বিখ্যাত শাখার নাম হচ্ছে যাইদুল যমহুর কোজাআহ এবং যাকাসেক।

(খ) কাহতান: এদের বিখ্যাত বিখ্যাত শাখার নাম হচ্ছে হামদান, আনমার, তাঈ, মাযহিজ, কেন্দাহ, লাখম, জুযাম আযদ, আওস, খাজরায এবং জাফনার বংশধর। নিজস্ব এলাকা ছেড়ে এরা সিরিয়ার আশে পাশে বাদশাহী কায়েম করেছিলো। পরে এরা গাস্সান নামে পরিচিতি লাভ করে।

সাধারণ কাহতানি গোত্রসমূহ পরবর্তীকালে ইয়েমেন ছেড়ে দেয় এবং আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন এলাকায় বসতি স্থাপন করে। এরা সেই সময় দেশত্যাগ করেছিলো, যখন রোমকরা মিসর ও সিরিয়া অধিকার করার পর ইয়েমেনবাসীদের জলপথের বাণিজ্যের ওপর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলো এবং স্থলপথের বাণিজ্যও নিজেদের অধিকারে এনেছিলো। এর ফলে কাহতানিদের বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিলো।

এমনও হতে পারে, কাহতানি এবং হেমইয়ারি গোত্রসমূহের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ দেখা দেয়ায় কাহতানিরা দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিলো। এরূপ মনে করার এটাই কারণ যে, কাহতানি গোত্রসমূহ দেশত্যাগ করেছিলো, কিন্তু হিমইয়ারী গোত্রসমূহ তাদের জায়গায় অটল ছিলো।

যেসব কাহতানি গোত্র দেশ ত্যাগ করেছিলো, তাদের চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

এক) আযাদ ঃ এরা তাদের সর্দার এমরান ইবনে আমর মুযাইকিয়ার পরামর্শে দেশত্যাগ করে। প্রথমে এরা ইয়েমেনে এক জায়গা থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত হয় এবং অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেয়ার জন্যে বিভিন্ন দল পাঠাতে থাকে। এরপর উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে বসতি স্থাপন করে। এদের বিস্তারিত বিরবণ নিম্নরূপ:

ছা'লাবা ইবনে আমর ঃ এই ব্যক্তি প্রথমে হেজায অভিমুখে রওয়ানা হয়ে ছা'লাবা এবং জিকার এর মাঝখানে অবস্থান গ্রহণ করেন। তার সন্তানরা বড় হলে এবং খান্দান শক্তিশালী হলে তখন মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন এবং মদীনাতেই বসবাস করেন। এই ছা'লাবার বংশ থেকেই আওস এবং খাযরাজের জন্ম। আওস এবং খাযরাজ ছিলো ছা'লাবার পুত্র হারেছার সন্তান।

হারেছ ইবনে আমর ঃ তিনি ছিলেন খোজাআর সন্তান। এই বংশধারার লোকেরা হেজায ভূমির বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরার পর মাররায যাহরানে অবস্থান নিয়ে পরে মদীনায় হামলা করে। মক্কা থেকে বনি জুরহুম গোত্রের লোকদের বের করে দিয়ে নিজেরা মক্কায় বসতি গড়ে।

এমরান ইবনে আমর ঃ এই ব্যক্তি এবং তার সন্তানরা আম্মানে বসবাস করতে থাকেন। এ কারণে এদেরকে আযদে আম্মান বলা হয়ে থাকে।

নাসর ইবনে আযদ ঃ এই ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত গোত্রসমূহ তোহামায় অবস্থান করে। এদের আযদে শানুয়াত বলা হয়ে থাকে।

জাফনা ইবনে আমর ঃ এই ব্যক্তি সিরিয়ায় চলে যান এবং সেখানে সপরিবারে বসবাস করেন। তিনি ছিলেন গাস্‌সানী বাদশাহদের প্রপিতামহ। সিরিয়ায় যাওয়ার আগে এরা হেজাযে গাস্‌সান নামক একটি জলাশয়ের কাছে কিছুদিন অবস্থান করেন।

দুই) লাখম জুযাম গোত্র, লাখমের বংশধরদের মধ্যে নসর ইবনে রবিয়া ছিলেন অন্যতম। তিনি হীরার শাসনকর্তাদের (যাদের বলা হতো আলে মোনযের) পূর্বপুরুষ ছিলেন।

তিন) বনু তাঈ গোত্র, এই গোত্র বনু আযদের দেশত্যাগের পর উত্তর দিকে রওয়ানা হয় এবং আজা ও সালমা নামে দু'টি পাহাড়ের মাঝখানে বসবাস করতে শুরু করে। তাঈ গোত্রের কারণে এই দু'টি পাহাড় বিখ্যাত হয়ে ওঠে।

চার) কিন্দা গোত্র , এ গোত্রের লোকেরা প্রথমে বাহরাইনের বর্তমান আল আহমা নামক স্থানে বসতি স্থাপন করে। কিছুকাল পর তারা হাদরামাউতে যায়। কিন্তু সেখানেও তারা টিকতে পারেনি। অবশেষে নাজদে গিয়ে বসতি স্থাপন করে এবংএকটি সরকার প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু সে সরকারও স্থায়ী হয়নি। কিছুকালের মধ্যেই তাদের নাম নিশানাও মুছে যায়।

কাহতান ছাড়া হেমইয়ারের আর একটি গোত্র ছিলো, তার নাম ছিলো কাজাআ। এ গোত্রের নাম হেমিরি হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এরা ইয়েমেন থেকে চলে গিয়ে ইরাকের বাদিয়াতুস সামাওয়াতে বসবাস করতে থাকে।[১]

আরবে মোস্তারেবা এদের পূর্ব পুরুষ ছিলেন সাইয়েদেনা হযরত ইবরাহীম (আ.)। তিনি ছিলেন প্রকৃতপক্ষে ইরাকের উয শহরের অধিবাসী। এ শহর ফোরাত নদীর পশ্চিম উপকূল কুফার কাছে অবস্থিত ছিলো। ফোরাত নদী খননের সময়ে পাওয়া নিদর্শনসমূহ থেকে এ শহর সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা গেছে। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর পরিবার এবং উয শহরের অধিবাসী ও তাদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কেও অনেক তথ্য এতে উদঘাটিত হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম (আ.) দ্বীনের তাবলীগের জন্যে দেশের ভেতর ও বাইরে ছুটোছুটি করেন। একবার তিনি মিসরে যান। হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর স্ত্রী সারার কথা শোনার পর ফেরাউনের মনে মন্দ ইচ্ছা জাগে। অসৎ উদ্দেশ্যে সে হযরত সারাকে নিজের দরবারে ডেকে নেয়। তারপর তা চরিতার্থ করতে চায়। হযরত সারা আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন। তার দোয়ার বরকতে আল্লাহ তায়ালা ফেরাউনকে এমনভাবে পাকড়াও করেন যে, সে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে শুরু করে। এতে সে বুঝতে পারে যে, হযরত সারা আল্লাহর খুবই প্রিয়পাত্রী এবং পুণ্যশীলা রমনী। হযরত সারার এ বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে ফেরাউন তার কন্যা হাজেরাকে[২] হযরত সারার হাতে তুলে দেন। হযরত সারা হযরত হাজেরাকে তাঁর স্বামী হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে বিবাহ দেন।[৩]

---

১. এ সকল গোত্র এবং তাদের দেশত্যাগ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, তারিখুল ইমামিল ইসলামিয়া ১ম খন্ড, পৃঃ ১১-১৩ আল জাযিরাতুল আরব পৃঃ ২৩১-২৩৫। দেশ ত্যাগের ঘটনাবলীর ব্যাপারে সময় নির্ণয়ের মতভেদ রয়েছে। আমরা নানা দিক বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য তথ্য উল্লেখ করেছি।

২. হযরত হাজেরা দাসী ছিলেন বলে ভিন্ন গ্রন্থে বলা হয়, আসলে তিনি ছিলেন ফেরাউনের কন্যা। রহমাতুল্লিল আলামিন, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬-৩৭ দেখুন।

৩. ঐ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪, ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের জন্য সহীহ বোখারী, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮৪ দেখুন ।

হযরত ইবরাহীম (আ.) হযরত সারা এবং হযরত হাজেরাকে সঙ্গে নিয়ে ফিলিস্তিন ফিরে যান। এরপর আল্লাহ রব্বুল আলামীন হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে হযরত হাজেরার গর্ভ থেকে একটি সন্তান দান করেন। উল্লেখ্য, হযরত সারা ছিলেন নিঃসন্তান। ভূমিষ্ট সন্তানের নাম রাখা হয় ইসমাইল। আস্তে আস্তে হযরত সারা হযরত হাজেরার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন এবং নবজাত শিশুসহ হযরত হাজেরাকে নির্বাসনে দিতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে বাধ্য করেন। পরিস্থিতি এমন হয়েছিলো যে, হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে একথা মানতে হয় এবং তিনি হযরত হাজেরা এবং হযরত ইসমাঈলকে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় গমন করেন। বর্তমানে যেখানে কাবা ঘর রয়েছে, সেই ঘরের কাছে হযরত ইবরাহীম (আ.) স্ত্রী পুত্রকে রেখে আসেন। সে সময় কাবাঘর ছিলো না। একটি টিলার মতো কাবা ঘরের স্থানটি উঁচু ছিলো। প্লাবন এলে সেই টিলার দু'পাশ দিয়ে পানি চলে যেতো। সেখানে মসজিদুল হারামের উপরিভাগে— পাশেই যমযমের কাছে একটি বড় বৃক্ষ ছিলো। হযরত ইবরাহীম (আ.) সেই গাছের পাশে স্ত্রী হাজেরা এবং পুত্র ইসমাঈলকে রেখে আসেন। সে সময় মক্কায় পানি এবং মানব বসতি কিছুই ছিলো না। একারণে হযরত ইবরাহীম (আ.) একটি পাত্রে কিছু খেজুর এবং একটি মশকে কিছু পানি রেখে আসেন। এরপর তিনি ফিলিস্তিন ফিরে যান। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই সে খেজুর ও পানি শেষ হয়ে যায়। কঠিন দুঃসময় দেখা দেয়। সেই করুণ দুঃসময়ে আল্লাহর রহমতের ঝর্ণাধারা যমযমরূপে প্রকাশ লাভ করে এবং দীর্ঘদিন যাবত বহু মানুষের জীবন ধারণের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ মোটামুটি সবার জানা।[৪] কিছুকাল পরে ইয়েমেন থেকে একটি গোত্র মক্কায় আসে। ইতিহাসে এ গোত্র জুরহুমে সানি বা দ্বিতীয় জুরহুম নামে পরিচিত। এ গোত্র ইসমাইল (আ.)-এর মায়ের অনুমতি নিয়ে মক্কায় বসবাস শুরু করে। বলা হয়ে থাকে যে, এ গোত্র আগে মক্কার আশেপাশের এলাকায় বসতি স্থাপন করেছিলো। উল্লেখ রয়েছে যে, এই গোত্রের লোকেরা হযরত ইসমাইল (আ.)-এর আগমনের পরে এবং তাঁর যুবক হওয়ার আগে যমযমের জন্যে মক্কায় আসে। এ পথে তারা আগেও যাতায়াত করেছিলো।[৫]

হযরত ইবরাহীম (আ.) স্ত্রী-পুত্রের দেখাশোনার জন্যে মাঝে মাঝে মক্কায় যেতেন। এভাবে কতোবার যাতায়াত করেছিলেন, সেটা জানা যায়নি। তবে ঐতিহাসিক তথ্য থেকে কমপক্ষে চারবার যাওয়া আসার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এক) পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে আল্লাহ তায়ালা এ মর্মে স্বপ্ন দেখান যে, তিনি তাঁর পুত্র হযরত ইসমাইলকে যবাই করছেন। এ স্বপ্ন ছিলো আল্লাহর এক ধরনের নির্দেশ। পিতা পুত্র উভয়েই এ নির্দেশ পালনে প্রস্তুত হন। উভয়ে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করার পর পিতা তার পুত্রকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে যবাই করতে উদ্যত হলেন। এ সময় আল্লাহ তায়ালা বললেন , হে ইবরাহীম, তুমি স্বপ্নকে সত্য করে দেখিয়েছো। আমি পুণ্যশীলদেরকে এভাবে বিনিময় দিয়ে থাকি। নিশ্চিতই এটা ছিলো একটা সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আল্লাহ তায়ালা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পুরস্কারস্বরূপ হযরত ইবরাহীম -(আ.)-কে কোরবানীর মহান গৌরব দান করেন।[৬]

বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত ইসমাইল (আ.) হযরত ইসহাক (আ.)-এর চেয়ে তেরো বছরের বড় ছিলেন। কোরআনের বর্ণনা রীতি থেকে বোঝা যায় যে, এ ঘটনা ঘটেছিলো হযরত

---

৪. সহীহ বোখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৭৪-৪৭৫,

৫. এই গ্রন্থ ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৭৫

ইসহাক (আ.)-এর জন্মের আগে। কেননা সমগ্র ঘটনা বর্ণনা করার পর এখানে হযরত ইসহাকের জন্মের সুসংবাদ উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইসমাইল (আ.)-এর যুবক হওয়ার আগে হযরত ইবরাহীম (আ.) কমপক্ষে একবার মক্কায় সফর করেছিলেন। বাকি তিন বারের সফরের বিবরণ বোখারী শরীফের একটি দীর্ঘ বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে।[৭]

দুই) হযরত ইসমাইল (আ.) যুবক হলেন। জুরহাম গোত্রের লোকদের কাছে আরবী ভাষা শিক্ষা করেন। গোত্রের লোকেরা হযরত ইসমাইলের সাথে তাদের এক কন্যাকে বিবাহ দেন। এ সময়ে হযরত হাজেরা ইন্তেকাল করেন। এদিকে হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর স্ত্রী পুত্রকে দেখতে মক্কায় আসেন। কিন্তু হযরত ইসমাইলের সাথে দেখা হয়নি। পুত্রবধূর সাথে দেখা হলে তিনি অভাব অনটনের কথা ব্যক্ত করেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) পুত্রবধূকে বলে এলেন যে, ইসমাইল এলে তাকে বলবে, সে যেন ঘরের চৌকাঠ পাল্টে ফেলে। পিতার এ উপদেশের তাৎপর্য হযরত ইসমাইল বুঝে ফেললেন। তিনি স্ত্রীকে তালাক দেন এবং অন্য একজন মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন জুরহাম গোত্রের সরদার মাজায ইবনে আমরের কন্যা।[৮]

তিন) হযরত ইসমাইল (আ.)-এর দ্বিতীয় বিয়ের পর হযরত ইবরাহীম (আ.) পুনরায় মক্কায় আগমন করেন। কিন্তু এবারও পুত্রের সাথে তার দেখা হয়নি। পুত্রবধূর কাছে ঘর সংসারের অবস্থা জিজ্ঞাসা করার পর তিনি আল্লাহর প্রশংসা করেন। পুত্রবধূর মুখে আল্লাহর প্রশংসা শোনার পর হযরত ইবরাহীম (আ.) এবারে পুত্রবধূকে বলেন যে, ইসমাইল এলে তাকে বলবে সে যেন তার ঘরের চৌকাঠ ঠিক রাখে। এরপর হযরত ইবরাহীম (আ.) ফিলিস্তিন ফিরে যান।

চার) চতুর্থবার হযরত ইবরাহীম (আ.) মক্কায় এসে দেখতে পান, তাঁর পুত্র ইসমাইল (আ.) যমযমের কাছে বসে তীর তৈরী করছেন। পরস্পরকে দেখা মাত্র উভয়ে আবেগে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরলেন। দীর্ঘকাল পর কোমল হৃদয় পিতা এবং অনুগত পুত্রের সাক্ষাৎ হয়েছিলো। এই সময়েই পিতাপুত্র মিলিতভাবে কাবাঘর নির্মাণ করেন। মাটি খুঁড়ে দেয়াল তোলেন এবং হযরত ইবরাহীম (আ.) সমগ্র বিশ্বের মানুষকে হজ্ব পালনের আহবান জানান।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মাজায ইবনে আমরের কন্যার গর্ভে হযরত ইসমাইল (আ.)-কে বারোটি পুত্র সন্তান দান করেন।[৯] তাঁদের নাম ছিলো (১) নাবেত বা নিয়াবুত (২) কায়দার (৩) আদবাইল (৪) মোবশাম (৫) মেশমা (৬) দুউমা (৭) মাইশা (৮) হাদদ (৯) তাইমা (১০) ইয়াতুর (১১) নাফিস ও (১২) কাইদমান।

এই বারোজন পুত্রের মাধ্যমে বারোটি গোত্র তৈরী হয়। এরা সবাই মক্কাতেই বসবাস করেন। ইয়েমেন, মিসর এবং সিরিয়ায় ব্যবসা করে তারা জীবিকা নির্বাহ করতো। পরবর্তীকালে এসব গোত্র জাযিরাতুল আরবের বিভিন্ন এলাকা এবং আরবের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। এদের অবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ মহাকালের গভীর অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। শুধু নাবেত এবং কাইদার বংশধরদের সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায়।

নাবেতিদের সংস্কৃতি হেজাযের উত্তরাংশে বিকাশ লাভ করে। তারা একটি শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠা করে এবং আশেপাশের লোকদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। বাত্‌রা ছিলো তাদের

---

৭. সহীহ বোখারী ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৭৫- ৪৭৬
৮. কলবে জাযিরাতুল আরব, পৃঃ ২৩৩
৯. কলবে জাযিরাতুল আরব, পৃঃ ২৩০

রাজধানী। তাদের মোকাবেলা করার মতো শক্তি কারো ছিলো না। এরপর আসে রোমকদের যুগ। রোমকরা নাবেতিদের পরাজিত করে। মওলানা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী (র.) দীর্ঘ গবেষণা ও আলোচনার পর প্রমাণ করেছেন যে, গাসসান বংশের লোকেরা এবং আনযারনি অর্থাৎ আওস ও খাযরাজ কাহতানিরা আরব ছিলেন না। বরং এ এলাকায় ইসমাইলের পুত্র নাবেতের অবশিষ্ট বংশধর বসবাস করতো।[১০]

হযরত ইসমাইলের পুত্র কাইদারের বংশের লোকেরা মক্কায় বসতি স্থাপন করতে থাকে এবং কালক্রমে এদের বংশবৃদ্ধি ঘটে। পরবর্তীকালে আদনান এবং তৎপুত্র মায়া'দ-এর যমানা আসে। আদনানী আরবদের বংশধারা সঠিকভাবে এ পর্যন্তই সংরক্ষিত আছে।

আদনান ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উনিশতম পূর্ব পুরুষ। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বংশধারা বর্ণনা করার সময় আদনান পর্যন্ত পৌঁছে থেমে যেতেন। তিনি বলতেন, বংশধারা বিশেষজ্ঞরা ভুল তথ্য পরিবেশন করে থাকে।[১১] তবে এসব পূর্ব-পুরুষদের সব বংশধারাও বর্ণনা করা সম্ভব। অনেকে উপরোক্ত বর্ণনাকে যঈফ বলে আখ্যায়িত করেছেন। মতে আদনান এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মধ্যে চল্লিশ পুরুষের ব্যবধান রয়েছে।

মোটকথা মায়া'দ-এর পুত্র নাযার থেকে কয়েকটি পরিবার জন্ম নেয়। এদের সম্পর্কে বলা হয় যে, উল্লিখিত মায়া'দ এর পুত্র ছিলো মাত্র একজন, তার নাম নাযার। নাযার এর পুত্র সংখ্যা ছিলো চার এবং প্রত্যেক পুত্রের বংশধর থেকে একটি করে গোত্র গড়ে ওঠে। সেই চার পুত্রের নাম ছিলো ইয়াদ, আনমার, রবিয়া এবং মোদার। শেষোক্ত দু'টি অর্থাৎ রবিয়া ও মোদার গোত্রের বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার লাভ করেছে। রবিয়া থেকে আসাদ ইবনে রবিয়া, আনযাহ, আবদুল কায়স ওয়ায়েল, বকর, তাগলাব এবং বনু হানিফাসহ বহু গোত্র বিস্তার লাভ করে।

মোদার এর বংশধররা দু'টি বড় গোত্রে বিভক্ত হয়েছিলো। (এক) কায়স আইনাম ইবনে মোদার এবং (২) ইলিয়াস ইবনে মোদার।

কায়স আইলাম থেকে বনু সুলাইম বনু হাওয়াজেন, বনু গাতফান, গাতফান থেকে আবাস, জুরিয়ান, আশজা এবং গানি বিন আস্থুর এর গোত্রসমূহ বিস্তার লাভ করে।

ইলিয়াস ইবনে মোদার থেকে তামিম ইবনে মাররা, বুদাইন ইবনে মাদরেকা, বনু আসাদ ইবনে খোয়ায়মা এবং কেনানা ইবনে খোযায়মার গোত্রসমূহ বিস্তার লাভ করে। কেনানা থেকে কোরায়শ গোত্র অস্তিত্ব লাভ করে। এ গোত্রের লোকেরা ছিলো দেহের ইবনে মালেক, ইবনে নযর ও ইবনে কেনানার বংশধর।

পরবর্তী সময়ে কোরায়শরাও বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। কোরায়শ বংশের বিখ্যাত শাখাগুলো হলো: জমেহ, ছাহমা, আদী, মাখজুম, তাইম, কোহরা। কুসাই ইবনে কেলাবের পরিবার অর্থাৎ আবদুদ দার, আসাদ ইবনে আবদুল ওয্যা এবং আবদে মান্নাফ। এ তিনজন ছিলেন কুসাইয়ের পুত্র। এদের মধ্যে আবদে মান্নাফের পুত্র ছিলো চারজন। সেই চার পুত্র থেকে নিম্নোক্ত চারটি গোত্রের উৎপত্তি হয়। আবদে শামস, নওফেল, মোত্তালেব এবং হাশেম। হাশেমের বংশধর থেকে আল্লাহ তায়ালা আখেরী নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মনোনীত করেন।[১২]

---

১০. তারিখে আরদুল কোরআন ২য় খন্ড; পৃঃ ৭৭-৮৬
১১. তিবরি, উমাম অল মুলুক, ২য় খন্ড, পৃঃ ১৯১-১৯৪ আল-আ'লাম পৃঃ ৫-৬
১২. মোহাদেরাতে খাযরামি ১ম খন্ড, পৃঃ ১৪-১৫

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম (আ.)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে ইসমাইল (আ.)-কে মনোনীত করেন। এরপর ইসমাইল (আ.)-এর বংশধরদের মধ্য থেকে কেনানাকে মনোনীত করেন। কেনানার বংশধরদের থেকে কোরায়শকে মনোনীত করেন। পরে কোরায়শ বংশধরদের মধ্য থেকে বনু হাশেমকে মনোনীত করেন এবং বনু হাশেম থেকে আমাকে মনোনীত করেন।[১৩]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা মাখলুক সৃষ্টি করার পর আমাকে সর্বোত্তম দলের মধ্যে সৃষ্টি করেন। এরপর সেই দলকে দুই ভাগে বিভক্ত করেন এবং আমাকে দুই দলের মধ্যে উৎকৃষ্ট দলের মধ্যে রাখেন। এরপর গোত্রসমূহ বাছাই করেন এবং আমাকে সবচেয়ে ভালো গোত্রের মধ্যে সৃষ্টি করেন। সবশেষে পরিবার বাছাই করেন এবং আমাকে সবচেয়ে ভালো পরিবারে সৃষ্টি করেন। কাজেই আমি গোত্রের দিক থেকে উৎকৃষ্ট গোত্রজাত এবং পরিবার বা খান্দানের দিক থেকেও সর্বোত্তম।[১৪]

মোটকথা, আদনানের বংশ যখন বিস্তার লাভ করে, তখন তারা খাদ্য পানীয়ের সন্ধানে আরবের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। আবদে কায়স গোত্র, বকর ইবনে ওয়ায়েলের কয়েকটি শাখা এবং বনু তামিমের পরিবারসমূহ বাহরাইন অভিমুখে রওয়ানা হয় এবং সেই এলাকায় গিয়ে বসবাস শুরু করে। বনু হানিফা ইবনে স'ব ইবনে আলী ইবনে বকর ইয়ামামা গমন করে এবং ইয়ামামার কেন্দ্রস্থল হেজর নামক জায়গায় বসবাস শুরু করে।

বকর ইবনে ওয়ায়েলের অবশিষ্ট শাখাসমূহ ইয়ামামা থেকে বাহরাইন, কাজেমার উপকূল ইরাক উপদ্বীপের আশেপাশে, ইবলা এবং হিয়াত পর্যন্ত এলাকায় বসতি স্থাপন করে।

বনু তাগলাব ফোরাত উপদ্বীপ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। তবে তাদের কয়েকটি শাখা বনু বকরের সাথে বসবাস করতে থাকে।

বনু সালিম মদীনার কাছে বসতি গড়ে তোলে। ওয়াদিউল কোরা থেকে শুরু করে তারা খয়বর মদীনার পূর্বাঞ্চল হয়ে হাররায়ে বনু সোলাইমের সাথে সংশ্লিষ্ট দুটি পাহাড় পর্যন্ত ছিলো তাদের বসতি এলাকা।

বনু ছাকিফ গোত্র তায়েফে বসতি স্থাপন করে। বনু হাওয়াজেন মক্কার পূর্বদিকে আওতাস প্রান্তরের আশেপাশে বসতি গড়ে। তাদের বাসস্থান ছিলো মক্কা-বসরা রাজপথের দুই পাশে।

বনু আসাদ তাইমার পূর্বে এবং কুফার পশ্চিমে বসবাস করতে থাকে। এদের এবং তাইমার মধ্যে বনু তাঈ গোত্রের একটি পরিবার বসবাস করতো। এ পরিবারের লোকদের বলা হতো বোহতার। বনু আসাদের বাসস্থান এবং কুফার মধ্যেকার দূরত্ব ছিলো পাঁচ দিনের পথ।

বনু জুবিয়ান তাইমার কাছে হাওয়ান এলাকার আশেপাশে বসবাস করতো।

বনু কেনানা পরিবার তোহামায় বসবাস করতে থাকে। এদের মধ্যে কোরায়শী পরিবারসমূহ মক্কা ও তার আশেপাশে বসবাস করতো। এরা বিচ্ছিন্নভাবে জীবন যাপন করতো। পরবর্তীকালে কুসাই ইবনে কেলাব আবির্ভূত হন এবং তিনি কোরায়শদের ঐক্যবদ্ধ করে মর্যাদা, গৌরব এবং শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেন।[১৫]

---

১৩. সহীহ মুসলিম, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৪৫, জামে তিরমিযি
১৪. তিরমিযি ২য় খন্ড, পৃঃ ২৩১
১৫. মোহাদেরাতে খাযরামি, ১ম খন্ড পৃঃ ১৫-১৬

আরবের প্রশাসনিক অবস্থা

ইসলাম পূর্বকালের আরবের অবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে আরবের প্রশাসনিক অবস্থা, সর্দারী এবং ধর্মীয় আদর্শ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হচ্ছে। এতে ইসলামের আবির্ভাবকালে আরবের অবস্থা সহজে বোঝা যাবে।

জাযিরাতুল আরবে যে সময় ইসলামের আলো ছড়িয়ে পড়েছিলো, সে সময় আরবে দু'ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিলো। প্রথমত মুকুটধারী বাদশাহ, এরাও আবার পরিপূর্ণ স্বাধীন ছিলো না। দ্বিতীয়ত ছিলো গোত্রীয় সর্দার ব্যবস্থা। এরা মুকুটধারী বাদশাহদের মতোই ক্ষমতা প্রয়োগ করতো এবংএরা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাধীন ছিলো। প্রকৃত বাদশাহ ছিলো ইয়েমেনের বাদশাহ, সিরিয়ার গাস্‌সান বংশের বাদশাহরা ও ইরাকের হীরার বাদশাহরা। এছাড়া আরবে অন্য কোন মুকুটধারী বাদশাহ ছিলো না।

ইয়েমেনের বাদশাহী

'আরবে আরেবার' মধ্যে প্রাচীন ইয়েমেনী গোত্রের নাম ছিলো কওমে সাবা। ইরাকে আবিষ্কৃত প্রাচীন শিলালিপি থেকে জানা যায়, খৃষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছর আগে সাবা জাতির এখানে বসতি ছিলো। তবে এ জাতির উন্নতি অগ্রগতির সূচনা হয়েছিলো খৃষ্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীতে। উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক সময়কাল নিম্নরূপ,

এক) খৃষ্টপূর্ব ৬৫০ সালের পূর্বেকার সময়। সেই সময়ে সাবার বাদশাহদের উপাধি ছিলো মাকরাবে সাবা। এদের রাজধানী ছিলো সরওয়াহ নামক জায়গায়। এই রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ মা-আবের থেকে পশ্চিমে একদিনের পথের দূরত্বে পাওয়া যায়। সেই জায়গার বর্তমান নাম খারিবা। সেই যুগে মা-আরেবের বিখ্যাত বাঁধের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিলো। ইয়েমেনের ইতিহাসে এটা এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সেই সময়ে সাবার বাদশাহদের শাসনামলে বহুলোক আরবের ভেতর এবং বাইরে বিভিন্ন স্থানে নতুন বসতি স্থাপন করেছিলো।

দুই) খৃষ্টপূর্ব ৬৫০ থেকে খৃষ্টপূর্ব ১১৫ সাল। এ সময়ে সাবার বাদশাহরা মাকরাব উপাধি পরিত্যাগ করে বাদশাহ উপাধি ধারণ করে এবং সরওয়াহ এর পরিবর্তে মায়ারেবকে রাজধানী মনোনীত করে। এই শহরের ধ্বংসাবশেষ সান-য়া' থেকে ৬০ মাইল পূর্বে পাওয়া যায়।

তিন) খৃষ্টপূর্ব ৩০০ থেকে ১১৫ সাল। এ সময়ে সাবার বাদশাহদের ওপর হেমইয়ার গোত্র আধিপত্য বিস্তার করে এবং তারা মায়া'রবের পরিবর্তে রাইদানকে নিজেদের রাজধানী মনোনীত করে। পরবর্তী সময়ে রাইদানের নাম পরিবর্তন করে জেফার রাখা হয়। এর ধ্বংসাবশেষ ইয়েমেনের কাছাকাছি একটি পাহাড়ে পাওয়া যায়।

এই যুগে সাবা জাতির পতন শুরু হয়। প্রথমে নাবেতিরা হেজাযের উত্তরাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে এবং সাবার নতুন জনবসতি উৎখাত করতে শুরু করে। এরপর রোমকরা মিসর, সিরিয়া এবং হেজাযের উত্তরাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে এতে তাদের স্থলপথে ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে কাহতানি গোত্রসমূহ নিজেরাও ছিলো আর্থিক দিক থেকে দুর্দশাগ্রস্ত। এমন পরিস্থিতিতে কাহতানি গোত্রসমূহ নিজেদের দেশ ছেড়ে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

চার) খৃষ্টপূর্ব ১১৫ থেকে ইসলামের সূচনাকাল পর্যন্ত। এ সময়ে ইয়েমেনে ক্রমাগত বিভেদ বিশৃঙ্খলা চলতে থাকে। বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ এবং বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপ চলতে থাকে। এমনি করে এক পর্যায়ে ইয়েমেনের স্বাধীনতাও কেড়ে নেয়া হয়। এই সময়ে রোমকরা আদনের ওপর সামরিক হস্তক্ষেপ করে এবং তাদের সাহায্যে হাবশী অর্থাৎ আবিসিনীয়রা হেমইয়ার ও হামদান

গোত্রের পারস্পরিক সংঘাত থেকে লাভবান হয়ে ৩৪০ সালে প্রথমবার ইয়েমেন দখল করে নেয়। এই দখল ৩৭৮ সাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ন থাকে। এরপর ইয়েমেন স্বাধীনতা লাভ করে বটে, কিন্তু মা-য়া'রেবের বিখ্যাত বাঁধে ভাঙ্গন দেখা দেয়। ৪৫০ বা ৪৫১ সালে এই বাঁধ ভেঙ্গে যায়। পবিত্র কোরআনে এই ভাঙ্গনকে বাঁধভাঙ্গা বন্যা বলে অভিহিত করা হয়েছিলো। সূরা সাবায় এর উল্লেখ রয়েছে। এটা ছিলো বড় ধরনের একটা দুর্ঘটনা। এ বন্যায় বহু জনপদ বিরান ও জনশূন্য হয়ে পড়েছিলো এবং বহু গোত্র বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিলো।

৫২৩ ঈসায়ী সালে আরেকটি বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটে। বাদশাহ জুনুয়াস ইয়েমেনের ঈসায়ীদের ওপর হামলা করে তাদের খৃষ্টধর্ম ত্যাগে বাধ্য করার চেষ্টা করে। তারা রাযি না হওয়ায় তাদেরকে পরিখা খনন করে প্রজ্জলিত অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করা হয়। পবিত্র কোরআনের সূরা বুরুজে 'ধ্বংস হয়েছিলো কুন্ডের অধিপতিরা' বলে এই লোমহর্ষক ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে রোমক বাদশাহদের নেতৃত্বে ঈসায়ী ধর্মের উজ্জীবনকারীরা তৎপর এবং প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে ওঠে। আবিসিনীয়রা রোমকদের সমর্থন পেয়ে ৫১৫ সালে আরিয়াতের নেতত্বে ৭০ হাজার সৈন্যসহ পুনরায় ইয়েমেনে হামলা চালিয়ে ইয়েমেন অধিকার করে নেয়। অধিকারের পর আবিসিনিয়ার সম্রাটের গভর্নর হিসাবে আরিয়াত ইয়েমেন শাসন করতে থাকেন। কিছুকাল পর আরিয়াতের সেনাবাহিনীর এক অধিনায়ক আরিয়াতকে হত্যা করে ক্ষমতা গ্রহণ করে। এ অধিনায়কের নাম ছিলো আবরাহা। ক্ষমতা গ্রহণের পর আবরাহা শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং আবিসিনিয়ার সম্রাটকেও তার বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করায়।

এই আবরাহাই পরবর্তীকালে কাবাঘর ধ্বংস করতে ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলো। দুর্ধর্ষ একদল সৈন্য এবং কয়েকটি হাতী নিয়ে আবরাহা মক্কা অভিযান পরিচালনা করেছিলো। এই অভিযানকে 'আসহাবে ফীল' নামে সূরা ফীলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আসহাবে ফীলের ঘটনায় আবিসিনীয়দের যে ক্ষতি হয়েছিলো, তার প্রেক্ষিতে ইয়েমেনের অধিবাসীরা পারস্য সরকারের কাছে সাহায্য চায়। তারা আবিসিনীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং সাইফে যী ইয়াযান ইময়ারীর পুত্র মাদি কারাবের নেতৃত্বে আবিসিনীয়দের দেশ থেকে বের করে দেয়। এরপর তারা একটি স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জাতি হিসাবে মাদিকারাবকে ইয়েমেনের বাদশাহ বলে ঘোষণা করে। এটা ছিলো ৫০৫ সালের ঘটনা।

স্বাধীনতার পর মাদিকারাব তার সেবা এবং রাজকীয় বাহিনীর সৌন্দর্যের জন্যে কিছু সংখ্যক হাবশী অর্থাৎ আবিসিনীয়কে রেখে দেয়। তার এ শখ পরবর্তীতে বিপজ্জনক প্রমাণিত হয়। কর্মরত হাবশীরা একদিন ধোঁকা দিয়ে বাদশাহ মাদিকারাবকে হত্যা করে। এর ফলে যী ইয়াযান পরিবারের রাজত্ব চিরতরে শেষ হয়ে যায়। এ পরিস্থিতি থেকে সুবিধা আদায়ের জন্যে এগিয়ে আসেন পারস্য সম্রাট কিসরা। তিনি সন্য়া'য় পারস্য বংশোদ্ভুত একজন গভর্ণর নিয়োগ করে ইয়েমেনকে পারস্যের একটি প্রদেশে পরিণত করেন। পরবর্তী সময়ে ইয়েমেনে একের পর এক ফরাসী গভর্ণর নিযুক্ত হতে থাকেন। সর্বশেষ গভর্ণর বাযান ৬২৮ সালে ইসলাম গ্রহণ করেন। এর ফলে ইয়েমেনে পারস্য আধিপত্য লোপ পায় এবং ইয়েমেন ইসলামী একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়।[১]

---

১. মওলানা সাইয়েদ সোলায়মান নদভী তারীখে আরদুল কোরআন গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ১৩৬ পৃষ্ঠা থেকে গ্রন্থের শেষ পর্যন্ত ঐতিহাসিক তথ্য সংরক্ষণের আলোকে সাবা জাতি সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। মওলানা সাঈয়েদ

অপর পৃষ্ঠায় দেখুন

হীরার বাদশাহী

ইরাক এবং তার আশেপাশের এলাকায় কোরোশ কাবির অথবা সায়রাম যুল কারনাইনের (খৃষ্টপূর্ব ৫৭৫ থেকে ৫২৯ সাল পর্যন্ত) সময় থেকেই পারস্যদের রাজত্ব চলে আসছিলো। ফরাসীদের মোকাবেলা করার মতো শক্তি কারো ছিলো না। খৃষ্টপূর্ব ৩২৬ সালে সিকান্দার মাকদুনি প্রথম পরাজিত করে পারস্য শক্তি নস্যাৎ করেন। এর ফলে পারস্য সাম্রাজ্য খন্ড খন্ড হয়ে যায়। এ বিশৃঙ্খল অবস্থা ২৩০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ সময়ে কাহতানী গোত্রসমূহ দেশত্যাগ করে। ইরাকের এক বিস্তীর্ণ সীমান্ত থেকে যেসব আদনানী দেশত্যাগ করে গিয়েছিলো, তারা এ সময় কারিলায় ফিরে এসে প্রতিপক্ষের সাথে লড়াই করে ফোরাত নদীর উপকূল ভাগের একাংশে বসতি স্থাপন করে।

এদিকে ২২৬ সালে আর্দেশির সাসানি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার পর ধীরে ধীরে পারস্য শক্তি পুনরায় সংহত হতে শুরু করে। আর্দেশির পারস্যদের পৃষ্ঠপোষকতা এবং তার দেশের সীমান্তে বসবাসকারী আরবদের প্রতিহত করেন। এর ফলে কোযায়া গোত্র সিরিয়ার পথে রওয়ানা হয়। পক্ষান্তরে হীরা এবং আনবারের আরব অধিবাসীরা বশ্যতা স্বীকারে সম্মতি জ্ঞাপন করে।

আর্দেশিরের শাসনামলে হীরা, বাদিয়াতুল ইরাক এবং উপদ্বীপবাসীর ওপর রবিয়ী গোত্রের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিলো। মোদারী গোত্রসমূহের ওপর জাযিমাতুল ওয়াযযাহদের শাসন ছিলো। মনে হয়, আর্দেশিয়রা বুঝতে পেরেছিলো যে, আরব অধিবাসীদের ওপর সরাসরি শাসনকার্য পরিচালনা করা এবং সীমান্তে তাদেরকে লুটতরাজ থেকে বিরত রাখা সম্ভব নয়। বরং ব্যাপক জনসমর্থন রয়েছে এমন কোন আরব নেতাকে শাসক হিসাবে নিযুক্ত করাই হবে বুদ্ধিমত্তার কাজ। এর ফলে একটা লাভ এই হবে যে, প্রয়োজনের সময় রোমকদের বিরুদ্ধে এসব আরবের সাহায্য নেয়া যাবে এবং সিরিয়ার রোমকপন্থী আরব শাসকদের মোকাবেলায় ইরাকের এসব আরব শাসনকর্তাকে দাঁড় করানো যাবে। হীরার বাদশাহদের অধীনে পারস্য সৈন্যদের একটি ইউনিট আবিসিনিয়ায় থাকতো। এদের দ্বারা বিভিন্ন স্থানে আরব বিদ্রোহীদের দমন করা হতো।

২৬৮ সালে জাযিমা মৃত্যু বরণ করেন এবং আমর ইবনে আদী ইবনে নসর লাখামী হাদরামি তার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি ছিলেন লাখাম গোত্রের প্রথম শাসনকর্তা। শাপুল কোবাজ ইবনে ফিরোজের যুগ পর্যন্ত একাধারে হীরার ওপর লাখমিদের শাসন চলতে থাকে। কোবাজের সমসাময়িককালে মোজদকের আবির্ভাব ঘটে। তিনি ছিলেন সংস্কারবাদের প্রবক্তা। কোবাজ এবং তার বহুসংখ্যক অনুসারী বাদশাহ মোনযার ইবনে মাউসসামাকে বার্তা পাঠালেন যে, তুমিও এ ধর্ম গ্রহণ করো। মোনযার ছিলো বড়ই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ, তিনি অস্বীকার করে বসলেন। ফলে কোবাজ তাকে বরখাস্ত করে তার স্থলে মোজদাকি মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা হারেস ইবনে আমর ইবনে হাযার ফিন্দীর হাতে হীরার শাসনভার ন্যস্ত করলেন।

কোবাজের পরে পারস্যের শাসনক্ষমতা কেস্‌রা নওশেরওয়া'র হাতে আসে। তিনি এ ধর্মকে প্রচন্ড ঘৃণা করতেন। তিনি মোজদাক এবং তার বহু সংখ্যক সমর্থককে হত্যা করেন। মোনযারকে পুনরায় হীরার শাসনভার ন্যস্ত করেন এবং হারেস ইবনে আমরকে ডেকে পাঠান। কিন্তু হারেস বনু কেনায়েব এলাকায় পালিয়ে গেলে তিনি সেখানেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেন।

মোনযার ইবনে মাউসসামার পরে নো'মান ইবনে মোনযারের কাল পর্যন্ত হীরার শাসনক্ষমতা তার বংশধরদের মধ্যে আবর্তিত হয়। এরপর যায়েদ ইবনে আদী এবাদী কিস্‌রার কাছে নো'মান

আবুল আলা মওদূদী তাফহীমুল কোরআনের চতুর্থ খন্ডের ১৫৮-১৯৮ পৃষ্ঠাতেও এপর্যায়ে কিছু কিছু তথ্য সন্নিবেশিত করেছেন।

ইবনে মোনযারের নামে মিথ্যা অভিযোগ করে। কেস্‌রা নওশেরওয়াঁ এতে ক্ষেপে যান এবং নো'মানকে ডেকে পাঠান। নো'মান প্রথমেই হাযির না হয়ে চুপিসারে বনু শায়বানের সর্দার হানি ইবনে মাসুদের কাছে যান এবং পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ সবকিছু তার কাছে রেখে কেসরার দরবারে হাযির হন। কিস্‌রা তাকে বন্দী করেন এবং ঐ অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়।

এদিকে কেস্‌রা নো'মানকে বন্দী করার পর তার স্থলে ইয়াস ইবনে কোবায়সা তাঈকে হীরার শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং হানি ইবনে মাসুদের কাছে নো'মানের জামানত চাওয়ার জন্যে ইয়াসকে নির্দেশ দেন। আত্মমর্যাদাসম্পন্ন হানি যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইয়াস কেসরার সৈন্যদের নিয়ে এবং মুরযবানদের দল নিয়ে রওয়ানা হন। জিকার ময়দানে তুমুল যুদ্ধে বনু শায়বান জয়লাভ করে এবং ফরাসীরা লজ্জাজনকভাবে পরাজিত হয়। এই প্রথম আরবরা অনারবদের ওপর জয়লাভ করেন। এ ঘটনা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের কিছুকাল পরে ঘটেছিলো। হীরায় ইয়াস-এর শাসন পরিচালনার অষ্টম মাসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্ম গ্রহণ করেন।

ইয়াস-এর পরে কেসরা হীরায় একজন ফরাসী গবর্ণর নিয়োগ করেন। কিন্তু ৬৩২ সালে লাখমিদের ক্ষমতা পুনর্বহাল হয় এবং মোনযের ইবনে মারুর নামে এক ব্যক্তি শাসন ক্ষমতা দখল করেন। শাসনকার্য পরিচালনার আট মাস পরেই হযরত খালেদ (রা.) ইসলামী শক্তির পতাকা নিয়ে হীরায় প্রবেশ করেন।

সিরিয়ার বাদশাহী

আরব গোত্রসমূহের হিজরত যে সময় চলছিলো, সে সময় কোজায়া গোত্রের কয়েকটি শাখা সিরিয়া সীমান্তে এসে বসবাস শুরু করে। বনু সোলাইম ইবনে হুলওয়ানের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিলো। এদের একটি শাখা ছিলো বনু জাজআন ইবনে সোলাইম। এরা জাজায়েমা নামে খ্যাত ছিলো। কোজায়ার এই শাখাকে রোমানরা আরবের মরু বেদুইনদের লুটতরাজ থেকে রক্ষা পাওয়া এবং পারস্যদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে কাছে টেনে নিয়েছিলো। এই গোত্রের একজনের ওপর শাসনভার ন্যস্ত করা হয়েছিলো। এরপর দীর্ঘদিন যাবত তাদের শাসন চলতে থাকে। এদের বিখ্যাত বাদশাহ ছিলেন যিয়াদ ইবনে হিউলা। ধারণা করা হয়ে যে, জাযায়েমার শাসনকাল দ্বিতীয় খৃষ্টীয় শতকের পুরো সময় ব্যাপ্ত ছিলো। পরে গাসসান বংশের আবির্ভাব ঘটে এবং জাযায়েমাদের শাসনামলের অবসান ঘটে। গাসসান বংশের লোকেরা বনু জাযয়া'মাদের পরাজিত করে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। এ অবস্থা দেখে রোমকরা গাসসানী বংশের শাসককে সিরিয়ার আরব অধিবাসীদের শাসনকর্তা হিসেবে মেনে নেয়। গাস্‌সান বংশের রাজধানী ছিলো দওমাতুল জন্দল। রোমক শক্তির ক্রীড়ানক হিসেবে সিরিয়ায় দীর্ঘকাল তাদের শাসন ক্ষমতা অটুট থাকে। ফারুকী খেলাফতের সময় ত্রয়োদশ হিজরীতে ইয়ারমুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ সময় গাস্‌সান বংশের সর্বশেষ শাসনকর্তা জাবলা ইবনে আইহাম ইসলাম গ্রহণ করে।[২] কিন্তু অহংকারের কারণে এই লোকটি বেশীদিন ইসলামের ওপর টিকে থাকতে পারেনি। পরে সে ধর্মান্তরিত বা মোরতাদ হয়ে যায়।

হেজাযের নেতৃত্ব

হযরত ইসমাইল (আ.) থেকেই মক্কায় মানব বসতি গড়ে ওঠে। তিনি ১৩৭ বছর বেঁচে ছিলেন।[৩] যতোদিন জীবিত ছিলেন ততোদিন তিনিই ছিলেন মক্কার নেতা এবং কাবাঘরের

---

২. মোহাদেরাতে খাযরামি ১ম খন্ড, পৃঃ ৬৪, তারীখে আরদুল কোরআন, ২য় খন্ড, পৃঃ ৮০-৮২

৩. বাইবেল, জন্ম শীর্ষক অধ্যায় পৃঃ ১৭-২৫

মোতাওয়াল্লী।[৪] তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র নাবেত এবং কাইদার মক্কায় শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

এই দুজনের মধ্যে কে আগে এবং কে পরে ক্ষমতাসীন ছিলেন— এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এদের পরে এদের নানা মাজাজ ইবনে জোরহামি ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এমনি করে মক্কার শাসন ক্ষমতা জোরহামিদের হাতে চলে যায়। দীর্ঘদিন এ ক্ষমতা তাদের কাছে থাকে। হযরত ইসমাইল (আ.) তাঁর পিতার সাথে কাবাঘর নির্মাণ করায় যদিও তাঁর বংশধরদের একটি সম্মানজনক অবস্থান ছিলো, কিন্তু ক্ষমতা ও নেতৃত্বে পরবর্তী সময়ে তাদের কোনো অংশ ছিলো না।[৫]

বছরের পর বছর কেটে যায়। কিন্তু হযরত ইসমাইল (আ.)-এর বংশধররা অজ্ঞাত পরিচয় অবস্থা থেকে বাইরে আসতে পারেননি। বখতে নসরের আবির্ভাবের কিছুকাল আগে বনু জোরহামের ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মক্কার রাজনৈতিক গগনে আদনানীদের রাজনৈতিক নক্ষত্র চমকাতে শুরু করে। এর প্রমাণ এই যে, ইরক নামক জায়গায় বখতে নসর আরবদের সাথে যে যুদ্ধ করেন, সেই যুদ্ধে আরব সেনাদলের অধিনায়কদের মধ্যে জোরহাম গোত্রের কেউ ছিলেন না।[৬]

খৃষ্টপূর্ব ৫৮৭ সালে বখতে নসরের দ্বিতীয় অভিযানের সময়ে বনু আদনান ইয়েমেনে পালিয়ে যায়। সে সময়ে বনি ইসরাইলের নবী ছিলেন হযরত ইয়ারমিয়াহ (আ.)। তিনি আদনানের পুত্র মায়া'দকে সঙ্গে নিয়ে সিরিয়ায় যান। বখতে নসরের দাপট হ্রাস পাওয়ার পর মায়া'দ মক্কায় ফিরে আসেন। এ সময় তিনি লক্ষ্য করেন যে, মক্কায় জোরহাম গোত্রের জোরশাম নামে শুধু একজন লোক রয়েছেন। জোরশাম ছিলেন জুলহামার পুত্র। মায়া'দ তখন জোরশামের কন্যা মায়া'নার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তার গর্ভ থেকে নাযার জন্মগ্রহণ করেন।[৭]

সে সময় মক্কায় জোরহামের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। দারিদ্রের নিষ্পেষণে তারা ছিলো জর্জরিত। এর ফলে তারা কাবাঘর তওয়াফ করতে আসা লোকদের ওপর বাড়াবাড়ি শুরু করে দেয় এমনকি কাবাঘরের অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করতেও দ্বিধাবোধ করেনি।[৮] বনু আদনান বনু জোরহামের এসব কাজে ভেতরে ভেতরে ছিলো দারুন অসন্তুষ্ট। ফলে বনু খোজায়া মাররাজ জাহরানে অভিযানের সময় আদনান বংশের লোকদের লোভকে কাজে লাগায়। বনু খোজায়া আদনান গোত্রের বনু বকর ইবনে আবদে মান্নাফ ইবনে কেনানাকে সঙ্গে নিয়ে বনু জোরহামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধে বনু জোরহাম পরাজিত হয়ে মক্কা থেকে বিতাড়িত হয়। এ ঘটনা ঘটেছিলো খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে।

মক্কা ছেড়ে যাওয়ার সময় বনু জোরহাম যমযম কূপ ভরাট করে দেয়। এ সময় তারা যমযমে কয়েকটি ঐতিহাসিক নিদর্শন নিক্ষেপ করে তা প্রায় ভরাট করে ফেলে। মোহাম্মদ ইবনে ইসহাক

---

৪. কল্‌বে জাযিরাতুল আরব, পৃঃ ২৩০-২৩৭

৫. ইবনে হিশাম ১ম খন্ড, পৃঃ ১১১-১১৩, ইবনে হিশাম, হযরত ইসমাইলের বংশধরদের মধ্যে শুধুমাত্র নাবেতের ক্ষমতাসীন থাকার কথা উল্লেখ করেছেন।

৬. কলবে জাযিরাতুল আরব, পৃঃ ২৩০

৭. রহমতুন লিল আলামিন, ২য় খন্ড, পৃঃ ৪৮

৮. কল্‌বে জাযিরাতুল আরব পৃঃ ২৩১

লিখেছেন, আমর ইবনে হারেস মাযায জোরহামি[৯] কাবাঘরের দু'টি সোনার হরিণ[১০] এবং কাবার কোণে স্থাপিত হাজরে আসওয়াদকে বের করে যমযম কুপে প্রোথিত করে। এরপর তারা জোরহাম গোত্রের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ইয়েমেনে চলে যায়। বনু জোরহাম মক্কা থেকে বহিষ্কৃত হওয়া এবং ক্ষমতা হারানোর ব্যথা ভুলতে পারছিলো না। জোরহাম গ্রোত্রের আমর নামক এক ব্যক্তি এ সম্পর্কে রচিত কবিতায় বলেছেন, 'আজুন থেকে সাফা পর্যন্ত মিত্র কেউ নেই, রাতের মহফিলে নেই গল্প বলার কেউ। নেই কেন? আমরা তো এখানের অধিবাসী, সময়ের আবর্তনে ভাঙ্গা কপাল, হায়রে, হায় আজ আমাদের করে দিয়েছে সর্বহারা।'[১১]

হযরত ইসমাইল (আ.)-এর সময়কাল ছিলো খৃষ্টপূর্ব প্রায় দু'হাজার বছর আগে। এ হিসেব অনুযায়ী মক্কায় জোরহাম গ্রোত্রের অস্তিত্ব ছিলো দুই হাজার একশত বছর। প্রায় দু'হাজার বছর তারা রাজত্ব করেছিলো।

বনু খোজায়া মক্কায় তাদের আধিপত্য বিস্তারের পর বনু বকরকে বাদ দিয়েই শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকে। তবে মর্যাদাসম্পন্ন তিনটি পদে মোদারী গোত্রের লোকদের অধিষ্ঠিত করা হয়। পদ তিনটি নিম্নরূপ:

এক) হাজীদের আরাফাত থেকে মোযদালেফায় নিয়ে যাওয়া এবং ইয়াওমুন নাহারে হাজীদের মিনা থেকে রওয়ানা হওয়ার পরোয়ানা প্রদান। ১৩ই জিলহজ্জ হচ্ছে ইয়াওমুন নাহার, এই দিন হচ্ছে হজ্জের শেষদিন। এই মর্যাদা ইলিয়াস ইবনে মোদায়ের পরিবার বনু সাওম ইবনে মাররার অধিকারে ছিলো। এদেরকে সোফা বলা হতো। সোফার একজন লোক পাথর নিক্ষেপ না করা পর্যন্ত ১৩ই জিলহজ্জ হাজীরা পাথর নিক্ষেপ করতে পারতেন না। হাজীদের পাথর নিক্ষেপ এবং মিনায় রওয়ানা হওয়ার সময় সোফার লোকেরা মিনার একমাত্র পথ আকাবার দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকতো। তাদের যাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন হাজী সে পথ অতিক্রম করতে পারত না। তাদের যাওয়ার পর অন্য লোকদের যাওয়ার অনুমতি দেয়া হতো। সোফাদের পর এই বিরল সম্মান বনু তামিমের একটি পরিবার বনু সা'দ ইবনে যায়েদ মানাত লাভ করে।

দুই) ১০ই জিলহজ্জ সকালে মোযদালেফা থেকে মিনা যাওয়ার সম্মান বনু আদনানের অধিকারে ছিলো।

তিন) হারাম মাসসমূহ এগিয়ে নেয়া ও পিছিয়ে দেয়া। বনু কেনানাহ গোত্রের একটি শাখা বনু তামিম ইবনে আদী এই মর্যাদার অধিকারী ছিলো।[১২]

মক্কার ওপর বনু খোজায়া গোত্রের আধিপত্য তিনশত বছর স্থায়ী ছিলো।[১৩]

এই সময়ে আদনানী গোত্রসমূহ মক্কা এবং হেজায থেকে বের হয়ে নজদ, ইরাকের বিভিন্ন এলাকা, বাহরাইন এবং অন্যত্র প্রসারিত হয়। মক্কার আশেপাশে কোরায়শদের কয়েকটি শাখা অবশিষ্ট থাকে। এরা ছিলো বেদুইন। এদের পৃথক পৃথক দল ছিলো এবং বনু কেনানায় এদের

---

৯. হযরত ইসমাঈলের ঘটনায় উল্লেখিত মাযায জোরহামি এবং এই লোক এক ব্যক্তি নন।

১০. মাসুদ লিখেছেন, পারস্যবাসী কাবাঘরের জন্য মূল্যবান সম্পদ এবং উপঢৌকন পাঠাতেন। যাযান ইবনে বাক সোনার তৈরী দুটি হরিণ, মনিমুক্তা, তলোয়ার এবং বহু সোনা প্রেরণ করেছিলেন। আমর এসব কিছু যমযম কূপে নিক্ষেপ করেন। মুরাও অযজাহাব ১ম খন্ড, পৃঃ ২ ও ৫

১১. ইবনে হিশাম ১ম খন্ড, পৃঃ ১১৪ -১১৫

১২. ইবনে হিশাম ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৪, ১১৯, ১২২

১৩. ইয়াকুত, সাদ্দা, মক্কা

কয়েকটি বিচ্ছিন্ন পরিবার বসবাস করছিলো। মক্কার শাসন পরিচালনা এবং কাবাঘরের রক্ষণাবেক্ষণে এদের কোন ভূমিকা ছিলো না। এরপর কুসাই ইবনে কেলাবের আবির্ভাব ঘটে।[১৪]

কুসাই সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, সে মায়ের কোলে থাকতেই তার পিতার মৃত্যু হয়। এরপর তার মা বনু ওজরা গোত্রের এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। স্বামীর গোত্র সিরিয়ায় থাকায় কুসাইয়ের মা সিরিয়ায় চলে যান। কুসাইকেও তিনি সঙ্গে নিয়ে যান। যুবক হওয়ার পর কুসাই মক্কায় ফিরে আসেন। সে সময় মক্কার গভর্ণর ছিলেন হোলাইল ইবনে হাবশিয়া খোযায়ী। কুসাই হোলাইলের কন্যা হোবাকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। হোলাইল সে প্রস্তাব গ্রহণ করে হোবাকে বিবাহ দেন।[১৫] হোলাইলের মৃত্যুর পর মক্কা ও কাবাঘরের ওপর আধিপত্যের বিষয় নিয়ে খোযায়ী এবং কোরায়শদের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে জয়লাভ করে কুসাই মক্কায় শাসন ক্ষমতা এবং কাবাঘরের রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার লাভ করেন।

এ যুদ্ধের কারণ কি ছিলো? এ সম্পর্কে তিনটি বিবরণ পাওয়া যায়।

প্রথমত, কুসাইয়ের বংশধরদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ধন-সম্পদের প্রাচুর্য আসার পর কুসাইয়ের সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। এদিকে হোলাইলের মৃত্যু হলে কুসাই চিন্তা করলেন যে, বনু খোযায়া এবং বনু বকরের পরিবর্তে কাবাঘরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং মক্কার শাসন পরিচালনার জন্যে আমিই উপযুক্ত। তিনি একথাও চিন্তা করেছিলেন যে, কোরায়শরা নির্ভেজাল ইসমাইলী বংশোদ্ভুত আরব এবং অন্যান্য ইসমাইলীদের সর্দার। কাজেই নেতৃত্ব কর্তৃত্বের অধিকার শুধু তাদেরই রয়েছে। এসব কথা চিন্তা করে কুসাই কোরায়শ এবং বনু খোযাআ গোত্রের কয়েকজন লোকের সাথে আলোচনা করেন। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বনু খোযায়া এবং বনু বকরকে মক্কা থেকে বের করে না দেয়ার কোন চযুক্ত আছে কি? সবাই তার সাথে ঐকমত্য প্রকাশ এবং সমর্থন জানালো।[১৬]

দ্বিতীয়ত, মৃত্যুর সময়ে কুসাইয়ের শ্বশুর হোলাইল অসিয়ত করেছিলেন যে, কুসাই কাবা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ এবং মক্কা শাসন করবেন।[১৭]

তৃতীয়ত, হোলাইল তার কন্যা হোবাকে কাবাঘরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। আবু গিবশান খোযায়ীকে উকিল নিযুক্ত করা হয়।

হোবার প্রতিনিধি হিসাবে আবু গিবশান কাবাঘরের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। হোলাইলের মৃত্যুর পর কুসাই এক মশক মদের বিনিময়ে আবু গিবশানের কাছ থেকে কাবার রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা ক্রয় করেন। কিন্তু খোযায়া গোত্র এ ক্রয়-বিক্রয় অনুমোদন করেনি। তারা কুসাইকে কাবাঘরে যেতে বাধা দেয়। এর ফলে কুসাই বনু খোযায়াদের মক্কা থেকে বের করে দেয়ার জন্যে কোরায়শ এবং বনু কেনানাদের একত্রিত করে। কুসাইয়ের ডাকে সবাই সাড়া দেয় এবং বনু খোযায়াদের মক্কা থেকে বের করে দেয়া হয়।[১৮]

---

১৪. মোহাদেরাতে খাযরামি, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৫ ইবনে হিশাম ১ম খন্ড পৃঃ ১১৭

১৫. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃঃ ১১৭-১১৮ ১৬. ঐ ১৭ ঐ, ১ম খন্ড, পৃঃ ১১৮

১৮ . রহমতুল লিল আলামিন, ২য় খন্ড পৃঃ ৫৫

১৯. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃঃ ১১৭

মোটকথা, কারণ যাই হোক না কেন ঘটনাধারা ছিলো এরূপ যে, হোলাইলের মৃত্যুর পর সোফা গোত্রের লোকেরা ইতিপূর্বে যা করতো তারা তাই করতে চাইলো। এ সময় কুসাই কোরায়শ এবং কেনানা গোত্রের লোকদের একত্রিত করেন। আকাবার পথের ধারে সমবেত লোকদের কুসাই বললেন, তোমার চেয়ে আমরা এ সম্মানের অধিক যোগ্য।[১৯] একথার পর উভয় পক্ষে তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয় এবং কুসাই সোফাদের কাছ থেকে মর্যাদা ছিনিয়ে নেন। এ সময়ে বনু খোজায়া এবং বনু বকর গোত্রের লোকেরা কুসাইয়ের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করার পরিবর্তে তার বিরোধিতা করে। এতে কুসাই তাদের হুমকি দেন। ফলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ বেধে যায় এবং বহু লোক মারা যায়।[২০] যুদ্ধের পর সন্ধির শর্ত অনুযায়ী কুসাই মক্কায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাস করেন। মক্কার বিভিন্ন এলাকা থেকে কোরায়শদের ডেকে এনে তাদেরকে প্রশাসনের সাথে যুক্ত করেন। এছাড়া তিনি প্রত্যেক কোরায়শ পরিবারের বসবাসের জন্যে নির্দিষ্ট স্থান বরাদ্দ করেন। মাসের হিসাব গণনাকারী, আলে সফওয়ানদের বনু আদওয়ান এবং বনু মাররা ইবনে আওফকে তাদের পদমর্যাদায় টিকিয়ে রাখেন। কুসাই মনে করতেন এটাও ধর্মের অংশ, এতে রদবদলের অধিকার কারো নেই।[২১]

কাবা ঘরের উভয় দিকে 'দারুন নোদওয়া' প্রতিষ্ঠা করা কুসাইয়ের অন্যতম কীর্তি। এর দরোজা ছিলো মসজিদের দিকে। দারুন নোদওয়া ছিলো প্রকৃতপক্ষে কোরায়শদের সংসদ ভবন। কোরায়শদের সামাজিক জীবনে দারুন নোদওয়ার গুরুত্ব ও প্রভাব ছিলো অসামান্য। এই প্রতিষ্ঠান ছিলো কোরায়শদের ঐক্যের প্রতীক। সমাজের বহু জটিল সমস্যার সমাধান এখানে হতো।[২২]

কুসাই নিম্নোল্লিখিত মর্যাদার ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন।

(এক) দারুন নোদওয়ার সভাপতি। এখানে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ হতো। যুবক-যুবতীদের বিয়েও এখানে অনুষ্ঠিত হতো।

(দুই) লেওয়া, অর্থাৎ যুদ্ধের পতাকা কুসাইয়ের হাতে বেঁধে রাখা হতো।

(তিন) হেজাবাত বা কাবাঘরের রক্ষণাবেক্ষণ। এর মানে হচ্ছে কাবাঘরের দরোজা কুসাই খুলতেন এবং কাবা ঘরের যাবতীয় খেদমত এবং রক্ষণাবেক্ষণ তার তদারকিতেই সম্পন্ন হতো।

(চার) সেকায়া বা পানি পান করানো। কয়েকটি হাউযে হাজীদের জন্যে পানি ভরে রাখা হতো। এরপর সেই পানিতে খেজুর এবং কিসমিস মিশিয়ে তা মিঠা করা হতো। হজ্বযাত্রীরা মক্কায় এলে সেই পানি পান করতেন।[২৩]

(পাঁচ) রেফাদা বা হাজীদের মেহমানদারী। এর অর্থ হচ্ছে হাজীদের মেহমানদারীর জন্যে খাবার তৈরী করা। এ উদ্দেশ্যে কোরায়শদের ওপর কুসাই নির্ধারিত পরিমাণ চাঁদা ধার্য করে দিতেন। সেই অর্থ হজ্জ মৌসুমে কুসাইয়ের কাছে জমা দিতে হতো। কুসাই জমাকৃত অর্থে হাজীদের জন্যে

---

২০. কালারে জাযিয়াতুল আরব পৃঃ ২৩২

২১ ইবনে হিশাম ১ম খন্ড পৃঃ১২৪-১২৫

২২ ঐ ১ম খন্ড. পৃঃ ১২৫, মোহাযেরাতে খাযরামি ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৬, আখবারুণ কেরাম, পৃঃ ১৫২

২৩. মোহাদেরাতে খাযরামি, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৬

খাবার তৈরী করাতেন। দরিদ্র ও নিঃস্ব হাজীদেরকে সেসব খাবার পরিবেশন করা হতো। যেসব হাজীর কাছে বাড়ী ফিরে যাওয়ার অর্থ সম্বল থাকতো না তাদের সাহায্যও করা হতো।[২৪]

কুসাই উল্লিখিত সকল প্রকার পদমর্যাদার অধিকারী ছিলেন। কুসাই-এর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ছিলো আবদুদ দার। দ্বিতীয় পুত্রের নাম ছিলো আবদে মান্নাফ। দ্বিতীয় পুত্র কুসাইয়ের জীবদ্দশাতেই নেতৃত্ব কর্তৃত্বের উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। এ কারণে কুসাই তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আবদুদ দারকে বলেছিলেন, ওরা যদিও তোমাকে ছাড়িয়ে গেছে, কিন্তু আমি তোমাকে তাদের সমমর্যাদায় উন্নীত করবো। এরপর কুসাই সকল পদমর্যাদার ব্যাপারে আবদুদ দারকে উত্তরসূরী করে ওসিয়ত করে যান। অর্থাৎ দারুন নোদওয়ার সভাপতি, কাবাঘরের রক্ষণাবেক্ষণ, যুদ্ধের পতাকা বহন, হাজীদের পানি পান এবং মেহমানদারী এ সব কিছুরই দায়িত্ব তিনি আবদুদ দারকে ন্যস্ত করেন। জীবদ্দশায় কুঁসাই-এর কোনো কথা এবং কাজের কেউ প্রতিবাদ করতো না। বরং সব কিছু সবাই বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতো। এ কারণে মৃত্যুর পরেও তার সব সিদ্ধান্ত সবাই বিনা সমালোচনায় মেনে নিয়েছিলো। কুসাইয়ের সন্তানরা পিতার ওসিয়তের প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করেন। আবদে মান্নাফের মৃত্যুর পর তার সন্তানেরা চাচাতো ভাইদের সাথে উল্লিখিত বিষয়গুলোতে দরকষাকষি শুরু করে। চাচাতো ভাইদের একক পদমর্যাদার সমালোচনা করে তারা অসন্তোষ প্রকাশ করতে থাকে। এর ফলে কোরায়শরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু একপর্যায়ে উভয় পক্ষ আপোস নিষ্পত্তির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে এবং বিভিন্ন পদমর্যাদা নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নেয়। এরপর হাজীদের পানি পান করানো এবং আতিথেয়তার দায়িত্ব বনু আবদে মান্নাফের ওপর ন্যস্ত করা হয়। দারুন নোদওয়ার নেতৃত্ব এবং কাবা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আবদুদ দারের সন্তানদের হাতে থাকে। অর্জিত পদ মর্যাদার ব্যাপারে আবদে মান্নাফের সন্তানেরা কোরা অর্থাৎ লটারির ব্যবস্থা করেন। কোরায় আবদে মান্নাফের পুত্র হাশেমের নাম ওঠে। এর ফলে হাশেম সারা জীবন হাজীদের পানি পান করানো এবং হাজীদের মেহমানদারীর দায়িত্ব পালন করেন। হাশেমের মৃত্যুর পর তার ভাই মোত্তালেব এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মোত্তালেবের পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল মোত্তালেবের ওপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। তিনি ছিলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাদা। আবদুল মোত্তালেবের পর তার সন্তানরা এই পবিত্র দায়িত্ব লাভ করেন। ইসলামের আবির্ভাবের পর আবদুল মোত্তালেবের পুত্র আব্বাস এ দায়িত্ব লাভ করেন।[২৫]

এসব ছাড়া আরো কিছু পদমর্যাদা ছিলো, যেসব কোরায়শরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন। এসব পদমর্যাদার মাধ্যমে কোরায়শরা একটি ছোটখাট সরকার গঠন করে রেখেছিলেন। সে সরকারের ব্যবস্থাপনা ছিলো অনেকটা বর্তমানে সংসদীয় পদ্ধতির মতো। পদমর্যাদার রূপরেখা ছিলো নিম্নরূপ।

(এক) ঈসার, অর্থাৎ ফালগিরি। ভাগ্য জানার জন্যে মূর্তিদের কাছে যে তীর রাখা হতো, সে তীরের রক্ষণাবেক্ষণ। এই মর্যাদা ছিলো বনু জমহের কাছে।

---

২৪ ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড পৃঃ ১১

২৫. ঐ ১ম খন্ড পৃঃ ১২৯, ১৩২, ১৩৭, ১৪২, ১৭৮, ১৭৯।

(দুই) অর্থ ব্যবস্থাপনা, মূর্তিদের নৈকট্য লাভের জন্যে যেসব উপঢৌকন, নযরানা এবং কোরবানী পেশ করা হতো তার ব্যবস্থাপনা। এছাড়া ঝগড়া-বিবাদের ফয়সালা করার দায়িত্বও বনু সাহাম দেয়া হয়েছিলো।

(তিন) শূরা, এ সম্মান বনু আসাদের কাছে ছিলো।

(চার) আশনাক, ক্ষতিপূরণ এবং জরিমানার অর্থ আদায় ও বন্টন। বনু তাঈম গোত্র এ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলো।

(পাঁচ) উকাব, জাতীয় পতাকা বহন। এ দায়িত্ব বনু উমাহিয়া গোত্রের ওপর ন্যস্ত ছিলো।

(ছয়) কুব্বা, সামরিক ছাউনির ব্যবস্থাপনা এবং সৈন্যদের অধিনায়কত্ব। এ সম্মান বনু মাখযুমের অধিকারে ছিলো।

(সাত) সাফায়াত, সফর সম্পর্কিত বিষয় তত্ত্বাবধান। এ দায়িত্ব বনু আদী গোত্র পালন করতো।[২৬]

আরবের অন্যান্য অংশের প্রশাসনিক অবস্থা

ইতিপূর্বে কাহতানি এবং আদনানী আরবদের দেশ ত্যাগের কথা আলোচনা করা হয়েছে এবং উল্লেখ করা হয়েছে যে, সমগ্র দেশ আরবের এসব গোত্রের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়েছে।

এরপর তাদের নেতৃত্ব এবং কর্তৃত্বের অবস্থা এরূপ ছিলো যে, কাবার আশেপাশে যেসব গোত্র বসবাস করতো, তাদেরকে হীরার অধীনস্থ মনে করা হতো। যেসব গোত্র সিরীয় এলাকায় বসবাস করতো, তাদেরকে আসমানী শাসকদের অধীনস্থ মনে করা হতো। কিন্তু এটা ছিলো নামকাওয়াস্তে, বাস্তবে না। উল্লিখিত দু'টি জায়গা বাদে অন্যান্য এলাকার আরবরা ছিলো সম্পূর্ণ স্বাধীন।

এ সকল গোত্রের মধ্যে সর্দার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো। গোত্রের লোকেরাই নিজেদের সর্দার নিযুক্ত করতো। এ সকল সর্দারদের জন্যে গোত্র হতো একটি ছোট খাট সরকার। রাজনৈতিক অস্তিত্বের নিরাপত্তার ভিত্তি, গোত্রীয় বিবাদ বিশৃঙ্খলা নিরসন এবং নিজেদের ভূখন্ডের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিরক্ষার সম্মিলিত স্বার্থ এর দ্বারা রক্ষা করা হতো।

সর্দারদের মর্যাদা ছিলো তাদের সমাজে বাদশার মতো। যুদ্ধ সন্ধির ব্যাপারে সর্দারদের ফয়সালাই হতো চূড়ান্ত। এ অবস্থায় কোন পরিবর্তন কোন অবস্থায়ই হতো না। একজন একনায়কের যেরূপ ক্ষমতা থাকা দরকার, সর্দারের ক্ষমতা তার চেয়ে কোন অংশেই কম ছিলো না, কোন কোন সর্দারের অবস্থা এমন ছিলো যে, তারা সব দিক থেকে স্বাতন্ত্রের অধিকারী হতেন। একজন কবি একথা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, 'আমাদের মধ্যে তোমার জন্যে গণিমতের মালের এক চতুর্থাংশ রয়েছে। এছাড়া রয়েছে নির্বাচিত ধন-সম্পদ। তুমি ফয়সালা করে দেবে, সে সম্পদেও রয়েছে তোমার মালিকানা। পথে যা কুড়িয়ে পাওয়া যাবে এবং যা বন্টন না হয়ে উদ্বৃত্ত থাকবে, সে সম্পদের মালিকও তুমি।'

রাজনৈতিক পরিস্থিতি

জাযিরাতুল আরবের সরকার পদ্ধতি এবং শাসনকর্তাদের সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। কাজেই রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করাই সমীচীন হবে।

জাযিরাতুল আরবের তিনটি সীমান্ত এলাকার জনগণ ছিলো ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রতিবেশী। এ তিনটি দেশে অশান্তি বিশৃঙ্খলা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা বিদ্যমান ছিলো। মানুষরা দাস এবং

২৬. তারীখে আরদুল কোরআন ২য় খন্ড, পৃঃ ১০৪, ১০৫, ১০৬

প্রভু এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিলো। সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা, নেতা, বিশেষত বিদেশী শাসকদের করতলগত ছিলো। সকল বোঝা ছিলো দাসদের মাথায়। সুস্পষ্ট ভাষায় বললে বলা যায় যে, প্রশাসন ছিলো খেত-খামারের মতো। তারা সরকারের আয়ের উৎস হিসাবে পরিগণিত হতো। শাসকবর্গ সেই অর্থ সম্পদ নিজের সুখ-সাচ্ছন্দ, আরাম-আয়েশ ঐশ্বর্য এবং বিলাসিতায় ব্যয় করতো। আর জনগণ অন্ধকারে হাত পা ছুঁড়তো। শাসকরা জনগণের ওপর সকল প্রকার যুলুম-অত্যাচার চালিয়ে যেতো, জনগণ সেসব মুখ বুঁজে নির্বিচারে সহ্য করতো। কোন প্রকার অভিযোগ করার তাদের উপায় ছিলো না। অসম্মান অবমাননা অত্যাচার তাদের সহ্য করতে হতো। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা ডিক্টেটরের মতো আচরণ করতো। মানুষের অধিকার বলতে কোন কিছুই তখন ছিলো না।

এ সকল এলাকার পাশে বসতি স্থাপনকারী প্রতিবেশীরা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতো। এসব গোত্রের লোকেরা পরিস্থিতি এবং প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতো। তারা কখনো ইরাকী, আবার কখনো সিরীয়দের সুরে সুর মেলাতো।

আরবের ভেতরে বসবাসকারী গোত্রসমূহও ছিলো শতধাবিচ্ছিন্ন। চারিদিকে ঝগড়া বিবাদ, কলহ কোন্দল এবং বংশগত ও ধর্মীয় বিভেদ বিশৃঙ্খলা চলছিলো।

এসব অশান্তির মধ্যেও বিচ্ছিন্ন লোকেরা প্রয়োজনে নিজের গোত্রের প্রতিই সমর্থন দিতো। এক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায়ের ধার ধারতো না। একটি গোত্রের মুখপাত্র একজন কবি বলেন,

'আমি তো গাযিয়া গোত্রের একজন মানুষ। ওরা যদি ভুল পথে চলে, তবে আমিও ভুল পথে চলবো, ওরা যদি সঠিক পথে চলে, তবে আমিও সঠিক পথে চলবো।'

আরবের ভেতর এমন কোন বাদশাহ ছিলো না, যে জনগণের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করতো। প্রজাদের কারো কোন আশ্রয়স্থল ছিলো না। দুঃখ কষ্ট, সমস্যা সংকট এবং আপদ বিপদে বিশ্বাস এবং নির্ভর করার মতো কেউই ছিলো না।

হেজাযের শাসককে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হতো এবং কেন্দ্রীয় শাষক হিসাবে তাকে সম্মান করা হতো। হেজাযের শাসক ছিলো প্রকৃতপক্ষে দুনিয়াবী এবং দ্বীনী নেতা। ধর্মীয় নেতা হিসাবে আরবদের ওপর তার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিলো। কাবাঘর এবং আশেপাশের এলাকায় তার শাসন বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়া হতো। কাবাঘর যেয়ারতের জন্যে যারা আসতো, তাদের দেখাশোনা, প্রয়োজন পূরণ, শরীয়তের বাস্তবায়ন, সংসদীয় পদ্ধতির লালন, বিকাশ ইত্যাদি কাজ সেই শাসনকর্তার ওপর ন্যস্ত থাকতো। কিন্তু সে এমন দুর্বল হতো যে, আরবের অভ্যন্তরীণ সমস্যার বোঝা মাথায় নেয়া অর্থাৎ যাবতীয় সমস্যার সমাধান করার শক্তি তার থাকতো না। আবিসিনীয়দের হামলার সময় এই দুর্বলতার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিলো।

আরবদের ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মীয় মতবাদ

হযরত ইসমাইল (আ.)-এর দাওয়াত ও তাবলীগের কারণে আরবের সাধারণ মানুষ দ্বীনে ইবরাহীমীর অনুসারী ছিলো। তারা একমাত্র আল্লাহর এবাদাত করত এবং তাওহীদ বা একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলো। কিন্তু দিন যতোই যেতে লাগলো তারা দ্বীনের শিক্ষা ততোই ভুলে যেতে থাকলো। তবুও তাদের মধ্যে তাওহীদের আলো এবং হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর শিক্ষা কিছু কিছু অবশিষ্ট ছিলো। ইতিমধ্যে বনু খোজাআ গোত্রের সর্দার আমর ইবনে লোহাই নেতৃত্ব দেয়ার মতো অবস্থানে চলে এলো। ছোটবেলা থেকে এ লোকটি ধর্মীয় পুণ্যময় পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছিলো। ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে তার আগ্রহ ছিলো অসামান্য। সাধারণ মানুষ তাকে ভালোবাসার চোখে দেখতো এবং নেতৃস্থানীয় ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে মনে করে তার অনুসরণ করতো। এক পর্যায়ে এই লোকটি সিরিয়া সফর করে। সেখানে যে মূর্তিপূজা করা হচ্ছে, সে মনে করলো এটাও বুঝি আসলেই একটা ভালো কাজ। সিরিয়ায় অনেক নবী আবির্ভূত হয়েছেন এবং আসমানী কেতাব নাযিল হয়েছে। কাজেই সিরিয়ার জনগণ যা করছে, সেটা নিশ্চয়ই ভালো এবং পুণ্যের কাজ। এরূপ চিন্তা করে সিরিয়া থেকে ফেরার পথে সে হোবাল নামের এক মূর্তি নিয়ে এসে সেই মূর্তি কাবাঘরের ভেতর স্থাপন করলো। এরপর সে মক্কাবাসীদের সেই মূর্তিপূজার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে শেরেক করার আহ্বান জানালো। মক্কার লোকেরা ব্যাপকভাবে তার ডাকে সাড়া দিলো। মক্কার জনগণকে মূর্তিপূজা করতে দেখে আরবের বিভিন্ন এলাকার লোক তাদের অনুসরণ করলো। কাবাঘরের রক্ষণাবেক্ষণকারীদের বৃহত্তর আরবের লোকেরা মনে করতো ধর্মগুরু[১]। এ কারণে তারাও মূর্তিপূজায় মক্কার লোকদের অনুসরণ করলো। এমনি করে আরবে মূর্তিপূজার প্রচলন হলো।

'হোবাল' ছাড়াও আরবের প্রাচীন মূর্তি ছিলো 'মানাত'। এ মূর্তি লোহিত সাগরের উপকূলে কোদাইদ এলাকার মুসাল্লাল নামক জায়গায় স্থাপন করা হয়েছিলো।[২] এরপর তায়েফে লাত নামে একটি মূর্তি স্থাপন করা হয়। নাখলা নামক স্থানে 'ওযযা' নামে একটি মূর্তি রেখে তার পূজা করা হয়। এ তিনটি ছিলো আরবের সবচেয়ে বড় বড় মূর্তি।

এসব মূর্তির অনুসরণে অল্পকালের মধ্যে হেজাযের সর্বত্র শেরকের আধিক্য এবং মূর্তি স্থাপনের হিড়িক পড়ে যায়। বলা হয়ে থাকে যে, একটি জিন আমর ইবনে লোহাইয়ের অনুসারী ছিলো। সে আমরকে জানালো যে, নূহের জাতির মূর্তি অর্থাৎ ওয়াদ্দা, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক এবং নাসর জেদ্দায় প্রোথিত রয়েছে।

এ খবর জানার পর আমর ইবনে লোহাই জেদ্দায় গেলো এবং এ সকল মূর্তি খুঁড়ে বের করলো। এরপর সেসব মূর্তি মক্কায় নিয়ে এলো। হজ্জ মৌসুমে সেসব মূর্তি বিভিন্ন গোত্রের হাতে

---

১. মুখতাছারুস সীরাত শেখ মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব নজদী, পৃঃ ১২
২. সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃঃ ২২২

তুলে দেয়া হলো। গোত্রগুলো নিজ নিজ এলাকায় সেসব মূর্তি নিয়ে গেলো। এমনিভাবে প্রত্যেক গোত্র এবং পর্যায়ক্রমে প্রত্যেক ঘরে ঘরে মূর্তি স্থাপিত হলো।

পালাক্রমে পৌত্তলিকরা কাবাঘরকে মূর্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করলো। মক্কা বিজয়ের সময় কাবাঘরে তিনশত ষাটটি মূর্তি ছিলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে সেসব মূর্তি ভাঙ্গেন। তিনি একটি ছড়ি দিয়ে গুঁতো দিতেন, সাথে সাথে সে মূর্তি নীচে পড়ে যেতো। এরপর তাঁর নির্দেশে সব মূর্তি কাবাঘর থেকে বাইরে বের করে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিলো।[৩] মোটকথা শেরেক এবং মূর্তিপূজা ছিলো আইয়ামে জাহেলিয়াতে সবচেয়ে বড় ধর্মীয় কাজ। মূর্তিপূজা করে মনে করতো যে, তারা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দ্বীনের ওপরই রয়েছে।

পৌত্তলিকদের মধ্যে মূর্তিপূজার কিছু বিশেষ নিয়ম প্রচলিত ছিলো। এর অধিকাংশই ছিলো আমর ইবনে লোহাই-এর আবিষ্কার। আমরের এ সকল কাজকে মক্কার লোকেরা প্রশংসার চোখে দেখতো। ইবরাহীমী দ্বীনে পরিবর্তন নয় বরং এসবকে তারা মনে করতো 'বেদাতে হাসানা।' নিচে পৌত্তলিকদের মূর্তি পূজার কয়েকটি প্রচলিত রেওয়াজ তুলে ধরা হচ্ছে।

এক) আইয়ামে জাহেলিয়াতে পৌত্তলিকরা মূর্তির সামনে নিবেদিত চিত্তে বসে থাকতো এবং তাদের কাছে আশ্রয় চাইতো। তাদের জোরে জোরে ডাকতো এবং প্রয়োজন পূরণ, মুশকিল আসান বা সমস্যা সমাধানের জন্যে তাদের কাছে সাহায্য চাইতো। তারা বিশ্বাস করতো যে, মূর্তিরা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে তাদের উদ্দেশ্য পূরণ করিয়ে দেবে।

দুই) মূর্তিগুলোর উদ্দেশ্যে হজ্জ এবং তওয়াফ করা হতো। তাদের সামনে অনুনয় বিনয় করা হতো তাদের সেজদা করা হতো।

তিন) মূর্তিগুলোর জন্যে উপঢৌকন এবং নযরানা পেশ করা হতো। কোরবানীর পশু অনেক সময় মূর্তির আস্তানায় নিয়ে যবাই করা হতো। তবে সেটা করা হতো মূর্তির নামে। যবাইয়ের এই উভয় রকমের কথা কোরআনে আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন। 'সেই পশুও হারাম করা হয়েছে, যা মূর্তি-পূজার বেদীর উপর বলি দেয়া হয়।' (৩, ৫)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, 'ওসব পশুর গোশত খেয়ো না, যার ওপর আল্লাহর নাম নেয়া হয়নি। অর্থাৎ গায়রুল্লাহর নামে যবাই করা হয়েছে এমন কিছুই আহার করো না।' (১২১, ৬)

চার) মূর্তির সন্তুষ্টি লাভের একটা উপায় এটাও ছিলো যে, পৌত্তলিকরা তাদের পানাহারের জিনিস, উৎপাদিত ফসল এবং চতুষ্পদ জন্তুর একাংশ মূর্তির জন্যে পৃথক করে রাখতো। মজার বিষয় হচ্ছে তারা আল্লাহর জন্যেও একটা অংশ রাখতো। পরে বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহর জন্যে রাখা অংশ মূর্তির কাছে পেশ করতো। কিন্তু মূর্তির জন্যে রাখা অংশ কোন অবস্থায়ই আল্লাহর কাছে পেশ করতো না।

যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহ যেসব শস্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্যে থেকে তারা আল্লাহর জন্যে একাংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা মতে বলে, এটা আল্লাহর জন্যে এবং এটা আমাদের দেবতাদের জন্যে। যা তাদের দেবতাদের অংশ, তা আল্লাহর কাছে পৌঁছে না কিন্তু যা আল্লাহর অংশ, তা তাদের দেবতাদের কাছে পৌঁছায়। তারা যা মীমাংসা করে, তা বড়ই নিকৃষ্ট। (১৩৬,৬)

পাঁচ) মূর্তিদের সন্তুষ্টি পাওয়ার একটা উপায় তারা এটা নির্ধারণ করেছিলো যে, পৌত্তলিকরা উৎপাদিত ফসল এবং চতুষ্পদ পশুর মধ্যে বিভিন্ন ধরনের মানত করতো। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তারা তাদের ধারণা অনুসারে বলে, এসব গবাদিপশু ও শস্যক্ষেত্র নিষিদ্ধ। আমরা যাকে

---

৩ মুখতাছারুছ সীরাত, শেখ মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব নজদী, পৃ ১৩, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৪

ইচ্ছা করি, সে ছাড়া কেউ এসব আহার করতে পারবে না এবং কতক গবাদিপশুর পিঠে আরোহণ নিষিদ্ধ করার সময় তারা আল্লাহর নাম নেয় না।' (১৩৮,৬)

ছয়) এসব পশুর মধ্যে ছিলো বাহিরা, সায়েবা, ওয়াসিলা এবং হামী। ইবনে ইসহাক বলেছেন, আর বাহিরা সায়েবার কন্যা শাবককে বলা হয়। সায়েবা সেই উটনীকে বলা হয় যার পর্যায়ক্রমে দশবার মাদী বাচ্চা হয়। এর মধ্যে কোন নর বাচ্চা হয় না। এ ধরনের উটনীকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়। সেই উটনীর পিঠে সওয়ার করা হয় না। তার পশম কাটা হয় না। মেহমান ছাড়া অন্য কেউ তার দুধ পান করে না। এগারবারের সময় এই উটনী যে বাচ্চা দেয় সেই বাচ্চাকে মায়ের সাথে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হয়। তার পিঠেও আরোহণ করা হয় না। তার পশম কাটা হয় না। মেহমান বাদে কেউ তার দুধ পান করে না। এই উটনী হচ্ছে বাহিরা। তার বাচ্চা হচ্ছে সায়েবা।

ওয়াসিলা সেই বকরিকে বলা হয় যে বকরি দু'টি করে পাঁচবার পর্যায়ক্রমে মাদী বাচ্চা প্রসব করে। অর্থাৎ পাঁচবারে দশটি মাদী বাচ্চা দেয় এবং এর মধ্যে কোন নর বাচ্চা দেয় না। এই বকরিকে ওয়াসিলা বলা হয়, যেহেতু তারা সব বাচ্চাকে পরস্পরের সাথে জুড়ে দেয়। এরপর এসব বকরি ষষ্ঠবারে যে বাচ্চা প্রসব করে, সে বাচ্চার গোশত শুধু পুরুষেরা খেতে পারে, মহিলাদের জন্যে তার গোশত নিষিদ্ধ। তবে কোন বাচ্চা বা শাবক মৃত প্রসব করলে সেই বাচ্চাকে নারী-পুরুষ সবাই খেতে পারে।

'হামী' সেই পুরুষ উটকে বলা হয়, যার বীর্য থেকে পরপর দশটি মাদী বাচ্চা জন্ম নেয়। এর মাঝে কোন নর বাচ্চা জন্ম না নেয়। এ ধরনের উটের পিঠ সংরক্ষিত রাখা হয়। এদের পিঠে কাউকে আরোহন করতে দেয়া হয় না, গায়ের পশম কাটা হয় না। উটের পালের মধ্যে এ উটকে স্বাধীনভাবে বিচরণের জন্যে ছেড়ে দেয়া হয়। এছাড়া এদের দিয়ে অন্য কোন প্রকার কাজও নেয়া হয় না। আইয়ামে জাহেলিয়াতে প্রচলিত এসব প্রকারের মূর্তি পূজা এবং রীতিনীতির প্রতিবাদ করে আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেন, 'বাহিরা, সায়েবা, ওয়াসিলা এবং হামী আল্লাহ স্থির করেননি কিন্তু কাফেররা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তাদের অধিকাংশই তা উপলব্ধি করে না।' (১০৩, ৫)

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে আরো বলেন, 'ওরা আরো বলে, এসব গবাদি পশুর গর্ভে যা রয়েছে তা আমাদের পুরুষদের জন্যে নির্দিষ্ট এবং সেটা আমাদের স্ত্রীদের জন্যে অবৈধ আর সেটি যদি মৃত হয়, তবে নারী পুরুষ সবাই ওতে অংশীদার। তাদের এরূপ বলার প্রতিফল তিনি তাদের দেবেন।' তিনি প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ। (১৩৯,৬)

চতুষ্পদ পশুদের উল্লিখিত শ্রেণীবিন্যাস অর্থাৎ বাহিরা, সায়েবা প্রভৃতির অন্য অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে।[৪] ইবনে ইসহাকের ব্যাখ্যায় উল্লিখিত ব্যাখ্যার সাথে এর কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

হযরত সাঈদ ইবনে মোসায়েব (র.) বলেন, এসব পশু হচ্ছে ওদের তাগুতদের জন্যে।[৫] সহীহ বোখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, মূর্তির নামে পশু সর্বপ্রথম আমর ইবনে লোহাই ছেড়েছিলো।[৬]

আরবের লোকেরা এ বিশ্বাসের সাথে এসব আচার অনুষ্ঠান পালন করতো যে, মূর্তি তাদেরকে আল্লাহর কাছাকাছি পৌঁছে দেবে এবং তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবে।

---

৪. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, ৮৯-৯০

৫. সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৯৯

৬. ঐ

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'পৌত্তলিকরা বলতো, আমরাতো এদের পূজা এজন্যে করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে।'

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে আরো বলেন, 'ওরা আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করে তা ওদের ক্ষতিও করে না, উপকারও করে না। ওরা বলে, এগুলো আল্লাহর কাছে আমাদের জন্যে সুপারিশকারী।' (১৮,১০)

মক্কার পৌত্তলিকরা 'আযলাম' অর্থাৎ ফাল-এর তীর ব্যবহার করতো। 'আযলাম' হচ্ছে 'যালামুন' শব্দের বহুবচন। যালাম সেই তীরকে বলা হয়, যে তীরে পালক লাগানো থাকে না। ফালগিরির জন্যে ব্যবহার করা এই তীর তিন প্রকারের হয়ে থাকে। এক প্রকারের তীরে হাঁ এবং না লেখা থাকে। এ ধরনের তীর সফর, বিয়ে ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা হয়। ফালে যদি হাঁ প্রকাশ পায়, তবে পরিকল্পিত কাজ করা হয়। যদি না লেখা থাকে, তবে এক বছরের জন্যে স্থগিত রাখা হয়। পরের বছর পুনরায় সে কাজ করতে ফাল এর তীর ব্যবহার করা হয়। ফালগিরির দ্বিতীয় শ্রেণীর তীরের মধ্যে পানি, দীয়ত বা ক্ষতিপূরণ ইত্যাদি শব্দ উৎকীর্ণ থাকতো।

তৃতীয় প্রকারের তীরের মধ্যে লেখা থাকতো তোমাদের মধ্য থেকে অথবা তোমাদের বাইরে থেকে। এ ধরনের তীরের কাজ ছিলো যে, কারো বংশ পরিচয়ের ক্ষেত্রে সন্দেহ থাকলে তাকে একশত উটসহ হোবাল মূর্তির সামনে হাযির করা হতো। সেসব উট তীরের মালিক সেবায়েতকে দেয়া হতো। সে এসব তীর একসাথে মিলিয়ে ঘোরাতো। এলোমেলো করতো। এরপর একটি তীর বের করতো। যদি সেই তীরে লেখা থাকতো যে, তোমাদের মধ্যে থেকে, তবে সেই ব্যক্তি গোত্রের একজন সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে পরিগণিত হতো। যদি সেই তীরে লেখা থাকতো যে, তোমাদের বাইরের লোক। তবে সেই ব্যক্তিকে শত্রুপক্ষের লোক মনে করা হতো। যদি তীরের গায়ে লেখা থাকতো মিশ্র, তবে সেই ব্যক্তির পদমর্যাদার কোন উন্নতি অবনতি হতো না। তাকে গোত্রের মধ্যে পূর্বের মতোই সাধারণভাবে জীবন যাপনের অধিকার দেয়া হতো।[৭]

পৌত্তলিকদের মধ্যে প্রায় একই ধরনের আরো একটি রেওয়াজ চালু ছিলো। সেটা হচ্ছে জুয়া খেলা এবং জুয়ার তীর। এ তীরের চিহ্নিতকরণ অনুযায়ী উট যবাই করে সেই উটের গোশত বন্টন করা হতো।[৮]

আরব পৌত্তলিকরা যাদুকর ও জ্যোতিষীদের কথার ওপরও বিশ্বাস রাখতো। এরা ভবিষ্যতের ভালোমন্দ সম্পর্কে কথা বলতো। কেউ দাবী করতো যে, তার অনুগত একটি জ্বীন রয়েছে, সেই জ্বীন তাকে খবর এনে দিচ্ছে। কেউ দাবী করতো যে, তার মধ্যে খোদাপ্রদত্ত মেধা এবং বিচক্ষণতা রয়েছে। এই মেধা বিচক্ষণতা এবং দূরদর্শিতার কারণে সে নির্ভুল ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে। এদের মধ্যে আররাফ নামে একটা শ্রেণী ছিলো। এরা চুরির ঘটনা সম্পর্কে কথা বলতো। চোরাই মাল উদ্ধার এবং চুরির জায়গা এরা সনাক্ত করতো। জ্যোতিষী সেসব লোককে বলা হতো, যারা নক্ষত্রের গতি সম্পর্কে গবেষণা করতো এবং হিসাব-নিকাশ করে বিশ্বের ভবিষ্যত ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করতো।[৯]

---

৭. মোহাদেরাতে খাযরামি, ১ম খন্ড, পৃঃ ৫৬, ইবনে হিশাম ১ম খন্ড, পৃঃ ১০২, ১০৩

৮. এই নিয়ম ছিল এবং যে ব্যক্তি জুয়া খেলতো, সে একটি উট যবাই করে দশ বা আটাশ ভাগ করতো। পরে তীর দিয়ে লটারী করা হতো। কোন তীরে জয়ের চিহ্ন থাকতো, কোন তীরে কোন চিহ্নই থাকত না। যার নামের ওপর জয় সূচক তীর বের হতো, তাকে বিজয়ী মনে করা হতো এবং উটের গোশত সে বিনামূল্যে পেতো। যে ব্যক্তির নামে চিহ্ন বিহীন তীর উঠতো, তাকে গোশতের মূল্য দিতে হতো।

৯. মেরাতুল মাফাতিহ, শরহে মেশকাতুল মাছাবিহ ২য় খন্ড, পৃঃ ২, ৩ লাক্ষ্ণৌর সংস্কর।

জ্যোতিষীর কথার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা প্রকৃতপক্ষে নক্ষত্রের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের শামিল। মক্কার পৌত্তলিকরা নক্ষত্রের ওপর বিশ্বাস রাখতো এবং বলতো, অমুক অমুক নক্ষত্র থেকে আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়।[১০]

একই ধরনের আরো অনেক কাজ তারা ভালোমন্দ নিরূপণের জন্যে করতো। সেটা হচ্ছে খরগোশের হাঁটুর একখানি হাড় ঝুলিয়ে দিতো। কিছু দিন ও মাস, কিছু পশু, কিছু নর এবং কিছু নারীকে তারা অশুভ মনে করতো। অসুস্থ লোকদের স্পর্শ থেকে তারা দূরে থাকতো এবং তার দেখাকে ক্ষতিকর মনে করতো। রূহ্ বেরিয়ে যাওয়ার পর উল্লুকে পরিণত হয় বলে তারা ধারণা করতো। নিহত ব্যক্তির আততায়ীর কাছ থেকে বদলা নেয়া না হলে নিহত ব্যক্তির রূহ শান্তি পায় না বলে তারা বিশ্বাস করতো। নিহত ব্যক্তির আত্মা পাহাড়ে প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায় এবং পিপাসা, পিপাসা, আমাকে পান করাও, পান করাও বলে চিৎকার করতে থাকে বলে তারা বিশ্বাস করতো। হত্যার ক্ষতিপূরণ নেয়া হলে নিহত ব্যক্তির রূহ শান্তি পায় বলে তারা বিশ্বাস করতো।[১১]

দ্বীনে ইবরাহীমীতে কোরায়শদের বিবাদ

আইয়ামে জাহেলিয়াতে লোকদের চিন্তা, বিশ্বাস কাজ সম্পর্কে মোটামুটি আলোকপাত করা হলো। এসব কিছুর পাশাপাশি দ্বীনে ইবরাহীমীও তারা আংশিকভাবে পালন করতো। অর্থাৎ ইবরাহীমী দ্বীন তারা পুরোপুরি পরিত্যাগ করেনি। তারা কাবাঘর তওয়াফ করতো, কাবাঘরের সম্মান করতো, হজ্জ এবং ওমরাহ পালন করতো, আরাফাত এবং মোযদালেফায় অবস্থান করতো এবং হাদীর পশু কোরবানী করতো। তবে দ্বীনে ইবরাহীমীতে তারা বেশ কিছু বেদয়া'তও যুক্ত করেছিলো। নিচে তার কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা যাচ্ছে।

কোরায়শদের একটি বেদয়া'ত ছিলো এই যে, তারা বলতো, আমরা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সন্তান। কাবার পাসবান বা রক্ষণাবেক্ষণকারী, কাবাঘরের তত্ত্বাবধায়ক এবং মক্কার বাসিন্দা, আমাদের সমমর্যাদার কেউ নেই। আমাদের সমতুল্য অধিকার কারো নেই। এ কারণে তারা নিজেদের নামকরণ করতো হুম্স। অর্থাৎ বাহাদুর এবং গরমজোশ। তারা বলতো, আমাদের অতি অসাধারণ মর্যাদা রয়েছে। কাজেই কাবাঘরের সীমানার বাইরে যাওয়া আমাদের শোভনীয় নয়। হজ্জের সময়ে তারা আরাফাতে যেতো না এবং নিয়ম অনুযায়ী সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করতো না। বরং তারা মোযদালেফায় অবস্থান করে সেখান থেকেই প্রত্যাবর্তন করতো। আল্লাহ তায়ালা এই বেদয়া'তকে সংশোধন করে বলেন, 'অতপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে প্রত্যাবর্তনও করে তোমরাও সেই স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন করবে।'[১২] (১৯৯,২)

পৌত্তলিকদের একটি বেদয়া'ত ছিলো এই যে, তারা বলতো, হুম্স অর্থাৎ কোরায়শদের জন্যে এহরাম বাঁধা অবস্থায় পনির এবং ঘি তৈরী করা বৈধ নয়। পশমওয়ালা ঘরে অর্থাৎ কম্বলের তাঁবুতে প্রবেশ হওয়াও বৈধ নয়। এটাও বৈধ নয় যে, ছায়া পেতে হলে চামড়ার তাঁবু ছাড়া অন্য কোথাও ছায়া লাভ করবে।[১৩]

তাদের একটি বেদয়া'ত এটাও ছিলো যে, তারা বলতো, মক্কার বাইরে থেকে যারা হজ্জ বা ওমরাহ করতে আসবে, তাদের নিয়ে আসা খাদ্য পানীয় খাওয়া বৈধ নয়।[১৪]

---

১০. সহীহ মোসলেম, শরহে নববী, কিতাবুল ঈমান। (১ম খন্ড পৃঃ ৯৫)
১১. সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড. পৃঃ ৮৫১, ৮৫৭
১২. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃঃ১৯৯, সহীহ বোখারী ১ম খন্ড. পৃঃ ২২৬
১৩. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ২০২
১৪. ঐ

একটি বেদয়াত এই ছিলো যে, তারা মক্কার বাইরের অধিবাসীদের আদেশ দিয়ে রেখেছিলো যে, তারা হরমে আসার পর প্রথম যে তওয়াফ করবে, সেই তওয়াফ হুমস অর্থাৎ কোরায়শদের কাছ থেকে নেয়া কাপড়ে করতে হবে। যদি কাপড় না পেতো, তবে পুরুষেরা উলঙ্গ হয়ে তওয়াফ করতো এবং মহিলারা সব পোশাক খুলে ফেলে একটি ছোট খোলা জামা পরিধান করে তওয়াফ করতো। তওয়াফের সময় তারা এ কবিতা আবৃত্তি করতো,

'লজ্জাস্থানের কিছুটা বা সবটুকু খুলে যাবে আজ। যেটুকু যাবে দেখা ভাবব না অবৈধ কাজ।'

এ অশ্লীল আচরণ বন্ধ করতে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন, 'হে বনি আদম, প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে।' (৩১, ৭)

যদি মক্কার বাইরে থেকে আসা কোন পুরুষ বা নারী মক্কার বাইরে থেকে নিয়ে আসা পোশাকে তওয়াফ করতো, তবে তওয়াফ শেষে সেই পোশাক ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হতো। সে পোশাক নিজেও ব্যবহার করতো না এবং অন্য কেউও ব্যবহার করতো না।[১৫]

কোরায়শদের একটি বেদয়াত এই ছিলো যে, তারা এহরাম বাঁধা অবস্থায় ঘরের দরোজা দিয়ে প্রবেশ করতো না বরং ঘরের পেছনের দিকে একটা ছিদ্র করে নিতো, সেই ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করতো এবং বাইরে বের হতো।

এ ধরনের উদ্ভট কাজকে তারা পুণ্যের কাজ মনে করতো। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'পেছন দিক দিয়ে তোমাদের গৃহে প্রবেশ করাতে কোন পুণ্য নাই, কিন্তু পুণ্য আছে কেউ যদি তাকওয়া অবলম্বন করে। সুতরাং তোমরা দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করো। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যাতে, তোমরা সফলকাম হতে পারো।' (১৮৯,২)

এই ছিলো পৌত্তলিকদের ধর্মীয় জীবনের রূপরেখা।

এছাড়া জাযিরাতুল আরবের বিভিন্ন এলাকায় ইহুদী, খৃস্টান, মাজুসিয়ত বা অগ্নিপূজক এবং সাবেয়ী মতবাদের ব্যাপক প্রচলন ছিলো। নীচে এদের সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যাচ্ছে:

জাযিরাতুল আরবে ইহুদীদের ছিলো দু'টি যুগ। প্রথম যুগ ছিলো সেই সময় যখন বাবেল ও আশুর সরকার ফিলিস্তিন জয় করেছিলো। এ সময় ইহুদীরা স্বদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সেই সরকারের কঠোর নির্যাতন নিষ্পেষণ এবং ইহুদী জনবসতির ধ্বংস সাধনের ফলে বহুসংখ্যক ইহুদী হেজায ছেড়ে ফিলিস্তিনের উত্তরাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিলো।[১৬]

দ্বিতীয় যুগ ছিলো সেই সময় যখন ৭০ ঈসায়ী সালে টাইটাস রুমীর নেতৃত্বে রোমকরা ফিলিস্তিন অধিকার করে। সেই সময় রোমকদের ইহুদী নির্যাতন এবং ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের ফলে বহু ইহুদী গোত্র হেজাযে পালিয়ে আসে। এরা ইরানের খয়বর ও তায়মাসে বসতি গড়ে তোলে এবং দুর্গ নির্মাণ করে। এসব দেশত্যাগী ইহুদীদের সাথে মেলামেশার ফলে আরব অধিবাসীদের মধ্যে ইহুদী ধর্ম-চিন্তার প্রসার ঘটে। এর ফলে ইসলামের আবির্ভাবের আগে এবং পরে বিভিন্ন সময়ে ইহুদীরাও উল্লেখযোগ্য শক্তিতে পরিণত হয়। ইসলামের আবির্ভাবের সময় যেসব ইহুদী গোত্র বিখ্যাত ছিলো, সেগুলো হচ্ছে খয়বর, নাযির, মোস্তালেক, কোরায়যা, কায়নুকা সামহুদী। 'অফা ওয়া অফা' গ্রন্থের ১১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন যে, এসময় ইহুদী গোত্রের সংখ্যা ছিলো বিশ-এর বেশি।[১৭]

---

১৫. ঐ ১ম খন্ড, পৃ. ২০২, ২০৩, সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ২২৬

১৬. কলবে জাযিরাতুল আরব পৃ. ২৫১

১৭. ঐ

ইয়েমেনেও ইহুদীরা ছিলো শক্তিশালী। তাবান আসাদ আবু কারাব নামে এক ব্যক্তির মাধমে ইয়েমেনে ইহুদী মতবাদ প্রসার লাভ করে। যুদ্ধ করতে করতে সে ইয়াসরেব পৌঁছে।

ইয়াসরেব যাওয়ার পর সে ইহুদী মতবাদের দীক্ষা নেয় এবং বনু কোরায়যার দু'জন ইহুদী ধর্ম বিশেষজ্ঞকে সঙ্গে নিয়ে ইয়েমেনে পৌঁছে। এদের মাধ্যমে ইয়েমেনে ইহুদী মতবাদ প্রচার প্রসার লাভ করে। আবু কারাবের পর তার পুত্র ইউসুফ জুনুয়াস ইয়েমেনের শাসন ক্ষমতা অধিকার করে। ইহুদী মতবাদের জোশে এই ব্যক্তি নাযরানের খৃস্টানদের ওপর হামলা চালায় এবং জোর করে তাদেরকে ইহুদী ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করে। কিন্তু এতে তারা অস্বীকৃতি জানায়। ক্রুদ্ধ জুনুয়াস বিরাট গর্ত খনন করিয়ে সে গর্তে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। তারপর দাউ দাউ করে প্রজ্বলিত আগুনে নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সব শ্রেণীর মানুষকে সেই গর্তে ফেলে দেয়। এ ঘটনায় বিশ থেকে চব্বিশ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। ৫২৩ ঈসায়ী সালের অক্টোবর মাসে এ ঘটনা ঘটে। পবিত্র কোরআনের সূরা বুরুজে এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।[১৮]

আরব দেশসমূহে ঈসায়ী বা খৃষ্টধর্ম আবিসিনীয় এবং রোমক বিজয়ীদের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিলো। ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইয়েমেনের ওপর আবিসিনীয়রা প্রথমবার ৩৪০ সালে আধিপত্য বিস্তার করে। ৩৭৮ সাল পর্যন্ত এ অবস্থা বজায় ছিলো। এ সময়ে ইয়েমেনে খৃস্টান মিশনারী কাজ করতে থাকে। সেই সময়ে ফেমিউন নামে একজন বিশিষ্ট সাধক নাযরান পৌঁছেন এবং স্থানীয় লোকেদের মধ্যে ঈসায়ী বা খৃস্টান ধর্ম প্রচার করেন। নাযরানের অধিবাসীরা খৃস্টান ধর্মের সত্যতার প্রমাণ পাওয়ার পর খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করে।[১৯]

জুনুয়াসের হত্যাকান্ডের ক্ষতচিহ্ন তখনো মুছে যায়নি। এ মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া হিসাবে হাবশীরা পুনরায় ইয়েমেন অধিকার করে এবং আবরাহা ক্ষমতা দখল করে। এই ব্যক্তি বিপুল উৎসাহের সাথে খৃস্টান ধর্ম প্রচারের উদ্যোগ নেয়। উৎসাহের আতিশয্যে এই ব্যক্তি ইয়েমেনে একটি মন্দির তৈরী করে। সে চাচ্ছিলো যে, ধর্মপ্রাণ মানুষরা মক্কার কাবাঘরে না গিয়ে তার তৈরী মন্দিরে যাবে। এ দুরাচার এ উদ্দেশ্যে মক্কায় কাবাঘর ধ্বংস করে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ ঘৃণ্য দুঃসাহস দেখানোর ফলে আল্লাহ তায়ালা তাকে এমন শাস্তি দিলেন যে, সে ঘটনা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী সকলের জন্যে শিক্ষনীয় হয়ে রইল।

অন্যদিকে রোমকরা অধিকৃত এলাকার প্রতিবেশী হওয়ায় আলে গাসসান, বনু তাগলাব, বনু তাঈ প্রভৃতি আরব গোত্রের মধ্যে খৃস্টান ধর্ম বিস্তার লাভ করে। হীরার কয়েকজন আরব শাসকও খৃস্টান ধর্মে দীক্ষিত হন।

মাজুসী ধর্ম বা অগ্নিপূজকদের অধিকাংশ বসবাস করতো পারস্যের প্রতিবেশী আরব দেশসমূহে। যেমন ইরাক, বাহরাইন ও আরব উপসাগরের উপকূলীয় এলাকা। এ ছাড়া ইয়েমেনে পারস্য আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর বিচ্ছিন্নভাবে বহু লোক মাজুসী ধর্ম গ্রহণ করেছিলো।

সাবী বা সাবেয়ী ধর্ম। ইরাক এবং অন্যান্য স্থানে প্রাচীন নির্দশনসমূহ খনন করে উদ্ধার করার সময় প্রাপ্ত শিলালিপি থেকে জানা যায়, সাবী ছিলো কালদানি জাতির ধর্ম। এরা ছিলো হযরত ইব্রাহিম (আ.)-এর বংশধর। প্রাচীনকালে সিরিয়া এবং ইয়েমেনের বহু অধিবাসী এ ধর্মের অনুসারী ছিলো। কিন্তু ইহুদী এবং খৃস্টান ধর্মের জয় জয়কার শুরু হলে এ ধর্মের বিলুপ্তি ঘটে।

---

১৮. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড পৃ. ২০. ২১. ২২. ২৭. ৩১. ৩৫. ৩৬ এ ছাড়াও তাফসীর সমূহে সূরা বুরুজের তাফসীর দেখুন।

১৯. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড পৃ. ৩১. ৩২. ৩৩. ৩৪

তবুও মাজুসিদের সাথে মিশ্রিতভাবে বা তাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে ইরাক এবং আরব উপসাগারীয় এলাকায় এ ধর্মের কিছু অনুসারী অবশিষ্ট ছিলো।[২০]

সাধারণ ধর্মীয় অবস্থা

ইসলামের আবির্ভাবের সময় উল্লেখিত কয়েকটি ধর্ম আরবে বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু এ সকল ধর্মমত ছিলো ভাঙ্গনের মুখে। পৌত্তলিকরা যদিও নিজেদেরকে দ্বীনে ইবরাহীমীর অনুসারী মনে করতো কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা দ্বীনে ইবরাহীমীর আদেশ নিষেধ থেকে বহু দূরে অবস্থান করতো।

দ্বীনে ইবরাহীমী উন্নত চরিত্র গঠনের লক্ষ্যে যেসব শিক্ষা দিয়েছিলো, তার সাথে পৌত্তলিকদের দূরতম সম্পর্কও ছিলো না। তারা পাপের পাঁকে ছিলো নিমজ্জিত। দীর্ঘকাল থেকে তাদের মধ্যে মূর্তিপূজার মাধ্যমে সৃষ্ট পাপাচার অনাচার কদাচার বিদ্যমান ছিলো। এসব কারণে তাদের সম্মিলিত রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন দারুণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলো।

ইহুদী ধর্মের অনুসারীদের ছিলো আকাশছোঁয়া অহংকার। ইহুদী পুরোহিতরা আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে নিজেরাই প্রভু হয়ে বসেছিলো। তারা মানুষের ওপর নিজেদের ইচ্ছে জোর করে চাপিয়ে দিতো। তারা মানুষের চিন্তা-ভাবনা ধ্যান-ধারণা এবং মুখের কথা নিজেদের মর্জির অধীন করে দিয়েছিলো। তারা সর্বতোভাবে ক্ষমতা এবং অর্থ সম্পদ উপার্জনে নিয়োজিত ছিলো। যে কোন মূল্যে এসব কিছু করায়ত্ত করতেই তারা ছিলো সতত উদগ্রীব। ধর্ম নষ্ট করে হলেও ক্ষমতা এবং ধন-সম্পদ তারা পেতে চাইতো। পৌত্তলিকরা কুফুরী ও খোদাদ্রোহিতায় লিপ্ত ছিলো। এসব অপকর্ম তাদের ইচ্ছা পূরণের সঙ্গী ছিলো। আল্লাহর নির্দেশ তারা উপেক্ষা করতে এতটুকু ইতস্তত করতো না।

খৃষ্টধর্ম ছিলো এক উদ্ভট মূর্তিপূজার ধর্ম। তারা আল্লাহ তায়ালা এবং মানুষকে বিস্ময়করভাবে একাকার করে দিয়েছিলো। আরবের যেসব লোক এ ধর্মের অনুসারী ছিলো, তাদের ওপর এ ধর্মের প্রকৃত কোন প্রভাব ছিলো না। কেননা দ্বীনের শিক্ষার সাথে তাদের ব্যক্তি জীবনের কোন মিল ছিলো না। কোন অবস্থায়ই তারা নিজেদের ভোগ সর্বস্ব জীবন-যাপন পরিত্যাগ করতে রাযি ছিলো না। পাপের পঙ্কে নিমজ্জিত ছিলো তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন।

আরবের অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের জীবনও ছিলো পৌত্তলিকদের মতো। কেননা তাদের ধর্মের মধ্যে বিভিন্নতা থাকলেও মনের দিক থেকে তারা ছিলো একই রকম। শুধু মনের দিক থেকেই নয়, জীবনাচার এবং রুসম রেওয়াজের ক্ষেত্রেও তারা ছিলো এক ও অভিন্ন।

---

২০. তারীখে আরদুল কোরআন, ২য় খন্ড. পৃ ১৯৩-২০৮

জাহেলী সমাজের কিছু খন্ড চিত্র

জাযিরাতুল আরবের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা বর্ণনা করার পর এবার সেখানকার সামগ্রিক, অর্থনৈতিক এবং চারিত্রিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরা হচ্ছে

সামগ্রিক অবস্থা

আরবের জনগণ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে বসবাস করতো। প্রতিটি শ্রেণীর অবস্থা ছিলো অন্য শ্রেণীর চেয়ে আলাদা। অভিজাত শ্রেণীতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক ছিলো যথেষ্ট উন্নত। এ শ্রেণীর মহিলাদের স্বাধীনতা ছিলো অনেক। এদের কথার মূল্য দেয়া হতো। তাদের এতোটা সম্মান করা হতো এবং নিরাপত্তা দেয়া হতো যে, এরা পথে বেরোলে এদের রক্ষের জন্যে তলোয়ার বেরিয়ে পড়তো এবং রক্তপাত হতো। কেউ যখন নিজের দানশীলতা এবং বীরত্ব প্রসঙ্গে নিজের প্রশংসা করতো, তখন সাধারণত মহিলাদেরই সম্বোধন করতো। মহিলারা ইচ্ছে করলে কয়েকটি গোত্রকে সন্ধি-সমঝোতার জন্যে একত্রিত করতো, আবার তাদের মধ্যে যুদ্ধ এবং রক্তপাতের আগুনও জ্বালিয়ে দিতো। এসব কিছু সত্তেও পুরুষদেরই মনে করা হতো পরিবারের প্রধান এবং তাদের কথা গুরুত্বের সাথে মান্য করা হতো। এ শ্রেণীর মধ্যে নারী-পুরুষের মধ্যেকার সম্পর্ক বিয়ের মাধ্যমে নির্ণিত হতো এবং মহিলাদের অভিভাবকদের মাধ্যমে এ বিয়ে সম্পন্ন হতো। অভিভাবক ছাড়া নিজে বিয়ে করার মতো কোনো অধিকার নারীদের ছিলো না।

অভিজাত শ্রেণীর অবস্থা এরকম হলেও অন্যান্য শ্রেণীর অবস্থা ছিলো ভিন্নরূপ। সেসব শ্রেণীর মধ্যে নারী পুরুষের যে সম্পর্ক ছিলো সেটাকে পাপাচার, নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা, অশ্লীলতা এবং ব্যভিচার ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আইয়ামে জাহেলিয়াতে বিয়ে ছিলো চার প্রকার।

প্রথমটা ছিলো বর্তমানকালের অনুরূপ। যেমন, একজন মানুষ অন্যকে তার অধীনস্থ মেয়ের বিয়ের জন্যে পয়গাম পাঠাতো। সে তা মঞ্জুর হওয়ার পর মোহরানা আদায়ের মাধ্যমে বিবাহ হতো।

দ্বিতীয়টা ছিলো এমন, বিবাহিত মহিলা রজস্রাব থেকে পাক সাফ হওয়ার পর তার স্বামী তাকে বলতো, অমুক লোকের কাছে পয়গাম পাঠিয়ে তার কাছ থেকে তার লজ্জাস্থান অধিকার করো। অর্থাৎ তার সাথে ব্যভিচার করো, এ সময় স্বামী নিজ স্ত্রীর কাছ থেকে দূরে থাকতো, কাছে যেতো না। যে লোকটাকে দিয়ে ব্যভিচার করানো হচ্ছিলো, তার দ্বারা নিজ স্ত্রীর গর্ভে সন্তান আসার প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত স্বামী তার স্ত্রীর কাছে যেতো না। গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর স্বামী ইচ্ছে করলে স্ত্রীর কাছে যেতো। এরূপ করার কারণ ছিলো যাতে, সন্তান অভিজাত এবং পরিপূর্ণ হতে পারে। একে বলা হয় 'এসতেবজা' বিবাহ। ভারতেও এ বিয়ে প্রচলিত আছে ।

তৃতীয়ত, দশজন মানুষের চেয়ে কম সংখ্যক মানুষ কোন এক জায়গায় একজন মহিলার সাথে ব্যভিচার করতো। গর্ভবতী এবং সন্তান প্রসবের পর সেই মহিলা সেসব পুরুষকে কাছে ডেকে আনতো। এ সময় কারো অনুপস্থিত থাকার উপায় ছিলো না। সকলে উপস্থিত হলে সেই মহিলা বলতো, তোমরা যা করেছো সে তো তোমরা জানো, এখন আমার গর্ভ থেকে এ সন্তান ভূমিষ্ট হয়েছে হে অমুক, এ সন্তান তোমার। সেই মহিলা ইচ্ছেমতো যে কারো নাম নিতে পারতো এবং যার নাম নেয়া হতো, নবজাত শিশুকে তার সন্তান হিসাবে সবাই মেনে নিতো।

চতুর্থত, বহুলোক একত্রিত হয়ে একজন মহিলার কাছে যেতো। সেই মহিলা যে কোন ইচ্ছুক পুরুষকেই বিমুখ করতো না বা ফিরিয়ে দিতো না। এরা ছিলো পতিতা। এরা নিজেদের ঘরের সামনে একটা পতাকা টানিয়ে রাখতো। ফলে ইচ্ছে মতো যে কেউ বিনা বাধায় তাদের কাছে যেতে পারতো। এ ধরনের মহিলা গর্ভবতী হলে এবং সন্তান প্রসব করলে যারা তার সাথে মিলিত

হয়েছিলো তারা সবাই হাযির হতো এবং একজন বিশেষজ্ঞকে ডাকা হতো। সেই বিশেষজ্ঞ তার অভিমত অনুযায়ী সন্তানটিকে কারো নামে ঘোষণা করতো। পরবর্তী সময়ে সেই শিশু ঘোষিত ব্যক্তির সন্তান হিসাবে বড় হতো এবং কখনো সে ব্যক্তি সন্তানটিকে অস্বীকার করতে পারত না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পর আল্লাহ তায়ালা জাহেলি সমাজের সকল প্রকার বিবাহ প্রথা বাতিল করে ইসলামী বিবাহ প্রথা প্রচলন করলেন।১

আরবে নারী পুরুষের সম্পর্ক অনেক সময় তলোয়ারের ধারের মাধ্যমে নির্ণিত হতো। গোত্রীয় যুদ্ধে বিজয়ীরা পরাজিত গোত্রের মহিলাদের বন্দী করে নিয়ে নিজেদের হারেমে অন্তরীণ রাখতো। এ ধরনের বন্দিনীর গর্ভজাত সন্তানেরা সমাজে কখনোই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারত না। তারা সব সময় আত্মপরিচয় দিতে লজ্জা অনুভব করতো।

জাহেলি যুগে একাধিক স্ত্রী রাখা কোন দোষণীয় ব্যাপার ছিলো না। সহোদর দুই বোনকেও অনেকে একই সময়ে স্ত্রী হিসাবে ঘরে রাখতো। পিতার তালাক দেয়া স্ত্রী অথবা পিতার মৃত্যুর পর সন্তান তার সৎ মায়ের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতো। তালাকের অধিকার ছিলো শুধুমাত্র পুরুষের এখতিয়ারে। তালাকের কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট ছিলো না।২

ব্যভিচার সমাজের সর্বস্তরে প্রচলিত ছিলো। কোন শ্রেণীর নারী-পুরুষই ব্যভিচারের কদর্যতা ও পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত ছিলো না। অবশ্য কিছুসংখ্যক নারী-পুরুষ এমন ছিলো যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকার কারণে এ থেকে বিরত থাকতো। এছাড়া স্বাধীন মহিলাদের অবস্থা তুলনামূলকভাবে দাসীদের চেয়ে ভালো ছিলো। দাসীদের অবস্থা ছিলো সবচেয়ে খারাপ। জাহেলি যুগের অধিকাংশ পুরুষ দাসীদের সাথে মেলামেশায় দোষ এবং লজ্জা মনে করত না। সুনানে আবু দাউদে উল্লেখ রয়েছে যে, একজন লোক দাঁড়িয়ে একদা বললো, হে আল্লাহর রসূল, অমুক আমার পুত্র সন্তান। জাহেলি যুগে আমি তার মায়ের সাথে মিলিত হয়েছিলাম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইসলামে এ ধরনের দাবীর কোন সুযোগ নেই। এখন তো সন্তান সেই ব্যক্তির মালিকানাধীন, যার স্ত্রী বা স্বামী হিসাবে সেই মহিলা পরিচিতা। আর ব্যভিচারীর জন্যে রয়েছে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুর শাস্তি। হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং আবদ ইবনে জাময়ার মধ্যে জাময়ার দাসীর পুত্র আবদুর রহমান ইবনে জাময়ার বিষয়ে যে ঝগড়া হয়েছিলো, সেটা তো সর্বজনবিদিত।৩ জাহেলি যুগে পিতা পুত্রের সম্পর্কও ছিলো বিভিন্ন রকমের। কিছু লোক ছিলো এমন যারা বলতো, আমাদের সন্তান আমাদের কলিজার মতো যারা মাটিতে চলাফেরা করে।

অন্যদিকে কিছু লোক এমন ছিলো, যারা অপমান এবং দারিদ্র্যের ভয়ে কন্যা সন্তানকে জীবিত মাটিতে প্রোথিত করতো। শিশু সন্তানদের শৈশবেই মেরে ফেলতো।

পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে।৪ এ অবস্থা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিলো কিনা তা বলা মুশকিল। কেননা আরবের লোকেরা শত্রুদের মোকাবেলা এবং আত্মরক্ষার জন্যে অন্যান্য জাতির চেয়ে বেশিসংখ্যক জনশক্তির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতো। এ ব্যাপারে তারা যথেষ্ট সচেতন ছিলো বলা যায়।

সহোদর ভাইয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক, চাচাতো ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক এবং গোত্রের অন্যান্য লোকদের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক যথেষ্ট মযবুত ছিলো। কেননা আরবের লোকেরা গোত্রীয় শ্রেষ্ঠত্ব এবং অহমিকার জোরেই বাঁচতো এবং মরতো। গোত্রের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সহমর্মিতা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিলো। গোত্রীয় সম্পর্কের ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপিত ছিলো।

তারা এ দৃষ্টিভঙ্গি লালন করতো যে, ভাইয়ের সাহায্য করো, সে অত্যাচারী বা অত্যাচারিত যা কিছুই হোক। পরবর্তীকালে ইসলাম অত্যাচারীকে তার অত্যাচার থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করেছিলো। প্রভুত্ব ও সর্দারীর চেষ্টায় কোনো গোত্রের একজন লোকের সমর্থনে

১. সহীহ বোখারী, কেতাবুন নেকাহ, ২য় খন্ড, পৃ. ৭৬৯ আবু দাউদ 'বাবে ওজুহুন নেকাহ' (বিস্তারিত বিবরণের জন্যে তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন ১৪ নং খন্ড দেখুন)
২. আবু দাউদ, তাফসীর গ্রন্থাবলী, 'আত তালাক মাররাতান' দ্রষ্টব্য
৩. সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৯৯৯, ১০৬৫, আবু দাউদ।
৪. সূরা আনআম, আয়াত ১০১, সূরা নাহল আয়াত ৫৮-৫৯, সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৩১, ৮১, সূরা আনফাল।

গোত্রের অন্য সব লোক যুদ্ধের জন্যে বেরিয়ে পড়তো। উদাহরণস্বরূপ আওস-খাজরায আবস-জুবয়ান, বকর-তাগলাব প্রভৃতি গোত্রের ঘটনা উল্লেখ করা যায়।

বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্পর্কের এতো অবনতি হয়েছিলো যে, গোত্রসমূহের সমস্ত শক্তি পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যয়িত হতো। দ্বীনী শিক্ষার কিছুটা প্রভাব এবং সামাজিক রুসম-রেওয়াজের কারণে অনেক সময় যুদ্ধের বিভীষিকা ও ভয়াবহতা কম হতো। অনেক সময় সমাজে প্রচলিত কিছু নিয়ম কানুনের অধীনে বিভিন্ন গোত্র মৈত্রী বন্ধনেও আবদ্ধ হতো। এছাড়া নিষিদ্ধ মাসসমূহ পৌত্তলিকদের জীবনে শান্তি স্থাপন এবং তাদের জীবিকা অর্জনে বিশেষ সহায়ক প্রমাণিত হতো।

মোটকথা সামাগ্রিক অবস্থা ছিলো চরম অবনতিশীল। মূর্খতা ছিলো সর্বব্যাপী। নোংরামী ও পাপাচার ছিলো চরমে। মানুষ পশুর মতো জীবন যাপন করতো। মহিলাদের বেচাকেনার নিয়ম প্রচলিত ছিলো। মহিলাদের সাথে অনেক সময় এমন আচরণ করা হতো যেন তারা মাটি বা পাথর। পারস্পরিক সম্পর্ক ছিলো দুর্বল এবং ভঙ্গুর। সরকার বা প্রশাসন নামে যা কিছু ছিলো তা প্রজাদের কাছ থেকে অর্থ সম্পদ সংগ্রহ করে কোষাগার পূর্ণ করা এবং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সৈন্য সমাবেশের কাজে নিয়োজিত থাকতো।

অর্থনৈতিক অবস্থা

অর্থনেতিক অবস্থা ছিলো সামগ্রিক সামাজিক অবস্থার অধীন। আরবদের জীবিকার উৎসের কথা চিন্তা করলে দেখা যায় যে, ব্যবসা-বাণিজ্যই ছিলো তাদের জীবনের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের প্রধান মাধ্যম। বাণিজ্যিক আদান-প্রদান সম্ভব ছিলো না। জাযিরাতুল আরবের অবস্থা এমন ছিলো যে, নিষিদ্ধ মাসসমূহ ছাড়া শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ অন্য কোন সময় বিদ্যমান ছিলো না। একারণেই জানা যায় যে, নিষিদ্ধ মাসসমূহেই আরবের বিখ্যাত বাজার ওকায, যিল মাযায, মাযনা প্রভৃতি মেলাগুলো বসতো।

শিল্পক্ষেত্রে আরবরা ছিলো বিশ্বের অন্য সকল দেশের পেছনে। কাপড় বুনন, চামড়া পাকা করা ইত্যাদি যেসব শিল্পের খবর জানা যায়, তার অধিকাংশই হতো প্রতিবেশী দেশ ইয়েমেনে। সিরিয়া ও হীরা বা ইরাকে। আরবের ভেতরে খেত-খামার এবং ফসল উৎপাদনের কাজ চলতো। সমগ্র আরবে মহিলারা সূতা কাটার কাজ করতো। কিন্তু মুশকিল ছিলো এই যে, সূতা কাটার উপকরণ থাকতো যুদ্ধের বিভীষিকায় দুর্লভ। দারিদ্র্যতা ছিলো একটি সাধারণ সমস্যা। প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য এবং পোশাক থেকে মানুষ প্রায়ই বঞ্চিত থাকতো।

চারিত্রিক অবস্থা

এটা স্বীকৃত সত্য যে, আরবের লোকদের মধ্যে ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় অভ্যাসসমূহ পাওয়া যেতো এবং এমন সব কাজ তারা করতো, যা বিবেক বুদ্ধি মোটেই অনুমোদন করত না। তবে তাদের মধ্যে এমন কিছু চারিত্রিক গুণও ছিলো, যা রীতিমত বিস্ময়কর। নীচে সেসব গুণাবলীর কিছু বিবরণ উল্লেখ করা যাচ্ছে।

এক) দয়া ও দানশীলতা। এটা ছিলো তাদের একটা বিশেষ গুণ। এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব লক্ষ্য করা যেতো। এ গুণের ওপর তারা এতো গর্ব করতো যে, আরবের অর্ধেক মানুষই কবি হয়ে গিয়েছিলো। এ ব্যাপারে কেউ নিজের এবং কেউ অন্য কারো প্রশংসা করতো। কখনো এমন হতো যে, প্রচন্ড শীত এবং অভাবের সময়েও হয়তো কারো বাড়িতে মেহমান এলো। সেই সময় গৃহস্বামীর কাছে একটা মাত্র উটই ছিলো সম্বল। গৃহস্বামী আতিথেয়তা করতে সেই উটই যবাই করে দিতো। দয়া এবং উদারতার কারণেই তারা মোটা অংকের আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করে নিতো এবং সে ক্ষতি যথারীতি আদায় করতো। এমনিভাবে মানুষকে ধ্বংস এবং রক্তপাত থেকে রক্ষা করে অন্যান্য ধনী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তির ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে গর্ব করতো।

এ ধরনের দানশীলতার কারণেই দেখা যেতো যে, তারা মদ পান করায় গর্ব অনুভব করতো। মদ পান প্রকৃতপক্ষে কোন ভাল কাজ ছিলো না; কিন্তু এতে তারা উদার হতে পারতো এবং দান-খয়রাত করা তাদের জন্যে সহজ হতো। কেননা নেশার ঘোরে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা মানুষের জন্যে কষ্টকর হয় না। এ কারণে আরবের লোকেরা মদ তৈরীর উপকরণ আঙ্গুরের গাছকে 'করম' এবং মদকে 'বিনতুল করম' বলে অভিহিত করতো। জাহেলি যুগের কবিদের কবিতার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তারা গর্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট মনোযোগী ছিলো।

আনতারা ইবনে শাদ্দাদ আবসী তার রচিত মোয়াল্লাকায় লিখেছেন, 'দুপুরের প্রখর রোদ কমে যাওয়ার পর আমি একটি কারুকার্য খচিত পীত রঙের পাত্র থেকে মদ পান করলাম। যখন আমি মদ পান করি, তখন আমার অর্থ-সম্পদ দান করে ফেলি। কিন্তু এ সময়ও আমি নিজের ইযযত আব্রু সম্পর্কে সচেতন থাকি। ওতে কোন দাগ রাখতে দেই না। জ্ঞান ফিরে আসার পরও আমি দানশীলতার ক্ষেত্রে কোন কার্পণ্য করি না। আমার চারিত্রিক সৌন্দর্য এবং দয়া সম্পর্কে তোমাদের কি আর বলবো, সেটাতো তোমাদের অজানা নয়।'

দয়াশীলতার কারণেই আরবের লোকেরা ঢালাওভাবে জুয়া খেলতো। তারা মনে করতো যে, এটা দানশীলতার একটা পথ। কেননা জুয়া খেলার পর জুয়াড়িয়া যা লাভ করতো অথবা লাভ থেকে খরচের পর যা বেঁচে যেতো, সেসব তারা গরীব দুঃখীদের মধ্যে দান করে দিতো। এ কারণেই পবিত্র কোরআনে মদ এবং জুয়ার উপকারের কথা অস্বীকার করা হয়নি। বরং বলা হয়েছে যে, এ দু'টোর উপকারের চেয়ে অপকার বেশি। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'লোকে তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বল, উভয়ের মধ্যে মহাপাপ এবং মানুষের জন্যে উপকারও আছে। কিন্তু এদের পাপ উপকারের চাইতে বেশী। (২১৯, ৬)

দুই) অংগীকার পালন। আরবের লোকেরা অংগীকার পালনকে ধর্মের অংশ বলে মনে করতো। অংগীকার পালন বা কথা রাখতে গিয়ে তারা জানমালের ক্ষতিকেও তুচ্ছ মনে করতো। এটা বোঝার জন্যে হানি ইবনে মাসুদ শায়বানি, সামোয়াল ইবনে আদীয়া এবং হাজের ইবনে জারারার ঘটনাগুলোই যথেষ্ট।

তিন) আত্মমর্যাদা সচেতনতা। যুলুম অত্যাচার সহ্য করেও নিজের মর্যাদা বজায় রাখা ছিলো জাহেলি যুগের পরিচিত একটি চারিত্রিক গুণ। এর ফলে তারা বীরত্ব বাহাদুরি প্রকাশ করতো। তাদের ক্রোধ ছিলো অসামান্য, হঠাৎ করেই তারা ক্ষেপে যেতো। অবমাননার সামান্য লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া গেলেই তারা অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে এবং রক্তপাত ঘটাতো। এ ব্যাপারে তারা নিজের জীবনকে তুচ্ছ মনে করতো।

চার) প্রতিজ্ঞা পালনে জাহেলী যুগের লোকদের একটা বৈশিষ্ট ছিলো এই যে, কোন কাজ করতে প্রতিজ্ঞা করলে সে কাজ থেকে তারা কিছুতেই দূরে থাকতো না। কোন বাধাই তারা মানত না। জীবন বিপন্ন হলেও সে কাজ তারা সম্পাদন করতো।

পাঁচ) সহিষ্ণুতা এবং দূরদর্শীতামূলক প্রজ্ঞা। এটাও ছিলো আরবদের একটা মহৎ গুণ। কিন্তু বীরত এবং যুদ্ধের জন্যে সব সময় তৈরী থাকার কারণে এ গুণ তাদের মধ্যে ছিলো দুর্লভ।

ছয়) বেদুইন সুলভ সরলতা। তারা সভ্যতার উপকরণ থেকে দূরে অবস্থান করতো এবং এক্ষেত্রে তাদের অনীহা ছিলো। এই ধরনের সহজ সরল জীবন যাপনের কারণে তাদের মধ্যে সত্যবাদিতা এবং আমানতদারী পাওয়া যেতো। প্রতারণা, অংগীকার ভঙ্গ এসবকে তারা ঘৃণা করতো।

আমরা মনে করি যে, জাযিরাতুল আরবের সাথে সমগ্র বিশ্বের যে ধরনের ভৌগোলিক অবস্থান ছিলো, সেটা ছাড়া উল্লিখিত চারিত্রিক গুণাবলীর কারণেই তাদেরকে মানব জাতির নেতৃত্ব এবং নবুয়তের জন্যে মনোনীত করা হয়েছিলো। এসব গুণাবলীর কারণে হঠাৎ করে যদিও তারা ভয়ংকর হয়ে উঠতো এবং অঘটন ঘটাতো, তবু এ কথা অস্বীকার করা যাবে না যে, এসব গুণাবলী ছিলো অত্যন্ত প্রশংসনীয় প্রকৃত মানবিক গুণ। সামান্য সংশোধনের পর এসব গুণ মানুষের জন্যে মহাকল্যাণকর প্রমাণিত হতে পারে। ইসলাম সেই কাজ সম্পাদন করেছে।

সম্ভবত উল্লিখিত চারিত্রিক গুণাবলীর মধ্যে অংগীকার পালনের পর আত্মমর্যাদাবোধ এবং প্রতিজ্ঞা পালন ছিলো সবচেয়ে মূল্যবান এবং প্রশংসনীয়। এইসব গুণাবলী এবং চারিত্রিক শক্তি ছাড়া বিশৃংখলা, অশান্তি ও অকল্যাণ দূর করে ন্যায়নীতি ও সুবিচারমূলক ব্যবস্থার বাস্তবায়ন অসম্ভব।

জাহেলী যুগে আরবের লোকদের মধ্যে আরো কিছু উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক গুণ ছিলো কিন্তু এখানে সবগুলো আলোচনা করার প্রয়োজন নেই।

তিনিই সেই মহান সত্বা, যিনি তাদের সাধারণ জনগোষ্ঠী থেকে তাদেরই একজনকে রসূল করে পাঠিয়েছেন। সে তাদের আল্লাহর আয়াতসমূহ পড়ে শোনাবে, তাদের জীবনকে (জাহেলিয়াত থেকে) পবিত্র করবে, সর্বোপরি তাদের (দ্বীনের) কৌশল শিক্ষা দেবে, অথচ এই লোকগুলোই (সে আসার) আগে (পর্যন্ত) এক সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিলো।

(সূরা জুমুয়া ২)

কোন্ বংশে সেই সোনার মানুষ

আল আমীন থেকে আর রাসূল

নবী পরিবারের পরিচয়

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধারাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম অংশের নির্ভুলতার ব্যাপারে সীরাত রচয়িতা এবং বংশধারা বিশেষজ্ঞরা একমত। দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে সীরাত রচয়িতাদের মাঝে কিছু মতভেদ রয়েছে। কেউ সমর্থন, কেউ বিরোধিতা আবার কেউ ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। এটি আদনান থেকে ওপরের দিকে হযরত ইবরাহীম (আ.) পর্যন্ত। তৃতীয় অংশে নিশ্চিত কিছু ভুল রয়েছে, এটি হযরত ইবরাহীম (আ.) থেকে হযরত আদম (আ.) পর্যন্ত। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে। নিচে তিনটি অংশ সম্পর্কে মোটমুটি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাচ্ছে।

প্রথম অংশ

মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ, ইবনে আবদুল মোত্তালেব (শায়বা) ইবনে হাশেম (আমর) ইবনে আবদ মাননাফ (মুগীরা) ইবনে কুসাই (যায়েদ) ইবনে কেলাব ইবনে মাররা, ইবনে কা'ব ইবনে লোয়াই ইবনে গালেব ইবনে ফাহার, (এর উপাধিই ছিলো কোরায়শ এবং কোরায়শ গোত্র নামেই পরিচিত) ইবনে মালেক ইবনে নযর কায়েস ইবনে কেনানা ইবনে খোযায়মা ইবনে মাদরেকা (আমের) ইবনে ইলিয়াস ইবনে মোদার ইবনে নাযার ইবনে মায়া'দ ইবনে আদনান।[১]

দ্বিতীয় অংশ

আদনান থেকে ওপরের দিকে। অর্থাৎ আদনান ইবনে আওফ ইবনে হামিছা ইবনে ছালামান ইবনে আওছ ইবনে পোজ, ইবনে কামোয়াল ইবনে উবাই ইবনে আওয়াম ইবনে নাশেদ ইবনে হাজা ইবনে বালদাস ইবনে ইয়াদলাফ ইবনে তারেখ ইবনে জাহেম ইবনে নাহেশ, ইবনে মাখি, ইবনে আয়েয, ইবনে আবকার, ইবনে ওবায়েদ, ইবনে আদদায়া, ইবনে হামদান, ইবনে সুনবর, ইবনে ইয়াসরেবী, ইবনে ইয়াহাজান, ইবনে ইয়ালহান ইবনে আরউই ইবনে আই ইবনে যায়শান ইবনে আইশার ইবনে আফনাদ ইবনে আইহাম ইবনে মাকছার ইবনে নাহেছ ইবনে জারাহ ইবনে সুমাই ইবনে মাযি ইবনে আওযা ইবনে আরাম ইবনে কায়দার ইবনে ইসমাইল ইবনে ইবরাহীম।[২]

তৃতীয় অংশ

হযরত ইবরাহীম (আ.) থেকে ওপরের দিকে। ইবরাহীম ইবনে তারাহ (আযর) ইবনে নাহুব ইবনে ছারদা (সারুগ) ইবনে রাউ ইবনে ফালেজ ইবনে আবের ইবনে শালেখ ইবনে আরফাখশাদ ইবনে সাম ইবনে নূহ (আ.) ইবনে লামেক ইবনে মাতুশালাখ ইবনে আখনুখ (মতান্তরে হযরত ইদরিস (আ.) ইবনে ইয়াদ ইবনে মাহলায়েল ইবনে কায়নান ইবনে আনুশা, ইবনে শীশ ইবনে আদম (আ.)।[৩]

---

১. ইবনে হিশাম ১ম খন্ড, পৃ. ২০. তালকীহে ফুহ্মে আহলুল আছার পৃ. ৫, ৬, রহমাতুললিল আলামিন ২য় খন্ড, পৃ. ১১, ১৪, ৫২

২. আল্লামা মনুসরপুরী দীর্ঘ গবেষণার পর এ অংশ ঐতিহাসিক কালবি এবং ইবনে সা'দ এর বর্ণনা থেকে সংযোযিত করেছেন। রহমাতুললিল আলামিন, ২য় খন্ড পৃ. ১৪-১৭)। এ অংশের ঐতিহাসিক তথ্যে বেশ পার্থক্য আছে।

৩. ইবনে হিশাম ১ম খন্ড. পৃ. ২, ৪, তালাকীহুল ফুহুম প. ৬ খোলাছাতুছ সীয়ার. পৃ. ৬, রহমাতুল লিল আলামিন ২য় খন্ড. ১৮

নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরদাদা হাশেম ইবনে আবদে মান্নাফের পরিচয়ে হাশেমী বংশোদ্ভুত হিসাবে পরিচিত। কাজেই হাশেম এবং তাঁর পরবর্তী কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় উল্লেখ করা জরুরী।

(এক) হাশেম, ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, বনু আবদে মান্নাফ এবং বনু আবদুদ দারের মধ্যে পদমর্যাদা বন্টনে সমঝোতা হয়েছিলো। এর প্রেক্ষিতে আবদে মান্নাফের বংশধররা হাজীদের পানি পান করানো এবং মেহমানদের আতিথেয়তার মেযবানি লাভ করেন। হাশেম বিশিষ্ট সম্মানিত এবং সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মক্কার হাজীদের সুরুয়া রুটি খাওয়ানোর প্রথা চালু করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিলো আমর। কিন্তু রুটি ছিঁড়ে সুরুয়ায় ভেজানোর কারণে তাঁকে বলা হতো হাশেম। হাশেম অর্থ হচ্ছে যিনি ভাঙ্গেন। হাশেমই প্রথম মানুষ, যিনি কোরায়শদের গ্রীষ্ম এবং শীতে দু'বার বাণিজ্যিক সফরের ব্যবস্থা করেন। তাঁর প্রশংসা করে কবি লিখেছেন, 'তিনি সেই আমর, যিনি দুর্ভিক্ষ পীড়িত দুর্বল স্বজাতিকে মক্কায় রুটি ভেঙ্গে ছিঁড়ে সুরুয়ায় ভিজিয়ে খাইয়েছিলেন এবং শীত ও গ্রীষ্মে দু'বারের সফরের ব্যবস্থা করেছিলেন।

হাশেম বা আমরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই যে, তিনি ব্যবসার জন্যে সিরিয়া সফরে গিয়েছিলেন। যাওয়ার পথে মদীনায় পৌঁছে বনি নাজ্জার গোত্রের সালমা বিনতে আমরের সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন এবং কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন। গর্ভবতী হওয়ার পর স্ত্রীকে পিত্রালয়ে রেখে তিনি সিরিয়ায় রওয়ানা হন। ফিলিস্তিনের গাযা শহরে গিয়ে তিনি ইন্তেকাল করেন। এদিকে সালমার একটি সন্তান ভূমিষ্ট হয়। এটা ৪৯৭ ঈসায়ী সালের ঘটনা। শিশুর মাথার চুলে ছিলো শুভ্রতার ছাপ, এ কারণে সালমা তার নাম রাখেন শায়বা।[৪] ইয়াসরেব বা মদীনায় সালমা তার পিত্রালয়েই সন্তান প্রতিপালন করেন। পরবর্তীকালে এই শিশুই আবদুল মোত্তালেব নামে পরিচিত হন। দীর্ঘকাল যাবত হাশেমী বংশের লোকেরা এ শিশুর সন্ধান পায়নি। হাশেমের মোট চার পুত্র পাঁচ কন্যা ছিলো। পুত্রদের নাম নিম্নরূপ: আসাদ, আবু সায়ফি, নাযলা, আবদুল মোত্তালেব। আর কন্যাদের নাম হলো: শাফা, খালেদা, যঈফা, রোকাইয়া এবং যিন্নাত।[৫]

(দুই) আবদুল মোত্তালেব, ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাজীদের পানি পান করানো এবং মেহমানদারী করার দায়িত্ব হাশেমের পর তাঁর ভাই মোত্তালেব পেয়েছিলেন। তিনিও ছিলেন তাঁর পরিবার ও কওমের মধ্যে অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন। তিনি কোন কথা বললে সে কথা কেউ উপেক্ষা করতো না। দানশীলতার কারণে কোরায়শরা তাঁকে 'ফাইয়ায' উপাধি দিয়েছিলো। শায়বা অর্থাৎ আবদুল মোত্তালেব-এর বয়স যখন দশ বারো বছর হয়েছিলো, তখন মোত্তালেব তার খবর পেয়েছিলেন। তিনি শায়বাকে নিয়ে আসার জন্যে মদীনায় গিয়েছিলেন। মদীনা অর্থাৎ ইয়াসরেবের কাছাকাছি পৌঁছার পর শায়বার প্রতি তাকালে তাঁর দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। তিনি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এরপর নিজের উটের পেছনে বসিয়ে মক্কার পথে রওয়ানা হলেন। কিন্তু শায়বা তার মায়ের অনুমতি না নিয়ে মক্কায় যেতে অস্বীকার করলেন। মোত্তালেব যখন শায়বার মায়ের কাছে অনুমতি চাইলেন, তখন শায়বার মা সালমা অনুমতি দিতে অস্বীকার করলেন। মোত্তালেব বললেন, ওতো তার পিতার হুকুমত এবং আল্লাহর ঘরের দিকে যাচ্ছে। একথা বলার পর সালমা অনুমতি দিলেন। মোত্তালেব তাকে নিজের উটের পেছনে বসিয়ে মক্কায় নিয়ে এলেন। মক্কায় নিয়ে আসার পর প্রথমে যারা দেখলো, তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো, ওতো আবদুল মোত্তালেব অর্থাৎ মোত্তালেবের দাস। মোত্তালেব বললেন, না, না, ওতো আমার ভ্রাতুষ্পুত্র, হাশেমের ছেলে। এরপর থেকে শায়বা মোত্তালেবের কাছে বড় হতে থাকেন এবং এক সময় যুবক হন। পরবর্তীকালে মোত্তালেব ইয়েমেনে মারা যান। তাঁর পরিত্যক্ত

৪. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড. পৃ. ১৩৭, রহমাতুল লিল আলামিন, ১ম খন্ড পৃ. ২৬, ২য় খন্ড, পৃ২৪
৫. ঐ ১ম খন্ড. পৃ. ১০৭

পদমর্যাদা শায়বা লাভ করেন। আবদুল মোত্তালেব তাঁর স্বজাতীয়দের মধ্যে এতো বেশি সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেছিলেন যে, ইতিপূর্বে অন্য কেউ এতোটা লাভে সক্ষম হয়নি। স্বজাতির লোকেরা তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতো এবং তাঁকে অভূতপূর্ব সম্মান দিতো।৬

মোত্তালেবের মৃত্যুর পর নওফেল আবদুল মোত্তালেবের কিছু জমি জোর করে দখল করে নেয়। আবদুল মোত্তালেব কোরায়শ বংশের কয়েকজন লোকের কাছ সাহায্য চান। কিন্তু তারা এই বলে অক্ষমতা প্রকাশ করেন যে, আপনার চাচার বিরুদ্ধে আমরা আপনার পাশে দাঁড়াতে পারব না। অবশেষে আবদুল মোত্তালেব বনি নাজ্জার গোত্রে তাঁর মামার কাছে কয়েকটি কবিতা লিখে পাঠান। সেই কবিতায় সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছিলো। জবাবে তাঁর মামা আবু সা'দ ইবনে আদী আশি জন সওয়ার নিয়ে রওয়ানা হয়ে মক্কার নিকটবর্তী আবতাহ নামক জায়গায় অবতরণ করেন। আবদুল মোত্তালেব তাঁকে ঘরে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু আবু সা'দ বললেন, না, আমি আগে নওফেলের সাথে দেখা করতে চাই। এরপর আবু সা'দ নওফেলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। নওফেল সে সময় মক্কার কয়েকজন বিশিষ্ট কোরায়শ এর সাথে বসে কথা বলছিলেন। আবু সা'দ তলোয়ার কোষমুক্ত করে বললেন, এই ঘরের প্রভুর শপথ, যদি তুমি আমার ভাগ্নের জমি ফিরিয়ে না দাও তবে এই তলোয়ার তোমার দেহে ঢুকিয়ে দেব। নওফেল বললেন, আচ্ছা নাও, আমি ফিরিয়ে দিচ্ছি। আবু সা'দ কোরায়শ নেতৃবৃন্দকে সাক্ষী রেখে আবদুল মোত্তালেবকে তাঁর জমি ফিরিয়ে দিলেন। এরপর আবু সা'দ আবদুল মোত্তালেবের ঘরে গেলেন এবং সেখানে তিনদিন অবস্থানের পর ওমরাহ পালন করে মদীনায় ফিরে গেলেন।

এরপর নওফেল বনি হাশেমের বিরুদ্ধে বনি আবদে শামসের সাথে সহায়তার অংগীকার করলো।

এদিকে বনু খোজায়া গোত্র লক্ষ্য করলো যে, বনু নাজ্জার আবদুল মোত্তালেবকে এভাবে সাহায্য করলো। তখন তারা বললো, আবদুল মোত্তালেব তোমাদের যেমন তেমনি সে আমাদেরও সন্তান। কাজেই আমাদের ওপর তার সাহায্য করার অধিক অধিকার রয়েছে। এর কারণ ছিলো এই যে, আবদে মান্নাফের মা বনু খোজায়া গোত্রের সাথে সম্পর্কিত ছিলো। এ কারণে বনু খোজায়া 'দারুন নাদওয়ায়' গিয়ে বনু আবদে শামস এবং বনু নওফেলের বিরুদ্ধে বনু হাশেমের কাছ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করলো। এই প্রতিশ্রুতিই পরবর্তী সময়ে ইসলামী যুগে মক্কা বিজয়ের কারণ হয়েছিলো। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পরে উল্লেখ করা হবে।৭

কাবাঘরের সাথে সম্পর্কিত থাকার কারণে আবদুল মোত্তালেবের সাথে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিলো। একটি হচ্ছে যমযম কূপ খনন, অন্যটি হাতী যুদ্ধের ঘটনা।

যমযম কূপের খনন কাজ

এই ঘটনার সারমর্ম এই যে, আবদুল মোত্তালেব স্বপ্নে দেখলেন যে, তাঁকে যমযম কূপ খননের আদেশ দেয়া হচ্ছে। স্বপ্নের মধ্যেই তাকে জায়গাও দেখিয়ে দেয়া হলো। ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর তিনি যমযম কূপ খনন শুরু করলেন। পর্যায়ক্রমে দু'টি জিনিস আবিষ্কৃত হলো। এগুলো বনু জোরহাম গোত্র মক্কা থেকে চলে যাওয়ার সময় যমযমের ভেতর ফেলে দিয়েছিলো। এগুলো হচ্ছে তলোয়ার, অলংকার এবং সোনার দু'টি হরিণ। আবদুল মোত্তালেব উদ্ধারকৃত তলোয়ার দিয়ে কাবার দরোজা লাগালেন। সোনার দু'টি হরিণও দরোজায় ফিট করলেন এবং হাজীদের যমযম কূপের পানি পান করানোর ব্যবস্থা করলেন।

---

৬. ইবনে হিশাম ১ম খন্ড, পৃ. ১৩৭, ১৩৮

৭. মুখতাছার সীরাতে রাসূল, শায়খুল ইসলাম মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব নজদী, পৃ. ৪১-৪২

যমযম কূপ আবিষ্কৃত হওয়ার পর কোরায়শরা আবদুল মোত্তালেবের সাথে ঝগড়া শুরু করলো। তারা দাবী করলো যে, আমাদেরও খনন কাজে যুক্ত করা হোক। আবদুল মোত্তালেব বললেন, আমি সেটা করতে পারি না। আমাকেই এ কাজের জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু কোরায়শরা মানতে চাইলো না। অবশেষে ফয়সালার জন্যে সবাই বনু সা'দ গোত্রের একজন জ্যোতিষী মহিলার কাছ গেলে। কিন্তু যাওয়ার পথে তারা কিছু বিস্ময়কর নির্দশন দেখলো। এতে তারা বুঝতে পারলো যে, কুদরতীভাবেই যমযম কূপ খননের দায়িত্ব আবদুল মোত্তালেবকে দেয়া হয়েছে। তাই বিবাদকারী কোরাশয়রা পথ থেকেই ফিরে এলো। এই সময়েই আবদুল মোত্তালেব মানত করেছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা যদি তাকে দশটি পুত্র দেন এবং তারা নিজেদের রক্ষার মতো বয়সে উন্নীত হয়, তবে একজনকে কাবার পাশে আল্লাহর নামে কোরবানী করবেন।৮

হস্তী যুদ্ধের ঘটনা

দ্বিতীয় ঘটনার সারমর্ম এই যে, আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশীর পক্ষ থেকে আবরাহা সাবাহ হাবশী ইয়েমেনের গভর্ণর জেনারেল ছিলো। আবরাহা লক্ষ্য করলো যে, আরবের লোকেরা কাবাঘরে হজ্জ পালনের জন্যে যাচ্ছে। এটা দেখে সে সনয়ায় একটি গীর্জা তৈরী করলো। সে চাচ্ছিলো যে, আরবের লোকেরা হজ্জ পালনের জন্যে মক্কায় না গিয়ে সনয়ায় যাবে। এ খবর জানার পর বনু কেনানা গোত্রের একজন লোক আবরাহার নির্মিত গীর্জার ভেতর প্রবেশ করে গীর্জার মেহরাবে পায়খানা করে এলো। আবরাহা এ খবর পেয়ে ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে ষাট হাজার দুর্ধর্ষ সৈন্য নিয়ে কাবাঘর ধ্বংস করতে অগ্রসর হলো। নিজের জন্যে সে একটি বিশাল হাতী ব্যবস্থা করলো। তার বাহিনীতে মোট নয় বা তেরোটি হাতী ছিলো। আবরাহা ইয়েমেন থেকে মোগাম্মাস নামক জায়গায় পৌঁছে সৈন্যদের বিন্যস্ত করলো। মক্কায় প্রবেশের পর মোযদালেফা এবং মিনার মধ্যবর্তী মোহাস্‌সের প্রান্তরে পৌঁছুলে সব হাতী বসে পড়লো। অনেক চেষ্টার পরও কাবার দিকে যাওয়ার জন্যে হাতীকে উঠানো সম্ভব হলো না। চেষ্টা করলে হাতী উঠে উত্তর, দক্ষিণ বা পূর্ব দিকে দৌড়াতে শুরু করতো। কিন্তু কাবার দিকে নেয়ার চেষ্টা করলেই বসে পড়তো। এ সময় আল্লাহ তায়ালা এক পাল চড়ুই পাখি প্রেরণ করলেন। পাখিরা মুখে ছোট ছোট পাথর বহন করছিলো। এসব পাথর তারা সৈন্যদের ওপর নিক্ষেপ করলো। এর মাধ্যমে আবরাহার সেনাদল ভূষির মতো নাস্তানাবুদ হয়ে গেলো। চড়ুই পাখিগুলো ছিলো আবাবিলের মতো। প্রতিটি পাখি তিনটি পাথর বহন করছিলো। একটি মুখে, অন্য দু'টি দুই পাখার নীচে। পাথরগুলো ছিলো মটরশুঁটির মত। যার গায়ে সে পাথর পড়তো, তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ খসে পড়তে শুরু করতো এবং সে মরে যেতো। প্রত্যেকের গায়ে এ পাথর পড়েনি। কিন্তু সেনাদলের মধ্যে এমন আতঙ্ক এবং বিভীষিকা সৃষ্টি হলো যে, সবাই এলোপাতাড়ি পালাতে শুরু করলো। এরপর তারা এখানে সেখানে পড়ে মরতে লাগলো। এদিকে আবরাহার ওপর আল্লাহ তায়ালা এমন গযব নাযিল করলেন যে, তার হাতের আঙ্গুল খসে পড়তে শুরু করলো। সনয়ায় পৌঁছুতে পৌঁছুতে তার মৃত্যু ঘনিয়ে এলো। কলিজা ফেটে বাইরে এসে মর্মান্তিকভাবে সে মৃত্যুবরণ করলো।

আবরাহার এ হামলার সময় মক্কার অধিবাসীরা প্রাণভয়ে পাহাড়ে প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়লো এবং পাহাড়ের গুহায় গিয়ে আত্মগোপন করলো। সেনাদলের ওপর আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ হলে তারা নিশ্চিন্তে নিজ নিজ বাড়িঘরে ফিরে গেলো।৯

উল্লিখিত ঘটনা অধিকাংশ সীরাত রচয়িতার অভিমত অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্মের পঞ্চাশ বা পঞ্চান্ন দিন আগে ঘটে। সেটি ছিলো মহররম মাস। ৫৭১ ঈসায়ী সালের ফেব্রুয়ারীর শেষ বা মার্চের শুরুতে এ ঘটনা ঘটেছিলো। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা তাঁর

---

৮. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ১৪২-১৪৭

৯. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৩, ৫৬

নবী এবং তাঁর পবিত্র ঘর কাবা শরীফকে কেন্দ্র করে এর ভূমিকাস্বরূপ এ ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। যেমন ৫৮৭ সালে বখতে নসর বায়তুল মাকদেস দখল করেছিলো। এর আগে ৭০ সালে রোমকরা বায়তুল মাকদেস অধিকার করেছিলো। পক্ষান্তরে কাবার ওপর খৃস্টানরা কখনোই আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি। অথচ সে সময় ঈসায়ী বা খৃস্টানরা ছিলো আল্লাহ বিশ্বাসী মুসলমান এবং কাবার অধিকারীরা ছিলো পৌত্তলিক।

হস্তীযুদ্ধের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরপরই অল্প সময়ের মধ্যেই তদনীন্তন উন্নত দেশ হিসাবে পরিচিত রোম এবং পারস্যে এ খবর পৌঁছে গিয়েছিলো। কেননা মক্কার সাথে রোমকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিলো। অন্যদিকে রোমকদের ওপর পারসিকদের সব সময় নযর থাকতো। রোমক এবং তাদের শত্রুদের যাবতীয় ঘটনা পারস্য বা পারসিকরা পর্যবেক্ষণ করতো। তাই দেখা যায় যে, আবরাহার পতনের পর পরই পারস্যবাসীরা ইয়েমেন দখল করে নেয়। সে সময়কার বিশ্বে পারস্য এবং রোম উন্নত ও সভ্য দেশ হিসাবে পরিচিত থাকায় বিশ্ব মানবের দৃষ্টি কাবার প্রতি নিবদ্ধ হলো। কাবাঘরের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ তারা প্রত্যক্ষ করলো। তারা বুঝতে পারলো যে, এই ঘরকে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র ঘর হিসাবে মনোনীত করেছেন। কাজেই মক্কার জনপদ থেকে নবুয়তের দাবীসহ কারো উত্থান অবশ্য সমীচীন। এদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী পৌত্তলিকদের আল্লাহ তায়ালা কেন সাহায্য করেছিলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের কথা চিন্তা করলে তা বুঝতে মোটেও অসুবিধা হয় না।

আবদুল মোত্তালেবের পুত্র ছিলো দশজন। তারা হলো: হারেস, যোবায়ের, আবু তালেব, আবদুল্লাহ, হামযা, আবু লাহাব, গাইদাক, মাকহুম, সাফার এবং আব্বাস। কেউ কেউ বলেছেন, এগারোজন। একজনের ছিলো কাছাম। কেউ বলেছেন, তেরোজন। একজনের নাম ছিলো আবদুল কাবা, অন্যজন ছিলো হোজাল। যারা দশজন পুত্র বলে উল্লেখ করেছেন তারা বলেন, মুকাওয়ামের আরেক নাম ছিলো আবদুল কাবা আর গাইদাকের আরেক নাম ছিলো হোজাল। কাছাম নামে আবদুল মোত্তালেবের কোন পুত্র ছিলো না। আবদুল মোত্তালেবের কন্যা ছিলো ছয়জন। তাদের নাম, উম্মুল হাকিম (এর অন্য নাম বায়জা), বাররা, আতেকা, সাফিয়া, আরোয়া ও উমাইমা।[১০]

(তিন) আবদুল্লাহ ছিলেন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিতা। আবদুল্লাহর মায়ের নাম ছিলো ফাতেমা। তিনি ছিলেন আমর ইবনে আবেদ ইবনে এমরান ইবনে মাখযুম ইবনে ইবনে ইয়াকজা ইবনে মাররার কন্যা। আবদুল মোত্তালেবের সন্তানদের মধ্যে আবদুল্লাহ ছিলেন সবচেয়ে সুদর্শন, সচ্চরিত্র এবং স্নেহভাজন। তাঁকে বলা হতো যবীহ বা যবাইকৃত। এরূপ বলার কারণ ছিলো এই যে, আবদুল মোত্তালেবের পুত্রদের সংখ্যা দশ হয়ে যাওয়ার পর এবং তারা নিজেদের রক্ষায় সমর্থ হওয়ার মতো বয়সে উন্নীত হওয়ার পর আবদুল মোত্তালেব তাদেরকে নিজের মানতের কথা জানান। সবাই মেনে নেন। এরপর আবদুল মোত্তালেব ভাগ্য পরীক্ষার তীরের গায়ে তাদের সকলের নাম লিখলেন। লেখার পর হোবাল মূর্তির তত্ত্বাবধায়কের হাতে দিলেন। তত্ত্বাবধায়ক লটারি করার পর আবদুল্লাহর নাম উঠলো। আবদুল মোত্তালেব আবদুল্লাহর হাত ধরলেন, ছুরি নিয়ে যবাই করতে কাবাঘরের পাশে নিয়ে গেলেন। কিন্তু সকল কোরায়শ বিশেষত আবদুল্লাহর ভাই আবু তালেব বাধা দিলেন। আবদুল মোত্তালেব বললেন, তোমরা যদি বাধা দাও তবে আমি মানত পূর্ণ করব কিভাবে? তারা পরামর্শ দিলেন যে, আপনি কোন মহিলা সাধকের কাছে গিয়ে এর সমাধান চান। আবদুল মোত্তালেব এক মহিলা সাধকের কাছে গেলেন। সেই সাধক আবদুল্লাহ এবং দশটি উটের নাম লিখে লটারি করার পরামর্শ দিলেন। তবে বললেন,

---

১০.তালকিহুল ফুহুম পৃ. ৮, ৯, রহমাতুল লিল আলামিন ২য় খন্ড, পৃ. ৫৬, ৬৬

যদি আবদুল্লাহর নাম না উঠে তবে দশটি করে উট বাড়াতে থাকবেন, যতোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ খুশি না হন। এরপর যতোটি উটের নাম লটারিতে উঠবে ততোটি যবাই করবেন। আবদুল মোত্তালেব ফিরে গিয়ে কোরা অর্থাৎ লটারি করতে শুরু করলেন। প্রথম দশটিতে আবদুল্লাহর নাম এলো না। এরপর দশটি করে বাড়াতে লাগলেন। একশত উট হওয়ার পর আবদুল্লাহর নাম উঠলো। এরপর আবদুল মোত্তালেব একশত উট যবাই করে সেখানেই ফেলে রাখলেন। মানুষ এবং পশু কারো জন্যে তা নিতে বাধা ছিলো না। এ ঘটনার আগ পর্যন্ত কোরায়শ এবং আরবদের মধ্যে রক্ত ঋণের পরিমাণ ছিলো দশটি উট। কিন্তু এর পর পরিমাণ বাড়িয়ে একশত উট করা হলো। ইসলামও এই পরিমাণ অব্যাহত রাখে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি দুইজন যবীহের সন্তান। একজন হযরত ইসমাইল (আ.) অন্যজন আমার পিতা আবদুল্লাহ।[১১]

আবদুল মোত্তালেব তাঁর পুত্র আবদুল্লাহর বিয়ের জন্যে আমেনাকে মনোনীত করেন। আমেনা ছিলেন ওয়াহাব ইবনে আবদে মান্নাফ ইবনে যোহরা ইবনে কেলাবের কন্যা। এরা বংশ মর্যাদায় কোরায়শদের মধ্যে সর্বোত্তম বলে বিবেচিত হতো। আমেনার পিতা বংশ মর্যাদা এবং আভিজাত্যে বনু যোহরা গোত্রের সর্দার ছিলেন। বিবি আমেনা বিয়ের পর পিত্রালয় থেকে বিদায় নিয়ে স্বামীগৃহে আগমন করেন। কিছুদিন পর আবদুল মোত্তালেব আবদুল্লাহকে খেজুর আনতে মদীনায় পাঠান। আবদুল্লাহ সেখানে ইন্তেকাল করেন।

কোন কোন সীরাত রচয়িতা লিখেছেন যে, আবদুল্লাহ ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়া গিয়েছিলেন। কোরায়শদের একটি বাণিজ্য কাফেলার সাথে মক্কায় ফিরে আসার সময় অসুস্থ হয়ে মদীনায় অবতরণ করে সেখানে ইন্তেকাল করেন। নাবেগা যাআদীর বাড়িতে তাঁকে দাফন করা হয়। সে সময় তাঁর বয়স ছিলো পঁচিশ বছর। অবশ্য অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে রসূল তখনো জন্মগ্রহণ করেননি। কারো কারো মতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্ম তার পিতার ইন্তেকালের দু'মাস আগে হয়েছিলো।[১২]

স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর আমেনা বেদনা মথিত কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন, 'বাতহার যমীন হাশেমের বংশধর থেকে খালি হয়ে গেছে। মৃত্যু তাকে এক ডাক দিয়েছে এবং তিনি 'আমি হাযির' বলেছেন। তিনি রাঙ্গ ও খুরুশের মধ্যবর্তী এক জায়গায় শায়িত রয়েছেন। মৃত্যু এখন ইবনে হাশেমের মতো কোন লোক রেখে যায়নি। সেই বিকেলের কথা মনে পড়ে, যখন তাঁকে লোকেরা খাটিয়ায় তুলে নিয়ে গিয়েছিলো। মৃত্যু যদিও তাঁর অস্তিত্ব মুছে দিয়েছে, কিন্তু তাঁর কীর্তি মুছে দিতে পারবে না। তিনি ছিলেন বড় দাতা এবং দয়ালু।[১৩]

মৃত্যুকালে তিনি যেসব জিনিস রেখে গিয়েছিলেন সেসব হচ্ছে পাঁচটি উট, এক পাল বকরি, একটি হাবশী দাসী। সেই দাসীর নাম ছিলো বরকত, কুনিয়ত ছিলো উম্মে আয়মন। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুধ খাইয়েছিলেন।[১৪]

---

১১. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ১৫১-১৫৫, রহমাতুললিল আলামিন, ২য় খন্ড, পৃ. ৮৯, ৯০, মুখতাছার সীরাতে রাছুল শেখ আবদুল ওয়াহাব নজদী, পৃ. ২২, ২৩

১২ ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ১৫৬, ১৫৮, ফেকহুস সিয়ার, মোহাম্মদ গাযালী, পৃ.. ৪৫, রহমাতুল লিল আলামিন, ২য় খন্ড পৃ. ৯১,

১৩. তাবাকাতে ইবনে সা'দ ১ম খন্ড, পৃ. ৬২

১৪, মুখতাছারুছ সীরাত, শেখ আবদুল্লাহ, পৃ. ১২ তালাকিহুল ফুহুম, পৃ. ১৪, সহীহ মুসলিম ২য় খন্ড পৃ. ৯৬

আল্লাহর রসূলের আবির্ভাব

পবিত্র জীবনের চল্লিশ বছর

তাঁর জন্ম মোবারক

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় বনি হাশেম বংশে ৯ই রবিউল আউয়াল সোমবার জন্মগ্রহণ করেন। সেই বছরেই হাতী যুদ্ধের ঘটনাটি ঘটেছিলো। সে সময় সম্রাট নওশেরওঁয়ার সিংহাসনে আরোহণের চল্লিশ বছর পূর্ণ হয়েছিলো। জন্ম তারিখ ছিলো ২০ বা ২২ শে এপ্রিল। ৫৭১ ঈসায়ী সাল। সাইয়েদ সোলায়মান নদভী, সালমান মনসুরপুী এবং মোহাম্মদ পাশা ফালাকি গবেষণা করে এ তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন।[১]

ইবনে সা'দ-এর বর্ণনায় রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাতা বলেছেন, যখন তিনি জন্ম গ্রহণ করেন তখন দেহ থেকে একটি নূর বের হলো, সেই নূর দ্বারা শামদেশের মহল উজ্জ্বল হয়ে গেলো। ইমাম আহমদ হযরত এরবাজ ইবনে ছারিয়া থেকে প্রায় একই ধরনের একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন।[২]

কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, নবুয়তের পটভূমি হিসেবে আল্লাহর রসূলের জন্মের সময় কিছু কিছু ঘটনা প্রকাশ পেয়েছিলো। কেসরার রাজ প্রাসাদের চৌদ্দটি পিলার ধসে পড়েছিলো। অগ্নি উপাসকদের অগ্নিকুন্ড নিভে গিয়েছিলো। বহিরার গীর্জা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। এটি ছিলো বায়হাকির বর্ণনা। কিন্তু মোহাম্মদ গাযযালী এ বর্ণনা সমর্থন করেননি।[৩]

জন্মের পর তাঁর মা তাঁর দাদা আবদুল মোত্তালেবের কাছে পৌত্রের জন্মের সুসংবাদ দিলেন। তিনি খুব খুশি হলেন এবং সানন্দভাবে তাঁকে কাবাঘরে নিয়ে গিয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া এবং শোকরেয়া আদায় করলেন। এ সময় তিনি তাঁর নাম রাখলেন মোহাম্মদ। এ নাম আরবে পরিচিত ছিলো না। এরপর আরবের নিয়ম অনুযায়ী সপ্তম দিনে খৎনা করালেন।[৫]

মায়ের পর তাঁকে আবু লাহাবের দাসী ছাওবিয়া দুধ পান করান। সে সময় ছাওবিয়ার কোলের শিশুর নাম ছিলো মাছরুহ। ছাওবিয়া তাঁর আগে হামযা ইবনে আবদুল মোত্তালেব এবং তাঁর পরে আবু সালমা সামা ইবনে আবদুল আছাদ মাখজুমিকেও দুধ পান করিয়েছিলেন।[৬]

বনি সা'দ গোত্রে অবস্থান

আরবের শহুরে নাগরিকদের রীতি ছিলো যে, তারা নিজেদের শিশুদের শহরের অসুখ বিসুখ থেকে ভালো রাখার জন্যে দুধ পান করানোর কাজে নিয়োজিত বেদুইন নারীদের কাছে পাঠাতেন।

১.তারিখে খাযরাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৬২, রহমাতুল লিল আলামিন ১ম খন্ড, পৃ. ৩৯, পৃ. ৩৯

২.মুখতাছারুছ সীরাত, শেখ আবদুল্লাহ, পৃ. ১২, ইবনে, সা'দ ১ম খন্ড, পৃ ৬৩

৩. মুখতাছারুছ সীরাত, পৃ. ১২

৫. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ১৫৯, ১৬০, তারীখে খাযরামি ১ম খন্ড, পৃ. ৬২, একটি বর্ণনায় এ কথাও উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি খৎনাকৃত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। (তালকিহুল ফুহুম, পৃ. ৪) ইবনে কাইয়েম বলেছেন, এ সম্পর্কে কোন প্রমাণিত হাদীস দেখা যায়নি। যাদুল মায়াদ, ১ম খন্ড, পৃ. ১৮

৬. তালকিহুল ফুহুম, পৃ. ৪, মুখতাছারুছ সীরাত শেখ আবদুল্লাহ, পৃ. ১৩

এতে শিশুদের দেহ মজবুত এবং শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠতো। এছাড়া এর আরেক উদ্দেশ্য হলো, সেই দুধ পানের সময়েই যেন তারা বিশুদ্ধ আরবী ভাষা শিখতে পারে। এই রীতি অনুযায়ী আবদুল মোত্তালেব ধাত্রীর খোঁজ করে তাঁর দৌহিত্রকে হালিমা বিনতে আবু জুয়াইবের হাতে দিলেন। এই মহিলা ছিলেন বনি সা'দ ইবনে বকরের অন্তর্ভুক্ত। তার স্বামী ছিলো হারেস ইবনে আবদুল ওযযা, ডাক নাম আবু কাবশা। তিনিও ছিলেন বনি সা'দ গোত্রেরই মানুষ।

হারেসের সন্তানরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্পর্কের কারণে তাঁর দুধ ভাই ও বোন ছিলো। তাদের নাম হলো। আবদুল্লাহ, আনিসা, হোযাফা বা জোযামা। হালিমার উপাধি ছিলো শায়মা এবং এই নামেই তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন। তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুকের দুধ খাওয়াতেন। এবং তিনি ছাড়া আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মোত্তালেব, যিনি রসূলুল্লাহর চাচাতো ভাই ছিলেন, তিনিও হালিমার মাধ্যমে তাঁর দুধ ভাই ছিলেন। তাঁর চাচা হামযা ইবনে আবদুল মোত্তালেবও দুধ পানের জন্যে বনু সা'দ গোত্রের একজন মহিলার কাছে ন্যস্ত হয়েছিলেন। বিবি হালিমার কাছে থাকার সময়ে এই মহিলাও একদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুধ পান করিয়েছিলেন। এই হিসাবে তিনি এবং হামযা উভয়ে দুই সূত্রে রেযায়ী ভাই বা দুধ ভাই ছিলেন। (একদিকে ছাওরিয়ার সূত্রে, অন্যদিকে বনু সা'দ গোত্রের এই মহিলার সূত্রে)।[৭]

দুধ পান করানোর সময় হযরত হালিমা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতের এমন ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। বিস্তারিত বিবরণ তাঁর মুখেই শোনা যাক। ইবনে ইসহাকের বর্ণনামতে হযরত হালিমা বলেন, আমি আমার স্বামীর সাথে আমাদের দুগ্ধপোষ্য শিশুসহ বনি সা'দ গোত্রের কয়েকজন মহিলার সঙ্গে নিজেদের শহর ছেড়ে বের হলাম। সেটা ছিলো দুর্ভিক্ষের বছর; চারিদিকে অভাব অনটন। আমি একটি মাদী গাধার পিঠে সওয়ার ছিলাম। আমাদের কাছে একটি উটনিও ছিলো। কিন্তু সেই উটনি এক ফোটাও দুধ দিত না। ক্ষুধার জ্বালায় দুধের শিশু ছটফট করতো। রাতে ঘুমাতে পারতাম না। আমার বুকেও দুধ ছিলো না, উটনিও দুধ দিত না। বৃষ্টি এবং স্বাচ্ছন্দের অপেক্ষায় আমরা দিন কাটাচ্ছিলাম। মাদী গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে বাড়ি থেকে যাওয়ার সময় গাধা এতো ধীরে চলতে লাগলো যে, কাফেলার সবাই বিরক্ত হয়ে গেলো। দুধ পান করানোর জন্যে শিশুর সন্ধানে মক্কায় গেলাম। আমাদের কাফেলার যতো মহিলা ছিলো, সকলের কাছেই আল্লাহর রসূলকে গ্রহণ করতে পেশ করা হলো। কিন্তু পিতৃহীন অর্থাৎ এতিম হওয়ায় সবাই তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো। কেননা সবাই সন্তানের পরিবার থেকে ভালো পারিশ্রমিকের আশা করছিলো। একজন বিধবা মা কি আর দিতে পারবে? এ কারণেই আমরা কেউ তাঁকে নিতে রাযি হইনি।

এদিকে আমাদের কাফেলার প্রত্যেক মহিলাই কোন না কোন শিশু পেয়ে গেলো। আমি কোন শিশুই পেলাম না। ফেরার সময় স্বামীকে বললাম, খালি হাতে ফিরে যেতে ভালো লাগছে না। আমি বরং সেই এতিম শিশুকেই নিয়ে যাই। স্বামী রাযি হলেন। বললেন, হয়তো ওর ওছিলায় আল্লাহ তায়ালা আমাদের বরকত দেবেন। এরপর আমি গিয়ে তাঁকে গ্রহণ করলাম।

হযরত হালিমা (রা.) বলেন, শিশুকে নিয়ে আমি যখন ডেরায় ফিরে এলাম তখন আমার উভয় স্তন ছিলো দুধে পূর্ণ, শিশুটি পেট ভরে দুধ পান করলো। তার সঙ্গে তার দুধ ভাইও পেট ভরে দুধ পান করলো। এরপর উভয়ে স্বস্তির সাথে ঘুমিয়ে পড়লো। অথচ এর আগে আমার সন্তান ক্ষুধার জ্বালায় ঘুমাতে পারত না। এদিকে আমার স্বামী উটনি দোহন করতে গিয়ে লক্ষ্য করলো

---

৭. যাদুল মা'য়াদ, ১ম খন্ড, পৃ. ১৯

তার স্তন দুধে পরিপূর্ণ। তিনি এতো দুধ দোহন করলেন যে, আমরা তৃপ্তির সাথে পান করলাম। বড় আরামে আমরা রাত কাটালাম। সকালে আমার স্বামী বললেন, খোদার কসম, হালিমা, তুমি একটি বরকতসম্পন্ন শিশু গ্রহণ করেছো। আমি বললাম, আমারও তাই মনে হয়।

হালিমা বলেন, এরপর আমাদের কাফেলা রওয়ানা হলো। আমি দুর্বল গাধার পিঠে সওয়ার হলাম। শিশুটি ছিলো আমার কোলে। গাধা এতো দ্রুত পথ চললো যে, সব গাধাকে সে ছাড়িয়ে গেলো। সঙ্গিনী মহিলারা অবাক হয়ে বললো, ও আবু যোবায়েবের কন্যা, এটা কি আশ্চর্য ব্যাপার, আমাদের দিকে একটু তাকাও। যে গাধায় সওয়ার হয়ে তুমি এসেছিলে, এটা কি সেই গাধা? আমি বললাম, হাঁ, সেটিই। তারা বললো, এর মধ্যে নিশ্চয়ই বিশেষ কোন ব্যাপার রয়েছে।

এরপর আমরা বনু সা'দ গোত্রে নিজেদের ঘরে চলে এলাম। আমাদের এলাকার চেয়ে বেশি অভাবগ্রস্ত দুর্ভিক্ষ কবলিত অন্য কোন এলাকা ছিলো কিনা আমি জানতাম না। আমাদের ফিরে আসার পর বকরিগুলো চারণভূমিতে গেলে ভরা পেট ও ভরা স্তনে ফিরে আসতো। আমরা দুধ দোহন করে পান করতাম। অথচ সে সময় অন্য কেউ দুধই পেতো না। তাদের পশুদের স্তনে কোন দুধই থাকত না। আমাদের কওমের লোকেরা রাখালদের বলতো, হতভাগ্যের দল তোমরা তোমাদের বকরি সেই এলাকায় চরাও যেখানে আবু যোবায়েরের কন্যা বকরি চরায়। কিন্তু তবুও তাদের বকরি খালি পেটেই ফিরে আসতো। একফোটা দুধও তাদের স্তনে পাওয়া যেতো না। অথচ আমার বকরিগুলো ভরাপেট এবং ভরা স্তনে ফিরে আসতো। এমনি করে আমরা আল্লাহর রহমত ও বরকত প্রত্যক্ষ করতে লাগলাম । শিশুর বয়স দুই বছর হওয়ার পর আমরা তাকে দুধ ছাড়ালাম। অন্যান্য শিশুদের চেয়ে এই শিশু ছিলো অধিক হৃষ্টপুষ্ট এবং মোটাসোটা। এরপর আমরা শিশুটিকে তার মায়ের কাছে নিয়ে গেলাম। আমরা তার কারণে বরকত প্রত্যক্ষ করেছিলাম। তাই চাচ্ছিলাম যে, শিশুটি আমাদের কাছেই আরও কিছুদিন থাকুক। শিশুর মাকে আমি এ ইচ্ছার কথা জানালাম। বার বার আবেদন নিবেদন জানাতে বিবি আমেনা পুনরায় শিশুকে আমার কাছেই ফিরিয়ে দিলেন।[৮]

সিনা চাকের ঘটনা

দুধ ছাড়ানোর পরও শিশু মোহাম্মদ বনু সা'দ গোত্রেই ছিলেন। তাঁর বয়স যখন চার অথবা পাঁচ বছর তখন 'সিনা চাক'-এর ঘটনাটি ঘটে।[৯]

এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হযরত জিবরাঈল (আ.) আগমন করলেন। এ সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য শিশুদের সাথে খেলা করছিলেন। জিবরাঈল (আ.) তাঁকে শুইয়ে বুক চিরে দিল বের করলেন। তারপর দিল থেকে একটি অংশ বের করে বললেন, এটা তোমার মধ্যে শয়তানের অংশ। এরপর দিল একটি তশতরিতে রেখে যমযম কূপের পানি দিয়ে ধুয়ে নিলেন। তারপর যথাযথ স্থানে তা স্থাপন করলেন। অন্য শিশুরা ছুটে গিয়ে বিবি হালিমার কাছে বললো, মোহাম্মদকে মেরে ফেলা হয়েছে। পরিবারের লোকেরা ছুটে এলো। এসে দেখলো তিনি বিবর্ণমুখে বসে আছেন।[১০]

৮.ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ১৬২, ১৬৩, ১৬৪

৯. অধিকাংশ সীরাত রচয়িতা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু ইবনে ইসহাকের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিন বছর বয়সে এ ঘটনা ঘটেছিল। (ইবনে হিশাম ১ম খন্ড, পৃ. ১৬৪, ১৬৫)

১০.সহীহ মুসলিম, আল আসরা অধ্যায়, ১ম খন্ড, পৃ. ৯২

মায়ের স্নেহ ও দাদার আদরে

এ ঘটনার পর বিবি হালিমা ভীত হয়ে পড়লেন। তিনি শিশুকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিয়ে এলেন। ছয় বছর বয়স পর্যন্ত তিনি মায়ের স্নেহছায়ায় কাটালেন।[১১]

এদিকে হযরত আমেনার ইচ্ছে হলো যে, তিনি পরলোকগত স্বামীর কবর যেয়ারত করবেন। পুত্র মোহাম্মদ, দাসী উম্মে আয়মন এবং শ্বশুর আবদুল মোত্তালেবকে সঙ্গে নিয়ে তিনি প্রায় পাঁচ শত কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে মদীনায় পৌছুলেন। একমাস সেখানে অবস্থানের পর মক্কার পথে রওয়ানা হলেন। মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি আবওয়া নামক জায়গায় এসে বিবি আমেনা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ক্রমে এই অসুখ বেড়ে চললো। অবশেষে তিনি আবওয়ায় ইন্তেকাল করেন।[১২]

বৃদ্ধ আবদুল মোত্তালেব পৌত্রকে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় পৌছুলেন। পিতৃমাতৃহীন পৌত্রের জন্যে তাঁর মনে ছিলো ভালোবাসার উত্তাপ। অতীতের স্মৃতিতে তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। পিতৃমাতৃহীন পৌত্রকে তিনি যতোটা ভালোবাসতেন, এতো ভালোবাসা তাঁর নিজ পুত্র কন্যা কারো জন্যেই ছিলো না। ভাগ্যের লিখন, বালক মোহাম্মদ সে অবস্থায় ছিলেন একান্ত নিঃসঙ্গ; কিন্তু আবদুল মোত্তালেব তাঁকে নিঃসঙ্গ থাকতে দিতেন না, তিনি পৌত্রকে অন্য সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন এবং স্নেহ করতেন। ইবনে হিশাম লিখেছেন, আবদুল মোত্তালেবের জন্যে কাবাঘরের ছায়ায় বিছানা পেতে দেয়া হতো। তাঁর সব সন্তান সেই বিছানার চারিদিকে বসতো। কিন্তু মোহাম্মদ গেলে বিছানায়ই বসতেন। তিনি ছিলেন অল্প বয়স্ক শিশু। তাঁর চাচারা তাঁকে বিছানা থেকে সরিয়ে দিতেন। কিন্তু আবদুল মোত্তালেব বলতেন, ওকে সরিয়ে দিয়ো না। ওর মর্যাদা অসাধারণ। বরং তাকে নিজের পাশে বসাতেন। শুধু বসানোই নয়, তিনি প্রিয় দৌহিত্রকে সব সময় নিজের সাথে রাখতেন। বালক মোহাম্মদের কাজকর্ম তাঁকে আনন্দ দিতো।[১৩]

বয়স আট বছর দুই মাস দশদিন হওয়ার পর তাঁর দাদার স্নেহের ছায়াও উঠে গেলো। তিনি ইন্তেকাল করলেন। মৃত্যুর আগে তিনি তার পুত্র আবু তালেবকে ওসিয়ত করে গেলেন, তিনি যেন ভ্রাতুষ্পুত্রের বিশেষভাবে যত্ন নেন। উল্লেখ্য আবু তালেব এবং আবদুল্লাহ ছিলেন একই মায়ের সন্তান।[১৪]

চাচার স্নেহবাৎসল্যে

আবু তালেব ভ্রাতুষ্পুত্রকে গভীর স্নেহ-মমতার সাথে প্রতিপালন করেন। তাঁকে নিজ সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। বরং নিজ সন্তানদের চেয়ে বেশিই স্নেহ করতেন, চল্লিশ বছরের বেশি সময় পর্যন্ত প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে সহায়তা দেন। আবু তালেব ভ্রাতুষ্পুত্রের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখেই মানুষের সাথে শত্রুতা মিত্রতার বন্ধনও স্থাপন করতেন।

আল্লাহর রহমতের সন্ধানে

ইবনে আসাকের জলাহামা ইবনে আরফাতার বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে, আমি মক্কায় এলাম। চারিদিকে দুর্ভিক্ষ, অনাবৃষ্টির ফলেই এর সৃষ্টি হয়েছে। কোরায়শ বংশের লোকেরা বৃষ্টির জন্যে দোয়া করতে আবু তালেবের কাছে আবেদন জানালো। আবু তালেব একটি বালককে সঙ্গে নিয়ে বের হলেন। বালকটিকে দেখে মেঘে ঢাকা সূর্য মনে হচ্ছিলো। আশে পাশে অন্যান্য বালকও

---

১১. তালকিহুল ফুহুম, পৃ. ৭, ইবনে হিশাম ১ম খন্ড পৃ. ১৬৮

১২. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড. পৃ. ১৬৮, তালকিহুল তুহুম পৃ. ৭ তারীখে খাজরামি, ১ম খন্ড, পৃ. ৬৩ ফেকহুছ সীরাত, গাজ্জাযযলী, পৃ. ৫০

১৩. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ; ১৬৮

১৪. তালকিহুল ফুহুম, পৃ. ৭, ইবনে হিশাম ১ম খন্ড, পৃ ১৪৯

ছিলো। আবু তালেব সেই বালককে সঙ্গে নিয়ে কাবাঘরের সামনে গেলেন। বালকের পিঠ কাবার দেয়ালের সাথে লাগিয়ে দিলেন। বালক তাঁর হাতে আঙ্গুল রাখলো। আকাশে এক টুকরো মেঘও ছিলো না। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সমগ্র আকাশ মেঘে ছেয়ে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। শহর প্রান্তর সজীব উর্বর হয়ে গেলো। পরবর্তীকালে আবু তালেব এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, 'তিনি সুদর্শন, তাঁর চেহারা থেকে বৃষ্টির করুণা প্রত্যাশা করা হয়। তিনি এতিমদের আশ্রয় এবং বিধবাদের রক্ষাকারী।'[১৫]

পাদ্রী বুহাইরা

নবী মোহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স যখন বারো বছর, মতান্তরে বারো বছর দুই মাস দশদিন হলো[১৬] তখন আবু তালেব তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় রওয়ানা হলেন। বসরায় পৌছার পর এক জায়গায় তাঁবু স্থাপন করলেন। সে সময় আরব উপদ্বীপের রোম অধিকৃত রাজ্যের রাজধানী সেরা ছিলো। সেই শহরে জারজিস নামে একজন পাদ্রী ছিলেন। তিনি বুহাইরা নামে পরিচিত ছিলেন। কাফেলা তাঁবু স্থাপনের পর বুহাইরা গীর্জা থেকে বের হয়ে কাফেলার লোকদের কাছে এলেন এবং তাদের মেহমানদারী করলেন। অথচ পাদ্রী বুহাইরা কখনো তার গীর্জা থেকে বের হতেন না। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনে ফেললেন এবং তাঁর হাত ধরে বললেন, তিনি সাইয়েদুল আলামিন। আল্লাহ তায়ালা এঁকে রহমাতুললিল আলামিন হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আবু তালেব বুহাইরাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এটা কিভাবে বুঝলেন? তিনি বললেন, আপনারা এই এলাকায় আসার পর এই বালকের সম্মানে এখানকার সব গাছপালা এবং পাথর সেজদায় নত হয়েছে। এরা নবী ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করে না। তাছাড়া মোহরে নবুয়তের দ্বারা আমি তাঁকে চিনতে পেরেছি। তাঁর কাঁধের নীচে নরম হাড়ের পাশে এটি 'সেব' ফলের মতো মজুদ রয়েছে। আমরা তাঁর উল্লেখ আমরা আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থে দেখেছি।

এরপর পাদ্রী বুহাইরা আবু তালেবকে বললেন, ওকে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দিন। সিরিয়ায় নেবেন না। ইহুদীরা ওর ক্ষতি করতে পারে। এ পরামর্শ অনুযায়ী আবু তালেব কয়েকজন ভৃত্যের সঙ্গে প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন।[১৭]

ফুজ্জারের যুদ্ধ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স যখন পনের বছর, তখন ফুজ্জারের যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে একদিকে কোরায়শ এবং তাদের সাথে ছিলো বনু কেনানা অন্যদিকে ছিলো কয়সে আয়নাল। কোরায়শ এবং কেনানার প্রধান ছিলো হারব ইবনে উমাইয়া। বয়স এবং বংশ মর্যাদার কারণে কোরায়শের কাছে সে সম্মানের পাত্র ছিলো। বনু কেনানাও তাকে সম্মান করতো। যুদ্ধের প্রথম প্রহরে কেনানার ওপর কয়েসের পাল্লা ভারি ছিলো। কিন্তু দুপুর হতে না হতেই কয়েসের ওপর কেনানার পাল্লা ভারি হয়ে গেলো। এই যুদ্ধকে ফুজ্জারের যুদ্ধ বলা হয়। কারণ যেহেতু এতে হরম এবং হারাম মাস উভয়ের নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়েছিলো। এই যুদ্ধে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

১৫. মুখতাছারু সীরাত, শেখ আবদুল্লাহ, পৃ. ১৫, ১৬

১৬. তালকিহুল ফুহুম, ইবনে জওযি, পৃ. ৭

১৭. মুখতাছারুছ সীরাত, শেখ আবদুল্লাহ, পৃ. ১৬, ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ১৮০, ১৮৩, তিরমিযি সহ অনন্য গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি হযরত বেলালের সাথে মক্কায় ফিরে যান, কিন্তু এটা ভুল। বেলালের তখনো জন্মই হয়নি। আর জন্ম হয়ে থাকলেও তিনি আবু তালেব বা আবু বকরের সাথে পরিচিত ছিলেন না। যাদুল মা'য়াদ, ১ম খন্ড, পৃ. ১৭

আলাইহি ওয়া সাল্লামও স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর চাচাদের হাতে তীর তুলে দিতেন।[১৮]

হেলফুল ফুযুল

ফুজ্জারের যুদ্ধের পর নিষিদ্ধ ঘোষিত যিলকদ মাসে হেলফুল ফুযুল সংঘটিত হয়। কয়েকটি গোত্র যেমন কোরায়শ অর্থাৎ বনি হাশেম, বনি মোত্তালেব, বনি আসাদ ইবনে আবদুল ওযযা, বনি যোহরা ইবনে কেলাব এবং বনু তাইম ইবনে মোররা এর ব্যবস্থা করেন। এরা সবাই আবদুল্লাহ ইবনে জুদআন তাইমির ঘরে একত্রিত হন। এরা বয়স এবং আভিজাত্যে ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয়। এরা পরস্পর এ মর্মে অংগীকার করলেন যে, মক্কায় সংঘটিত যে কোন প্রকার যুলুম অত্যাচার প্রতিরোধ করবেন।

হোক মক্কার অধিবাসী বা বাইরের কেউ—অত্যাচারিত হলে প্রতিকার করে তার অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হবে। এ সমাবেশে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও উপস্থিত ছিলেন। নবুয়ত পাওয়ার পর এ ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলতেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে জুদআনের ঘরে এমন চুক্তিতে শরিক ছিলাম, যার বিনিময়ে লাল উটও আমার পছন্দ নয়। ইসলামী যুগে সেই চুক্তির জন্যে যদি আমাকে ডাকা হতো, তবে আমি অবশ্যই হাযির হতাম।[১৯]

এ চুক্তির মূল ছিলো জাহেলী যুগের যাবতীয় বে-ইনসাফী দূরীকরণ। এ চুক্তির কারণ এটাই বলা হয়েছে যে, যোবায়েরের একজন লোক কিছু জিনিস নিয়ে মক্কায় এসেছিলো। আস ইবনে ওয়ায়েল তার কাছ থেকে সেই জিনিস ক্রয় করে, কিন্তু তার মূল্য পরিশোধ করেনি। আস ইবনে ওয়ায়েলের কাছে জিনিস বিক্রেতা আবদুদ দার, মাখজুম, জামিহ, ছাহাম এবং আদীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়। কিন্তু কেউ এ ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়নি। এরপর সেই লোকটি আবু কুরাইস পাহাড়ে উঠে উচ্চস্বরে কয়েকটি কবিতা আবৃত্ত করলো। সে কবিতায় তার প্রতি অত্যাচারের কথা বর্ণনা করা হয়েছিলো।

এতে যোবায়ের ইবনে আবদুল মোত্তালেব ছুটোছুটি শুরু করে বলেন, এই লোকটির কোন সাহায্যকারী নেই কেন? তার চেষ্টায় উল্লেখিত কয়েকটি গোত্র একত্রিত হলো। প্রথমে তারা চুক্তি করলো পরে আস ইবনে ওয়ায়েলের কাছ থেকে বিক্রীত পণ্যের মূল্য আদায় করে দিল।[২০]

সংগ্রামী জীবন যাপন

তরুণ বয়সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দিষ্ট কোন কাজ ছিলো না। তবে বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তিনি বকরি চরাতেন। সেগুলো ছিলো বনি সা'দ গোত্রের।[২১]

কয়েক কিরাত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মক্কার বিভিন্ন লোকের বকরিও তিনি চরাতেন।[২২] পঁচিশ বছর বয়সে তিনি হযরত খাদিজা (রা.) বাণিজ্যিক পণ্য নিয়ে সিরিয়ায় সফর করেন। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, খাদিজা বিনতে খোয়াইলেদ একজন অভিজাত ও ধনবতী মহিলা ছিলেন। তিনি বিভিন্ন লোককে দিয়ে পণ্য কিনতেন এবং সেসব পণ্য বিক্রি করাতেন। লাভের একটা অংশ তিনি গ্রহণ করতেন। সমগ্র কোরায়শ গোত্রই ব্যবসা করতো। বিবি খাদিজা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সততা, সচ্চরিত্রতা এবং নম্রতার কথা শুনে তাঁকে ব্যবসায়

---

১৮. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ১৮৪-১৮৬ কলবে জাযিরাতুল আরব, পৃ. ৩৬০, তারীখে খাযরামি, ১ম খন্ড, পৃ. ৬৩
১৯. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ১৩৩, ১৩৫, মুখতাছারুছ সীরাত, শেখ আবদুল্লাহ, পৃ. ৩০, ৩১।
২০. মুখতাছারুছ সীরাত, পৃ. ৩০-৩১
২১. ইবনে হিশাম ১ম খন্ড. পৃ. ৬২, ১৬৬
২২. সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ৩০১

নিয়োগের জন্যে প্রস্তাব পাঠালেন। তিনি তাঁর ক্রীতদাস মায়ছারাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রস্তাব দিলেন। বিবি খাদিজা একথাও বললেন যে অন্য লোকদের তিনি যে পারিশ্রমিক দিয়ে থাকেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তার চেয়ে বেশি পারিশ্রমিক দেবেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং বিবি খাদিজার ব্যবসায়িক পণ্য (তথা মসলাদী) তাঁর ক্রীতদাস মায়ছারাকে সাথে করে নিয়ে সিরিয়া গেলেন।[২৩]

বিবি খাদিজার সাথে বিয়ে

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাণিজ্যিক সফর থেকে ফিরে আসার পর বিবি খাদিজা লক্ষ্য করলেন, অতীতের চেয়ে এবার তাঁর অনেক বেশি লাভ হয়েছে। এছাড়া তিনি ভৃত্য মায়ছারার কাছে আল্লাহর রসূলের উন্নত চরিত্র, সততা, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদির ভূয়সী প্রশংসা শুনলেন। এসব শুনে মনে মনে তিনি আল্লাহর রসূলকে ভালোবেসে ফেললেন। এর আগে বড় বড় সর্দার এবং নেতৃস্থানীয় লোক বিবি খাদিজাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু কোন প্রস্তাবই তিনি গ্রহণ করেননি। মনের গোপন ইচ্ছার কথা বিবি খাদিজা তাঁর বান্ধবী নাফিসা বিনতে মুনব্বিহর কাছে ব্যক্ত করলেন। নাফিসা গিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বললেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাযি হলেন এবং তাঁর চাচাদের সাথে পরামর্শ করলেন। তাঁর চাচারা খাদিজার চাচার সাথে আলোচনা করলেন এবং বিয়ের পয়গাম পাঠালেন। এরপর বিয়ে হয়ে গেলো। এ বিয়েতে বনি হাশেম এবং মুযার গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

সিরিয়া থেকে বাণিজ্যিক সফর শেষ করে ফিরে আসার দুই মাস পর এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিয়ের মোহরানা হিসাবে বিশটি উট দিয়েছিলেন। বিবি খাদিজার বয়স সে সময় ছিলো চল্লিশ বছর। তিনি বিবেক বুদ্ধি, সৌন্দর্য, অর্থ সম্পদ, বংশমর্যাদায় ছিলেন সেকালের শ্রেষ্ঠ নারী। বিবি খাদিজার সাথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এটা ছিলো প্রথম বিবাহ। তিনি বেঁচে থাকা অবস্থায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি।[২৪]

ইবরাহীম ব্যতীত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সকল সন্তান ছিলেন বিবি খাদিজার গর্ভজাত। সর্বপ্রথম কাসেম জন্মগ্রহণ করেন। এ কারণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হতো আবুল কাসেম বা কাসেমের পিতা। কাসেমের পর যয়নব, রোকাইয়া, উম্মে কুলসুম, ফাতেমা এবং আবদুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন। আবদুল্লাহর উপাধি ছিলো তাইয়েব এবং তাহের। পুত্র সন্তান সকলেই শৈশবে ইন্তেকাল করেন। কন্যারা ইসলামের যুগ পেয়েছিলেন। তাঁরা সকলেই ইসলাম গ্রহণ এবং হিজরতের গৌরব অর্জন করেন। হযরত ফাতেমা (রা.) ছাড়া অন্য সকলেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায়ই ইন্তেকাল করেন। হযরত ফাতেমা (রা.) তাঁর আব্বা রসূলুল্লাহ (স)-এর ইন্তেকালের মাত্র ছয় মাস পর ইন্তেকাল করেন।[২৫]

---

২৩. ইবনে হিশাম ১ম খন্ড, পৃ. ১৮৭,১৮৮

২৪. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ১৮৯, ১৯০, ফেকহুছ সীরাত পৃ. ৫৯, তালকিহুল ফুহুম, পৃ. ৭

২৫. ইবনে হিশাম ১ম খন্ড, পৃ; ১৯০, ১৯১, ফেকহুছ সীরাত পৃ. ৬০, ফতহুল বারী, সপ্তম খন্ড, পৃ. ১০৫, ঐতিহাসিক তথ্যে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। যে তথ্য নির্ভুল মনে হয়েছে সে তথ্যই উল্লেখ করেছি।

কাবার পুননির্মাণ এবং হাজরে আসওয়াদের বিরোধ মীমাংসা

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর, সে সময় কোরায়শরা নতুন করে কাবাঘর নির্মাণের কাজ শুরু করেন। এ উদ্যোগের কারণ ছিলো এই যে, কাবাঘর মানুষের উচ্চতার চেয়ে সামান্য বেশি উচ্চতা বিশিষ্ট চার দেয়ালে ঘেরা ছিলো। হযরত ইসমাইল (আ.)-এর যমানায়ই এসব দেয়ালের উচ্চতা ছিলো নয় হাত এবং উপরে কোন ছাদ ছিলো না। এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে কিছু দুর্বৃত্ত চোর ভেতরের সম্পদ চুরি করে। তাছাড়া নির্মাণের পর দীর্ঘকাল কেটে গেছে। ইমারত পুরনো হওয়ায় দেয়ালে ফাটল ধরেছিলো। এদিকে সে বছর প্রবল প্লাবনও হয়েছিলো, সেই প্লাবনের তোড় ছিলো কাবাঘরের দিকে। এ সব কারণে কাবাঘর যে কোনো সময় ধসে পড়ার আশঙ্কা ছিলো। তাই কোরায়শরা কাবাঘর নতুন করে নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো।

এ পর্যায়ে কোরায়শরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, কাবাঘরের নির্মাণ কাজে শুধু বৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থই ব্যবহার করা হবে। এসবের মধ্যে পতিতার উপার্জন, সুদের অর্থ এবং অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা কোনো অর্থ সম্পদ ব্যবহার করা যাবে না।

কাবাঘর নতুন করে নির্মাণের জন্যে পুরনো ইমারত ভেঙ্গে ফেলার প্রয়োজন ছিলো। কিন্তু কেউ ঘর ভাঙ্গার সাহস পাচ্ছিলো না। অবশেষে ওলীদ ইবনে মুগিরা মাখযমি প্রথমে ভাঙ্গতে শুরু করলো। সবাই যখন লক্ষ্য করলো যে, ওলীদের ওপর কোন বিপদ আপতিত হয়নি, তখন সবাই ভাঙ্গার কাজে অংশগ্রহণ করলো। হযরত ইব্রাহীম (আ.) নির্মিত অংশও ভাঙ্গার পর নতুন করে নির্মাণ শুরু করা হলো। নির্মাণ কাজে প্রত্যেক গোত্রের অংশ নির্ধারিত ছিলো এবং প্রত্যেক গোত্র কাজ শুরু করলো। বাকুম নামে এক রোমক স্থপতি নির্মাণ কাজ তদারক করছিলো। ইমারত যখন হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত উঁচু হলো তখন বিপদ দেখা দিলো যে, এ পবিত্র পাথর কে স্থাপন করবে? এটা ছিলো একটা পবিত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত কাজ। চার পাঁচ দিন যাবত এ ঝগড়া চলতে থাকলো। এ ঝগড়া এমন মারাত্মক রূপ ধারণ করলো যে, খুন খারাবি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। আবু উমাইয়া মাখজুমি এ বিবাদ ফয়সালার একটা উপায় এভাবে নির্ধারণ করলেন যে, আগামীকাল প্রত্যুষে মসজিদে হারামের দরোজা দিয়ে যিনি প্রথম প্রবেশ করবেন, তার ফয়সালা সবাই মেনে নেবে। এ প্রস্তাব সবাই গ্রহণ করলো। পরদিন প্রত্যুষে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম কাবাঘরে প্রবেশ করলেন। এরপর তাঁকে বিচারক মনোনীত করা হলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একখানি চাদর মাটিতে বিছিয়ে নিজ হাতে সে চাদরের ওপর পাথর রাখলেন, তারপর বিবাদমান গোত্রসমূহের নেতাদের সে চাদরের অংশ ধরে পাথর যথাস্থানে নিয়ে যেতে বললেন। তারা তাই করলো। নির্ধারিত জায়গায় চাদর নিয়ে যাওয়ার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ হাতে পাথর যথাস্থানে স্থাপন করলেন। এ ফয়সালা ছিলো অত্যন্ত বিবেকসম্মত এবং বুদ্ধিদীপ্ত। বিবাদমান গোত্রের সকলেই এতে সন্তুষ্ট হলো, কারো কোনো অভিযোগ রইলো না।

এদিকে কোরায়শদের কাছে বৈধ অর্থের অভাব দেখা দিলো। এ কারণে তারা উত্তর দিকে কাবার দৈর্ঘ প্রায় ছয় হাত কমিয়ে দিল। এই অংশকে হেজর এবং হাতীম বলা হয়। এ পর্যায়ে কোরায়শরা কাবার দরোজা বেশ উঁচু করে দিলো, যাতে একমাত্র তাদের অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিই কাবাঘরে প্রবেশ করতে পারে। দেয়ালসমূহ পনের হাত উঁচু হওয়ার পর ভেতরে ছয়টি খুঁটি দাঁড় করিয়ে ওপর থেকে ছাদ ঢালাই করা হলো। নির্মাণ শেষে কাবাঘর চতুষ্কোণ আকৃতি লাভ করলো। বর্তমানে কাবাঘরের উচ্চতা পনের মিটার। যে অংশে হাজরে আসওয়াদ রয়েছে, সে অংশের

দেয়াল এবং তার সামনের অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ অংশের দেয়াল দশ দশ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন। হাজরে আসওয়াদ মাটি থেকে দেড় মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। যে দিকে দরোজা রয়েছে, সেদিকের দেয়াল এবং সামনের দিকের অংশ পূর্ব ও পশ্চিম দিকের দেয়াল থেকে বারো মিটার উচ্চ। দরোজা মাটি থেকে দুই মিটার উঁচু। দেয়ালের ঘেরাও এর নীচে চারিদিক থেকে চেয়ারের আকৃতিবিশিষ্ট ঘেরাও রয়েছে। এর উচ্চতা পঁচিশ সেন্টিমিটার এবং দৈর্ঘ ত্রিশ সেন্টিমিটার। এটাকে শাজরাওয়ান বলা হয়। এটাও প্রকৃতপক্ষে কাবাঘরের অংশ, কিন্তু কোরায়শরা এ অংশের নির্মাণ কাজও স্থগিত রাখে।২৬

নবুয়তের আগের জীবন

বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যেসব গুণবৈশিষ্ট বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে এককভাবেই বিদ্যমান ছিলো। তিনি ছিলেন সেগুলো দূরদর্শিতা, সত্যপ্রিয়তা এবং চিন্তাশীলতার এক সুউচ্চ মিনার। চিন্তার পরিচ্ছন্নতা, পরিপক্কতা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পবিত্রতা তাঁর মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান ছিলো। দীর্ঘ সময়ের নীরবতায় তিনি সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে আল্লাহর সাহায্য পেতেন। পরিচ্ছন্ন, মার্জিত, সুন্দর বিবেক বুদ্ধি, উন্নত স্বভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি মানুষের জীবন, বিশেষত জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে গভীরভাবে ধ্যান করেছিলেন। এ ধ্যানর মাধ্যমে মানুষকে যে সকল পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত দেখলেন, এতে তাঁর মন ঘৃণায় ভরে উঠলো। তিনি গভীরভাবে মর্মাহত হলেন। পঙ্কিলতার আবর্তে নিমজ্জিত মানুষ থেকে তিনি নিজেকে দূরে রাখলেন। মানুষের জীবন সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেয়ার পর মানবকল্যাণে যতোটা সম্ভব অংশগ্রহণ করতেন। বাকি সময় নিজের প্রিয় নির্জনতার ভুবনে ফিরে যেতেন। তিনি কখনো মদ স্পর্শ করেন নি, আস্তানায় যবাই করা পশুর গোশত খাননি, মূর্তির জন্যে আয়োজিত উৎসব, মেলা ইত্যাদিতেও কখনোই অংশগ্রহণ করেননি।

শুরু থেকে মূর্তি নামের বাতিল উপাস্যদের অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। এতো বেশি ঘৃণা অন্য কিছুর প্রতি ছিলো না। এছাড়া লাত এবং ওযযার নামে শপথও সহ্য করতে পারতেন না।[২৭]

তকদীর তাঁর ওপর হেফাযতের ছায়া ফেলে রেখেছিলো এতে কোন সন্দেহ নেই। পার্থিব কোন কিছু পাওয়ার জন্যে যখন মন ব্যাকুল হয়েছে, অথবা অপছন্দনীয় রুসুম-রেওয়াজের অনুসরণের জন্যে মনে ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সেসব থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন।

ইবনে আছিরের এক বর্ণনায় রয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জাহেলি যুগের লোকেরা যেসব কাজ করতো, দু'বারের বেশি কখনোই সেসব কাজ করার ইচ্ছে আমার হয়নি। সেই দু'টি কাজেও আল্লাহর পক্ষ থেকে বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে।

এরপর সে ধরনের কাজের ইচ্ছা কখনোই আমার মনে জাগেনি। ইতিমধ্যে আল্লাহ তায়ালা আমাকে নবুয়তের গৌরবে গৌরবান্বিত করেছেন। মক্কার উপকণ্ঠে যে বালক আমার সাথে বকরি চরাতো, একদিন তাকে বললাম, তুমি আমার বকরিগুলোর দিকে যদি লক্ষ্য রাখতে, তবে আমি মক্কায় গিয়ে অন্য যুবকদের মতো রাত্রিকালের গল্প-গুজবের আসরে অংশ নিতাম। রাখাল রাজি হলো। আমি মক্কার দিকে রওয়ানা দিলাম। প্রথম ঘরের কাছে গিয়ে বাজনার আওয়ায শুনলাম। জিজ্ঞাসা করায় একজন বললো, অমুকের সাথে অমুকের বিবাহ হচ্ছে। আমি শোনার জন্যে বসে

২৬. বিস্তারিত বিবরণের জন্য ইবনে হিশাম ১ম খন্ড, পৃ. ১৯২, ১৯৭ ফেকহুস সীরাত ৬২, সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ১, ২, ১৫ তারীখে খাজরামি ১ম খন্ড, পৃ. ৬৪, ৬৫ দেখুন.,

২৭. বুহাইরার ঘটনায় এর প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে (ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ১২৮),

পড়লাম। আল্লাহ তায়ালা আমার কান বন্ধ করে দিলেন, আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। রোদের আঁচ গায়ে লাগার পর আমার ঘুম ভাঙ্গলো। আমি তখন মক্কার উপকণ্ঠে সেই রাখালের কাছে ফিরে গেলাম। সে জিজ্ঞাসা করার পর সব কথা খুলে বললাম। আরো একদিন একই রকমের কথা বলে রাখালের কাছ থেকে মক্কায় পৌঁছুলাম এবং প্রথমোক্ত রাতের মতই ঘটনাও সেদিন ঘটলো। এরপর কখনো ওই ধরনের ভুল ইচ্ছা আমার মনে জাগ্রত হয়নি।[২৮]

সহীহ বোখারী শরীফে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কাবাঘর যখন নির্মাণ করা হয়েছিলো তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আব্বাস পাথর ভাঙ্গছিলেন। হযরত আব্বাস (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, তহবন্দ খুলে কাঁধে রাখো, পাথরের ধুলোবালি থেকে রক্ষা পাবে। তহবন্দ খোলার সাথে সাথে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। তারপর আকাশের প্রতি তাকালেন এবং বেহুঁশ হয়ে গেলেন। খানিক পরেই হুঁশ ফিরে এলে বললেন, আমার তহবন্দ, আমার তহবন্দ। এরপর তাঁর তহবন্দ তাঁকে পরিয়ে দেয়া হয়। এক বর্ণনায় রয়েছে যে, এ ঘটনার পর আর কখনো তাঁর লজ্জাস্থান দেখা যায়নি।[২৯]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রশংসনীয় কাজ, উন্নত সুন্দর চরিত্র এবং মাধুর্য মন্ডিত স্বভাবের কারণে স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট ছিলেন। তিনি ছিলেন সকলের চেয়ে অধিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, উন্নত চরিত্রের অধিকারী, সম্মানিত প্রতিবেশী, সর্বাধিক দূরদর্শিতাসম্পন্ন, সকলের চেয়ে অধিক সত্যবাদী, সকলের চেয়ে কোমলপ্রাণ ও সর্বাধিক পবিত্র পরিচ্ছন্ন মনের অধিকারী। ভালো কাজে ভালো কথায় তিনি ছিলেন সকলের চেয়ে অগ্রসর এবং প্রশংসিত। অংগীকার পালনে ছিলেন সকলের চেয়ে অগ্রণী, আমানতদারির ক্ষেত্রে ছিলেন অতুলনীয়। স্বজাতির লোকেরা তার নাম রেখেছিলো আল-আমিন। তার মধ্যে ছিলো প্রশংসনীয় গুণ বৈশিষ্টের সমন্বয়। হযরত খাদিজা (রা.) সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি বিপদগ্রস্তদের বোঝা বহন করতেন, দুঃখী দরিদ্র লোকদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াতেন, মেহমানদারি করতেন এবং সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্য করতেন।[৩০]

---

২৮. হাকেম যাহাবি এ হাদীসকে সহীহ বলেছেন। আর ইবনে কাছির তাঁর 'আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া' গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডের ২৮৭ পৃষ্ঠায় এই হাদীসকে যঈফ (দুর্বল) বলে উল্লেখ করেছেন।

২৯. সহীহ বোখারী, বাবে বুনিয়ানুল কাবা, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৪০

৩০. সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ৩

(আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে ওহী পাঠিয়ে বললেন) হে কম্বল আবৃত (মোহাম্মদ), উঠো (তোমার শয্যা ছেড়ে)। দুনিয়ার মানুষদের (ঈমান না আনার পরিণাম সম্পর্কে) সাবধান করো এবং তুমি নিজে তোমার মালিকের মাহাত্ম্য বর্ণনা করো

(সূরা মোদ্দাসসের ১-৭)

নিজ ঘরে তিনি পরদেশী

যুলুম নিপীড়নের তেরো বছর

দাওয়াতের বিভিন্ন পর্যায়

রেসালাতের ছায়ায় হেরাগুহার অভ্যন্তরে

মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স চল্লিশ বছরের কাছাকাছি হলো। তাঁর পরিচ্ছন্ন অনমনীয় ব্যক্তিত্বের কারণে স্বজাতীয়দের সাথে তাঁর মানসিক ও চিন্তার দূরত্ব অনেক বেড়ে গেলো। এ অবস্থায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিঃসঙ্গপ্রিয় হয়ে উঠলেন। ছাত এবং পানি নিয়ে তিনি মক্কা থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত হেরা পাহাড়ের গুহায় গিয়ে সময় কাটাতে লাগলেন। এটি একটি ছোট গুহা, এর দৈর্ঘ চার গজ এবং প্রস্ত পৌনে দুই গজ। নীচ দিক গভীর নয়। ছোট একটি পথের পাশে ওপরের প্রান্তরের সঙ্গমস্থলে এ গুহা অবস্থিত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই গুহায় যাওয়ার পর বিবি খাদিজাও সঙ্গে যেতেন এবং নিকটবর্তী কোন জায়গায় অবস্থান করতেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরো রমযান মাস এই গুহায় কাটাতেন। পথচারী মিসকিনদের খাবার খাওয়াতেন এবং বাকি সময় আল্লাহর এবাদাতে কাটাতেন। জগতের দৃশ্যমান এবং এর পেছনে কার্যকর কুদরতের কারিশ্মা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতেন। স্বজাতির লোকদের মূর্তি পূজা এবং নোংরা জীবন যাপন দেখে তিনি শান্তি পেতেন না। কিন্তু তাঁর সামনে সুস্পষ্ট কোন পথ, পদ্ধতি অথবা প্রচলিত অবস্থার বিপরীত কোন কর্মসূচীও ছিলো না, যার ওপর জীবন কাটিয়ে তিনি মানসিক স্বস্তি ও শান্তি পেতে পারেন।[১]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ নিঃসঙ্গপ্রিয়তা ছিলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর হেকমতের একটি অংশবিশেষ। এমনি করে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ভবিষ্যতের গুরুদায়িত্বের জন্যে তৈরী করছিলেন। প্রকৃতপক্ষে মানব জীবনের বাস্তব সমস্যার সমাধান দিয়ে যিনি জীবনধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে সচেষ্ট হবেন, তিনি পারিপার্শ্বিক হৈ চৈ হট্টগোল থেকে দূরে নির্জনতায় কোলাহলমুক্ত পরিবেশে কিছুকাল থাকবেন এটাইতো স্বাভাবিক।

এই নিয়ম অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা ধীরে ধীরে তাঁর প্রিয় রসূলকে আমানতের বিরাট বোঝা বহন এবং বিশ্ব মানবের জীবনধারায় পরিবর্তনের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের জন্যে তৈরী করছিলেন। তাঁকে আমানতের জিম্মাদারী অর্পণের তিন বছর আগে নির্জনে ধ্যান করা তাঁর জন্যে আগেই নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। এই নির্জনতায় কখনো কখনো এক মাস পর্যন্ত তিনি ধ্যানমগ্ন থাকতেন। আধ্যাত্মিক রূহানী সফরে তিনি সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা ও গবেষণা করতেন যাতে, প্রয়োজনীয় নির্দেশ পেলে যথাযথভাবে সেই দায়িত্ব পালনে সক্ষম হন।[২]

ওহী নিয়ে জিবরাইলের আগমন

চল্লিশ বছর বয়স হচ্ছে মানুষের পূর্ণতা ওপরিপক্কতার বয়স। পয়গম্বররা এই বয়সেই ওহী লাভ করে থাকেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স চল্লিশ হওয়ার পর তাঁর জীবনের দিগন্তে নবুয়তের নিদর্শন চমকাতে লাগলো। এই নিদর্শন প্রকাশ পাচ্ছিলো স্বপ্নের মাধ্যমে। এ সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে স্বপ্নই দেখতেন, সেই স্বপ্ন শুভ্র সকালের মতো প্রকাশ পেতো। এ অবস্থায় ছয়মাস কেটে গেলো। এ সময়টুকু নবুয়তের সময়ের ৪৬তম অংশ এবং নবুয়তের মোট মেয়াদ হচ্ছে তেইশ বছর। হেরা গুহার নির্জনাবাসের তৃতীয় বছরে আল্লাহ তায়ালা জগতবাসীকে তাঁর করুণাধারায় সিঞ্চিত করতে চাইলেন। আল্লাহ তায়ালা

---

১. রহমাতুল লিল আলামিন, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৭, ইবনে হিশাম ১ম খন্ড পৃ. ২৩৫, ২৩৬ তাফসীর ফি যিলালিল কোরআন—সাইয়েদ কুতুব শহীদ, পারা, ২৯, পৃ. ৬৬

২. তাফসীর ফি যিলালিল কোরআন, পারা ২৯, পৃ. ১৬৬-১৬৭ (স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এটা হচ্ছে এই তাফসীরের আরবী সংস্করণের পৃষ্ঠা। বাংলাদেশে আল কোরআন একাডেমী লন্ডন-এর যে বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছেন, তার পৃষ্ঠা এর সাথে নাও মিলতে পারে।)

তখন তাঁর রসূলকে নবুয়ত দান করলেন। হযরত জিবরাইল (আ.) কয়েকটি আয়াত নিয়ে হাযির হলেন।[৩]

ইতিহাসের যুক্তি-প্রমাণ এবং কোরআনসহ বিভিন্ন গ্রন্থ অধ্যয়ন করে পাওয়া তথ্যানুযায়ী জানা যায় যে, প্রথম ওহী এসেছিলো রমযান মাসের ২১ তারিখ সোমবার রাতে। চান্দ্র মাসের হিসাব মোতাবেক সে সময় রসূলে করিম হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স হয়েছিলো ৪০ বছর ৬ মাস ১২ দিন।

ওহী নাযিলের সময়ে তাঁর বয়স

প্রিয় নবী কি মাসে নবুয়ত লাভ করেছিলেন, এ ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। অধিকাংশ সীরাত রচয়িতার মতে প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসে নবুয়ত লাভ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন রমযান মাসে, আবার কেউ কেউ বলেছেন রজব মাসে। (দেখুন মুখতাছারুছ সিরাত, রচনা শেখ আবদুল্লাহ ১ম খন্ড, পৃ. ৭৫।) আমার বিবেচনায় রমযান মাসে ওহী নাযিল হওয়া অর্থাৎ নবুয়ত লাভ করার কথাই ঠিক। কেননা কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, রমযান মাসেই কোরআন নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেছেন, শবে কদরে কোরআন নাযিল করা হয়েছে। শবে কদর তো রমযান মাসেই হয়ে থাকে। তিনি আরো বলেছেন, আমি একটি বরকতময় রাতে কোরআন নাযিল করেছি এবং আমি লোকদের আযাবের আশঙ্কা সম্পর্কে অবহিত করি। রমযানে কোরআন নাযিল হওয়ার পক্ষে এ যুক্তিও রয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেরার গুহায় রমযানে ধ্যান করতেন। হযরত জিবরাইল (আ.) হেরার গুহাতেই এসেছিলেন।

যারা রমযান মাসে কোরআন নাযিল হওয়ার উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে রমযানের কতো তারিখে কোরআন নাযিল হয়েছিলো, এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন সাত, আবার কেউ বলেন আঠারো তারিখ। (মুখতাছারুস ছিরাত ১ম খন্ড পৃ. ৭৫, রহমাতুল লিল আলামিন ১ম খন্ড পৃ. ৪৯ দেখুন,) আল্লামা হাযরামি লিখেছেন, সতের তারিখই নির্ভুল।

(তারিখে হাযরামি ১ম খন্ড পৃ. ৬৯, এবং তারিখে আত্‌তাশারিহ আল ইসলামী পৃ. ৫, ৬, ৭ দেখুন।) আমি এ ব্যাপারে ২১শে রমযান তারিখকে প্রাধান্য দিয়েছি। অথচ অন্য কেউই ২১ শে রমযান কোরআন নাযিলের শুরু বলে উল্লেখ করেননি। আমার যুক্তি হচ্ছে, অধিকাংশ সীরাত রচয়িতার মতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব ঘটেছিলো সোমবার দিনে। হযরত কাতাদা (রা.) বর্ণিত একটি হাদীসেও এর প্রমাণ রয়েছে। তিনি বলেন, প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সোমবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এই দিনে আমি জন্মগ্রহণ করেছি, এই দিনে আমাকে নবুয়ত দেয়া হয়েছে। (সহী মুসলিম ১ম খন্ড পৃ. ৩৬৮ মোসনাদে আহমদ ৫ম খন্ড, পৃ. ২৯৭, ২৯৯, বায়হাকী ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২৮৬, ৩০০ হাকেম ২য় খন্ড, পৃ. ২, ৬।) সেই বছর রমযান মাস সোমবার পড়েছিলো ৭, ১৪, ২১ এবং ৮ তারিখে। সহীহ বর্ণনায় এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, শবে কদর রমযান মাসের বেজোড় রাতে হয়ে থাকে এবং বেজোড় রাতেই আবর্তিত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, শবে কদরে কোরআন নাযিল হয়েছে। যে বছর তিনি নবুয়ত পেয়েছেন, সে বছরের সোমবারসমূহ পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, তিনি ২১শে রমযান সোমবার জন্মগ্রহণ করেন এবং এই তারিখেই নবুয়তও লাভ করেন।

আসুন, হযরত আয়েশা (রা.)-এর যবানীতে এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ শোনা যাক। কোরআন নাযিল ছিলো এক অলৌকিক আলোক শিখার আবির্ভাব, সেই আলোক শিখায় সকল গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকার তিরোহিত হয়ে গিয়েছিলো। ইতিহাসের গতিধারা এই ঘটনায় বদলে গিয়েছিলো।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ওহী নাযিলের সূচনা স্বপ্নের মাধ্যমে হয়েছিলো। তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন তা স্বপ্ন শুভ্র সকালের মতো প্রকাশ পেতো। এরপর তিনি নির্জনতাপ্রিয় হয়ে যান। তিনি হেরা গুহায় এবাদাত বন্দেগীতে

---

৩. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী লিখেছেন, বায়হাকী উল্লেখ করেছেন যে, স্বপ্ন দেখার মেয়াদ ছিল ছয় মাস। অর্থাৎ ছয় মাস যাবত বিভিন্ন সময়ে তিনি স্বপ্ন দেখেছেন। কাজেই স্বপ্নের মাধ্যমে নবুয়তের সূচনা চল্লিশ বছর পূর্তির পর রবিউল আউয়াল মাসে হয়েছিল। এ মাস ছিল প্রিয় রসূলের জন্মের মাস। জাগ্রতাবস্থায় তাঁর কাছে প্রথম ওহী এসেছিল রমযান মাসে। (ফতহুল বারী, ১ম খন্ড, পৃ. ২৭)

কাটাতে থাকেন এবং এ সময় একাধারে কয়েকদিন ঘরে ফিরতেন না। পানাহার সামগ্রী শেষ হয়ে গেলে সেসব নেয়ার জন্যে পুনরায় বাড়িতে ফিরতেন। এমনি করে এক পর্যায়ে হযরত জিবরাইল (আ.) তাঁর কাছে আসেন এবং তাঁকে বলেন, পড়ো। তিনি বললেন, আমি তো পড়তে জানি না। ফেরেশতা তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে সজোরে চাপ দিলেন। তিনি বলেন, আমার সব শক্তি যেন নিংড়ে নেয়া হলো। এরপর ফেরেশতা তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ো। তিনি বলেন, আমি তো পড়তে জানি না। পুনরায় ফেরেশতা আমাকে বুকে জড়িয়ে চাপ দিলেন।

এরপর ছেড়ে দিয়ে বললেন, পড়ো। তৃতীয়বার তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে সজোরে চাপ দিলেন এবং বললেন, 'ইকরা বে-ইসমে রাব্বিকাল্লাযি খালাক'।[৫] অর্থাৎ পড়ো সেই প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন।

এই আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার পর প্রিয় নবী ঘরে এলেন। তাঁর বুক ধুকধুক করছিলো। স্ত্রী হযরত খাদিজা বিনতে খোয়াইলেদকে বললেন, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। বিবি খাদিজা প্রিয় নবীকে চাদর জড়িয়ে শুইয়ে দিলেন। তার ভয় কেটে গেলো।

এরপর বিবি খাদিজাকে সব কথা খুলে বলে প্রিয় রসূল বললেন, আমার কী হয়েছে? নিজের জীবনের আমি আশঙ্কা করছি। বিবি খাদিজা তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে অপমান করবেন না। আপনি আত্মীয় স্বজনের হক আদায় করেন, বিপদগ্রস্ত লোকদের সাহায্য করেন, মেহমানদারী করেন এবং সত্য প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন।

বিবি খাদিজা এরপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আপন চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেল ইবনে আবদুল ওযযার কাছে নিয়ে গেলেন। ওয়ারাকা আইয়ামে জাহেলিয়তে ঈসায়ী ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি হিব্রু ভাষায় লিখতে জানতেন। যতোটা আল্লাহ তায়ালা তওফীক দিতেন, হিব্রু ভাষায় ততোটা ইঞ্জিল তিনি লিখতেন। সে সময় তিনি ছিলেন বয়সের ভারে ন্যুজ এবং দৃষ্টিহীন। বিবি খাদিজা বললেন, ভাইজান, আপনি আপনার ভাতিজার কথা শুনুন। ওয়ারাকা বললেন, ভাতিজা তুমি কি দেখেছো?

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা যা দেখেছেন তাকে সব খুলে বললেন। সব শুনে ওয়ারাকা বললেন, তিনি সেই দূত, যিনি হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে এসেছিলেন। হায়, যদি আমি সেই সময় বেঁচে থাকতাম, যখন তোমার কওম তোমাকে বের করে দেবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবাক হয়ে বললেন, তবে কি আমার কওম আমাকে সত্যি সত্যিই বের করে দেবে? ওয়ারাকা বললেন, হাঁ, তুমি যে ধরনের বাণী লাভ করেছো, এ ধরনের বাণী যখনই কেউ পেয়েছে, তার সাথেই শত্রুতা করা হয়েছে। যদি আমি বেঁচে থাকি, তবে অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করবো। এর কিছুকাল পরই ওয়ারাকা ইন্তেকাল করেন। এরপর হঠাৎ ওহীর আগমন বন্ধ হয়ে যায়।[৬]

তাবারী এবং ইবনে হিশামের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ওহী নাযিল বন্ধ হওয়ার সময়েও তিনি হেরার গুহায় আরো কিছুকাল অবস্থান করে নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ করেন। পরে মক্কায় ফিরে যান। তাবারীর বর্ণনায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘর থেকে বের হওয়ার ওপরও আলোকপাত করা হয়েছে। সে বর্ণনা নিম্নরূপ।

ওহী আসার পরের মানসিক অবস্থা আলোচনা করতে গিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর মখলুকের মধ্যে কবি এবং পাগল ছিলো আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত। প্রচন্ড ঘৃণার কারণে এদের প্রতি চোখ তুলে তাকাতেও আমার ইচ্ছা হতো না। ওহী আসার পর আমি মনে মনে বললাম, কোরায়শরা আমাকে কবি বা পাগল বলবে না তো? এরূপ চিন্তার পর আমি পাহাড়চূড়ায় উঠে ঝাপ দিয়ে নিজেকে শেষ করে দেয়ার চিন্তা করলাম। একদিন এক পাহাড়ে উঠলামও। পাহাড়ের মাঝামাঝি ওঠার পর হঠাৎ আসমান থেকে আওয়ায এলো,

৫. 'আল্লামাল ইনসানা মা লাম ইয়ালাম' পর্যন্ত নাযিল হয়েছিলো।
৬. সহীহ বোখারীতে 'কিভাবে ওহী নাযিল হয়েছিলম্ব (১ম খন্ড পৃ. ২, ৩) অধ্যায়ে ঈষৎ পরিবর্তিতভাবে এই বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে।

মোহাম্মদ আপনি আল্লাহর রসূল। আমি জিবরাঈল। প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, এই আওয়ায শোনার পর আকাশের প্রতি তাকালাম। দেখলাম জিবরাঈল মানুষের আকৃতি ধরে দিগন্তে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বলছেন, হে মোহাম্মদ, আপনি আল্লাহর রসূল, আমি জিবরাঈল বলছি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি থমকে দাঁড়িয়ে সেখানে জিবরাঈলকে দেখতে লাগলাম। যে ইচ্ছা করে এসেছিলাম সে ইচ্ছার কথা ভুলে গেলাম। আমি তখন সামনেও যেতে পারছিলাম না, পেছনেও না। আকাশের যেদিকেই তাকাচ্ছিলাম, সেদিকেই জিবরাঈলকে দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। এর মধ্যে খাদিজা আমার খোঁজে লোক পাঠালেন। আমাকে খুঁজে না পেয়ে তারা মক্কায় ফিরে এলো।

জিবরাঈল চলে যাওয়ার পর আমি নিজের ঘরে ফিরে এলাম। খাদিজার উরুর পাশে হেলান দিয়ে বসলাম। তিনি বললেন, আবুল কাশেম, আপনি কোথায় ছিলেন? আপনার খোঁজে আমি একজন লোক পাঠিয়েছি, সে মক্কায় গিয়ে খুঁজে এসেছে, কিন্তু আপনাকে পায়নি। আমি তখন যা কিছু দেখেছি, খাদিজাকে তা বললাম। তিনি বললেন, হে আমার চাচাতো ভাই, আপনি খুশি হোন এবং দৃঢ়পদ থাকুন, আমার আশা, আপনি এই উম্মতের নবী হবেন। এরপর তিনি ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে গেলেন। তাঁকে সব কথা শোনালেন। তিনি সব শুনে বললেন, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে ওয়ারাকার প্রাণ রয়েছে, তাঁর কাছে সেই ফেরেশতা এসেছেন, যিনি হযরত মুসা (আ.)-এর কাছে এসেছিলেন। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই উম্মতের নবী। তাঁকে বলবে, তিনি যেন দৃঢ়পদ থাকেন।

এরপর হযরত খাদিজা ফিরে এসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওয়ারাকার কথা শোনালেন! প্রিয় নবী হেরা গুহায় তাঁর অবস্থানের মেয়াদ পূর্ণ করে মক্কায় আসেন। এ সময় ওয়ারাকা ইবনে নওফেল তাঁর সাথে দেখা করে সব কথা বিস্তারিত শোনার পর বললেন, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আপনি হচ্ছেন এই উম্মতের নবী। আপনার কাছে সেই বড় ফেরেশতা এসেছেন, যিনি হযরত মুসা (আ.)-এর কাছে এসেছিলেন।[৭]

সাময়িকভাবে ওহীর আগমন স্থগিত

ঐ সময়ে ওহীর আগমন কতোদিন যাবত স্থগিত ছিলো? এ সম্পর্কে ইবনে সা'দ হযরত ইবনে আব্বাসের একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন। এতে উল্লেখ রয়েছে যে, ওহী কয়েকদিনের জন্যে স্থগিত ছিলো। সবদিক বিবেচনা করলে এ বর্ণনাই যথার্থ মনে হয়। একটা কথা বিখ্যাত রয়েছে যে, আড়াই বা তিন বছর ওহী স্থগিত ছিলো, এই বিবরণ সত্য নয়। এ সম্পর্কিত যুক্তি প্রমাণ সম্পর্কে এখানে আলোচনার দরকার নেই।[৮]

ওহী স্থগিত থাকার সময়ে প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষণ্ন এবং চিন্তাযুক্ত থাকতেন। তিনি মানসিক অস্থিরতা এবং উদ্বেগের মধ্যে ছিলেন। সহীহ বোখারী শরীফের কিতাবুত তাবীর-এর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, ওহীর আগমন স্থগিত হওয়ার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতোটা অস্থিরতা এবং চিন্তার মধ্যে ছিলেন যে, কয়েকবার উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছিলেন যেখান থেকে লাফিয়ে নীচে পড়বেন। কিন্তু পাহাড়ে ওঠার পর জিবরাঈল আসতেন এবং বলতেন হে মোহাম্মদ, আপনি আল্লাহর রসূল। এ কথা শোনার পর তিনি থমকে দাঁড়াতেন। তাঁর উদ্বেগ অস্থিরতা কেটে যেতো। প্রশান্ত মনে তিনি ঘরে ফিরে আসতেন। পুনরায় ওহী না আসার কারণে তিনি অস্থির হয়ে উঠতেন এবং পাহাড়ে গিয়ে উঠতেন। সেখানে জিবরাঈল এসে হাযির হতেন এবং বলতেন, হে মোহাম্মদ, আপনি আল্লাহর রসূল।[৯]

৭.হিয়াব. পৃ. ২০৭, ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, ২৩৭-২৩৮, এ বর্ণনার সত্যতা সম্পর্কে আমি অবশ্য দ্বিধান্বিত। ওয়ারাকার সাথে আলোচনার ঘটনা ওহী আসার পরই ঘটেছিল। বোখারী বর্ণিত হাদীস পর্যালোচনার পর এ সিদ্ধান্তে পৌছুতে হয় যে, ওয়ারাকার সাথে আলোচনা মক্কায় ওহী প্রাপ্তির পরেই হয়েছিল।

৮. ১১ নং টীকায় এ সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে।

৯. সহীহ বোখারী 'কিতাবুত তাবির, রুইয়া সালেহাহ্ ২য় খন্ড, পৃ. ১০৩৪।

ওহী নিয়ে পুনরায় জিবরাঈলের আগমন

হাফেজ ইবনে হাজার লিখেছেন, ওহী কিছুকাল স্থগিত থাকার কারণ ছিলো এই যে, তিনি যে ভয় পেয়েছিলেন সেই ভয় যেন কেটে যায় এবং পুনরায় ওহী প্রাপ্তির আগ্রহ এবং প্রতীক্ষা যেন তাঁর মনে জাগে।[১০]

বিস্ময়ের ঘোর কেটে যাওয়ার পর, বাস্তব অবস্থা তার সামনে প্রকাশ পেলো। তিনি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারলেন যে, তিনি আল্লাহর নবী হয়েছেন। তিনি আরো বুঝতে সক্ষম হলেন যে, কাছে যিনি এসেছিলেন তিনি ওহীর বাণী বহনকারী, আসমানী সংবাদবাহক। এইরূপ বিশ্বাস তাঁর মনে দৃঢ় হওয়ার পর তিনি আগ্রহের সাথে ওহীর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তাঁকে দৃঢ় হয়ে থাকতে হবে এবং এ দায়িত্ব বহন করতে হবে। মানসিক অবস্থার এ পর্যায়ে হযরত জিবরাঈল (আ.) পুনরায় এসে হাযির হলেন। সহীহ বোখারী শরীফে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রিয় নবীর মুখে ওহী স্থগিত হওয়ার বিবরণ শুনেছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি পথ চলছিলাম। হঠাৎ আকাশ থেকে একটি আওয়ায শোনা গেলো। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি সেই ফেরেশতা যিনি হেরা গুহায় আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি আসমান যমীনের মাঝখানে একখানি কুরসীতে বসে আছেন। আমি ভয় পেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। এরপর বাড়ীতে এসে আমার স্ত্রীর কাছে বললাম, আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও, আমাকে চাদর জড়িয়ে দাও। স্ত্রী আমাকে চাদর জড়িয়ে শুইয়ে দিলেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা সূরা মোদদাসসের-এর 'ওয়াররুজযা ফাহজুর' পর্যন্ত নাযিল করেন। এ ঘটনার পর থেকে ঘন ঘন ওহী নাযিল হতে থাকে।[১১]

ওহীর বিভিন্ন রকম

প্রিয় নবীর ওপর ওহী নাযিল হওয়ার পর অর্থাৎ তিনি নবুয়ত পাওয়ার পর তাঁর যে জীবন শুরু হয়, সে আলোচনায় যাওয়ার আগে ওহীর প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোকপাত করা দরকার। এতে রেসালত ও নবুয়ত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। আল্লামা ইবনে কাইয়েম নিম্নোক্ত কয়েক প্রকারের ওহীর কথা উল্লেখ করেছেন:

এক. সত্য স্বপ্ন-স্বপ্নের মাধ্যমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ওহী নাযিল।

দুই. ফেরেশতা তাঁকে দেখা না দিয়ে তাঁর মনে কথা বসিয়ে দিত। যেমন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, রুহুল কুদুস আমার মনে একথা বসিয়ে দিলেন যে, কোন মানুষ তার জন্যে নির্ধারিত রেযেক পাওয়ার আগে মৃত্যু বরণ করে না। কাজেই আল্লাহকে ভয় করো এবং ভালো জিনিস তালাশ করো। রেযেক পেতে বিলম্ব হলে আল্লাহর নাফরমানীর মাধ্যমে রেযেক তালাশ করো না। কেননা আল্লাহর কাছে যা কিছু রয়েছে, সেটা তাঁর আনুগত্য ছাড়া পাওয়া যায় না।

তিন. ফেরেশতা মানুষের আকৃতি ধরে তাকে সম্বোধন করতেন। তিনি যা কিছু বলতেন, প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা মুখস্ত করে নিতেন। এ সময় কখনো কখনো সাহাবারাও ফেরেশতাদের দেখতে পেতেন।

চার. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ওহী ঘন্টাধ্বনির মতো টন টন শব্দে আসতো। এটি ছিলো ওহীর সবচেয়ে কঠোর অবস্থা। এ অবস্থায় ফেরেশতা তাঁর সাথে দেখা করতেন এবং প্রচন্ড শীতের মওসুম হলেও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘেমে যেতেন। তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়তো। তিনি উটের ওপর সওয়ার থাকলে মাটিতে বসে পড়তেন। একবার হযরত যায়েদ ইবনে সাবেতের উরুর ওপর তাঁর উরু থাকা অবস্থায় ওহী

---

১০. ফতহুল বারী, ১ম খন্ড, পৃ. ২৭

১১. সহীহ বোখারী 'কিতাবুত তাফসীর' অধ্যায় 'ওয়ার রুজযা ফাহজুরব ২য় খন্ড পৃ. ৭৩৩। এ বর্ণনায় একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, রসূল (স.) বলেছেন, আমি হেরা গুহায় এতেকাফ করেছি। এতেকাফ পূর্ণ করার পর নিচে নেমে এলাম। এরপর আমি যখন প্রান্তর ধরে অগ্রসর হচ্ছিলাম, তখন আমাকে ডাকা হলো। ডানে বাঁয়ে সামনে পেছনে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেলাম না। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি সেই ফেরেশতা। ....। সীরাত রচয়িতাদের সকল বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রসূল তিন বছর রমযান মাসে হেরা গুহায় এতেকাফ করেন। তৃতীয় রমযানে তাঁর কাছে জিবরাঈল (আ.) ওহী নিয়ে আসেন। তিনি রমযানের পুরো মাস এতেকাফ করে ১ম শওয়ালে খুব ভোরে মক্কায় ফিরে আসতেন। উল্লিখিত রেওয়ায়েতের সাথে এ বিবরণ সংযুক্ত করলে এ সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, সূরা মোদদাসসেরের প্রথম অংশের ওহী—প্রথম ওহীর দশদিন পর নাযিল হয়েছিল। অর্থাৎ ওহী স্থগিত থাকার মেয়াদ ছিল দশদিন।

এলো, হযরত যায়েদ এতো ভারি বোধ করলেন যে, তাঁর উরু থেতলে যাওয়ার মতো অবস্থা হলো।

পাঁচ. তিনি ফেরেশতাকে তার প্রকৃত চেহারায় দেখতেন। সেই অবস্থায়ই আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর ওপর ওহী নাযিল হতো। দু'বার এরূপ হয়েছিলো। পাক কোরআনে সূরা নাজম-এ আল্লাহ তায়ালা সে কথা উল্লেখ করেছেন।

ছয়. মেরাজের রাতে নামায ফরয হওয়া এবং অন্যান্য বিষয়ক ওহী আকাশে নাযিল হয়েছিলো। প্রিয় নবী তখন আকাশে ছিলেন।

সাত. ফেরেশতার মাধ্যম ছাড়া আল্লাহর সরাসরি কথা বলা। হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে আল্লাহ তায়ালা যেমন কথা বলেছিলেন। হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে আল্লাহর কথা বলার প্রমাণ কোরআনে রয়েছে। প্রিয় নবীর সাথে আল্লাহর কথা বলার প্রমাণ মে'রাজের হাদীসে রয়েছে।

আট. আর এক প্রকার কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। এটি হচ্ছে আল্লাহর মুখোমুখি পর্দা বিহীন অবস্থায় কথা বলা। কিন্তু এ ব্যাপারে মতপার্থক্যের অবকাশ রয়েছে।[১২]

তাবলীগের নির্দেশ

সূরা মোদদাসসের-এর প্রথম দিকের কয়েকটি আয়াতে প্রিয় নবীকে যেসব নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, এসব নির্দেশ দৃশ্যত সংক্ষিপ্ত এবং সহজ সরল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব নির্দেশ খুবই সুদূরপ্রসারী এবং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। বাস্তব জীবনে এসব নির্দেশের কার্যকারিতা ও প্রভাব অসামান্য। যথা-

এক. ভয় প্রদর্শন করতে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে এই নির্দেশের শেষ মনযিল হচ্ছে এই যে, বিশ্বে আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেসব কাজ হচ্ছে, তার মারাত্মক পরিণাম সম্পর্কে সবাইকে জানিয়ে দেয়া। সেই ভয় এমনভাবে দেখাতে হবে যাতে, আল্লাহর আযাবের ভয়ে মানুষের মনে মগজে ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়।

দুই. রব এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনার শেষ মনযিল হচ্ছে আল্লাহর যমীনে শুধুমাত্র তাঁরই শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব অটুট থাকবে, অন্য কারোর শ্রেষ্ঠত্ব বহাল থাকতে দেয়া যাবে না বরং অন্য সব কিছুর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য নস্যাৎ করে দিতে হবে। ফলে আল্লাহর যমীনে একমাত্র তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, কর্তৃত্ব ও মহিমাই শুধু প্রকাশ পাবে এবং স্বীকৃত হবে।

তিন. পোশাকের পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতার শেষ মনযিল হচ্ছে এই যে, প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল প্রকার পাক সাফ রাখতে হবে। এ অবস্থা এমন পর্যায়ে উন্নীত হতে হবে যাতে করে, আল্লাহর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় পাওয়া যায়। এটা শুধুমাত্র তাঁরই হেদায়াত ও নূরের দ্বারা সম্ভব হতে পারে। উল্লিখিত পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জনের পর অন্তর আল্লাহর প্রতি আকৃষ্ট এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমাই অন্তরে জাগ্রত হবে। এর ফলে সমগ্র বিশ্বের মানুষ বিরোধিতা বা আনুগত্যে তাঁর কাছাকাছি থাকবে। তিনিই হবেন সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু।

চার. কারো প্রতি দয়া বা অনুগ্রহ করার পর অধিক বিনিময় প্রত্যাশা না করার শেষ মনযিল এই যে, নিজের কাজকর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করা যাবে না, বেশী গুরুত্ব দেয়া যাবে না। বরং একটির পর অন্য কাজের জন্যে চেষ্টা সাধনা চালিয়ে যেতে হবে। বড় রকমের ত্যাগ ও কোরবানী করেও সেটাকে তুচ্ছ মনে করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ এবং তাঁর সামনে জবাবদিহির ভয়ের অনুভূতির সামনে নিজের চেষ্টাসাধনাকে ক্ষুদ্র ও সামান্য মনে করতে হবে।

পাঁচ. শেষ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে দাওয়াতের কাজ শুরু হওয়ার পর শত্রুরা বিরোধিতা, হাসিঠাট্টা, উপহাস বিদ্রূপ ইত্যাদির মাধ্যমে কষ্ট দেবে এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গীদের হত্যা করার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। তাঁকে এসব কিছুর সাথে মোকাবেলা করতে হবে। এমতাবস্থায় তাঁকে দৃঢ়তার সাথে ধৈর্যধারণ করতে হবে। এই ধৈয মনের শান্তির জন্যে নয় বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর দ্বীনের প্রচার প্রসারের জন্যে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'ওয়া লিরাব্বেকা ফাছবের' অর্থাৎ তোমার প্রতিপালকের জন্যে ধৈর্যধারণ করবে।

কী চমৎকার! এ সকল নির্দেশ প্রকাশ্য ভাষায় কতো সহজ সরল এবং সংক্ষিপ্ত। শব্দ চয়ন কতো হালকা এবং কাব্যধর্মী। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা কতো ব্যাপক ও তাৎপর্যমন্ডিত। এই কয়েকটি শব্দের প্রকৃত প্রয়োগের ফলে চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে যাবে এবং বিশ্বের দিকদিগন্তের মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতির সুদৃঢ় বন্ধন স্থাপিত হবে।

---

১২. যাদুল মায়াদ ১ম খন্ড, পৃ. ১৮।

উল্লেখিত আয়াতগুলোতে দাওয়াত ও তাবলীগের উপাদানও বিদ্যমান রয়েছে। বনি আদমের কিছু আমল এমন রয়েছে, যার পরিণাম মন্দ। এ কথা সবাই জানে যে, মানুষ যা কিছু করে, তার সব কিছুর বিনিময় এ পৃথিবীতে তাকে দেয়া হয় না এবং দেয়া সম্ভবও না। স্বাভাবিকভাবেই এমন একটা দিন থাকা দরকার, যেদিন সব কাজের পুরোপুরি বিনিময় দেয়া হবে। সেই দিনের নাম হচ্ছে কেয়ামত। সেদিন বিনিময় দেয়ার একটা অনিবার্য প্রয়োজন এই যে, আমরা এ পৃথিবীতে যে জীবন যাপন করছি, এর চেয়ে একটা পৃথক জীবন থাকা দরকার।

অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের কাছে নির্ভেজাল তাওহীদের অনুসারী হওয়ার দাবী জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বান্দা যেন তার সব ইচ্ছা-আকাঙ্খা আল্লাহর ওপরই ন্যস্ত করে। প্রবৃত্তির খায়েশ এবং মানুষের অন্যান্য ইচ্ছার ওপর সে যেন আল্লাহর ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দেয়। এমনি করে দাওয়াত ও তাবলীগের দায়িত্ব সম্পন্ন হতে পারে। এসব শর্ত নিম্নরূপ।
ক, তাওহীদ। খ, পরকালের প্রতি বিশ্বাস। গ. তাযকিয়ায়ে নফ্স এর ওপর গুরুত্বারোপ। অর্থাৎ সকল প্রকার অশ্লীলতা ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা। পুণ্য কাজ বেশী করে করা এবং তার ওপর অটল থাকার চেষ্টা। ঘ. নিজের সকল কাজ আল্লাহর ওপর ন্যস্ত করা। ঙ. এসব কিছু প্রিয় নবীর নবুয়ত ও রেসালাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন এবং অসাধারণ নেতৃত্বের অনুসরণের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

এসব আয়াতে আসমানী নির্দেশ রয়েছে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় নবীকে এক মহান কাজের জন্যে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। ঘুমের আরাম পরিত্যাগ করে জেহাদের কষ্টকর ময়দানে অবতীর্ণ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। সূরা মোদদাসসেরের প্রথম কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা যেমন বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের জন্যে বাঁচবে, শুধু সেইতো আরামের জীবন কাটাতে পারে। কিন্তু যার ওপর বিশাল মানবগোষ্ঠীর পথনির্দেশের দায়িত্বের বোঝা সে কি করে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকতে পারে? উষ্ণ বিছানার সাথে আরামদায়ক জীবনের সাথে তার কি সম্পর্ক? তুমি সেই মহান কাজের জন্যে বেরিয়ে পড়ো, যে কাজ তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তোমার জন্যে প্রস্তুতকৃত বিরাট দায়িত্বের বোঝা তোলার জন্যে এগিয়ে এসো। সংগ্রাম করতে এগিয়ে এসো। কষ্ট করো। ঘুম এবং আরামের সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। এখন সময় বিনিদ্র রজনী কাটানোর, সময় দীর্ঘ পরিশ্রমের। তুমি একাজ করতে তৈরী হও।

এ নির্দেশ বিরাট তাৎপর্য মন্ডিত। এই নির্দেশ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আরামের জীবন থেকে বের করে তরঙ্গসঙ্কুল অথৈ সমুদ্রে নিক্ষেপ করে দিয়েছে। মানুষের বিবেকের সামনে এবং জীবনের বাস্তবতার সামনে এনে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

এরপর আল্লাহর রসূল উঠে দাঁড়িয়েছেন এবং সুদীর্ঘ বিশ বছরের বেশী সময় যাবত দাঁড়িয়েই থেকেছেন। এই সময়ে তিনি ছিলেন জীবন সংগ্রামে অটল অবিচল। আরাম আয়েশ পরিত্যাগ করেছেন, নিজ এবং পরিবার পরিজনের সুখ-শান্তি আরাম বিসর্জন দিয়েছেন। উঠে দাঁড়ানোর পর তিনি সেই অবস্থাতেই ছিলেন। তাঁর কাজ ছিলো আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়া। কোন প্রকার চাপ সৃষ্টি ছাড়াই এ দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। এই দায়িত্ব ছিলো পৃথিবীতে 'আমানতে কোবরা' অর্থাৎ বিরাট আমানতের বোঝা। সমগ্র মানবতার বোঝা, সমগ্র আকীদা বিশ্বাসের বোঝা। বিভিন্ন ময়দানে জেহাদের বোঝা। বিশ বছরেরও বেশী সময় তিনি এই সংগ্রামমুখর জীবন যাপন করেছেন। আসমানী নির্দেশ পাওয়ার পর থেকে কখনোই তিনি এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থা সম্পর্কে অমনোযোগী বা উদাসীন ছিলেন না। আল্লাহ তায়ালা তাকে আমাদের এবং সমগ্র মানব জাতির পক্ষ থেকে উত্তম পুরস্কার দান করুন।[১৩]

---

১৩. তাফসীর ফি যিলালিল কোরআন, সাইয়েদ কুতুব শহীদ সূরা মোযযাম্মেল, সূরা মোদদাসসের, পারা ২৯, পৃ. ১৬৮, ১৭৬, ১৭২ (মূল আরবী খন্ড)

প্রথম পর্যায়
ব্যক্তিগত উদ্যোগ

গোপনীয় দাওয়াতের তিন বছর

মক্কা ছিলো আরব দ্বীপের কেন্দ্রস্থল। এখানে কাবাঘরের পাসবান বা তত্ত্বাবধায়ক ছিলো। আরবরা মূর্তির নেগাহবানও ছিলো, যাদেরকে সমগ্র আরবের লোকেরা মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতো। এ কারণে অন্য সব স্থানের চেয়ে মক্কায় মূর্তির বিরুদ্ধে সংস্কার প্রচেষ্টা সফল হওয়া ছিলো অধিক কষ্টকর। এখানে এমন দৃঢ়চিত্ততার প্রয়োজন ছিলো যাতে, কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট এবং বিপদ বাধা বিন্দুমাত্র সরাতে না পারে বরং বিপদ বাধায় অটল অবিচল থাকা যায়। কাজেই কৌশল হচ্ছে যে, দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ প্রথমে গোপনীয়ভাবে সম্পন্ন করতে হবে যাতে, মক্কাবাসীদের মধ্যে হঠাৎ কোন কোলাহল সৃষ্টি না হয়।

ইসলামের প্রথম পর্যায়ের কিছু সৈনিক

রসূল সর্বপ্রথম তাদের কাছেই দ্বীনের দাওয়াত দেবেন, যাঁরা তাঁর নিকটাত্মীয়, যাদের সাথে রয়েছে তাঁর গভীর সম্পর্ক, এটাই স্বাভাবিক। নিজের পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের আগে দাওয়াত দেবেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে তাই এসব লোককে দাওয়াত দেন। চেনা পরিচিত লোকদের মধ্যে তাদেরকেই তিনি দাওয়াত দিয়েছেন, যাদের চেহারায় সরলতা এবং নমনীয়তার ছাপ দেখতে পেয়েছিলেন। এছাড়া তিনি যাদের সম্পর্কে জানতেন যে, তারা তাঁকে সত্যবাদী, ন্যায়নীতিপরায়ণ ও সৎ মানুষ হিসাবে জানে এবং শ্রদ্ধা করে তাঁদেরকেও।

আল্লাহর রসূলের দাওয়াতে তাদের কয়েকজন ইসলাম গ্রহণ করেন। এরা প্রিয় রসূলের সততা, সত্যবাদিতা ও মহানুভবতা সম্পর্কে কখনোই কোন প্রকার সন্দেহ করতেন না। ইসলামের ইতিহাসে এরা 'সাবেকীনে আউয়ালীন' নামে পরিচিত। এদের মধ্যে শীর্ষ তালিকায় রয়েছেন রসূলের সহধর্মিনী উম্মুল মোমেনীন খাদিজা বিনতে খোয়াইলেদ, তাঁর মুক্ত করা ক্রীতদাস যায়েদ ইবনে সাবেত ইবনে শরাহবিল কালবি।[১] তাঁর চাচাতো ভাই হযরত আলী ইবনে আবু তালেব, যিনি সে সময় তাঁর পরিবারে প্রতিপালিত হচ্ছিলেন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সুহৃদ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) আজমাঈন। এরা সবাই প্রথম দিনেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।[২]

---

১. তিনি এসেছিলেন যুদ্ধে বন্দী দাস হয়ে। পরে হযরত খাদিজা তাঁর মালিক হন এবং স্বামীর জন্যে তাকে দান করে দেন। এরপর তাঁর পিতা ও চাচা তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিলেন কিন্তু পিতা ও চাচাকে ছেড়ে তিনি প্রিয় রসূল (স.)-এর সাথে থাকতে পছন্দ করেন। এরপর রসূল তাঁর ভৃত্য যায়েদকে আরব দেশীয় রীতি অনুযায়ী পালকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। এ ঘটনার পর তিনি যায়েদ ইবনে মোহাম্মদ নামে পরিচিত হন। ইসলামের আগমনে পালক পুত্রের আরবদেশীয় প্রাচীন রীতির অবসান ঘটে।

২. রহমাতুল লিল আলামিন, ১ম খন্ড পৃ. ৫০।

ইসলাম গ্রহণের পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন সর্বজনপ্রিয় নরম মেজায, উত্তম চরিত্র এবং উদার মনের মানুষ। চমৎকার ব্যবহারের কারণে সব সময় তাঁর কাছে মানুষ যাওয়া আসা করতো। এ সময় বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য লোকদের কাছে হযরত আবু বকর (রা.) দ্বীনের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। তার চেষ্টায় হযরত ওসমান (রা.), হযরত যোবায়ের (রা.), হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ, হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসও, হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা.) প্রমুখ ইসলাম গ্রহণ করেন। এরা ছিলেন ইসলামের প্রথম সারির সৈনিক।

প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে হযরত বেলাল (রা.)ও ছিলেন একজন। তাঁর পরে আমীনে উম্মত হযরত আবু ওবায়দা, আমের ইবনে জাররাহ, আবু সালমা ইবনে আবদুল আছাদ, আরকাম ইবনে আবুল আরকাম, ওসমান ইবনে মাজউন, এবং তাঁর দুই ভাই, কোদামা ও আবদুল্লাহ এবং ওবায়দা ইবনে হারেস, মোত্তালেব ইবনে আবদুল মান্নাফ, সাঈদ ইবনে যায়েদ এবং তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ ওমরের বোন ফাতেমা বিনতে খাত্তাব, খাব্বাব ইবনে আরত, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এবং অন্য কয়েকজন ইসলাম গ্রহণ করেন। এরা সম্মিলিতভাবে কোরায়শ বংশের বিভিন্ন শাখার সাথে সম্পর্কিত ছিলেন। ইবনে হিশাম লিখেছেন, এদের সংখ্যা ছিলো চল্লিশের বেশী। (দেখুন ১ম খন্ড, পৃ. ২৪৫-২৬২)। এদের মধ্যের কয়েকজনকেও 'সাবেকীনে আউয়ালীনের' অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, উল্লিখিত ভাগ্যবানদের ইসলাম গ্রহণের পর দলে দলে লোক ইসলামের শীতল ছায়ায় আশ্রয়গ্রহণ করেন। মক্কার সর্বত্র ইসলামের আলোচনা চলতে থাকে এবং ইসলাম ব্যাপকতা লাভ করে।[৩]

এরা গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে ইসলাম শিক্ষা এবং পথ নির্দেশ দেয়ার জন্যে গোপনে গোপনে দেখা করতেন। কেননা তাবলীগের কাজ তখনো বিচ্ছিন্নভাবে এবং গোপনে চলছিলো। সূরা মোদদাসসের-এর প্রথম কয়েকটি আয়াত নাযিল হওয়ার পর ঘন ঘন ওহী নাযিল হতে থাকে। এ সময়ে ছোট ছোট আয়াত নাযিল হচ্ছিলো। এসব আয়াত প্রায় একই ধরনের আকর্ষণীয় শব্দে শেষ হতো। এসব আয়াতে থাকতো চিত্তাকর্ষক গীতিধর্মিতা এবং কাব্যময়তা। পরিবেশের সাথে সেইসব আয়াত পুরোপুরি খাপ খেয়ে যেতো। এসব আয়াতে তাযকিয়ায়ে নফস বা আত্মার শুদ্ধি ও সৌন্দর্য এবং দুনিয়ার মায়াজালে জড়িয়ে যাওয়ার কুফল সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া বেহেশত ও দোযখের বিবরণ এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যেন চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে। এ সকল আয়াত এমন সব স্থান পরিভ্রমণ করিয়ে আনছিলো, যা ছিলো প্রচলিত পরিবেশে সম্পূর্ণ নতুন।

নামাযের আদেশ

প্রথমে যা কিছু নাযিল হয়েছিলো এরমধ্যে নামাযের আদেশও ছিলো। মোকাতেল ইবনে সোলায়মান বলেন, ইসলামের শুরুতে আল্লাহ তায়ালা দু'রাকাত নামায সকালে এবং দু'রাকাত নামায সন্ধ্যার জন্যে নির্দিষ্ট করেছিলেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'সকাল এবং সন্ধ্যায় তোমরা প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তাঁর সেজদা করো।'

ইবনে হাজার বলেন, প্রিয় রসূল এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম মে'রাজের ঘটনার আগেই নামায আদায় করতেন। তবে এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে যে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আগে অন্য

৩. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, ২৬২

কোন নামায ফরয ছিলো কিনা। কেউ কেউ বলেন, সূর্য উদয় হওয়ার আগে এবং অস্ত যাওয়ার আগে এক এক নামায ফরয ছিলো।

হারেস ইবনে ওসামা হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয় নবীর কাছে প্রথম যখন ওহী এসেছিলো, সেই সময় জিবরাঈল এসে তাঁকে প্রথমে ওযুর নিয়ম শিক্ষা দেন। ওযু শেষ করার পর এক আঁজলা পানি লজ্জাস্থানে ছুঁড়ে মারেন। ইবনে মাজাও এ ধরনের হাদীস বর্ণনা করেছেন। বারা' ইবনে আযেব এবং ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এ ধরনের হাদীস বর্ণিত রয়েছে। ইবনে আব্বাসের বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ রয়েছে যে, এই নামায ছিলো প্রথম দিকের ফরযের অন্তর্ভুক্ত।[৪]

ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম নামাযের সময়ে পাহাড়ে চলে যেতেন এবং গোপনে নামায আদায় করতেন। একবার আবু তালেব রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আলী (রা.)-কে নামায আদায় করতে দেখে ফেলেন। তিনি এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তাঁকে জানানোর পর তিনি বলেন, এই অভ্যাস অব্যাহত রেখো।[৫]

কোরায়শদের সংবাদ প্রদান

বিভিন্ন ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, এ সময়ে তাবলীগের কাজ যদিও গোপনভাবে করা হচ্ছিলো, কিন্তু কোরায়শরা কিছু কিছু বুঝতে পারছিলো। তবে তারা ব্যাপারটিকে কোন গুরুত্ব দেয়নি।

ইমাম গাজ্জালী লিখেছেন যে, কোরায়শরা মুসলমানদের তৎপরতার খবর পাচ্ছিলো। কিন্তু তারা এর প্রতি কোন গুরুত্ব দেয়নি। সম্ভবত তারা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন কোন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব মনে করেছিলো, যারা বৈরাগ্যবাদ এবং সংসার বিরাগী হওয়ার বিষয়ে কথাবার্তা বলে থাকেন। আরব সমাজে এ ধরনের লোক ছিলো। যেমন, উমাইয়া ইবনে আবু ছালত, কুস ইবনে সা'দাহ, আমর ইবনে তোফায়েল প্রমুখ। তবে কোরায়শরা এটা লক্ষ্য করেছিলো যে, তাঁর তৎপরতা যেন একটু বেশী এবং ভিন্ন ধরনের। সময়ের গতিধারার সাথে সাথে কোরায়শরা প্রিয় নবীর ধর্মীয় তৎপরতা এবং তাবলীগের প্রতি ক্রমে ক্রমে দৃষ্টি বাড়িয়ে দিচ্ছিলো।[৬]

তিন বছর যাবত দ্বীনের কাজ গোপনভাবে চললো। এ সময়ে ঈমানদারদের একটি দল তৈরী হয়ে গেলো। এরা ভ্রাতৃত্ব এবং সহায়তার ওপর কায়েম ছিলো। তারা আল্লাহর পয়গাম পৌঁছাচ্ছিলো এবং এ পয়গামকে একটা পর্যায়ে উন্নীত করতে চেষ্টা করছিলেন। এরপর আল্লাহ তায়ালা ওহী নাযিল করেন এবং তাঁর কওমকে নির্দেশ প্রদান করেন। দ্বীনের দাওয়াতের সাথে সাথে কোরায়শদের বাতিল শক্তির সাথে সংঘাত এবং তাদের মূর্তির ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরারও নির্দেশ দেয়া হয়।

৪. মুখতাছারুছ ছিরাত, শেখ আবদুল্লাহ পৃ. ৮৮
৫. ইবনে হিশাম ১ম খন্ড, পৃ. ১৪৭
৬. ফেকহুস সিরাত পৃ; ৭৬

দ্বিতীয় পর্যায়
প্রকাশ্য তাবলীগ

দাওয়াতের প্রথম নির্দেশ

এ সম্পর্কে সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালা এ নির্দেশ নাযিল করেছিলেন যে, 'হে নবী, তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দের আল্লাহর আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদান করো।' এটি হচ্ছে সূরা শোয়ারার একটি আয়াত। এ সূরায় সর্বপ্রথম হযরত মুসা (আ.)-এর ঘটনা ব্যক্ত করা হয়। অর্থাৎ বলা হয়, কিভাবে হযরত মুসা (আ.) নবুয়ত পেয়েছিলেন এবং বনি ইসরাইলসহ হিজরত করে ফেরাউন এবং ফেরাউনের জাতি এবং তার সঙ্গী সাথীদের নীল নদে ডুবিয়ে মারা হয়েছিলো। অন্যকথায় এ সূরায় হযরত মুসা (আ.) ফেরাউন এবং বনি ইসরাইলদের কাছে যেভাবে দাওয়াত দিয়েছিলেন, সেই দাওয়াতের বিভিন্ন পর্যায় তুলে ধরা হয়েছে।

আমার ধারণা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর কওমের মধ্যে প্রকাশ্য তাবলীগের নির্দেশ বলে দেয়ার পর হযরত মুসা (আ.)-এর ঘটনা এ কারণেই বলা হয়েছে যাতে, একটা উদাহরণ তার সামনে থাকে। প্রকাশ্যে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার পর হযরত মুসা (আ.)-কে যেভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়েছিলো এবং যে ধরনের বাড়াবাড়ি তাঁর সাথে করা হয়েছিলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের সামনে যেন তার একটা নমুনা সব সময় বিদ্যমান থাকে।

অন্যদিকে এ সূরায় যেসব সম্প্রদায় নবীদের মিথ্যাবাদী বলেছিলো, যেমন ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়, নূহের সম্প্রদায়, আদ, সামুদ, ইবরাহীমের সম্প্রদায়, লুতের সম্প্রদায়, আইকার অধিবাসীসহ এদের সবার পরিণাম কিরূপ হয়েছিলো, সে সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। সম্ভবত এর উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, যেসব লোক আল্লাহর রসূলকে মিথ্যাবাদী বলবে, তারা যেন বুঝতে পারে যে, এ ধরনের আচরণের ওপর অবিচল থাকলে তাদের পরিণাম এবং আল্লাহর কিরূপ পাকড়াও এর সম্মুখীন হতে হবে। এছাড়া ঈমানদাররাও বুঝতে পারবেন যে, উত্তম পরিণাম তাদেরই জন্যে রয়েছে। পক্ষান্তরে যারা নবীকে মিথ্যাবাদী বলে, তাদের পরিণাম মোটেই ভালো হবে না।

নিকটাত্মীয়দের মধ্যে তাবলীগ

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বনু হাশেমদের সমবেত করলেন। তাদের সাথে বনু মোত্তালেব ইবনে আবদে মান্নাফের একটি দলও ছিলো। তারা ছিলো মোট পঁয়তাল্লিশ জন। আবু লাহাব কথা লুফে নিয়ে বিরোধিতার সুরে বললো, দেখো, এরা তোমার চাচা এবং চাচাতো ভাই। কথা বলো তবে মুর্খতার পরিচয় দিয়ো না এবং মনে রেখো, তোমার খান্দান সমগ্র আরবের সাথে মোকাবেলা করতে পারবে না। আমিই

তোমাকে পাকড়াও করার বেশী হকদার। তোমার জন্যে তোমার পিতৃকূলের লোকেরাই যথেষ্ট। যদি তুমি তোমার কথার ওপর অটল থাকো, তাহলে কোরায়শদের সমগ্র গোত্র তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আরবের অন্যান্য গোত্রও তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। এরপর কি হবে? তোমার পিতৃকূলের মধ্যে তুমিই হবে সবচেয়ে বেশী ধ্বংসাত্মক কাজের মানুষ। এসব কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ করে রইলেন, সেই মজলিসে কোন কথা বললেন না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর পুনরায় তাদের সমবেত করলেন এবং বললেন, 'আল্লাহর জন্যেই সকল প্রশংসা। আমি তাঁর প্রশংসা করছি এবং তাঁর কাছেই সাহায্য চাইছি। তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছি। তাঁর ওপর ভরসা করছি। আমি এ সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত এবাদাতের উপযুক্ত কেউ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরিক নেই। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পথ প্রদর্শক তার পরিবারের লোকদের কাছে মিথ্যা কথা বলতে পারে না। সেই আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আমি তোমাদের প্রতি বিশেষভাবে এবং অন্য সব মানুষের প্রতি সাধারণভাবে আল্লাহর রসূল। আল্লাহর শপথ, তোমরা যেভাবে ঘুমিয়ে থাকো, সেভাবেই একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হবে। ঘুম থেকে যেভাবে তোমরা জাগ্রত হও, সেভাবেই একদিন তোমাদের উঠানো হবে। এরপর তোমাদের থেকে তোমাদের কৃতকর্মের হিসাব নেয়া হবে। তারপর রয়েছে চিরকালের জন্যে হয়তো জান্নাত নতুবা জাহান্নাম।'

একথা শুনে আবু তালেব বললেন, তোমাকে সহায়তা করা আমার কতো যে পছন্দ, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। তোমার উপদেশ গ্রহণযোগ্য। তোমার কথা আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি। এখানে তোমার পিতৃকূলের সকলে উপস্থিত রয়েছে, আমিও তাদের একজন। কাজেই তুমি যে কাজের নির্দেশ পেয়েছো, আমি অব্যাহতভাবে তোমার হেফাযত এবং সহায়তা করে যাবো। তবে আমার মন আবদুল মোত্তালেবের দ্বীন ছাড়ার পক্ষপাতি নয়। আবু লাহাব বললো, আল্লাহর শপথ এটা মন্দ কাজ। অন্যদের আগে তুমিই তার হাত ধরেছো? আবু তালেব বললেন, আল্লাহর শপথ, যতোদিন বেঁচে থাকি, ততোদিন আমি তার হেফাযত করতে থাকবো।[১]

সাফা পাহাড়ের ওপর তাবলীগ

নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নিশ্চিতভাবে বুঝলেন যে, আল্লাহর দ্বীনের তাবলীগের ক্ষেত্রে আবু তালেব তাঁকে সহায়তা করবেন, তখন তিনি একদিন সাফা পাহাড়ে উঠে আওয়ায দিলেন, ইয়া সাবাহাহ, অর্থাৎ হায় সকাল।[২] এই আওয়ায শুনে কোরায়শ গোত্রসমূহ তাঁর কাছে সমবেত হলো। তিনি তাদেরকে আল্লাহর তাওহীদ, তাঁর রেসালত এবং রোয কেয়ামতের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দিলেন। এ ঘটনার একটি অংশ সহীহ বোখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

'হে নবী, তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করো।' এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পাহাড়ের ওপর আরোহন করে আওয়ায দিলেন, হে বনি ফেহর, হে বনি আদী। এই আওয়ায শুনে কোরায়শদের

---

১. ফেকহুছ সীরাত পৃ. ৭৭, ৮৮, ইবনুল আছির রচিত ।

২. তখনকার দিনে কোনো ভয়াবহ সংবাদ দেয়ার দরকার হলে মানুষরা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে 'ইয়া সাবাহ' 'ইয়া সাবাহ' হায় সকাল, হায় সকাল বলে চীৎকার করতে থাকতো।

নেতৃস্থানীয় সকল লোক একত্রিত হলো। যিনি যেতে পারেননি, তিনি একজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন কি ব্যাপার সেটা জানার জন্যে। কোরায়শরা এসে হাযির হল, আবু লাহাবও তাদের সঙ্গে ছিলো। এরপর তিনি বললেন, তোমরা বলো, যদি আমি তোমাদের বলি যে, পাহাড়ের ওদিকের প্রান্তরে একদল ঘোড় সওয়ার আত্মগোপন করে আছে, ওরা তোমাদের ওপর হামলা করতে চায়, তোমরা কি সে কথা বিশ্বাস করবে? সবাই বললো, হাঁ বিশ্বাস করবো, কারণ আপনাকে আমরা কখনো মিথ্যা বলতে শুনিনি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তবে শোনো, আমি তোমাদেরকে এক ভয়াবহ আযাবের ব্যাপারে সাবধান করতে প্রেরিত হয়েছি। আবু লাহাব বললো, তুমি ধ্বংস হও। তুমি আমাদেরকে একথা বলার জন্যে এখানে ডেকেছ?

আবু লাহাব একথা বলার পর আল্লাহ তায়ালা সূরা লাহাব নাযিল করেন। এতে বলা হয় আবু লাহাবের দু'টি হাত ধ্বংস হোক এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক।[৩]

এই ঘটনার আরেক অংশ ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'নিকটাত্মীয়দের আল্লাহর আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করো' এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আওয়ায দিলেন সাধারণ ও বিশেষভাবে। তিনি বললেন, 'হে কোরায়শ দল, তোমরা নিজেদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো। হে বনি কা'ব, নিজেদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো। হে মোহাম্মদের মেয়ে ফাতেমা, নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষার ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছি। যেহেতু তোমাদের সাথে আমার আত্মীয়তা রয়েছে, কাজেই এই সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে যথাসম্ভব সজাগ করবো।'[৪]

দাওয়াতের প্রকাশ্য ঘোষণা

এই আওয়াযের স্পন্দন তখনো মক্কার আশে পাশে শোনা যাচ্ছিলো, এমন সময় আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন, 'তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে, সেটা খোলাখুলি তুমি ঘোষণা করো এবং মোশরেকদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।' (১৫, ৯৪)

এরপর রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৌত্তলিকতার নোংরামি ও অকল্যাণসমূহ প্রকাশ্যে তুলে ধরে মিথ্যার পর্দা উন্মোচিত করেন। তিনি মূর্তিসমূহের অন্তসারশূন্যতা ও মূল্যহীনতা তুলে ধরে তাদের স্বরূপও উদঘাটন করেন। তিনি উদাহরণ দিয়ে দিয়ে বোঝাতে থাকেন যে, মূর্তিসমূহ নিরর্থক এবং শক্তিহীন। তিনি আরো জানান যে, যারা এসব মূর্তিপূজা করে এবং নিজের ও আল্লাহর মধ্যে এদেরকে মাধ্যম হিসাবে স্থির করে, তারা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছে।

পৌত্তলিক এবং মূর্তির উপাসকদের পথভ্রষ্ট বলা হয়েছে একথা শোনার পর মক্কার অধিবাসীরা ক্রোধে দিশেহারা হয়ে পড়লো। তাদের ওপর যেন বজ্রপাত হলো, তাদের নিরুদ্বেগ শান্তিপূর্ণ জীবনে যেন ঝড়ের তান্ডব দেখতে পেলো। এ কারণেই কোরায়শরা অকস্মাৎ উৎসারিত

---

৩. সহীহ বোখারী ২য় খন্ড, পৃ. ৭০৬, ৭৪৩ সহীহ মুসলিম ১ম খন্ড. পৃ. ১১৪
৪. সহীহ মুসলিম ১ম খন্ড পৃ. ৩৮৫

এ বিপ্লবের শেকড় উৎপাটনের জন্যে উঠে দাঁড়ালো। কেননা এ বিপ্লবের মাধ্যমে তাদের পৌত্তলিক রুসম রেওয়াজ নির্মূল হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

কোরায়শরা কোমর বেঁধে উঠে দাঁড়ালো। কারণ তারা জানতো যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য সকলকে মাবুদ হিসাবে অস্বীকার করা এবং রেসালাত ও আখেরাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের অর্থ হচ্ছে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে রেসালাতের হাতে ন্যস্ত এবং তার কাছে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করা। এতে করে অন্যদের তো প্রশ্নই আসে না, নিজের জানমাল সম্পর্কে পর্যন্ত নিজের কোন স্বাধীন অধিকার থাকে না। এর অর্থ হচ্ছে যে, আরবের লোকদের ওপর মক্কার লোকদের ধর্মীয় ক্ষেত্রে যে শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব ছিলো, সেটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এর ফলে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের ইচ্ছা ও মর্জিই হবে চূড়ান্ত, নিজেদের ইচ্ছামতো তারা কিছুই করতে পারবে না। নীচু শ্রেণীর লোকদের ওপর তারা যে অত্যাচার নির্যাতন চালিয়ে আসছিলো, সকাল সন্ধ্যা তারা যেসব ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত ছিলো সেসব থেকে তাদের দূরে থাকতে হবে। কোরায়শরা এর অর্থ ভালোই বুঝতে পারছিলো। তাই তাদের দৃষ্টিতে অবমাননাকর এরূপ অবস্থা তারা মেনে নিতে পারছিলো না। কিন্তু এটা কোন কল্যাণ বা মঙ্গলের প্রত্যাশায় নয়, বরং আরো বেশী মন্দ কাজে নিজেদের জড়িত করাই এর উদ্দেশ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'বরং এ জন্যে যে, মানুষ চায় ভবিষ্যতেও তারা মন্দ কাজে লিপ্ত হবে।' (৫, ৭৫)

কোরায়শরা এসব কিছুই বুঝতে পারছিলো। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে, তাদের সামনে এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি ছিলেন, সত্যবাদী এবং বিশ্বাসী। তিনি ছিলেন আদর্শের উত্তম দৃষ্টান্ত। দীর্ঘকাল যাবত মক্কার অধিবাসীরা পূর্ব পুরুষদের মধ্যে এ ধরনের দৃষ্টান্ত দেখেনি, শোনেওনি। এমন এক ব্যক্তিত্বের সাথে তারা কিভাবে মোকাবেলা করবে, সেটাও ভেবে ঠিক করতে পারছিলো না। তারা ছিলো অবাক ও বিস্মিত। অবশ্য এভাবে বিস্মিত হওয়ার পেছনে কিছু কারণও ছিলো।

কোরায়শরা অনেক চিন্তা-ভাবনার পর এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, তারা প্রিয় নবীর চাচা আবু তালেবের কাছে যাবে এবং তাকে এক মাস অনুরোধ করবে যে, তিনিই যেন নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে তাঁর এই কাজ থেকে বিরত রাখেন। নিজেদের দাবীকে যুক্তিগ্রাহ্য ও বিশ্বাসযোগ্য করতে তারা এ দলিল তৈরী করলো যে, তাদের উপাস্যদের পরিত্যাগ করার দাওয়াত দেয়া এবং তারা যে ভালো-মন্দ কোন কিছু করার শক্তি রাখে না এ কথা বলা প্রকৃতপক্ষে তাদের উপাস্যদের প্রতি অবমাননাকর এবং মারাত্মক গালিস্বরূপ।

তাছাড়া এটা হচ্ছে আমাদের পিতা ও পিতামহ অর্থাৎ আমাদের পূর্ব পুরুষদের নির্বোধ এবং পথভ্রষ্ট আখ্যায়িত করার শামিল। কেননা বর্তমানে আমরা যে ধর্ম বিশ্বাসের ওপর রয়েছি, তারাও একই ধর্ম বিশ্বাসের ওপর জীবন যাপন করেছিলেন। অপরাপর কোরায়শদের এসব কথা বোঝানোর পর তারা সহজেই বুঝাতে পারলো এবং এতে দ্রুত সাড়া দিলো।

আবু তালেব সমীপে কোরায়শ প্রতিনিধিদল

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, কোরায়শদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ক'জন লোক আবু তালেবের কাছে গিয়ে বললো যে আবু তালেব, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের উপাস্যদের গালাগাল করছে আমাদের দ্বীনকে পথভ্রষ্টতা বলছে এবং বিবেককে নির্বুদ্ধিতা বলে অভিহিত করছে। এমনকি আমাদের পিতা ও পিতামহদেরও পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করছে। কাজেই হয়তো আপনি তাকে বাধা দিন

অথবা তাঁর এবং আমাদের মাঝখান থেকে আপনি সরে দাঁড়ান। কেননা আপনিও আমাদের একই ধর্মের বিশ্বাসী। তার সাথে বোঝাপড়ার জন্যে আমরা নিজেদেরই যথেষ্ট মনে করি।

এ আবেদনের জবাবে আবু তালেব নরম ভাষায় কথা বললেন এবং মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করলেন। ফলে তারা ফিরে গেলো। অন্যদিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই নিয়মে অব্যাহতভাবে দ্বীনের তাবলীগ করতে লাগলেন এবং দ্বীনের প্রচার প্রসারে মনোনিবেশ করলেন।[৫]

হাজীদের বাধা দেয়ার জন্যে জরুরী বৈঠক

সেই সময়ে কোরায়শদের সামনে আরো একটি সমস্যা এসে উপস্থিত হলো। প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর এসে পড়লো হজ্জের মৌসুম। কোরায়শরা জানতো যে, আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিনিধিদল এ সময় মক্কায় আসবে। তাই তারা দরকার মনে করলো যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে এমন সব কথা বলবে যাতে তাদের মনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তাবলীগের কোন প্রভাব না পড়ে। এ বিষয়ে আলোচনার জন্যে তারা ওলীদ ইবনে মুগীরার কাছে একত্রিত হলো। ওলীদ বললো, প্রথমে তোমরা সবাই একমত হবে, একজনের কথা অন্যজন মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবে এমন অবস্থা যেন না হয়। তোমাদের মধ্যে কোন প্রকার মতপার্থক্য থাকতে পারবে না। আগন্তুকরা বললো, আপনিই আমাদের বলে দিন, আমরা কি বলব। ওলীদ বললো, তোমরা বলো, আমি শুনব। এরপর কয়েকজন বললো, আমরা বলব যে, তিনি একজন জ্যোতিষী। ওলীদ বললো, না তিনি জ্যোতিষী নন, আমি জ্যোতিষীদের দেখেছি, তার মধ্যে জ্যোতিষীদের মতো বৈশিষ্ট্য নেই। জ্যোতিষীরা যেভাবে আন্তসারশূন্য কথা বলে থাকে তিনি সেভাবে বলেন না। এ কথা শুনে আগন্তুকরা বললো, তাহলে আমরা বলব যে, তিনি একজন পাগল। ওলীদ বললো, না তিনি পাগলও নন। আমি পাগলও দেখেছি, পাগলের প্রকৃতিও দেখেছি। তিনি পাগলের মতো আচরণও করেন না। পাগলের মতো উল্টাপাল্টা কথাও বলেন না। লোকেরা বললো, তাহলে আমরা বলব যে, তিনি একজন কবি। ওলীদ বললো, তিনি কবিও নন। কবিত্বের বিভিন্ন রকম আমার জানা আছে। তাঁর কথা কবিতা নয়। লোকরা বললো, তাহলে আমরা বলব যে, তিনি একজন যাদুকর। ওলীদ বললো, না তিনি যাদুকরও নন। আমি যাদুকর এবং তাদের যাদু দেখেছি। তিনি ঝাড়ফুঁক করেন না এবং যাদুটোনাও করেন না। আগন্তুকরা বললো, তাহলে আমরা কি বলব? ওলীদ বললো, আল্লাহর শপথ তার কথা বড় মিষ্টি। তার কথার তাৎপর্য অনেক গভীরতাপূর্ণ। তোমরা যে কথাই বলবে, শ্রোতারা সবাই মিথ্যা মনে করবে। তবে তার সম্পর্কে একথা বলতে পারো যে, তিনি একজন যাদুকর। তিনি যেসব কথা পেশ করেছেন সেসব কথা স্রেফ যাদু। তাঁর কথা শোনার পর পিতা পুত্র, ভাই-ভাই, স্বামী-স্ত্রী এবং বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে মত-পার্থক্য দেখা দেয়। পরিশেষে কোরায়শ প্রতিনিধিদল একথার ওপরেই একমত হয়ে সেখান থেকে ফিরে এলো।[৬]

কোন কোন বর্ণনায় বিস্তারিতভাবে একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, ওলীদ যখন আগন্তুকদের সব কথা প্রত্যাখ্যান করলো তখন তারা বললো, তাহলে আপনিই সুচিন্তিত মতামত পেশ করুন।

---

৫. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ২৬৫
৬. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ২৭১

একথা শুনে ওলীদ বললো, আমাকে একটুখানি চিন্তা করার সময় দাও। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর ওলীদ উপরোক্ত মন্তব্য করেছিলো।[৭]

উল্লিখিত ঘটনার প্রেক্ষিতে ওলীদ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা সূরা মোদদাসসেরের ষোলটি আয়াত নাযিল করেন। এসব আয়াতে ওলীদের চিন্তার প্রকৃতির চিত্ররূপ লক্ষ্য করা যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'সে তো চিন্তা করলো এবং সিদ্ধান্ত করলো। অভিশপ্ত হোক সে, কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত করলো। আরো অভিশপ্ত হোক সে, কেমন করে সে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো। সে আগে চেয়ে দেখলো। অতপর সে ভ্রুকুঞ্চিত করলো এবং মুখ বিকৃত করলো। অতপর সে পেছন ফিরলো, দম্ভ প্রকাশ করলো এবং ঘোষণা করলো, এটাতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছু নয়, এটাতো মানুষেরই কথা।' (আয়াত ১৮-২৫)

উল্লিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পর তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়াও হয়। ক'জন পৌত্তলিক হজ্জ যাত্রীদের আসার বিভিন্ন পথে অবস্থান নেয় এবং নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তাদের সতর্ক করে।[৮]

এ কাজে সবার আগে ছিলো আবু লাহাব। হজ্জের সময়ে সে হজ্জযাত্রীদের ডেরায়, ওকায, মাজনা এবং যুল মায়াযের বাজারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে লেগে থাকে। নবী (সঃ) আল্লাহর দ্বীনের তাবলীগ করছিলেন, আর আবু লাহাব পেছনে থেকে বলছিলো, তোমরা ওর কথা শুনবে না, সে হচ্ছে মিথ্যাবাদী এবং বেদ্বীন।[৯]

এ ধরনের ছুটোছুটির ফল এই হলো যে, হজ্জযাত্রীরা ঘরে ফিরে যাওয়ার সময় জানতে পারলো যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়ত দাবী করেছেন। মোটকথা, হজ্জযাত্রীদের মাধ্যমে সমগ্র আরব জাহানে আল্লাহর রসূলের আলোচনা ছড়িয়ে পড়লো।

সম্মিলিত প্রতিরোধ

কোরায়শরা যখন লক্ষ্য করলো যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাবলীগে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে রাখার কৌশল কাজে আসছে না তখন তারা নতুন করে চিন্তা করলো। দ্বীনের দাওয়াত চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করলো। সে পন্থা ও পদ্ধতির সারমর্ম নিম্নরূপ,

প্রতিরোধের প্রথম ধরন

এটি ছিলো হাসি-ঠাট্টা, বিদ্রূপ-উপহাস এবং মিথ্যাবাদী বলে তাকে অভিহিত করা। এর উদ্দেশ্য ছিলো মুসলমানদের মনোবল নষ্ট করা। এ লক্ষ্য অর্জন পৌত্তলিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অহেতুক অপবাদ গালাগাল দিতে শুরু করে। কখনো কখনো তারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাগল বলতো। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'ওসব কাফেররা বললো, যার ওপর কোরআন নাযিল হয়েছে, নিশ্চয়ই সে একটা পাগল।' (৬-১৫)

---

৭. তাফসীর ফি যিলাযিল কোরআন, সাইয়েদ কুতুব শহীদ, পারা ২৯, পৃ ১৮৮

৮. ইবনে হিশাম ১ম খন্ড ২৭১ পৃঃ

৯. তিরমিযী মোসনাদে আহমদ তৃতীয় খন্ড ৪৯২

কখনো কখনো তাঁর ওপর যাদুকর এবং মিথ্যাবাদী হওয়ার অপবাদ দেয়া হতো। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'ওরা বিস্ময় বোধ করছে যে, ওদের কাছে ওদেরই মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী এলেন এবং কাফেররা বলে, এতো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী।' (৪-৩৮)

কাফেররা আল্লাহর রসূলের সামনে দিয়ে পেছন দিয়ে ক্রুদ্ধভাবে চলাচল করতো এবং রোষ কষায়িত চোখে তাঁর প্রতি তাকাতো। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'কাফেররা যখন কোরআন শ্রবণ করে তখন তারা যেন তাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়িয়ে ফেলে দেবে এবং বলে, এতো পাগল।' (৫১-৬৮)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোথাও যেতেন এবং তাঁর সামনে পেছনে দুর্বল ও অত্যাচারিত সাহাবায়ে কেরাম থাকতেন, তখন পৌত্তলিকরা ঠাট্টা করে বলতো, 'আল্লাহ কি তোমাদের ওপর অনুগ্রহ করলেন?' (৫৩, ৬)

'তাদের এ উক্তির জবাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন, আল্লাহ কি কৃতজ্ঞ লোকদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত নন?' (৫৩, ৬)

কোরআনে আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের অবস্থার চিত্র এভাবে অঙ্কন করেছেন, 'যারা অপরাধী, তারা তো মোমেনদের উপহাস করতো এবং ওরা যখন মোমেনদের কাছ দিয়ে যেতো, তখন চোখ টিপে ইশারা করতো এবং যখন ওদের আপনজনের কাছে ফিরে আসতো, তখন ওরা ফিরতো উৎফুল্ল হয়ে এবং যখন ওদেরকে দেখতো, তখন বলতো, এরা তো পথভ্রষ্ট। এদেরকে তো তাদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি।' (২৯, ৩৩, ৮৩)

প্রতিরোধের দ্বিতীয় ধরন

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষাকে বিকৃত করা, সন্দেহ অবিশ্বাস সৃষ্টি করা, মিথ্যা প্রোপাগান্ডা করা, দ্বীনের শিক্ষা এবং প্রচারকারীদের ঘৃণ্য সমালোচনা করা ছিলো তাদের নৈমিত্তিক কাজ। এসব কাজ তারা এতো বেশী করতো যাতে জনসাধারণ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করার সুযোগ না পায়। পৌত্তলিকদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলতো, 'ওরা বলেছে, এগুলোতো সে কালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে, এগুলো সকাল সন্ধ্যা তার কাছে পাঠ করা হয়।' (৫, ২৫)

কাফেররা বলে, 'এটা মিথ্যা ব্যতীত কিছুই নয়, সে এটা উদ্ভাবন করেছে এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছে।' (৪, ২৫)

পৌত্তলিকরা এ কথাও বলে যে, 'তাকে শিক্ষা দেয় এক মানুষ।' (১০৩, ১৬)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর তাদের অভিযোগ ছিলো এই, 'ওরা বলে, এ কেমন রসূল, যে আহার করে এবং হাটে বাজারে চলাফেরা করে।' (৭, ২৫)

কোরআন শরীফের বহু জায়গায় পৌত্তলিকদের অভিযোগসমূহ খন্ডন করা হয়েছে, কোথাও কোথাও তাদের অভিযোগ উল্লেখ করা হয়েছে, কোথাও কোথাও হয়নি।

প্রতিরোধের তৃতীয় ধরন

পূর্ববর্তী লোকদের ঘটনাবলী এবং কাহিনী উল্লেখ করে কোরআন তার অবিশ্বাসীদের মোকাবেলা করেছে। নযির ইবনে হারেসের ঘটনা এই যে, একবার সে কোরায়শদের বললো, হে

কোরায়শরা, আল্লাহর শপথ, তোমাদের ওপর এমন আপদ এসে পড়েছে যে, তোমরা এখনো তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন উপায় বের করতে পারোনি। মোহাম্মদ তোমাদের মধ্যে বড় হয়েছেন, তোমাদের সবচেয়ে পছন্দনীয় মানুষ ছিলেন, সবার চেয়ে বেশী সত্যবাদী এবং সবচেয়ে বড় আমানতদারও ছিলেন। আজ তাঁর কানের কাছে চুল যখন সাদা হয়েছে, তখন তিনি তোমাদের কাছে কিছু কথা নিয়ে এসেছেন। অথচ তোমরা বলছো, তিনি যাদুকর। আল্লাহর শপথ, তিনি যাদুকর নন। আমি যাদুকর দেখেছি এবং তাদের যাদুটোনাও দেখেছি। তোমরা বলছো যে, তিনি জ্যোতিষী, না তিনি জ্যোতিষীও নন। আমি জ্যোতিষীও দেখেছি। তাদের উল্টাপাল্টা কথাও শুনেছি। তোমরা বলছো, তিনি কবি, আল্লাহর শপথ, তিনি কবিও নন। আমি কবিদের দেখেছি এবং তাদের কবিতা শুনেছি। তোমরা বলছো, তিনি পাগল, না, আল্লাহর শপথ, তিনি পাগলও নন। আমি পাগল দেখেছি, পাগলের পাগলামিও দেখেছি। তাঁর মধ্যে পাগলামির কোন প্রকার চিহ্ন নেই। কোরায়শদের লোকেরা, তোমরা গভীরভাবে চিন্তা করো, তোমাদের ওপর বিরাট আপদ এসে পড়েছে।'

এরপর নযর ইবনে হারেস হীরায় গিয়ে সেখানে বাদশাহদের বিভিন্ন ঘটনা বিশেষত রুস্তম এবং আলেকজান্ডারের কাহিনী শিখলো। এরপর সে মক্কায় ফিরে এলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন মজলিসে বসে আল্লাহর কথা বলতেন এবং তাঁর শাস্তি সম্পর্কে লোকদের ভয় দেখাতেন, তখন সে সেখানে গিয়ে বলতো, আল্লাহর শপথ, মোহাম্মদের কথা আমার কথার চেয়ে ভালো নয়। এরপর সে পারস্যের বাদশাহ এবং রুস্তম ও আলেকজান্ডারের কাহিনী শোনাতো। এরপর বলতো, মোহাম্মদের কথা আমার কথার চেয়ে কি কারণে ভালো হবে?[১০]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনা থেকে এ কথাও জানা যায় যে, নযর ইবনে হারেস কয়েকজন দাসী ক্রয় করে রেখেছিলো। যখন সে শুনতো যে, কোন মানুষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, তখন তার ওপর একজন দাসীকে লেলিয়ে দিতো। সেই দাসী সেই লোককে পানাহার করাতো, তাকে গান শোনাতো। একপর্যায়ে সেই লোকের ইসলামের প্রতি কোন আকর্ষণ অবশিষ্ট থাকতো না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন, 'কিছু লোক এমন রয়েছে, যারা ক্রীড়ার কথাবার্তা ক্রয় করে, যাতে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরানো যায়।'[১১]

প্রতিরোধের চতুর্থ ধরন

কোরায়শরা একপর্যায়ে এ রকম চেষ্টা করেছিলো যে, ইসলাম এবং জাহেলিয়াতের মধ্যে একটি সেতুবন্ধন রচনা করবে। অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে কিছু ছাড় দেবে। আল্লাহর রসূল পৌত্তলিকদের কিছু গ্রহণ করবেন এবং পৌত্তলিকরা ও আল্লাহর রসূলের কিছু আদর্শ গ্রহণ করবে। আল্লাহ তায়ালা কোরআনে এ সম্পর্কে বলেন, 'ওরা চায় যে, আপনি নমনীয় হবেন, তাহলে তারাও নমনীয় হবে।' (৯, ৬৮)

ইবনে জরীর এবং তিবরানির একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, পৌত্তলিকরা আল্লাহর রসূলের কাছে এ মর্মে প্রস্তাব দিল যে, এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের উপাসনা করুন, আর এক বছর

---

১০. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ২৯৯, ৩০০, ৩৫৮, মুখতাছুছ ছিয়ার, শেখ আবদুল্লাহ, পৃ. ১১৭, ১১৮
১১. ফাতহুল কাদির, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ২৩৬

আমরা আপনার প্রভুর উপাসনা করবো। আবদ ইবনে হোমায়েদের একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, পৌত্তলিকরা বললো, আপনি যদি আমাদের উপাস্যদের মেনে নেন, তবে আমরাও আপনার খোদার এবাদাত করবো।[১২]

ইবনে ইসহাক বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবাঘরের তওয়াফ করছিলেন। এমন সময় আসওয়াদ ইবনে মোত্তালেব ইবনে আসাদ ইবনে আবদুল ওযযা, ওলীদ ইবনে মুগীরা, উমাইয়া ইবনে খালফ ও আসা ইবনে ওয়ায়েল ছাহমি তাঁর কাছে এলো। এরা ছিলো নিজ নিজ গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তি। এরা বললো, এসো মোহাম্মদ, তুমি যার পূজা করছো, আমরা তার পূজা করবো। আর আমরা যাকে পূজা করছি, তুমিও তাকে পূজা করবে। এতে আমরা উভয়ে সমপর্যায়ে উন্নীত হবো। যদি তোমার মাবুদ আমাদের মাবুদের চেয়ে ভালো হন তবে আমরা তার কাছ থেকে কল্যাণ লাভ করবো আর যদি আমাদের মাবুদ তোমার মাবুদের চেয়ে ভালো হন তবে তোমরা তার কাছ থেকে কল্যাণ লাভ করবে। তাদের এ হাস্যকর কথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা 'সূরা কাফেরুন' নাযিল করেন। এতে ঘোষণা করা হয় যে, 'তোমরা যাদের উপাসনা করো, আমি তাদের উপাসনা করতে পারি না।'[১৩]

এ সিদ্ধান্তমূলক জবাবের মাধ্যমে পৌত্তলিকদের হাস্যকর বক্তব্যের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনার সম্ভাব্য কারণ এই যে, এ ধরনের চেষ্টা সম্ভবত বারবার করা হয়েছে।

যুলুম নির্যাতন

নবুয়তের চতুর্থ বছরে ইসলামের প্রকাশ্য দাওয়াত বন্ধ করতে পৌত্তলিকরা যেসব কাজ করেছে তার বিবরণ ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। এসব অপতৎপরতা পৌত্তলিকরা পর্যায়ক্রমে এবং ধীরে ধীরে চালিয়েছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, এমনকি মাসের পর মাস অতিরিক্ত কিছু করেনি এবং যুলুম অত্যাচারের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িও করেনি। কিন্তু তারা যখন লক্ষ্য করলো যে, তাদের তৎপরতা ইসলামের দাওয়াতের পথে বাধা সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হচ্ছে তখন তারা পুনরায় সমবেত হয়ে পঁচিশজন কাফেরের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করলো। এরা ছিলো কোরায়শ বংশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। এ কমিটির প্রধান ছিলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা। পারস্পরিক পরামর্শ এবং চিন্তা-ভাবনার পর কমিটি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাদের বিরুদ্ধে একটি সিদ্ধান্তমূলক প্রস্তাব অনুমোদন করলো। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, ইসলামের বিরোধিতা করতে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়া এবং ইসলাম গ্রহণকারীদের নির্যাতন করার ব্যাপারে কোন প্রকার শিথিলতার পরিচয় দেয়া হবে না।[১৪]

পৌত্তলিকরা এ প্রস্তাব গ্রহণ করার পর সর্বাত্মকভাবে তা বাস্তবায়নের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করলো। মুসলমান বিশেষত দুর্বল মুসলমানদের ক্ষেত্রে পৌত্তলিকদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সহজ ছিলো। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে ছিলো কঠিন। কেননা তিনি ছিলেন অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী এক অসাধারণ মানুষ। সবাই তাকে সম্মানের চোখে দেখতো। তাঁর কাছে সম্মানজনকভাবেই যাওয়া সহজ এবং স্বাভাবিক ছিলো। তাঁর বিরুদ্ধে অবমাননাকর

১২. ফাতহুল কাদির, শাওকানি রচিত, ৫ম খন্ড, পৃ. ৫০৮
১৩. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৬২
১৪. রহমতুললিল আলামিন, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৯-৬০

এবং ঘৃণ্য তৎপরতা বর্বর এবং নির্বোধদের জন্যেই ছিলো মানানসই। ব্যক্তিত্বের এ স্বাতন্ত্র্য এবং প্রখরতা ছাড়া আবু তালেবের সাহায্যও তিনি পাচ্ছিলেন। মক্কায় আবু তালেবের প্রভাব ছিলো অনতিক্রম্য। ব্যক্তিগত বা সম্মিলিতভাবে এ প্রভাব অতিক্রম করা এবং তাঁর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করার সাহস কারো ছিলো না। এ পরিস্থিতিতে কোরায়শরা নিদারুণ মর্মপীড়ার মধ্যে দিন যাপন করছিলো। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে দ্বীনের প্রচার প্রসার তাদের ধর্মীয় আধিপত্য এবং পার্থিব নেতৃত্ব কর্তৃত্বের শেকড় কেটে দিচ্ছিলো, সে দ্বীনের ব্যাপারে আর কতোকাল তারা ধৈর্যধারণ করবে? পরিশেষে পৌত্তলিকরা আবু লাহাবের নেতৃত্বে নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অত্যাচার নির্যাতন চালাতে শুরু করলো। প্রকৃতপক্ষে প্রিয় নবীর সাথে আবু লাহাবের শত্রুতামূলক আচরণ আগে থেকেই ছিলো। কোরায়শরা আল্লাহর রসূলের ওপর নির্যাতনের কথা চিন্তা করারও আগে আবু লাহাব চিন্তা করেছিলো। বনি হাশেমের মজলিস এবং সাফা পাহাড়ের পাদদেশে এই দুর্বৃত্ত যা বলেছিলো, ইতিপূর্বে সেসব কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, সাফা পাহাড়ের পাদদেশে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার পর নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মারার জন্যে আবু লাহাব একটি পাথরও তুলেছিলো।[১৫]

রসূলের নবুয়ত পাওয়ার আগে আবু লাহাব তার দুই পুত্র ওতবা এবং ওতাইবাকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুই কন্যা রোকাইয়া এবং উম্মে কুলসুমের সাথে বিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত পাওয়ার পর এবং দ্বীনের দাওয়াত প্রচারের শুরুতে আবু লাহাব নবীর দুই কন্যাকেই তালাক দিতে তার দুই পুত্রকে বাধ্য করেছিলো।[১৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বিতীয় পুত্র আবদুল্লাহর ইন্তেকালের পর আবু লাহাব এতো খুশী হয়েছিলো যে, তার বন্ধুদের কাছে দৌড়ে গিয়ে গদগদ করে বলেছিলো যে, মোহাম্মদ অপুত্রক হয়ে গেছে।[১৭]

ইতিপূর্বে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, হজ্জ মৌসুমে আবু লাহাব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করতে বাজার এবং বিভিন্ন জনসমাবেশে তাঁর পেছনে লেগে থাকতো। তারেক ইবনে আবদুল্লাহ মুহাবেরীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, আবু লাহাব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মিথ্যা প্রমাণ করতেই শুধু ব্যস্ত থাকত না বরং তাঁকে পাথরও নিক্ষেপ করতো। এতে তাঁর পায়ের গোড়ালি রক্তাক্ত হয়ে যেতো।[১৮]

আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিলের প্রকৃত নাম ছিলো আরওয়া। সে ছিলো হারব ইবনে উমাইয়ার কন্যা এবং আবু সুফিয়ানের বোন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি শত্রুতার ক্ষেত্রে সে তার স্বামীর চেয়ে কোন অংশে কম ছিলো না। নবী (সঃ) যে পথে চলাফেরা করতেন, ঐ পথে এবং তাঁর দরজায় সে কাঁটা বিছিয়ে রাখতো। অত্যন্ত অশ্লীল ভাষী এবং

---

১৫. তিরমিযি

১৬. তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন, সাইয়েদ কুতুব শহীদ ৩য় খন্ড, পৃ. ২৮২ তাফসীর তাফহীমুল কোরআন, মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী ষষ্ঠ খন্ড, ৫২২ (উর্দূ সংস্করণ)

১৭. তাফসীর তাফহীমুল কোরআন, ষষ্ঠ খন্ড, পৃ. ৪৯০ (উর্দূ সংস্করণ)

১৮. জামে তিরমিযি

ঝগড়াটে ছিলো এ নোংরা মহিলা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালাগাল দেয়া এবং কুটনামি, নানা ছুতোয় ঝগড়া, ফেতনা-ফাসাদ সৃষ্টি এবং সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করা ছিলো তার কাজ। এ কারণে কোরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'এবং তার স্ত্রীও সে ইন্ধন বহন করে।'

আবু লাহাবের স্ত্রী যখন জানতে পারলো যে, তার এবং তার স্বামীর নিন্দা করে আয়াত নাযিল হয়েছে, তখন সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খুঁজে খুঁজে কাবা শরীফের কাছে এলো। প্রিয় নবী সে সময় কাবাঘরের পাশে অবস্থান করছিলেন। তাঁর সাথে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-ও ছিলেন। আবু লাহাবের স্ত্রীর হাতে ছিলো এক মুঠি পাথর। আল্লাহর রসূলের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছুলে আল্লাহ তায়ালা তার দৃষ্টি কেড়ে নেন, সে আল্লাহর রসূলকে দেখতে পায়নি, হযরত আবু বকরকে দেখতে পাচ্ছিলো। হযরত আবু বকরের সামনে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলো যে, তোমার সাথী কোথায়? আমি শুনেছি তিনি আমার নামে নিন্দা করছেন। আল্লাহর শপথ, যদি আমি তাকে পেয়ে যাই তবে তার মুখে এ পাথর ছুঁড়ে মারব। দেখো আল্লাহর শপথ, আমিও একজন কবি। এরপর সে এ কবিতা শোনালো, 'মোযাম্মাম[১৯] আছাইনা ওয়া আমরাহু আবাইনা ওয়া দ্বীনাহু কালাইনা'। অর্থাৎ মোযাম্মামের অবাধ্যতা করেছি, তার কাজকে সমর্থন করিনি এবং তার দ্বীনকে ঘৃণা ও অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করেছি। এরপর সে চলে গেলো।

আবু বকর সিদ্দিক (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল সে কি আপনাকে দেখতে পায়নি? তিনি বললেন, না দেখতে পায়নি, আল্লাহ তায়ালা আমার ব্যাপারে তার দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলেন।[২০]

আবু বকর রাযযারও এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি এটুকু সংযোজন করেছেন যে, আবু লাহাবের স্ত্রী হযরত আবু বকরের সামনে গিয়ে একথাও বলেছিলো যে, আবু বকর, আপনার সঙ্গী আমার নিন্দা করেছেন। আবু বকর বললেন, একথা ঠিক নয়। এই ঘরের প্রভুর শপথ, তিনি কবিতা রচনা করেন না এবং কবিতা মুখেও উচ্চারণ করেন না। আবু লাহাবের স্ত্রী বললো, আপনি ঠিকই বলেছেন।

আবু লাহাব ছিলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিবেশী এবং চাচা। তাঁর ঘর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরের কাছাকাছি ছিলো। অন্য প্রতিবেশীরাও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিতো।

ইবনে ইসহাক বলেন, যেসব লোক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘরের মধ্যে কষ্ট দিতো তাদের নাম হলো আবু লাহাব, হাকাম ইবনে আবুল আস ইবনে উমাইয়া, ওকবা ইবনে আবু মুঈত, আদী ইবনে হামরা, ছাকাফি ইবনুল আছদা হুজালি প্রমুখ। এরা সবাই ছিলো তার প্রতিবেশী।

১৯. পৌত্তলিকরা নবী করিম (স.)-কে মোহাম্মদ না বলে 'মোযাম্মাম' বলতো। মোহাম্মদ অর্থ প্রশংসিত। অথচ মোযাম্মাম শব্দের অর্থ এর বিপরীত। অর্থাৎ নিন্দিত।

২০. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৩৫-৩৩৬

এদের মধ্যে হাকাম ইবনে আবুল আস[২১] ব্যতীত অন্য কেউ মুসলমান হয়নি। এদের কষ্ট দেয়ার পদ্ধতি ছিলো এ রকম যে, যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায আদায় করতেন তখন এদের কেউ বকরির নাড়িভুড়ি এমনভাবে ছুঁড়ে মারতো যে সেসব গিয়ে তাঁর গায়ে পড়তো। আবার উনুনের ওপর হাঁড়ি চাপানো হলে বকরির নাড়ি ভুড়ি এমনভাবে নিক্ষেপ করতো যে, সেগুলো গিয়ে সেই হাঁড়িতে পড়তো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরে নিরাপদে নামায আদায়ের জন্যে ঘরের ভেতর একটি জায়গা করে নিয়েছিলেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর এসব নাড়িভুড়ি নিক্ষেপের পর তিনি সেগুলো একটি কাঠির মাথায় নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে বলতেন, 'হে বনি আবদে মান্নাফ, এটা কেমন ধরনের প্রতিবেশী সুলভ ব্যবহার? এরপর সেসব নাড়িভুড়ি ফেলে দিতেন।'[২২]

ওকবা ইবনে আবু মুঈত ছিলো জঘন্য দুর্বৃত্ত ও দুষ্কৃতিতে ওস্তাদ। সহীহ বোখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবাঘরের পাশে নামায আদায় করছিলেন। আবু জেহেল এবং তার কয়েকজন বন্ধু সেখানে বসেছিলো। এমন সময় একজন অন্যজনকে বললো, কে আছো অমুকের উটের নাড়িভুড়ি এনে মোহাম্মদ যখন সেজদায় যাবে, তখন তার পিঠে চাপিয়ে দিতে পারবে? এরপর ওকবা ইবনে আবু মুঈত।[২৩] উটের নাড়িভুড়ি এনে অপেক্ষা করতে লাগলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেজদায় যাওয়ার পর সেই নাড়িভুড়ি তাঁর উভয় কাঁধের দু'দিকে ঝুলিয়ে দিল। আমি সব কিছু দেখছিলাম, কিন্তু কিছু বলতে পারছিলাম না। কি যে ভালো হতো হায় যদি আমার মধ্যে তাঁকে রক্ষা করার শক্তি থাকতো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এরপর দুর্বৃত্তরা হাসতে হাসতে একজন অন্যজনের গায়ে ঢলে পড়ছিলো। এদিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেজদায় পড়ে রইলেন, মাথা তুললেন না। হযরত ফাতেমা (রা.) খবর পেয়ে ছুটে এসে নাড়িভুড়ি সরিয়ে ফেললেন। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেজদা থেকে মাথা তুললেন। এরপর তিনবার বললেন, 'আল্লাহুমা আলাইকা বে-কোরাইশ'। অর্থাৎ হে আল্লাহ তায়ালা, কোরায়শদের দায়িত্ব তোমার ওপর। এই বদদোয়া শুনে তারা নাখোশ হলো। কেননা তারা একথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো যে, এই শহরে তার দোয়া কবুল হয়ে থাকে। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাম ধরে ধরে বদদোয়া করলেন, হে আল্লাহ, আবু জেহেলকে পাকড়াও করো। ওতবা ইবনে রবিয়া, শায়বা ইবনে রাবিয়া, ওলীদ ইবনে ওতবা, উমাইয়া ইবনে খালফ এবং ওকবা ইবনে আবু মুঈতকেও পাকড়াও করো।'

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্ভবত আরো কয়েকজনের নাম বলেছিলেন। কিন্তু বর্ণনাকারী সেই নাম ভুলে গেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু

---

২১. তিনি ছিলেন উমাইয়া খলিফা মারওয়ান ইবনে হাকামের পিতা।

২২. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪১৬

২৩. বোখারী শরীফের অন্য এক বর্ণনায় এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। ১ম খন্ড, পৃ. ৫৪৩ দেখুন,

আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব কাফেরের নাম উচ্চারণ করে বদদোয়া করেছিলেন, আমি দেখেছি বদরের কূয়োয় তাদের সবার লাশ পড়ে আছে।[২৪]

উমাইয়া ইবনে খালফ-এর অভ্যাস ছিলো যে, সে যখনই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতো তখনই নানা কটূক্তি করতো এবং অভিশাপ দিতো। আল্লাহ তায়ালা তার সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল করেন, 'ওয়ায়লুল লেকুল্লি হুমাযাতিল লুমাযাহ। অর্থাৎ দুর্ভোগ প্রত্যেক্যের জন্যে, যে পেছনে ও সামনে লোকের নিন্দা করে। ইবনে হিশাম বলেন, 'হুমাযা' সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গালাগাল দেয় এবং চোখ বাঁকা করে ইশারা করে। 'লুমাযা' সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে পশ্চাতে মানুষের নিন্দা করে এবং কষ্ট দেয়।[২৫]

উমাইয়ার ভাই উবাই ইবনে খালফ ছিলো ওকবা ইবনে আবু মুঈতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ওকবা একদিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসে ইসলামের কিছু কথা শুনেছিলো। উবাই একথা শুনে ওকবাকে সমালোচনা করলো এবং নির্দেশ দিলো যে, যাও, তুমি গিয়ে মোহাম্মদের মুখে থুথু দিয়ে এসো। ওকবা তাই করলো। উবাই ইবনে খালফ একবার একটি পুরনো হাড় গুঁড়ো করলো। এরপর সেই গুঁড়ো বাতাসে ফুঁ দিয়ে দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি উড়িয়ে দিল।[২৬]

আখলাস ইবনে শোরাইক ছাকাফিও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দেয়ার কাজে উৎসাহী ছিলো। কোরআনে করিমে তার নয়টি বদঅভ্যাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকেই তার কর্মতৎপরতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন, 'এবং অনুসরণ করো না তার, যে কথায় কথায় শপথ করে, পশ্চাতে নিন্দাকারী, একজনের কথা অন্যজনের কাছে লাগিয়ে বেড়ায়, কল্যাণের কাজে বাধা প্রদান করে, সীমা লংঘনকারী, পাপিষ্ঠ, রূঢ়স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত।' (১০-১৩, ৬৮)

আবু জেহেল কখনো কখনো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে কোরআন শুনতো, কিন্তু শোনা পর্যন্তই। সে ঈমানও আনতো না ইসলামের শিক্ষাও গ্রহণ করতো না এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি আনুগত্যের পরিচয়ও দিতো না। বরং সে নিজের কথা দ্বারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিতো এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করতো। এরপর নিজের এ কাজের জন্যে গর্বের সাথে বুক ফুলিয়ে নিতো। মনে হতো যে, বড় ধরনের কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে ফেলেছে। পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ আল্লাহ তায়ালা তার সম্পর্কে নাযিল করেছেন।[২৭] আল্লাহ বলেন, 'যে বিশ্বাস করেনি এবং নামায আদায় করেনি, বরং যে সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলো। এরপর সে তার পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে গিয়েছিলো দম্ভ ভরে। দুর্ভোগ, তোমার জন্যে দুর্ভোগ। (৩১-৩৫, ৭৫)

আবু জেহেল প্রথম দিনেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামায আদায় করতে দেখে তাঁকে নামায থেকে ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। একবার নবী (সঃ) মাকামে ইবরাহীমের

---

২৪. সহীহ বোখারী কিতাবুল ওযু ১ম খন্ড, পৃ. ৩৭
২৫. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৫৬, ৩৫৭
২৬. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড. পৃ. ৩৬১-৩৬২
২৭. তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন, ২৯ খন্ড

কাছে নামায আদায় করছিলেন। আবু জেহেল সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। সে বললো, মোহাম্মদ, আমি কি তোমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করিনি? সাথে সাথে সে হুমকিও দিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও হুমকি দিয়ে জবাব দিলেন। এরপর আবু জেহেল বললো, মোহাম্মদ, আমাকে কেন ধমক দিচ্ছো? দেখো এই মক্কায় আমার মজলিস হচ্ছে সবচেয়ে বড়। আবু জেহেলের এর উদ্ধত কথায় আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন, 'আচ্ছা সে যেন মজলিসকে ডাকে।[২৮] আমিও শাস্তি দেয়ার ফেরেশতাদের ডাক দিচ্ছি।'

এক বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু জেহেলের চাদর গলার কাছে ধরে বললেন, 'দুর্ভোগ, তোমার জন্যে দুর্ভোগ। আবার দুর্ভোগ, তোমার জন্যে দুর্ভোগ।'[২৯]

একথা শুনে আল্লাহর দুশমন আবু জেহেলে বললো, হে মোহাম্মদ, আমাকে হুমকি দিচ্ছো? খোদার কসম, তুমি এবং তোমার পরওয়ারদেগার আমার কিছুই করতে পারবে না। মক্কার উভয় পাহাড়ের মাঝে চলাচলকারীদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বেশী সম্মানিত মানুষ।

পবিত্র কোরআনে ঘোষিত হুমকি সত্তেও আবু জেহেল তার নির্বুদ্ধিতামূলক আচরণ থেকে বিরত থাকেনি। বরং তার দুষ্কৃতি আরো বেড়ে গিয়েছিলো। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, কোরায়শ সর্দারদের কাছে একদিন আবু জেহেল বললো, মোহাম্মদ আপনাদের সামনে নিজের চেহারা ধুলায় লাগিয়ে রাখে কি? কোরায়শ সর্দাররা বললো, হাঁ। আবু জেহেল বললো, লাত এবং ওযযার শপথ, আমি যদি তাকে এ অবস্থায় দেখি, তবে তার ঘাড় ভেঙ্গে দেবো, তার চেহারা মাটিতে হেঁচড়াবো। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামায আদায় করতে দেখে তাঁর ঘাড় মটকে দেয়ার জন্যে সে অগ্রসর হলো। কিন্তু সবাই দেখলো যে, আবু জেহেল চিৎকাত হয়ে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে এবং চিৎকার করে বলছে, বাঁচাও, বাঁচাও। পরিচিত লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, আবুল হাকাম, তোমার কি হয়েছে? আবু জেহেল বললো, আমি দেখলাম যে, আমার এবং মোহাম্মদের মাঝখানে আগুনের একটি পরিখা। ভয়াবহ সে আগুনের পরিখায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা শুনে বললেন, 'যদি সে আমার কাছে আসতো, তবে ফেরেশতা তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিড়ে ফেলতো।'[৩০]

একদিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এ ধরনের যুলুম অত্যাচারমূলক ব্যবহার করা হচ্ছিলো অন্যদিকে তাঁর প্রতি মক্কার যে সাধারণ মানুষের গভীর শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা ছিলো, তারা তাঁকে তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের কারণে অসাধারণ মর্যাদা ও সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতো। উপরন্তু তাঁর চাচা আবু তালেবের সমর্থন ও সহায়তা তাঁর প্রতি ছিলো। তা সত্তেও তাঁর প্রতি এসব অত্যাচার করা হচ্ছিলো। ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণকারী মুসলমানদের প্রতি, বিশেষত দুর্বল মুসলমানদের প্রতি পৌত্তলিকদের অত্যাচার নির্যাতন ছিলো আরো ভয়াবহ। প্রত্যেক গোত্র তাদের গোত্রের ইসলাম গ্রহণকারীদের শাস্তি দিচ্ছিলো। যারা মক্কার গোত্রের

---

২৮. তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন, সাইয়েদ কুতুব শহীদ, পারা ৩০, পৃ. ২০৮
২৯. ঐ
৩০. সহীহ মুসলিম

অন্তর্ভুক্ত ছিলো না তাদের ওপর উচ্ছৃঙ্খল এবং নেতৃস্থানীয় লোকেরা নানাপ্রকার অত্যাচার নির্যাতন চালাতো। সেসব অত্যাচারের বিবরণ শুনলে শক্ত মনের মানুষও অস্থির হয়ে উঠতো।

কোন সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত মানুষের ইসলাম গ্রহণের কথা শুনলে আবু জেহেল তাকে গালমন্দ ও অপমান করতো। এছাড়া সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকেও ক্ষতিগ্রস্ত করার হুমকি দিতো। কোন দুর্বল মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে ধরে প্রহার করতো এবং অন্যদেরও প্রহার করতে অন্যদের উৎসাহিত করতো।[৩১]

হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর চাচা তাঁকে খেজুরের চাটাইয়ের মধ্যে জড়িয়ে ধুয়ো দিতো।'[৩২]

হযরত মসয়াব ইবনে ওমায়ের (রা.)-এর মা তাঁর ইসলাম গ্রহণের খবর শোনার পর পুত্রের পানাহার বন্ধ করে দেয় এবং তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। হযরত মসয়াব ছোট বেলা থেকে স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে আরাম-আয়েশে জীবন কাটিয়েছিলেন। পরিস্থিতির কারণে তিনি এমন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন যে, তাঁর গায়ের চামড়া খোলস ছাড়ানো সাপের গায়ের মতো হয়ে গিয়েছিলো।[৩৩]

হযরত বেলাল (রা.) ছিলেন উমাইয়া ইবনে খালফের ক্রীতদাস। ইসলাম গ্রহণের পর উমাইয়া হযরত বেলাল (রা.)-কে গলায় দড়ি বেঁধে উচ্ছৃঙ্খল বালকদের হাতে তুলে দিত। বালকেরা তাঁকে মক্কার বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যেতো। এ রকম করায় তাঁর গলায় দড়ির দাগ পড়ে যেতো। উমাইয়া নিজেও তাকে বেঁধে নির্মম প্রহারে জর্জরিত করতো। এরপর উত্তপ্ত বালির ওপর জোর করে শুইয়ে রাখতো। এ সময়ে তাকে অনাহারে রাখা হতো, পানাহার কিছুই দেয়া হতো না। কখনো কখনো দুপুরের রোদে মরু বালুকার ওপর শুইয়ে বুকের ওপর ভারি পাথর চাপা দিয়ে রাখতো। এ সময় বলতো, তোমার মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত এভাবে ফেলে রাখা হবে। তবে বাঁচতে চাইলে মোহাম্মদের পথ ছাড়ো। কিন্তু তিনি এমনি কষ্টকর অবস্থাতেও বলতেন 'আহাদ, আহাদ'। তার ওপর নির্যাতন চলতে দেখে হযরত আবু বকর (রা.) একদিন খুবই ব্যথিত হলেন। তিনি হযরত বেলাল (রা.)-কে একটি কালো ক্রীতদাসের পরিবর্তে মতান্তরে দুশো দেরহামের পরিবর্তে ক্রয় করে মুক্তি দেন।[৩৪]

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রা.) ছিলেন বনু মাখযুমের ক্রীতদাস। তিনি এবং তার পিতামাতা ইসলাম গ্রহণের পর তাদের ওপর ভয়াবহ নির্যাতন শুরু করা হলো। আবু জেহেলের নেতৃত্বে পৌত্তলিকরা তাঁদেরকে উত্তপ্ত রোদে বালুকাময় প্রান্তরে শুইয়ে কষ্ট দিতো। একবার তাদের এভাবে শাস্তি দেয়া হচ্ছিলো। এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, 'হে ইয়াসের পরিবার, ধৈর্যধারণ করো, তোমাদের ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত।'

---

৩১. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৩২০
৩২. রহমাতুল লিল আলামীন ১ম খন্ড, পৃ. ৫৭
৩৩. ঐ পৃ. ৫৮
৩৪. রহমতুল লিল আলামীন ১ম খন্ড, পৃ. ৫৭, তালাকিহে ফুহুম, ইবনে হিশাম ১ম খন্ড, পৃ. ৩১৮

অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে হযরত ইয়াসের (রা.) ইন্তেকাল করেন। তাঁর স্ত্রী হযরত আম্মারের মা হযরত ছুমাইয়া (রা.)-এর লজ্জাস্থানে দুর্বৃত্ত আবু জেহেল বর্শা নিক্ষেপ করে। এতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তিনি ছিলেন ইসলামের প্রথম শহীদ। হযরত আম্মারের ওপর তখনো অব্যাহতভাবে অত্যাচার চালানো হচ্ছিলো। তাঁকে কখনো উত্তপ্ত বালুকার ওপর শুইয়ে রাখা হতো, কখনো বুকের ওপর ভারি পাথর চাপা দেয়া হতো, কখনো পানিতে চেপে ধরা হতো। পৌত্তলিকরা তাকে বলতো যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি মোহাম্মদকে গালি না দেবে এবং লাত ওযযা সম্পর্কে প্রশংসনীয় কথা না বলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তোমাকে ছাড়তে পারব না। হযরত আম্মার (রা.) বাধ্য হয়ে তাদের কথা মেনে নেন। এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কাঁদতে কাঁদতে হাযির হন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তখন পবিত্র কোরআনের এই আয়াত নাযিল করেন, 'কেউ তার ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং কুফরীর জন্যে হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার ওপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তার জন্যে আছে সহজ শাস্তি কিন্তু তার জন্যে নয়, যাকে কুফরীর জন্যে বাধ্য করা হয়। কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচলিত থাকে।'[৩৫]

হযরত খাব্বাব ইবনে আরত (রা.) খোজায়া গোত্রের উম্মে আনসার নামে এক মহিলার ক্রীতদাস ছিলেন। পৌত্তলিকরা তাঁর ওপর নানাভাবে নির্যাতন চালাতো। তাকে মাটির ওপর টানতো।[৩৬] তাঁর মাথার চুল ধরে টানতো এবং ঘাড় মটকে দিতো। কয়েকবার জ্বলন্ত কয়লার ওপরে তাঁকে শুইয়ে বুকে পাথর চাপা দিয়ে রাখা হয়েছিলো যাতে, তিনি উঠতে না পারেন।[৩৭]

যিন্নীরাহ[৩৮] নাহদিয়া এবং তাদের কন্যা এবং উম্মে উবাইস ছিলেন ক্রীতদাসী। এরা ইসলাম গ্রহণ করে পৌত্তলিকদের হাতে কঠোর শাস্তি ভোগ করেন। শাস্তির কিছু দৃষ্টান্ত ওপরে তুলে ধরা হয়েছে। বনু আদী গোত্রের একটি পরিবার বনু মোয়াম্মেলের একজন দাসী ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি সেই দাসীকে অস্বাভাবিক প্রহার করে বিরতি দিয়ে বলতেন, তোমার প্রতি দয়ার কারণে নয় বরং নিজে ক্লান্ত হয়েই ছেড়ে দিলাম।[৩৯]

পরিশেষে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হযরত বেলাল এবং আমের ইবনে ফোহায়রার মতোই এসব দাসীকেও ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।[৪০]

পৌত্তলিকরা বীভৎস উপায়েও ইসলাম গ্রহণকারীদের শাস্তি দিতো। তারা কোন কোন সাহাবাকে উট এবং গাভীর কাঁচা চামড়ার ভেতর জড়িয়ে বেঁধে রোদে ফেলে রাখতো। কাউকে লোহার বর্ম পরিয়ে তপ্ত পাথরের ওপর শুইয়ে রাখতো। কারো ইসলাম গ্রহণের খবর পেলে দুর্বৃত্ত পৌত্তলিকরা নানা উপায়ে তার ওপর অত্যাচার এবং নির্যাতন চালাতো। মোটকথা আল্লাহর

---

৩৫. ইবনে হিশাম ১ম খন্ড, পৃ. ৩২০, ফেকহুছ সীরাত, মোহাম্মদ গাযযালি, পৃ. ৮২। আওফি হযরত ইবনে আব্বাস থেকে এর কিছু অংশ বর্ণনা করেছেন। দেখুন তাফসীরে ইবনে কাসির।

৩৬. রহমাতুল লিল আলামিন, ১ম খন্ড. পৃ. ৫৭, এ'জাযুত তানযিল পৃ. ৫৩

৩৭. ঐ ১ম খন্ড. পৃ. ৫৭, তালকিহুল ফহুম পৃ. ৬০

৩৮. যিন্নিরাহ মিসকিনার ওযনে অর্থাৎ ওই শব্দের মতোই হবে এ শব্দের উচ্চারণ।

৩৯. রহমাতুল লিল আলামিন, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৭, ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড. পৃ ৩১৯

৪০. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড. পৃ. ৩১৮-৩১৯

মনোনীত দ্বীন গ্রহণকারীদের ওপর যে সব নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতন করা হয়েছিলো তার তালিকা খুবই দীর্ঘ এবং বড়োই বেদনাদায়ক।[৪১]

দারে আরকাম

অত্যাচারের এবং নির্যাতনের ভয়াবহ এ অবস্থার কৌশল হিসাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের বলেছিলেন যে, প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের কথা নতুন মুসলমানরা যেন প্রচার না করেন। তাছাড়া দেখা সাক্ষাত এবং মেলামেশার ব্যাপারে মুসলমানরা যেন গোপনীয়তার আশ্রয় নেন। কেননা আল্লাহর রসূলের সাথে মুসলমানদের দেখা সাক্ষাতের কথা যদি অমুসলিমরা শোনে তাহলে তারা ইসলামের শিক্ষা দীক্ষার প্রসারে বাধা সৃষ্টি করবে। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের আশঙ্কা তীব্র হয়ে উঠবে। নবুয়তের চতুর্থ বছরে এ ধরনের একটি ঘটনা ঘটেছিলো। ঘটনাটি হচ্ছে, সাহাবায়ে কেরাম ঘাঁটিতে একত্রিত হয়ে নামায আদায় করতেন। একবার সে অবস্থায় তাদের একদল পৌত্তলিক দেখে ফেলে। এ সময় তারা মুসলমানদের গালাগাল করতে শুরু করে এবং লড়াই ঝগড়া শুরু করে। এ পর্যায়ে হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) একজন লোককে এমনভাবে প্রহার করলেন যে তাতে, রক্ত গড়িয়ে গেলো। ইসলামে এটা ছিলো রক্তপাতের প্রথম ঘটনা।[৪২]

এ ধরনের সংঘর্ষ বারবার ঘটলে এবং দীর্ঘায়িত হলে মুসলমানদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। এ কারণে গোপনীয়তার কৌশল অবলম্বন করা ছিলো অত্যাবশ্যক। এই কৌশল অনুযায়ী সাধারণ সাহাবায়ে কেরাম তাদের ইসলাম গ্রহণ, এবাদাত বন্দেগী, তাবলীগ, পারস্পরিক দেখা সাক্ষাৎ মেলামেশা সবই গোপনভাবে করতেন। তবে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাবলীগে দ্বীন এবং এবাদাত সব কিছুই প্রকাশ্যে করতেন। কোন বাধাই তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। তবুও তিনি মুসলমানদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ এবং আলাপ আলোচনার ক্ষেত্রে গোপনীয়তা রক্ষা করতেন। আরকাম ইবনে আবুল আরকাম মাখযমীর ঘর সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত ছিলো। এখানে পৌত্তলিক বিদ্রোহীরা আসত না। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়তের পঞ্চম বছর থেকে 'দারে আরকাম'কে দ্বীনের দাওয়াত এবং মুসলমানদের সাথে মেলামেশার কেন্দ্র রূপে নির্ধারণ করেন।[৪৩]

---

৪১. রহমাতুল লিল আলামিন ১ম খন্ড, পৃ. ৫৮

৪২. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ২৬৩ মুখতাছারুছ সীরাত, শেখ মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব

৪৩. মুখতাছারুছ সীরাত, শেখ মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব নজদী, পৃ. ৬১

আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরত

যুলুম অত্যাচার ও নির্যাতনের এ ধারা নবুয়তের চতুর্থ বছরের মাঝামাঝি বা শেষদিকে শুরু হয়েছিলো। প্রথমদিকে ছিলো মামুলি কিন্তু দিনে দিনে এর মাত্রা বেড়ে চললো। নবুয়তের পঞ্চম বছরের মাঝামাঝি সময়ে তা চরমে পৌঁছুলো। মক্কায় অবস্থান করা মুসলমানদের জন্যে অসম্ভব হয়ে উঠলো। সেই সঙ্কটময় এবং অন্ধকার সময়ে সূরা কাহাফ নাযিল হলো। এতে পৌত্তলিকদের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে। তাতে বর্ণিত তিনটি ঘটনায় আল্লাহর পক্ষ থেকে মোমেন বান্দাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইংগিত দেয়া হয়েছে। আসহাবে কাহাফের ঘটনায় এ শিক্ষা মজুদ রয়েছে যে, দ্বীন ঈমান যখন আশঙ্কার সম্মুখীন হয় তখন কুফুরী এবং যুলুম-অত্যাচারের কেন্দ্র থেকে সশরীরে হিজরত করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা যখন ওদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে এবং ওরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের এবাদাত করে তাদের কাছ থেকে তখন তোমরা গুহায় আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে তাঁর দয়া বিস্তার করবেন এবং তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের কাজকর্মকে ফলপ্রসূ করার ব্যবস্থা করবেন।' (১৬, ১৮)

হযরত মুসা (আ.) এবং হযরত খিযির (আ.)-এর ঘটনা থেকে এ শিক্ষা পাওয়া যায় যে, পরিণাম সব সময় প্রকাশ্য অবস্থা অনুযায়ী নির্ণিত হয় না। বরং কখনো কখনো প্রকাশ্য অবস্থার সম্পূর্ণ বিরপীতও হয়ে থাকে। কাজেই এ ঘটনায় সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে বর্তমানে যেসব যুলুম-অত্যাচার হচ্ছে, তার পরিণাম হবে সম্পূর্ণ বিপরীত। এসব পৌত্তলিক ও উদ্ধত বিদ্রোহী ঈমান না আনেলে একদিন তারা পরাজিত হয়ে বাধ্য হবে মুসলমানদের সামনে মাথা নত করতে এবং তাদের ভাগ্য নির্ধারণের জন্যে মুসলমানদের সামনে আত্মসমর্পণ করবে।

যুলকারনাইনের ঘটনায় নীচে উল্লিখিত কয়েকটি শিক্ষার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এক. যমিনের মালিকানা আল্লাহর। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তাঁর অংশীদার করেন।

দুই. সাফল্য একমাত্র ঈমানের পথে রয়েছে, কুফুরীর পথে নেই।

তিন. আল্লাহ তায়ালা মাঝে মাঝে বান্দাদের মধ্য থেকে এমন মানুষদের উত্থান ঘটান যারা মযলুম ও উৎপীড়িত মানুষদের সেই কাফের 'ইয়াজুজ মাজুজদের' কবল থেকে মুক্তি দেন।

চার. আল্লাহর পুণ্যশীল বান্দারা যমিনের অংশীদার হওয়ার সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত।

সূরা কাহাফের পর আল্লাহ তায়ালা সূরা ঝুমার নাযিল করেন। এতে হিজরতের প্রতি ইশারা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আল্লাহর যমিন সংকীর্ণ নয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, বলো, 'হে আমার মোমেন বান্দারা, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর। যারা এ দুনিয়ায় কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্যে আছে কল্যাণ, প্রশস্ত আল্লাহর পৃথিবী, ধৈর্যশীলকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেয়া হবে।'

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানা ছিলো যে, হাবশার বাদশাহ আসহামা নাজ্জাশী একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক। তার রাজ্যে কারো ওপর কোন যুলুম অত্যাচার করা হয় না। এ কারণে আল্লাহর রসূল মুসলমানদেরকে তাদের দ্বীনের হেফাযতের জন্যে হাবশায় হিজরত করার আদেশ দিলেন। এরপর পরিকল্পিত কর্মসূচী অনুযায়ী রজব মাসে সাহাবায়ে কেরামের প্রথম

দল হাবশার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এ দলে বারো জন পুরুষ এবং চারজন মহিলা ছিলেন। হযরত ওসমান (রা.) ছিলেন দলনেতা। তাঁর সঙ্গে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা হযরত রোকাইয়া (রা.)-ও ছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের সম্পর্কে বলেন, 'হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং হযরত লুত (আ.)-এর পর আল্লাহর পথে হিজরতকারী এরা প্রথম দল।'[৪৪]

রাতের অন্ধকারে চুপিসারে এরা গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হন। কোরায়শদের জানতে না দেয়ার উদ্দেশ্যেই এ ধরনের সতর্কতার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমে তারা লোহিত সাগরের শুরাইবা বন্দরের দিকে অগ্রসর হন। সৌভাগ্যক্রমে সেখানে দুটি বাণিজ্যিক নৌকা পাওয়া গিয়েছিলো। সেই নৌকায় আরোহণ করে তারা নিরাপদে হাবশায় গমন করেন। তারা চলে যাওয়ার পর কোরায়শরা তাদের যাওয়ার খবর পায়। তারা খবর পাওয়ার পরই সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত ছুটে যায়। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আগেই চলে গিয়েছিলেন। এ কারণে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। ওদিকে মুসলমানরা হাবশায় পৌঁছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন।[৪৫]

সেই বছরই রমযান মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারম শরীফে গমন করেন। সেখানে নেতৃস্থানীয় কোরায়শরা সমবেত হয়েছিলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আকস্মিকভাবে উপস্থিত হয়ে সূরা 'নাজম' তেলাওয়াত শুরু করেন। একত্রে এতো পৌত্তলিক এর আগে কখনো কোরআন শোনেনি। কেননা তাদের সিদ্ধান্ত ছিলো এ রকম যে, কখনো কোরআন শোনা যাবে না, কোরআনের ভাষায়, কাফেররা বলে, 'তোমরা এই কোরআন শ্রবণ করো না, এবং তা যখন তেলাওয়াত করা হয়, তখন শোরগোল করো যাতে, তোমরা জয়ী হতে পারো।' (২৬, ৪১)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হঠাৎ করে মধুর স্বরে কোরআন তেলাওয়াত শুরু করলে পৌত্তলিকরা মোহিত হয়ে পড়ে। তারা কোরআনের লালিত্যে ভাষার মাধুর্যে ছিলো মুগ্ধ ও বিমোহিত। কারো মনে সে সময় অন্য কোন চিন্তাই আসেনি, সবাই এমনই অভিভূত হয়ে পড়েছিলো। সূরার শেষ দিকের এই আয়াত তিনি তেলাওয়াত করলেন, 'আল্লাহর জন্যে সেজদা করো এবং তাঁর এবাদত করো।' এই আয়াত পাঠ করার পরই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেজদায় চলে গেলেন। সাথে সাথে পৌত্তলিকরাও সেজদা করলো। সত্যের প্রভাব এবং মাধুর্য অমুসলিমদের অহংকার চূর্ণ করে দিয়েছিলো, তারা কেউই নিজের মধ্যে ছিলো না এ কারণে নিজের অজ্ঞাতেই সেজদায় নত হয়েছিলো।[৪৬]

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে তারা অবাক হয়ে গেলো। যে দ্বীনকে নিশ্চিহ্ন করতে তারা সর্বতোভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো, সেই কাজেই তাদের নিয়োজিত হতে দেখে সেখানে অনুপস্থিত পৌত্তলিকরা তাদের তিরস্কার করলো। তিরস্কারের কবল থেকে রক্ষা পেতে তারা তখন বললো, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মূর্তিগুলোর কথা সম্মানের সাথে উল্লেখ করেছেন। নিজেদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করতে তারা বললো, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ওরা সব উচ্চমার্গের দেবী এবং তাদের শাফায়াতের আশা করা যেতে পারে।'

অথচ এটা ছিলো সুস্পষ্ট মিথ্যা কথা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সেজদা করে তারা যে ভুল করেছিলো, তার একটা যুক্তিসঙ্গত ওযর পেশ করতে এ গল্প তৈরী করেছিলো।

---

৪৪. মুখতাছারুচ্ছ সীরাত, শেখ আবদুল্লাহ

৪৫. রহমাতুল লিল আলামিন ১ম খন্ড, পৃ ৬১ যাদুল মায়াদ ১ম খন্ড, পৃ ২৪

৪৬. সহীহ বোখারী শরীফে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে।

বলা বাহুল্য, যারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সব সময় মিথ্যাবাদী বলে রটনা করে, তাঁর বিরুদ্ধে নিন্দা কুৎসা রটায় তারা আত্মরক্ষার জন্যে এ ধরনের বানোয়াট কথার আশ্রয় নেবে এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই।[৪৭]

কোরায়শদের এই সেজদা করার খবর হাবশায় হিজরতকারী মুসলমানরাও পেয়েছিলো। কিন্তু তারা ভুল খবর পেয়েছিলো। তারা শুনেছেন যে, কোরায়শ নেতারা মুসলমান হয়ে গেছেন। এ খবর পাওয়ার পর শওয়াল মাসে তারা মক্কায় ফিরে আসার জন্যে হাবশা ত্যাগ করেন। মক্কা থেকে একদিনের দূরত্বে থাকার সময় তারা প্রকৃত খবর পেলেন। এরপর কেউ কেউ হাবশায় ফিরে গেলেন, আবার কেউ কেউ চুপিসারে অথবা কোরায়শদের কোন লোকের আশ্রিত হিসাবে মক্কায় প্রবেশ করেন।[৪৮]

আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরত

এরপর সেই হিজরতকারী মোহাজেরদের ওপর, বিশেষভাবে মুসলমানদের ওপর সাধারণভাবে পৌত্তলিকদের অত্যাচার আরো বেড়ে গেলো। পরিবারের অমুসলিমরা মুসলমানদের নানাভাবে কষ্ট দিতে লাগলো। কেননা কোরায়শরা খবর পেয়েছিলো যে, নাজ্জাশী মুসলমানদের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করেছেন এবং হাবশায় মুসলমানরা ভালোভাবেই দিন কাটিয়েছেন। এ খবর তাদের অন্তর্জ্বালা বাড়িয়ে দিয়েছিলো। কোরায়শদের অত্যাচার নির্যাতন বেড়ে যাওয়ায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় হাবশায় হিজরত করতে সাহাবাদের পরামর্শ দিলেন। তবে প্রথমবারের হিজরতের চেয়ে এটা ছিলো কঠিন। কারণ কোরায়শ পৌত্তলিকরা এবার ছিলো সতর্ক। তাদের ফাঁকি দিয়ে মুসলমানরা অন্যত্র চলে গিয়ে নিরাপদে জীবন যাপন করবে এটা তারা ভাবতেই পারছিলো না। কিন্তু মুসলমানরা অমুসলিমদের চেয়ে অধিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়ায় আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে হাবশায় যাওয়ার পথ সহজ করে দিলেন। ফলে হিজরতকারী মুসলমানরা কোরায়শদের নিয়ন্ত্রণে যাওয়ার আগেই হাবশার বাদশাহর কাছে পৌঁছে গেলেন। এবার বিরাশি বা তিরাশি জনের একটি দল হিজরত করেন। হযরত আম্মার (রা.)-এর হিজরত এর চেয়ে ভিন্ন ঘটনা, এ হিজরতে আঠার উনিশ জন মহিলা ছিলেন।[৪৯] আল্লামা মুনসুরপুরী মহিলাদের সংখ্যা আঠারো বলে উল্লেখ করেছেন।[৫০]

আবিসিনিয়ায় কোরায়শদের ষড়যন্ত্র

মুসলমানরা নিজেদের জীবন এবং ঈমান নিয়ে নিরাপদ এক জায়গায় চলে গেছে এটা ছিলো কোরায়শদের জন্যে মারাত্মক মনোবেদনার কারণ। অনেক আলোচনার পর তারা আমর ইবনুল আস এবং আবদুল্লাহ ইবনে রবিয়াকে এক গুরুত্বপূর্ণ মিশনে হাবশায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলো। এই দু'জন তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। এরা যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিলেন। হাবশার বাদশাহকে দেওয়ার জন্যে কোরায়শরা এই দুজন দূতের হাতে মূল্যবান উপঢৌকন পাঠালো। এরা প্রথমে বাদশাহকে উপঢৌকন দিলেন, এরপর সেসব যুক্তি এবং কারণ ব্যাখ্যা করলেন, যার ভিত্তিতে তারা মুসলমানদের মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। তারা বললো, 'হে বাদশাহ, আপনার দেশে আমাদের কিছু নির্বোধ যুবক পালিয়ে এসেছে। তারা স্বজাতির ধর্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু আপনি যে ধর্ম বিশ্বাস পোষণ করেন সেই ধর্ম বিশ্বাসও তারা গ্রহণ করেনি। বরং তারা এক

---

৪৭. উল্লিখিত বর্ণনা সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণের পর বিশেষজ্ঞরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

৪৮. যাদুল মায়াদ, ১ম খন্ড. পৃ ২৪, ২য় খন্ড, পৃ. ৪৪, হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৬৪

৪৯. যাদুল মায়াদ, ১ম খন্ড, পৃ. ১৪০, রহমাতুল লিল আলামিন ১ম খন্ড. পৃ. ৬০

৫০. রহমাতুল লিল আলামিন

নব আবিষ্কৃত ধর্ম বিশ্বাস গ্রহণ করেছে। এ ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে আমরাও কিছু জানি না আপনিও কিছু জানেন না। ওদের পিতামাতা ও আত্মীয়স্বজন আমাদেরকে ওদের ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে পাঠিয়েছেন। তারা চান যে, আপনারা তাদের নির্বোধ লোকদের আমাদের সাথে ফিরিয়ে দেবেন। তারা নিজেদের লোকদের ভালো-মন্দ সম্পর্কে ভালোভাবে বোঝেন।' দরবারের সভাসদরাও চাচ্ছিলেন যে, বাদশাহ যেন মুসলমানদের ফিরিয়ে দেন।

নাজ্জাশী ভাবলেন যে, এ সমস্যার গভীরে প্রবেশ করে সব দিক ভালোভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। তিনি মুসলমানদের তার দরবারে ডেকে পাঠালেন। মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তারা নির্ভয়ে সত্য কথা বলবে। এতে পরিণাম যা হয় হবে। মুসলমানরা দরবারে আসার পর নাজ্জাশী জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা যে ধর্ম বিশ্বাসের কারণে নিজেদের স্বজাতীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছো, সেটা কি? তোমরা তো আমার অনুসৃত ধর্ম বিশ্বাসেও প্রবেশ করোনি। মুসলমানদের মুখপাত্র হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব (রা.) বললেন, 'হে বাদশাহ, আমরা ছিলাম মূর্তিপূজায় লিপ্ত একটি মূর্খ জাতি। আমরা মৃত পশুর মাংশ খেতাম, পাপ কাজে লিপ্ত থাকতাম, নিকটাত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, প্রতিবেশীদের সাথে খারাপ ব্যবহার করতাম, আমাদের মধ্যে শক্তিশালীরা দুর্বলদের ওপর অত্যাচার করতো। আমরা যখন এরূপ অবস্থায় ছিলাম, তখন আল্লাহ তায়ালা আমাদের মধ্য থেকে একজনকে রসূলরূপে পাঠালেন। তাঁর উচ্চ বংশমর্যাদা, সত্যবাদিতা, সচ্চরিত্রতা, আমানতদারি ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে আমরা আগে থেকেই জানতাম। তিনি আমাদেরকে আল্লাহর পথে ডেকে বুঝিয়েছেন যে, আমরা যেন এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহকে মানি এবং তাঁর এবাদাত করি, যেসব মূর্তি এবং পাথরকে আমাদের পিতা পিতামহ পূজা করতেন সেসব যেন পরিত্যাগ করি। তিনি আমাদেরকে সত্য বলা, আমানত আদায় করা, নিকটাত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক স্থাপন, পাপ না করা এবং রক্তপাত থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। অশ্লীল কাজে লিপ্ত হওয়া, মিথ্যা বলা, এতিমের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করা এবং সতী পুন্যশীলা মহিলার নামে অপবাদ না দেয়ার জন্যে নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলেছেন, আমরা যেন শুধু আল্লাহর এবাদত করি। তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করি। তিনি আমাদের নামায আদায়, রোযা রাখা এবং যাকাত দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত জাফর (রা.) ইসলামের পরিচয় এভাবে তুলে ধরার পর বললেন, 'আমরা সেই পয়গাম্বরকে সত্য বলে মেনেছি, তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন, আনীত দ্বীনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও আনুগত্য করেছি। আমরা শুধুমাত্র আল্লাহর এবাদত করেছি এবং তার সাথে অন্য কাউকে শরিক করিনি। সেই পয়গাম্বর যেসব জিনিসকে নিষিদ্ধ বলেছেন, সেগুলোকে আমরা নিষিদ্ধ মনে করেছি যেগুলোকে হালাল বা বৈধ বলেছেন, সেগুলোকে হালাল মনে করেছি। এ সব কারণে আমাদের স্বজাতীয় লোকেরা আমাদের ওপর নাখোশ হয়েছে। তারা আমাদের উপর অত্যাচার নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে এবং পূর্ববর্তী ধর্মে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে নানাভাবে চেষ্টাও চালিয়ে যাচ্ছে। তারা চায়, আমরা যেন আল্লাহর এবাদত পরিত্যাগ করে মূর্তিপূজার প্রতি ফিরে যাই। যেসব নোংরা জিনিসকে ইতিপূর্বে হারাম মনে করেছিলাম, সেসব কিছুকে যেন হালাল মনে করি। ওরা যখন আমাদের ওপর অত্যাচার নির্যাতনের মাত্রা বহুলাংশে বাড়িয়ে, পৃথিবীকে আমাদের জন্যে সঙ্কীর্ণ করে দিয়েছে এবং তারা আমাদের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন আমরা আপনার দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছি এবং অন্যদের তুলনায় আপনাকে প্রাধান্য দিয়ে আপনার আশ্রয়ে থাকা পছন্দ করেছি। আমরা এ আশাও পোষণ করেছি যে, আপনার এখানে আমাদের ওপর কোন প্রকার যুলুম অত্যাচার করা হবে না।

নাজ্জাশী বললেন, আমাকে তোমাদের রসূলের আনীত গ্রন্থ থেকে একটু পড়ে শোনাও।

হযরত জাফর (রা.) সূরা মরিয়মের প্রথম অংশের কয়েকটি আয়াত পাঠ করলেন। তা শুনে নাজ্জাশীর মন পরিবর্তন হলো, তিনি অবিরাম কাঁদতে লাগলেন, তাঁর দাঁড়ি অশ্রুতে ভিজে গেলো। তাঁর ধর্মীয় উপদেষ্টারাও এতো বেশী কাঁদলেন যে, তাদের সামনে মেলে রাখা ধর্মীয় গ্রন্থের ওপর অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। নাজ্জাশী এরপর বললেন, এই বাণী এবং হযরত মুসা (আ.) আনীত বাণী একই উৎস থেকে উৎসারিত। এরপর নাজ্জাশী আমর ইবনুল আস এবং আবদুল্লাহ ইবনে রবিয়াকে বললেন, তোমরা চলে যাও, আমি ওই সব লোককে তোমাদের হাতে তুলে দিতে পারবো না। এখানে তাদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার কারসাজি আমি সহ্য করব না।

বাদশাহর নির্দেশের পর কোরায়শদের উভয় প্রতিনিধি দরবার থেকে বেরিয়ে এলো। এরপর আমর ইবনুল আস আবদুল্লাহ ইবনে রবিয়াকে বললো, আগামীকাল ওদের বিরুদ্ধে এমন কথা বাদশাহকে বলবো যে, ওদের সব চালাকি ছুটিয়ে দেবো। আবদুল্লাহ ইবনে রবিয়া বললেন, না তার দরকার নেই। ওরা যদিও আমাদের ধর্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ করেছে, কিন্তু ওরাতো আমাদের গোত্রের লোক। তবুও আমর ইবনুল আস তার সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন।

পরদিন আমর ইবনুল আস বাদশাহর দরবারে গিয়ে বললেন, হে বাদশাহ, ওরা ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.) সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বলে। এ কথা শুনে নাজ্জাশী পুনরায় মুসলমানদের ডেকে পাঠালেন। তিনি হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে মুসলমানদের মতামত জানতে চাইলেন। মুসলমানরা এবার ভয় পেয়ে গেলেন। তবু তারা ভাবলেন, আল্লাহর ওপর ভরসা, যা হবার হবে, তারা কিন্তু সত্য কথাই বলবেন।

নাজ্জাশীর প্রশ্নের জবাবে হযরত জাফর (রা.) বললেন, আমরা হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে সেই কথাই বলে থাকি, যা আমাদের নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর বান্দা, তাঁর রসূল, তাঁর রূহ এবং তাঁর কালেমা। তাকে আল্লাহ তায়ালা কুমারী সতী সাধ্বী হযরত মরিয়ম (আ.)-এর ওপর ন্যস্ত করেছেন।'

এ কথা শুনে নাজ্জাশী মাটি থেকে একটি কাঠের টুকরো তুলে নিয়ে বললেন, খোদার কসম, তোমরা যা কিছু বলেছ, হযরত ঈসা (আ.) এই কাঠের টুকরোর চাইতে বেশী কিছুই ছিলেন না। এ কথা শুনে ধর্মীয় উপদেষ্টাগণ হুঁ হুঁ শব্দ উচ্চারণ করে বিরক্তি প্রকাশ করলেন। বাদশাহ বললেন, তোমরা হুঁ হুঁ বললেও আমি যা বলেছি, একথাই সত্য।

এরপর নাজ্জাশী মুসলমানদের বললেন, যাও, তোমরা আমার দেশে সম্পূর্ণ নিরাপদ। যারা তোমাদের গালি দেবে, তাদের ওপর জরিমানা ধার্য করা হবে। আমি চাই না কেউ তোমাদের কষ্ট দিক, আর তার পরিবর্তে আমি সোনার পাহাড় লাভ করি।

এরপর নাজ্জাশী তার ভৃত্যদের বললেন, মক্কা থেকে আগত প্রতিনিধিদের আনীত উপঢৌকন তাদের ফিরিয়ে দাও, ওগুলোর কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহর শপথ, তিনি যখন আমাকে আমার দেশ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তখন আমার কাছ থেকে কোন ঘুষ নেননি। আমি কেন তাঁর পথে ঘুষ নেব। এছাড়া তিনি অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আমার ব্যাপারে অন্য লোকদের কথা গ্রহণ করেননি। আমি কেন আল্লাহর ব্যাপারে অন্য লোকদের কথা মানবো?

এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হযরত উম্মে সালমা (রা.) বলেন, কোরায়শদের উভয় প্রতিনিধি এরপর তাদের আনীত উপঢৌকনসহ অসম্মানজনকভাবে দেশে ফিরে এলো। আমরা নাজ্জাশীর দেশে একজন ভালো প্রতিবেশীর ছত্রছায়ায় অবস্থান করতে লাগলাম।[৫১]

---

৫১. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড. পৃ ৩৩৪-৩৩৮

উল্লিখিত ঘটনার বর্ণনা ইবনে ইসহাক উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য সীরাত রচয়িতারা লিখেছেন, নাজ্জাশীর দরবারে হযরত আমর ইবনুল আস বদরের যুদ্ধের পর গিয়েছিলেন। কেউ কেউ উভয় বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্যে লিখেছেন, মুসলমানদের ফিরিয়ে আনার জন্যে আমর ইবনুল আস নাজ্জাশীর দরবারে দু'বার গিয়েছিলেন। কিন্তু বদরের যুদ্ধের পরে নাজ্জাশী এবং হযরত জাফরের মধ্যেকার কথোকথনের যে বিবরণ ইবনে ইসহাক উল্লেখ করেছেন, সেটা হাবশায় মুসলমানদের হিজরতের পরবর্তী সময়ের কথোপকথনের অনুরূপ। তাছাড়া নাজ্জাশীর প্রশ্নের ধরন দেখে বোঝা যায় যে, তার সাথে মুসলমানদের কথাবার্তা একবারই হয়েছিলো আর, সেটা হয়েছিলো হাবশায় মুসলমানদের হিজরতের পরপরই।

মোটকথা পৌত্তলিকদের কৌশল ব্যর্থ হলো। তারা বুঝতে পেরেছিলো যে, শত্রুতামূলক আচরণ যতোটা করার, সেটা নিজেদের সীমানার মধ্যেই করতে হবে। তবে, এ সময়ে তারা একটা মারাত্মক বিষয় ভাবতে শুরু করলো। তারা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলো যে, এ বিপদ থেকে রক্ষা পেতে তাদের সামনে দুটি পথ খোলা রয়েছে। হয় শক্তি প্রয়োগে আল্লাহর রসূলের দ্বীনী তাবলীগ বন্ধ করে দিতে হবে অথবা তাঁর অস্তিত্বই নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সহজ ছিলো না কারণ স্বয়ং আবু তালেব ছিলেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিম্মাদার। তিনি পৌত্তলিকদের সঙ্কল্পের সামনে লৌহ যবনিকার মতো দাঁড়িয়েছিলেন। এমতাবস্থায় তারা পুনরায় আবু তালেবের সাথে কথা বলার প্রয়োজন অনুভব করলো।

আবু তালেবের প্রতি হুমকি

এ প্রস্তাবের পর কোরায়শ নেতারা আবু তালেবের কাছে গিয়ে বললেন, হে আবু তালেব, আপনি আমাদের মধ্যে মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। আমরা আপনাকে বলেছিলাম যে, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে ফিরিয়ে রাখুন, কিন্তু আপনি রাখেননি। আপনি মনে রাখবেন, আমাদের পিতা-পিতামহকে গালাগাল দেয়া হবে এটা সহ্য করতে পারব না। আমাদের বুদ্ধি বিবেক বিচার বিবেচনাকে নির্বুদ্ধিতা বলা হবে এবং উপাস্যদের দোষ বের করা হবে, এটাও আমাদের সহ্য হবে না। আপনি তাকে বাধা দিন এবং বিরত রাখুন। যদি এতে ব্যর্থ হন, তবে আপনার এবং আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের সাথে এমন লড়াই বাধিয়ে দেবো যে, এতে বহু প্রাণহানি ঘটবে।

এ হুমকিতে আবু তালেব প্রভাবিত হলেন। তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডেকে বললেন, ভাতিজা, তোমার কওমের লোকেরা আমার কাছে এসে এসব কথা বলে গেছে। কাজেই, তুমি এবার আমার এবং তোমার নিজের প্রতি দয়া করো। তুমি এ বিষয়ে আমার ওপর এমন বোঝা চাপিও না, যা আমি বহন করতে পারবো না।

একথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝতে পারলেন যে, এবার তাঁর চাচাও তাঁকে পরিত্যাগ করবে। তাঁকে সাহায্য করার ব্যাপারে তিনিও দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এ কারণে তিনি বললেন, 'চাচাজান, আল্লাহর শপথ, যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দিয়ে কেউ বলে একাজ ছেড়ে দাও, তবুও আমি তা ছাড়তে পারব না। হয়তো এ কাজের পূর্ণতা বিধান করে আমি একে জয়ী করবো অথবা এ কাজ করতে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যাব।'

একথা বলে আবেগের আতিশয্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেঁদে ফেললেন। এরপর চলে যেতে লাগলেন। চাচা আবু তালেবের মন কেঁদে উঠলো। তিনি ভাতিজাকে ডেকে

বললেন, যাও ভাতিজা, তুমি যা চাও, তাই করো। আল্লাহর শপথ, আমি কোন অবস্থায় কখনো তোমাকে ছাড়তে পারবো না।[৫২]

'খোদার শপথ তোমার কাছে যেতে ওরা, পারবে না তো দলে দলে,
যতোদিন না দাফন হবো আমি মাটির তলে।
বলতে থাকো তোমার কথা খোলাখুলি, করো না আর কোনো ভয়',
দু'চোখ তোমার শীতল হোক আর, খুশী হোক তোমার হৃদয়।[৫৩]

আবু তালেবের কাছে পুনরায় কোরায়শ প্রতিনিধি দল

মারাত্মক রকমের হুমকি সত্তেও কোরায়শরা যখন দেখলো যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, তখন তারা বুঝতে পারলো যে, আবু তালেব তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে পরিত্যাগ করতে পারবে না। বরং প্রয়োজনে তিনি কোরায়শদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন এবং শত্রুতার জন্যেও প্রস্তুত আছেন। এরূপ চিন্তা করে কোরায়শ নেতারা ওলীদ ইবনে মুগীরার পুত্র আম্মারাকে সঙ্গে নিয়ে আবু তালেবের কাছে হাযির হয়ে বললো, হে আবু তালেব, আম্মারাকে নিয়ে এলাম। আম্মারা কোরায়শ বংশের সুদর্শন যুবক, আপনি ওকে গ্রহণ করুন। সে আপনাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে। আপনি ওকে নিজের পুত্র সন্তান হিসাবে গ্রহণ করুন। সে আপনার হবে আর আপনি নিজের ভাতিজা মোহাম্মদকে আমাদের হাতে তুলে দিন, যে আপনার পিতা-পিতামহের দ্বীনের বিরোধিতা করছে, আপনার জাতিকে ছিন্নভিন্ন করছে এবং তাদের বুদ্ধিমত্তাকে নির্বুদ্ধিতা বলে অভিহিত করছে। আমরা তাকে হত্যা করবো। ব্যস, এটা একজন লোকের পরিবর্তে একজন লোকের হিসাব হবে।

আবু তালেব বললেন, 'কি চমৎকার সওদা করতে তোমরা আমার কাছে এসেছো। নিজেদের পুত্রকে তোমরা আমার কাছে নিয়ে এসেছো, আমি তাকে পানাহার করাবো লালন পালন করে বড় করবো, আর আমি নিজের পুত্রকে তোমাদের হাতে দেবো তোমরা তাকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করবে। আল্লাহর কসম, এটা হতে পারে না।'

একথা শুনে নওফেল ইবনে মাতয়ামের পুত্র আদী বললেন, খোদার কসম, হে আবু তালেব, তোমার সাথে তোমার কওম ইনসাফের কথা বলেছে এবং তুমি কল্যাণকর অবস্থা থেকে দূরে থাকতে চেয়েছো। কিন্তু আমি লক্ষ্য করছি যে, তুমি তাদের কোন কথাই গ্রহণ করতে চাচ্ছ না।

জবাবে আবু তালেব বললেন, খোদার শপথ, তোমরা আমার সাথে ইনসাফের কথা বলোনি, বরং তোমরাও আমার সঙ্গ ছেড়ে আমার বিরুদ্ধে লোকদের সাহায্য করতে উদ্যত হচ্ছ। ঠিক আছে, যা ইচ্ছা করো।[৫৪]

সীরাতের বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করেও উল্লিখিত উভয় কথোপকথনের সময় জানা যায় না, কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণ এবং ইঙ্গিত ইশারা থেকে মনে হয়, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য বেশী নয়। উভয় কথোপকথন ষষ্ঠ হিজরীর মাঝামাঝি কোন এক সময়ে হয়েছিলো।

আল্লাহর রসূলকে হত্যা করার হীন প্রস্তাব

কোরায়শ নেতাদের উল্লিখিত উভয় আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর তাদের আক্রোশ বেড়ে গেলো। অত্যাচার নির্যাতনের মাত্রা আরো বাড়লো। সে সময় কোরায়শ নেতাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের

৫২. ইবনে হিশাম ১ম খন্ড, পৃ. ২৬৫, ২৬৬
৫৩. মোখতাসারুস্ সীরাত, শেখ মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব নজদী, পৃঃ ৬৮
৫৪. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, ২৬৬ ২৬৭

মধ্যে আরো নতুন মাত্রা যোগ হলো। তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার প্রস্তাব করলো। কিন্তু সেই সময়ে দুই বিশিষ্ট কোরায়শ নেতা হযরত হামযা (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ ইসলামের শক্তি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার পরিবর্তে বরং এই দুই বীর কেশরী আল্লাহর রসূলের কাছে আত্মসমর্পণ করে ইসলামেরই শক্তি বাড়িয়ে দেন।

আল্লাহর রসূলের প্রতি পৌত্তলিকদের অত্যাচার নির্যাতনের দুটি উদাহরণ পেশ করছি।

একদিন আবু লাহাবের পুত্র ওতাইবা রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললো, 'ওয়াননাজমে ইযা হাওয়া এবং ছুম্মা দানা ফাতাদাল্লার' সাথে আমি কুফর করছি। সূরা নাজম-এর এ দুটি আয়াতের অর্থ হচ্ছে, 'শপথ নক্ষত্রের, যখন তা অস্তমিত হয়। অতপর, সে তার নিকটবর্তী হলো অতি নিকটবর্তী।' এরপর ওতাইবা আল্লাহর রসূলের ওপর অত্যাচার শুরু করলো। তাঁর জামা ছিঁড়ে দিলো এবং পবিত্র চেহারা লক্ষ্য করে থুথু নিক্ষেপ করলো। কিন্তু থুথু তাঁর চেহারায় পড়েনি। সে সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বদদোয়া দিলেন। তিনি বলেছিলেন,' হে আল্লাহ তায়ালা, ওর ওপর তোমার কুকুরসমূহের মধ্যে থেকে একটি কুকুর লেলিয়ে দাও।' রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বদদোয়া কবুল হয়েছিলো। ওতবা একবার কোরায়শ বংশের কয়েকজন লোকের সাথে এক সফরে সিরিয়া যাচ্ছিলো। যারকা নামক জায়গায় তারা একদা রাত্রি যাপনের জন্যে তাঁবু স্থাপন করলো। সে সময় একটি বাঘকে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেলো। ওতাইবা বাঘ দেখে বললো, হায়রে, আমার ধ্বংস অনিবার্য খোদার কসম, এই বাঘ আমাকে খাবে। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ওপর বদদোয়া করেছেন। দেখো আমি সিরিয়ায় রয়েছি, অথচ তিনি মক্কায় বসে আমাকে মেরে ফেলছেন। সতর্কতা হিসাবে সফরসঙ্গীরা তখন ওতাইবাকে নিজেদের মাঝখানে রেখে শয়ন করলো। রাত্রিকালে বাঘ এলো, সবাইকে ডিঙ্গিয়ে ওতাইবার কাছে গেলো এবং তার ঘাড় মটকালো।[৫৫]

ওকবা ইবনে আবু মুঈত ছিলো একজন প্রখ্যাত পৌত্তলিক। একবার এই দুর্বৃত্ত নামাযে সেজদা দেয়ার সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘাড় এতো জোরে পেঁচিয়ে ধরলো, মনে হচ্ছিলো যেন, তাঁর চোখ বেরিয়ে যাবে।[৫৬]

ইবনে ইসহাকের একটি দীর্ঘ বর্ণনায় কোরায়শদের চক্রান্ত সম্পর্কে জানা যায়। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে ক্রমাগত চক্রান্ত করছিলো। উক্ত বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, একবার আবু জেহেল বলেছিলো, হে কোরায়শ ভাইয়েরা, আপনারা লক্ষ্য করছেন যে, মোহাম্মদ আমাদের ধর্মের সমালোচনা এবং আমাদের উপাস্যদের নিন্দা থেকে বিরত হচ্ছে না। আমাদের পিতা পিতামহকে অবিরাম গালমন্দ দিয়েই চলেছে। এ কারণে আমি আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করছি যে, আমি একটি ভারি পাথর নিয়ে বসে থাকবো, মোহাম্মদ যখন সেজদায় যাবে, তখন সেই পাথর দিয়ে তার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবো। এরপর যে কোন পরিস্থিতির জন্যে আমি প্রস্তুত। ইচ্ছে হলে আপনারা আমাকে বান্ধবহীন অবস্থায় রাখবেন অথবা আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন। এরপর বনু আবদে মান্নাফ আমার সাথে যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার করবে, এতে আমার কোন পরোয়া নেই। কোরায়শরা এ প্রস্তাব শোনার পর বললো, কোন

৫৫. মুখতাছারুছ সিয়ার, শেখ আবদুল্লাহ পৃ. ১৩৫, ১ম খন্ড, এস্তিয়ার, এছাবা দালায়েলুন নবুয়ত। আর ফওয়ুল আনফ

৫৬. ঐ, মুখতাছারুছ সিয়ার, পৃ. ১১৩

অবস্থায়ই আমরা তোমাকে বান্ধবহীন অবস্থায় ফেলে রাখবো না। তুমি যা করতে চাও, করতে পারো।

সকালে আবু জেহেল একটি ভারি পাথর নিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অপেক্ষায় বসে থাকলো। কোরায়শরা একে একে সমবেত হয়ে আবু জেহেলের কর্মতৎপরতা দেখতে উৎকণ্ঠিত হয়ে রইলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথারীতি হাযির হয়ে নামায আদায় করতে শুরু করলেন। তিনি যখন সেজদায় গেলেন তখন আবু জেহেল পাথর নিয়ে অগ্রসর হলো। কিন্তু পরক্ষণে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় ফিরে এলো, এবং তার হাত পাথরের সাথে যেন আটকেই রইলো। কোরায়শের কয়েকজন লোক তার কাছে এসে বললো, আবুল হাকাম তোমার কী হয়েছে? সে বললো, আমি যে কথা রাতে বলেছিলাম, সেটা করতে যাচ্ছিলাম কিন্তু কাছাকাছি পৌছুতেই দেখতে পেলাম, মোহাম্মদ এবং আমার মাঝখানে একট উট এসে দাঁড়িয়েছে। খোদার কসম আমি কখনো অতো বড়, অতো লম্বা ঘাড় ও দাঁত বিশিষ্ট উট দেখিনি। উটটি আমার ওপর হামলা করতে চাচ্ছিলো।

ইবনে ইসহাক বলেন, আমাকে জানানো হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, উটের ছদ্মবেশে তিনি ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আ.)। আবু জেহেল যদি কাছে আসতো তবে তাকে পাকড়াও করা হতো।[৫৭]

এরপর আবু জেহেল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এমন ব্যবহার করছিলো যে, সেটা দেখে হযরত হামযা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। সে সম্পর্কে কিছুক্ষণ পরে আলোচনা করা হবে।

কোরায়শের অন্যান্য দুর্বৃত্তরাও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চাচ্ছিলো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, একবার পৌত্তলিকরা কা'বার সামনে বসেছিলো। আমিও সেখানে ছিলাম। তারা আল্লাহর রসূলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বললো, এই লোকটি সম্পর্কে আমরা যেরূপ ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছি তার উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রকৃতপক্ষে তার ব্যাপারে আমরা অতুলনীয় ধৈর্যধারণ করেছি। এ আলোচনা চলার সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপস্থিত হলেন। তিনি প্রথমে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন এরপর কাবাঘর তওয়াফ করার সময়ে পৌত্তলিকদের পাশ দিয়ে গেলেন। তারা খারাপ কথা বলে তাঁকে অপমান করলো, আল্লাহর রসূলের চেহারায় সে অপমানের ছাপ ফুটে উঠলো। তওয়াফের মধ্যে পুনরায় তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে তারা পুনরায় একইভাবে অপমানজনক কথা বললো। সে অপমানের প্রভাব আমি তাঁর চেহারায় লক্ষ্য করলাম। তৃতীয়বারও একই রকম ঘটনা ঘটলো। এবার আল্লাহর রসূলের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেলো। তিনি থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, কোরায়শের লোকেরা শোনো, সেই আল্লাহর শপথ, তাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আমি তোমাদের কাছে কোরবানীর পশু নিয়ে এসেছি।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একথায় কোরায়শরা দারুণ প্রভাবিত হলো। তারা সবাই নীরব হয়ে গেলো। কঠোর প্রাণের লোকেরাও তাঁর প্রতি নম্র নরম ভাষা ব্যবহার করতে লাগলো। তারা বলছিলো, আবুল কাসেম, আপনি ফিরে যান। আল্লাহর শপথ, আপনি তো কখনো নির্বোধ ছিলেন না।

---

৫৭. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ২৯৮-২৯৯

পরদিনও কোরায়শরা একইভাবে সমবেত হয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রসঙ্গ আলোচনা করছিলো। এমন সময় তিনি এলেন, তিনি কাছে আসতেই তারা একযোগে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। একজন তাঁর চাদর গলায় জড়িয়ে শ্বাসরোধ করতে চাচ্ছিলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তাঁকে দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রক্ষার চেষ্টা করছিলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন, তোমরা কি এমন একজন মানুষকে হত্যা করছো, যিনি বলেন যে, আমার প্রভু আল্লাহ? দুর্বৃত্তরা এরপর তাঁকে ছেড়ে দিয়ে চলে গেলো। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) বলেন, কোরায়শদের অত্যাচারের ঘটনাসমূহের মধ্যে আমার দেখা এ ঘটনাটি ছিলো সবচেয়ে মারাত্মক।[৫৮]

সহীহ বোখারী শরীফে হযরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, পৌত্তলিকরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সবচেয়ে বর্বরোচিত যে ব্যবহার করেছিলো তার বিবরণ আমাকে বলুন। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবার হাতীমে নামায আদায় করছিলেন। এমন সময় ওকবা ইবনে আবু মুঈত এসে হাযির হলো। সে এসেই নিজের চাদর আল্লাহর রসূলের গলায় পেঁচিয়ে তাঁর শ্বাসরুদ্ধ করতে চাইলো। এমন সময় হযরত আবু বকর (রা.) এলেন এবং ওকবার দুই কাঁধ ধরে তাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন। এরপর বললেন, তোমরা এমন একজন মানুষকে হত্যা করতে চাও যিনি বলেন যে, আমার প্রভু আল্লাহ?[৫৯]

হযরত আসমা (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এ চিৎকার শুনতে পেলেন যে, তোমাদের সঙ্গিকে বাঁচাও। এ চিৎকার শোনা মাত্র তিনি আমাদের কাছ থেকে দৌড়ে গেলেন। তাঁর মাথায় চারটি বেণী ছিলো। তিনি একথা বলতে বলতে ছুটে গেলেন যে, তোমরা কি এমন একজন মানুষকে হত্যা করতে চাও, যিনি বলেন, আমার প্রভু আল্লাহ? পৌত্তলিকরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছেড়ে হযরত আবু বকরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তিনি বাড়ী ফিরে আসার পর আমরা তাঁর মাথার চুলের যেখানেই হাত দিচ্ছিলাম, চুল আমাদের হাতে উঠে আসছিলো।[৬০]

হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণ

মক্কার পরিবেশ এমনি ধরনের যুলুম অত্যাচারে আচ্ছন্ন থাকার সময়ে হঠাৎ করে আলোর ঝলক দেখা গেলো। হযরত হামযা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করলেন। আল্লাহর রসূলের নবুয়ত লাভের ষষ্ঠ বছরের জিলহজ্জ মাসে এ ঘটনা ঘটে।

হযরত হামযা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ ছিলো এই যে, আবু জেহেল একদিন সাফা পাহাড়ের কাছাকাছি জায়গায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালমন্দ করে এবং তাঁকে কষ্ট দেয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব রইলেন, কোন কথা বললেন না। দুর্বৃত্ত আবু জেহেল এরপর আল্লাহর রসূলের মাথায় এক টুকরো পাথর নিক্ষেপ করলো। এতে মাথা ফেটে রক্ত বের হলো। আবু জেহেল এরপর কাবার সামনে কোরায়শদের মজলিসে গিয়ে বসলো। আবদুল্লাহ ইবনে জুদয়ানের একজন দাসী এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলো। হযরত হামযা শিকার করে ফিরছিলেন। সেই দাসী তাঁকে সব কথা শোনালো। হযরত হামযা ক্রোধে অধীরে হয়ে উঠলেন।

---

৫৮. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ২৮৯-২৯০

৫৯. সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৪৪

৬০. মুখতাছারুস সীরাত, শেখ আবদুল্লাহ, পৃ. ১১৩

তিনি ছিলেন কোরায়শদের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী যুবক। তিনি দেরী না করে সামনে পা বাড়িয়ে বললেন, আবু জেহেলকে যেখানেই পাব সেখানেই আঘাত করব। এরপর তিনি সোজা কাবাঘরে প্রবেশ করে আবু জেহেলের সামনে গিয়ে বললেন, ওরে গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ু ত্যাগকারী, তুই আমার ভাতিজাকে গালি দিচ্ছিস, অথচ আমিও তো তার প্রচারিত দ্বীনের অনুসারী। একথা বলে হাতের ধনুক দিয়ে আবু জেহেলের মাথায় এতো জোরে আঘাত করলেন যে, মাথায় মারাত্মক ধরনের জখম হয়ে গেলো। এ ঘটনার সাথে সাথে আবু জেহেলের গোত্র বনু মাখযুম এবং হযরত হামযা (রা.)-এর গোত্র বনু হাশেমের লোকেরা পরস্পরের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়ে উঠলো। আবু জেহেল এই বলে সবাইকে থামিয়ে দিল যে, আবু আমারাকে কিছু বলো না, আমি তার ভাতিজাকে আসলেই খুব খারাপ গালি দিয়েছিলাম।[৬১]

প্রথমদিকে নিজের আত্মীয়কে গালি দেয়ায় ধৈর্যহারা হয়ে হযরত হামযা (রা.) রসূল (রা.)-এর প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে আল্লাহ তায়ালা তাঁর অন্তর খুলে দেন। তিনি ইসলামের বলিষ্ঠ প্রবক্তা হয়ে ওঠেন। তাঁর কারণে মুসলমানরা যথেষ্ট শক্তি এবং স্বস্তি অনুভব করেন।[৬২]

হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ

যুলুম অত্যাচার নির্যাতনের কালোমেঘের সেই গম্ভীর পরিবেশে আলোর আরো একটি ঝলক ছিল হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা। হযরত হামযা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের তিনদিন পর নবুয়তের ষষ্ঠ বছরের জিলহজ্জ মাসেই এ ঘটনা ঘটেছিলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ইসলাম গ্রহণের জন্যে দোয়া করেছিলেন।[৬৩]

ইমাম তিরমিযি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছে এ ঘটনাকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। ইমাম তিবরানি হযরত ইবনে মাসউদ এবং হযরত আনাস (রা.) থেকে এ ঘটনা বর্ণনা করেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করেছিলেন, 'হে আল্লাহ, ওমর ইবনে খাত্তাব এবং আবু জেহেলের মধ্যে তোমার কাছে যে ব্যক্তি বেশী পছন্দনীয়, তাকে ইসলাম গ্রহণের সুযোগ দাও এবং তার দ্বারা ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি করো।'

আল্লাহ তায়ালা এ দোয়া কবুল করেন এবং হযরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। উল্লিখিত দু'জনের মধ্যে আল্লাহর কাছে হযরত ওমর (রা.) ছিলেন অধিক প্রিয়।[৬৪]

হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত সকল বর্ণনার ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ বিচারে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর মনে পর্যায়ক্রমে ইসলাম জায়গা করে নিয়েছিলো। সে বিষয়ে আলোকপাত করার আগে হযরত ওমর (রা.)-এর মন মেজায ও ধ্যান-ধারণার প্রতি সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত দেয়া জরুরী মনে করছি।

হযরত ওমর (রা.) তাঁর রুক্ষ মেজায এবং কঠোর স্বভাবের জন্যে পরিচিত ছিলেন। দীর্ঘকাল যাবত মুসলমানরা তাঁর হাতে নানাভাবে নির্যাতন ভোগ করেন। মনে হয়, তাঁর মধ্যে বিপরীতধর্মী স্বভাবের সমন্বয় সাধিত হয়েছিলো। একদিকে তিনি নিজের পিতা পিতামহের আবিষ্কৃত রুসম-

---

৬১. মুখতাছারুছ সীরাত, শেখ মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব, পৃ, ৬৬, রহমাতুল লিল আলামিন, ১ম খন্ড, ৬৮, ইবনে হিশাম, ১১ ১ম খন্ড পৃ, ২৯১-২৯২

৬২. মুখতাছারুছ সীরাত, শেখ আবদুল্লাহ, পৃ. ১০১

৬৩. তারীখে ওমর ইবনুল খাত্তাব, ইবনে জওযি, পৃ. ১১

৬৪. তিরমিজি, মানাকেবে আবু হাফস ওমর ইবনে খাত্তাব ২য় খন্ড, পৃ. ২০৯

রেওয়াজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, খেলাধূলার প্রতিও তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিলো, অন্যদিকে ঈমান-আকীদার প্রতি মুসলমানদের দৃঢ়তা এবং অত্যাচার নির্যাতনের মুখেও মুসলমানদের ধৈর্য সহিষ্ণুতা তিনি আগ্রহের দৃষ্টিতে দেখতেন। বুদ্ধি বিবেচনার মাধ্যমে তিনি মাঝে মাঝে ভাবতেন যে, ইসলাম ধর্মে যে বিষয়ে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে সম্ভবত সেটাই সত্য, অধিক পবিত্র ও উন্নত। এ কারণে হঠাৎ ক্ষেপে গেলেও হঠাৎ শান্ত হয়ে যেতেন।[৬৫]

হযরত ওমর (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত সকল বর্ণনার মূলকথা নিম্নরূপ,

একবার হযরত ওমরকে ঘরের বাইরে দিন কাটাতে হয়েছিলো। তিনি হারম শরীফে গমন করেন এবং কাবাঘরের পর্দার ভেতরে প্রবেশ করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময় নামায আদায় করছিলেন। তিনি সূরা আল হাক্কা তেলাওয়াত করছিলেন। হযরত ওমর (রা.) কোরআন শুনতে লাগলেন এবং কোরআনের রচনাশৈলীতে মুগ্ধ ও অভিভূত হলেন। মনে মনে বললেন, এই ব্যক্তি দেখছি কবি, কোরায়শদের কথাই ঠিক। এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেলাওয়াত করলেন, 'নিশ্চয়ই এই কোরআন এক সম্মানিত রসূলের কাছে বহন করে আনা বার্তা, এটা কোন কবির রচনা নয়, তোমরা অল্পই বিশ্বাস করো।' হযরত ওমর বলেন, আমি মনে মনে বললাম, এই ব্যক্তি তো দেখছি জ্যোতিষী। এমন সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেলাওয়াত করলেন, 'এটা কোন গণকের কথাও নয়। তোমরা অল্পই অনুধাবন কর। এটি জগৎসমূহের প্রতিপালকের কাছ থেকে অবতীর্ণ।' রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরার শেষ পর্যন্ত তেলাওয়াত করলেন।

হযরত ওমর (রা.) বলেন, সেই সময়েই আমার মনে ইসলাম রেখাপাত করে।[৬৬] কিন্তু তখনো তাঁর মনে পূর্ব-পুরুষদের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসা ছিলো অটুট। এ কারণেই হৃদয়ের গোপন গভীরে ইসলামের প্রতি ভালোবাসার বীজ রোপিত হলেও ইসলামের বিরোধিতার প্রকাশ্য কাজকর্মে তিনি ছিলেন সোচ্চার।

তাঁর স্বভাবের কঠোরতা এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে শত্রুতার অবস্থা এমন ছিলো যে, একদিন তলোয়ার হাতে নিয়েরসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই বেরিয়ে পড়লেন। পথে নঈম ইবনে আবদুল্লাহ নাহহাম আদবীর[৬৭] বা বনি যোহরা[৬৮] বনি মানজুমের[৬৯] কোন এক লোকের সাথে তাঁর দেখা হলো। সেই লোক তার রুক্ষ চেহারা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, ওমর, কোথায় যাচ্ছ? তিনি বললেন, মোহাম্মদকে হত্যা করতে যাচ্ছি। সেই লোক বললেন, মোহাম্মদকে হত্যা করে বনু হাশেম এবং বনু যোহরার হাত থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে? তিনি বললেন, মনে হয় তুমিও পূর্ব পুরুষদের ধর্ম ছেড়ে বেদ্বীন হয়ে পড়েছো? সেই লোক বললেন, ওমর একটা বিস্ময়কর কথা শোনাচ্ছি। তোমার বোন এবং ভগ্নিপতিও তোমাদের দ্বীন ছেড়ে বেদ্বীন হয়ে গেছে। একথা শুনে হযরত ওমর ক্রোধে দিশেহারা হয়ে সোজা ভগ্নিপতির বাড়ী অভিমুখে রওয়ানা হলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন, তারা হযরত

---

৬৫. হযরত ওমর সম্পর্কে এ পর্যালোচনামূলক মন্তব্য করেছেন ইমাম গাযযালী। ফেকহুছ সীরাত, পৃ. ৯২-৯৩ দেখুঃ
৬৬. তারীখে ওমর ইবনে খাত্তাব, ইবনে জওযি, পৃ. ৬, সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খসন্ড, পৃ. ৩২৬-৩৪৮
৬৭. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ, ৩৪৪
৬৮. তারীখে ওমর ইবনে খাত্তাব, আল জওযি, পৃ ১৭
৬৯. মুখতাছারুছ সীরাত, পৃ. ১০২

খাব্‌বাব ইবনে আরতের কাছে সূরা ত্বা-হা লেখা একটা সহীফা পাঠ করছেন। কোরআন শিক্ষা দেয়ার জন্যে হযরত খাব্বাব (রা.) সে বাড়ীতে যেতেন। হযরত ওমরের পায়ের আওয়ায শুনে সব্বাই নীরব হয়ে গেলেন। হযরত ওমরের বোন সূরা লেখা পাতাটি লুকিয়ে ফেললেন। কিন্তু ঘরের বাইরে থেকেই হযরত ওমর খাব্বাব (রা.)-এর কোরআন তেলাওয়াতের আওয়ায শুনেছিলেন। তিনি তাই জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের আওয়ায শুনছিলাম? তারা বললেন, কই কিছু নাতো! আমরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিলাম। হযরত ওমর বললেন, সম্ভবত তোমরা উভয়ে বেদ্বীন হয়ে গেছ। তার ভগ্নিপতি বললেন, আচ্ছা ওমর 'সত্য' যদি তোমাদের দ্বীন ছাড়া অন্য কোন ধর্মে থাকে তখন কি হবে? হযরত ওমর (রা.) একথা শোনা মাত্র ভগ্নিপতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাকে মারাত্মকভাবে প্রহার করলেন। তাঁর বোন ছুটে গিয়ে স্বামীকে ভাইয়ের হাত থেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করলেন, এক সময় তাকে সরিয়ে দিলেন। হঠাৎ হযরত ওমর (রা.) তার বোনকে এতো জোরে চড় দিলেন যে, তার চেহারা রক্তাক্ত হয়ে গেলো। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে যে, তার মাথায় আঘাত লেগেছিলো। তার বোন ক্রুদ্ধভাবে বললেন, ওমর, যদি তোমাদের ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মে সত্য থাকে, তখন কি হবে? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রসূল। এ কথা শুনে হযরত ওমর (রা.) হতাশ হয়ে পড়লেন, বোনের চেহারায় রক্ত দেখে তার লজ্জাও হলো। তিনি বললেন, আচ্ছা, তোমরা যা পাঠ করছিলে, আমাকেও একটু পড়তে দাওতো। তার বোন বললেন, তুমি নাপাক। এই কেতাব শুধু পাক পবিত্র লোকই স্পর্শ করতে পারে। যাও গোসল করে এসো। হযরত ওমর গিয়ে গোসল করে এলেন। এরপর কেতাবের সেই অংশবিশেষ হাতে নিয়ে বসলেন এবং পড়লেন, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। এরপর বললেন, এতো দেখি বড়ো পবিত্র নাম!

হযরত খাব্বাব (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর মুখে একথা শুনে ভেতর থেকে বাইরে এলেন এবং বললেন, ওমর, খুশী হও, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে যে দোয়া করেছিলেন, আমার মনে হয় এটা তারই ফল। এ সময়ে রসূল (রা.) সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী এক ঘরে অবস্থান করছিলেন।

একথা শুনে হযরত ওমর (রা.) তলোয়ার হাতে সেই ঘরের সামনে এসে দরোজায় করাঘাত করলেন। একজন সাহাবী দরজায় উঁকি দিয়ে দেখলেন যে, তলোয়ার হাতে হযরত ওমর। আশে-পাশেই সবাই একত্রিত হলেন। হযরত হামযা (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন কি ব্যাপার? তাঁকে বলা হলো যে, ওমর এসেছেন। তিনি বললেন, ওমর এসেছে? দরজা খুলে দাও। যদি ভালোর জন্যে এসে থাকে, তবে ভালোই পাবে। আর যদি খারাপ উদ্দেশ্যে এসে থাকে, তবে তার তলোয়ার দিয়েই আমরা তাকে শেষ করে দেবো। এদিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভেতরে ছিলেন, তাঁর ওপর ওহী নাযিল হচ্ছিলো। ওহী নাযিল হওয়ার পর তিনি এদিকের কামরায় হযরত ওমরের কাছে এলেন এবং তাঁর পরিধানের পোশাক এবং তলোয়ারের একাংশ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, ওমর, তুমি কি ততোক্ষণ পর্যন্ত বিরত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তোমার ওপরও ওলীদ ইবনে মুগিরার মতো অবমাননাকর শাস্তি নাযিল না করবেন? হে আল্লাহ, ওমর ইবনে খাত্তাবের দ্বারা দ্বীনের শক্তি ও সম্মান দান করো। একথা বলার সাথে সাথে হযরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করে নিলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই এবং আপনি আল্লাহর রসূল। একথা শুনে ঘরের ভেতর যারা ছিলেন তারা এতো জোরে আল্লাহু

আকবার ধ্বনি দিলেন যে, কাবাঘরের মধ্যে যারা ছিলেন, তারাও সেই আওয়ায শুনতে পেলেন।[৭০] আরবে কেউ তাঁর মোকাবেলা করার সাহস পেতো না। এ কারণে তাঁর ইসলাম গ্রহণের সংবাদে পৌত্তলিকদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেলো। তারা মারাত্মক সঙ্কট এবং অবমাননার সম্মুখীন হলো। অন্য দিকে তাঁর ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানদের গৌরব, শক্তি, মর্যাদা, সাফল্য ও আনন্দ বেড়ে গেলো। ইবনে ইসহাক তাঁর সনদে হযরত ওমর (রা.)-এর বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, আমি যখন মুসলমান হলাম, তখন ভাবলাম, মক্কায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবচেয়ে বড় শত্রু কে? এরপর মনে মনে বললাম, সে হচ্ছে আবু জেহেল। এরপর আমি আবু জেহেলের বাড়ী গেলাম। ঘরের দরজায় করাঘাত করলে আবু জেহেল বেরিয়ে এলো। সে আমাকে দেখে বললো, স্বাগতম সুস্বাগতম। কি কাজে এসেছ ওমর? আমি বললাম, তোমাকে একথা জানাতে এসেছি যে, আমি আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূল মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তিনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন, তার ওপরও বিশ্বাস পোষণ করেছি এবং সত্য বলে স্বীকার করছি। একথা শুনে আবু জেহেল দরোজা বন্ধ করে দিতে দিতে বললো, আল্লাহ তোমার মন্দ করুন এবং তুমি যা কিছু নিয়ে এসেছ, তারও মন্দ করুন।[৭১]

ইমাম ইবনে জওযি হযরত ওমর ফারুক (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, কেউ যখন ইসলাম গ্রহণ করতো। তখন কোরায়শ কাফেররা তাদের পেছনে লেগে যেতো। তাকে নির্মমভাবে প্রহার করতো। প্রহৃত ব্যক্তিও প্রহার করতেন। আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর আমার মামা আদী ইবনে হাশেমের কাছে গিয়ে তাকে জানালাম। তিনি কোন কথা না বলে ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলেন। এরপর কোরায়শের একজন বিশিষ্ট লোকের কাছে গেলেন। সম্ভবত আবু জেহেলের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। আমার মামা আদী কোরায়শের সেই লোককে খবর দেয়ার পর সেও ঘরের ভেতর ঢুকে গেলো।[৭২]

ইবনে হিশাম এবং ইবনে জওযি বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণের পর জামিল ইবনে মোয়াম্মার মাহমির কাছে গেলেন। কোন কথা প্রচারের ক্ষেত্রে কোরায়শদের মধ্যে এ লোক ছিলো বিখ্যাত। হযরত ওমর (রা.) তাকে জানালেন যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। একথা শোনার সাথে সাথে সে উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠলো যে, খাত্তাবের পুত্র বেদ্বীন হয়ে গেছে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তুমি মিথ্যা বলছো, আমি মুসলমান হয়েছি। মোটকথা, লোকেরা হযরত ওমরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাকে প্রহার করতে লাগলো। হযরত ওমর প্রহৃত হচ্ছিলেন আবার নিজেও প্রহার করছিলেন। এক সময় সূর্য মাথার ওপর এলো। ক্লান্ত হয়ে তিনি বসে পড়লেন। এরপর বললেন, যা খুশি করো। আল্লাহর কসম, যদি আমরা সংখ্যায় তিনশজনও হতাম, তাহলে মক্কায় হয় তোমরা থাকতে অথবা আমরা থাকতাম।[৭৩]

পৌত্তলিকরা এরপর হযরত ওমর (রা.)-কে প্রাণে মেরে ফেলার জন্যে তাঁর বাড়ীতে চড়াও হলো। সহীহ বোখারীতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রা.) ভীত বিহ্বল হয়ে ঘরের ভেতর ছিলেন। এমন সময় আবু আমর আস ইবনে ওয়ায়েল ছাহমি এলেন। তিনি কারুকাজ করা

---

৭০. তারীখে ওমর ইবনে খাত্তাব, পৃ.৭, ১০, ১১, সীরাতে ইবনে হিশাম, ১মখন্ড, পৃ, ৩৪৩, ৩৪৪

৭১. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ২৪৯-২৫০

৭২. তারীখে ওমর ইবনে খাত্তাব, পৃ. ৮

৭৩. ঐ, পৃ. ৮ ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯

ইয়েমেনি চাদর এবং রেশমী পোশাক পরিহিত ছিলেন। তিনি ছিলেন ছাহাম গোত্রের অধিবাসী। সেইকালে তিনি ছিলেন আমাদের মিত্র গোত্রের লোক। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার, এতো হল্লা কিসের? হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি মুসলমান হয়েছি। একারণে ওরা আমাকে মেরে ফেলতে চায়। আস বললেন, এটা সম্ভব নয়। আস-এর একথা শুনে আমি স্বস্তিবোধ করলাম। বহু লোক সে সময় আমার বাড়ীর আশে-পাশে ভিড় করে আছে। আস ভিড় ঠেলে এগিয়ে গিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা সবাই কোথায় চলেছ? সবাই বললো, ওমর বেদ্বীন হয়ে গেছে, তার কাছে যাচ্ছি। আস বললেন, সেদিকে যাওয়ার কোন পথ নেই। একথা শুনে সবাই ফিরে চলে গেলো।[৭৪] ইবনে ইসহাকের একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, তারা এমনভাবে সমবেত হয়েছিলো, মনে হচ্ছিলো যেন, তারা একই পোশাকের মধ্যে সবাই প্রবেশ করেছে।[৭৫]

হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের পর পৌত্তলিকদের অবস্থা ছিলো এরূপ, যা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলমানদের অবস্থার ধারণা এ ঘটনা থেকেই অনুমান করা যায়। মোজাহেদ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আমি ওমর ইবনে খাত্তাবকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, কি কারণে আপনার উপাধি ফারুক হয়েছে? তিনি বললেন, আমার ইসলাম গ্রহণের তিন দিন আগে হযরত হামযা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর হযরত ওমর হযরত হামযার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেন, এরপর আমি ইসলাম গ্রহণ করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, হে আল্লাহর রসূল, মরে যাই বা বেঁচে থাকি, আমরা কি হক-এর ওপর বিদ্যমান নেই? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কেন নয়? সেই সত্বার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তোমরা বেঁচে থাকো বা মরে যাও, নিশ্চয়ই তোমরা হক-এর ওপর রয়েছো। হযরত ওমর (রা.) বলেন, এরপর আমি বললাম, তাহলে আমরা কেন পালিয়ে বেড়াবো? সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, নিশ্চয়ই আমরা বাইরে বের হবো। এরপর আমরা দুই কাতারে বিভক্ত হয়ে মিছিল করে আল্লাহর রসূলকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে বের হলাম। এক কাতারে ছিলেন হযরত হামযা, অন্য কাতারে আমি। আমাদের চলার পথে যাঁতার পেষা আটার মতো ধূলো উড়ছিলো। আমরা মসজিদে হারামে প্রবেশ করলাম। হযরত ওমর (রা.) বলেন, কোরায়শরা আমাদের দেখে মনে এতোবড় কষ্ট পেলো, যা ইতিপূর্বে পায়নি। সেই দিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে 'ফারুক' উপাধি দিলেন।[৭৬]

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, এর আগে আমরা কাবাঘরের কাছে নামায আদায়ে সক্ষম ছিলাম না।[৭৭]

হযরত যোহায়ের ইবনে সেনান রুমী (রা.) বলেন, হযরত ওমর ফারুক (রা.) মুসলমান হওয়ার পর ইসলাম পর্দার বাইরে এলো এবং ইসলামের দাওয়াত প্রকাশ্যে দেয়া শুরু হলো। আমরা কাবাঘরের সামনে গোল হয়ে বসতে লাগলাম এবং কাবাঘর তওয়াফ করতে লাগলাম।

---

৭৪. সহীহ বোখারী, ওমর ইবনে খাত্তাব অধ্যায়, ১ম খন্ড, পৃ.৫৪৫

৭৫. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৪৯

৭৬. তারীখে ওমর ইবনুল খাত্তাব, ইবনে জওযি, পৃ. ৬, ৭

৭৭. মুখতাছারুছ সিরাত, শেখ আবদুল্লাহ, পৃ. ১০৩

যারা আমাদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছিলো, তাদের ওপর প্রতিশোধ নিলাম এবং অত্যাচারের জবাব দিলাম।[৭৮]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, হযরত ওমরের ইসলাম গ্রহণের পর থেকে পরবর্তীকালে আমরা শক্তিশালী এবং সম্মানিত ছিলাম।[৭৯]

হযরত হামযা ইবনে আবদুল মোত্তালেব এবং হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানদের ওপর পাইকারি নির্যাতন কমে গেলো, বুদ্ধি-বিবেচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যে পৌত্তলিকরা উদ্যোগী হলো। তারা চিন্তা করলো যে, ইসলামের দাওয়াত দেয়ার মাধ্যমে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা পেতে চান, সেই প্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তা পূরণের মাধ্যমে তাঁকে হয়তো তাঁর কাজ থেকে বিরত রাখা যাবে। কিন্তু তারা জানতো না রসূলে খোদার দ্বীনের দাওয়াতের মোকাবেলায় সমগ্র বিশ্বজগতও সম্পূর্ণ মূল্যহীন। কাজেই, তাদের চেষ্টায় তারা স্বাভাবিকভাবেই ব্যর্থ হলো।

ইবনে ইসহাক ইয়াজিদ ইবনে যিয়াদের মাধ্যমে মোহাম্মদ ইবনে ক'াব কারাযির এই বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, আমাকে জানানো হয়েছে, কওমের নেতা ওতবা ইবনে রবিয়া স্বজাতীয়দের সামনে একদিন নতুন একটা প্রস্তাব দিল। সে সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে হারামের এক জায়গায় একাকী ছিলেন। ওতবা বললো, মোহাম্মদের সাথে আলোচনা করে এর ব্যবস্থা নাও। তার সামনে কয়েকটা প্রস্তাব পেশ করো, হয়তো তিনি কোন একটা প্রস্তাব মেনে নেবেন। তিনি যে দাবী করবেন, সেই দাবী আমরা পূরণ করবো। হামযা (রা.)-এর ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি দেখে তারা নিজেদের মধ্যে এ পরামর্শ করলো।

কোরায়শরা বললো, আবুল ওলীদ তুমি যাও, তুমি গিয়ে তাঁর সাথে কথা বলো। এরপর ওতবা উঠে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বসলো। ওতবা বললো, ভাতিজা, আমাদের কওমের মধ্যে তোমার যে মর্যাদা রয়েছে, সে কথা সবাই জানে। তুমি উচ্চ বংশের মানুষ। তুমি এমন একটা বিষয় প্রচার করছো যার কারণে কওমের মধ্যে বিভেদ, বিশৃঙ্খলা ও অনৈক্য দেখা দিয়েছে। তুমি কওমের নেতৃস্থানীয় লোকদের বুদ্ধিমত্তাকে নির্বুদ্ধিতা বলে অভিহিত করছো। তাদের উপাস্যকে নানাভাবে সমালোচনা করছো, তাদের ধর্ম বিশ্বাসকে বাতিল করে দিচ্ছো, তাদের পূর্ব-পুরুষদের কাফের বলে অভিহিত করছো। আমার কথা শোনো, আমি তোমাকে কয়েকটি প্রস্তাব দিচ্ছি তুমি এসব প্রস্তাব সম্পর্কে চিন্তা করো। হয়তো যে কোন একটা প্রস্তাব তোমার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বলো আবুল ওলীদ, আমি শুনবো।

ওতবা ওরফে ওলীদ বললো, ভাতিজা, তুমি যা প্রচার করছো, যদি এর বিনিময়ে ধন-সম্পদ চাও তবে আমরা তোমাকে এতো এতো ধন-সম্পদ দেবো যে, তুমি হবে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। যদি তুমি মর্যাদা চাও, তাও বলো, আমরা তোমাকে আমাদের নেতা হিসাবে বরণ করে নেবো। তোমাকে ছাড়া কোন ফয়সালা করা হবে না। যদি তুমি বাদশাহ হতে চাও তাও বলো, আমরা তোমাকে বাদশাহ হিসাবে মেনে নেবো। যদি তোমার কাছে আসা জিনিস জ্বীন ভূত হয়ে থাকে, তাও বলো, তুমি দেখো, অথচ তাড়াতে পারছো না, আমরা চিকিৎসার ব্যবস্থা

---

৭৮. তারীখে ওমর ইবনুল খাত্তাব, ইবনে জওযি পৃ. ১৩

৭৯. সহীহ বোখারী, বাবে ইসলাম ওমর ইবনে খাত্তাব, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৪৫

করবো। যতো টাকা লাগে লাগুক, আমরা তোমার চিকিৎসা করাবো। কখনো কখনো এমন হয় যে, জ্বিন ভূতেরা মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে রাখে, সে অবস্থায় মানুষের চিকিৎসার প্রয়োজন দেখা দেয়।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওতবার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনার পর বললেন, আবুল ওলীদ, তোমার কথা কি শেষ হয়েছে? আমার কথা শোনো। এরপর রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা হা-মীম সাজদার প্রথম থেকে তেলাওয়াত শুরু করলেন। 'পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। হা-মীম। এই কেতাব দয়াময় পরম দয়ালুর কাছ থেকে অবতীর্ণ। এটি এক কেতাব, বিশদভাবে বিবৃত হয়েছে এর আয়াতসমূহ আরবী ভাষায় কোরআনরূপে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে। সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে। কিন্তু ওদের অধিকাংশই বিমুখ হয়েছে। কাজেই ওরা শুনবে না। ওরা বলে তুমি যার প্রতি আমাদের আহ্বান করছো। সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ আচ্ছাদিত, কানে আছে বধিরতা এবং তোমার ও আমাদের মধ্যে কাজ করে অন্তরাল। সুতরাং তুমি তোমার কাজ করো এবং আমরা আমাদের কাজ করি।'

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেলাওয়াত করে যাচ্ছিলেন আর ওতবা দু'হাত পেছনের দিকে মাটিতে রেখে আরাম করে বসে শুনছিলো। সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করার পর রসূল উঠে সেজদা করলেন। এরপর বললেন, আবুল ওলীদ, তুমি কিছু শুনতে চেয়েছিলে, আমি শুনিয়েছি, এবার তুমি জানো, আর তোমার কাজ জানে।

ওতবা উঠলো এবং নিজের সঙ্গীদের কাছে গেলো। তাকে দেখে তার সঙ্গীরা বলাবলি করতে লাগলো যে, খোদার কসম, আবুল ওলীদ যে চেহারা নিয়ে গিয়েছিলো, সে চেহারা নিয়ে কিন্তু ফিরে আসছে না। ওতবা বসার পর সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করলো যে, কি খবর নিয়ে এসেছো? সে বললো, খবর হচ্ছে, আমি এমন কালাম শুনেছি যা অতীতে কোনদিনই শুনিনি। খোদার কসম সেটা কবিতাও নয়, যাদুমন্ত্রও নয়। তোমরা আমার কথা শোনো। ওকে তার অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও। যে কালাম আমি শুনেছি, ভবিষ্যতে এর মাধ্যমে বড় ধরনের কোন ঘটনা ঘটবে। এরপর যদি ওকে আরবের লোকেরা মেরে ফেলে, তবে তোমাদের কাজ অন্য কেউ করবে। যদি তিনি আরবের ওপর জয়লাভ করেন, তবে তার সম্মান হবে তোমাদের সম্মান, তাঁর বাদশাহী হবে তোমাদের বাদশাহী। তাঁর অস্তিত্ব তোমাদের জন্যে সৌভাগ্যের কারণ হবে।

কোরায়শরা বললো, আবুল ওলীদ সে কালামের যাদু তোমাকেও প্রভাবিত করেছে। ওতবা বললো, তার ব্যাপারে আমি যা বুঝেছি, বলেছি। এখন তোমরা যা ভালো মনে করো, তা করো।[৮০]

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন যে, তবুও যদি ওরা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে বল, আমি তো তোমাদেরকে সতর্ক করছি এক ধ্বংসকর শাস্তির, যা আদ ও সামুদের শাস্তির অনুরূপ। এই আয়াত তেলাওয়াতের সাথে সাথে ওতবা উঠে দাঁড়ালো এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখে হাত চাপা দিয়ে বললো, আমি আপনাকে আল্লাহ এবং নিকট আত্মীয়ের দোহাই দিয়ে বলছি

৮০. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ২৯৩-২৯৪

যে, আপনি এরূপ করবেন না। ওতবা আশঙ্কা করছিলো যে, ও রকম শাস্তি তার ওপর এসে না পড়ে। এরপর সে উঠে তার সঙ্গীদের কাছে গিয়ে উল্লিখিত কথা বললো।[৮১]

বনু হাশেম ও বনু মোত্তালেবদের সাথে আবু তালেবের বৈঠক

ইতিমধ্যে পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। আবু তালেব তখনও ছিলেন শঙ্কিত। পৌত্তলিকদের পক্ষ থেকে তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের ব্যাপারে আশঙ্কা বোধ করছিলেন। তিনি এযাবত সংঘটিত ঘটনাবলী পর্যালোচনা করছিলেন। পৌত্তলিকরা তাঁকে মোকাবেলার হুমকি দিয়েছিলো। আম্মারা ইবনে ওলীদের বিনিময়ে তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিয়ে গিয়ে হত্যা করার প্রস্তাব করেছিলো। আবু জেহেল একটা ভারি পাথর দিয়ে তাঁর ভাতিজার মস্তক চূর্ণ করার চেষ্টা করেছিলো। ওকবা ইবনে আবু মুঈত গলার চাদর পেঁচিয়ে তাঁর ভাতিজাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করতে চেয়েছিলো। খাত্তাবের পুত্র খোলা তলোয়ার হাতে তাঁকে হত্যা করতে বেরিয়েছিলো। পর্যায়ক্রমে ঘটে যাওয়া এসব ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করে আবু তালেব এমন গুরুতর বিপদের আশঙ্কা করলেন যে, তাঁর বুক কেঁপে উঠলো।

তিনি ভালোভাবে বুঝতে পারলেন যে, পৌত্তলিকরা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এমতাবস্থায় কোন কাফের যদি তাঁর ভাতিজার ওপর হঠাৎ করে হামলা চালায় তাহলে বিচ্ছিন্নভাবে হযরত হামযা বা হযরত ওমর বা অন্য কেউ কি করে তাঁকে রক্ষা করবে?

আবু তালেবের এ আশঙ্কা অমূলক ছিলো না। কেননা পৌত্তলিকরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করতে সঙ্কল্পবদ্ধ ছিলো। তাদের এ সঙ্কল্পের প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'ওরা কি কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে? আমিই তো সিদ্ধান্তকারী।' (৭৯, ৪৩)

প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের পরিস্থিতিতে আবু তালেবের কি করা উচিত? তিনি যখন দেখলেন যে, পৌত্তলিকরা চারিদিক থেকে তার ভাতিজাকে নাজেহাল করতে উঠে লেগেছে তখন তিনি তাঁর পিতামহের দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হাশেম এবং মোত্তালেবের বংশধরদের একত্রিত করলেন। তিনি সেই সমাবেশে তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে রক্ষার ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্যে সকলের প্রতি আহ্বান জানালেন। তিনি আবেগজড়িত কণ্ঠে বললেন, যে দায়িত্ব এতোদিন আমি একা পালন করেছি, এবার এসো, আমরা সবাই মিলে সে দায়িত্ব পালন করি। আবু তালেবের এ আহ্বানে তাঁর দুই পূর্ব পুরুষের বংশধররা সাড়া দিলেন। আবু তালেবের ভাই আবু লাহাব শুধু ভিন্নমত পোষণ করলো। সে অস্বীকৃতি জানিয়ে পৌত্তলিকদের সাথে গিয়ে মিলিত হলো।[৮২]

সর্বাত্মক বয়কট

চার সপ্তাহ বা তার চেয়ে কম সময়ের ভেতর পৌত্তলিকরা চারটি বড় ধরনের ধাক্কা খেলো। হযরত হামযা এবং হযরত ওমর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। সর্বোপরি বনু হাশেম এবং বনু মোত্তালেব একত্রিত হয়ে আল্লাহর রসূলকে রক্ষার ব্যাপারে একমত হলো। পৌত্তলিকরা এতে অস্থির হয়ে উঠলো। অস্থির হবে না কেন, কারণ তারা বুঝতে পেরেছিলো যে, এখন যদি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে তাঁকে

---

৮১. তাফসীরে ইবনে কাসির, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ, ১৫-, ১৬০, ১৬১

৮২. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ২৬৯, মুখতাছারুছ সীরাত, শেখ আবদুল্লাহ, পৃ. ১০৬

রক্ষা করতে যে রক্তপাত হবে, এতে মক্কার প্রান্তর লাল হয়ে যাবে। তাদের নিজেদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ারও সম্ভাবনা ছিলো। এ কারণে আল্লাহর রসূলকে হত্যা করার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে পৌত্তলিকরা অত্যাচার নির্যাতনের একটি নতুন পথ আবিষ্কার করলো। এটি ছিলো ইতিপূর্বে গৃহীত সব পদক্ষেপের চেয়ে আরো বেশী মারাত্মক।

ইবনে কাইয়েম লিখেছেন যে, বলা হয়ে থাকে, এই দলিল মনসুর ইবনে একরামা ইবনে আমের ইবনে হাশেম লিখেছিলো। কারো কারো মতে নযর ইবনে হারেস লিখেছিলো। কিন্তু সঠিক কথা হচ্ছে, এই দলিল বোগাইজ ইবনে আমের ইবনে হাশেম লিখেছিলো। এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্যে বদদোয়া করায় তার হাত অবশ হয়ে গিয়েছিলো।[১]

লেখার পর দলিল কাবাঘরে টাঙিয়ে দেয়া হলো। তাতে আবু লাহাব ব্যতীত বনু হাশেম এবং বনু মোত্তালেবের মুসলিম অমুসলিম, নারী-পুরুষ শিশু সবাই শা'বে আবু তালেব নামক স্থানে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লেন। এটা ছিলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবী হিসাবে আবির্ভাবের সপ্তম বছরের ঘটনা।

শা'বে আবু তালেবে তিন বছর

এ বয়কটে পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে উঠলো। খাদ্যসামগ্রীর সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলো। যা-ও বা মক্কায় আসতো পৌত্তলিকরা তাড়াতাড়ি সেগুলো কিনে নিতো। ফলে অবরুদ্ধ মুসলিম অমুসলিম কারো কাছে কোন কিছু স্বাভাবিক উপায়ে পৌঁছুতো না। তারা গাছের পাতা এবং চামড়া খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। ক্ষুধার কষ্ট এতো মারাত্মক ছিলো যে, ক্ষুধার্ত নারী ও শিশুর কাতর কান্না শাবে আবু তালেব বা আবু তালেব ঘাঁটির বাইরে থেকে শোনা যেতো। তাদের কাছে কোন খাদ্যসামগ্রী পৌঁছার সম্ভাবনা ছিলো ক্ষীণ। যা কিছু পৌঁছুতো সেসব গোপনীয়ভাবেই পৌঁছাতো। নিষিদ্ধ মাসসমূহ ছাড়া প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার জন্যে তারা ঘাঁটির বাইরে বেরও হতেন না। বাইরে থেকে মক্কায় আসা জিনিস কেনার চেষ্টা করেও অনেক সময় তারা সক্ষম হতেন না। কারণ পৌত্তলিকরা সেসব জিনিসের দাম কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিতো।

হাকিম ইবনে হাজাম ছিলেন হযরত খাদিজা (রা.)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। মাঝে মাঝে তিনি ফুফুর জন্যে গম পাঠাতেন। একবার গম পাঠানোর উদ্যোগ নিতেই আবু জেহেল বাধা দিলো। কিন্তু আবুল বাখতারি হাকিম ইবনে হাজামের পক্ষাবলম্বন করে গম পাঠানোর ব্যবস্থা করে দিলেন।

এদিকে আবু তালেব সব সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে চিন্তায় ছিলেন। রাতে সবাই শুয়ে পড়ার পর তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলতেন, যাও, তুমি এবার তোমার বিছানায় শুয়ে পড়ো। তিনি একথা এ জন্যেই বলতেন যাতে, কোন গোপন আততায়ী থাকলে বুঝতে পারে যে, তিনি কোথায় শয়ন করছেন। এরপর সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আবু তালেব তাঁর প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রের শোয়ার স্থান বদলে দিতেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের বিছানায় নিজের পুত্র ভাই বা অন্য কাউকে শয়ন করাতেন। রাত্রিকালে প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র আল্লাহর রসূল মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটাতেন।

এ ধরনের কঠিন অবরোধ সত্তেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অন্যান্য মুসলমান হজ্জের সময় বাইরে বের হতেন এবং হজ্জের উদ্দেশ্যে আসা লোকদের কাছে ইসলামের

---

১. যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ৪৬

দাওয়াত দিতেন। এ সময় আবু লাহাব রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানদের সাথে যেরূপ আচরণ করতো, ইতিপূর্বে তা উল্লেখ করা হয়েছে।[২]

দলিল ছিন্ন করার ঘটনা

এ অবস্থায় পুরো তিন বছর কেটে যায়। এরপর নবুয়তের দশম বর্ষে মহররম মাসে দলিল ছিন্ন হওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে অত্যাচার নির্যাতনের অবসান ঘটে। কোরায়শদের মধ্যেকার কিছু লোক এ ব্যবস্থার বিরোধী থাকায় তারা অবরোধ বাতিল করারও উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

এই অমানবিক অবরোধ সম্পর্কিত প্রণীত দলিল বিনষ্ট করার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন বনু আমের ইবনে লুয়াই গোত্রের হেশাম ইবনে আমের নামক এক ব্যক্তি। হেশাম রাত্রিকালে চুপিসারে খাদ্য দ্রব্য পাঠিয়ে আবু তালেব ঘাঁটির অসহায় লোকদের সাহায্য করতেন। প্রথমে হেশাম যুহাইর ইবনে আবু উমাইয়া মাখযুমির কাছে যান। যুহাইয়ের মা আতেকা ছিলেন আবদুল মোত্তালেবের কন্যা। অর্থাৎ আবু তালেবের বোন। হেশাম তাকে বললেন, যুহাইর তুমি কি চাও যে, তোমরা মজা করে পানাহার করবে অথচ তোমার মামা এবং অন্যরা ধুঁকে ধুঁকে মারা যাবে? তারা কি অবস্থায় রয়েছে, সেটা কি তুমি জানো না? যুহাইর বললেন, আফসোস, আমি একা কি করতে পারি? যদি আমার সাথে আরো কেউ এগিয়ে আসে তবে আমি সে দলিল বিনষ্ট করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারি। হেশাম বললেন, অন্য একজন রয়েছেন। যুহাইর জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কে? হেশাম বললেন, আমি। যুহাইর বললেন, আচ্ছা তবে তৃতীয় কাউকে খুঁজে বের করো। একথা শোনার পর হেশাম মোত্য়াম ইবনে আদীর কাছে গেলেন এবং বনু হাশেম এবং বনু মোত্তালেবের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে তার সাহায্য চাইলেন। ওরা যে তার নিকটাত্মীয় সেকথাও বললেন। মোত্য়াম বললেন, আমি একা কি করতে পারি? হেশাম বললেন, আরো একজন আছেন। মোত্আম জিজ্ঞাসা করলেন তিনি কে? হেশাম বললেন, আমি। মোত্য়াম বললেন, আচ্ছা, তৃতীয় একজন লোক খুঁজে নাও। হেশাম বললেল, সেটাও করেছি। মোত্য়াম বললেন, তিনি কে? হেশাম বললেন, তিনি হচ্ছেন যুহাইর ইবনে উমাইয়া। মোত্য়াম বললেন আচ্ছা চতুর্থ একজন তালাশ করো। এরপর হেশাম আবুল বাখতারির কাছে গেলেন এবং তার সাথেও মোত্য়ামের কাছে যে ভাবে বলেছেন, সেভাবে কথা বললেন। আবুল বাখতারি জানতে চাইলেন, এ ব্যাপারে সমর্থক কেউ আছে কিনা। হেশাম বললেন, হাঁ আছে। এরপর তিনি যুহাইর ইবনে আবু উমাইয়া মোত্য়াম ইবনে আ'দী এবং নিজের কথা জানালেন। আবুল বাখতারি বললেন, আচ্ছা তবে বিশ্বস্ত একজন লোক খোঁজ করো। এরপর হেশাম জামআ ইবনে আছোয়াদ ইবনে মোত্তালেব ইবনে আছাদের কাছে গেলেন। তার সাথেও বনু হাশেম এবং বনু মোত্তালেবের দুরবস্থার বিষয়ে আলোচনা করে সাহায্য চাইলেন। তিনি জানতে চাইলেন অন্য কেউ সহায়তাকারী আছে কিনা। হেশাম বললেন, হাঁ, আছে। এরপর সকলের নাম জানালেন। পরে উল্লিখিত সবাই হাজুন নামক জায়গায় একত্রিত হয়ে দলিল বিনষ্ট করার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন। যুহাইর বললেন, প্রথমে আমি কথা তুলবো।

সকাল বেলা নিয়মানুযায়ী সবাই মজলিসে একত্রিত হলো। যুহাইর দামী পোশাক পরিধান করে সেজে গুজে উপস্থিত হলো। প্রথমে কাবাঘর সাতবার তওয়াফ করে সবাইকে সম্বোধন করে

২. আবু তালেবের মৃত্যু হয়েছিল দলিল ছিন্ন করার ঘটনার ছয়মাস পরে। সঠিক তথ্য হচ্ছে যে, তাঁর মৃত্যু রজব মাসে হয়েছিল। যারা বলে যে, তার মৃত্যু রমযান মাসে হয়েছিল, তারা এও বলে যে, তার মৃত্যু দলিল ছিন্ন করার ঘটনার আটমাস কয়েকদিন পরে হয়েছিল। উভয় অবস্থায় এটা প্রমাণিত হয় যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছিল মহররম মাসে।

বললো, মক্কাবাসীরা শোনো, আমরা পানাহার করবো, পোশাক পরিধান করবো, আর বনু হাশেম ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের কাছে কিছু বিক্রি করা হচ্ছে না, তাদের কাছ থেকে কেনাও হচ্ছে না। খোদার কসম, এ ধরনের অমানবিক দলিল বিদ্যমান থাকা অবস্থায় আমি নীরব হয়ে থাকতে পারি না। আমি চাই এ দলিল বিনষ্ট করে ফেলা হোক।

আবু জেহেল এ কথা শুনে বললো, তুমি ভুল বলছো। খোদার কসম, এ দলিল ছিন্ন করা যাবে না।

জাময়া ইবনে আসোয়াদ বললেন, খোদার কসম, তুমি ভুল বলছো। এ দলিল যখন লেখা হয়েছিলো, তখনো আমি রাযি ছিলাম না। আমি এটা মানতে প্রস্তুত নাই। এরপর মোত্‌য়াম ইবনে আদী বললেন, তোমরা দু'জনে ঠিকই বলছো। আমরা এ দলিলে যা কিছু লেখা রয়েছে, তা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

হেশাম ইবনে আমরও এ ধরনের কথা বললেন।

এ অবস্থা দেখে আবু জেহেল বললো, হুঁহ বুঝেছি, রাত্রিকালেই এ ধরনের ঐকমত্য হয়েছে। এ পরামর্শ এখানে নয়, বরং অন্য কোথাও করা হয়েছে।

সে সময় আবু তালেবও অদূরে উপস্থিত ছিলেন। রসূলুল্লাহ্ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, দলিল বিনষ্ট করতে আল্লাহ তায়ালা এক রকম পোকা পাঠিয়েছেন। তারা যুলুম অত্যাচারের বিবরণসমূহ কেটে ছারখার করে ফেলেছে, শুধু যেখানে যেখানে আল্লাহর নাম রয়েছে, সেসব অবশিষ্ট রয়েছে।

আবু তালেব কোরায়শদের বললেন, আমার ভাতিজা আমাকে আপনাদের কাছে এ কথা বলতে পাঠিয়েছেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে জানিয়েছেন যে, আপনাদের অংগীকার পত্রটি আল্লাহ তায়ালা এক রকম পোকা পাঠিয়ে নষ্ট করে দিয়েছেন। শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার নামটুকু সেখানে অবশিষ্ট আছে। এ কথা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হলে আমি তার ও আপনাদের মাঝ থেকে সরে দাঁড়াব এবং আপনারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারবেন। আর, সত্য বলে প্রমাণিত হয় তাহলে বয়কটের মাধ্যমে আমাদের প্রতি যে অন্যায় আচরণ করছেন, তা থেকে বিরত থাকবেন। এতে কোরায়শরা সম্মত হলো।

এ নিয়ে আবু জেহেল ও অন্যান্যদের মধ্যে তর্ক-বির্তক শেষ হলে মুতয়া'ম বিন আদী অংগীকারপত্র ছিঁড়তে গিয়ে দেখলেন যে, আল্লাহর নাম লেখা অংশ বাদে বাকি অংশ সত্যি সত্যি পোকা খেয়ে ফেলেছে। পরে অংগীকারপত্র ছিঁড়ে ফেলা হলে বয়কটের অবসান হলো এবং রসূলুল্লাহ (সঃ) ও অন্য সকলে শাবে আবু তালিব থেকে বেরিয়ে এলেন। কাফেররা এ বিস্ময়কর নিদর্শনে আশ্চর্য হলো, কিন্তু তাদের মনোভাবের কোন পরিবর্তন হলো না। আল্লাহ তায়ালা বলেন, আর যদি তারা কোন মোজেযা দেখে, তখন টালবাহানা করে এবং বলে, এ তো যাদু।

আরবের পৌত্তলিকরা নবুয়তের বিস্ময়কর এ নিদর্শন থেকেও মুখ ফিরিয়ে নিল এবং নিজেদের কুফুরীর পথে আরো কয়েক কদম অগ্রসর হলো।[৩]

---

৩. বয়কটের বিবরণ নিম্নোল্লিখিত গ্রন্থাগুলো থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ২১৬, ৫৪৮। যাদুল মা'য়াদ ২য় খন্ড, পৃ. ৪৬, ইবনে হিশাম ১ম খন্ড, পৃ. ৩৫০-৩৫১, ৩৪৭, ৩৭৭, রহমাতুল লিল আলামিন, ১ম খন্ড. পৃ. ৭০ মুখতাছারুছ সীরাত, শেখ আবদুল্লাহ পৃ. ৬, ১০, ১১০, মুখতাছারুছ সীরাত, মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব, পৃ. ৬৮, ৭৩

আবু তালেব সকাশে কোরায়শদের শেষ প্রতিনিধি দল

শা'বে আবু তালেব থেকে বেরোবার পর রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করলেন। বয়কট শেষ হলেও পৌত্তলিক দুর্বৃত্তরা ইসলাম প্রচারে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যাচ্ছিলো। এদিকে আবু তালেব তার ভাতিজাকে রক্ষা করার দীর্ঘকালীন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন বয়সের ভারে ন্যুজ। তাঁর বয়স আশি বছর ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। ক্রমাগত কয়েক বছর যাবত দুঃখ-দুর্দশা বিপদ মুসিবতে তাঁর স্বাস্থ্য মারাত্মকভাবে ভেঙ্গে পড়েছিলো। বিশেষ করে গিরিবর্তে অবরোধ তাঁর শক্তি সামর্থ নিশেষ করে দিয়েছিলো। সেখান থেকে বেরোবার কয়েকমাস পরই তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ সময় পৌত্তলিকরা চিন্তা করলো যে, আবু তালেব দ্রুত অসুস্থ হচ্ছেন। যে কোন সময় তার জীবনের দিন শেষ হতে পারে। তার মৃত্যুর পর যদি আমরা তার ভাতিজার ওপর কোন বাড়াবাড়ি করি, তখন আমাদের দুর্নাম হবে। লোকে বলাবলি করবে যে, অভিভাবক নেই দেখে এখন সুযোগ নিচ্ছে। এ কারণে তারা আবু তালেবের জীবদ্দশাতেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে একটি ফয়সালায় উপনীত হতে চাচ্ছিলো। এক্ষেত্রে ছাড় দিতে তারা রাযি ছিলো না। নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর একটি প্রতিনিধিদল আবু তালেবের কাছে হাযির হলো। এটা ছিলো তার কাছে কোরায়শদের শেষ প্রতিনিধি দল।

ইবনে ইসহাক প্রমুখ বর্ণনা করেছেন যে, আবু তালেব অসুস্থ হয়ে পড়ার পর কোরায়শরা আশঙ্কা করছিলো যে, হঠাৎ করেই আবু তালেব শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবেন। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলো যে, দেখো হামযা, ওমর মুসলমান হয়ে গেছে এবং মুহাম্মদের ধর্ম কোরায়শদের সব গোত্রে বিস্তার লাভ করেছে। কাজেই, চলো, আবু তালেবের কাছে যাই। তিনি যেন তার ভাতিজাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখেন। এতে আমরা তার ব্যাপারে একটা চুক্তিতে উপনীত হতে পারব। আমরা আশঙ্কা করছি যে, সাধারণ মানুষ ভবিষ্যতে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কোন বাড়াবাড়ি করলে সাধারণ লোকেরা আমাদের সমালোচনা করবে। তারা বলাবলি করবে যে, আবু তালেব বেঁচে থাকতে কোন কিছু করার সাহস ছিলো না, এখন সুযোগ পেয়েছে।

মোটকথা কোরায়শ প্রতিনিধিদল আবু তালেবের কাছে গিয়ে আলোচনা করলো। কোরায়শদের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও প্রতিনিধিদলে অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এরা হলো আবু জেহেল ইবনে হেশাম, উমাইয়া ইবনে খালফ, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব এবং অন্যান্য। সংখ্যায় এরা ছিলো পঁচিশ জন। তারা বললো, হে আবু তালেব, আমাদের কাছে আপনার যে মর্যাদা রয়েছে, সেটা আপনার অজানা নয়। বর্তমানে আপনি যে অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, সেটাও আপনি জানেন। আমরা আশঙ্কা করছি যে, আপনার জীবনের দিন দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। আপনার ভাতিজার সাথে আমাদের বিরোধ আপনার অজানা নয়। আমরা চাই, আপনি তাকে ডেকে তার সাথে আমাদের একটা সমঝোতার ব্যবস্থা করুন। আমরা তার সাথে কিছু অঙ্গীকারে আবদ্ধ হতে এবং তাকেও কিছু অঙ্গীকারে আবদ্ধ করতে চাই। আমরা তাকে তার দ্বীনের ওপর ছেড়ে দেবো, তিনিও যেন আমাদেরকে আমাদের দ্বীনের ওপর ছেড়ে দেন।

এ সব কথা শোনার পর আবু তালেব তাঁর প্রিয় ভাতিজা মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ডেকে আনালেন। তিনি আসার পর বললেন, দেখো ভাতিজা, ওরা তোমার কওমের সম্মানিত লোক। তোমার জন্যেই ওরা একত্রিত হয়েছে। তোমার কাছ থেকে ওরা কিছু অঙ্গীকার

নিতে চায়। এরপর আবু তালেব ওদের উত্থাপিত প্রস্তাব পেশ করলেন যে, ওরা চায়, তুমি তাদের ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না এবং ওরাও তোমার ধর্মের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না।

একথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোরায়শ প্রতিনিধিদলকে বললেন, আপনারা বলুন, আমি যদি এমন কোন কথা পেশ করি, যে কথা গ্রহণ করলে আপনারা আরবের বাদশাহ হবেন এবং অন্যরাও আপনাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে, তখন আপনারা কি করবেন? অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি আবু তালেবকে সম্বোধন করে বললেন, আমি তাদের কাছে এমন একটি কথার স্বীকারোক্তি চাই যদি সেই স্বীকারোক্তি করে, তবে সমগ্র আরব তাদের অধীনস্থ হবে এবং অন্যরাও তাদের জিযিয়া দেবে। বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি বলেছেন, চাচা আপনি ওদের একটা বিষয়ের প্রতি ডাকুন, এতে ওদের ভালো হবে। আবু তালেব জিজ্ঞাসা করলেন, ওদের তুমি কোন বিষয়ের প্রতি ডাকতে চাও? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি ওদের এমন একটা বিষয়ের প্রতি ডাকতে চাই, যদি ওরা সেটা গ্রহণ করে, তবে সমগ্র আরব তাদের অনুগত হয়ে যাবে এবং অনারবের ওপরও তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। ইবনে ইসহাকের একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আপনারা শুধু একটি কথা মেনে নিন। এর ফলে আপনারা আরবের বাদশাহ হয়ে যাবেন এবং অনারব আপনাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

মোটকথা এই প্রস্তাব শোনার পর কোরায়শ প্রতিনিধিদল থমকে গেলো। তারা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো যে, মাত্র একটি কথা মেনে নিলে এত বড় লাভ যদি হয়, তবে সেটা কিভাবে উপেক্ষা করা যায়? আবু জেহেল বললো, বলো সেই কথা। তোমার পিতার শপথ, এ ধরনের কথা একটি কেন দশটি বললেও আমরা মানতে প্রস্তুত রয়েছি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আপনারা বলুন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নাই, অন্য সকলের আনুগত্য উপাসনা পরিত্যাগ করুন। একথা শুনে কোরায়শরা হাতে তালি দিয়ে বললো, মোহাম্মদ, আমরা এক খোদা মানব? আসলেই তোমার ব্যাপার স্যাপার বড়ো অদ্ভুত!

এরপর তারা একে অন্যকে বললো, খোদার কসম, এই লোক তোমাদের কোন কথাই মানতে রাযি নয়। কাজেই এসো আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের ধর্মবিশ্বাসের ওপর অটল থাকি। এরপর আল্লাহ্ ওর এবং আমাদের মধ্যে একটা ফয়সালা করে দেবেন। একথা বলে তারা উঠে চলে গেলো। এ ঘটনার পর ওদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন, 'শপথ উপদেশপূর্ণ কোরআনের। তুমি অবশ্যই সত্যবাদী। কিন্তু কাফেররা ঔদ্ধত্য এবং বিরোধিতায় ডুবে আছে। এদের পূর্বে আমি কতো জনগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি, তখন ওরা আর্ত চিৎকার করেছিলো। কিন্তু তখন পরিত্রাণের কোন উপায় ছিলো না। এরা বিস্ময় বোধ করছে যে, এদের কাছে এদেরই মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী আসলো এবং কাফেররা বললো, এতো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী। সে কি বহু ইলাহের পরিবর্তে এক ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? এটাতো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! ওদের প্রধানেরা সরে পড়ে এই বলে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের দেবতাগুলোর পূজায় অবিচল থাকো। নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটি উদ্দেশ্যমূলক। আমরা তো অন্য ধর্মাদর্শে এরূপ কথা শুনিনি। নিশ্চয়ই এটা একটি মনগড়া উক্তি মাত্র।'[১] (১-৭, ৩৮)

১. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড. ৭, ৪, ৪১৯, মুখতাছারুছ সীরাত, শেখ আবদুল্লাহ পৃ. ৯১

দুঃখ-বেদনার বছর

আবু তালেবের ইন্তেকাল

আবু তালেবের অসুখ বেড়ে গেলো এবং এক সময় তিনি ইন্তেকাল করলেন। আবু তালেব ঘাঁটিতে অবরোধ থেকে মুক্ত হওয়ার ছয়মাস পর নবুয়তের দশম বর্ষে রজব মাসে তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো।[২] অন্য এক বর্ণনায় একথা উল্লেখ রয়েছে যে, বিবি খাদিজার ইন্তেকালের তিনদিন আগে রমযান মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন।

সহীহ বোখারীতে হযরত মোসায়েব থেকে বর্ণিত আছে যে, আবু তালেবের ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে এলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে যান। সেখানে আবু জেহেলও উপস্থিত ছিলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, চাচাজান, আপনি শুধু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলুন। এই স্বীকারোক্তি করলেই আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্যে সুপরিশ করতে পারব। আবু জেহেল এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়া বললো, আবু তালেব, আপনি কি আবদুল মোত্তালেবের মিল্লাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন? এরপর এরা দু'জন আবু তালেবের সাথে কথা বলতে লাগলো। আবু তালেব শেষ কথা বলেছিলেন যে, আবদুল মোত্তালেবের মিল্লাতের উপর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমাকে নিষেধ না করা পর্যন্ত আমি আপনার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করতে থাকব। এরপর আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন, 'আত্মীয়স্বজন হলেও মোশরেকদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী এবং মোমেনদের জন্যে সঙ্গত নয়, যখন এটা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ওরা জাহান্নামী।' (১১৩, ৯)

আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতও নাযিল করেন, 'তুমি যাকে ভালোবাসো,[২] ইচ্ছা করলেই তাকে সৎপথে আনতে পারবে না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন এবং তিনিই ভালো জানেন সৎপথ অনুসারীদেরকে।' (৫৬, ২৮)

আবু তালেব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিরূপ সাহায্য সহযোগিতা করেছিলেন, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রকৃতপক্ষে মক্কায় কোরায়শ নেতা এবং নির্বোধ লোকদের ইসলামের ওপর হামলার মুখে তিনি ছিলেন একটি দুর্গের মতো। কিন্তু তিনি নিজে তাঁর পূর্ব পুরুষদের ধর্ম বিশ্বাসের ওপর অটল অবিচল ছিলেন। এ কারণে বোখারীতে হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালেব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি আপনার চাচার কি কাজে আসলেন? তিনি তো আপনাকে হেফাযত করতেন, আপনার জন্যে অন্যদের সাথে ঝগড়া বিবাদ, শত্রুতার ঝুঁকি নিতেন। রসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তিনি জাহান্নামের একটি সাধারণ জায়গায় রয়েছেন। যদি আমি না থাকতাম, তবে তিনি জাহান্নামের সবচেয়ে গভীর গহ্বরে থাকতেন।[৩]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একবার তাঁর চাচার প্রসঙ্গ আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, কেয়ামতের দিন আমার শাফায়াত হয়তো

---

২. সহীহ বোখারী, আবু তালেবের কিসসা অধ্যায় ১ম খন্ড, পৃ. ৫৪৮

৩. সহীহ বোখারী, আবু তালেবের কিসসা অধ্যায়, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৪৮

তার কিছু উপকারে আসবে। তাকে জাহান্নামের একটি উঁচু জায়গায় রাখা হবে যা শুধু তার উভয় পায়ের হাঁটু পর্যন্ত পৌছুবে।[৪]

হযরত খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকাল

জনাব আবু তালেবের ইন্তেকালের দু' মাস অথবা শুধু তিনদিন পর উম্মুল মোমেনীন খাদিজাতুল কোবরা (রা.) ইহলোক ত্যাগ করেন। নবুয়তের দশম বর্ষের রমযান মাসে তাঁর ইন্তেকাল হয়েছিলো। সেই সময় তাঁর বয়স ছিলো ৬৫ বছর। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স সে সময় পঞ্চাশে পড়েছিলো।[৫]

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যে হযরত খাদিজা (রা.) ছিলেন আল্লাহর এক বিশিষ্ট নেয়ামত। সিকি শতাব্দী যাবত তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনসঙ্গিনী ছিলেন। এ সময় দুঃখে কষ্ট ও বিপদের সময় প্রিয় স্বামীর জন্যে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠতো, বিপদের সময় তাঁকে তিনি ভরসা দিতেন, তাবলীগে দ্বীনের ক্ষেত্রে তার সঙ্গী থাকতেন। নিজের জানমাল দিয়েও তাঁর দুঃখ-কষ্ট দূর করতেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে সময় মানুষ আমার সাথে কুফুরী করছিলো সে সময় খাদিজা আমার ওপর ঈমান এনেছিলেন, যে সময় লোকেরা আমাকে অবিশ্বাস করেছিলো সে সময় খাদিজা আমাকে সত্যবাদী বলে গ্রহণ করেছেন, যে সময় লোকেরা আমাকে বঞ্চিত করেছিলো, সে সময় তিনি আমাকে নিজের ধন-সম্পদের অংশীদার করেছেন। তাঁর গর্ভ থেকে আল্লাহ আমাকে সন্তান দিয়েছেন, অন্য স্ত্রীদের গর্ভ থেকে আমাকে কোন সন্তান দেয়া হয়নি।'[৬]

সহীহ বোখারীতে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, দেখুন, খাদিজা আসছেন। তাঁর কাছে একটি বরতন রয়েছে। সেই বরতনে আগুন, খাবার অথবা পানীয় রয়েছে। তিনি আপনার কাছে এলে আপনি তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সালাম জানাবেন এবং জান্নাতে একটি মতিমহলের সুসংবাদ দেবেন। সেই মহলে কোন শোরগোল থাকবে না এবং ক্লান্তি ও অবসন্নতাও কাউকে গ্রাস করবে না।[৭]

দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও মনোবেদনা

উল্লিখিত দু'টি দুর্ঘটনা কয়েক দিনের মধ্যেই সংঘটিত হয়েছিলো। এতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শোকে দুঃখে কাতর হয়ে পড়লেন। এছাড়া তাঁর স্বজাতীয়দের পক্ষ থেকেও নির্যাতন নিষ্পেষণ নিপীড়ন চলছিলো। কেননা আবু তালেবের ওফাতের পর তাদের সাহস বেড়ে গিয়েছিলো। তারা খোলাখুলিভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিতে লাগলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ অবস্থায় তায়েফ গেলেন। মনে মনে আশা করেছিলেন যে, সেখানের জনসাধারণ হয়তো তাঁর প্রচারিত দ্বীনের দাওয়াত কবুল করবে, তাঁকে আশ্রয় দেবে এবং তাঁর স্বজাতীয়দের বিরোধিতার মুখে তাঁকে সাহায্য করবে।

কিন্তু সেখানে কোন সাহায্যকারী বা আশ্রয়দাতা তো পাওয়াই গেলো না, বরং উল্টো তাঁর ওপর অত্যাচার নির্যাতন চালানো হলো। তাঁর সাথে এমন দুর্ব্যবহার করা হলো যে, তাঁর কওমের লোকেরাও এযাবত ওরকম ব্যবহার করেনি। এ সম্পর্কিত বিবরণ পরে উল্লেখ করা যাবে।

---

৪. সহীহ বোখারী আবু তালেবের কিসসা অধ্যায়, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৪৮

৫. রমযান মাসে ইন্তেকাল সম্পর্কে ইবনে জওযি 'তালকিহুল ফুহুম' গ্রন্থের সপ্তম পৃষ্ঠায় এবং আল্লামা মনসুরপুরী তাঁর রহমতুল লিল আলআমিন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

৬. মুনসাদে আহমদ, ষষ্ঠ খন্ড, পৃ১১৮

৭. সহীহ বোখারী, তাজবিজুল নবী অধ্যায় ১ম খন্ড, পৃ. ৫৩৯

এখানে একথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, মক্কার অধিবাসীরা যেভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অত্যচার নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়েছিলো, তাঁর বন্ধুদের ওপরও একই রকম অত্যাচার চালিয়েছিলো। আল্লাহর রসূলের প্রিয় সহচর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) সেই অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হাবশা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। মক্কার এক প্রভাবশালী ব্যক্তি ইবনে দাগানার সাথে পথে দেখা হলো। তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে নিজের আশ্রয়ে রাখার দায়িত্ব নিয়ে মক্কায় ফিরিয়ে আনলেন।[৮]

ইবনে ইসহাক উল্লেখ করেছেন যে, আবু তালেবের ইন্তেকালের পর কোরায়শরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর এতো বেশী নির্যাতন চালিয়েছিলো যা, তাঁর জীবদ্দশায় চিন্তাও করতে পারেনি। কোরায়শের এক বেকুব সামনে এসে আল্লাহর রসূলের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করলো। তাঁর এক মেয়ে ছুটে এসে সে মাটি পরিষ্কার করলো।

মাটি পরিষ্কার করার সময়ে তিনি শুধু কাঁদছিলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে সে সময়, সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, মা, তুমি কেঁদো না। আল্লাহ তায়ালা তোমার আব্বাকে হেফাযত করবেন। এ সময়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথাও বলছিলেন যে, কোরায়শরা আমার সাথে এমন কোন খারাপ ব্যবহার করেনি, যাতে আমার খারাপ লেগেছে। এমনি পরিস্থিতিতে আবু তালেব ইন্তেকাল করেন।[৯]

পর্যায়ক্রমে এ ধরনের অত্যাচার নির্যাতনের কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই বছরের নাম রেখেছিলেন 'আমুল হোযন' অর্থাৎ দুঃখের বছর। সেই বছরটি এ নামেই ইতিহাসে বিখ্যাত।

হযরত সাওদার সাথে বিবাহ

সেই বছর অর্থাৎ নবুয়তের দশম বর্ষে শওয়াল মাসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সাওদা বিনতে জাম'য়া (রা.)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হযরত সাওদা নবুয়তের প্রথম দিকেই মুসলমান হয়েছিলেন। দ্বিতীয় হিজরীতে তিনি হাবশায় হিজরতও করেছিলেন। তাঁর স্বামীর নাম ছিলো ছাকরান ইবনে আমর। তিনিও প্রথম দিকে মুসলমান হন। হযরত সাওদা তাঁর সঙ্গে হাবশায় হিজরত করেন। কিন্তু তিনি হাবশাতেই মতান্তরে মক্কায় ফেরার পথে ইন্তেকাল করেন। এরপর হযরত সাওদার ইদ্দত শেষ হওয়ার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দেন এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হযরত খাদিজা (রা.)-এর ওফাতের পর তিনিই ছিলেন আল্লাহর রসূলের স্ত্রী। কয়েক বছর পর তিনি নিজের পালা হযরত আয়েশাকে হেবা করে দেন।[১০]

---

৮. আকবর শাহ নযীবাবাদী উল্লেখ করেছেন যে, এই ঘটনা সেই বছরেই ঘটেছিল। দেখুন, তারীখে ইসলাম, ১ম খন্ড ৩৭২-৩৭৩, বোখারী ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫২-৫৫৩

৯. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪১৬

১০. রহমাতুল লিল আলামিন, ২য় খন্ড, পৃ. ১৬৫, তালকিহুল ফুহুম, পৃ. ৬

প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবাদের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা

সেই নিদারুণ দুঃসময়েও মুসলমানরা কিভাবে অটল অবিচল থাকতে সক্ষম হলেন? একথা ভেবে শক্ত মনের মানুষও অবাক হয়ে যান। কি নির্মম নির্যাতনের মুখেও মুসলমানরা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছিলেন। অত্যাচার নির্যাতনের বিবরণ পাঠ করে দেহ-মন শিউরে উঠে। কি সেই সম্মোহনী শক্তি, যার কারণে মুসলমানরা এতোটা অবিচলিত ছিলেন? এ সম্পর্কে নীচে সংক্ষেপে আলোকপাত করা যাচ্ছে।

এক. ঈমানের সৌন্দর্য

সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে আল্লাহর ওপর ঈমান এবং তাঁর সঠিক পরিচয় জানা। ঈমানের সৌন্দর্য ও মাধুর্য পাহাড়ের সাথে ধাক্কা খেয়েও অটল থাকে। যার ঈমান এ ধরনের মযবুত এবং শক্তিশালী, তিনি যে কোন অত্যাচার নির্যাতনকে সমুদ্রের ওপরে ভাসমান ফেনার চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেন না। এ কারণেই মোমেন বান্দা ঈমানের মিষ্টতা এবং মাধুর্যের সামনে কোন বিপদ বাধাকেই পরোয়া করেন না।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যা আবর্জনা, তা ফেলে দেয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে, তা জমিতে থেকে যায়।' (১৭, ১৩)

দুই. আকর্ষণীয় নেতৃত্ব

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন উম্মতে ইসলামিয়া বরং সমগ্র মানব জাতির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। তাঁর শারীরিক সৌন্দর্য, মানসিক পূর্ণতা, প্রশংসনীয় চরিত্র, চমৎকার ব্যক্তিত্ব, পরিশীলিত অভ্যাস ও কর্মতৎপরতা দেখে আপনা থেকেই তাঁকে ভালোবাসার ইচ্ছা জাগতো। তাঁর জন্যে মন উজাড় করে দিতে ইচ্ছা হতো। মানুষ যেমন গুণ বৈশিষ্ট মনে প্রাণে পছন্দ করে, সেসব তার মধ্যে এতো বেশী ছিলো যে, এতোগুলো গুণবৈশিষ্ট্য একত্রে অন্য কাউকেই দেয়া হয়নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব, আভিজাত্য ও চারিত্রিক সৌন্দর্যে সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ক্ষমাশীলতা, আমানতদারি, সততা সত্যবাদিতা, সহিষ্ণুতা ইত্যাদি গুণ এতো বেশী ছিলো যে, তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে শত্রুরাও কখনো সন্দেহ পোষণ করেনি। তিনি যে কথা মুখে একবার উচ্চারণ করতেন তাঁর শত্রুরাও জানতো যে, সে কথা সত্য এবং তা বাস্তবায়িত হবেই হবে। বিভিন্ন ঘটনা থেকে একথার প্রমাণও পাওয়া যায়।

একবার কোরায়শদের তিনজন লোক একত্রিত হয়েছিলো, তারা প্রত্যেকেই গোপনে কোরআন তেলাওয়াত শুনেছিলো। কিন্তু কারো কাছে তারা সে কথা প্রকাশ করেনি। এদের মধ্যে আবু জেহেলও ছিলো একজন। অন্য দু'জনের একজন আবু জেহেলকে জিজ্ঞাসা করলো যে, মোহাম্মদের কাছে যা কিছু শুনেছো, বলতো, সে সম্পর্কে তোমার মতামত কি? আবু জেহেল বললো, আমি কি শুনেছি? আসলে কথা হচ্ছে যে, আমরা এবং বনু আবদে মান্নাফ আভিজাত্য ও মর্যাদার ব্যাপারে একে অন্যের সাথে মোকাবেলা করতাম। তারা গরীবদের পানাহার করালে

আমরাও তা করতাম, তারা দান খয়রাত করলে আমরাও করতাম। ওরা এবং আমরা ছিলাম পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। আমরা ছিলাম রেসের ঘোড়ার দুই প্রতিযোগীর মতো। এমনি অবস্থায় আবদে মান্নাফ বলতে শুরু করলো যে, আমাদের মধ্যে একজন নবী আছেন, তার কাছে আকাশ থেকে ওহী আসে। বলতো আমরা কিভাবে ওরকম ওহী পেতে পারি? খোদার কসম, আমি ঐ ব্যক্তির ওপর কখনো বিশ্বাস স্থাপন করবো না এবং কখনো তাকে সত্যবাদী বলে স্বীকৃতি দেবো না।[১] আবু জেহেল বলতো, হে মোহাম্মদ আমি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলি না, কিন্তু তুমি যা কিছু নিয়ে এসেছ সেটাকে মিথ্যা বলি। একথার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা কোরআনে বলেন, 'ওরা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না। কিন্তু ওসব যালেম আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে।'[২]

ইতিপূর্বে এ ঘটনার বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে যে, পৌত্তলিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একদিন গালাগাল করছিলো। পরপর তিনবার এরূপ করলো। তৃতীয়বার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, হে কোরায়শদল, আমি তোমাদের কাছে যবাই্র পশু নিয়ে এসেছি। একথা শোনার সাথে সাথে কাফেররা আল্লাহর রসূলকে ভালো ভালো কথা বলে খুশী করার চেষ্টা করতে লাগলো। ইতিপূর্বে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেজদা দেয়ার সময় কয়েকজন কাফের তাঁর ঘাড়ের ওপর উটের নাড়িভুড়ি চাপিয়ে দিয়েছিলো। নামায শেষে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের কাজ যারা করেছে, তাদেরকে বদ দোয়া দিলেন। সেই বদ দোয়া শুনে কাফেরদের মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো, তারা গভীর চিন্তায় পড়ে গেলো। কেননা তারা নিশ্চিতভাবে জানতো যে, এবার আর তারা রেহাই পাবে না।

এ ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু লাহাবের পুত্র ওতাইবাকে বদদোয়া করার পর সে বুঝেছিলো যে, এর পরিণাম থেকে সে রক্ষা পাবে না। সিরিয়া সফরের সময় বাঘ দেখেই সে বলেছিলো, আল্লাহর কসম, মোহাম্মদ মক্কায় থেকেই আমাকে হত্যা করছেন।

উবাই ইবনে খালফের ঘটনায় রয়েছে যে, এই লোকটি বারবার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার হুমকি দিতো। এ ধরনের হুমকির জবাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার বলেছিলেন, তুমি নও বরং আমিই তোমাকে হত্যা করবো ইনশাল্লাহ্। এরপর ওহুদের যুদ্ধে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য একজন সাহাবীর হাত থেকে একটি বর্শা নিয়ে উবাইয়ের প্রতি নিক্ষেপ করেন। এতে তার ঘাড়ের কাছে সামান্য যখম হয়েছিলো। পরে উবাই বারবার বলছিলো, মোহাম্মদ মক্কায়ই বলেছিলেন, আমি তোমাকে হত্যা করবো। তিনি যদি আমাকে থুথুও নিক্ষেপ করতেন, তবুও আমার প্রাণ বেরিয়ে যেতো।[৩] এর বিস্তারিত বিবরণ পরে উল্লেখ করা হবে।

একবার হযরত সা'দ ইবনে মায়ায মক্কায় উমাইয়া ইবনে খালফকে বলেছিলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি যে, মুসলমানরা তোমাকে হত্যা করবে। একথা শুনে উমাইয়া ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো। এ ভয় সব সময়েই তার ছিলো। সে প্রতিজ্ঞা করেছিলো যে, মক্কার বাইরে কখনো যাবে না। বদরের যুদ্ধের সময় আবু জেহেলের পীড়াপীড়িতে উমাইয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়ার পর সবচেয়ে দ্রুতগামী উট ক্রয় করলো, যাতে বিপদের

---

১. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ২১৬

২. তিরমিযি, তাফসীরে সূরা আল অনআম, ২য় খন্ড, পৃ. ১৩২

৩. ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ৮৪

আশঙ্কার সময় দ্রুত পালিয়ে আসতে পারে। যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার সময় তার স্ত্রী তাকে বলেছিলো, আবু সফওয়ান, আপনার ইয়াসরেবী ভাই যে কথা বলেছেন, আপনি কি সে কথা ভুলে গেছেন? উমাইয়া বললো, না ভুলিনি, আমি তো ওদের সাথে অল্প কিছু দূরে যাব।[৪]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শত্রুদের অবস্থা ছিলো এ রকম। তাঁর সঙ্গী এবং সাহাবাদের অবস্থাতো এমন ছিলো যে, তারা মনে প্রাণে প্রিয় নবীর প্রতি নিবেদিত ছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সাহাবাদের ভালোবাসা এতো তীব্র ছিলো যেন তা পাহাড়ী ঝর্ণার পানির ধারা। লোহা যেমন চুম্বকের প্রতি আকৃষ্ট হয়, সাহাবারাও তেমনি আল্লাহর রসূল (স,)-এর প্রতি আকৃষ্ট হতেন।

কবি বলেন, 'তাঁর চেহারা সব মানব দেহের জন্যে অস্তিত্ব স্বরূপ, তাঁর অস্তিত্ব ছিলো প্রতিটি অন্তরের জন্যে চুম্বকের মতো।'

এ ধরনের ভালোবাসা এবং নিবেদিত চিত্ততার কারণেই সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রসূলের ওপর কারো আঁচড় এবং তাঁর পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হওয়াও সহ্য করতে পারতেন না। এর বিনিময়ে তারা নিজেদের মাথা কাটিয়ে দিতেও প্রস্তুত থাকতেন।

দুর্বৃত্ত ওতবা ইবনে রবিয়া একদা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-কে মারাত্মকভাবে প্রহার করলো। তাঁর চেহারা রক্তাক্ত করে দেয়া হলো। তীব্র প্রহারের এক পর্যায়ে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। খবর পেয়ে তাঁর গোত্র বনু তাইমের লোকেরা তাঁকে কাপড়ে জড়িয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিল। তাঁর বাঁচার আশা সবাই ছেড়ে দিয়েছিলো। দিনের শেষে তাঁর জ্ঞান ফিরে এলো। তিনি প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেমন আছেন? একথা শুনে বনু তাইম গোত্রের যারা সেখানে উপস্থিত ছিলো, তারা বিরক্তি প্রকাশ করলো। তারা উঠে যাওয়ার সময় হযরত আবু বকরের মাকে বললো, ওকে কিছু খাওয়াতে পারেন কিনা দেখুন। আবু বকর (রা.) তাঁর মা উম্মুল খায়েরের কাছে আল্লাহর রসূলের খবর জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, আমি তো জানি না বাবা। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, মা, আপনি উম্মে জামিল বিনতে খাত্তাবের কাছে যান। তাঁর কাছ থেকে আমাকে আল্লাহর রসূলের খবর এনে দিন। উম্মুল খায়ের উম্মে জামিল বিনতে খাত্তাবের কাছে গেলেন, তাঁকে বললেন, আবু বকর তোমার কাছে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ সম্পর্কে জানতে চাইছেন। উম্মে জামিল বললেন, আমি আবু বকরকেও জানি না, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহকেও জানি না। তবে আপনি যদি চান, তাহলে আমি আবু বকরের কাছে যেতে পারি। উম্মুল খায়ের উম্মে জামিলকে তাঁর পুত্রের কাছে নিয়ে এলেন। হযরত আবু বকরের অবস্থা দেখে উম্মে জামিল চিৎকার দিয়ে উঠলেন। বললেন, যে কওমের লোকেরা আপনার এ দুরবস্থা করেছে, নিসন্দেহে তারা দুর্বৃত্ত এবং কাফের। আমি আশা করি, আল্লাহ তায়ালা আপনার পক্ষে ওদের ওপর প্রতিশোধ নেবেন। হযরত আবু বকর (রা.) আল্লাহর রসূলের খবর জানতে চাইলেন। উম্মে জামিল উম্মুল খায়েরের প্রতি ইশারা করলেন। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, অসুবিধা নেই। উম্মে জামিল বললেন, তিনি ভালো আছেন এবং ইবনে আরকামের ঘরে আছেন। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমাকে আল্লাহর রসূলের কাছে না নেয়া পর্যন্ত আমি কোন কিছুই পানাহার করবো না। উম্মুল খায়ের এবং উম্মে জামিল অপেক্ষা করতে লাগলেন। সন্ধ্যার পর লোক চলাচল কমে গেলে এবং অন্ধকার গাঢ় হয়ে

---

৪. সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৬৩

এলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তাঁর মা উম্মুল খায়ের এবং উম্মে জামিলের কাঁধে ভর দিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হলেন।[৫]

ভালোবাসা এবং নিবেদিতচিত্ততার আরো কিছু বিস্ময়কর ঘটনা এ বইয়ের বিভিন্ন স্থান, বিশেষত ওহুদের যুদ্ধের ঘটনায় এবং হযরত যোবায়ের (রা.)-এর ঘটনায় উল্লেখ করা হয়েছে।

তিন. দায়িত্ব সচেতনতা

সাহবায়ে কেরাম ভালোভাবেই জানতেন যে, মাটির মানুষের ওপর যেসব দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, সে দায়িত্ব যতো কঠিনই হোক না কেন, উপেক্ষা করার কোন উপায় নেই। কেননা সে দায়িত্ব উপেক্ষার পরিণাম হবে আরো বেশী ভয়াবহ। এতে সমগ্র মানব জাতি ক্ষতির সম্মুখীন হবে। সেই ক্ষতির তুলনায় এ যুলুম অত্যাচার বিপদ মুসিবতের কোন গুরুত্বই নেই।

চার. পরকালের ওপর বিশ্বাস

আখেরাত বা পরকালের জীবনের ওপর বিশ্বাস উল্লিখিত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁদের কঠোর সংযমী ও সহিষ্ণু হতে অনুপ্রাণিত করেছে। সাহাবায়ে কেরাম এ ব্যাপারে সুদৃঢ় ও অবিচল আস্থা পোষণ করতেন যে, তাদেরকে একদিন রব্বুল আলামিন আল্লাহর দরবারে দাঁড়াতে হবে। সেখানে জীবনের ছোট বড় সকল কাজের হিসাব দিতে হবে। এরপর হয়তো নেয়ামতপূর্ণ জান্নাত অথবা ভয়াবহ শাস্তিভরা জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে। এ বিশ্বাসের বলে সাহাবায়ে কেরাম আশা ও আশঙ্কায় পরিপূর্ণ জীবন যাপন করতেন। প্রিয় প্রভু আল্লাহর রহমতের আশা পোষণ করতেন এবং তার আযাবকে ভয় করতেন। তাঁদের অবস্থার কথা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালা এভাবে উল্লেখ করেন তারা যা কিছু সম্পাদন করে সেটা করে অন্তরে ভয়ভীতির সঙ্গে। একারণে করে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যেতে হবে।

তাঁরা একথাও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, এ পৃথিবীর সকল আরাম-আয়েশ সুখ-স্বাচ্ছন্দ এবং দুঃখষ্টসহ্য পরকালের তুলনায় একটি মশার একটি পাখার সমান মূল্যও রাখে না। এ বিশ্বাস তাঁদের এতো অবিচল এবং অটুট ছিলো যে, এর মোকাবেলায় দুনিয়ার সব বিপদ-আপদ তিক্ততা দুঃখকষ্ট ছিলো তুচ্ছ।

পাঁচ. কঠিন থেকে কঠিনতর সে অবস্থা

কোরআনের যেসব আয়াত পর্যায়ক্রমে নাযিল হচ্ছিলো, তাতে ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা ও আদর্শ আকর্ষণীয়ভাবে তুলে ধরা হচ্ছিলো। কোরআনের সেসব আয়াতে মানব জাতির সামনে সবচেয়ে সম্মানজনক ও বৈশিষ্টমন্ডিত ইসলামী সমাজের ঈমানের সজীবতা এবং দৃঢ়তাকে আরো শক্তিমান করে তোলা হচ্ছিলো। আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন উদাহরণ পেশ করছিলেন এবং হেকমত বা কৌশল মুসলমানদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা কি মনে করো যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে যদিও এখনো তোমাদের কাছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের অবস্থা আসেনি এবং তারা ভীত ও কম্পিত হয়েছিলো। এমনকি রসূল ও তাঁর সাথে ঈমান আনয়নকারীরা বলে উঠেছিলো, আল্লাহর সাহায্য কবে আসবে? হাঁ আল্লাহর সাহায্য কাছেই।' (২১৪, ২)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, 'আলিফ লাম মীম। মানুষ কি মনে করে, আমরা ঈমান এনেছি, একথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেয়া হবে? আমি তো তাদের পূর্ববর্তীদেরও পরীক্ষা করেছিলাম। আল্লাহ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন কারা সত্যবাদী আর কারা মিথ্যাবাদী।' (১-৩, ২৯)

পাশাপাশি এমন সব আয়াত নাযিল হচ্ছিলো যেসব আয়াতে কাফের মোশরেকদের বিভিন্ন প্রশ্নের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হচ্ছিলো। তাদের কোন অজুহাতই ধোপে টেকার মতো ছিলো না।

---

৫. 'আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া', ৩য় খন্ড, পৃ. ৩০

সুস্পষ্ট ভাষায় তাদের বলে দেয়া হয়েছিলো যে, যদি তারা তাদের পথভ্রষ্টতা এবং হঠকারিতার ওপর অটল থাকে তবে পরিণাম হবে মারাত্মক। উদাহরণ হিসাবে পূর্ববর্তী জাতিসমূহের এমন সব ঘটনা এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে যে, ওতে আল্লাহর রসূল এবং কাফেরদের সম্পর্কে আল্লাহর নীতি ব্যক্ত করা হয়েছে। একই সাথে দয়া ও ক্ষমার কথাও বলা হয়েছে এবং পথনির্দেশ ব্যক্ত করা হয়েছে। এসব বলা হয়েছে এ জন্যে যে, অবিশ্বাসীরা যেন নিজেদের পথভ্রষ্টতা ও গোমরাহী থেকে বিরত থাকে।

প্রকৃতপক্ষে পবিত্র কোরআন মুসলমানদের এক ভিন্ন পৃথিবী ভ্রমণ করিয়ে এনেছে। তাদের সামনে বিস্ময়কর সব উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে। যাতে তারা হতোদ্যম হয়ে না পড়ে কোন বাধা বা প্রতিকূলতাই যেন তাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখতে না পারে।

এ সকল আয়াতে মুসলমানদের এমন সব কথাও বলা হয়েছে, যার দ্বারা মুসলমানরা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতের সুসংবাদ পেতে পারে। আর অবিশ্বাসীদের চিত্র এমনভাবে তুলে ধরা হয়েছে যাতে, তারা আল্লাহর দরবারে ফয়সালার জন্যে হাযির করার কথা জানতে পারে। তাদের পার্থিব জীবনের পুণ্যের কোন স্থান পাবে না বরং তাদেরকে টেনে হিঁচড়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে এবং বলা হবে, এবার দোযখের স্বাদ গ্রহণ করো চিরদিন ধরে।

ছয়. কঠোর ধৈর্য

এসব কথা ছাড়াও মুসলমানরা অত্যাচারিত হওয়ার কেবল শুরু থেকেই নয়, বরং তার আগে থেকেই এটা জানতো যে, ইসলাম গ্রহণের অর্থ এই নয় যে, চিরস্থায়ীভাবে দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হবে। বরং ইসলামের দাওয়াতের মূল কথাই ছিলো জাহেলী যুগের অবসান, সকল প্রকার অত্যাচার ও নির্যাতন নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার মূলোৎপাটন। ইসলামের দাওয়াতের একটা লক্ষ্য এটাও ছিলো যে, মুসলমানরা পৃথিবীতে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করবে এবং রাজনৈতিকভাবে এমন বিজয় অর্জন করবে, যাতে সকল মানুষকে আল্লাহর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করা যায়। মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে আল্লাহর দাসত্বে প্রবেশ করানো যায়।

কোরআনে করীমের এসব সুসংবাদ কখনো ইশারা এবং কখনো খোলাখুলিভাবে নাযিল হচ্ছিলো। একদিকে অবস্থা এমন ছিলো যে, প্রশস্ত হওয়া সত্তেও পৃথিবী মুসলমানদের জন্যে সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছিলো, তাদের টিকে থাকাই ছিলো কঠিন। তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করতে একদল লোক ছিলো সদা সক্রিয়। অন্যদিকে মুসলমানদের শক্তি সাহস ও মনোবল বাড়াতে এমন সব আয়াত নাযিল হচ্ছিলো যাতে পূর্বকালের ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী সময়ের নবীদের অবিশ্বাস করা হয়েছে এবং তাদের ওপরও অত্যাচার নির্যাতন চালানো হয়েছে। সেসব আয়াতে যে চিত্র অঙ্কন করা হচ্ছিলো তার সঙ্গে মক্কার মুসলমান ও কাফেরদের অবস্থার হুবহু সাদৃশ্য ছিলো। পরিশেষে একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইতিপূর্বে অবিশ্বাসীরা কিভাবে ধ্বংস এবং আল্লাহর পুণ্যশীল বান্দাদের তাঁর যমীনের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে। পরিণামে মক্কার অবিশ্বাসীরাই ব্যর্থ ও পরাজিত ও মুসলমান এবং ইসলামের দাওয়াতের সাফল্যই অর্জিত হবে। সেই সময়ে এমন সব আয়াতও নাযিল হয়েছে, যেসব আয়াতে ঈমানদারদের বিজয়ের সুসংবাদ স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন— আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন, 'আমার প্রেরিত বান্দাদের সম্পর্কে আমার এ বাক্য পূর্বেই স্থির হয়েছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে এবং আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী। অতএব কিছুকালের জন্যে তুমি ওদেরকে উপেক্ষা কর। তুমি ওদের পর্যবেক্ষণ কর, শীঘ্রই ওরা প্রত্যক্ষ করবে।'

ওরা কি আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়? তাদের আঙ্গিনায় যখন শাস্তি নেমে আসবে তখন সতর্কীকৃতদের প্রতিফল ভয়াবহ ও জঘন্য হবে। (১৭১, ১৭৭, ৩৭)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, 'এই দলতো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে।' (৪৫, ৫৪)

'বহু দলের এই বাহিনীও সে ক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত হবে।' (১১, ৩৮)

হাবশায় হিজরতকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

'যারা অত্যাচারিত হওয়ার পরও আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, আমি অবশ্যই দুনিয়ায় তাদের উত্তম আবাস দেবো এবং আখেরাতের পুরস্কারই তো শ্রেষ্ঠ। হায় ওরা যদি সেটা জানতো।' (৪২, ১৬)

অবিশ্বাসীরা আল্লাহর রসূলকে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা জিজ্ঞাসা করার পর আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'জিজ্ঞাসুদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে।' (৭, ১২) অর্থাৎ মক্কাবাসীরা আজ হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা জিজ্ঞাসা করছে এবং ঠিক সে রকমই ব্যর্থ হবে, যেমন ব্যর্থ হয়েছিলো হযরত ইউসুফের ভাইয়েরা। এদের পরিণাম হবে হযরত ইউসুফের ভাইয়ের পরিণামের মতোই। কাজেই হযরত ইউসুফ এবং তাঁর ভাইদের ঘটনা থেকে মক্কাবাসীদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। তাদের বোঝা উচিত যে, অত্যাচারীদের পরিণাম কি ধরনের হয়ে থাকে। এক জায়গায় পয়গাম্বরদের প্রসঙ্গ আলোচনা করে আল্লাহ তায়ালা বলেন, কাফেররা তাদের রসূলদের বলেছিলো, 'আমরা তো তোমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে অবশ্যই বহিষ্কার করবো। অথবা তোমাদেরকে আমাদের ধর্মাদর্শে ফিরে আসতেই হবে। অতপর রসূলদের প্রতি তাদের প্রতিপালক ওহী প্রেরণ করলেন। যালেমদেরকে আমি অবশ্যই বিনাশ করবো।' (১৩-১৪, ১৪)

পারস্য এবং রোমে যখন যুদ্ধের দাবানল জ্বলছিলো, কাফেররা চাচ্ছিলো পারস্যবাসী যেন জয়লাভ করে, মুসলমানরা চাচ্ছিলো রোমকরা যেন জয়লাভ করে। কেননা রোমকরা আল্লাহ তায়ালা, পয়গাম্বর, ওহী, আসমানী কেতাবে বিশ্বাসী বলে দাবী করতো। পারস্যবাসীরা জয়যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে আল্লাহ এ সুসংবাদ প্রদান করেন যে, 'কয়েক বছর পর রোমকরা জয়লাভ করবে। শুধু এ সুসংবাদই দেয়া হয়নি, বরং আল্লাহ তায়ালা এই সুসংবাদও দিয়েছিলেন যে, রোমকদের বিজয়ের সময় আল্লাহ তায়ালা মোমেনদেরও বিশেষভাবে সাহায্য করবেন। এই সাহায্য পেয়ে তারা খুশী হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আর সেদিন মোমেনরা হর্ষোৎফুল্ল হবে আল্লাহর সাহায্যে। (৪৫, ৩০) পরবর্তী সময়ে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় ও সাফল্যের দ্বারা আল্লাহর বাণীর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছিলো।

কোরআনের ঘোষণা ছাড়াও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও বিভিন্ন সময়ে মুসলমানদেরকে এ ধরনের সুসংবাদ শোনাতেন। হজ্জের সময় ওকায, মাযনা এবং যুলমাজাযের বাজারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের কাছে তাঁর নবুয়তের কথা প্রচার করতেন। সে সময় তিনি শুধু বেহেশতের সুসংবাদই দিতেন না, বরং সুস্পষ্টভাবে একথাও ঘোষণা করতেন, হে লোক সকল, তোমরা বলো যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, এতে তোমরা সফলকাম হবে। এর বদৌলতে তোমরা হবে আরবের বাদশাহ এবং অন্যরাও তোমাদের পদানত হবে। আর মরণের পরও তোমরা জান্নাতের ভেতর বাদশাহ হয়ে থাকবে।[৬]

ইতিপূর্বে এ ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওতবা ইবনে রবিয়া যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পার্থিব ভোগ বিলাস এবং ঐশ্বর্যের লোভ দেখাচ্ছিলো এবং জবাবে তিনি হা-মীম সেজদা সূরার কয়েকটি আয়াত পাঠ করে শুনিয়েছিলেন, তখন ওতবা ভবিষ্যৎবাণী করেছিলো যে, শেষ পর্যন্ত মুসলমানরাই জয় লাভ করবে।

---

৬. জামে তিরমিযি

আবু তালেবের কাছে কোরায়শদের সর্বশেষ প্রতিনিধিদল দেখা করতে এলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে জবাব দিয়েছিলেন, ইতিপূর্বে সেই জবাব উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানেও পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, তোমরা আল্লাহর তওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করো, এর ফলে সমগ্র আরব তোমাদের অধীনস্থ হবে এবং অনারবের ওপরও তোমাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

হযরত খাব্বাব ইবনে আরত (রা.) বলেন, একবার আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হলাম। তিনি কাবাঘরের ছায়ায় একটি চাদরকে বালিশ বানিয়ে শায়িত ছিলেন। সে সময় আমরা পৌত্তলিকদের হাতে অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছিলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করলেই পারেন। এ কথা শুনে তিনি উঠে বসলেন, তাঁর চেহারা রক্তিম হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী সময়ে ঈমানদারদের অবস্থা এমনও হয়েছিলো যে, লোহার চিরুনি দিয়ে তাদের গোশ্‌ত খুলে নেয়া হতো, দেহে থাকতো শুধু হাড়। এরূপ অত্যাচারও তাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের ওপর বিশ্বাস থেকে সরিয়ে নিতে পারেনি। এরপর বললেন, আল্লাহ তায়ালা দ্বীনকে পূর্ণতা প্রদান করবেন। একজন ঘোড় সওয়ার সান্‌য়া থেকে হাদরামাউত পর্যন্ত সফর করবে, এ সময়ে আল্লাহর ভয় ছাড়া তার অন্য কোন ভয় থাকবে না। তবে হাঁ বকরিদের ওপর বাঘের ভয় তখনো থাকবে।[৭]

একটি বর্ণনায় একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়ো করছো।[৮]

স্মরণ রাখা দরকার যে, এসব সুসংবাদ কোন গোপনীয় বিষয় ছিলো না। এসব কথা ছিলো সর্বজনবিদিত। মুসলমানদের মতোই কাফের অবিশ্বাসীরাও এসব কথা জানতো। আসওয়াদ ইবনে মোত্তালেব এবং তার বন্ধুরা সাহাবায়ে কেরামকে দেখলেই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতো তোমাদের কাছে সারা দুনিয়ার বাদশাহ এসে পড়েছে। ওরা খুব শীঘ্রই কেসরা কায়সারকে পরাজিত করবে। এসব কথা বলে তারা শিশ মারতো এবং হাততালি দিতো।[৯]

মোটকথা সাহাবায়ে কেরামের ওপর সে সময় যেসব যুলুম অত্যাচার নির্যাতন নিপীড়ন চালানো হতো সেসব কিছু বেহেশত পাওয়ার নিশ্চিত বিশ্বাস এবং সুসংবাদের মোকাবেলায় ছিলো তুচ্ছ। এসব-অত্যাচারকে সাহাবায়ে কেরাম মনে করতেন এক খন্ড মেঘের মতো, যে মেঘ বাতাসের এক ঝাপটায় দূর হয়ে যাবে।

এছাড়া ঈমানদারদের ঈমানের পরিপক্কতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিয়ে নিয়মিতভাবে সাহাবারা রূহানী খাবার সরবরাহ করতেন। কোরআন শিক্ষা দেয়ার মাধ্যমে তাদের মানসিক পরিশুদ্ধতার ব্যবস্থা করতেন। ইসলাম সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, রূহানী শক্তির ব্যবস্থা, মানসিক পরিচ্ছন্নতা চারিত্রিক সৌন্দর্যের শিক্ষা সাহাবাদের মনোবল বাড়িয়ে দিচ্ছিলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের ঈমানের নিভু নিভু স্ফুলিঙ্গকে উজ্জ্বল শিখায় পরিণত করতেন। অন্ধকার থেকে বের করে তাদেরকে হেদায়াতের আলোকে পৌঁছে দিতেন। এর ফলে সাহাবাদের দ্বীনী শিক্ষা ও বিশ্বাস বহুগুণ উন্নত হয়ে গিয়েছিলো। প্রবৃত্তির দাসত্ব ছেড়ে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথে অগ্রসর হতেন। জান্নাতের অধিবাসী হওয়ার আগ্রহ, জ্ঞান লাভের আকাঙ্খা এবং আত্ম সমালোচনায় তাঁরা উদ্যোগী হয়েছিলেন। এসব কারণে বিধর্মী পৌত্তলিকদের অত্যাচার নির্যাতন তাঁদেরকে লক্ষ্য পথ থেকে দূরে সরাতে পারেনি, ধৈর্য সহিষ্ণুতায় তাঁরা ছিলেন অটল অবিচল। বিশ্ব মানবের জন্যে তাঁরা প্রত্যেকেই হয়ে উঠেছিলেন এক একজন উজ্জ্বল আদর্শ।

---

৭. সহীহ বোখারী ১ম খন্ড, পৃ. ৫৪৩

৮. সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ৫১

৯. ফেকহুস সীরাত, প. ৮৪

তৃতীয় পর্যায়

মক্কার বাইরে ইসলামের দাওয়াত

তায়েফে আল্লাহর রসূল

নবুয়তের দশম বর্ষের[১] শুরুর দিকে ৬১৯ ঈসায়ী সালের মে মাসের শেষ দিকে অথবা জুন মাসের প্রথম দিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফ গমন করেন। তায়েফ মক্কা থেকে ষাট মাইল দূরে অবস্থিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাওয়া-আসার পথ একশত বিশ মাইল দূরত্ব পায়ে হেঁটে অতিক্রম করেছিলেন। আল্লাহর রসূলের সাথে তার মুক্ত করা ক্রীতদাস যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.) ছিলেন। তায়েফ যাওয়ার পথে পথে তিনি ইসলামের দাওয়াত দিতেন। কিন্তু কেউ তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করলো না। তায়েফ পৌঁছার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাকিফ গোত্রের তিনজন সর্দারের কাছে যান। এরা পরস্পর ভাই। এদের নাম ছিলো আবদে ইয়ালিল, মাসউদ এবং হাবিব। এদের পিতার নাম ছিলো আমর ইবনে ওমায়ের ছাকাফি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে পৌঁছে আল্লাহর প্রতি আনুগত্য এবং ইসলামের সাহায্য করার আহ্বান জানান। জবাবে একজন টিপ্পনির সুরে বললো, কাবার পর্দা সে ফেঁড়ে দেখাক যদি আল্লাহ তাকে রসূল করে থাকেন।[২]

অন্য একজন বললো, আল্লাহ তায়ালা কি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে পেলেন না? তৃতীয়জন বললো আমি তোমার সাথে কোন কথাই বলতে চাই না। কেননা তুমি যদি নবী হয়ে থাকো, তাহলে তোমার কথা রদ করা আমার জন্যে বিপজ্জনক হবে। আর, তুমি যদি আল্লাহর নামে মিথ্যা কথা রটাও, তবে তো তোমার সাথে আমার কথা বলাই উচিত নয়। এসব শুনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, তোমরা যা করেছো করেছো, তবে বিষয়টা গোপন রেখো।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফে দশদিন অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি তায়েফের সকল নেতৃস্থানীয় লোক অর্থাৎ গোত্রীয় সর্দারদের কাছে যান এবং প্রত্যেককে দ্বীনের দাওয়াত দেন। কিন্তু সবাই এক কথা বললো যে, তুমি আমাদের শহর থেকে বেরিয়ে যাও। শুধু এ কথা বলেই তারা ক্ষান্ত হয়নি বরং উচ্ছৃঙ্খল বালকদের উস্কানি দিয়েছিলো। তিনি ফেরার সময় ওসব দুর্বৃত্ত বালক তাঁর পেছনে লেগে গেলো। তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালাগাল করছিলো, হাততালি দিচ্ছিলো ও হৈ চৈ করছিলো। কিছুক্ষণের মধ্যে এতো বালক এবং দুর্বৃত্ত লোক জড়ো হলো যে, পথের দু'ধারে লাইন লেগে গেলো। এরপর গালাগাল দিতে এবং ঢিল ছুঁড়তে লাগলো, এতে তাঁর দু'পা রক্তাক্ত হয়ে তাঁর জুতো রক্তে ভরে গেলো। এদিকে হযরত

---

১. মাওলানা নজীবাদী তারীখে ইসলাম ১ম খন্ডে ১২২ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। আমার মতে এ তারিখটিই নির্ভুল।

২. উর্দু ভাষায় এ পরিভাষার সাথে একথা মিলে যায় যে, যদি তুমি পয়গাম্বর হও, তবে আল্লাহ আমাকে ধ্বংস করুন। একথা দ্বারা এটাই বোঝানো হয় যে, তোমার মত লোকের পয়গাম্বর হওয়া অসম্ভব, যেমন কাবাঘরের ওপর হামলা করা অসম্ভব।

যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.) ঢাল হিসাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আগলে রাখছিলেন। ফলে নিক্ষিপ্ত ঢিল তাঁর গায়ে পড়ছিলো। তাঁর মাথায় কয়েক জায়গায় কেটে গেলো। হৈ চৈ করতে করতে দুর্বৃত্তরা আল্লাহর রসূলের পিছু নিয়েছিলো। এক সময় তিনি মক্কার ওতবা, শায়বা এবং রবিয়াদের একটি বাগানে আশ্রয় নিলেন। এ বাগান ছিলো তায়েফ থেকে তিন মাইল দূরে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বাগানে আশ্রয় নেয়ার পর দুর্বৃত্তদল ফিরে গেলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি দেয়ালে হেলান দিয়ে আঙ্গুর গাছের ছায়ায় বসে পড়লেন। কিছুটা শান্ত হওয়ার পর এই দোয়া করলেন যা 'দোয়ায়ে মোসতাদয়েফিন' নামে বিখ্যাত। এ দোয়ার প্রতিটি শব্দ দ্বারা বোঝা যায় যে, তায়েফবাসীদের খারাপ ব্যবহার এবং একজন লোকেরও ঈমান না আনার কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতোটা মনোকষ্ট পেয়েছিলেন। তাঁর দুঃখ ও মনোবেদনা ছিলো কতো গভীর। এই দোয়ায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে আল্লাহ তায়ালা, আমি তোমার কাছে আমার দুর্বলতা, অসহায়তা এবং মানুষের কাছে আমার মূল্যহীনতা সম্পর্কে অভিযোগ করছি। দয়ালু দাতা, তুমি দুর্বলদের প্রভু, তুমি আমারও প্রভু, তুমি আমাকে কার কাছে ন্যস্ত করছো? আমাকে কি এমন অচেনা কারো হাতে ন্যস্ত করছো, যে আমার সাথে রুক্ষ ব্যবহার করবে। নাকি কোন শত্রুর হাতে ন্যস্ত করছো যাকে তুমি আমার বিষয়ের মালিক করে দিয়েছো? যদি তুমি আমার ওপর অসন্তুষ্ট না হও তবে আমার কোন দুঃখ নেই, আফসোসও নেই। তোমার ক্ষমাশীলতা আমার জন্যে প্রশস্ত ও প্রসারিত করো। আমি তোমার সত্তর সেই আলোর আশ্রয় চাই, যা দ্বারা অন্ধকার দূর হয়ে আলোয় চারিদিক ভরে যায়। দুনিয়া ও আখেরাতের সকল বিষয় তোমার হাতে ন্যস্ত। তুমি আমার ওপর অভিশাপ নাযিল করবে বা ধমকাবে, যে অবস্থায় তোমার সন্তুষ্টি কামনা করি। সকল ক্ষমতা ও শক্তি শুধু তোমারই। তোমার শক্তি ছাড়া কারো কোনো শক্তি নেই।'

রবিয়ার পুত্ররা আল্লাহর রসূলের অবস্থা দেখে তাঁর প্রতি দয়া পরবশ হলো। নিকটাত্মীয়তার কথা ভেবে তাদের মন নরম হয়ে গেলো। নিজেদের খৃস্টান ক্রীতদাস আদাসের হাতে এক থোকা আঙ্গুর দিয়ে বললো, লোকটিকে দিয়ে এসো। ক্রীতদাস আদাস আঙ্গুরের থোকা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেয়ার পর তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলে খেতে শুরু করলেন।

আদাস বললো, খাওয়ার সময় এ ধরনের কথা তো এখানের লোকজনরা বলে না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কোথাকার অধিবাসী? তোমার ধর্ম কি? সে বললো, আমার বাড়ী নিনোভায়। ধর্ম ঈসায়ী। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি পুণ্যশীল বান্দা হযরত ইউসুফের এলাকার অধিবাসী। আদাস বললো, আপনি ইউসুফকে কি করে চেনেন? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তিনি ছিলেন আমার ভাই। তিনি ছিলেন নবী, আমিও নবী। একথা শুনে আদাস রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঝুঁকে পড়লো এবং তাঁর মাথা, হাত ও পায়ে চুম্বন করলো।

এ অবস্থা দেখে রবিয়ার দুই পুত্র নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলো, এই লোক এবার আমাদের ক্রীতদাসের মাথা বিগড়ে দিয়েছে। মনিবদের কাছে ফিরে গেলে তারা আদাসকে জিজ্ঞাসা করলো, কিরে কি ব্যাপার? আদাস বললো, আমার বিবেচনায় পৃথিবীতে এই লোকের চেয়ে ভালো লোক আর নেই। তিনি আমাকে এমন একটি কথা বলেছেন, যে কথা নবী ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই জানা সম্ভব নয়। রবিয়ার পুত্ররা বললো, দেখো আদাস, এই লোক যেন তোমাকে তোমার ধর্ম বিশ্বাস থেকে সরাতে না পারে। তোমার ধর্ম এ লোকের ধর্মের চেয়ে ভালো।

কিছুক্ষণ অবস্থানের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাগান থেকে বেরিয়ে মক্কার পথে রওয়ানা হলেন। মানসিকভাবে তিনি ছিলেন বিপর্যস্ত। কারণে মানায়েল নামক জায়গায়

পৌঁছার পর আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিবরাঈল (আ) এলেন, তাঁর সাথে পাহাড়ের ফেরেশতারাও ছিলেন। তারা আল্লাহর রসূলের কাছে অনুমতি চাইতে এসেছিলেন যে, যদি তিনি বলেন, তবে এর অধিবাসীদেরকে দু'টি পাহাড়ের মধ্যে পিষে দেবেন।

এ ঘটনার বিবরণ বোখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রসূলকে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ওহুদের দিনের চেয়ে মারাত্মক কোন দিন আপনার জীবনে এসেছিলো কি? রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার কওম থেকে আমি যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, তার মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ দিন ছিলো তায়েফের দিন। আমি আবদে ইয়ালিল ইবনে আবদে কুলাল সন্তানদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা আমার দাওয়াত গ্রহণ করেনি। আমি দুঃখ-কষ্ট ও মানসিক বিপর্যস্ত অবস্থায় 'কারোন ছাআলেবে' পৌঁছে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। সেখানে মাথা তুলে দেখি মাথার ওপরে এক টুকরো মেঘ। ভালোভাবে তাকিয়ে দেখি সেখানে হযরত জিবরাঈল (আ.)। তিনি আমাকে বললেন, আপনার কওম আপনাকে যা যা বলেছে আল্লাহ তায়ালা সবই শুনেছেন। আপনার কাছে পাহাড়ের ফেরেশতাদের পাঠানো হয়েছে। এরপর পাহাড়ের ফেরেশতারা আমাকে আওয়ায দিলেন, সালাম জানালেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল, হাঁ, এ কথা সত্যই। আপনি যদি চান তবে আমরা ওদেরকে দুই পাহাড়ের মধ্যে পিষে দেবো।[৩]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না, আমি আশা করি আল্লাহ তায়ালা ওদের বংশধরদের মধ্যে এমন মানুষ সৃষ্টি করবেন, যারা শুধুমাত্র আল্লাহর এবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।[৪]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই জবাবে তাঁর দুরদর্শিতা, বিচক্ষণতা, অনুপম ব্যক্তিত্ব ও উত্তম মানবিক চেতনার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। মোটকথা, আসমানের ওপর থেকে আসা গায়েবী সাহায্যে তাঁর মন শান্ত হয়ে গেলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার পথে পা বাড়ালেন। ওয়াদীয়ে নাখলা নামক জায়গায় এসে তিনি থামলেন। এখানে তাঁর অবস্থানের মতো জায়গা ছিলো দু'টি। এক জায়গার নাম 'আসসাইলোল কাবির' অন্য জায়গা হলো 'জায়মা'। উভয় জায়গায় পানি, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সজীবতা বিদ্যমান ছিলো। এ দু'টি জায়গার মধ্যে তিনি কোথায় অবস্থান করেছিলেন, সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যায়নি।

নাখলায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকদিন কাটান। সেখানে আল্লাহ রব্বুল আলামিন জিনদের দু'টি দল তাঁর কাছে প্রেরণ করেন। পবিত্র কোরআনের দুই জায়গায়— সূরা আহকাফ এবং সূরা জিন-এ এদের কথা উল্লেখ রয়েছে।

সূরা আহকাফে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জিনকে, যারা কোরআন পাঠ শুনছিলো। যখন ওরা তার কাছে উপস্থিত হলো, ওরা একে অপরকে বলতে লাগলো, চুপ করে শ্রবণ করো। যখন কোরআন পাঠ সমাপ্ত হলো ওরা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলো এক একজন সতর্ককারীরূপে। এমন এক কেতাবের পাঠ শ্রবণ করেছি, যা অবতীর্ণ হয়েছে মূসা (আ.)-এর ওপর। এটি পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে এবং সত্য ও সরল পথের দিকে পরিচালিত করে। হে আমাদের সম্প্রদায়, আমাদের দিকে আহ্বাকারীর

---

৩. এখানে সহীহ বোখারীতে আখশাবিন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। মক্কার দু'টি বিখ্যাত পাহাড় আবু কোবায়েস এবং কাযাইকাযান সম্পর্কে এ শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ দু'টি পাহাড় কাবাঘরের উত্তর ও দক্ষিণে মুখোমুখি অবস্থানে অবস্থিত। সেই সময়ে মক্কার জন সাধারণ এই দুটি পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় বসবাস করতো।

৪. সহীহ বোখারী, কেতাবে বাদায়াল খালক', ১ম খন্ড, পৃ. ৪৫৮

প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দেবেন এবং মর্মন্তুদ শাস্তি থেকে তোমাদের রক্ষা করবেন।' (২৯-৩১, ৪৬)

সূরা জিন-এ আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'বল, আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনযোগ সহকারে শ্রবণ করেছে এবং বলেছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কোরআন শ্রবণ করেছি, যা সঠিক পথ নির্দেশ করে, ফলে আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থির করবো না।' সূরা জিন-এর পনেরটি আয়াত পর্যন্ত এর বর্ণনা রয়েছে।

উল্লিখিত আয়াতসমূহের বর্ণনাভঙ্গি থেকে বোঝা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিনদের আসার কথা প্রথম দিকে জানতেন না। কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে জানানোর পর আল্লাহর রসূল এ সম্পর্কে অবহিত হন। কোরআনের আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, এটা ছিলো জিনদের প্রথম আগমন। বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, পরবর্তী সময়ে তাদের যাতায়াত চলতে থাকে।

জিনদের আগমন এবং ইসলাম গ্রহণ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিলো দ্বিতীয় সাহায্য। আল্লাহর অদৃশ্য ভান্ডার থেকে তিনি এ সাহায্য লাভ করেন। এ ঘটনার বর্ণনা সম্পর্কিত অন্যান্য আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় রসূলকে দ্বীনী দাওয়াতের সাফল্যের ব্যাপারে সুসংবাদ দিয়েছেন এবং একথা সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, পৃথিবীর কোন শক্তিই দ্বীন ইসলামের দাওয়াতের সাফল্য ও অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে টিকতে পারবে না। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'কেউ যদি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া না দেয়, তবে সে পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারীও থাকবে না। ওরাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।' (৩২, ৪৬)

আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের উক্তির কথা বলেন, 'আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আমরা আল্লাহকে যমিনে অসহায় করতে পারবো না এবং আমরা পালিয়ে গিয়েও তাঁকে অসহায় করতে পারবো না।' (১২, ৭২)

এই সাহায্য এবং সুসংবাদের সামনে তায়েফের খারাপ ব্যবহারজনিত দুঃখ কষ্ট, মনের কালো মেঘ দূর হয়ে গিয়েছিলো। আল্লাহর রসূল দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন যে, মক্কায় তাঁকে ফিরে যেতে হবে এবং নতুন উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে দ্বীনের দাওয়াত দিতে হবে। এ সময় হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রসূল আপনি কি করে মক্কায় যাবেন, মক্কার অধিবাসীরা তো আপনাকে মক্কা থেকে বের করে দিয়েছে। তিনি বললেন, 'হে যায়েদ, তুমি যে অবস্থা দেখছো, এ অবস্থা থেকে উত্তরণের কোন উপায় আল্লাহ তায়ালা বের করে দেবেন। আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই তাঁর দ্বীনকে সাহায্য এবং তাঁর নবীকে জয়যুক্ত করবেন।'

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাখলা থেকে রওয়ানা হয়ে মক্কার অদূরে হেরা গুহায় অবস্থান করলেন। সেখান থেকে খাজায়া গোত্রের একজন লোকের মাধ্যমে আখনাস ইবনে শোরাইককে এ পয়গাম পাঠালেন যে, আখনাস যেন তাঁকে আশ্রয় দেয়। আখনাস একথা বলে অক্ষমতা প্রকাশ করলো যে, আমি তো মিত্রপক্ষ, মিত্রপক্ষ তো কাউকে আশ্রয় দেয়ার মতো দায়িত্ব নিতে পারে না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর সোহায়েল ইবনে আমরের কাছেও একই পয়গাম পাঠালেন। কিন্তু সেই লোকও এই বলে অক্ষমতা প্রকাশ করলো যে, বনু আমরের দেয়া আশ্রয় বনু কা'ব এর ওপর প্রযোজ্য নয়। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোতয়া'ম ইবনে আদীর কাছে পয়গাম পাঠালেন। মোতয়া'ম বললেন, হাঁ, আমি রাযি আছি। এরপর তিনি অস্ত্র সজ্জিত হয়ে নিজের সন্তান এবং গোত্রের লোকদের ডেকে একত্রিত

করলেন। সবাই একত্রিত হওয়ার পর বললেন, তোমরা অস্ত্রসজ্জিত হয়ে কাবাঘরের সামনে যাও। কারণ আমি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আশ্রয় দিয়েছি। এরপর মোতয়া'ম রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খবর পাঠালেন যে, আপনি মক্কার ভেতরে আসুন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর পাওয়ার পর যায়েদকে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করলেন। মোত্য়া'ম ইবনে আদী তাঁর সওয়ারীর ওপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন যে, কোরায়শের লোকেরা শোনো, আমি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আশ্রয় দিয়েছি। কেউ যেন এরপর তাঁকে বিরক্ত না করে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজরে আসওয়াদ চুম্বন এবং দু'রাকাত নামায আদায় করলেন। নামায আদায়ের পর তিনি নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। এ সময় মোতয়া'ম ইবনে আদী এবং তার সন্তানেরা অস্ত্র সজ্জিত হয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘিরে রাখলো। আল্লাহর রসূল ঘরে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত তারা তাঁর সঙ্গে ছিলো।

বলা হয়ে থাকে যে, এ সময় আবু জেহেল মোতয়া'মকে জিজ্ঞাসা করছিলো, তুমি শুধু তাকে আশ্রয় দিয়েছো, না তাঁর অনুসারী অর্থাৎ মুসলমান ও হয়ে গেছো? মোতয়া'ম বললেন, আমি শুধু আশ্রয় দিয়েছি।

এতে আবু জেহেল বললো, তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছো, আমরাও তাকে দিলাম।[৫]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোতয়া'ম ইবনে আদীর এ উপকার কখনো ভোলেননি। বদরের যুদ্ধের পর মক্কার কাফেররা বহু সংখ্যক বন্দী হয়ে আসার পর কয়েকজন বন্দীর মুক্তির সুপারিশ নিয়ে মোতয়ামের পুত্র হযরত হোবায়ের (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হলে তিনি বলেছিলেন, মোতয়াম ইবনে আদী যদি আজ বেঁচে থাকতো এবং আমার কাছে এসব দুর্গন্ধময় লোকদের ব্যাপারে সুপারিশ করতো, তবে তার খাতিরে আমি এদের সবাইকে মুক্ত করে দিতাম।[৬]

বিভিন্ন গোত্র ও ব্যক্তির কাছে ইসলামের দাওয়াত

নবুয়তের দশম বর্ষের যিলকদ মাসে অর্থাৎ ৬১৯ ঈসায়ী সালের মে মাসের শেষ বা জুনের প্রথম দিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফ থেকে মক্কায় আগমন করেন। সেখানে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তি এবং গোত্রের কাছে নতুন উদ্যমে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। এ সময় হজ্জের মৌসুম হওয়ায় দূরে কাছে সর্বত্র থেকে হজ্জ পালনের জন্যে পায়ে হেঁটে এবং সওয়ারীতে করে বহু লোক হজ্জ পালনের জন্যে আসেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সময় তাদের ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেন। নবুয়তের চতুর্থ বছর থেকে তিনি এ ধরনের দাওয়াত দিয়ে আসছিলেন।

ইমাম যুহরী বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সকল গোত্রের কাছে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন, তারা হচ্ছে, বনু আমের ইবনে সায়া'সায়া', মোহারেব ইবনে খাছবা, ফাজারাহ, নাস্সান, মায়রা, হানিফা, ছালিম, আবাস, বনু নছর, বনু আলবাকা, কেলাব, হারেছ ইবনে কা'ব আযারাহ ও হাযারেমা। কিন্তু কেউই ইসলাম গ্রহণ করেনি।[১]

ইমাম যুহরীর উল্লিখিত এ সকল গোত্রের কাছে একবার বা এক বছরের হজ্জ মৌসুমেই শুধু ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়নি বরং নবুয়তের চতুর্থ বছর থেকে শুরু করে হিজরত পূর্ববর্তী শেষ

---

৫ তায়েফ সফরের এ ঘটনার বিবরণসমূহ, ইবনে হিশাম ১ম খন্ড, পৃ. ৪১৯-৪২২, যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ৪৬-৪৭, রহমাতুল লিল আলামিন ১ম খন্ড, পৃ. ৭১-৭৪, তারীখে ইসলাম, নযীরাবাদী, ১ম খন্ড, পৃ. ১২৩-১২৪।

৬ সহীহ বোখারী, তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৫৭৩

১. তিরমিযি, মুখতাছারুছ সীরাত, শেখ আবদুল্লাহ, পৃ. ১৪৯

হজ্জ মৌসুম অর্থাৎ দশ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছিলো।[২]

ইবনে ইসহাক কয়েকটি গোত্রের কাছে ইসলামের দাওয়াত প্রদান এবং তাদের জবাবের প্রকৃতিও উল্লেখ করেছেন। নীচে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু উল্লেখ করা যাচ্ছে।

এক) বনু কেলাব, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই গোত্রের একটি শাখা বনু আবদুল্লাহর কাছে গমন করেন এবং তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি আহ্বান জানান। কথায় কথায় তিনি বলেছিলেন, হে বনু আবদুল্লাহ, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের পিতামহের চমৎকার নাম রেখেছিলেন। কিন্তু এই গোত্রের লোকেরা আল্লাহর রসূলের দেয়া দাওয়াত গ্রহণ করেনি।

দুই) বনু হানিফা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদের বাড়ীতে গমন করেন তাদেরকে দাওয়াত দেন কিন্তু তারা যে জবাব দিয়েছিলো, সে রকম জবাব আরবের অন্য কেউই প্রদান করেনি।

তিন) আমের ইবনে সায়া'সায়া', রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদের কাছেও দাওয়াত দিয়েছিলেন। জবাবে এ গোত্রের বুহায়রাহ বিন ফারাস নামক এক ব্যক্তি বলেছিলো, আল্লাহর শপথ যদি আমি কোরায়শের এক যুবককে সঙ্গে রাখি, তবে সমগ্র আরবকে খেয়ে ফেলবো। এরপর সে বললো, একটা কথার জবাব দিন, যদি আমরা আপনার দ্বীন গ্রহণ করি এবং আপনি প্রতিপক্ষের ওপর জয় লাভ করেন, এরপর কি নেতৃত্ব আমাদের হাতে আসবে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নেতৃত্ব কর্তৃত্ব তো আল্লাহর হাতে, তিনি যেখানে ইচ্ছা করেন সেখানে রাখবেন। একথা শুনে সেই লোক, বললো চমৎকার কথা। আপনার নিরাপত্তার জন্যে আমরা নিজেদের বুককে আরবদের নিশানা করবো অথচ আল্লাহ যখন আপনাকে জয়যুক্ত করবেন, তখন নেতৃত্ব কর্তৃত্ব থাকবে অন্যদের হাতে, এটা হয় না। আপনার দ্বীন আমাদের প্রয়োজন নেই।

এরপর বনু আমের গোত্র তাদের এলাকায় চলে যাওয়ার পর একজন বৃদ্ধ এ ঘটনা শুনলেন। বার্ধক্যের কারণে তিনি হজ্জে যেতে পারেন নি। সব শোনার পর তিনি দু'হাতে মাথা চেপে ধরে বললেন, মারাত্মক ভুল করেছো তুমি। হে বনু আমের গোত্রের লোকেরা, সেই লোককে কি খুঁজে পাওয়ার কোন উপায় আছে? সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, হযরত ইসমাইলের কোন বংশধরই নবুয়তের মিথ্যা দাবী করতে পারে না, অতীতেও করেনি। তোমাদের বুদ্ধি চলে গিয়েছিলো?[৩]

মক্কার বাইরে ইসলামের আলো

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন গোত্র এবং প্রতিনিধিদলকেই শুধু নয়, বহু ব্যক্তিকেও ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। এদের অনেকে ভালো জবাবও দিয়েছিলেন। হজ্জ মৌসুমের অল্পকাল পর কিছুসংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। নীচে এ সম্পর্কিত একটি সংক্ষিপ্ত রোয়েদাদ পেশ করা হচ্ছে।

এক) সুয়াইদ ইবনে সামেত, এই লোক ছিলো কবি এবং যথেষ্ট বুদ্ধি বিবেচনাও রাখতো। সে ছিলো ইয়াসরেবের অধিবাসী। বুদ্ধিমত্তা, কাব্যচর্চা, আভিজাত্য এবং বংশ মর্যাদার কারণে তার কওমের লোকেরা তাকে কামেল উপাধিতে ভূষিত করেছিলো। এই লোকটি হজ্জ বা ওমরাহ

---

২. রহমাতুললিল আলামিন, ১ম খন্ড, পৃ. ৭৪
৩. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৪৩-৪৪৮

করার জন্যে মক্কায় এসেছিলো। আল্লাহর রসূল তাকে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন। সে বললো, আমার কাছে যে জিনিস আছে, সম্ভবত আপনার কাছেও সেই জিনিসই রয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার কাছে কি রয়েছে? সে বললো, লোকমানের হেকমত। আল্লাহর রসূল বললেন, শোনাও তো। সুয়াইদ শোনালো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ বাণী উত্তম, কিন্তু আমার কাছে যা রয়েছে, সেটা এর চেয়েও উত্তম। আমার কাছে রয়েছে কোরআন। এই কোরআন আল্লাহ আমার ওপর নাযিল করেছেন। এটি হচ্ছে হেদায়াতের নূর। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর লোকটিকে কোরআনের কিছু অংশ শোনালেন। এরপর তিনি ইসলাম গ্রহণ করে বললেন, এটা তো চমৎকার কালাম। নবুয়তের একাদশ বর্ষের প্রথমদিকে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর সুয়াইদ মদীনায় ফিরে এলে বুআস' যুদ্ধ শুরু হয়। সেই যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।[৪]

দুই) ইয়াশ ইবনে মায়া'য, এই ব্যক্তিও ছিলেন ইয়াসরেবের অধিবাসী। বয়সে ছিলেন যুবক। নবুয়তের একাদশ বর্ষে বুআস যুদ্ধের কিছুকাল আগে আওসের একটি প্রতিনিধিদল খাযরাজের বিরুদ্ধে কোরায়শদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশায় মক্কায় আসে। ইয়াশও তাদের সঙ্গে ছিলেন। সে সময় এ উভয় গোত্রের মধ্যে শত্রুতার আগুন জ্বলে উঠেছিলো। আওসের লোকসংখ্যা ছিলো খাযরাজের চেয়ে কম। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রতিনিধিদলের আগমন সংবাদ শোনার পর দেখা করতে গেলেন। তাদের মাঝখানে গিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আপনারা যে উদ্দেশ্যে মক্কায় এসেছেন, এর চেয়ে ভালো কোন জিনিস গ্রহণে রাযি আছেন কি? তারা বললো, কি সেই জিনিস? আল্লাহর রসূল বললেন, আমি আল্লাহর রসূল। আল্লাহ তায়ালা আমাকে তাঁর বান্দাদের কাছে এ দাওয়াত দেয়ার জন্যে প্রেরণ করেছেন যে, তারা যেন আল্লাহর এবাদাত করে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করে। আল্লাহ তায়ালা আমার উপর কেতাবও নাযিল করেছেন। এরপর তিনি ইসলামের কথা উল্লেখ করে কোরআন তেলাওয়াত করেন।

ইয়াশ ইবনে মায়া'য বললেন, হে কওম, আপনারা যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন, এই দাওয়াত তার চেয়ে উত্তম। প্রতিনিধিদলের একজন সদস্য আবুল হাছির আনাস ইবনে রাফে একমুঠো খড় ইয়াশের মুখে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, এসব কথা ছাড়ো। আমার বয়সের শপথ, এখানে আমরা অন্য উদ্দেশ্যে এসেছি। এরপর ইয়াশ আর কোন কথা বলেননি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও উঠে চলে গেলেন। এদিকে প্রতিনিধিদল কোরায়শদের সাথে মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি করতেও সক্ষম হয়নি। তারা ব্যর্থ হয়ে মদীনায় ফিরে গেলো।

তিন) আবুযর গেফারী, এই ব্যক্তি শহর থেকে দূরের এক জায়গায় বসবাস করতেন। সুয়াইদ ইবনে সামেত এবং ইয়াশ ইবনে মায়া'য এর কাছ থেকে আবু যর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের খবর পেয়েছিলেন। এ খবরই ছিলো তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ।[৫]

তার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বোখারী শরীফে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনা মতে আবু যর বলেন, আমি ছিলাম গেফার গোত্রের লোক। আমি শুনলাম এমন একজন লোক আবির্ভূত হয়েছেন, যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করছেন। এ খবর শুনে আমার ভাইকে মক্কায় পাঠালাম। তাকে বলে দিলাম, তুমি সেই ব্যক্তির সাথে দেখা করবে

৪. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪২৫-৪২৭ রহমতুল লিল আলামিন, ১ম খন্ড, পৃ. ৭৪

৫. একথা আকবর নদীরাবাদী লিখেছেন। তারীখুল ইসলাম, ১ম খন্ড, পৃ. ১২৮ দেখুন

এরপর আমার কাছে তার খবর নিয়ে আসবে। আমার ভাই মক্কায় থেকে ফিরে এলে জিজ্ঞাসা করলাম, কি খবর এনেছো? সে বললো, খোদার কসম, আমি এমন একজন মানুষ দেখেছি, যিনি সৎ কাজের আদেশ দিয়ে থাকেন এবং খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখেন। আমি বললাম, তুমি স্বস্তি পাওয়ার মতো খবর দিতে পারোনি। এরপর আমি কিছু পাথেয় সম্বল করে মক্কার পথে রওয়ানা হয়ে সেখানে হাযির হলাম। কিন্তু সেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনতে পারলাম না। কারো কাছে জিজ্ঞাসা করতেও সাহস পেলাম না। যমযমের পানি পান করে মসজিদে হারামে পড়ে রইলাম। হযরত আলী (রা.) দেখে বললেন, আপনাকে অচেনা মনে হচ্ছে। আমি বললাম, জ্বী হাঁ। তিনি বললেন, আমার ঘরে চলুন। আমি তাঁর সাথে গেলাম। তিনি আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না, আমিও কিছু বললাম না।

সকালে আবার মসজিদে হারামে গেলাম। আশা ছিলো যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবো। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে কেউ আমাকে কিছু বললো না। সন্ধ্যায় হযরত আলী (রা.) এসে আমাকে দেখে বললেন, এই লোকটি এখনো নিজের ঠিকানা জানতে পারেনি? আমি বললাম, হাঁ তাই, এখনো পারেনি। তিনি বললেন, চলুন, আমার সাথে চলুন। এরপর তিনি বললেন, কি ব্যাপার আপনার, বলুন তো? আপনি এ শহরে কেন এসেছেন? আমি বললাম, আপনি যদি কথাটা গোপন রাখেন, তবে বলতে পারি। তিনি বললেন, ঠিক আছে। আমি বললাম, এখানে একজন লোক নিজেকে নবী বলে দাবী করছেন বলে আমি খবর পেয়েছি। খবর পাওয়ার পর আমি আমার ভাইকে পাঠিয়েছিলাম কিন্তু সে আমাকে বিস্তারিত কোন খবর জানাতে পারেনি এ কারণে নিজেই এসেছি। হযরত আলী (রা.) বললেন, আপনি ঠিক জায়গাতেই এসেছেন। আমার সাথে চলুন। যেখানে আমি প্রবেশ করবো, আপনিও সেখানে প্রবেশ করবেন। যাওয়ার পথে যদি কোন লোকের কারণে আপনার আশঙ্কার কারণ দেখা দেয় তবে আমি দোকানের কাছে যাব এবং জুতো ঠিক করার ভান করবো। সে সময়ে আপনি পথ চলতে থাকবেন। এরপর হযরত আলী (রা.) রওয়ানা হলেন, আমিও তার সাথে রওয়ানা হলাম। অবশেষে তিনি ঘরে প্রবেশ করলে আমিও তার সাথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম। তাঁকে বললাম, আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিন। আল্লাহর রসূল আমার কাছে ইসলাম পেশ করলেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেলাম। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, হে আবু যর, তোমার ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রেখো এবং তোমার এলাকায় চলে যাও। আমরা প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করেছি, এ খবর শোনার পর আমাদের সাথে এসে দেখা করবে। আমি বললাম, সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আমি কাফেরদের সামনে প্রকাশ্যে আমার ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করবো। এ কথা বলার পর আমি কাবাঘরের সামনে এলাম। কোরায়শরা সেখানে উপস্থিত ছিলো। আমি তাদের বললাম, তোমরা শোনো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রসূল।

এই ঘোষণার পর কোরায়শরা পরস্পর বলাবলি করলো যে, ওঠো, তোমরা এই বেদ্বীনের খবর নাও। এরপর তারা আমাকে এমনভাবে প্রহার করলো যে, ভেবেছিলাম মরেই যাবো। এ অবস্থায় হযরত আব্বাস (রা.) এসে আমাকে বাঁচালেন। তিনি একটুখানি ঝুঁকে আমাকে দেখলেন। এরপর কোরায়শদের বললেন, এই লোক তো গেফার গোত্রের। তোমরা এ গোত্রের এলাকার ওপর দিয়েই ব্যবসা করতে যাও। এ কথা শুনে পৌত্তলিক কোরায়শরা আমাকে ছেড়ে দিলো। পরদিনও আমি সেখানে গেলাম এবং একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। এবারও হযরত আব্বাস (রা.) এসে আমাকে উদ্ধার করলেন।[৬]

৬. সহীহ বোখারী, যমযমের কাহিনী অধ্যায়, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৯৯ আবূ জরের ইসলাম গ্রহণ অধ্যায়, ১ম খন্ড, পৃঃ ৫৪৪-৫৪৫

৪) **তোফায়েল ইবনে আমর দাওসি,** এই লোক ছিলেন কবি, বুদ্ধি বিবেচনায় বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং তাঁর গোত্রের সর্দার। এই গোত্র ইয়েমেনের কিছু এলাকায় শাসন ক্ষমতার অধিকারী ছিলো। নবুয়তের একাদশ বর্ষে তিনি মক্কায় গেলে মক্কায় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং তার কাছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে নালিশ করে। তারা বলে যে, এই লোক আমাদের জটিল অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। আমাদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে, তার কথায় রয়েছে যাদুর মতো প্রভাব। এতে ভাই ভাইয়ের মধ্যে এবং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে, পিতা পুত্রের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। আমরা আশংকা করছি, যে বিপদে আমরা পড়েছি, আপনিও সেই বিপদে পড়েন কিনা। কাজেই আপনার কাছে আবেদন এ লোকের সাথে কোন কথাই বলবেন না।

হযরত তোফায়েল (রা.) বলেন, কোরায়শ পৌত্তলিকরা আমাকে নানাভাবে বোঝালো, এক সময় আমি সিদ্ধান্তই নিয়েছিলাম যে, আল্লাহর রসূলের সাথে কথাও বলবো না তাঁর কোন কথাও শুনবো না। সকালে মসজিদে হারামে যাওয়ার পর কানে তুলো গুঁজে দিয়েছিলাম যাতে আল্লাহর রসূলের কোন কথা আমার কানে না যায়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিছু কথা আমাকে শোনানোর ইচ্ছা করেছিলেন। এরপর আমি কিছু ভালো কথা শুনলাম। মনে মনে বললাম, আমি তো বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন একজন মানুষ। খ্যাতনামা কবি। ভালমন্দ কোন কিছুই তো আমার কাছে গোপন থাকতে পারে না। কেন আমি ভালো কথা শুনবো না? যদি গ্রহণযোগ্য হয়, তবে গ্রহণ করবো। মন্দ হলে গ্রহণ করবো না। এ কথা ভেবে চুপচাপ থাকলাম। আল্লাহর রসূল ঘরে ফিরতে শুরু করলে তাঁর পিছু নিলাম। তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন, আমিও প্রবেশ করলাম। এরপর লোকেরা আমাকে তাঁর ব্যাপারে যে সতর্ক করেছিলো এবং সতর্কতা হিসেবে নিজের কানে যে তুলো গুঁজে দিয়েছিলাম, সেসব কথা তাঁকে শোনালাম। এরপর বললাম, আপনি সবাইকে যে কথা বলে থাকেন আমাকেও বলুন। আল্লাহর রসূল আমাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং কোরআন পাঠ করে শোনালেন। আমি সাথে সাথেই ইসলাম গ্রহণ করলাম। আল্লাহর শপথ, আমি এর চেয়ে ভালো কথা আগে কখনো শুনিনি। আমি সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করে সত্যের সাক্ষ্য দিলাম। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললাম, আমার কওমের কাছে আমার কথা গ্রহণযোগ্য, তারা আমাকে যথেষ্ট মান্য করে। আমি তাদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদরেকে দ্বীনের দাওয়াত দেবো। আপনি আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আমাকে কোন নিদর্শন দেখান। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করলেন।

হযরত তোফায়েল (রা.)-কে যে নিদর্শন দেয়া হয়েছিলো, সেটা এই যে, তিনি তাঁর কওমের কাছাকাছি পৌঁছার পর তাঁর চেহারা চেরাগের আলোর মতো উজ্জ্বল হয়ে গিয়েছিলো। তিনি বললেন, হে আল্লাহ, অন্য কোথাও এ আলো স্থানান্তর করে দিন, অন্যথায় চেহারা বিকৃত হওয়ার অপবাদ দিয়ে ওরা আমার সমালোচনা করবে। এরপর সেই আলো আমার হাতের লাঠির মধ্যে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। হযরত তোফায়েল (রা.) তার পিতা এবং স্ত্রীর কাছে ইসলামের দাওয়াত দেন, এতে তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে তাঁর কওমের লোকেরা ইসলাম গ্রহণে দেরী করে। কিন্তু হযরত তোফায়েল (রা.) ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যান। খন্দকের[৭] যুদ্ধের পর তিনি যখন হিজরত করেন সে সময় তাঁর কওমের সত্তর বা আশি পরিবার তাঁর সঙ্গে ছিলো। হযরত

৭. হোদায়বিয়ার সন্ধির পরে তিনি হিজরত করেন। তিনি যখন মদীনায় যান সে সময় আল্লাহর রসূল খয়বরে ছিলেন।

তোফায়েল (রা.) ইসলাম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।[৮]

পাঁচ) জেমাদ আযদি ঃ এই ব্যক্তি ছিলেন ইয়েমেনের অধিবাসী এবং আযদ শানওয়াহ গোত্রের মানুষ। ঝাঁড় ফুঁক এবং ভূত প্রেত তাড়ানোর কাজ করতেন। মক্কায় এসে সেখানকার নির্বোধদের কাছে শুনতে পান যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাগল। আল্লাহর রসূলের কাছে তিনি এ উদ্দেশ্যে গেলেন যে, হয়তো আল্লাহর রসূল তার হাতে ভালো হয়ে যাবেন। আল্লাহর রসূলের সাথে দেখা করে তিনি বললেন, আমি ঝাড় ফুঁক জানি, আপনার কি এর প্রয়োজন আছে? জবাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, আমি তাঁর প্রশংসা করি এবং তাঁর কাছেই সাহায্য চাই। আল্লাহ তায়ালা যাকে হেদায়াত করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যাকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন কেউ তাকে হেদায়াত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরিক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রসূল।'

জেমাদ তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, আপনার কথাগুলো আমাকে পুনরায় শুনিয়ে দিন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথাগুলো তিনবার শোনালেন। জেমাদ বললেন, আমি যাদুকরদের জ্যোতিষীদের কথা শুনেছি, কিন্তু আপনি যেসব কথা বললেন, এ ধরনের কথা কোথাও শুনিনি। আপনার কথাতো সমুদ্রের অতলস্পর্শী গভীরতা থেকে উৎসারিত। দিন আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। আমি আপনার হাতে ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করবো। এরপর জেমাদ আযদি ইসলাম গ্রহণ করেন।[৯]

মদীনার ছয়জন পুণ্যশীল মানুষ

নবুয়তের একাদশ বর্ষে অর্থাৎ ৬২০ ঈসায়ী সালে জুলাই মাসের হজ্জ মওসুমে ইসলামের দাওয়াতের ফলপ্রসূ বিস্তার ঘটে। এ সময়ে সে দাওয়াত একটি মহীরুহে পরিণত হয়। সেই গাছের ঘন পত্রপল্লবের ছায়ায় মুসলমানরা দীর্ঘদিনের অত্যাচার নির্যাতন থেকে মুক্তি লাভ করেন। মক্কার অধিবাসীরা আল্লাহর রসূলকে অবিশ্বাস করা এবং লোকদের আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়ার যে ষড়যন্ত্র শুরু করেছিলো তা থেকে পরিত্রাণ পেতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কৌশলের আশ্রয় নেন। এ সময়ে তিনি রাত্রিকালে বিভিন্ন গোত্রের কাছে গিয়ে তাদের ইসলামের দাওয়াত দিতেন। তাই মক্কার পৌত্তলিকরা তাঁর পথে বাঁধার সৃষ্টি করতে পারেনি।

এ কৌশলের একপর্যায়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) এবং হযরত আলী (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে একরাতে মক্কার বাইরে বনু যোহাল এবং বনু শায়বান ইবনে ছালাবা গোত্রের লোকদের বাড়ীতে গিয়ে তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দেন। জবাবে তারা আশাব্যঞ্জক কথা বলে। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন সাড়া দেয়নি। এ সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক এবং বনু যোহাল গোত্রের একজন লোকের মধ্যে বংশধারা সম্পর্কে চিত্তাকর্ষক প্রশ্নোত্তর ঘটে। উভয়েই ছিলেন বংশধারা বিশেষজ্ঞ।[১০]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর মিনার পাহাড়ী এলাকা অতিক্রমের সময়

---

৮. মেশকাতুল মাসাবিহ

৯. সহীহ মুসলিম, মেশকাতুল মাসাবিহ, ২য় খন্ড পৃঃ ৫২৫

১০. মুখতাছারুছ সীরাত, শেখ আবদুল্লাহ, পৃঃ ১৫০-১৫২

কয়েকজন লোককে আলাপ করতে শোনেন।[১১] তিনি সোজা তাদের কাছে যান। এরা ছিলো মদীনার ছয়জন যুবক। এরা ছিলো খাযরাজ গোত্রের সাথে সম্পর্কিত। তাদের নাম ও পরিচয় এই,

ক্রঃ নম্বর	নাম	গোত্রের নাম
১	আসয়াদ ইবনে যোরারাহ	বনু নাজ্জার
২	আওন ইবনে হারেস ইবনে রেফায়া' (ইবনে আফরা)	বনু নাজ্জার
৩	রাফে ইবনে মালেক ইবনে আযলান	বনু যোরায়েক
৪	কোতবা ইবনে আমের ইবনে হাদিদা	বনু সালমা
৫	ওকবা ইবনে আমের ইবনে নাবি	বনু হারাম ইবনে কা'ব
৬	হারেস ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে রেআব	বনু ওবায়েদ ইবনে গানাম

এসব যুবক তাদের প্রতিপক্ষ মদীনার ইহুদীদের কাছে শুনতো যে, সেই যুগে একজন নবী আসবেন। তারা একথাও শুনেছিলো যে, তিনি সহসা আবির্ভূত হবেন।[১২]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে গিয়ে তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বললো, আমরা খাযরাজ গোত্রের লোক। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইহুদীদের প্রতিপক্ষ? তারা বললো, হাঁ! আল্লাহর রসূল বললেন, তোমরা একটু বসো, আমি কিছু কথা বলি। তারা বসলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে দ্বীন ইসলামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করলেন, আল্লাহর পথে দাওয়াত দিলেন এবং কোরআন পাঠ করে শোনালেন। সেই ছয়জন যুবক পরস্পরকে বললো, এই তো মনে হয় সেই নবী, যার কথা উল্লেখ করে ইহুদীরা আমাদের ধমক দিয়ে থাকে। ইহুদীরা যেন আমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে না পারে আমাদের সেই ব্যবস্থা করতে হবে। এরপর সেই ছয় ভাগ্যবান যুবক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত কবুল করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

এই ছয়জন ছিলেন মদীনার বিবেকসম্পন্ন মানুষ। এর কিছুদিন আগে মদীনায় একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো, সেই যুদ্ধের ধোঁয়া তখনো মিলিয়ে যায়নি। সেই যুদ্ধ এদেরকে তছনছ করে দিয়েছিলো। এ কারণে তারা সঙ্গত কারণেই আশা করেছিলো যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত যুদ্ধ সমাপ্তির হিসেবে প্রমাণিত হবে। তারা বললেন, আমরা আমাদের কওমকে এমন অবস্থায় রেখে এসেছি যে, তারা শত্রু পরিবেষ্টিত। অন্য কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ ধরনের শত্রুতা আছে বলে মনে হয় না। আমরা আশা করি যে, আপনার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন সৃষ্টি করবেন। মদীনায় ফিরে গিয়ে আমরা তাদেরকে আপনার প্রচারিত দ্বীনের পথে আহ্বান জানাবো। আমরা আপনার কাছ থেকে যে দ্বীন গ্রহণ করেছি, এই দ্বীন গ্রহণ করার জন্যে তাদেরও দাওয়াত দেবো। যদি আল্লাহ তায়ালা আপনার মাধ্যমে তাদের ঐক্যবদ্ধ করেন, তবে আপনার চেয়ে সম্মানিত অন্য কেউই হবে না।

এই ছয়জন নও মুসলিম মদীনায় ফিরে যাওয়ার সময় ইসলামের দাওয়াত সাথে নিয়ে গেলেন। এদের মাধ্যমে মদীনার ঘরে ঘরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাব ও দ্বীনের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়লো।[১৩]

---

১১. রহমাতুল লিল আলামিন, ১ম খন্ড পৃঃ ৮৪

১২. যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃঃ ৫০, ইবনে সালাম ১ম খন্ড, পৃঃ ৪২৯-৫৪১

১৩. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪২৮-৪৪৩

হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে বিয়ে

সেই বছরেই অর্থাৎ নবুয়তের একাদশ বর্ষের শাওয়াল মাসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হযরত আয়েশার বয়স ছিলো তখন মাত্র ছয় বছর। হিজরতের আগের বছর শাওয়াল মাসে হযরত আয়েশা (রা.) স্বামী গৃহে গমন করেন। সেই সময় তাঁর বয়স ছিলো নয় বছর।[১৪]

মেরাজ-এর ঘটনা

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত ও তাবলীগের সাফল্য এবং তাঁর এবং ইসলামের অনুসারীদের প্রতি অত্যাচার নির্যাতন মাঝামাঝি পর্যায়ে চলছিলো, দূর দিগন্তে মিটিমিটি জ্বলছিলো তারার আলো, এমনি সময়ে মেরাজের রহস্যময় ঘটনা ঘটলো। এই মেরাজ কবে সংঘটিত হয়েছিলো? এ সম্পর্কে সীরাত রচয়িতাদের মতামতের বিভিন্নতা রয়েছে। যেমন—

এক) তিবরানি বলেছেন, যে বছর নবী সাইয়েদুল মুরসালিনকে নবুয়ত দেয়া হয়, সে বছরই।
দুই) ইমাম নববী এবং ইমাম কুরতুবী লিখেছেন, নবুয়তের পাঁচ বছর পর।
তিন) হিজরতের ১৬ মাস আগে অর্থাৎ নবুয়তের দ্বাদশ বছরে রমযান মাসে।
চার) নবুয়তের দশম বর্ষে ২৭শে রযবে । আল্লামা মনসুরপুরী এ অভিমত গ্রহণ করেছেন।
পাঁচ) হিজরতের এক বছর দুই মাস আগে। অর্থাৎ নবুয়তের ত্রয়োদশ বর্ষের মহররম মাসে।
ছয়) হিজরতের এক বছর আগে অর্থাৎ নবুয়তের ত্রয়োদশ বর্ষের রবিউল আউয়াল মাসে।

উল্লিখিত বক্তব্যসমূহের মধ্যে তিনটি বক্তব্যকে সঠিক বলে মেনে নেয়া যায়। পাঞ্জেগানা নামায ফরয হওয়ার আগে হযরত খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকাল হয়েছিলো আর এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, পাঞ্জেগানা নামায মেরাজের রাতে ফরয করা হয়। এর অর্থ হচ্ছে যে, হযরত খাদিজার মৃত্যু মেরাজের আগেই হয়েছিলো। তাঁর মৃত্যু নবুয়তের দশম বর্ষের রমযান মাসে হয়েছিলো বলে জানা যায়। কাজেই মেরাজের ঘটনা এর পরেই ঘটেছে, আগে নয়। শেষোক্ত তিনটি বক্তব্যের কোনটিকে কোনটির ওপর প্রাধান্য দেয়ার মতো, তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কোরআন হাদীসে বর্ণিত এ সম্পর্কিত বিবরণ উল্লেখ করবো।[১]

ইবনে কাইয়েম লিখেছেন, সঠিক বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় যে, নবী সাইয়েদুল মুরসালিনকে স্বশরীরে বোরাকে তুলে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সঙ্গে মসজিদে হারাম থেকে প্রথমে বায়তুল মাকদেস পর্যন্ত ভ্রমণ করানো হয়। প্রিয় নবী সেখানে মসজিদের দরজার খুঁটির সাথে বোরাক বেঁধে যাত্রা বিরতি করেন এবং সকল নবীর ইমাম হয়ে নামায আদায় করেন।

এরপর সেই রাতেই তাঁকে বায়তুল মাকদেস থেকে প্রথম আসমানে নিয়ে যাওয়া হয়। হযরত জিবরাঈল (আ.) দরজা খোলেন। প্রিয় নবী সেখানে হযরত আদম (আ.)-কে দেখে সালাম করেন। হযরত আদম (আ.) তাঁকে মারহাবা বলে সালামের জবাব দেন। তাঁর নবুয়তের স্বীকারোক্তি করেন। সে সময় আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ.)-এর ডানদিকে নেককার এবং বামদিকে পাপীদের রূহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখান। এরপর তিনি দ্বিতীয় আসমানে যান। দরজা খুলে দেয়া হয়। প্রিয় নবী সেখানে হযরত ইয়াহিয়া ইবনে যাকারিয়া (আ.) এবং হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.)-কে দেখে সালাম করেন। তাঁরা সালামের জবাব দিয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তের কথা স্বীকার করেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর যান চতুর্থ আসমানে। সেখানে তিনি হযরত ইদরিস (আ.)-কে

---

১৪. তালকিহুল হুকুম, পৃঃ ১০, সহীহ বোখারী ১ম খন্ড, পৃঃ ৫৫৭

১. যাদুল মায়াদ ২য় খন্ড পৃঃ ৪৯

দেখে সালাম করেন। তিনি সালামের জবাবে তাকে মোবারকবাদ দেন এবং তাঁর নবুয়তের কথা স্বীকার করেন।

এরপর তাঁকে পঞ্চম আসমানে নেয়া হয়। সেখানে তিনি হযরত হারুন (আ.)-কে দেখে সালাম দেন। তিনি সালামের জবাবে মোবারকবাদ দেন এবং তাঁর নবুয়তের কথা স্বীকার করেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরপর নেয়া হয় ষষ্ঠ আসমানে। সেখানে হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি সালাম করেন। হযরত মূসা (আ.) মারহাবা বলেন এবং নবুয়তের কথা স্বীকার করেন। নবী মুরসালিন সামনে অগ্রসর হলেন, এ সময় হযরত মূসা (আ.) কাঁদতে লাগলেন। এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, একজন নবী যিনি আমার পরে আবির্ভূত হয়েছেন তার উম্মতেরা আমার উম্মতদের চেয়ে সংখ্যায় বেশী বেহেশতে যাবে।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর নিয়ে যাওয়া হয় সপ্তম আসমানে। সেখানে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর সাথে তাঁর দেখা হয়। তিনি তাঁকে সালাম করেন। তিনি জবাব দেন, মোবারকবাদ দেন এবং তাঁর নবুয়তের কথা স্বীকার করেন।

এবার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেদরাতুল মুনতাহা'য় নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি আল্লাহর এতো কাছাকাছি পৌঁছেন যে, উভয়ের মধ্যে দুটি ধনুক বা তারও কম ব্যবধান ছিলো। সেই সময় আল্লাহ তায়ালা তার যা কিছু দেয়ার দিয়ে দেন, যা ইচ্ছা ওহী নাযিল করেন এবং পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায ফরয করেন। ফেরার পথে হযরত মুসা (আ.)-এর সাথে দেখা হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আল্লাহ তায়ালা আপনাকে কি কাজের আদেশ দিয়েছেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামায আদায়ের আদেশ দিয়েছেন। হযরত মূসা (আ.) বললেন, আপনার উম্মত এতো নামায আদায় করার শক্তি রাখে না। আপনি আল্লাহর কাছে ফিরে গিয়ে নামায কমিয়ে দেয়ার আবেদন করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর দিকে তাকালেন, তিনি ইশারা করলেন। এরপর ফিরে গিয়ে নামাযের সংখ্যা কমিয়ে দেয়ার আবেদন জানালেন। হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে আবার ফেরার পথে দেখা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহর কাছ থেকে কি আদেশ নিয়ে যাচ্ছেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পঁয়তাল্লিশ ওয়াক্ত নামাযের কথা বললেন। হযরত মূসা (আ.) বললেন, আপনি ফিরে যান, এমনি করে বারবার ফিরে যাওয়ার এবং নামায কম করার হার একপর্যায়ে সংখ্যা দাঁড়ালো পাঁচ। এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযও হযরত মূসা (আ.) বেশী মনে করলেন এবং আরো কমিয়ে আনার আবেদন জানানোর জন্যে ফিরে যেতে বললেন। হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার ভীষণ লজ্জা লাগছে, আমি আর যেতে চাই না। আমি আল্লাহর এই আদেশের ওপরই মাথা নত করলাম। ফেরার পথে কিছুদূর আসার পর আওয়ায হলো, আমি আমার ফরয নির্ধারণ করে দিয়েছি এবং আমার বান্দাদের জন্যে কমিয়ে দিয়েছি।[২]

আল্লামা ইবনে কাইয়েম এ সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন যে, নবী কি আল্লাহ তায়ালাকে দেখেছেন? ইমাম ইবনে তাইমিয়া লিখেছেন, চোখে দেখার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি, কোন সাহাবী এ কথা বর্ণনাও করেননি। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে চোখ এবং অন্তর দ্বারা দেখার যে কথা উল্লেখ রয়েছে, তার মধ্যে প্রথম বর্ণনা দ্বিতীয় বর্ণনার বিপরীত নয়। ইমাম ইবনে কাইয়েম যে নৈকট্য এবং নিকটতর হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, এটি মেরাজের সময়ের চেয়ে ভিন্ন সময়ের কথা। সূরা নাজম-এ হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর নৈকট্যের কথা উল্লেখ রয়েছে। হযরত আয়েশা (রা.) সে কথাই বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে

---

২. যাদুল মায়াদ ২য় খন্ড, ৪৭-৪৮

মে'রাজের হাদীসে যে নৈকট্যের কথা বলা হয়েছে, সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, এটা আল্লাহরই নৈকট্য। সূরা নাজম–এ এ সম্পর্কে কোন ব্যাপক আলোচনা নেই। বরং সেখানে বলা হয়েছে যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দ্বিতীয়বার 'সেদরাতুল মোনতাহা'র কাছে দেখেছেন। যাঁকে দেখেছেন তিনি জিবরাঈল (আ.)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত জিবরাঈলকে তার আসল চেহারায় দু'বার দেখেছেন। একবার পৃথিবীতে এবং অন্যবার 'সেদরাতুল মুনতাহা'র কাছে।[৩]

এ সময়েও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের 'শাককুস সদর' বা সিনা চাক-এর ঘটনা ঘটেছিলো। এ সফরের সময় তাঁকে কয়েকটি জিনিস দেখানো হয়েছিলো। তাঁকে দুধ এবং মদ দেয়া হয়েছিলো। তিনি দুধ গ্রহণ করলেন। এটা দেখে হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, আপনাকে ফেতরাত বা স্বভাবের ফল দেখানো হয়েছে। যদি আপনি মদ গ্রহণ করতেন তবে আপনার উম্মত পথভ্রষ্ট হয়ে যেতো।

আল্লাহর রসূল ৪টি নহর দেখলেন। ৪টি যাহেরী, আর ৪টি বাতেনী। প্রকাশ্য নহর ছিলো নীল এবং ফোরাত। এর তাৎপর্য সম্ভবত এই যে, তার রেসালত নীল এবং ফোরাত সজীব এলাকা সমূহে বিস্তার লাভ করবে। অর্থাৎ এখানের অধিবাসীরা বংশ পরম্পরায় মুসলমান হবে। এমন নয় যে, এ দু'টি নহরের পানির উৎস জান্নাতে রয়েছে।

জাহান্নামের দারোগা মালেককে তিনি দেখলেন। তিনি হাসেন না, তার চেহারায় হাসিখুশীর কোন ছাপও নেই। আল্লাহর রসূলকে বেহেশত এবং দোযখও দেখানো হলো।

এতিমের ধনসম্পদ যারা অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের অবস্থাও দেখানো হয়। তাদের ঠোঁট ছিলো উটের ঠোঁটের মতো। তারা নিজেদের মুখে পাথরের টুকরোর মতো অঙ্গার প্রবেশ করাচ্ছে আর সেই অঙ্গার তাদের গুহ্যদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদখোরদেরও দেখেছিলেন। তাদের ঠোঁট এতো বড় ছিলো যে, তারা নড়াচড়া করতে পারছিলো না। ফেরাউনের অনুসারীদের জাহান্নামে নেয়ার সময় তারা এসব সুদখোরকে মাড়িয়ে যাচ্ছিলো।

যেনাকারীদেরও তিনি দেখেছিলেন। তাদের সামনে তাজা গোশত এবং দুর্গন্ধময় পচা গোশত ছিলো। অথচ তারা তাজা গোশত রেখে পচা গোশত খাচ্ছিলো।

যেসব নারী স্বামী থাকা সত্তেও নিজ গর্ভে অন্য পুরুষের সন্তান ধারণ করেছিলো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরও দেখেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লক্ষ্য করলেন যে, ওসব মহিলার বুকে বড় বড় কাঁটা বিঁধিয়ে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

তিনি মক্কার একটি কাফেলাকে দেখেছিলেন। সেই কাফেলার একটি উট পালিয়ে গিয়েছিলো তিনি তাদেরকে সেই উটের সন্ধান বলে দিয়েছিলেন। ঢেকে রাখা পাত্রে পানি ছিলো, তিনি সেই পানি থেকে পান করেছিলেন। সে সময় কাফেররা সকলে ঘুমোচ্ছিলো। মেরাজের রাতের পরদিন সকালে এই বিবরণ তাঁর দাবীর সত্যতার একটি প্রমাণ হয়েছিলো।[৪] বলে দিলেন যে, অমুক সময়ে সেই কাফেলা ফিরে আসবে। কাফেলা থেকে পালিয়ে যে উটটি মক্কার দিকে আসছিলো তিনি সেই উটটির বিবরণও পেশ করলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর বর্ণিত সব কথাই সত্য প্রমাণিত হলো। কিন্তু এতোকিছু সত্তেও কাফেরদের ঘৃণা আরো বেড়ে গেলো এবং তারা তার কথা মেনে

---

৩. যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড পৃঃ ৪৭, ৪৮ সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড পৃঃ ৫০, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৭০, ৪৭১, ৪৮১, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫০, ২য় খন্ড ৬৮৪, মুসলিম ১ম খন্ড পৃঃ ৯১, ৯২, ৯৩

৪. ইবনে হিশাম, ১ম, খন্ড, পৃঃ ৩৯। ৪০২, ৪০৬ তাফসীরের গ্রন্থাবলীতে সূরা বনি ইসরাইলের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

নিতে অস্বীকৃতি জানালো।[৫]

বলা হয়, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-কে নবীজী সেই সময়ই সিদ্দিক উপাধি দিয়েছিলেন। কেননা অন্য সবাই যখন অবিশ্বাস করেছিলো, তিনি তখন সব কিছুই বিশ্বাস করেছিলেন।[৬]

মেরাজের বিবরণ আল্লাহ তায়ালা কোরআনে করিমে উল্লেখ করেছেন।

নবীদের ব্যাপারে এটাই হচ্ছে আল্লাহর সুন্নত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'এবং এভাবেই আমি ইবরাহীমকে আসমান যমীনের রাজ্য ব্যবস্থাপনা দেখিয়েছি যাতে, সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।'

আল্লাহ তায়ালা হযরত মূসা (আ.)-কে বলেছিলেন, 'তাহলে আমি তোমাকে আমার বড় কিছু নিদর্শন দেখাব।'

এসব দেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে, তারা যেন বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে। এ কথাও আল্লাহ তায়ালা বলে দিয়েছেন। নবীরা আল্লাহর নিদর্শন সরাসরি প্রত্যক্ষ করায় তাদের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়। ফলে তারা আল্লাহর পথে মানুষকে দাওয়াত দিতে গিয়ে এমন সব দুঃখ এবং কষ্ট নির্যাতন নিপীড়ন সহ্য করতে পারেন, যা অন্য কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তাদের দৃষ্টিতে পার্থিব জগতের যাবতীয় শক্তিই মনে হয় তুচ্ছ। এ কারণে তারা কোন শক্তিকেই পরোয়া করেন না। মেরাজের ঘটনায় ছোটখাট বিষয় এবং এ ঘটনার প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে শরীয়তের বড় বড় কেতাবে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা যাচ্ছে।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আল্লাহ তায়ালা কোরআনে মাত্র একটি আয়াতে মেরাজের ঘটনা উল্লেখ করেই ইহুদীদের দুষ্কৃতির কথা বর্ণনা করেছেন। এরপর তাদের জানিয়েছেন যে, এই কোরআন সেই পথেরই হেদায়াত দিয়ে থাকে, যে পথ সঠিক এবং সরল। কোরআন পাঠকারীদের মনে হতে পারে যে, উভয় কথা সম্পর্কহীন, কিন্তু আসলে তা নয়। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বর্ণনাভঙ্গিতে এই ইশারাই দিয়েছেন যে, এখন থেকে ইহুদীদের মানব জাতির নেতৃত্বের আসন থেকে সরিয়ে দেয়া হবে। কেননা এইসব ইহুদী এমন ভয়াবহ অপরাধ করেছে যে, নেতৃত্বের যোগ্যতা তাদের আর নেই। কাজেই এই দায়িত্ব ও মর্যাদা এখন থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করা হবে এবং দুঃসাহসী দাওয়াতের উভয় কেন্দ্রকে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন করা হবে। অন্য কথায় বলা যায় যে, রূহানী নেতৃত্ব এক উম্মত থেকে অন্য উম্মতের কাছে স্থানান্তর করা হবে। যুলুম, অত্যাচার এবং বিশ্বাসঘাতকতায় কলঙ্কিত ইতিহাসের অধিকারী একটি উম্মতের কাছ থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নিয়ে এমন একটি উম্মতকে দেয়া হবে, যাদের মাধ্যমে কল্যাণের ঝর্ণাধারা উৎসারিত হবে। এই উম্মতের পয়গাম্বর ওহীর মাধ্যমে কোরআনে করিম পেয়েছেন। এই কোরআন মানব জাতিকে সর্বাধিক হেদায়াত দান করেছে।

কিন্তু এই নেতৃত্বের পূর্ণতা কিভাবে সাধিত হবে? ইসলামের নবী তো মক্কার পাহাড়ে লোকদের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এটি একটি প্রশ্ন। এই প্রশ্ন অন্য একটি সত্যের পর্দা উন্মোচন করছে। ইসলামের দাওয়াত একটা পর্যায় অতিক্রম করার কাছে পৌঁছেছে, বর্তমানে অন্য একটি পর্যায়ে প্রবেশ করবে। এই ধারা হবে অন্য ধারা থেকে ভিন্ন। এ কারণে দেখা যায় যে, কোন কোন আয়াতে পৌত্তলিকদের সুস্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এবং কঠোর হুমকি দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আমি যখন কোন জনপদ ধ্বংস করতে চাই, তখন তার সমৃদ্ধ

---

৫. যাদুল মায়াদ, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৮, এ ছাড়া দেখুন সহীহ বোখারী ২য় খন্ড, পৃঃ ৬৮৪, সহীহ মুসলিম ১ম খন্ড পৃঃ ৯৬, ইবনে হিশাম ১ম খন্ড, পৃঃ ৪০২, ৪০৩

৬. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃঃ ৩৯৯

ব্যক্তিদের সৎ কাজ করতে আদেশ করি, কিন্তু তারা সেখানে অসৎ কাজ করে। তারপর তাদের প্রতি দন্ড প্রদান ন্যায়সঙ্গত হয়ে যায় এবং আমি সেটা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি।' (সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ১৬)

আল্লাহ তায়ালা উক্ত সূরায় আরো বলেন, 'নূহের পর আমি কতো মানব গোষ্ঠী ধ্বংস করেছি। তোমার প্রতিপালকই তার বান্দাদের পাপাচারের সংবাদ রাখা এবং পর্যবেক্ষণের জন্যে যথেষ্ট।' (সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ১৭)

এ সকল আয়াতের পাশাপাশি এমন কিছু আয়াতও রয়েছে, যাতে মুসলমানদের ভবিষ্যত ইসলামী সমাজের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। তারা এমন এক ভূখন্ডে নিজেদের ঠিকানা তৈরী করেছে, যেখানে সবকিছু তাদের নিজের হাতে ন্যস্ত। উল্লিখিত আয়াতে এমন ইশারা রয়েছে যে, আল্লাহর রসূল শীঘ্রই এমন নিরাপদ জায়গা পেয়ে যাবেন, যেখানে দ্বীন ইসলাম যথাযথভাবে প্রচার ও প্রসার লাভ করবে।

মেরাজের রহস্যময় ঘটনার এমন সব বিষয় রয়েছে, যার সাথে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সরাসরি সম্পর্ক বিদ্যমান। এ কারণে সেসব বর্ণনা করা দরকার। আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, মে'রাজের ঘটনা হয়তো বাইয়াতে আকাবার কিছুকাল আগে ঘটেছিলো অথবা প্রথম ও দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবার মাঝামাঝি সময়ে ঘটেছিলো। আল্লাহ তায়ালাই সব কিছু ভালো জানেন।

প্রথম বাইয়াতে আকাবা

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবুয়তের দশম বর্ষে হজ্জ মওসুমে ইয়াসরেবের ছয়জন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারা আল্লাহর রসূলের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, নিজেদের কওমের কাছে ফিরে গিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেসালাতের তাবলীগ করবেন।[১]

এর ফলে পরবর্তী হজ্জ মওসুমে ১৩ জন লোক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসেন। এদের মধ্যে জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ছাড়া অন্য ৫ জন ছিলেন, যারা গত বছরও এসেছিলেন। এরা ছাড়া বাকি সাত জনের নাম পরিচয় নিম্নরূপ।

ক্রমিক	নাম	গোত্র
১.	মায়া'য ইবনে হারেস ইবনে আফরা	বনি নাজ্জার, খাযরাজ
২.	যাকওয়ান ইবনে আবদুল কয়েস	বনি যুরাইক, খাযরাজ
৩.	ওবাদা ইবনে সামেত	বনি গানাম, খাযরাজ
৪.	ইয়াযিদ ইবনে ছা'লাবা	বনি গানামের মিত্র, খাযরাজ
৫.	আব্বাস ইবনে ওবাদা ইবনে নাযলাহ	বনি সালেম, খাযরাজ
৬.	আবুল হায়ছাম ইবনে তাইহান	বনি আবদে আশহাল, আওস
৭.	ওয়াইম ইবনে সায়েদাহ	বনি আমর ইবনে আওফ, আওস।

১ সংকীর্ণ গিরিপথকে বলা হয় আকাবা। মক্কা থেকে মিনায় আসার পথে মিনায় পশ্চিম পাশে একটি সংকীর্ণ পাহাড়ী পথ অতিক্রম করতে হয়। এই গিরিপথ আকাবা নামে বিখ্যাত। দশই যিলহজ্জ তারিখে যে জামরাতে কংকর নিক্ষেপ করা হয় তা এ সুড়ঙ্গ পথের মাথায় অবস্থিত বলে একে জামরায়ে আকাবা বলা হয়। এর দ্বিতীয় নাম জামরায়ে কুবরা। অন্য দুটি জামরা এ স্থান থেকে কিছু পূর্ব দিকে। মিনা ময়দান এ তিনটি জামরার পূর্ব দিকে। এ কারণে জনসমাগম এদিকে লেগেই থাকে। পাথর নিক্ষেপের পর এদিকে আর লোক চলাচল থাকে না। তাই নবী করিম রসূলুল্লাহ (সঃ) যে বাইয়াত করেন, এ বলা হয় বাইয়াতে আকাবা। বর্তমানে এখানে পাহাড় কেটে প্রশস্ত রাস্তা তৈরী করা হয়েছে।

এদের মধ্যে শেষোক্ত দু'জন ছিলেন আওস এবং বাকি সবাই খাযরাজ গোত্রের।[২]

এরা সবাই মিনায় আকাবার কাছে আল্লাহর রসূলের কাছে কয়েকটি বিষয়ে বাইয়াত নেন। পরবর্তীতে হোদায়বিয়ার সন্ধির পর এবং মক্কা বিজয়ের সময়ে এইসব কথার ওপরেই মহিলাদের কাছ থেকেও বাইয়াত গ্রহণ করা হয়। আকাবার এই বাইয়াতের বিবরণ বোখারী শরীফে ওবাদা ইবনে সামেতের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'এসো, আমার কাছে এ মর্মে বাইয়াত করো যে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবে না, চুরি করবে না, যেনা করবে না, নিজের সন্তানকে হত্যা করবে না, মনগড়া কোন অপবাদ কারো ওপর দেবে না, ভালো কাজে আমার অনুসরণ করবে, কোন প্রকার অবাধ্যতা করবে না। যে ব্যক্তি এসব কিছু পালন করবে, তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে। আর যে ব্যক্তি এসব বিষয়ের কোন কিছু অমান্য করবে, যদি তাকে সেই অবাধ্যতার জন্যে শাস্তি দেয়া হয় তবে তার শাস্তি তার পাপের কাফফারা হবে। যদি কেউ অবাধ্যতা সত্তেও আল্লাহ যদি তার পাপ গোপন রাখেন তাহলে তার কাজের পরিণাম আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। তিনি ইচ্ছে করলে শাস্তি অথবা ক্ষমা করে দেবেন।

হযরত ওবাদা বলেন, এসব বিষয়ে আমরা আল্লাহর রসূলের কাছে বাইয়াত গ্রহণ করলাম।[৩]

মদীনায় রসূলের দূত ও তার ঈর্ষণীয় সাফল্য

বাইয়াত শেষ হয়ে গেলো এবং হজ্জ ও শেষ হলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগত লোকদের সাথে মদীনায় তাঁর প্রথম দূত পাঠালেন। মুসলমানদের ইসলামের শিক্ষা প্রদান এবং যারা এখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি তাদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত প্রদানই ছিলো এই দূত প্রেরণের উদ্দেশ্য। প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণকারী যুবক মসআব ইবনে ওমায়ের আবদারি (রা.)-কে আল্লাহর রসূল মদীনায় প্রেরণ করেন।

হযরত মসআব ইবনে ওমায়ের (রা.) মদীনায় পৌঁছে হযরত আসআদ ইবনে যুরারা (রা.)-এর ঘরে অবস্থান করেন। এরপর উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে উভয়ে মদীনাবাসীদের ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন। এ সময় হযরত মসআব 'মুকরিউন' উপধি লাভ করেন। এর অর্থ শিক্ষক বা মোয়াল্লেম।

দ্বীনের তাবলীগ করার ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্যের একটি বিস্ময়কর ঘটনা রয়েছে। যোরারাকে সঙ্গে নিয়ে একদিন বনি আবদুল আশহাল এবং বনি যোফরের মহল্লায় যান। সেখানে বনি যোবায়ের একটি বাগানে মারক নামে একটি জলাশয়ের কিনারায় বসেন। তাদের কাছে কয়েকজন মুসলমানও সমবেত হন। বনি আশহাল গোত্রের সর্দার ছিলেন সা'দ ইবনে মায়া'য এবং উছায়েদ ইবনে খোযায়ের। তারা তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। তারা নবাগত মুসলমানদের আগমনের খবর পেলেন। হযরত সা'দ অপর সর্দার উছায়েদ ইবনে খোযায়েরকে বললেন, তুমি গিয়ে দেখে এসো, ব্যাপারটা কি। ওদের বলবে যে, তোমরা কি আমাদের দুর্বল লোকদের বেকুব বানাতে চাও। তাদের ধমক দেবে এবং আমাদের মহল্লায় আসতে নিষেধ করবে। আসয়া'দ ইবনে যোরারা আমার খালাতো ভাই, এ কারণেই তোমাকে পাঠাচ্ছি, না হলে আমি নিজেই যেতাম।

উছায়েদ নিজের বর্শা তুলে উভয়ের কাছে গেলেন। হযরত আসয়া'দ তাকে আসতে দেখে হযরত মসআবকে বললেন, কওমের একজন সর্দার তোমার কাছে আসছে। তার ব্যাপারে

---

২. রহমতুল লিল আলামিন, ১ম খন্ড, পৃঃ ৮৫, ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৩১-৪৩৩

৩. বোখারী, ১ম খন্ড, পৃঃ ৫৫০, ৫৫১।

আল্লাহর রহমত মনে মনে কামনা করো। হযরত মসআব বললেন, তিনি যদি বসেন তবে আমি তার সাথে কথা বলব। উছায়েদ পৌঁছেই ক্ষেপে গেলেন। বললেন, আপনারা কেন আমাদের এলাকায় এসেছেন? আপনারা কি আমাদের দুর্বল লোকদের বোকা বানাতে চান? প্রাণের মায়া থাকলে কেটে পড়ুন। হযরত মসআব বললেন, আপনি আমাদের কাছে বসুন। কিছু কথা শুনুন। পছন্দ হলে গ্রহণ করবেন, পছন্দ না হলে করবেন না। হযরত উছায়েদ বললেন, কথা তো ঠিকই। এরপর তিনি নিজের বর্শা মাটিতে পুঁতে বসে পড়লেন। হযরত মসআব (রা.) ইসলামের কথা বলতে শুরু করলেন। কোরআন তেলাওয়াত করলেন। পরে তিনি বলেছেন, উছায়েদ কিছু বলার আগেই আমি তার চেহারায় ইসলামের চমক লক্ষ্য করেছি। সব কথা শুনে উছায়েদ বললেন, কথা তো খুব ভালো। আপনারা কাউকে ইসলামে কিভাবে দীক্ষিত করেন? মসআব বললেন, আপনাকে গোসল করে পাক কাপড় পরতে হবে। এরপর কালেমা তাইয়্যেবার সাক্ষ্য দিতে হবে এবং দু'রাকাত নামায আদায় করতে হবে। উছায়েদ সবই করলেন এরপর বললেন, আমাদের গোত্রে আরো একজন সর্দার রয়েছেন। তিনি যদি ইসলামে দীক্ষা নেন, তবে আমাদের গোত্রের আর কেউই বাদ থাকবে না। আমি তাকে এখনই আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছি।

এরপর হযরত উছায়েদ তার বর্শা নিয়ে সা'দ ইবনেময়া'য-এর কাছে গেলেন। সা'দ উছায়েদকে দেখে বললেন, এই লোকটি যে চেহারা নিয়ে গিয়েছিলো, তার চেয়ে অন্য রকম চেহারা নিয়ে ফিরে এসেছে। উছায়েদকে সা'দ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি করেছো? উছায়েদ বললেন, আমি তাদের সাথে আলাপ করেছি, কিন্তু আপত্তিকর কিছুই পাইনি। তবে আমি তাদের নিষেধ করেছি। তারা বলেছে, আপনারা যা চান, আমরা তাই করবো। আমি শুনেছি বনি হারেছা গোত্রের লোকেরা আসআদ ইবনে যোরারাকে হত্যা করতে চায়। এর কারণ হচ্ছে যে, তিনি আপনার খালাতো ভাই। ওরা আপনার সাথে করা অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে চায়। এ কথা শোনামাত্র সা'দ ক্রোধে অধীর হয়ে বর্শা হাতে ওদের কাছে পৌঁছুলেন। গিয়ে দেখেন দু'জনেই নিশ্চিন্তে বসে আছেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, উছায়েদ চেয়েছে যে, আমি দু'জন আগন্তুকের সাথে কথা বলি। সা'দ তাদের সামনে গিয়ে রুক্ষ ভাষায় বললেন, তোমরা আমাদের দুর্বল লোকদের বোকা বানাতে চাও? এরপর আসআদকে বললেন, খোদার কসম হে আবু আনাস, তোমার এবং আমার মধ্যে যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকতো, তবে তুমি এমন কাজ করতে পারতে না। আমাদের এলাকায় এসে তোমরা এমন কাজ করছো, যা আমাদের পছন্দনীয় নয়।

হযরত আসয়াদ হযরত মসআবকে আগেই বলেছিলেন যে, এমন একজন লোক আসছেন যিনি তার গোত্রের প্রভাবশালী নেতা। যদি তিনি তোমার কথা শোনেন, তবে তার পেছনে কেউ বাদ থাকবে না। এ কারণে হযরত মসআব হযরত সা'দকে বললেন, আপনি বসুন, কিছু কথা শুনুন। ভালো না লাগলে শুনবেন না। হযরত সা'দ বললেন, ঠিকই তো। একথা বলে তিনিও বর্শা মাটিতে পুঁতে বসে পড়লেন। হযরত মসআব তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং কোরআন তেলাওয়াত করলেন। হযরত মসআব পরে বলেছেন, সা'দ বলার আগেই আমি তার চেহারায় ইসলামের চমক লক্ষ্য করেছি। সা'দ বললেন, তোমরা ইসলাম গ্রহণের পর কি করো? মসআব বললেন, আপনি গোসল করুন, এরপর পাক কাপড় পরুন, এরপর কালেমা শাহাদাতের সাক্ষ্য দেবেন। তারপর দু'রাকাত নামায আদায় করবেন। তারপর সা'দ ইবনে ময়া'য তাই করলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর প্রাথমিক আনুষ্ঠানিকতা শেষে হযরত সা'দ নিজের গোত্রের লোকদের কাছে ফিরে গেলেন। লোকেরা বললো, আপনি ভিন্ন চেহারায় ফিরে এসেছেন মনে হচ্ছে। হযরত সা'দ বললেন, তোমরা আমাকে কেমন লোক মনে করো, হে বনি আবদুল আশহাল? সবাই বললো আপনি হচ্ছেন আমাদের নেতা। বুদ্ধি-বিবেচনার ক্ষেত্রে সবার চেয়ে বেশী। সা'দ ইবনে

মায়া'য বললেন, আচ্ছা তবে শোনো, তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলামীন এবং তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান না আনবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের সাথে কথা বলা আমার জন্যে হারাম। বিকেল পর্যন্ত গোত্রের নারী পুরুষ সবাই ইসলাম গ্রহণ করলেন। উসাইরেম নামে একজন লোক সে সময় ঈমান আনেননি। তিনি ওহুদের যুদ্ধের দিনে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধে অংশ নিয়ে শহীদ হন। তিনি কোন নামাযও আদায় করেননি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্পর্কে বলেছেন, অল্প আমল করে সে অনেক বেশী পুরস্কার পেয়েছে।

হযরত মসআব ও হযরত আসআদ ইবনে যোরারার ঘরে অবস্থান করেই ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করেন। এই দাওয়াতে আনসারদের প্রত্যেক পরিবারেই কয়েকজন করে নারী-পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করলেন। পরবর্তী হজ্জ মৌসুমে আসার আগে হযরত মসআব ইবনে ওমায়ের (রা.) সাফল্যের সুসংবাদ নিয়ে আল্লাহর রসূলের কাছে মক্কায় হাযির হন। তিনি প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ইয়াসরেবের গোত্রসমূহের অবস্থা, তাদের যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষার কৌশল এবং অন্যান্য যোগ্যতা সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য পেশ করেন।[৪]

দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবা

নবুয়তের ত্রয়োদশ বর্ষে ৬২২ ঈসায়ী সালের জুন মাসে মদীনা থেকে ৭০ জন মুসলমান হজ্জ পালনের জন্যে মক্কায় আগমন করেন। এরা নিজ কওমের পৌত্তলিক হাজীদের সঙ্গে মক্কায় আসছিলেন। মদীনায় থাকার সময়েই অথবা মক্কায় আসার পথে তারা পরস্পরকে বললেন, কতোদিন পর্যন্ত প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমরা মক্কায় এভাবে কষ্টকর অবস্থায় ফেলে রাখবো? তিনি মক্কায় যেভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন, সে সম্পর্কেও তারা আলোচনা করলেন।

মক্কায় পৌঁছার পর গোপনে তারা প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গোপনে যোগাযোগ করলেন এবং সিদ্ধান্ত হলো যে, উভয় দল আইয়ামে তাশরিকের মাঝামাঝি[৫] ১২ই জিলহজ্জ তারিখে মিনার জামারায়ে উলায় অর্থাৎ জামরায়ে আকাবার ঘাঁটিতে একত্রিত হয়ে রাতের অন্ধকারে গোপন আলোচনা করবেন।

এই সম্মেলন ইসলাম ও মূর্তিপূজার সংঘাতের মধ্যে সময়ের গতিধারা পরিবর্তন করে দিয়েছিলো। একজন আনসার নেতার মুখে সেই সম্মেলনের বিবরণী উল্লেখ করা যাচ্ছে।

হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) বলেন, আমরা হজ্জ এর জন্যে বেরিয়েছিলাম। প্রিয় নবী আইয়ামে তাশরিকের মাঝে আকাবায় আমাদের সাথে কথা বলার সময় নির্ধারণ করলেন। অবশেষে, সেই রাত এলো, যে রাতে কথা বলার তারিখ ছিলো। আমাদের সাথে আমাদের সম্মানিত নেতা আবদুল্লাহ ইবনে হারামও ছিলেন। তিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। আমরা তাকে সঙ্গে নিলাম। আমাদের সঙ্গী অমুসলিমদের কাছে এই সম্মেলনের বিষয় গোপন রাখা হয়েছিলো। আবদুল্লাহ ইবনে হারামের সাথে আমরা আলোচনা করে তাকে বললাম, হে আবু জাবের আপনি আমাদের একজন সম্মানিত নেতা। আপনার বর্তমান অবস্থা থেকে আমরা আপনাকে বের করতে চাই। অনন্তকাল দোযখের আগুন থেকে আপনি মুক্তি লাভ করবেন এটাই আমরা চাই। এরপর আমরা তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দিলাম এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমাদের আলোচনার বিষয় তাঁকে জানালাম। তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন

৪. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৩৫ ২য় খন্ড পৃ. ৯০, যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ৫১

৫. জিলহজ্জ মাসের ১১, ১২,১৩ তারিখকে আইয়ামে তাশরিক বলা হয়।

এবং আমাদের সাথে আকাবায় গেলেন। তাঁকে নকিব মনোনীত করা হলো।[১]

হযরত কা'ব (রা.) ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে বলেন, সেই রাতে আমরা নিয়ম অনুযায়ী আমাদের ডেরায় শুয়ে পড়লাম। রাতের এক তৃতীয়াংশ কেটে যাওয়ার পর আল্লাহর রসূলের সাথে পূর্ব নির্ধারিত জায়গায় মিলিত হলাম। চড়ুই পাখী যেমন চুপিসারে তার বাসা থেকে বের হয়, আমরাও ঠিক সেভাবেই ডেরা থেকে বের হয়েছিলাম। এক সময় আমরা আকাবায় সমবেত হলাম। সংখ্যায় ছিলাম আমরা ৭৫ জন। ৭৩ জন পুরুষ এবং ২ জন মহিলা। দুইজন হচ্ছেন বনু মাজেন ইবনে নাজ্জার গোত্রের উম্মে আম্মারা নাছিবা বিনতে কা'ব এবং বনু সালমা গোত্রের উম্মে মানীঈ আসমা বিনতে আমর।

আমরা সবাই ঘাঁটিতে পৌঁছে প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। এক সময় তিনি এসে পৌঁছুলেন। তাঁর সাথে তাঁর চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালেব ছিলেন। তিনি তখনো যদিও ইসলাম গ্রহণ করেননি, তবুও ভ্রাতুষ্পুত্রের হিতাকাঙ্খী ছিলেন। সর্বপ্রথম কথা বার্তা তিনিই শুরু করেন।[২]

পরিস্থিতির নাজুকতা ব্যাখ্যা

সম্মেলন শুরু হলো। দ্বীনী এবং সামরিক সহায়তাকে চূড়ান্ত রূপ দিতে আলোচনা শুরু হলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আব্বাস প্রথমে কথা বললেন। তিনি চাচ্ছিলেন যে, পরিস্থিতির আলোকে দায়িত্বের গুরুত্বের প্রতি আলোকপাত করবেন। সেই গুরুদায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত হতে যাচ্ছিলো, তাদের সম্বোধন করে তিনি বললেন, মোহাম্মদ মোস্তফার যে মূল্য ও মর্যাদা রয়েছে, সেটা তোমরা জানো। আমাদের কওমের মধ্যে মোহাম্মদ প্রবর্তিত ধর্ম বিশ্বাস যারা সমর্থন করে না, মোহাম্মদকে তাদের কাছ থেকে আমরা দূরে রেখেছি। নিজ শহরে স্বজাতীয়দের মধ্যে তিনি নিরাপদে রয়েছেন। তিনি বর্তমানে তোমাদের কাছে যেতে চান। তোমাদের সাথে মিশতে চান, যদি তোমরা তাঁর নিরাপত্তা দিতে এবং বিরোধী পক্ষের হামলা থেকে তাঁকে হেফাযত করতে পারো তবে কিছু বলার নেই। তোমরা যে দায়িত্ব নিয়েছো, সে সম্পর্কে তোমরাই ভালো জানো। কিন্তু যদি তাঁকে ছেড়ে যাওয়ার চিন্তা করে থাকো, তবে এখনই চলে যাও। কেননা তিনি স্বজাতীয়দের মধ্যে নিজ শহরে নিরাপদেই রয়েছেন। তাঁর সম্মানও এখানে রয়েছে।

হযরত কা'ব (রা.) বলেন, আমরা হযরত আব্বাসকে বললাম যে, আপনার কথা আমরা শুনেছি। 'হে আল্লাহর রসূল, এবার আপনি কথা বলুন। আপনি নিজের এবং আপনার প্রতিপালকের জন্যে আমাদের কাছ থেকে যে অঙ্গীকার নিতে চান, তাই নিন।'[৩]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথা শুরু করলেন। তিনি প্রথমে কোরআন তেলাওয়াত করলেন। আল্লাহর প্রতি দাওয়াত দিলেন। এরপর বাইয়াত হলো।

বাইয়াতের দফাসমূহ

বাইয়াতের ঘটনা ইমাম আহমদ হযরত জাবের (রা.) থেকে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। হযরত জাবের (রা.) বলেন, আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল, আমরা আপনার কাছে কি কি বিষয়ের ওপর বাইয়াত করবো? তিনি বললেন, নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর ওপর।

১. ভালোমন্দ সকল অবস্থায় আমার কথা শুনবে এবং মানবে।

২. স্বচ্ছলতা অস্বচ্ছলতা উভয় অবস্থায়ই ধন-সম্পদ ব্যয় করবে।

---

১. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪৪০

২ ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৪০-৪৪১

৩. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৪১-৪৪২

৩. সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে।
৪. আল্লাহর পথে উঠে দাঁড়াবে এবং আল্লাহর ব্যাপারে কারো ভয়ভীতি প্রদর্শনে পিছিয়ে যাবে না।
৫. তোমাদের কাছে যাওয়ার পর আমাকে সাহায্য করবে এবং নিজেদের প্রাণ ও সন্তানদের হেফাযতের মতোই আমার হেফাযত করবে এতে তোমাদের জন্যে জান্নাত রয়েছে।[৪]

ইবনে ইসহাক উল্লেখিত হযরত কা'ব এর বর্ণনা শুধু পঞ্চম দফায় উল্লেখ রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোরআন তেলাওয়াত দ্বারা আল্লাহর প্রতি দাওয়াত এবং ইসলামের প্রতি তাকিদ দিয়ে বললেন, আমি তোমাদের কাছে এ মর্মে বাইয়াত নিচ্ছি যে, তোমরা যে জিনিস দ্বারা নিজেদের সন্তানদের হেফাযত করে থাকো, সেই জিনিস দিয়ে আমারও হেফাযত করবে। এ কথা শুনে হযরত কাব ইবনে মা'রুর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত ধরে বললেন, হাঁ, সেই জাতের শপথ, যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসাবে প্রেরণ করেছেন, আমরা অবশ্যই সেই জিনিস দ্বারা আপনার হেফাযত করবো, যা দ্বারা নিজেদের সন্তানদের হেফাযত করি। কাজেই হে আল্লাহর রসূল, আপনি আমাদের কাছে বাইয়াত নিন। খোদার কসম, আমরা যুদ্ধের পুত্র, (অর্থাৎ যুদ্ধের ছায়ায় আমরা জন্ম লাভ করেছি), হাতিয়ার হচ্ছে আমাদের খেলনা এবং পূর্বপুরুষের সময় থেকেই এ অবস্থা চলে আসছে।

হযরত কা'ব বলেন, তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলছিলেন, এমন সময় আবুল তায়াহাল ইবনে তাইহান বললেন, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ইহুদীদের সাথে চুক্তি রয়েছে, আমরা তার রজ্জু কেটে ফেলবো। আমরা ইহুদীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলাম, এরপর আল্লাহ তায়ালা আপনাকে জয়যুক্ত করলে আপনি আমাদের ছেড়ে স্বজাতীয়দের কাছে ফিরে আসবেন না তো?

এ কথা শুনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃদু হেসে বললেন না, তা হবে না তোমাদের রক্ত আমার রক্ত এবং তোমাদের ধ্বংস আমার ধ্বংস হিসাবে গণ্য হবে। আমি তোমাদের অন্তর্ভুক্ত, আর তোমরা আমার অন্তর্ভুক্ত। তোমরা যাদের সাথে যুদ্ধ করবে আমিও তাদের সাথে যুদ্ধ করবো, তোমরা যাদের সাথে সন্ধি করবে, আমিও তাদের সাথে সন্ধি করবো।

বাইয়াতের বিপজ্জনক অবস্থার বিবরণ

বাইয়াতের শর্তাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর উপস্থিত লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইয়াতের ইচ্ছা করলেন। এ সময় দু'জন মুসলমান উঠে দাঁড়ালেন। এরা নবুয়তের একাদশ ও দ্বাদশ বছরের মাঝামাঝির হজ্জের মৌসুমে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিত ভালোভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে চাইলেন। তারা চাচ্ছিলেন যে, বিষয়টির সব দিক যথাযথভাবে তুলে ধরে তারপর বাইয়াত করবেন। তারা এটাই জানতে এবং বুঝতে চাচ্ছিলেন যে, কওমের লোকেরা কতোটা আত্মত্যাগে প্রস্তুত রয়েছে।

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, লোকেরা বাইয়াতের জন্যে সমবেত হওয়ার পর হযরত আব্বাস ইবনে ওবাদা ইবনে নাযলা বললেন, তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে, তাঁর সাথে কিসের ব্যাপারে বাইয়াত করছো? সবাই বললেন, হাঁ জানি। হযরত আব্বাস বললেন, তোমরা কালো এবং লাল লোকদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে তাঁর হাতে বাইয়াত করছো। যদি তোমরা এরূপ মনে করে থাকো যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ব্যয়িত হলে এবং তোমাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা নিহত হলে তোমরা

৪. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল 'হাছান সনদের' সাথে এ বর্ণনা করেছেন। ইমাম হাকেম ও ইবনে হাব্বান বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন। ইবনে হিশাম ১ম খন্ড, দেখুন

তাকে পরিত্যাগ করবে তবে এখনই তাঁকে পরিত্যাগ করো। কেননা তাঁকে নিয়ে যাওয়ার পর নিসঙ্গ অবস্থায় পরিত্যাগ করা দুনিয়া ও আখেরাতের জন্যে অবমাননাকর হবে। যদি তোমরা মনে করো যে, ধন-সম্পদ কোরবানী দেয়ার পর নেতৃস্থানীয় লোকদের নিহত হওয়ার পরও তাঁর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পালন করবে, যেদিকে তোমাদের ডাকা হচ্ছে সেদিকে যাবে, তবে তোমরা তাঁকে নিয়ে নাও। আল্লাহর শপথ, এতে দুনিয়া এবং আখেরাতের কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে।[৫]

এসব কথা বলার পর সবাই সমস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, ধন-সম্পদ কোরবানী করবো এবং নেতৃস্থানীয় লোকদের নিহত হওয়ার ঝুঁকি নেবো কিন্তু বিনিময়ে আমরা কী পাব? আমরা আমাদের অঙ্গীকার যথাযথ পালন করবো, কিন্তু আমাদের বিনিময় কী হবে? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, জান্নাত। সবাই তখন হাত বাড়ালেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও হাত বাড়ালেন। বাইয়াত হয়ে গেলো।[৬]

হযরত জাবের (রা.) বলেন, সমবেত লোকের মধ্যে আসআদ ইবনে যোরারা ছিলেন সবচেয়ে কম বয়সের, আসআদ তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত ধরে বললেন, মদীনাবাসীরা একটু থামো। আমরা তাঁর কাছে উটের বুক শুকানো দূরত্ব অতিক্রম করে এ কারণেই হাযির হয়েছি, যেহেতু তিনি আল্লাহর রসূল। আজ তাঁকে মক্কা থেকে নিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে সমগ্র আরবের সাথে শত্রুতা, তোমাদের বিশিষ্ট নেতাদের নিহত হওয়া ও তলোয়ারের ঝনঝনানি। কাজেই এসব কিছু যদি সহ্য করতে পারো তবেই তাঁকে নিয়ে যাও। তোমাদের একাজের বিনিময় আল্লাহর কাছে রয়েছে। আর যদি নিজেদের প্রাণ তোমাদের কাছে প্রিয় হয়ে থাকে, তবে তাঁকে এখনই ছেড়ে দাও। এটা হবে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য ওযর।[৭]

বাইয়াতের পূর্ণতা

বাইয়াতের দফাসমূহ আগেই নির্ধারিত ছিলো। পরিস্থিতির গুরুতর অবস্থাও তুলে ধরা হয়েছে। এরপর অতিরিক্ত তাকিদ দেয়ায় সবাই সমস্বরে বললেন, আসআদ ইবনে যোরারা তোমার হাত সরাও। আল্লাহর শপথ, আমরা এই বাইয়াতকে ছাড়তেও পারি না, নষ্টও করতে পারি না।[৮]

এই জবাব পেয়ে হযরত আসআদ ভালোভাবে বুঝতে পারলেন যে, তার স্বজাতীয় লোকেরা দৃঢ়সংকল্প, তারা জীবন দিতে প্রস্তুত। মুসআব ইবনে ওমায়ের ছিলেন মদীনায় দ্বীনের বিশিষ্ট মোবাল্লেগ। এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই তারা ছিলেন বাইয়াতকারীদের ধর্মীয় নেতা। তাই সর্বপ্রথম আসআদ ইবনে যোরারা বাইয়াত করেন। ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, বনু নাজ্জার বলেছে, আবু উমাশা আসআদ ইবনে যোরারা প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন।[৯] এরপর অন্য সবাই বাইয়াত করেন। হযরত জাবের

---

৫. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৪২

৬. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৪৬

৭. মোসনাদে আহমদ

৮. মোসনাদে আহমদ

৯. ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, বনু আশহাল বলেছেন, সর্ব প্রথম আবুল হায়হাম ইবনে তায়হান বাইয়াত করেছেন, হযরত কা'ব ইবনে মালেক বলেন, সর্ব প্রথম বাইয়াত করেছিলেন বারা ইবনে মারুর। ইবনে হিশাম ১ম খন্ড, পৃ. ৪৪৭। আমার ধারণা, বাইয়াতের আগে আবুল হায়ছাম এবং বারার কথাকেই বাইয়াত বলে ধরা হয়েছে। অন্যথায় সে সময় সবার সামনে তো ছিলেন হযরত আসআদ ইবনে যোরারা। তাই তার নামই আগে বর্ণনা করার কথা।

(রা.) বলেন, আমরা একজন করে উঠলাম, আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের একজন কাছে বাইয়াত নিলেন। বিনিময়ে তিনি আমাদের জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন।[১০]

সেই সম্মেলনে উপস্থিত দু'জন মহিলা মৌখিকভাবে বাইয়াত করেছিলেন। প্রিয় রসূল কখনোই কোন অপরিচিতা মহিলার সাথে করমর্দন করেননি।[১১]

বারোজন নকীব ও তাদের নাম

বাইয়াত সম্পন্ন হওয়ার পর প্রিয় নবী প্রস্তাব করলেন যে, বারোজন নেতা মনোনীত করা হোক। এরা হবে তাদের কওমের নকীব। এরা বাইয়াতের শর্তাবলী নিজ নিজ কওমের লোকেদের দ্বারা পূরণ করার দায়িত্ব পালন করবে। প্রিয় নবী উপস্থিত লোকদেরই বারোজনের নাম জানাতে বললেন। তাঁর একথা বলার কিছুক্ষণের মধ্যেই ১২ জন নকীব মনোনীত করা হলো। এদের মধ্যে ৯ জন খাযরাজ ও ৩ জন আওস গোত্রের ছিলেন।

(১) আদআদ ইবনে যোরাবা ইবনে আদাছ, (২) সা'দ ইবনে রবিয়া ইবনে আমর (৩) আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা ইবনে সালাবাহ (৪) রাফে ইবনে মালেক ইবনে আযলান (৫) বারা ইবনে মারুর ইবনে ছাখার (৬) আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম (৭) ওবাদা ইবনে সামেত ইবনে কায়েস (৮) সা'দ ইবনে ওবাদা ইবনে অইম (৯) মুনযের ইবনে আমর খোনাইস। এরা ছিলেন খাযরাজ গোত্রের। যথা-

অন্যদিকে (১) উছায়েদ ইবনে খুজায়ের ইবনে ছাম্মাক (২) সা'দ ইবনে খায়ছামা ইবনে হারেছ (৩) রেফায়া ইবনে আবদুল মুনযের ইবনে যোবায়র ছিলেন আওস গোত্রের।[১২]

বারোজন নকীব নিযুক্ত হওয়ার পর তাদের কাছ থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় আরো একটি অঙ্গীকার নিলেন। কেননা এরা ছিলেন অধিক দায়িত্বশীল। তিনি বললেন, আপনারা স্বজাতীয়দের সকল বিষয়েরই জন্যেই দায়িত্বশীল ও যিম্মাদার। হাওয়ারিরা (১২ জন) হযরত ঈসা (আ.)-এর পক্ষ থেকে যেমন দায়িত্বশীল ও যিম্মাদার ছিলেন, আপনারাও ঠিক তেমনি। আমি মুসলমানদের পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল ও যিম্মাদার। সবাই সমস্বরে বললেন, জ্বী হাঁ।

শয়তান কর্তৃক চুক্তির তথ্য ফাঁস

চুক্তি সম্পূর্ণ হওয়ার পর সবাই চলে যাওয়ার উপক্রম করছিলেন এমন সময় শয়তান সম্মেলনের বিষয়ে জেনে গেলো। কোরায়শদের কাছে খবর পৌঁছানোর সময় ছিলো না। যদি পৌঁছাতো, তবে তারা সংঘবদ্ধভাবে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো। এ কারণে শয়তান উঁচু পাহাড় চূড়ায় উঠে উচ্চস্বরে বললো, মিনাবাসীরা, মোহাম্মদকে দেখো। বে-দ্বীন লোকেরা বর্তমানে তার সঙ্গে রয়েছে। তোমাদের সাথে লড়াই করার জন্যে তারা সমবেত হয়েছে।

প্রিয় নবী বললেন, ওটা হচ্ছে এই ঘাঁটির শয়তান। ওরে আল্লাহর দুশমন, শুনে রাখ, খুব শীঘ্রই আমি তোর জন্যে সময় পাচ্ছি। এরপর তিনি লোকদের বললেন, তারা যেন নিজ নিজ তাঁবুতে ফিরে যায়।[১৪]

শয়তানের আওয়ায শুনে হযরত আব্বাস ইবনে ওবাদা ইবনে সাজলা বললেন, সেই জাতের কসম যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, যদি আপনি চান, তবে আগামীকালই আমরা

---

১০. মোসনাদে আহমদ,

১১, সহীহ মুসলিম বাইয়াতুল নেসা, ২য় খন্ড, পৃ. ১৩১

১২. কেউ কেউ যোবাইর এর পরিবর্তে যোনাইর উল্লেখ করেছেন। কোন কোন সীরাত রচয়িতা রেফায়ার পরিবর্তে আবুল হায়ছাম, ইবনে তাইহানের নাম সংযোজন করেছেন।

১৪. যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ৫১

মিনাবাসীদের ওপর তলোয়ার নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব। প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমাকে এখনো এ কাজের আদেশ দেয়া হয়নি। তোমরা তোমাদের আস্তানায় ফিরে যাও। এরপর সবাই গিয়ে শুয়ে পড়লেন।[১৫]

মদীনার নেতাদের সাথে কোরায়শদের কথা কাটাকাটি

কোরায়শরা এ খবর পাওয়ার পর দিশেহারা হয়ে পড়লো। কেননা এ ধরনের বাইয়াতের সুদূর প্রসারী ফলাফল সম্পর্কে তারা অবহিত ছিলো। পরদিন সকালে কোরায়শদের একদল বিশিষ্ট লোক মদীনাবাসী আগন্তুকদের তাঁবুর সামনে গিয়ে গত রাতের সম্মেলনের এবং বাইয়াতের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলো। তারা বললো, ওহে খাযরাজের লোকেরা, আমরা শুনলাম তোমরা আমাদের এই লোককে আমাদের কাছ থেকে বের করে নিয়ে যেতে চাও। তোমরা আমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে তার হাতে বাইয়াত করছো। অথচ তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা অন্যসব আরব গোত্রের সাথে যুদ্ধ করার চেয়ে আমাদের কাছে অপছন্দনীয়।[১৬]

মক্কার কোরায়শরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করার পর মদীনা থেকে আসা অমুসলিম তীর্থযাত্রীরা বললো, তোমাদের কথা ঠিক নয়। তারা কসম করে বললো, এ ধরনের ঘটনা ঘটতেই পারে না। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বললো, আমার কওমের লোকেরা আমাকে বাদ দিয়ে এতোবড় কাজ করবে, এটাতো চিন্তাই করা যায় না। আমি তো এখন মক্কায়, যদি আমি মদীনায় থাকতাম, তবুও তারা আমার সাথে পরামর্শ না করে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতো না।

সম্মেলন এবং বাইয়াত রাতের আঁধারে হয়েছিলো। বিশ্বাস করার মতো নয়। এ কারণে মদীনার অমুসলিম তীর্থ যাত্রীদের কথাই মক্কার অমুসলিমরা বিশ্বাস করলো। মুসলমানরা একে অন্যের প্রতি আড়চোখে তাকালেন। তারা ছিলেন চুপচাপ।

তাঁরা হাঁ বা না কিছুই বললেন না। এক সময় কোরায়শ, নেতারা বুঝলো যে, আশঙ্কা করার মতো কিছু আসলে ঘটেনি। অবশেষে তারা হতাশ হয়ে ফিরে গেলো।

বাইয়াতকারীদের ধাওয়া

মক্কায় কোরায়শ নেতারা এ বিশ্বাসের সাথে সাথে ফিরে এলো যে, তারা যা শুনেছে, সেটা সত্য নয়। তবে যেহেতু সন্দেহ ছিলো, এ জন্যে তারা তথ্য সংগ্রহের জন্যে অধীর হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত বুঝতে পারলো যে, ঘটনা সত্য। বাইয়াতের ঘটনা আসলেই ঘটেছে- নিশ্চিতভাবেই ঘটেছে। কিন্তু এ খবর নিশ্চিতভাবে যখন তারা পেলো, তখন মদীনার হজ্জযাত্রীরা রওয়ানা হয়ে গেছেন। কিছুসংখ্যক অমুসলিম মদীনায় যাত্রীদের পিছু ধাওয়া করলো। কিন্তু সুযোগ ততক্ষণে হাতছাড়া হয়ে গেছে। দ্রুতগামী ঘোড় সওয়াররা সা'দ ইবনে ওবাদা এবং মুনযের ইবনে আমরকে দেখতে পেল। মুনযের দ্রুত এগিয়ে গেলেন। সা'দ ধরা পড়লেন। তাকে মক্কায় বেঁধে নিয়ে আসা হলো। তাঁকে প্রহার করা হলো। মক্কায় নেয়ার পর মাতয়াম ইবনে আদী এবং হারেছ ইবনে হবর উমাইয়া তাকে ছাড়িয়ে দিলেন। কেননা এই দু'জনের বাণিজ্য কাফেলা মদীনায় সা'দ ইবনে ওবাদার তত্ত্বাবধানে যাতায়াত করতো। এদিকে মদীনার হজ্জযাত্রীরা তাদের সফরসঙ্গী সা'দ ইবনে ওবাদার গ্রেফতারের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। তারা মক্কায় ফিরে গিয়ে কাফের কোরায়শদের ওপর হামলার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু মক্কার দিকে এগিয়ে যাওয়ার আগেই তারা লক্ষ্য করলেন যে, সা'দ ইবনে ওবাদা ফিরে আসছেন। এরপর কাফেলার সবাই নিরাপদে রওয়ানা

---

১৫. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৪৮

১৬. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৪৮

হয়ে নিরাপদে মদীনা পৌঁছুলেন।[১৭]

এটি হচ্ছে দ্বিতীয় বাইয়াত্তে আকাবা। এটাকে বাইয়াতে আকাবা কোবরাও বলা হয়। এই বাইয়াত এমন এক পরিবেশে হয়েছিলো যে, ঈমানদারদের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা, সহযোগিতা, বিশ্বাস, বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রেরণা এখানে জাগরুক ছিলো। মদীনার ঈমানদারদের অন্তর মক্কার দুর্বল ভাইদের প্রতি ভালোবাসায় ছিলো পরিপূর্ণ। সাহায্য করার উদ্দীপনায় মনে ছিলো দুর্বার সঙ্কল্প। অত্যাচারী বিধর্মীদের জন্যে অন্তরে ছিলো ক্রোধ ও ঘৃণা। না দেখেও যাদের আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে ভাই হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। তারা ছিলো প্রকৃতপক্ষেই দ্বীনী ভাই।

এ ধরনের প্রেরণা বাহ্যিক কোন আকর্ষণের কারণে ছিলো না। সময়ের স্রোতধারায় এ ভালোবাসার প্রেরণা মুছে যাওয়ার সম্ভাবনাও ছিলো না। বরং এ ভালোবাসার মূলে ছিলো আল্লাহর প্রতি ঈমান, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ঈমান ও আল্লাহর কোরআনের প্রতি ঈমান। এই ঈমান কোন প্রকার যুলুম নির্যাতন অত্যাচার ও শক্তির সামনে দুর্বল ও নষ্ট হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিলো না। এই ঈমান বা অদৃশ্য বিশ্বাসের দৃঢ়তার পরিচয় আমলের মাধ্যমে পাওয়া যায়। এই ঈমানের কারণেই মুসলমানরা পৃথিবীতে বিস্ময়কর কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছিলো। সেই কৃতিত্বের উদাহরণ অতীতের পৃথিবীতে যেমন পাওয়া যায়নি, ভবিষ্যতের পৃথিবীতেও পাওয়ার তেমনি সম্ভাবনা নেই।

হিজরতকারী মুসলমানদের শঙ্কিত প্রতিনিধিদল

দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবা সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমে ইসলাম, কুফুরী ও মূর্খতার অন্ধকারের মধ্যে নিজের জন্যে একটি আবাসভূমির বুনিয়াদ রাখতে সক্ষম হলো। দাওয়াতের শুরু থেকে এটা ছিলো ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের অনুমতি দিলেন, তারা যেন নিজেদের নতুন দেশে হিজরত করে চলে যায়।

হিজরত অর্থ হচ্ছে সব কিছু পরিত্যাগ করে শুধু প্রাণ রক্ষার জন্যে কোথাও চলে যাওয়া। তবে এই প্রাণও শঙ্কামুক্ত নয়। যাত্রা শুরু থেকে গন্তব্যে পৌঁছা পর্যন্ত যে কোন জায়গায় এই প্রাণ সংহার হয়ে যেতে পারে। যাত্রা শুরু হচ্ছে এক অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে। ভবিষ্যতে কি ধরনের বিপদ মুসবিতের সম্মুখীন হতে হবে, সে সম্পর্কে আগে ভাগে কিছুই বলা যায় না।

এসব কিছু জেনে বুঝেই মুসলমানরা হিজরত শুরু করেন। এদিকে পৌত্তলিকরা মুসলমানদের যাত্রা পথে বাধা সৃষ্টি করতে লাগলো। কারণ পৌত্তলিকরা বুঝতে পেরেছিলো যে, মুসলমানদের হিজরতের পর ভবিষ্যতে তাদের জন্যে অনেক আশঙ্কা ও বিপদ দেখা দেবে। নীচে হিজরতের কায়েকটি নমুনা উল্লেখ করা যাচ্ছে।

এক) প্রথম মোহাজের ছিলেন হযরত আবু সালমা (রা.)। ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবার এক বছর আগে তিনি হিজরত করেন। স্ত্রী এবং সন্তানরাও তার সাথে ছিলেন। তিনি রওয়ানা হতে শুরু করলে তাঁর শ্বশুরালয়ের লোকেরা বললো, আপনার নিজের জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার আমাদের চেয়ে আপনার বেশী রয়েছে। কিন্তু আমাদের মেয়ের কি হবে? আপনি তাকে শহরে শহরে ঘোরাবেন এটা জানার পরও কিভাবে তাকে আপনার সাথে যেতে দিতে পারি? সেটা কিছুতেই সম্ভব নয়। আবু সালমার স্ত্রীকে তার মা-বাবা রেখে দিলেন। এ খবর পাওয়ার পর আবু সালমার মা-বাবা ক্ষেপে গেলেন। তারা নিজেদের পৌত্রকে কেড়ে নিয়ে এলেন। দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এক ধাত্রীর কাছে প্রতিপালনের জন্যে দেয়া হলো। এর

---

১৭. যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ৫১-৫২, ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৪৮-৪৫০

আগে এক জায়গায় শিশুকে উভয় পক্ষ টানাটানি করায় শিশুর হাতে ব্যথা পেলো। মোটকথা হযরত আবু সালমা (রা.) একা মদীনায় চলে গেলেন। এদিকে স্বামী সন্তান ছেড়ে উম্মে সালমা পাগলিনীর মত হয়ে গেলেন। যেখানে তাঁর স্বামী বিদায় নিয়েছিলেন এবং তাঁর সন্তানকে কেড়ে নেয়া হয়েছিলো, সেই জায়গার নাম ছিলো আবত্তাহ। প্রতিদিন সকালে তিনি আবত্তাহ যেতেন এবং সারাদিন বিলাপ করতেন। এভাবে এক বছর কেটে গেলো। অবশেষে উম্মে সালমার একজন আত্মীয় উম্মে সালমার মা-বাবাকে বললো, বেচারীকে কেন আপনারা স্বামীর কাছে যেতে দিচ্ছেন না? এরপর তার মা-বাবা তাকে বললেন, তুমি ইচ্ছা করলে স্বামীর কাছে যেতে পারো। উম্মে সালমা তখন শ্বশুরালয়ে গিয়ে সন্তানকে ধাত্রীর কাছ থেকে নিয়ে নিলেন এবং একাকী সন্তানসহ মদীনা রওয়ানা হলেন। মক্কা থেকে মদীনাব দূরত্ব প্রায় পাঁচশত কিলোমিটার। তানঈম নামক জায়গায় পৌঁছার পর ওসমান ইবনে আবু তালহার সাথে দেখা হলো। উম্মে সালমা তাকে সব কথা খুলে বললেন। সব শুনে ওসমান তাকে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় রওয়ানা হলেন। কোবার জনপদ দূর থেকে দেখে বললেন, এ জনপদে তোমার স্বামী রয়েছে, তুমি সেখানে চলে যাও। আল্লাহ তোমাকে বরকত দিন। এরপর ওসমান মক্কায় ফিরে এলেন।[১]

দুই) হযরত সোহায়ব (রা.) মদীনায় হিজরত করার ইচ্ছা করলে কোরায়শ পৌত্তলিকরা বললো, তুমি আমাদের কাছে যখন এসেছিলে, তখন তুমি ছিলে নিসঙ্গ কাঙ্গাল। এখানে আসার পর তোমার অনেক ধন-সম্পদ হয়েছে। তুমি অনেক উন্নতি করেছ। এখন তুমি সেসব নিয়ে এখান থেকে কেটে পড়তে চাও? সেটা কিছুতেই সম্ভব নয়। হযরত সোহায়েব বললেন, আমি যদি ধন-সম্পদ সব ছেড়ে যাই তবে কি তোমরা আমাকে যেতে দেবে? তারা বললো, হাঁ, দেবো। হযরত সোহায়েব বললেন, ঠিক আছে, তাই হোক। সব কিছু তোমাদের কাছে রেখে গেলাম। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর পাওয়ার পর মন্তব্য করলেন, সোহায়েব লাভবান হয়েছে, সোহায়ের লাভবান হয়েছে।[২]

তিন) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব, আইয়াশ ইবনে আবি রবিয়া এবং হিশাম ইবনে আস ইবনে ওয়ায়েল পরস্পর আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, অমুক জায়গায় সকাল বেলা একত্রিত হয়ে সেখান থেকে মদীনায় হিজরত করবেন। এরপর হযরত ওমর এবং আইয়াশ নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছুতে সক্ষম হলেন কিন্তু হিশাম পৌঁছুতে পারলেন না, তাকে বন্দী করে রাখা হলো।

উল্লিখিত দু'জন হিজরত করে কোবায় পৌঁছার পর আইয়াশের কাছে আবু জেহেল এবং তার ভাই হারেস পৌঁছুলো। তিনজন ছিলেন এক মায়ের সন্তান। উভয় ভাই আইয়াশকে বললো, মা প্রতিজ্ঞা করেছে যে, তোমাকে না দেখা পর্যন্ত মাথার চুল আঁচড়াবে না, রোদ থেকে ছায়ায় যাবে না। একথা শুনে মায়ের জন্যে আইয়াশের মন কেঁদে উঠলো। হযরত ওমর (রা.) এ অবস্থা দেখে আইয়াশকে বললেন, শোনো আইয়াশ, ওরা তোমাকে তোমার দ্বীনের ব্যাপারে একটা ফেতনায় ফেলতে চায়, কাজেই তুমি সাবধান হও। খোদার কসম, তোমার মায়ের মাথায় যখন উকুন কামড়াবে, তখন তিনি নিশ্চয়ই মাথায় চিরুনি দেবেন, মক্কার কড়া রোদ অসহ্য হলে তিনি ঠিকই ছায়ায় যাবেন। কিন্তু আইয়াশ সেকথা কানে তুললেন না। তিনি মায়ের কসম পুরো করার জন্যে ভাইদের সাথে মক্কায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, যেতেই যখন চাও, আমার এ উটনী নিয়ে যাও। এর পিঠ থেকে নামবে না। মায়ের সাথে দেখা দিয়েই চলে আসবে। যদি সন্দেহজনক কোন আচরণ দেখো দ্রুত মদীনায় ফিরে আসবে।

আইয়াশ উটনীর পিঠে চড়ে দুই ভাইয়ের সাথে মক্কা অভিমুখে ফিরে চললেন। কিছুদূর

---

১. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৬৯, ৪৭০

২. ইবনে হিশাম, ১ম খনড, পৃ. ৪৭৭

যাওয়ার পর আবু জেহেল আইয়াশকে বললো, ভাই, আমার উট খুব ধীরে চলে, তোমার উটনীটা কিছুক্ষণের জন্যে বদল করবো। আইয়াশ উটনী বসানোর সাথে সাথে দুই ভাই মিলে আইয়াশকে রশি দিয়ে বেঁধে বাঁধা অবস্থায় দিনের বেলায় মক্কায় নিয়ে গেলো। মক্কায় নেয়ার পর সবাইকে শুনিয়ে বললো, ওহে মক্কার অধিবাসীরা, তোমরা তোমাদের বেকুবদের সাথে ঠিক এরূপ ব্যবহার করো, আমরা আমাদের এই বেকুবের সাথে যেমন ব্যবহার করেছি।[৩]

হিজরত করার জন্যে কেউ উদ্যোগ নিচ্ছে এ খবর পাওয়ার পর পৌত্তলিকরা তাদের সাথে যেরূপ ব্যবহার করতো, এখানে তার তিনটি নমুনা তুলে ধরা হলো। কিন্তু এতো বাধা সত্তেও ঈমানের সম্বল বুকে নিয়ে মুসলমানরা হিজরত করতে থাকেন। দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবার দুই মাস কয়েক দিন পর মক্কায় প্রিয় নবী হযরত আবু বকর এবং হযরত আলী (রা.) ছাড়া অন্য কোন মুসলমান ছিলেন না। এরা দু'জন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী মক্কায় রয়ে গেলেন। কয়েকজন মুসলমান এমন ছিলেন যে, তাদেরকে পৌত্তলিকরা জোর করে আটকে রেখেছিলো। রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হিজরতের প্রস্তুতি নিয়ে আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলেন। আর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) সফরের সাজ-সরঞ্জাম বেঁধে রেখে দিয়েছিলেন।[৪]

সহীহ বোখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের বললেন, আমাকে তোমাদের হিজরতের স্থান দেখানো হয়েছে। এটি হচ্ছে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি এলাকা। এরপর মুসলমানরা মদীনায় হিজরত শুরু করেন। হাবশায় যারা হিজরত করেছিলেন তারাও মদীনায় আসতে শুরু করেন। হযরত আবু বকর (রা.)-ও মদীনায় সফরের প্রস্তুতি নেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, অপেক্ষা করো, আমি ধারণা করছি যে, আমাকেও হিজরতের নির্দেশ দেয়া হবে। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আমার মা-বাবা আপনার জন্যে কোরবান হোক, আপনি কি হিজরতের আশা করছেন? প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাঁ। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সফরসঙ্গী হবেন-এ আশায় ছিলেন। তাঁর কাছে দু'টি উটনী ছিলো। তাদেরকে চার মাস যাবত ভালো করে বাচলা গাছের পাতা খাওয়ানো হলো।[৫]

দারুন নোদওয়ায় কোরায়শদের বৈঠক

মক্কার পৌত্তলিকরা যখন দেখলো যে, সাহাবায়ে কেরামরা পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ ফেলে রেখে আওস এবং খাযরাজদের এলাকায় গিয়ে পৌঁছেছে, তখন তারা দিশেহারা হয়ে পড়লো। ক্রোধে তারা অস্থির হয়ে উঠলো। ইতিপূর্বে তারা এ ধরনের বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন কখনোও হয়নি। এ পরিস্থিতি ছিলো তাদের মূর্তি পূজা এবং অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর মারাত্মক আঘাত এবং চ্যালেঞ্জ স্বরূপ।

---

৩. হিশাম এবং আইয়াশ কাফেরদের হাতে বন্দী ছিলো। রসূল হিযরত করার পর একদিন বললেন, কে আছো, যে আমার জন্য হিশাম এবং আইয়াশকে ছাড়িয়ে আনতে পারো? ওলীদ ইবনে ওলীদ এ দায়িত্ব নিলেন। গোপনে তিনি মক্কায় গেলেন। ওদের জন্য খাবার নিয়ে যাওয়া এক মহিলাকে অনুসরণ করে তাদের ঠিকানা জেনে নিলেন। ছাদ বিহীন একটি ঘরে উভয়কে আটকে রাখা হয়েছিলো। গভীর রাতে ওলীদ দেয়াল বেয়ে উঠে ঘরের ভেতরে গেলেন। তারপর বাঁধন কেটে দিয়ে বের করে নিজের উটে বসিয়ে উভয়কে মদীনায় নিয়ে এলেন। ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৭৪-৪৭৬। হযরত ওমর (রাঃ) ২০ জন সাহাবার একটি দলসহ মদীনায় হিযরত করেন। সহীহ বোখারী ১ম খন্ড।

৪. যাদুল আয়অদ, ২য় খন্ড, পৃ. ৫২

৫. সহীহ বোখারী, হিযরতে নবী অধ্যায়, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫৩

পৌত্তলিকরা ভালো করেই জানতো যে, হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর মধ্যে নেতৃত্ব ও পথ-নির্দেশের যোগ্যতা এবং তাঁর প্রভাব সৃষ্টিকারী শক্তি বিদ্যমান রয়েছে। একই সাথে তাঁর সাহাবাদের মধ্যে আত্মত্যাগ এবং সাহসিকতার যে প্রেরণা রয়েছে সেটাও তাদের অজানা ছিলো না। আওস এবং খাযরাজ গোত্রের রণ কৌশল, যোদ্ধা বা লড়াকু হিসাবে সুনাম সুখ্যাতিও ছিলো সর্বজনবিদিত। উভয় গোত্রের মধ্যে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন যেসব নেতা রয়েছেন, তাদের অসাধারণ প্রজ্ঞাও সকলের জানা ছিলো। তাঁরা পরিস্থিতি অনুযায়ী যেমন লড়াই করতে জানেন, তেমনি প্রয়োজনে সন্ধি সমঝোতাও করতে জানেন। বহু বছর গৃহযুদ্ধের তিক্ততার পর আওস এবং খাযরাজ গোত্র বর্তমানে প্রয়োজনে সন্ধি এবং মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্যে এগিয়ে এসেছে। এ খবরও কোরায়শদের অজানা ছিলো না।

পৌত্তলিক কোরায়শরা এটা জানতো যে, ইয়েমেন থেকে সিরিয়া পর্যন্ত লোহিত সাগরের উপকূল দিয়ে যে পথ রয়েছে, সেই পথেই চলাচল করে কোরায়শদের বাণিজ্য কাফেলা। সে পথ মদীনা থেকে বেশী দূরে নয়। কাজেই অর্থনৈতিক এবং সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে মদীনার অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সিরিয়া থেকে মক্কাবাসীদের বার্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ছিলো (সেই সময়ের হিসাব অনুযায়ী) আড়াই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার সমপরিমাণ। তাবেরা এবং অন্যান্য এলাকার বাণিজ্যিক হিসাব ছিলো এর অতিরিক্ত। কাজেই বাণিজ্যিক পথ নিরাপদ থাকার নিশ্চয়তার মাধ্যমেই যে এ বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা হতে পারে এটা তারা ভালো করেই বুঝতো।

এ আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, মদীনায় ইসলামী দাওয়াতের বুনিয়াদ দৃঢ় হওয়া এবং মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে মদীনাবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরিণাম কতো মারাত্মক। পৌত্তলিকরা এসব আশঙ্কা সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত ছিলো এবং তারা বুঝতে পারছিলো যে, সামনে কঠিন সময় ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এ কারণে তারা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার কার্যকর প্রতিষেধক সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করলো। তারা জানতো যে, এসব বিশৃঙ্খলা এবং অশান্তির মূলে রয়েছেন ইসলামের পতাকাবাহী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং নিজে।

দ্বিতীয় বাইয়াতে আকাবার প্রায় আড়াই মাস পর ২৬ শে সফর, ১২ই সেপ্টেম্বর ৬২২ ঈসায়ী সালের শুক্রবার[১] সকালে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।[২] মক্কার পার্লামেন্ট দারুন নোদওয়ায় ইতিহাসের সবচেয়ে ঘৃণ্য ও জঘন্য এ বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে মক্কার কোরায়শদের সকল গোত্রের প্রতিনিধি যোগদান করে। আলোচ্য বিষয় ছিলো এমন একটি পরিকল্পনা উদ্ভাবন করা যাতে ইসলামী দাওয়াতের নিশানবরদারকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ইসলামের আলো চির দিনের জন্যে নিভিয়ে দেয়া যায়।

---

১. আল্লামা মনসুরপুরীর সংযোজিত তথ্যের আলোকে এ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। রহমতুল লিল আলামিন ১ম খন্ড, পৃ. ৯৫, ৯৭, ১০২ ২য় খন্ড, পৃ. ৪৭১

২. প্রথম প্রহরে অর্থাৎ সকাল বেলায় এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রমাণ ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় রয়েছে। এতে তিনি বলেছেন, হযরত জিবরাঈল (আঃ) প্রিয় রসূল (সঃ)-এর কাছে এ বৈঠকের খবর নিয়ে আসেন এবং তাঁকে হিজরতের অনুমতি প্রদান করেন। সহীহ বোখারীতে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বর্ণনা উল্লেখ রয়েছে যে, প্রিয় রসূল (সঃ) দুপুর বেলায় হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কাছে এসে বলেন, আমাকে মদীনা রওয়ানা হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী পর্যায়ে উল্লেখ করা হবে।

এ জঘন্য বৈঠকে যেসব গোত্রের প্রতিনিধি অংশ নিয়েছিলো তাদের পরিচয়

ক্রমিক	ব্যক্তি	গোত্র
১	আবু জেহেল ইবনে হিশাম	বনি মাখযুম গোত্র
২	যোবায়ের ইবনে মুতয়েম তুয়াইমা ইবনে আদী এবং হারেস ইবনে আমের	বনি নওফেল ইবনে আবদে মান্নাফ
৩	শায়বা ইবনে রবিয়া, ওতবা ইবনে রবিয়া এবং আবু সুফিয়ান ইবনে হারব	বনি আবদে শামস ইবনে আবদে মান্নাফ
৪	নযর ইবনে হারেস	বনি আবদুদ দার
৫	আবুল বুখতারি ইবনে হিশাম জামআ ইবনে আসোয়াদ এবং হাকিম ইবনে হেযাম	বনি আসাদ ইবনে আবদুল ওজ্জা
৬	নবীহ ইবনে হাজ্জাজ এবং মুনাব্বাহ ইবনে হাজ্জাজ	বনি ছাহাম
৭	উমাইয়া ইবনে খালফ	জুমাহ

পূর্ব নির্ধারিত সময়ে প্রতিনিধিরা দারুন নোদওয়ায় পৌঁছে গেলো। এ সময় ইবলিস শয়তান একজন বৃদ্ধের রূপ ধারণ করে সভাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হলো। তার পরিধানে ছিলো জোব্বা। প্রবেশদ্বারে তাকে দেখে লোকেরা বললো, আপনি কে, আপনাকে তো চিনতে পারলাম না। শয়তান বললো, আমি নজদের অধিবাসী, একজন গেলো। আপনাদের কর্মসূচী শুনে হাযির হয়েছি। কথা শুনতে চাই, কিছু কার্যকর পরামর্শ দিতে পারব আশা করি। পৌত্তলিক নেতারা শয়তানকে যত্ন করে সসম্মানে নিজেদের মধ্যে বসালো।

আল্লাহর রসূলকে হত্যা করার নীলনকশা

সবাই হাযির হওয়ার পর আলোচনা শুরু হলো। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর নানা প্রকার প্রস্তাব পেশ করা হলো। প্রথমে আবুল আসওয়াদ প্রস্তাব করলো যে, তাঁকে আমরা আমাদের মধ্য থেকে বের করে দেবো। তাকে মক্কায় থাকতে দেবো না। আমরা তার ব্যাপারে কোন খবরও রাখব না যে, তিনি কোথায় যান, কি করেন। এতেই আমরা নিরাপদে থাকতে পারব এবং আমাদের মধ্যে আগের মতো সহমর্মিতা ফিরে আসবে।

শেখ নজদী রূপী শয়তান বললো, এটা কোন কাজের কথা নয়। তোমরা কি লক্ষ্য করোনি যে, তার কথা কতো উত্তম, কতো মিষ্টি। তিনি সহজেই মানুষের মন জয় করেন। যদি তোমরা তার ব্যাপারে নির্বিকার থাকো, তবে তিনি কোন আরব গোত্রে গিয়ে হাযির হবেন এবং তাদেরকে নিজের অনুসারী করার পর তোমাদের ওপর হামলা করবেন। এরপর তোমাদের শহরেই তোমাদেরকে নাস্তানাবুদ করে তোমাদের সাথে যেমন খুশী আচরণ করবেন। কাজেই তোমরা অন্য কোন প্রস্তাব চিন্তা করো।

আবুল বুখতারী বললো, তাকে লোহার শেকলে বেঁধে আটক করে রাখা হোক। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে একটা বন্ধ ঘরে রাখা হোক। এতে করে সেই ঘরে তার মৃত্যু হবে। কবি যোহাইর এবং নাবেগার এভাবেই মৃত্যু হয়েছিলো।

শেখ নজদী রূপী শয়তান বললো, এ প্রস্তাবও গ্রহণযোগ্য নয়। তোমরা যদি তাকে আটক করে ঘরের ভেতরে রাখো, তবে যেভাবে হোক, তার খবর তার সঙ্গীদের কাছে পৌঁছে যাবে। এরপর তারা মিলিতভাবে তোমাদের ওপর হামলা করে তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। এরপর তার সহায়তার সংখ্যা বৃদ্ধি করে তোমাদের ওপর হামলা করবে। সেই হামলায় তোমাদের পরাজয়

অনিবার্য। কাজেই অন্য কোন প্রস্তাব নিয়ে চিন্তা করো।

উল্লিখিত দু'টি প্রস্তাব বাতিল হওয়ার পর তৃতীয় একটি প্রস্তাব পেশ করা হলো। মক্কার সবচেয়ে জঘন্য অপরাধী আবু জেহেল এ প্রস্তাব উত্থাপন করলো। সে বললো, তার সম্পর্কে আমার একটিই প্রস্তাব রয়েছে। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, এখনো কেউ সেই প্রস্তাবের ধারে কাছে পৌঁছেনি। সবাই বললো, বলো আবুল হাকাম, কি সেই প্রস্তাব? আবু জেহেল বললো, প্রত্যেক গোত্র থেকে একজন যুবককে বাছাই করে তাদের হাতে একটি করে ধারালো তলোয়ার দেয়া হবে। এরপর সশস্ত্র শক্তিশালী যুবকরা একযোগে তাকে হত্যা করবে এমনভাবে মিলিত হামলা করতে হবে, দেখে যেন মনে হয় একজন আঘাত করেছে। এতে করে আমরা এই লোকটির হাত থেকে রেহাই পাব। এমনিভাবে হত্যা করা হলে তাকে হত্যার দায়িত্ব সকল গোত্রের মধ্যে ছড়িয়ে যাবে। বনু আবদে মান্নাফ সকল গেত্রের সাথে তো যুদ্ধ করতে পারবে না। ফলে তারা হত্যার ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করতে রাযি হবে। আমরা তখন তাকে হত্যার ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেবো।[৩]

শেখ নজদী রূপী শয়তান এ প্রস্তাব সমর্থন করলো। মক্কার পার্লামেন্ট এ প্রস্তাবের ওপর ঐক্যমত্যে উপনীত হলো। সবাই এ সঙ্কল্পের সাথে ঘরে ফিরলো যে, অবিলম্বে এ প্রস্তাব কার্যকর করতে হবে।

আল্লাহর রসূলের হিজরত

রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার জঘন্য প্রস্তাব পাশ হওয়ার পর হযরত জিবরাঈল (আ.) ওহী নিয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোরায়শদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবহিত করে বলেন যে, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে মক্কা থেকে হিজরত করার অনুমতি দিয়েছেন। হিজরত করার সময় জানিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ.) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, আপনি আজ রাত আপনার বাসভবনের বিছানায় শয়ন করবেন না।[৪]

এ খবর পাওয়ার পর নবী ঠিক দুপুরের সময় হযরত আবু বকর (রা.)-এর বাড়ীতে গেলেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হিজরতের পরিকল্পনা তৈরী করাই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, ঠিক দুপুরের সময় আমরা আবু বকর (রা.)-এর ঘরে বসেছিলাম, এমন সময় একজন আবু বকরকে বললেন, আল্লাহর নবী মাথা ঢেকে এদিকে আসছেন। এই সময়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো আসতেন না। আবু বকর (রা.) এ খবর শুনে বললেন, আমার মা-বাবা তাঁর জন্যে কোরবান হউন। নিশ্চয়ই তিনি গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজে এসেছেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, প্রিয় নবী এলে ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। অনুমতি দেয়া হলে তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। এরপর আবু বকর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, তোমার কাছে যারা রয়েছে, তাদের সরিয়ে দাও। আবু বকর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, শুধু আপনার স্ত্রী রয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমাকে রওয়ানা হওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। আবু বকর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, সঙ্গে আমি? হে রসূল, আপনার ওপর আমার মা-বাবা কোরবান হউন, হে আল্লাহর রসূল। প্রিয় রসূল বললেন, হাঁ।[১]

এরপর হিজরতের কর্মসূচী তৈরী করে তিনি নিজের ঘরে ফিরে রাত্রির অপেক্ষা করতে লাগলেন।[২]

৩.ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড. পৃ. ৪৮০-৪৮২

৪. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, ৪৮২, যাদুল মায়াদ ২য় খন্ড, পৃ. ৫২

১. যাদুল মায়াদ, ১ম খন্ড,

২. সহীহ বোখারী হিযরতে নবী অধ্যায়, ১ম খন্ড. পৃ. ৫৫৩

আল্লাহর রসূলের বাসভবন ঘেরাও

এদিকে কোরায়শদের নেতৃস্থানীয় অপরাধীরা মক্কার পার্লামেন্ট দারুন নোদওয়ায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী সারা দিনব্যাপী প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। জঘন্য অপরাধীদের মধ্যে থেকে এগারোজন সর্দারকে বাছাই করা হলো। এদের নাম হচ্ছে, ১) আবু জেহেল ইবনে হিশাম, ২) হাকাম ইবনে আস, ৩) ওকবা ইবনে আবি মুয়াইত, ৪) নযর ইবনে হারেছ, ৫) উমাইয়া ইবনে খালফ, ৬) জামআ ইবনে আসওয়াদ, ৭) তুয়াইমা ইবনে আদী, ৮) আবু লাহাব ৯) উবাই ইবনে খালফ, ১০) নুবাইহ ইবনে হাজ্জাজ, ১১) মুনাব্বাহ ইবনে হাজ্জাজ।[৩]

ইবনে ইসহাক বলেন, রাতের আঁধার ঘন হয়ে এলে এগারোজন দুর্বৃত্ত নবী (সাঃ)-এর বাসভবনের চারিদিকে ওঁৎ পেতে রইলো। তারা অপেক্ষা করছিলো যে, তিনি শুয়ে পড়লে একযোগে হামলা করবে।

দুর্বৃত্তরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছিলো যে, তাদের এ ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র অবশ্যই সফল হবে।[৪] আবু জেহেল তার সঙ্গীদের সঙ্গে ঠাট্টা মস্কারা করে বলছিলো, মোহাম্মদ বলে যে, তোমরা যদি তার ধর্ম মতে দীক্ষা নিয়ে তার অনুসরণ করো, তবে আরব অনারবের বাদশাহ হবে। এরপর মৃত্যুশেষে পুনরুজ্জীবিত হলে তোমাদের জন্যে জর্দানের বাগানের মতো জান্নাত থাকবে। যদি তোমরা তাকে না মারো, তবে তারা তোমাদের যবাই করবে এবং মত্যুর পর পুরুজ্জীবিত হলে তোমাদের আগুনে পোড়ানো হবে।[৫]

ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের জন্যে সময় নির্ধারণ করা হয়েছিলো রাত বারোটার পর। এ কারণে নির্ঘুম চোখে নির্ধারিত সময়ের প্রতীক্ষায় তারা অপেক্ষা করছিলো। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাঁর ইচ্ছাই সফল করে থাকেন। তিনি আসমান যমীনের বাদশাহ। তিনি যা চান তাই করেন। তিনি যাকে বাঁচাতে চান, কেউ তার ক্ষতি করতে পারে না। যাকে পাকড়াও করতে চান কেউ তাকে বাঁচাতে পারে না। এই সময়েও আল্লাহ তায়ালা যা ইচ্ছা করেছিলেন, তা-ই করলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে তিনি বলেন, 'স্মরণ কর, কাফেররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করার জন্যে, হত্যা করার জন্যে, নির্বাসিত করার জন্যে তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও কৌশল করেন। আর আল্লাহই কৌশলীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। (সূরা আনফাল, আয়াত ৩০)

আল্লাহর রসূলের গৃহত্যাগ

কোরায়শ কাফেররা তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চূড়ান্ত প্রস্তুতি এবং সর্বাত্মক চেষ্টা সত্তেও সফল হতে পারেনি। এমনি এক নাযুক পরিস্থিতিতে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রা.)-কে বললেন, তুমি আমার এই সবুজ হাদরামি[৬] চাদর গায়ে দিয়ে আমার বিছানায় শুয়ে থাকো। ওদের হাতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না। প্রিয় নবী এই চাদর গায়ে দিয়ে রাতে ঘুমোতেন।[৭]

আল্লাহর রসূল এরপর বাইরে এলেন একমুঠো ধুলো নিয়ে কাফেরদের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। এতেই আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্ধ করে দিলেন। তারা আল্লাহর রসূলকে দেখতে

---

[৩]. যাদুল মায়াদ, ১ম খন্ড, পৃ. ৫২

[৪]. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৮২

৫. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড. পৃ. ৪৮৩

[৬]. দক্ষিণ ইয়েমেনের হাদরামাউতে নির্মিত চাদরকে হাদরামি চাদর বলা হয়।

৭. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৮২, ৪৮৩

পেলো না। সে সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাক কোরআনের এই আয়াত তেলওয়াত করছিলেন, 'আমি ওদের সামনে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করছি এবং ওদেরকে আবৃত করেছি। ফলে ওরা দেখতে পায় না।' (সূরা ইয়াসিন, আয়াত ৯)

প্রতিটি পৌত্তলিকের মাথায় নিক্ষিপ্ত ধুলি গিয়ে পড়লো। এরপর তিনি হযরত আবু বকরের বাড়ীতে গেলেন। সেই ঘরের একটি জানালা পথে বেরিয়ে উভয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে ইয়েমেনের পথে যাত্রা করলেন। রওয়ানা হওয়ার পর কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ছুর পাহাড়ের একটি গুহায় তাঁরা যাত্রা বিরতি করলেন।[৮]

এদিকে অবরোধকারীরা নির্ধারিত সময়ের জন্যে অপেক্ষা করছিলো। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের আগেই তারা নিজেদের ব্যর্থতার কথা জেনে ফেললো। অপরিচিত একজন লোক এসে দুর্বৃত্তদের বললো, আপনারা এখানে কার জন্যে অপেক্ষা করছেন? তারা বললো, মোহাম্মদের জন্যে। সেই লোক বললো, আপনাদের ইচ্ছা পূরণ হবার নয়। আল্লাহর কসম, মোহাম্মদ আপনাদের মাথায় ধুলি নিক্ষেপ করে আপনাদের সামনে দিয়ে নিজের কাজে চলে গেছেন। তারা একথা শুনে বললো, কই আমরা তো তাকে দেখলাম না। তারা সবাই নিজের মাথায় হাত দিয়ে ধুলি দেখতে পেলো। তারা এরপর ধুলো ঝেড়ে সবাই উঠে দাঁড়ালো।

এরপর তারা প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিছানায় কেউ শুয়ে আছেন। ওরা হযরত আলীকেই আল্লাহর রসূল মনে করে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলো। সকালে হযরত আলী (রা.)-কে শয্যাত্যাগ করতে দেখে দুর্বত্তরা চূড়ান্তভাবে হতাশ হয়ে পড়লো। তারা হযরত আলী (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলো, আল্লাহর রসূল কোথায়? হযরত আলী (রা.) বললেন, আমি জানি না।[৯]

ঘর থেকে গারে ছুরে

প্রিয় রসূল ২৭ শে সফর মোতাবেক ১২ ও ১৩ই সেপ্টেম্বর ৬২২ ঈসায়ী সালের মাঝামাঝি সময়ে অর্থাৎ ১২ই সেপ্টেম্বর দিবাগত রাতে হিজরত করেন। তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত সাথী হযরত আবু বকর (রা.)। তাঁরা সূর্যোদয়ের আগেই মক্কার সীমানা অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে চললেন।[১০]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন যে, কোরায়শ দুর্বৃত্তরা সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় তাঁকে খুঁজবে এবং স্বাভাবিকভাবে মদীনা অভিমুখী পথের দিকেই অগ্রসর হবে। এ কারণে প্রিয় নবী উল্টো দিকে ইয়েমেনের পথে অগ্রসর হলেন। মদীনার পথ হচ্ছে মক্কা থেকে উত্তর দিকে। আর ইয়েমেনের পথ দক্ষিণ দিকে। পাঁচ মাইল অতিক্রমের পর প্রিয় নবী একটি পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছুলেন, সেই পাহাড় 'ছুর পাহাড়' নামে পরিচিতি। একটি সুউচ্চ পাহাড়। এই পাহাড়ে ওঠা খুব কষ্টকর। এখানে বহু পাথর রয়েছে। সেই পাথর পাড়ি দিতে গিয়ে প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরণযুগল রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিলো। বলা হয়ে থাকে যে, পায়ের

---

৮. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৮৩, যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ৫২

৯. যাদুল মায়াদ, ১ম খন্ড, পৃ. ৫২, ইবনে হেশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৮৩

১০. রহমতুল লিল আলামিন ১ম খন্ড, পৃ. ৯৫। সফরের এ মাস নবুয়তের চর্তুদশ বর্ষ হিসাবে গণ্য হবে যদি মহররম মাস থেকে বর্ষ শুরুর হিসাব করা হয়। যদি নবুয়ত পাওয়ার মাস থেকে বর্ষ শুরুর হিসাব ধরা হয়, তাহলে সফর মাস হবে নবুয়তের ত্রয়োদশ বছর। সীরাত রচয়িতাদের অধিকাংশই মহররম মাস থেকেই বর্ষ শুরুর হিসাব করেছেন। কেউ কেউ উভয় রকমের হিসাব গ্রহণ করেছেন। এ কারণে হিজরতের তারিখ নির্ধারণে তারা এলোমেলো করে দেখছেন। আমরা মহররম মাস থেকেই বর্ষ শুরুর হিসাব উল্লেখ করেছি।

ছাপ গোপন রাখার উদ্দেশ্যে তিনি পায়ের গোড়ালী দিয়ে হাঁটছিলেন। এ কারণে তাঁর পা জখম হয়ে যায়।

হযরত আবু বকর (রা.) প্রথমে পাহাড়ের কিছু অংশে উঠে প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ওপরে উঠতে সহায়তা করেন। এরপর উভয়ে পাহাড় চূড়ার একটি গুহায় আশ্রয় নেন। এই গুহা ইতিহাসে 'গারে ছূর' নামে বিখ্যাত।[১১]

ছূর পর্বতের গুহায়

গুহার কাছে পৌঁছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবু বকর (রা.) বললেন, একটু অপেক্ষা করুন। গুহায় কোন কিছু থাকলে তার মোকাবেলা আমার সাথেই যা হবার হবে। এরপর তিনি গুহায় প্রবেশ করে তারা পরিষ্কার করলেন। কয়েকটি গর্ত ছিলো, যেগুলো তহবন্ধ ছিঁড়ে বন্ধ করলেন। দু'টি গর্ত বাকি ছিলো, সেগুলোতে পা চাপা দিয়ে প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভেতরে আসার আহ্বান জানালেন। প্রিয় নবী ভেতরে গেলেন এবং আবু বকরের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে হযরত আবু বকর (রা.)-কে কিসে যেন দংশন করলো। কিন্তু প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে এ আশঙ্কায় তিনি নড়াচড়া করলেন না। বিষের কষ্টে তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো, বেখেয়ালে এক ফোটা অশ্রু প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারায় পড়তেই তিনি জেগে গেলেন। আবু বকর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি হয়েছে? তিনি বললেন, কিসে যেন আমাকে দংশন করেছে।

এ কথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খানিকটা থুথু নিয়ে দংশিত স্থলে লাগিয়ে দিলেন। সাথে সাথে বিষের যাতনা দূর হয়ে গেলো।[১২]

এখানে উভয়ে শুক্র, শনি ও রবিবার এ তিনদিন অবস্থান করেন।[১৩] এ সময়ে হযরত আবু বকরের পুত্র আবদুল্লাহও একই সঙ্গে রাত্রি যাপন করেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আবদুল্লাহ ছিলো খুব বুদ্ধিমান যুবক। সে শেষ রাতে উভয়ের কাছ থেকে চলে আসতো কিন্তু মক্কায় তাকে সকাল বেলাই দেখা যেতো। যে কেউ দেখে ভাবতো, রাতে সে মক্কাতেই ছিলো। সারাদিন উভয়ের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের যেসব কথা শুনতো, সন্ধ্যায় অন্ধকার ঘনিয়ে এলে সেসব খবর নিয়ে 'গারে ছূরে' চলে যেতো।

এদিকে হযরত আবু বকরের ক্রীতদাস আমের ইবনে যোহায়রা বকরি চরাতেন। রাতের আঁধার গভীর হলে তিনি বকরি নিয়ে তাদের কাছে যেতেন এবং দুধ দোহন করে দিতেন। উভয়ে তৃপ্তির সাথে দুধ পান করতেন। খুব ভোরে আমের বকরি নিয়ে রওয়ানা হতেন। তিন রাতেই তিনি এরূপ করেছিলেন।[১৪] এছাড়া আমের ইবনে যোহায়রা আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকরের মক্কা যাওয়ার চিহ্ন সেই পথে বকরী তাড়িয়ে মুছে দিতেন।[১৫]

---

১১. রহমতুল লিল আলমিন, ১ম খন্ড, পৃ. ৯৫, মুখতাছারুছ সিরাহ্ শেখ আবদুল্লাহ, পৃ. ১৬৭৭, ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৮২

১২. এই বক্তব্য ওমর ইবনে খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। এ বর্ণনায়, একথাও রয়েছে যে, পরবর্তী সময়ের সেই বিষের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং সেই বিষের প্রভাবেই তিনি ইন্তেকাল করেন। দেখুন, মেশকাত, ২য় খন্ড, পৃ, ৫৫৬, মানাকেরে আবু বকর শীর্ষক অধ্যায়।

১৩. ফতহুল বারী, ৭ম খন্ড, পৃ. ৩৩৬

১৪. সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫৩-৫৫৪

১৫. ইবনে হিশাম ১ম খন্ড, পৃ. ৪৮৬

কোরায়শদের অভিযান

কোরায়শদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার পর তারা যখন পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলো যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের হাতছাড়া হয়ে গেছেন, তখন তারা যেন উন্মাদ হয়ে গেলো। প্রথমে তারা হযরত আলীর ওপর তাদের ক্রোধ প্রকাশ করলো। তাকে টেনে হিঁচড়ে কাবাঘরে নিয়ে গেলো এবং কথা আদায়ের চেষ্টা করলো।[১৬] কিন্তু এতে কোন লাভ হলো না। এরপর তারা হযরত আবু বকরের বাড়ীতে গেলো। দরজা খুললেন হযরত আসমা বিনতে আবু বকর। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, তোমার আব্বা কোথায়? তিনি বললেন, আমি তো জানি না। এ জবাব শুনে দুর্বৃত্ত আবু জেহেল আসমাকে এতো জোরে চড় দিলো যে, তার কানের বালি খুলে পড়ে গেলো।[১৭]

এরপর কোরায়শ নেতারা এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হয়ে এ সিদ্ধান্ত নিলো যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কে গ্রেফতার করার জন্যে সর্বাত্মক অভিযান চালাতে হবে। মক্কা থেকে বাইরের দিকে যাওয়ার সকল পথে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করলো। সেই সাথে ঘোষণা করা হলো যে, যদি কেউ হযরত মোহাম্মদ এবং আবু বকর (রা.)-কে বা দু'জনের একজনকে জীবিত বা মৃত হাযির করতে পারে, তাকে একশত উট পুরস্কার দেয়া হবে।[১৮] এ ঘোষণা সর্বসাধারণ্যে প্রচারিত হবার পর চারিদিকে বহু লোক বেরিয়ে পড়লো। পায়ের চিহ্ন বিশারদরাও উভয়কে তালাশ করতে লাগলো। পাহাড়ে প্রান্তরে ও উঁচু নীচু এলাকায় সর্বত্র চষে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু এতো কিছু করেও কোন লাভ হলো না।

অনুসন্ধানকারীরা 'ছুর' পাহাড়ের গুহার কাছেও পৌঁছুলো। কিন্তু সারা দুনিয়ার বাদশাহ আল্লাহ তায়ালা নিজের ইচ্ছাকেই পূর্ণতা দান করেন। সহীহ বোখারীতে হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে গুহায় ছিলাম, মাথা তুলতেই দেখি, লোকদের পা দেখা যাচ্ছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, ওরা কেউ যদি একটুখানি নিচু হয়ে এদিকে তাকায়, তবেই আমাদের দেখতে পাবে। প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আবু বকর চুপ করো, আমরা এখানে দু'জন নই বরং আমাদের সাথে তৃতীয় হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা। অন্য বর্ণনায় রয়েছে যে, প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আবু বকর এমন দুঃজন সম্পর্কে তোমার কি ধারণা, যাদের তৃতীয় হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা।[১৯]

মোটকথা অনুসন্ধানকারীরা তখনই চলে গেলো, যখন আল্লাহর রসূল এবং দুর্বৃত্তদের মধে ব্যবধান ছিলো খুব কম— মাত্র কয়েক কদম।

---

[১৬]. রহমতুল লিল আলামীন ১ম খন্ড, পৃ. ৯৯

[১৭]. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড পৃ. ৪৮৭

[১৮]. সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫৪

[১৯]. সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ৫১৬-৫৫৮। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, হযরত আবু বকরের অস্থিরতা নিজের জীবন রক্ষার জন্য ছিলো না। তিনি প্রিয় নবী (সঃ)-এর জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি দুর্বত্তদের পা দেখতে পাচ্ছিলেন, সে সময় তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন এবং বললেন, যদি আমি মারা যাই তবে একজন আবু বকর মারা যাবে। কিন্তু আপনি মারা গেলে সমগ্র উম্মত বরবাদ হয়ে যাবে। এ সময়ে রসূল বলেছিলেন, ভয় পেয়ো না, আবু বকর, আল্লাহ পাক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।

২০. সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫৩-৫৫৫ ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৮৬

মদীনার পথে

মক্কার কোরায়শদের নেতৃত্বে পুরস্কারলোভী লোকদের অনুসন্ধান তৎপরতা নিষ্ফল প্রমাণিত হলো। ক্রমাগত তিনদিন অনুসন্ধান করে তারা ক্লান্ত ও হতাশ হয়ে পড়লো। তাদের অনুসন্ধান উৎসাহ স্তিমিত হয়ে এলো। এ অবস্থা লক্ষ্য করে প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আবু বকর (রা.) মদীনার পথে রওয়ানা হলেন। বিভিন্ন পথ সম্পর্কে অভিজ্ঞ আবদুল্লাহ ইবনে আরিকত লাইছির সাথে আগেই চুক্তি হয়েছিলো যে, তিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে এই দুইজনকে মদীনায় পৌঁছে দেবেন। কোরায়শদের ধর্ম বিশ্বাসের ওপর থাকলেও এ লোকটি ছিলো বিশ্বস্ত। এ কারণে তাকে সওয়ারীও দেয়া হয়েছিলো। তাকে বলা হয়েছিলো যে, তিনদিন পর সে দু'টি সওয়ারীসহ ছুর গুহার সামনে যাবে। সোমবার রাতে ১লা রবিউল আউয়াল মোতাবেক ১৬ই সেপ্টেম্বর ৬২২ ঈসায়ী সালের সোমবার রাতে আবদুল্লাহ ইবনে আরিকত সওয়ারী নিয়ে এলেন। হযরত আবু বকর (রা.) এ সময় তাঁর দুটি উটনী দেখিয়ে বললেন, হে রসূল, আপনি এ দুটির মধ্যে একটি গ্রহণ করুন। রসূল বললেন, হাঁ, তবে মূল্যের বিনিময়ে।

এদিকে আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) উটের ওপর বিছানোর বিছানা নিয়ে এলেন। কিন্তু বাঁধার দড়ি আনতে ভুলে গিয়েছিলেন। রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত আসমা উটের পিঠে বিছানা রাখার পর দেখা গেলো বাঁধার দড়ি রেখে এসেছেন। তিনি তখন নিজের কোমরবন্দ খুলে সেটি দু'ভাগ করে ছিঁড়ে বিছানা উটের পিঠের সাথে বেঁধে দিলেন, অন্য অংশ নিজের কোমরে বাঁধলেন। এ কারণে তাঁর উপাধি হয়েছিলো 'যাতুন নেতাকাইন'।[২০]

এরপর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আবু বকর (রা.) রওয়ানা হলেন। আমের ইবনে যোহায়রাও সঙ্গে ছিলেন। রাহবার আবদুল্লাহ ইবনে আরিকত উপকূলীয় পথে মদীনা রওয়ানা হলেন।

গারে ছুর থেকে বেরোবার পর আবদুল্লাহ প্রথমে ইয়েমেনের দিকে অর্থাৎ দক্ষিণ দিকে বহুদূর অগ্রসর হলেন। এরপর পশ্চিমাভিমুখী হয়ে সমুদ্রোপকূল ধরে যাত্রা করলেন। পরে এমন এক পথে চলতে লাগলেন, যে পথ সম্পর্কে সাধারণ লোকেরা কেউ অবহিত ছিলো না। সে পথে উত্তর দিকে অগ্রসর হলেন। লোহিত সাগরের উপকূলবর্তী এ পথে খুব কম সময়েই লোক চলাচল করতো।

আল্লাহর রসূল এ পথে যেসব স্থান অতিক্রম করেছেন, ইবনে ইসহাক তার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, পথ প্রদর্শক যখন তাদের নিয়ে বের হলেন, তখন মক্কার নিম্ন ভূমি এলাকা দিয়ে অতিক্রম করলেন। উপকূল দিয়ে চলার পর আসফানের নীচু এলাকায় বাঁক ঘুরলেন। সানিয়াতুল মুররা দিয়ে তারপর লকফ হয়ে লকফের বিস্তীর্ণ ভূমি অতিক্রম করলেন। এরপর হেজাযের বিস্তীর্ণ ভূমিতে পৌঁছে এবং সেখান থেকে মুজাহের মোড় দিয়ে শস্যশ্যামল ভূমিতে গমন করেন। তারপর যি কেশরার মাঠে প্রবেশ করে জুদাজাদের দিকে যান এবং সেখান থেকে আজার্দে পৌঁছেছেন। এরপর তাহানের বিস্তীর্ণ এলাকার পাশ দিয়ে যু যালাম অতিক্রম করেন। সেখানে থেকে আবাদি, তারপর ফাজা অভিমুখে রওয়ানা হন। তারপর অবতরণ করেন আজরে। পরে রকুবার ডান পাশ দিয়ে সানিয়াতুল আযেরে গেলেন এবং রিম উপত্যকায় অবতরণ করেন। সবশেষে কোবায় গিয়ে পৌঁছুলেন।[২১]

---

২১. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৯১, ৪৯২

পথের কয়েকটি ঘটনা

এক) সহীহ বোখারী শরীফে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, গারে ছুর থেকে বেরিয়ে আমরা সারারাত ধরে পথ চলেছি, পরদিন দুপুর পর্যন্তও চলেছি। ঠিক দুপুরে রাস্তায় কোন পথচারী ছিলো না। আমরা এ সময় একটা লম্বালম্বি প্রান্তর দেখতে পেলাম। এখানে রোদ নেই। আমরা সেখানে অবতরণ করলাম। নিজের হাতে আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শয়নের জন্যে একটি জায়গা সমতল করলাম, এরপর সেখানে চাদর বিছালাম। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরপর বললাম, হে আল্লাহর রসূল, আপনি শয়ন করুন, বিশ্রাম নিন, আমি আশপাশে খেয়াল রাখছি। নবীজী শুয়ে পড়লেন। আমি চারিদিকে নযর রাখলাম। হঠাৎ দেখি একজন রাখাল কিছু সংখ্যক বকরি নিয়ে এদিকেই আসছে। সে প্রান্তরের ছায়ায় আসছিলো। আমি তাকে বললাম, তুমি কার লোক? সে মক্কা বা মদীনার একজন লোকের নাম বললো। আমি তাকে বললাম, তোমার বকরির কি কিছু দুধ হবে? সে বললো, হাঁ। আমি বললাম, দোহন করতে পারি? সে বললো, হাঁ। এ কথা বলে সে একটি বকরি ধরে আনলো। আমি বললাম, মাটি খড়কুটো এবং লোম থেকে ওলান একটু পরিষ্কার করে দাও। পরিষ্কার করার পর একটি পেয়ালায় কিছু দুধ দোহন করে দিলো। আমার কাছে ছিলো একটি চামড়ার পাত্র। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওযু এবং পানি পান করার জন্যে সেটি রেখেছিলাম। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে দেখি তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁকে জাগানো সমীচীন মনে করলাম না, কিছুক্ষণ পর তিনি ঘুম থেকে জাগলেন। দুধের সাথে কিছু পানি মেশালাম, এতে পাত্রের নীচের অংশ ঠান্ডা হয়ে গেলো। তাকে বললাম, আপনি এ দুধটুকু পান করুন। তিনি পান করে খুশী হলেন। এরপর বললেন, এখনো কি রওয়ানা হওয়ার সময় আসেনি? আমি বললাম, কেন নয়? এরপর আমরা আবার রওয়ানা হলাম।[২২]

দুই) এ সফরের সময় হযরত আবু বকর (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে বসতেন। পথচারীদের দৃষ্টি তার দিকেই প্রথমে যেতো, কারণ তাঁর চেহারায় বার্ধক্যের ছাপ ছিলো। তাঁর তুলনায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কমবয়সী মনে হচ্ছিলো। পথচারীদের কেউ যখন জিজ্ঞাসা করতো যে, আপনার সামনে উনি কে? হযরত আবু বকর (রা.) জবাব দিতেন যে, উনি আমাকে পথ দেখান। প্রশ্নকারী বুঝতো যে মরুভূমিতে পথ দেখাচ্ছেন, প্রকৃতপক্ষে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) নেকী ও কল্যাণের পথের কথাই বোঝাতেন।[২৩]

তিন) এই সফরের সময় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে মা'বাদ খোযায়ার তাঁবুতে কিছুক্ষণের জন্যে যাত্রা বিরতি করেন। এই মহিলা খুব বুদ্ধিমতী। নিজের বাড়ীতে আঙ্গিনায় তিনি বসেছিলেন। যাতায়াতকারী পথচারীদের সাধ্যমতো পানাহার করাতেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কাছে কিছু আছে? মহিলা বললেন, যদি কিছু থাকতো, তবে আপনাদের মেহমানদারিতে ক্রটি করতাম না। কয়েকটি বকরি আছে, যেগুলো দূরে চারণভূমিতে রয়েছে। এখন দুর্ভিক্ষের সময় চলছে।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লক্ষ্য করলেন যে, বাড়ীর এক পাশে একটি বকরি বাঁধা আছে। তিনি বললেন, উম্মে মা'বাদ, এ বকরি এখানে কেন? উম্মে মা'বাদ বললেন, এ বকরি খুব দুর্বল, হাঁটতে পারে না। প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, অনুমতি যদি দাও, তবে ওর দুধ দোহন করি? মহিলা বললেন, হাঁ, যদি দুধ দেখতে পান, অবশ্যই দোহন

---

২২. সহীহ বোখারী ১ম খন্ড ৫৫৬

২৩. সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫৬

করুন। এ কথার পর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বকরির ওলানে হাত লাগালেন। আল্লাহর নাম নিলেন এবং দোয়া করলেন। বকরি সাথে সাথে পা প্রসারিত করে দাঁড়ালো। তার ওলানে ভরা দুধ। প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বড় পাত্র নিয়ে সেই পাত্রে দুধ দোহন করলেন। সেই পাত্র ভর্তি দুধ এক দল লোক তৃপ্তির সাথে পান করতে পারতো। দুধ দোহনের পর পাত্রে ফেনা ভরে গেলো। সঙ্গীদের পান করালেন উম্মে মা'বাদ নিজে পান করলেন। এরপর সেই পাত্রে পুনরায় দুধ দোহন করলেন। সেই পাত্র ভর্তি দুধ উম্মে মা'বাদের ঘরে রেখে আল্লাহর রসূল গন্তব্যের দিকে রওয়ানা হলেন।

কিছুক্ষণ পর মহিলার স্বামী বকরির পাল নিয়ে বাড়ী ফিরলো। সেসব বকরিও দুর্বল, পথ চলতে ক্লান্তিতে হাঁপিয়ে ওঠে। উম্মে মা'বাদের স্বামী আবু মা'বাদ দুধ দেখে তো অবাক! জিজ্ঞাসা করলেন, দুধ পেলে কোথায়? সব দুগ্ধবতী বকরি তো আমি চারণ ভূমিতে নিয়ে গেছি, ঘরে তো দুধ দেয়ার মতো বকরি ছিলো না। উম্মে মা'বাদ বললেন, আমাদের কাছে একজন বরকত সম্পন্ন মানুষ এসেছিলেন। তাঁর কথা ছিলো এমন এবং তাঁর অবস্থা ছিলো এমন । সব শুনে আবু মা'বাদ বললেন, এই তো মনে হয় সেই ব্যক্তি, যাকে কোরায়শরা খুঁজে বেড়াচ্ছে। আচ্ছা তুমি তার আকৃতি প্রকৃতি একটু বলো। উম্মে মা'বাদ অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে চিত্তাকর্ষক ভঙ্গিতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিচয় বর্ণনা করলেন। সে বর্ণনা ভঙ্গি শুনে মনে হয় শ্রোতা যেন তাকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। গ্রন্থের শেষ দিকে এইসব বিবরণ উল্লেখ করা হবে। আগন্তুকের ভূয়সী প্রশংসা শুনে সে বললো, আল্লাহর শপথ, এই হচ্ছে কোরায়শদের সেই ব্যক্তি, যার সম্পর্কে লোকেরা নানা কথা বর্ণনা করেছে। আমার ইচ্ছা হচ্ছে তাঁর প্রিয় সঙ্গীদের একজন হবো। যদি কোন পথ পাই, তবে অবশ্যই এটা করবো।

এদিকে মক্কার বাতাসে কবিতার ছন্দে কিছু কথা ভেসে আসছিলো। যিনি কবিতা আবৃত্তি করছিলেন, তাকে দেখা যাচ্ছিলো না। কবিতার অর্থ নিম্নরূপ

আল্লাহর পুরস্কার লাভ করুন সেই দু'জন,
উম্মে মা'বাদের বাড়ীতে যারা করলেন পদার্পণ।
ভালোয় ভালোয় থেমেছিলেন, যাত্রা করলেন, ফের সফলকাম হয়েছেন
তিনি সঙ্গী, যিনি মোহাম্মদের।
হায় কুসাই তোমাদের থেকে
নযিরবিহীন সাফল্য এবং নেতৃত্ব নিলেন আল্লাহ কেড়ে।
বনু কা'ব-এর সেই মহিলা, আহা কী যে ভাগ্যবান
মোবারক হোক মোমেনীনের জন্যে সেই বাসস্থান।
বকরির কথা পাত্রের কথা মহিলার কাছে জানতে চাও
সেই বকরিও সাক্ষী দেবে, তোমরা বকরির কাছে যাও।

হযরত আসমা (রা.) বলেন আমাদের জানা ছিলো না যে, আল্লাহর রসূল কোনদিকে গেছেন। হঠাৎ একটি জিন মক্কায় এসে এসব কবিতা শোনালো। উৎসাহী জনতা সেই জিনকে পাচ্ছিলো না। তারা শব্দের পেছনে ছুটে যাচ্ছিলো। শব্দ শুনছিলো। এক সময় সেই শব্দ মক্কার উঁচু এলাকায় মিলিয়ে গেলো। সেই কবিতা শুনে আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনদিকে গেছেন। স্পষ্টই বোঝা গেলো যে, তিনি মদীনার পথে রয়েছেন।[২৪]

---

২৪. যাদুল মা'য়াদ, ২য় খন্ড পৃ. ৫৩-৫৪ বনু খোজাআ গোত্রের অবস্থানের কথা চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এ ঘটনা প্রিয় নবী (সঃ)-এর মদীনা রওয়ানা হওয়ার দ্বিতীয় দিনে ঘটেছিলো।

চার) পথে ছোরাকা ইবনে মালেক প্রিয় নবী এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কে অনুসরণ করেছিলেন ছোরাকার বর্ণিত ঘটনা নিম্নরূপ। আমি আমার কওম বনি মুদলেজের এক মজলিসে বসেছিলাম। এমন সময় একজন লোক এসে আমাদের কাছে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ পর বসলো। সেই লোকটি বললো, ওহে ছোরাকা, একটু আগে আমি উপকূলের কাছে কয়েকজন লোক দেখলাম। আমার ধারণা, তিনি মোহাম্মদ এবং তাঁর সাথী। ছোরাকা বললো, আমি বুঝতে পারলাম যে এরাই তারা কিন্তু যে লোকটি খবর দিয়েছিলো, তার কাছে মনোভাব গোপন রাখার জন্যে বললাম, না না, ওরা তারা নয়, তুমি যাদের দেখেছো তাদের তো আমরাও দেখেছি। তারা আমাদের চোখের সামনে দিয়ে গেছে। এরপর আমি মজলিসে কিছুক্ষণ বসে কাটালাম। তারপর ঘরের ভেতর গিয়ে আমার দাসীকে আমার ঘোড়া বের করতে বললাম। ঘোড়া বের করার পর তাকে বললাম, টিলার পেছনে নিয়ে যাও এবং সেখানে অপেক্ষা করো, আমি আসছি। এরপর আমি তীর নিলাম এবং ঘরের পেছন দিয়ে বাইরে বের হলাম। তীরের এক প্রান্ত ধরে অপর প্রান্ত মাটিতে হেঁচড়ে আমি ঘোড়ার কাছে গেলাম। ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলে ঘোড়া আমাকে নিয়ে ছুটতে লাগলো। এক সময় আমি উপকূলীয় এলাকায় তাঁদের কাছে এসে পৌঁছলাম। হঠাৎ ঘোড়া লাফাতে শুরু করলো। আমি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলাম। পুনরায় আমি ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করলাম এবং তূন্ এর দিকে হাত বাড়ালাম এবং পাশার তীর বের করে জানতে চাইলাম, তাকে বিপদে ফেলতে পারব কিনা। কিন্তু যে তীর বের হলো সেটি আমার অপছন্দনীয়। আমি লক্ষ্য করলাম যে, আল্লাহর রসূল নির্বিকারভাবে একাগ্রচিত্তে কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন। কোনদিকেই তাঁর খেয়াল নেই। আবু বকর সিদ্দিক পেছন ফিরে আমাকে দেখছিলেন। হঠাৎ আমার ঘোড়ার সামনের পা দু'খানি মাটিতে দেবে গেলো। হাঁটু পর্যন্ত দেবে গেলো এক সময়। আমি ঘোড়া থেকে পড়ে গেলাম। ঘোড়াকে শাসন করলাম, ঘোড়া উঠতে চাইলো। অনেক কষ্টে ঘোড়া নিজের পা উপরে তুললো। ঘোড়া পা তুললে তার পায়ের নিশানা থেকে ধোঁয়ার মতো ধুলো উড়ছিলো। আমি তীর দ্বারা ভাগ্য পরীক্ষা করলাম, এবার ও এমন তীর বের হলো, যা আমি চাইনি। এরপর আামি স্বাভাবিক কণ্ঠে তাদের ডাক দিলাম, তারা থামলেন। ঘোড়ার পিঠে করে আমি তাদের কাছে পৌঁছলাম। যখনই আমি তাদের থামালাম, তখনই হঠাৎ আমার মনে হলো আল্লাহর রসূলই বিজয়ী হবেন। আমি তখন আল্লাহর রসূলকে বললাম, আপনার স্বজাতীয়রা আপনার জীবনের পরিবর্তে পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। সাথে সাথে মক্কার লোকদের সংকল্প সম্পর্কেও আমি তাঁকে অবহিত করলাম। তাঁকে পথের কিছু সম্বলও দিতে চাইলাম। কিন্তু তিনি কিছুই নিলেন না এবং আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসাও করলেন না। শুধু বললেন, আমাদের ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করো। তাঁকে বললাম, আপনি আমাকে নিরাপত্তার পরোয়ানা লিখে দিন। আল্লাহর রসূল তখনই আমের ইবনে ফোহায়রাকে আদেশ দিলেন। আমের নিরাপত্তার পরোয়ানা স্বরূপ এক টুকরো চামড়ায় কিছু কথা লিখে আমাকে দিলেন। এরপর আল্লাহর রসূল সামনে অগ্রসর হলেন।[২৫]

এ ঘটনা সম্পর্কে হযরত আবু বকরের একটি বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেন, আমরা রওয়ানা হওয়ার পর কওমের লোকেরা আমাদের তালাশ করছিলো। কিন্তু ছোরাকা ইবনে মালেক ইবনে জুশুম ছাড়া কেউ আমাদের দেখতে পায়নি। ছোরাকা ঘোড়ায় চড়ে এসেছিলো। আমি বললাম, হে

---

২৫. বোখারী ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫৪, বনি মুদলেজদের জন্মস্থান ছিলো রাবেগের কাছে। ছোয়াকা যে সময় অনুসরণ করেছিলো, সে সময় প্রিয় নবী (সঃ) কোদায়েদ থেকে ওপরের দিকে উঠছিলেন। যাদুল মা'য়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৩। গারে ছুর থেকে রওয়ানা হওয়ার তৃতীয় দিনে এ ঘটনা ঘটেছে বলেই মনে হয়।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, একটি লোক আমাদের পিছু লেগেছে, সে কাছাকাছি এসে পড়েছে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে সাথে বললেন, 'লা তাহযান ইন্নাল্লাহা মাআনা।' অর্থাৎ ভয় পেয়ো না, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।[২৬]

ছোরাকা মক্কায় ফিরে এসে দেখতে পেলো, তখনো অনুসন্ধান অব্যাহত রয়েছে। আল্লাহর রসূলকে সে যে পথে দেখেছে, সেদিকে কিছু লোককে দেখে ছোরাকা বললো, ওদিকে তোমাদের যে কাজ ছিলো সেটা হয়ে গেছে। দিনের শুরুতে যে লোক ছিলো সন্ধানকারীদের একজন, দিনের শেষে সেই ব্যক্তিই হয়ে গেলো আমানতদার।[২৭]

পাঁচ) পথে বুরাইদা আসলামির সাথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাক্ষাৎ হলো। এই লোক ছিলো তার কওমের সর্দার। কোরায়শদের ঘোষিত পুরস্কারের লোভে এই লোকও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আবু বকর (রা.)-এর সন্ধানে বের হয়েছিলো কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কথা বলার সাথে সাথে তার মনে ভাবান্তর হলো। তিনি নিজ গোত্রের ৭০ জন লোকসহ সেখানেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর পাগড়ি খুলে বর্শায় বেঁধে দোলাতে দোলাতে সুসংবাদ শোনালেন যে, শান্তির বাদশাহ, সমাঝোতার পথিকৃৎ, পৃথিবীকে ন্যায় বিচার ও ইনসাফে পরিপূর্ণ করার অগ্রপথিক আগমন করছেন।[২৮]

ছয়) মদীনা যাওয়ার পথে হযরত যোবায়ের ইবনে আওয়ামের (রা.) সাথে প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখা হলো। তিনি মুসলমানদের একটি বাণিজ্য কাফেলার সঙ্গে সিরিয়া থেকে ফিরছিলেন। তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কে কিছু জিনিস উপহার দেন।[২৯]

কোবায় অবস্থান

নবুয়তের চুর্তদশ বছরের ৮ই রবিউল আউয়াল অর্থাৎ ১লা হিজরী মোতাবেক ২৩শে সেপ্টেম্বর ৬২২ ঈসায়ী সালের সোমবার প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোবায় অবতরণ করেন।[৩০]

হযরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রা.) বলেন, মদীনার মুসলমানরা মক্কা থেকে প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওয়ানা হওয়ার খবর জেনেছিলেন এ কারণে মদীনার বাইরে হাররার নামক স্থানে এসে প্রতিদিন তারা অপেক্ষা করতেন। দুপুরের রোদ অসহ্য হয়ে উঠলে ফিরে যেতেন। একদিন এমনি করে দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর সবাই ঘরে ফিরে গেছেন। এ সময় একজন ইহুদী ব্যক্তিগত কাজে একটি টিলার উপর উঠেছিলো। হঠাৎ সে সাদা কাপড়ের তৈরী চাঁদোয়া লক্ষ্য করলো। আনন্দের আতিশয্যে সে চিৎকার করে বলতে লাগলো, শোনো মুসলমানরা, শোনো, তোমরা যার জন্যে প্রতিদিন অপেক্ষা করছিলে, তিনি আসছেন। একথা শোনা মাত্রই মুসলমানরা ছুটে এলো এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তাদের প্রাণপ্রিয় নেতাকে অভ্যর্থনা জানানোর

---

২৬. সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ৫১৬

২৭. সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ৫১৬

২৮. রহমাতুল লিল আলামীন, ১ম খন্ড, পৃ. ১০১

২৯. সহীহ বোখারী ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫৪

৩০. রহমতুল লিল আলামীন ১ম খন্ড, পৃ. ১০২। সেই তারিখে প্রিয় রসূল (সঃ)-এর বয়স পুরোপরি তেপান্ন বছর পূর্ন হয়েছিলো। যারা হস্তী যুদ্ধের ঘটনার বছর হিসেবে ৯ই রবিউল আউয়াল ৪১ সালের হিসাবে নবুয়তের হিসাব করেন, তাদের হিসাব মতো এ তারিখে নবুয়তের ১৩ বছর পূর্ণ হয়েছিলো। আর যারা হস্তী যুদ্ধের ঘটনার হিসাব ৪৯ সালের রমযান মাসে তাঁর নবুয়তের শুরু মনে করেন, তাদের হিসাব অনুযায়ী এ তারিখে তাঁর নবুয়তের বয়স ১২ বছর ৫ মাস ১২ দিন বা ২২ দিন।

জন্যে বেরিয়ে পড়লো।[৩১]

ইবনে কাইয়েম বলেন, ঘোষণার সাথে সাথে বনি আমর ইবনে আওফের মধ্যে শোরগোল পড়ে গেলো এবং তকবির ধ্বনি শোনা গেলো। মুসলমানরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের সম্বর্ধনার জন্যে বেরিয়ে পড়লো। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভ্যর্থনা জানালো এবং তাঁর চারপাশে ভিড় করতে লাগলো। সে সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন নীরব। তাঁর ওপর তখন কোরআনের এই আয়াত নাযিল হচ্ছিলো, 'কিন্তু তোমরা যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে একে অপরের পৃষ্ঠপোষকতা করো, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ তায়ালাই তার বন্ধু, জিবরাঈল ও সৎকর্মপরায়ন মোমেনরা, উপরন্তু অন্যান্য ফেরেশতারাও তাঁর সাহায্যকারী।' (সূরা তাহরীম, আয়াত ৪)

হযরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (রা.) বলেন, লোকদের সাথে মিলিত হওয়ার পর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামতাদের সাথে ডানদিকে অগ্রসর হলেন এবং বনি আমর ইবনে আওফের বাড়ী অভিমুখে রওয়ানা হলেন। এ দিন ছিলো সোমবার, মাস ছিলো রবিউল আউয়াল। হযরত আবু বকর (রা.) আগন্তুকদের অভ্যর্থনার জন্যে দাঁড়িয়েছিলেন, আর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপচাপ বসেছিলেন।

আনসারদের মধ্যে যারা ইতিপূর্বে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেননি, তারা হযরত আবু বকর (রা.)-কে সালাম করছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গায়ের ওপর ঢলে পড়া সূর্যের কিরণ এসে পড়লে হযরত আবু বকর (রা.) একখানি চাদর দিয়ে তাঁকে ছায়া করে দাঁড়ালেন। এতে সবাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনতে পারলেন।[৩৩]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভ্যর্থনার জন্যে মদীনায় জনতার ঢল নামলো। এটি ছিলো এক ঐতিহাসিক দিন। মদীনার মাটি এ ধরনের দৃশ্য অতীতে কোনোদিন দেখেনি। ইহুদীরাও প্রতিশ্রুত নবীর আগমন প্রত্যক্ষ করলো। বাইবেলে উল্লেখ রয়েছে, আল্লাহ দক্ষিণ দিক থেকে তার আগমন ঘটাবেন এবং যিনি পবিত্র, তিনি 'ফারান' পর্বত থেকে আগমন করবেন।[৩৪]

রসূল মদীনায় কুলসুম ইবনে হাদাম, মতান্তরে সায়াদ ইবনে খায়ছামার ঘরে অবস্থান করেন। তবে প্রথম তথ্যটি অধিক নির্ভরযোগ্য।

ইতিমধ্যে হযরত আলী (রা.) মক্কায় তিনদিন অবস্থান করে মানুষের আমানতসমূহ বুঝিয়ে দিয়ে মদীনায় আসেন।[৩৫]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোবায় মোট চারদিন[৩৬]। সোম, মঙ্গল, বুধ ও

---

[৩১]. সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫৫

[৩৩]. সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫৫

[৩৪] বাইবেল, হাবকুক অধ্যায়, পৃ. ৩

৩৫. যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৪, ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৯৩ রহমাতুল লিল আলামিন।

৩৬. এটা ইবনে ইসহাকের বর্ণনা। ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৯৪ দেখুন। এই বর্ণনাই আল্লামা মনসুরপুরী গ্রহণ করেছেন। রহমাতুল লিল আলামীন ১ম খন্ড, পৃ. ১০২ দেখুন। কিন্তু সহীহ বোখারীর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, প্রিয় রসূল সেখানে ২৪ রাত অবস্থান করেন। ১ম খন্ড পৃ. ৬১। অন্য এক বর্ণনায় ১০ রাতের চেয়ে কিছু বেশীর কথা রয়েছে। ১ম খন্ড পৃ. ৫৫৫। তৃতীয় এক বর্ণনায় ১৪ রাতের কথা রয়েছে। ১ম খন্ড পৃ. ৫৬০। ইবনে কাইয়েম শেষোক্ত বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইবনে কাইয়েম ব্যাখ্যা করেছেন যে, প্রিয় নবী সোমবার কোবায় পৌঁছেছেন এবং শুক্রবার সেখান থেকে রওয়ানা হয়েছেন। যাদুল মা'য়াদ ২য় খন্ড, পৃ. ৫৪-৫৫। সোমবার ও শুক্রবার যদি পৃথক দুই সপ্তাহের নেয়া হয় তবে পথের দিনগুলো ছাড়া মোট ১০ দিন হয়। পথের সময়সহ ১২

বৃহস্পতিবার অবস্থান করেন। কারো কারো মতে ১০ দিন, কারো কারো মতে রওয়ানা ও পথের কয়েকদিন ছাড়া কোবায় মোট ২৪ দিন অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি মসজিদে কোবার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন এবং সেই মসজিদে নামায আদায় করেন। নবুয়ত প্রাপ্তির পর এটি ছিলো প্রথম মসজিদ। তাকওয়ার ওপর এই মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিলো। পঞ্চম, দ্বাদশ বা ২৬তম দিনের শুক্রবারে তিনি আল্লাহর নির্দেশে সওয়ারীর ওপর আরোহন করেন। রওয়ানা হওয়ার আগে তিনি তাঁর মামার গোত্র বনু নাজ্জাহকে খবর পাঠালে তারা তলোয়ার সজ্জিত করে হাযির হলো। তিনি তাদের সাথে নিয়ে মদীনার পথে রওয়ানা হলেন। বনু সালেম ইবনে আওফের জনপদে পৌঁছার পর জুমার নামাযের সময় হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকালয়ে জুমার নামায আদায় করলেন। জুমার জামাতে একশ মুসল্লী হাযির হয়েছিলেন।[৩৭] এখনো সেখানে এ মসজিদ রয়েছে।

রসূলুল্লাহর মদীনায় প্রবেশ

জুমার নামায আদায়ের পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা গমন করেন। সেদিন থেকে ইয়াসরেবের নাম হয়েছে 'মদীনাতুর রসূল' বা শহরে রসূল। সংক্ষেপে মদীনা। এই দিন ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় দিন। চারদিকে আল্লাহর প্রশংসা ধ্বনি শোনা যাচ্ছিলো। আনসার শিশুরা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে এ গান গাইছিলো।

'দক্ষিণের সেই পাহাড় থেকে উদয় হলো মোদের ওপর চতুর্দশীর চাঁদ।

শোকরিয়া আদায় করা আল্লাহর, কর্তব্য মোদের সকলের।

তোমার আদেশ পালন আর আনুগত্য কর্তব্য মোদের সকলের, পাঠিয়েছেন তোমায় আল্লাহ সর্ব শক্তিমান।[৩৮]

আনসাররা ধনী বা বিত্তশালী ছিলেন না কিন্তু সবাই চাচ্ছিলেন যে, নবী তার বাড়ীতেই অবস্থান করবেন। যে এলাকা দিয়ে তিনি যাচ্ছিলেন, সেখানের লোকেরাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উটের রশি ধরে তাঁর বাড়ীতে আসার আবেদন জানাতেন। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলে দিলেন যে, উটনীর পথ ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর তরফ থেকে আদেশ পেয়েছে। এরপর উটনী ইচ্ছামতো চলতে লাগলো এবং বর্তমানে যেখানে মসজিদে নববী রয়েছে সেখানে গিয়ে থামলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটনী থেকে নামলেন না। উটনী সামনে কিছুদূরে এগিয়ে গেলো এরপর পুনরায় ঘুরে আগের জায়গায় ফিরে এসে বসে পড়লো। এটা ছিলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নানাদের মহল্লা অর্থাৎ বনু নাজ্জারদের মহল্লা। উটনীকে আল্লাহর ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়ায় সে বনু নাজ্জার এলাকায় থেমে নানাদের প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও মনে মনে এটাই চাচ্ছিলেন। এবার বনু

দিন এমতাবস্থায় ১৪ দিন কি করে হবে?

৩৭. সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫৫, ৫৬০ যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৫, ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড পৃ. ৪৯৪ রহমাতুললিল আলামীন ১ম খন্ড পৃ. ১০২

৩৮. কবিতার এ তরজমা আল্লামা মনসুরপুরী করেছেন। আল্লামা ইবনে কাইয়েম লিখেছেন, এই কবিতা তবুক থেকে রসূলের ফেরার সময় আবৃত্তি করা হয়েছিলো। যিনি বলেন যে, মদীনায় নবী (সাঃ)-এর প্রবেশের সময়েই শুধু এ কবিতা পড়া হয়েছে একথাকে তিনি ভুল বলেছেন। যাদুল মায়াদ, ৩য় খন্ড, পৃ ১০। তবে আল্লামা ইবনে কাইয়েম ভুল বললেও নির্ভরযোগ্য যুক্তি প্রমাণ দিতে পারেননি। পক্ষান্তরে আল্লামা মনসুরপুরী একথাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, এ কবিতা মদীনায় প্রবেশের সময় পড়া হয়েছিলো। তিনি বলেছেন, এ ব্যাপারে তাঁর কাছে বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি প্রমাণও রয়েছে। দেখুন রহমতুল লিল আলামিন, ১ম খন্ড, পৃ. ১০৬

নাজ্জার গোত্রের লোকেরা নিজ নিজ বাড়ীতে নিয়ে তাকে যাওয়ার জন্যে আবেদন নিবেদন শুরু করলো। আবু আইয়ুব আনসারী এগিয়ে এসে উটের লাগাম ধরলেন এবং তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, মানুষ তার উটের পালানের সঙ্গে রয়েছে। এরপর হযরত আসআদ ইবনে যোরারাহ এসে উটনীর লাগাম ধরলেন, উটনী তখন থেকে তাঁর নিয়ন্ত্রণেই থাকলো।[৩৯]

সহীহ বোখারী শরীফে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমাদের মধ্যে কার ঘর সবচেয়ে কাছে? হযরত আবু আইউব আনসারী বললেন, আমার ঘর, হে আল্লাহর রসূল। এই হচ্ছে আমার ঘর, আর এই হচ্ছে আমার দরজা। আল্লাহর রসূল বললেন, যাও আমাদের জন্যে কাইলুলা অর্থাৎ মধ্যাহ্নের বিশ্রামের ব্যবস্থা করো। আবু আইউব বললেন, আপনারা উভয়ে আসুন, আল্লাহ তায়ালা বরকত দেবেন।[৪০]

কয়েকদিন পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিনী উম্মুল মোমেনীন হযরত সাওদা, দুই কন্যা ফাতেমা এবং উম্মে কুলসুম, ওসামা ইবনে যায়েদ এবং উম্মে আরমানও এসে পড়লেন। এদের সবাইকে হযরত আবু বকরের পরিবারের সাথে আবদুল্লাহ ইবনে আবু বকর মদীনায় নিয়ে আসেন। হযরত আয়েশা (রা.)-ও এদের সঙ্গে ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এক কন্যা হযরত যয়নব হযরত আবুল আস-এর কাছে রয়ে গেলেন। তিনি তখন আসতে দেননি। তিনি বদরের যুদ্ধের পর আগমন করেন।[৪১]

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, প্রিয় রসূল (রা.) মদীনায় আসার পর হযরত আবু বকর এবং হযরত বেলাল (রা.) জ্বরে আক্রান্ত হলেন। আমি তাদের কাছে গিয়ে বললাম, আব্বাজান, আপনি কেমন আছেন? বেলাল (রা.), আপনি কেমন আছেন? হযরত আবু বকরের জ্বর এলে তিনি এ কবিতা আবৃতি করতেন,

'পরিবারের সদস্যদের সবাই বলে সুপ্রভাত
কেউ ভাবে না জুতোর ফিতার চেয়েও তার মরণ কাছে।'

হযরত বেলাল (রা.) কিছুটা সুস্থ হওয়ার পর তাঁর সুরেলা কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন,

'জানতাম যদি রাত্রি যাপন করবো আমি মক্কার প্রান্তরে চারিপাশে রবে ইযখিরও জালিল (ঘাস)। মার্জিন্নার ঝর্ণার ধারে যেতে পারব কিনা জানি না। সামা আর তোফায়েল পাহাড় দেখতে কি পাবো?'

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছাকাছি গিয়ে এ খবর দিলাম, তিনি বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, মক্কা যেমন আমাদের কাছে প্রিয় ছিলো, মদীনাকেও তেমন প্রিয় করে দাও, বরঞ্চ মদীনার পরিবেশ ও আবহাওয়া তার চেয়ে বেশী স্বাস্থ্যকর করে দাও। এখানে শস্যের মধ্যে বরকত দাও। এখান থেকে অসুখ জাহফায় সরিয়ে নাও।[৪২] আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবীর দোয়া কবুল করলেন, পরিস্থিতির পরিবর্তন হলো।

এ পর্যন্ত প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের এক অংশ এবং ইসলামী দাওয়াতের মক্কী যুগ পূর্ণ হয়ে গেলো।

---

৩৯. যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. রহমাতুল লিল আলামীন ১ম খন্ড পৃ. ১০৬

৪০. সহীহ বোখারী ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫৬

৪১. যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৫

৪২. সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ, ৫৮৮-৫৮৯

আমি যদি এদের (আমার) যমীনে (রাজনৈতিক) প্রতিষ্ঠা দান করি, তাহলে তারা নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত আদায় (-এর ব্যবস্থা) করবে, সৎ কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দকাজ থেকে বিরত রাখবে, (অবশ্য) সব কাজের চূড়ান্ত পরিণাম কিন্তু আল্লাহ তায়ালারই এখতিয়ারভুক্ত।

(সূরা হজ্জ ৪১)

ইয়াসরাবের দশ বছর

ফকীরের বেশে বাদশাহ

মাদানী জীবনের বিভিন্ন ভাগ

হিজরতের সময় মদীনার সার্বিক অবস্থা

এক) প্রথমত, মুসলমানদের ফেতনা ও বিশৃঙ্খলা এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। একই সাথে বহিশত্রুরা মদীনাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে মদীনার ওপর হামলা চালিয়েছিলো। ষষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে হোদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত এ পর্যায় অব্যাহত ছিলো।

দুই) দ্বিতীয়ত, পৌত্তলিকদের সাথে তাদের সন্ধি হয়েছিলো। অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে এ পর্যায়ের সমাপ্তি হয়। এ পর্যায়ে বিভিন্ন দেশের শাসনকর্তাদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হয়।

তিন) তৃতীয়ত, আল্লাহর দ্বীনে মানুষ দলে দলে প্রবেশ করতে থাকে। এ পর্যায়ে মদীনায় বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং গোত্রের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএর জীবনের শেষ অর্থাৎ একাদশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এ পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন তিনটি গোষ্ঠীর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়েছিলো, যাদের ক্ষেত্রে ভিন্নতার প্রাধান্যই ছিলো বেশী। এরা হচ্ছে,

এক) আল্লাহর মনোনীত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে উত্তম প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও আল্লাহর পথে ধন প্রাণ উৎসর্গ করতে সদাপ্রস্তুত সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর জামাত।

দুই) মদীনার প্রাচীন এবং প্রকৃত অধিবাসীদের সাথে সংযোগ স্থাপনকারী পৌত্তলিকরা, যারা তখনো ঈমান আনেনি।

তিন) ইহুদী সম্প্রদায় ও সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো, তা ছিলো এই যে, মদীনার অবস্থা ছিলো মক্কার অবস্থার চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক। মক্কায় যদিও ছিলেন একই কালেমার অনুসারী এবং তাদের উদ্দেশ্যও ছিলো অভিন্ন। কিন্তু তারা বিভিন্ন পরিবারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। তারা ছিলেন শঙ্কিত, দুর্বল ও অবমাননার সম্মুখীন। তাদের হাতে কোন ক্ষমতা ছিলো না। সকল ক্ষমতা ছিলো শত্রুদের হাতে। যেসব উপাদানের ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীতে একটি সমাজ গঠন করা হয়, মক্কায় মুসলমানদের হাতে তার কিছুই ছিলো না। কিসের ভিত্তিতে মুসলমানরা সমাজ গঠনে সক্ষম হবে? এ কারণে দেখা যায় যে, মক্কায় অবতীর্ণ কোরআনের সূরাসমূহে শুধু ইসলামী দাওয়াতের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ সময়ে এমন সব আহকাম অবতীর্ণ হয়েছে, যার ওপর প্রতিটি মানুষই পৃথক পৃথক আমল করতে পারে।

পক্ষান্তরে মদীনায় যাওয়ার পর প্রথম দিন থেকেই ক্ষমতার বাগডোর ছিলো মুসলমানদের হাতে। মুসলমানদের ওপর অন্য কারো আধিপত্য ছিলো না। সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধ, সন্ধিসহ তাদের অনেক আইন কানুনের মুখোমুখি হতে হচ্ছিলো। সেটা ছিলো হালাল-হারাম মেনে চলা ও উন্নত চরিত্রের প্রতিফলনের মাধ্যমে উন্নত জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশের সময় মুসলমানদের একটি নয়া সমাজ অর্থাৎ ইসলামী সমাজ গঠনের প্রত্যক্ষ আদর্শ গড়ে তোলা। সেই সমাজ হবে একটি আদর্শ সমাজ। মূর্খতা ও অজ্ঞতা থেকে মুক্ত সেই সমাজে জাহেলী সমাজের কোন চিহ্ন

থাকবে না। সেই সমাজ হবে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। ইসলামের দাওয়াতের জন্যে মুসলমানরা যে দশ বছর যাবত নানা ধরনের দুঃখকষ্ট নির্যাতন-নিষ্পেষণ সহ্য করেছিলো তার বাস্তবতা প্রমাণের সময় তখন এসে পড়েছিলো।

এ ধরনের কোন সমাজ একদিন একমাস বা এক বছরে গঠন করা সম্ভব নয় বরং এর জন্যে প্রয়োজন দীর্ঘ সময় যাতে করে, ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রম নির্দেশ প্রদান করা যায় এবং আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। নির্দেশ ও আইন কানুন বাস্তবায়ন মুসলমানদের প্রশিক্ষণ ও পথনির্দেশের দায়িত্ব ছিলো সরাসরি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তিনিই উম্মীদের মধ্য থেকে তাদের একজনকে রসূলরূপে পাঠিয়েছেন। যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াত তেলাওয়াত করেন, তাদেরকে পবিত্র করেন এবং তাদের কেতাব ও হেকমত শিক্ষা দেন, অথচ ইতিপূর্বে এরাই ছিলো ঘোর বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। (সূরা জুমুয়া', আয়াত-২)

এদিকে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা এরূপ ছিলো যে, তাঁরা সব সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি মনোযোগী থাকতেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আদেশ প্রদান করতেন, সেই আদেশ যথাযথভাবে পালন করে সন্তুষ্টি লাভ করতেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যখন তাঁর আয়াত নিদর্শন তাদের কাছে পাঠ করা হয় তখন সেটা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে।'

এসব বিষয় আমাদের এখানে আলোচনার পর্যায়ভুক্ত নয়, এ কারণে আমরা সেসব বিষয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী যথাস্থানে আলোচনা করবো।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের ফলে সৃষ্ট বিষয়গুলো, ইসলামের দাওয়াত এবং রেসালাতে মোহাম্মদীই হচ্ছে এখানে মুখ্য বিষয়। কিন্তু এটাও কোন হুজুগপূর্ণ বিষয় নয়। বরং এটা একটা পৃথক এবং স্থায়ী বিষয়। এছাড়া অন্য কিছু বিষয়ও ছিলো, যেসব বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন ছিলো। সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ,

মুসলমানদের মধ্যে দুই প্রকারের লোক ছিলো। এক প্রকারের লোক যারা ছিলেন নিজেদের জমি, বাড়ী-ঘর এবং অর্থ-সম্পদের মধ্যে নিশ্চিন্তেই জীবন যাপন করছিলেন। এরা ছিলো আনসার গোত্রের লোক। এদের পরস্পরের মধ্যে বংশানুক্রমিকভাবে শত্রুতা চলে আসছিলো। এদের পাশাপাশি আরেকটি দলে ছিলেন মোহাজের। তারা উল্লিখিত সুবিধা থেকে ছিলেন বঞ্চিত। তারা কোন না কোন উপায়ে খালি হাতে মদীনা পৌঁছেছিলেন। তাদের থাকার কোন ঠিকানা ছিলো না, ক্ষুধা নিবারণের জন্যে কোন কাজও ছিলো না। সঙ্গে টাকা-পয়সা বা অন্য কোন জিনিসও ছিলো না, যা দিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মত ব্যবস্থা করা যায়। পরাশ্রয়ী এসকল মোহাজেরের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছিলো। কেননা কোরআনের ঘোষণা প্রচার করা হয়েছিলো যে, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যারা ঈমান রাখে, তারা যেন হিজরত করে মদীনায় চলে আসে। এটা তো জানাই ছিলো যে, মদীনায় তেমন কোন সম্পদও নেই এবং আয়-উপার্জনের উল্লেখযোগ্য উপায়-উপকরণও নেই। ফলে মদীনার অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় এবং সেই সঙ্কটময় সময়ে ইসলামের শত্রুরা মদীনাকে অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করে। এতে আমদানীর পরিমাণ কমে যায় এবং পরিস্থিতি আরো গুরুতর হয়ে পড়ে।

অন্য একটি দলে ছিলো মদীনার অমুসলিম অধিবাসী। তাদের অবস্থা মুসলমানদের চেয়ে ভালো ছিলো না। কিছু অমুসলিম পৌত্তলিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও সন্দেহের মধ্যে ছিলো এবং নিজেদের পৈতৃক ধর্ম-বিশ্বাস পরিবর্তনে দ্বিধান্বিত ছিলো। কিন্তু ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের মনে কোন প্রকার শত্রুতা বা বিদ্বেষ ছিলো না। এ ধরনের লোকেরা অল্পকালের মধ্যেই ইসলাম

গ্রহণ করে সত্যিকার মুসলমানে পরিণত হলো।

পক্ষান্তরে কিছু পৌত্তলিক এমন ছিলো, যারা মনে মনে নিজেদের বুকের ভেতর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড ঘৃণা ও শত্রুতা পোষণ করতো। কিন্তু মুখোমুখি এসে দাঁড়াবার বা মোকাবেলা করার সাহস তাদের ছিলো না। বরং পরিস্থিতির কারণে তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসার ভাব দেখাতো এবং সরলতার অভিনয় করতো। এদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। এখানে উল্লেখ্য যে, বুআসের যুদ্ধের পর আওস ও খাযরাজ গোত্র তাকে নিজেদের নেতা করার ব্যাপারে একমত হয়েছিলো।

এর আগে অন্য কোন ব্যাপারে এ দু'টি গোত্র ঐকমত্যে উপনীত হয়নি। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে বাদশাহ ঘোষণার প্রস্তুতি নিয়ে আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা বর্ণাঢ্য মুকুট তৈরী করছিলো। এমনি সময়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় এসে পৌঁছুলেন। জনগণের দৃষ্টি তখন আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পরিবর্তে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নিবদ্ধ হলো। এ কারণে আবদুল্লাহ মনে করলো যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই তার বাদশাহী কেড়ে নিয়েছেন। ফলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সে মনে মনে প্রচন্ড ঘৃণা পোষণ করতো। তা সত্ত্বেও বদরের যুদ্ধের পর আবদুল্লাহ লক্ষ্য করলো যে, পরিস্থিতি তার অনুকূলে নয়, এ অবস্থায় শেরেকের উপর অটল থাকলে সে পার্থিব সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হবে। এ কারণে সে দৃশ্যত ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করলো। কিন্তু মনে মনে সে ছিলো কাফের। ফলে মুসলমানদের ক্ষতি করার কোন সুযোগই সে হাতছাড়া করেনি। তার সাথী ছিলো ওই সকল লোক, যারা এই মোনাফেকের নেতৃত্বে বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন দেখছিলো। কিন্তু সেসব সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হলো। ফলে এরাও মুসলমানদের ক্ষতি করতে সব সময় প্রস্তুত থাকতো। মোনাফেক নেতা আবদুল্লাহর পরিকল্পনা এরা বাস্তবায়িত করতো। এই উদ্দেশ্যে তারা মদীনার কিছুসংখ্যক সরলপ্রাণ যুবক মুসলমানকেও নিজেদের দলে এনে ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহার করতো।

তৃতীয় শ্রেণীর লোক ছিলো এখানকার ইহুদী। এরা অশোরী এবং রোমীয়দের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে হেজাযে আশ্রয় নিয়েছিলো। প্রকৃতপক্ষে এরা ছিলো হিব্রু। হেজাযে আশ্রয় নেয়ার পর চালচলন, কথাবার্তা ও পোশাক পরিচ্ছদে তাদেরও আরব বলে মনে হতো। এমনকি তাদের গোত্র এবং মানুষের নামকরণও ছিলো আরবদের মতো। আরবদের সাথে তাদের বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়েছিলো। কিন্তু এতোসব সত্তেও তারা তাদের বংশ-গৌরব ভুলতে পারেনি। তারা নিজেদের ইসরাঈলী অর্থাৎ ইহুদী হওয়ার মধ্যেই গৌরব বোধ করতো। আরবদের তারা মনে করতো খুবই নিকৃষ্ট। ওদেরকে উম্মী বলে গালি দিতো। এই উম্মী বলতে তারা বোঝাতো নির্বোধ, মুর্খ, জংলী, নীচু এবং অচ্ছ্যুৎ। তারা বিশ্বাস করতো যে, আরবদের ধন-সম্পদ তাদের জন্যে বৈধ। যেভাবে ইচ্ছা তারা ভোগ ব্যবহার করতে পারবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তারা বলে, নিরক্ষরদের প্রতি আমাদের কোন বাধ্য-বাধকতা নেই।' (আলে ইমরান, আয়াত ৭৫)

অর্থাৎ উম্মীদের অর্থ-সম্পদ ভোগ ব্যবহার আমাদের জন্যে দোষণীয় নয়। এসব ইহুদীর মধ্যে তাদের দ্বীনের প্রচার প্রসারের ব্যাপারে কোন প্রকার তৎপরতা লক্ষ্য করা যেতো না। ভাগ্য গণনা, যাদু, ঝাড়ফুঁক এ সবই ছিলো তাদের ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের অংশ। এ সব কিছুর মাধ্যমেই তারা নিজেদেরকে জ্ঞানী, পন্ডিত এবং আধ্যাত্মিক নেতা মনে করতো।

ইহুদীরা ধন-সম্পদ উপার্জনের ব্যাপারে ছিলো দক্ষ। তারা খাদ্য-সামগ্রী, খেজুর, মদ এবং পোশাকের ব্যবসা করতো। তারা খাদ্য সামগ্রী পোশাক এবং মদ আমদানি করতো এবং খেজুর

রফতানী করতো। এছাড়াও আরো নানা ধরনের কাজ-কর্মে তারা নিজেদের ব্যস্ত রাখতো। ব্যবসা বাণিজ্যের মালামালের মধ্যে তারা আরবদের কাছ থেকে দ্বিগুণ তিনগুণ মুনাফা করতো। শুধু তাই নয় তারা সুদও খেতো। তারা আরবের শেখ সর্দারদের সুদের ওপর টাকা ধার দিতো। ধার নেয়া অর্থ আরব শেখ ও সর্দাররা খ্যাতি লাভের জন্যে তাদের প্রশংসাকারী কবিদের জন্যে উদারভাবে ব্যয় করতো। এদিকে ইহুদীরা সুদের ওপর অর্থ ধার দেয়ার বিনিময়ে বিভিন্ন জিনিস বন্ধক রাখতো। এতে কয়েক বছরেই ইহুদীরা সেসব সম্পত্তির মালিক হয়ে যেতো।

ইহুদীরা ষড়যন্ত্র এবং যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়ার ব্যাপারে ছিলো তুখোড়। তারা প্রতিবেশী গোত্রসমূহের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে শত্রুতার বীজ বপন করতো। একটি গোত্রকে অন্য গোত্রের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে এবং লেলিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তারা ছিলো সদা-তৎপর। অথচ যারা পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হতো তারা ঘূণাক্ষরেও এসব বুঝতে পারত না। পরবর্তী সময়ে বিবদমান গোত্রগুলোর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত লেগে থাকতো। যুদ্ধের আগুন নিভু নিভু হয়ে আসছে লক্ষ্য করলে ইহুদীরা পুনরায় তৎপর হয়ে উঠতো। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, পরস্পরকে লেলিয়ে দিয়ে ইহুদীরা চুপচাপ বসে থাকতো। তারা আরবদের ধ্বংসের দৃশ্য দেখতো। সে সময়েও মোটা সুদে অর্থ ধার দিতো। মূলধনের অভাবে যুদ্ধ বন্ধ হোক সেটা তারা চাইত না। এতে ইহুদীরা দুই প্রকারে লাভবান হতো। একদিকে নিজেদের সম্প্রদায়কে নিরাপদ রাখতো, অন্যদিকে সুদের ব্যবসা জমজমাট রাখতো। সুদের ওপর সুদ হিসাব করেই তারা অর্থ উপার্জন করতো।

মদীনার প্রধান তিনটি ইহুদী গোত্র

এক) বনু কাইনুকা। এরা ছিলো খাযরাজ গোত্রের মিত্র। এরা মদীনার ভেতরেই বসবাস করতো।

দুই) বনু নাযির।

তিন) বনু কোরাইযা। এ দুটি গোত্র ছিলো আওস গোত্রের মিত্র। মদীনার শহরতলী এলাকায় এরা বসবাস করতো।

দীর্ঘকাল যাবত আওস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে যুদ্ধের আগুন জ্বলছিলো। বুআস-এর যুদ্ধে এরা নিজ নিজ মিত্র গোত্রের সমর্থনে নিজেরাও যুদ্ধে শরীক হতো। ইহুদীরা ইসলামের প্রতি শত্রুতা পোষণ করছিলো, এটাই ছিলো স্বাভাবিক। এই ধরনের শত্রুতার স্বভাব তাদের চরিত্রে বহুকাল থেকেই বিদ্যমান ছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বংশোদ্ভূত ছিলেন না, কাজেই তাদের আভিজাত্যের গৌরব কোন গুরুত্ব পাচ্ছিলো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তাদের মধ্যে থেকে আবির্ভূত হতেন তাহলে তারা মনে শান্তি পেতো। তাছাড়া ইসলামের দাওয়াত ছিলো একটি বলিষ্ঠ দাওয়াত। এতে মানুষ শত্রুতা ভুলে পরস্পর ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পায়। ন্যায়নীতি, আমানতদারী এবং হালাল হারামের বিচার-বিবেচনা করা হয়। এর অর্থ হলো, এবার ইয়াসরেবের বিবদমান গোত্রসমূহের মধ্যে সৌহার্দ্য সম্প্রীতি সৃষ্টি হবে। এর ফলে ইহুদীদের বাণিজ্যিক তৎপরতা হ্রাস পাবে। তাদের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি সুদভিত্তিক সম্পদ থেকে তারা বঞ্চিত হবে। এমনকি এ ধরনের আশঙ্কা ছিলো যে, এসব গোত্র আত্মসচেতন হবে এবং ইহুদীরা কোন কিছুর বিনিময় ছাড়াই যেসব অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করেছে ওরা সেসব ফিরিয়ে নেবে। অর্থাৎ সুদের ব্যবসায় বিভিন্ন গোত্রের যেসব বাগান ও জমি, ইহুদীরা দখল করেছে, সেসব ফিরিয়ে নেবে।

ইয়াসরেবে ইসলাম প্রচারের সূচনাতেই ইহুদীরা এসব কিছুই নিজেদের চিন্তার মধ্যে এনেছিলো। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আসার সময় থেকেই মদীনার ইহুদীরা ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি প্রবল শত্রুতা পোষণ করতো। তবে সেই শত্রুতার প্রকাশ তারা তখনই নয়, একটু দেরীতে করেছে। ইবনে ইসহাক বর্ণিত একটি ঘটনায় এ অবস্থার সুস্পষ্ট

উল্লেখ পাওয়া যায়।

ইবনে ইসহাক লিখেছেন যে, উম্মুল মোমেনীন হযরত সফিয়্যা বিনতে হুয়াই ইবনে আখতার (রা.) থেকে একটি বর্ণনা আমি পেয়েছি। তিনি বলেন, আমি ছিলাম আমার পিতা ও আমার চাচার সন্তানদের মধ্যে তাদের কাছে সর্বাধিক প্রিয়। অন্যসব সন্তানদের মধ্যে তারা আমাকে বেশী ভালোবাসতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আসার পর কোবা পল্লীতে বনু আমর ইবনে আওফের কাছে অবস্থান করলেন। এই খবর পাওয়ার পর আমার পিতা হুয়াই ইবনে আখতার এবং চাচা আবু ইয়াসের খুব সকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে গেলেন এবং সূর্যাস্তের সময় ফিরে এলেন। তারা দু'জনই ছিলেন ভীষণ ক্লান্ত।

আমি অভ্যাসবশত তাদের দিকে ছুটে গেলাম। কিন্তু তারা চিন্তায় এমন বিভোর ছিলেন যে, আমার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলেন না। আমি শুনলাম, চাচা আবু ইয়াসের এবং আমার পিতার সাথে এভাবে কথোপথন হচ্ছে-

এই কি তিনি?

-হাঁ, আল্লাহর শপথ।

-আপনি তাকে ভালোভাবে চিনেছেন তো?

-হাঁ।

-এখন আপনি তার সম্পর্কে কি মনোভাব পোষণ করছেন?

-শত্রুতা। আল্লাহর শপথ, যতদিন বেঁচে থাকি।[১]

সহীহ বোখারীতে উল্লিখিত একটি বর্ণনায়ও এর প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই বর্ণনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.)-এর মুসলমান হওয়ার বিবরণ রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ছিলেন এক উচুঁস্তরের ইহুদী পন্ডিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় আগমনের খবর পাওয়ার পরই তিনি তাঁর কাছে হাযির হলেন এবং এমন কিছু প্রশ্ন করলেন, যেসব প্রশ্নের উত্তর একজন নবী ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই দেয়া সম্ভব নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে সেসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার সাথে সাথে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ইহুদীরা অন্যের নামে অপবাদ দেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত। যদি তাদের কারো কাছে আপনি আমার সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে তারা যা বলবে, আমার ইসলাম গ্রহণের খবর শোনার পর পরই বিপরীত রকমের কথা বলবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে সাথে কয়েকজন ইহুদীকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে সালাম তোমাদের মধ্যে কেমন লোক? তারা বললো, তিনি আমাদের মধ্যেকার সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানীর পুত্র। অন্য এক বর্ণনায় এরূপ রয়েছে যে, তিনি আমাদের সর্দার এবং আমাদের সর্দারের সন্তান। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, আচ্ছা বলতো, যদি শোনো আবদুল্লাহ ইবনে সালাম মুসলমান হয়েছে? ইহুদীরা দু'বার অথবা তিনবার বললো, আল্লাহ তায়ালা তার হেফাযত করুন। এরপরই হযরত আবদুল্লাহ বেরিয়ে এলেন এবং উচ্চস্বরে বললেন, আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাছুলুল্লাহ। অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রসূল। একথা শোনার সাথে সাথে ইহুদীরা বললো, এ হচ্ছে আমাদের মধ্যেকার সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তি এবং মন্দ ব্যক্তির সন্তান। এছাড়া তাঁর নামে আরো নানা খারাপ কথা বলতে লাগলো। হযরত আবদুল্লাহ

---

[১] ইবনে হিশাম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫১৮-৫১৯

(রা.) বলেন, হে ইহুদী সম্প্রদায়, আল্লাহকে ভয় করো। সেই আল্লাহর শপথ, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তোমরা ভালো করেই জানো যে, এই হচ্ছেন আল্লাহর রসূল। তিনি সত্যসহ আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু ইহুদীরা বললো, আপনি মিথ্যা কথা বলছেন।[২]

মদীনায় আগমনের প্রথমদিকেই ইহুদীদের সম্পর্কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছিলো।

এ যাবত যা কিছু উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো মদীনার আভ্যন্তরীণ অবস্থা। মদীনার বাইরে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিলো কোরায়শরা। তারা মক্কায় মুসলমানদের দশ বছর সীমাহীন কষ্ট দিয়েছিলো। চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র, নির্যাতন ও অত্যাচারে মুসলমানদের জর্জরিত করে তুলেছিলো। মুসলমানদের কষ্ট দেয়ার কোন সুযোগই তারা হাতছাড়া করেনি। মুসলমানরা মদীনায় হিজরত করার পর কাফেররা তাদের বাড়ীঘর, জায়গা জমি, ধন-সম্পদ সব অধিকার করে নিলো। মুসলমান এবং তাদের পরিবার পরিজনের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ালো এমন কাউকে কাছে পেলে তাকে নানাভাবে কষ্ট দিচ্ছিলো। শুধু তাই নয়, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করে ইসলামের দাওয়াত সমূলে উৎপাটিত করার ভয়াবহ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। এ উদ্দেশ্যে তারা তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করলো। মুসলমানরা পাঁচশত কিলোমিটার দূরবর্তী মদীনায় গিয়ে পৌঁছার পরেও কাফেররা তাদের ষড়যন্ত্র বাদ দেয়নি। কোরায়শরা বায়তুল্লাহর প্রতিবেশী ছিলো এবং আরবদের মধ্যে ধর্মীয় নেতৃত্বের আসন ছিলো তাদের দখলে। এ কারণে তারা সে প্রভাব বিস্তার করে মক্কার বিভিন্ন গোত্রের ওপর চাপ সৃষ্টি এবং তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে মদীনাকে রাজনৈতিকভাবে বয়কট করলো। এর ফলে মদীনায় জিনিসপত্রের আমদানী কমে গেলো। এদিকে মদীনায় মোহাজেরদের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছিলো। প্রকৃতপক্ষে মক্কায় কাফেরদের সাথে মদীনার অধিবাসী মুসলমানদের যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো। এ পরিস্থিতির জন্যে মুসলমানদের দায়ী করা হলে সেটা হবে চরম নির্বুদ্ধিতা।

মুসলমানদের বাড়ীঘর ও ধন-সম্পদ যেভাবে মক্কার কাফেররা জবর দখল করে নিয়েছিলো এবং যেভাবে মুসলমানদের উপর অত্যাচার নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়েছিলো, মুসলমানরাও সঙ্গতভাবে সেরূপ কিছু করার অধিকার রাখে। মুসলমানদের স্বাভাবিক জীবনের পথে অমুসলিমরা যেভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলো, মুসলমানরাও সঙ্গতভাবেই সেরূপ বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির অধিকার রাখে। অমুসলিমদের কাজ অনুযায়ী কাজের উপযুক্ত জবাবই তারা পাওয়ার যোগ্য। এতে করে তাদের মুসলমানদের সমূলে উৎখাত করার চক্রান্ত সফল হবে না।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আমগনের পর এসব সমস্যার সম্মুখীন হন। তিনি এসব সমস্যার প্রেক্ষিতে পয়গাম্বর ও নেতাসুলভ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। যারা অনুগ্রহ পাওয়ার উপযুক্ত ছিলো, তাদের অনুগ্রহ করেন আর যারা শস্তি পাওয়ার যোগ্য ছিলো, তাদের জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা করেন। তবে এটা ঠিক যে, দয়া ও অনুগ্রহের পরিমাণ শাস্তি ও কঠোরতার চাইতে অনেক বেশী ছিলো। ফলে কয়েক বছরের মধ্যে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব মুসলমানদের হাতে এসে পড়ে। পরবর্তী পর্যায়ে সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হবে।

---

[২]. সহীহ বোখারী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা, ৪৫৯, ৫৫৬, ৫৬১

প্রথম পর্যায়

নতুন সমাজ ব্যবস্থা রূপায়ন

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৬২২ ঈসায়ী সালের ২৭ শে সেপ্টেম্বর মোতাবেক পহেলা হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল শুক্রবার বনু নাজ্জার গোত্রের হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর বাড়ীর সামনে এসে পৌঁছুলেন। সে সময় তিনি বলেছিলেন, 'ইনশাল্লাহ এটাই হবে আমাদের মনযিল।' এরপব তিনি হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর গৃহে স্থানান্তরিত হন।

মসজিদে নববীর নির্মাণ

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীর নির্মাণ কাজ শুরু করেন। মসজিদ নির্মাণের জন্যে সেই জায়গা নির্ধারণ করেন, যেখানে গিয়ে তাঁর উট যাত্রা বিরতি করে। সেই জমির মালিক ছিলো দু'টি এতিম বালক। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছ থেকে নায্য মূল্যে সেই যমিন ক্রয় করে মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। তিনি নিজেও মসজিদের জন্যে ইট ও পাথর বহন করছিলেন এবং আবৃত্তি করছিলেন,

'আল্লাহুম্মা লা আইশা ইল্লা আইশান আখেরা, ফাগফির লিল আনসারে
ওয়াল মোহাজেরে, হাযাল হামালূ লা হামালা, খায়বারা
হাযা আবাররু রাব্বিনা, ওয়া আতহারা।

সাহাবারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাথে উচ্ছ্বাসভরে আবৃত্তি করছিলেনঃ
'রাঈন কাদা'না ওয়ান নাবীউ, ইয়া'মাল
লাযাকা মিন্নাল আমালু ওয়াল মুদাল্লাল।'

অর্থাৎ হে আল্লাহ তায়ালা, জীবন তো প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের। আনসার ও মোহাজেরদের তুমি ক্ষমা করো। এই বোঝা খায়বারের বোঝা নয়।এই বোঝা আমাদের প্রতিপালকের এবং পবিত্র বোঝা। যদি আমরা বসে থাকি, আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাজ করেন, তাহলে আমরা পথভ্রষ্টতার কাজ করার জন্যে দায়ী হবো।

সেই জমিতে পৌত্তলিকদের কয়েকটি কবর ছিলো। কিছু অংশ ছিলো বিরান উচু-নীচু। খেজুর এবং অন্যান্য কয়েকটি গাছও ছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পৌত্তলিকদের কবর খোঁড়ালেন, উঁচু নীচু জায়গা সমতল করলেন। খেজুর এবং অন্যান্য গাছ কেটে কেবলার দিকে লাগিয়ে দিলেন। উল্লেখ্য সে সময় কেবলা ছিলো বায়তুল মাকদেস।

মসজিদের দরজার দু'টি বাহু ছিলো পাথরের। দেয়ালসমূহ কাঁচা ইট এবং কাদা দিয়ে গাঁথা হয়েছিলো। ছাদের ওপর খেজুর শাখা এবং পাতা বিছিয়ে দেয়া হলো। তিনটি দরজা লাগানো হলো। কেবলার সামনের দেয়াল থেকে পেছনের দেয়াল পর্যন্ত একশত হাত দৈর্ঘ ছিলো। প্রস্থ ছিলো এর চাইতে কম। বুনিয়াদ ছিলো প্রায় তিন হাত গভীর।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদের অদূরে কয়েকটি কাঁচা ঘর তৈরী করলেন এসব ঘরের দেয়াল খেজুর পাতা ও শাখা দিয়ে তৈরী। এসব ঘর ছিলো প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিনীদের বাসগৃহ। এগুলো তৈরী হওয়ার পর রসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা.)-এর ঘর থেকে এখানে এসে উঠলেন।[১]

নির্মিত মসজিদ শুধু নামায আদায়ের জন্যেই ছিলো না, বরং এটি ছিলো একটি বিশ্ববিদ্যালয়। এতে মুসলমানরা ইসলামের মূলনীতি ও হেদায়াত সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতেন।

এটি এমন এক মাহফিল ছিলো যে, এখানে গোত্রীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ঘৃণা-বিদ্বেষে জর্জরিত বিভিন্ন গোত্রের মানুষ পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের মধ্যে অবস্থান করতো। এই মসজিদ ছিলো এমন একটি কেন্দ্র, যা কেন্দ্র থেকে নবগঠিত রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজ কর্ম পরিচালিত হতো এবং এখান থেকেই বিভিন্ন অভিযানে লোক প্রেরণ করা হতো। এছাড়া এই মসজিদের অবস্থা ছিলো একটি সংসদের মতো। এতে মজলিসে শুরা এবং মজলিশে এন্তেযামিয়ার অধিবেশন বসতো।

এছাড়া এ মসজিদ ছিলো সেইসব মোহাজেরিন এবং নিরাশ্রয় লোকদের আশ্রয়স্থল, যাদের বাড়ীঘর, পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ কিছুই ছিলো না।

হিজরতের প্রথম পর্যায় থেকেই আযানের প্রচলন শুরু হয়। এই আযান ছিলো এক অপূর্ব মধুর সঙ্গীতের মতো। সেই সঙ্গীতের সুরে দিক দিগন্ত মুখরিত হয়ে উঠতো। এ ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.)-এর স্বপ্নাদেশ পাওয়ার ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। বিস্তারিত জানতে তিরমিযি, সুনানে আবু দাউদ, মোসনাদে আহমদ এবং সহীহ ইবনে খোজায়মা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববী নির্মাণের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্মিলন ও মিল মহব্বতের একটি কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। একইভাবে তিনি মানব ইতিহাসের এক অসাধারণ কাজ সম্পন্ন করেন এবং তা হচ্ছে মোহাজের ও আনসারদের মধ্যেকার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি। আল্লামা ইবনে কাইয়েম লিখেছেন, অতপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আনাস ইবনে মালেকের গৃহে মোহাজের ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করেন। সে সময় মোট নব্বইজন সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। অর্ধেক ছিলেন মোহাজের আর অর্ধেক ছিলেন আনসার। ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের মূল কথা ছিলো তারা একে অন্যের দুঃখে দুখী এবং সুখে সুখী হবে। মৃত্যুর পর নিকটাত্মীয়দের পরিবর্তে একে অন্যের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। উত্তরাধিকারী হওয়ার এ নিয়ম বদরের যুদ্ধ পর্যন্ত কার্যকর ছিলো। এরপর আল্লাহ তায়ালা কোরআনে করিমের এই আয়াত নাযিল করেন, 'নিকটাত্মীয়রা একে অন্যের বেশী হকদার।'

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যেকার সম্পত্তির ক্ষেত্রে উত্তরাধিকার আইন শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক অটুট থাকে। বলা হয় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধুমাত্র মোহাজেরদের মধ্যে আরেকটি ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করেন। কিন্তু প্রথমে উল্লেখিত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের সম্পর্কই প্রমাণিত রয়েছে। এমনিতেই বোঝা যায় যে, মোহাজেররা ইসলামী ভ্রাতৃত্ব, স্বদেশী ভ্রাতৃত্ব এবং আত্মীয়তার বন্ধনের কারণে পরস্পর ছিলেন খুবই ঘনিষ্ঠ। অন্য কোন প্রকার ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কের তারা মুখাপেক্ষী ছিলেন না। কিন্তু মোহাজের এবং আনসারদের প্রসঙ্গ ছিলো ভিন্ন রকমের।[২]

এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইমাম গাযযালী (র.) লিখেছেন, জাহেলী যুগের রীতিনীতির অবসান ঘটানো, ইসলামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং বর্ণ, গোত্র ও আঞ্চলিকতার পার্থক্য মিটিয়ে দেয়াই ছিলো এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের উদ্দেশ্য। এর ফলে এটাই বোঝানো হয়েছে যে, উচু

---

১. সহীহ বোখারী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭১, ৫৫৫, ৫৬০। যাদুল মায়াদ দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৫৬।

২. যাদুল মায়াদ, দ্বিতীয়, খন্ড, পৃষ্ঠা, ৫৬

নীচুর মানদন্ড তাকওয়া ব্যতীত অন্য কিছুতেই নেই।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনকে শুধু অন্তসারশূন্য শব্দের আবরণে সজ্জিত করেননি। বরং এমন একটি অবশ্য করণীয় ও পালনীয় অঙ্গীকাররূপে আখ্যায়িত করেছিলেন, যার সাথে সম্পৃক্ত ছিলো জানমাল। এটা শুধুমাত্র মুখে মুখে উচ্চারিত এমন সালাম ও মোবারকবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না, যার কোন ফলাফল নেই। বরং এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের সাথে আত্মত্যাগ, পরদুঃখকাতরতা এবং সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির প্রেরণাও জাগরুক ছিলো। একারণে এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধন মদীনার নতুন সমাজকে দুর্লভ ও সমুজ্জল কর্ম তৎপরতায় পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলো।[৩]

সহীহ বোখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে যে, মোহাজেররা মদীনায় আগমনের পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) এবং হযরত সা'দ ইবনে রবি (রা.)-এর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন। এরপর হযরত সা'দ ইবনে রবি (রা.) হযরত আবদুর রহমান (রা.)-কে বললেন, আনসারদের মধ্যে আমি সবচেয়ে ধনী। আপনি আমার ধন-সম্পদের অর্ধেক গ্রহণ করুন। আমার দু'জন স্ত্রী রয়েছে। আপনি ওদের দেখুন। যাকে আপনার বেশী পছন্দ হয় তার কথা বলুন। আমি তাকে তালাক দেবো। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর আপনি তাকে বিবাহ করবেন। একথা শুনে হযরত আবদুর রহমান (রা.) বললেন, আল্লাহ তায়ালা আপনার পরিবার পরিজন এবং ধন-সম্পদে বরকত দান করুন। আপনাদের এখানে বাজার কোথায়? তাকে বনু কাইনুকা বাজারের কথা জানানো হলো। তিনি বাজার থেকে ফিরে আসার পর তাঁর কাছে কিছু পনির এবং ঘি দেখা গেলো। এরপর প্রতিদিন নিয়মিত তিনি বাজারে যাওয়া আসা করতেন। একদিন তিনি ফিরে আসার পর তাঁর গায়ে হলুদের চিহ্ন দেখা গেলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কারণ জানতে চাইলেন। হযরত আবদুর রহমান (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমি বিবাহ করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, মোহরানা কতো দিয়েছো? হযরত আবদুর রহমান বললেন, সোয়া তোলা সোনা।[৪]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণিত রয়েছে যে, আনসাররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন জানালেন যে, আপনি আমাদের এবং আমাদের ভাইদের মধ্যে আমাদের মালিকানাধীন খেজুরের বাগানগুলো বণ্টন করে দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাযি হলেন না। আনসাররা তখন বললেন, তাহলে মোহাজেররা আমাদের বাগানে কাজ করুক, আমরা উৎপাদিত ফলের মধ্য থেকে তাদেরকে অংশ দেবো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতে সম্মতি দিলেন। অতপর আমরা সেই অনুযায়ী কাজ করলাম।

এর দ্বারা বোঝা যায় যে, আনসাররা কিভাবে মোহাজেরদের সম্মান করেছিলেন। মোহাজের ভাইয়ের প্রতি আনসারদের ভালোবাসা, সরল-সহজ আন্তরিকতা এবং আত্মত্যাগের পরিচয়ও এতে পাওয়া যায়। মোহাজেররা আনসাদের এ ধরনের[৫] আচরণের যথেষ্ট গুরুত্ব দিতেন। তাঁরা আনসারদের কাছ থেকে কোন প্রকার বাড়তি সুবিধা গ্রহণ করেননি। বরং ভঙ্গুর অর্থনীতি কিছুটা সজীব করে তুলতে যতোটা সাহায্য গ্রহণ প্রয়োজন, ততোটাই গ্রহণ করেছিলেন।

আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যেকার এ ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এক অনন্য রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও

---

৩. ফেকা হু সসিরাত পৃ. ১৪০-১৪১

৪. সহীহ বোখারী। মোহাজের ও আনসারদের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন অধ্যায়। প্রথম খন্ড, পৃ. ৫৫৩।

৫. সহীহ বোখারী, প্রথম খন্ড, পৃ. ৩১২।

বিচক্ষণতার প্রমাণ। সেই সময় মুসলমানরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, এই ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন ছিলো তার একটি চমৎকার সমাধান।

ইসলামের প্রতি সহযোগিতার অঙ্গীকার

উল্লিখিত ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক ছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের জন্যে আরেকটি অঙ্গীকারনামা প্রণয়ন করেন। এর মাধ্যমে জাহেলী যুগের সকল দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও গোত্রীয় বিরোধের বুনিয়াদ ধ্বংস করে দেয়া হয়। এ ছাড়া জাহেলী যুগের রুসম-রেওয়াজের জন্যে কোন অবকাশই রাখা হয়নি। উক্ত অঙ্গীকারনামার দফাসমূহ ছিলো এই,

এই লেখা নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে কোরায়শী, ইয়াসরেবী, তাদের অধীনস্থ এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্টদের এবং জেহাদে অংশগ্রহণকারী মোমেনীন ও মোসলেমীনদের মধ্যে সম্পাদিত হচ্ছে—

এক) এরা সবাই অন্য সকল মানুষের চাইতে একটি ভিন্ন জাতি।

দুই) কোরায়শ মোহাজেররা তাদের পূর্বতন রীতি অনুযায়ী পরস্পর মুক্তিপণ আদায় করবে। মোমেনদের মধ্যে সুবিচারমূলকভাবে কয়েদীদের ফিরিয়ে দেবে। আনসারদের সকল গোত্র নিজেদের পূর্বতন রীতি অনুযায়ী পরস্পর মুক্তিপণ আদায় করবে। তাদের সকল দল প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ঈমানদারদের মধ্য সুবিচারমূলকভাবে নিজ নিজ কয়েদীদের ফিদিয়া আদায় করবে।

তিন) ঈমানদাররা নিজেদের মধ্যেকার কাউকে ফিদিয়া বা মুক্তিপণের ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী দান ও উপঢৌকন থেকে বঞ্চিত করবে না।

চার) যারা বাড়াবাড়ি করবে, সকল সত্যনিষ্ঠ মুসলমান তাদের বিরোধিতা করবে। ঈমানদারদের মধ্যে যারা যুলুম-অত্যাচার, পাপ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বা ফেতনা ফাসাদ সৃষ্টি করবে, সকল মোমেন তাদের বিরোধিতা করবে।

পাঁচ) মোমেনরা সম্মিলিতভাবে অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে থাকবে। অন্যায়কারী কোন মোমেনের সন্তান হলেও এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হবে না।

ছয়) কোন মোমেন অন্য মোমেনকে কোন কাফেরের হত্যার অভিযোগে হত্যা করবে না।

সাত) কোন মোমেন কোন কাফেরের সাহায্যের জন্যে অন্য মোমেনের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হবে না।

আট) সকলেই থাকবে আল্লাহর যিম্মায়। একজন সাধারণ মানুষের কৃত অঙ্গীকারও সকল মানুষ পালনে বাধ্য থাকবে।

নয়) যে সকল ইহুদী আমাদের আদর্শে দীক্ষিত হবে, তাদের সাহায্য করা হবে। তারা অনান্য মুসলমানের মতোই ব্যবহার পাবে। তাদের ওপর কোন প্রকার যুলুম-অত্যাচার করা হবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করা হবে না।

দশ) মুসলমানদের সমঝোতা হবে অভিন্ন। কোন মুসলমান অন্য মুসলমানকে বাদ দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদে অন্যের সাথে আপোস করবে না। বরং সকলেই সাম্য ও সুবিচারের ভিত্তিতে চুক্তি বা সমঝোতায় উপনীত হবে।

এগারো) আল্লাহর পথে জেহাদে প্রবাহিত রক্তের ক্ষেত্রে সকল মুসলমানই অভিন্ন বিবেচিত হবে।

বারো) কোন মুসলমানই কাফের কোরায়শদের কাউকে জানমালের নিরাপত্তা বা আশ্রয় দিতে পারবে না। কোন কাফেরের জানমালের নিরাপত্তা অথবা আশ্রয় দেয়ার জন্যে কোন মোমেনের কাছে অনুরোধ জানাতে পারবে না।

তেরো) কোন ব্যক্তি যদি কোন মোমেনকে হত্যা করে এবং তার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে এর পরিবর্তে তার কাছ থেকে কেসাস আদায় করা হবে। অর্থাৎ হত্যার অপরাধে অপরাধী হওয়ায় তাকেও হত্যা করা হবে। তবে যদি নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে হত্যাকারী ক্ষতিপূরণ দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারে, তবে সে ক্ষেত্রে কেসাস করা হবে না।

চৌদ্দ) সকল মোমেন কোন বিষয়ে ঐকমত্যে উপনীত হলে অন্য কেউ তার বিরোধিতা করতে পারবে না।

পনেরো) কোন হাঙ্গামা সৃষ্টিকারী বা বেদয়া'তীকে সাহায্য করা মোমেনের জন্যে বৈধ বিবেচিত হবে না। অশান্তি সৃষ্টিকারী কোন ব্যক্তিকে কেউ আশ্রয় দিতে পারবে না। যদি কেউ আশ্রয় দেয় বা সাহায্য করে, তাহলে কেয়ামতের দিন তার উপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হবে। ইহলৌকিক জীবনে তার ফরয ও নফল এবাদাত কোনটাই কবুল হবে না।

ষোল) তোমাদের মধ্যে যে কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে সেই বিষয় আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী মীমাংসা করবে।[৬]

সমাজ ব্যবস্থার নয়া কাঠামো

এ দূরদর্শিতা এবং বুদ্ধিমত্তার কারণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি নয়া সমাজের ভিত্তি স্থাপন করেন। তবে সমাজের বাহ্যিক রূপ আল্লাহর রসূলকে কেন্দ্র করেই বিকশিত ও পরিস্ফূটিত হয়েছিলো। তাঁর মোহনীয় ব্যক্তিত্বই ছিলো সকল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, নৈতিক চরিত্র গঠনের উপাদান, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্বের নমুনা, এবাদাত বন্দেগী ও আনুগত্য মুসলমানদের নব জীবন লাভে ধন্য করে তুলেছিলো।

একজন সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কোন ইসলাম উৎকৃষ্ট? অর্থাৎ ইসলামের মধ্যে কোন আমল উত্তম? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, তুমি অন্যদের খাবার খাওয়াবে এবং চেনা অচেনা সবাইকে সালাম করবে।[৭]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আসার পর আমি তাঁর কাছে হাযির হলাম। তাঁর পবিত্র চেহারা দেখেই আমি বুঝে ফেললাম যে, এই চেহারা কোন মিথ্যাবাদী মানুষের নয়। এরপর তিনি আমার সামনে প্রথম কথা এটাই বলেছিলেন যে, 'হে লোক সকল, সালাম দিতে থাকো, খাবার খাওয়াও, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো, রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, তখন নামায পড়ো, জান্নাতে নিরাপদে প্রবেশ করবে।'[৮]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, 'সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার দুর্বৃত্তপনা এবং ধ্বংসকারিতা থেকে নিরাপদ না থাকে।'[৯]

তিনি বলতেন, 'সেই ব্যক্তিই ভালো মুসলমান, যার মুখ এবং হাত থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে।'[১০]

তিনি বলতেন, 'তোমাদের মধ্যেকার কোন ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মোমেন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের জন্যে পছন্দ করা জিনিস নিজের ভাইয়ের জন্যে পছন্দ না করবে।'[১১]

তিনি বলতেন, 'সকল মোমেন একজন মানুষের মতো। যদি তার চোখে ব্যথা হয়, তবে সারা দেহে সেই কষ্ট অনুভূত হয়। যদি মাথায় ব্যথা হয়, তবে সারা দেহে সেই ব্যথার কষ্ট অনুভূত হয়।'[১২]

তিনি বলতেন, 'মোমেন মোমেনের জন্যে ইমারত স্বরূপ। এর এক অংশ অন্য অংশকে শক্তি

---

৬. ইবনে হিশাম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫০৩, ৫০৩

৭. সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ৬, ৯

৮. তিরমিযি, ইবনে মাজা, দারেমী, মেশকাত, প্রথম খন্ড, পৃ. ১৬৮

৯. সহীহ মুসলিম, মেশকাত দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৪২২

১০. সহীহ বোখারী, প্রথম খন্ড, পৃ. ৬

১১. সহীহ বোখারী, প্রথম খন্ড, পৃ. ৬

১২. মুসলিম, মেশকাত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৪২২

প্রদান করে।'[১৩]

তিনি বলতেন, 'নিজেদের মধ্যে পরস্পর ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, শত্রুতা করো না, বিবাদ করো না, একে অন্যের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না। আল্লাহর বান্দা এবং ভাই ভাই হয়ে থাকো। কোন মুসলমানের জন্যে এটা বৈধ নয় যে, নিজের ভাইকে তিনদিনের বেশী দূরে সরিয়ে রাখে।'[১৪]

তিনি বলতেন, 'মুসলমান মুসলমানের ভাই। একজন মুসলমান যেন অন্য মুসলমানের ওপর যুলুম না করে এবং তাকে শত্রুর হাতে তুলে না দেয়। যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে, আল্লাহ তায়ালা তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুঃখ দুশ্চিন্তা দূর করবে, আল্লাহ তায়ালা রোজ কেয়ামতে সেই ব্যক্তির দুঃখসমূহের মধ্যে একটি দুঃখ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন করে রাখবে, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন সেই ব্যক্তির দোষ গোপন রাখবেন।'[১৫]

তিনি বলতেন, 'তোমরা যমিনের অধিবাসীদের ওপর দয়া করো, আকাশের মালিক তোমাদের ওপর দয়া করবেন।'[১৬]

তিনি বলতেন, 'সেই ব্যক্তি মোমেন নয়, যে ব্যক্তি নিজে পেট ভরে খায়, অথচ তার পাশে তার প্রতিবেশী অনাহারে থাকে।'[১৭]

তিনি বলতেন, 'মুসলমানকে গালাগাল দেয়া ফাসেকের কাজ। মুসলমানের সাথে মারামারি কাটাকাটি করা কুফুরী।'[১৮]

তিনি বলতেন, 'রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা সদকার অন্তর্ভুক্ত। এই কাজ ঈমানের শাখাসমূহের একটি অন্যতম শাখা।'[১৯]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদকা-খয়রাতের তাকিদ দিতেন। এই সদকা খয়রাতের ফযিলত এতো বেশী বলে বর্ণনা করতেন যে, আপনা থেকেই সেদিকে মন আকৃষ্ট হতো। 'তিনি বলতেন, সদকা গুনাহসমূহকে এমনভাবে নিভিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয়।'[২০]

তিনি বলতেন, 'যে মুসলমান কোন নগ্ন মুসলমানকে পোশাক পরিধান করায়, আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে সবুজ পোশাক পরিধান করাবেন। যে মুসলমান কোন ক্ষুধার্ত মুসলমানকে আহার করায়, আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে ফল খাওয়াবেন। যে মুসলমান কোন পিপাসিত মুসলমানকে পানি পান করায়, আল্লাহ তায়ালা তাকে জান্নাতে ছিপি আঁটা শরাবান তহুরা পান করাবেন।'[২১]

তিনি বলতেন, 'খেজুরের এক টুকরো দান করে হলেও আগুন থেকে আত্মরক্ষা করো। যদি সেইটুকু সামর্থও না থাকে, তবে ভালো কথার মাধ্যমে আগুন থেকে আত্মরক্ষা করো।'[২২]

---

১৩. বোখারী, মুসলিম ও মেশকাত,দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৪২২

১৪. সহীহ বোখারী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৮৯৬

১৫. বোখারী, মুসলিম ও মেশকাত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৪২২

১৬. সুনানে আবুদাউদ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৩৩৫, তিরমিযি দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১৪

১৭. বায়হাকী, মেশকাত, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৪২৪

১৮. বোখারী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৮৯৩

১৯. বোখারী মুসলিম, মেশকাত, প্রথম খন্ড, পৃ. ১২, ১৬৭

২০. আহমদ, তিরমিযি, ইবনে মাজা মেশকাত প্রথম খন্ড, পৃ. ১৪

২১. আবু দাউদ, তিরমিযি মেশকাত, প্রথম খন্ড, পৃ. ১৬৯

২২. বোখারী, প্রথম খন্ড, ১৯০, দ্বিতীয় খন্ড, ৮৯০

একই সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভিক্ষাবৃত্তি থেকে দূরে থাকার জন্যে তাকিদ দিয়েছেন। তিনি ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং মিতব্যয়িতার শিক্ষা দিয়েছেন। ভিক্ষাবৃত্তিকে ভিক্ষুকের চেহারায় আঁচড় এবং অন্যান্য ধরনের যখম বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২৩]

তবে উল্লিখিত ধরনের অবমাননা থেকে তাদেরকে মুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন, যারা একান্ত নিরুপায় হয়েই ভিক্ষা করে।

তিনি একেক প্রকার এবাদাতের বিভিন্ন রকম ফযিলতের কথা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর কাছে সেইসব এবাদতের ভিন্ন ভিন্ন রকম সওয়াবের কথা উল্লেখ করেছেন।

আকাশ থেকে তাঁর কাছে যে ওহী আসতো, তিনি মুসলমানদেরকে সেই সম্পর্কে অবহিত করতেন এবং সেই আলোকে জীবন যাপনে সহায়তা করতেন। তিনি সেই ওহী মুসলমানদের পড়ে শোনাতেন এবং তাঁর কাছ থেকে শোনার পর মুসলমানরা তাঁকে পুনরায় পড়ে শোনাতো। এর ফলে মুসলমানদের মধ্যে বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও চিন্তাচেতনা ছাড়াও দাওয়াতে হক-এর পয়গাম্বরসুলভ দায়িত্বানুভূতি ও সচেতনতা সৃষ্টি হতো।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের জীবনধারায় বিস্ময়কর উন্নতির সোপান তৈরী করেন। মানুষের মধ্যেকার খোদা প্রদত্ত যোগ্যতাকে উন্নত করেন। মানুষের কর্মপ্রণালী এবং চিন্তা-চেতনায় মাধুর্যের সৃষ্টি হয়। এমনকি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষার কারণে সাহাবারা নবীদের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষে পরিণত হন। মানবেতিহাসে তাঁরা আদর্শের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, যে ব্যক্তি আদর্শ অনুসরণ করতে চায়, সে যেন মৃত ব্যক্তিদের আদর্শ অনুসরণ করে। কেননা জীবিত লোকদের ব্যাপারে ফেতনার আশঙ্কা বিদ্যমান রয়েছে।

সাহাবারা ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথী। উম্মতে মোহাম্মদীর শ্রেষ্ঠ মনুষ, পুণ্যপ্রাণ, গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং সর্বাধিক নিরহংকার। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এই সকল মানুষকে তাঁর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বন্ধু ও সাথী এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে যোগ্য মানুষরূপে মনোনীত করেন। কাজেই তাঁদের বৈশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে জানা দরকার এবং তাঁদের অনুসরণ অনুকরণ ও আনুগত্য করা দরকার। তাঁদের চরিত্র মাধুর্য এবং জীবন চরিত যতোটা সম্ভব আত্মস্থ করা দরকার। কেননা তাঁরা ছিলেন হেদায়েতের ওপর, সেরাতুল মোস্তাকিমের ওপর।[২৪]

আমাদের পয়গাম্বর হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তম ও উন্নত আদর্শের এমন এক নমুনা ছিলেন যে, মন আপনা আপনি তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়। জান কোরবান করার ইচ্ছা জাগে। এর ফলে তাঁর পবিত্র মুখ নিসৃত কথা পালন করার জন্যে সাহাবারা ছুটে যেতেন। হেদায়াত ও পথনির্দেশের জন্যে তিনি যেসব কথা বলতেন, সেই কথা যথাযথভাবে পালন করতে সাহাবাদের মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেতো।

এ ধরনের প্রচেষ্টার কারণেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় এমন একটি সমাজ গঠনে সক্ষম হলেন, যা ছিলো ইতিহাসের আলোকে সর্বাধিক সফল সমাজ। তিনি সেই সমাজের সমস্যাসমূহের এমন সমাধান দিলেন যে, যারা অন্ধকারের আবর্তে হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করছিলো তারা স্বস্তি লাভ করলো। সেই সমাজ উন্নত শিক্ষা ও আদর্শের মাধ্যমে যুগের সকল প্রতিকূলতা সরিয়ে ইতিহাসের ধারাই পরিবর্তন করে দিতে সক্ষম হলো।

---

২৩. আবু দাউদ, তিরমিযি, নামাঈ, ইবনে মাজা, দারেমী মেশকাত দ্রষ্টব্য।

২৪. রাযীন, মেশকাত, প্রথম খন্ড, পৃ. ৩২

ইহুদীদের সাথে চুক্তি সম্পাদন

হিজরতের পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের মধ্যে চিন্তা-বিশ্বাস, রাজনীতি এবং ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মাধ্যমে একটি নতুন সমাজের ভিত্তি স্থাপন করলেন। এরপর তিনি অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ নিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাচ্ছিলেন যে, সকল মানুষ সুখে শান্তিতে বসবাস করুক, মদীনা এবং আশপাশের এলাকার মানুষ একটি সুস্থ প্রশাসনের আওতাভুক্ত হোক। তিনি উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে এমন আইন প্রণয়ন করলেন, বর্তমান সংঘাত বিক্ষুব্ধ বিশ্বে যার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, মদীনার নিকটবর্তী লোকেরা ছিলো ইহুদী। গোপনে এরা মুসলমানদের সাথে শত্রুতা করলেও প্রকাশ্যে তার পরিচয় দেয়নি। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে একটি চুক্তিতে উপনীত হলেন। সেই চুক্তিতে ইহুদীদেরকে তাদের ধর্ম পালনে স্বাধীনতা এবং জানমালের নিরাপত্তা দেয়া হলো। রাজনৈতিক হঠকারিতার কোন সুযোগ তাদের দেয়া হয়নি।

মুসলমানদের মধ্যকার পারস্পরিক চুক্তির আলোকেই ইহুদীদের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছিলো। চুক্তি দফাসমূহ ছিলো নিম্নরূপ-

এক. বনু আওফের ইহুদীরা মুসলমানদের সাথে মিলিত হয়ে একই উম্মত হিসাবে বিবেচিত হবে। ইহুদী ও মুসলমানরা নিজ নিজ দ্বীনের ওপর আমল করবে। বনু আওফ ছাড়া অন্যান্য ইহুদীরাও একই রকমের অধিকার লাভ করবে।

দুই. ইহুদীরা নিজেদের সমুদয় ব্যয়ের জন্যে দায়ী হবে এবং মুসলমানরা নিজেদের ব্যয়ের জন্যে পৃথক পৃথকভাবে দায়ী হবে।

তিন. এই চুক্তির আওতাভুক্তদের কোন অংশের সাথে যারা যুদ্ধ করবে সবাই সম্মিলিতভাবে তাদের সাথে প্রতিহত করবে।

চার. এই চুক্তির অংশীদাররা সকলেই পরস্পরের কল্যাণ কামনা করবে। তবে সেই কল্যাণ কামনা ও সহযোগিতা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে—অন্যায়ের ওপর নয়।

পাঁচ. কোন ব্যক্তি তার মিত্রের কারণে অপরাধী বিবেচিত হবে না।

ছয়. মযলুমকে সাহায্য করা হবে।

সাত. যতদিন যাবত যুদ্ধ চলতে থাকবে ততদিন ইহুদীরাও মুসলিমদের সাথে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করবে।

আট. এই চুক্তির অংশীদারদের জন্যে মদীনায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও রক্তপাত নিষিদ্ধ থাকবে।

নয়. এই চুক্তির অন্তর্ভুক্তদের মধ্যে কোন নতুন সমস্যা দেখা দিলে বা ঝগড়া-বিবাদ হলে আল্লাহর আইন অনুযায়ী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মীমাংসা করবেন।

দশ. কোরায়শ এবং তাদের সাহায্যকারীদের আশ্রয় প্রদান করা হবে না।

এগারো. ইয়াসরেবের ওপর কেউ হামলা করলে সেই হামলা মোকাবেলায় পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করবে। সকল পক্ষ নিজ নিজ অংশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করবে।

বারো. এই চুক্তির মাধ্যমে কোন অত্যাচারী বা অপরাধীকে আশ্রয় দেয়া হবে না।[২৫]

এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর মদীনা এবং তার আশে পাশের এলাকা নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। সেই রাষ্ট্রের রাজধানী ছিলো মদীনা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সেই রাষ্ট্রের মহানায়ক। এর মূল কর্তৃত্ব ছিলো মুসলমানদের হাতে। এমনি করে মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো। শান্তি ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরবর্তী সময়ে অন্যান্য গোত্রের সাথেও একই রকম চুক্তি করেন।

---

২৫. ইবনে হিশাম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫০৩, ৫০৪

সশস্ত্র সংঘাত

মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোরায়শদের ষড়যন্ত্র

ইতিপূর্বে মুসলমানদের ওপর মক্কার কাফেরদের যুলুম অত্যাচার সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। মুসলমানরা হিজরত করতে শুরু করলে কাফেররা তাদের বিরুদ্ধে কি ধরনের ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিলো, সে সম্পর্কেও উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে কি এ ধরনের অত্যাচার নির্যাতনের ফলে কাফেরদের অর্থ-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার মতো অপরাধও তারা করেছিলো। তাদের নির্বুদ্ধিতা না কমে বরং বেড়েই চলেছিলো। মুসলমানরা তাদের কবল থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো এবং মদীনায় তারা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলো এটা দেখে কাফেরদের ক্রোধ আরো বেড়ে গেলো। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তখনো ইসলামের ছদ্মবেশ ধারণ করেনি। মদীনায় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিলো আনসারদের নেতা। মক্কার পৌত্তলিকরা আবদুল্লাহকে হুমকিপূর্ণ একটি চিঠি লিখলো। সেই সময় মদীনায় আবদুল্লাহর যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিলো। এমনকি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি মদীনায় না যেতেন, তবে মদীনাবাসীরা তাকে তাদের বাদশাহ হিসাবে গ্রহণ করতো। মক্কার পৌত্তলিকরা তাদের হুমকিপূর্ণ চিঠিতে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার পৌত্তলিক সহযোগিদের উদ্দেশ্যে লিখলো যে, আপনারা আমাদের লোককে আশ্রয় দিয়েছেন, তাই আমরা আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি যে, হয়তো আপনারা তার সাথে লড়াই করুন অথবা তাকে মদীনা থেকে বের করে দিন। যদি না করেন তবে আমরা সর্বশক্তিতে আপনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যোদ্ধা পুরুষদের হত্যা এবং আপনাদের মহিলাদের সম্মান বিনষ্ট করবো।[১]

আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর সাথে পত্র বিনিময়

এই চিঠি পাওয়ার পরই আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মক্কার পৌত্তলিকদের নির্দেশ পালনের জন্যে প্রস্তুত হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মনে আগে থেকেই প্রবল ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছিলো। কেননা তার মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিলো যে. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই মদীনার রাজমুকুট তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছেন। মক্কার পৌত্তলিকদের চিঠি পাওয়ার পর পরই আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং মদীনার সহযোগিরা রসূলে মাকবুলের সাথে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর পেয়ে আবদুল্লাহর কাছে গিয়ে তাকে বললেন, কোরায়শদের হুমকিতে তোমরা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছো মনে হচ্ছে। শোনো, তোমরা নিজেরা নিজেদের যতো ক্ষতি করতে উদ্যত হয়েছো মক্কার কোরায়শরা তার চেয়ে তোমাদের বেশী ক্ষতি করতে পারবে না। তোমরা কি নিজেদের সন্তান এবং ভাইয়ের সাথে নিজেরাই যুদ্ধ করতে চাও ? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা শোনার পর যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত আবদুল্লাহর সাহযোগিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো।[২]

সমর্থক ও সহযোগিরা ছত্রভঙ্গ হওয়ায় আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তখনকার মতো যুদ্ধ থেকে

---

১. আবু দাউদ, খবরুন নাযির অধ্যায়

২. আবু দাউদ, খবরুন নাযির অধ্যায়

বিরত হলো। কিন্তু কোরায়শদের সাথে তার গোপন যোগাযোগ অব্যাহত ছিলো। কেননা এই দুর্বৃত্ত মুসলমান ও কাফেরদের সাথে সংঘাতের কোন ক্ষেত্রেই নিজের জড়িত হওয়ার সুযোগকে হাতছাড়া করেনি। উপরন্তু মুসলমানদের বিরোধিতায় শক্তি অর্জনের জন্যে ইহুদীদের সাথেও সে যোগাযোগ রক্ষা করতো যেন, প্রয়োজনের সময় ইহুদীরা তাকে সাহায্য করে। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার আগুন বার বার খোদাপ্রদত্ত কৌশলে নির্বাপিত করতেন।[৩]

মুসলমানদের জন্যে মসজিদে হারাম বন্ধ ঘোষণা

এরপর হযরত সা'দ ইবনে মা'য (রা.) ওমরাহ পালনের জন্যে মক্কায় গিয়ে উমাইয়া ইবনে খালফের মেহমান হন। হযরত সা'দ (রা.) তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি উমাইয়াকে বললেন, আমি একটু নিরিবিলি কাবাঘর তওয়াফ করতে চাই। উমাইয়া দুপুরে হযরত সা'দকে নিয়ে বেরোলেন। তওয়াফের সময় আবু জেহেলের সাথে দেখা। নিবিষ্ট চিত্তে হযরত সা'দকে তওয়াফ করতে দেখে আবু জেহেল উমাইয়াকে বললো, আবু সফওয়ান, তোমার সঙ্গে আসা এই লোকটির পরিচয় কি? উমাইয়া বললো, এ হচ্ছে সা'দ ইবনে মা'য। আবু জেহেল হযরত সা'দকে সরাসরি সম্বোধন করে বললো, আপনি বড় নিবিষ্ট মনে তওয়াফ করছেন দেখছি। অথচ আপনারা বেদ্বীনকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছেন। আপনারা তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন। খোদার কসম, আপনি যদি আবু সফওয়ানের মেহমান না হতেন, তবে আপনাকে নিরাপদে মদীনায় ফিরে যেতে দেয়া হতো না। একথা শুনে হযরত সা'দ (রা.) উচ্চস্বরে বললেন, শোনো, তুমি যদি আমাকে তওয়াফ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করো, তবে আমি তোমার বাণিজ্য কাফেলা মদীনার কাছে দিয়ে যেতে দেবো না। সেটা কিন্তু তোমার জন্যে গুরুতর ব্যাপার হবে।[৪]

মোহাজেরদের প্রতি কোরায়শদের হুমকি

কোরায়শরা মুসলমানদের খবর পাঠালো যে, তোমরা মনে করো না যে, মক্কা থেকে গিয়ে নিরাপদে থাকবে। বরং মদীনায় পৌঁছে আমরা তোমাদের সর্বনাশ করে ছাড়বো।[৫]

এটা শুধু হুমকি ছিলো না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নানা সূত্রে কোরায়শদের ষড়যন্ত্র এবং অসদুদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হন। ফলে তিনি কখনো সারারাত জেগে কাটাতেন, আবার কখনো সাহাবায়ে কেরামের প্রহরাধীনে রাত্রি যাপন করতেন। সহীহ বোখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, মদীনা আসার পর এক সন্ধ্যায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কি যে ভালো হতো, যদি আমার সাহাবাদের মধ্যে কোন নেককার সাহাবী আমার এখানে পাহারা দিতো। একথা বলার সাথে সাথে অস্ত্রের ঝনঝনানি শোনা গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন কে ওখানে? জবাব এলো সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস। বললেন, কি জন্যে এসেছো? আগন্তুক বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আপনার নিরাপত্তা প্রশ্নে আমার মনে হঠাৎ একটা সংশয়ের উদ্রেক হওয়ায় আমি আপনাকে পাহারা দিতে এসেছি। একথা শুনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জন্যে দোয়া করে শুয়ে পড়লেন।[৬]

মনে রাখতে হবে যে, পাহারার ব্যবস্থা বিশেষ কয়েকটি রাতের জন্যে নির্দিষ্ট ছিলো না। বরং অব্যাহতভাবেই তা রাখা হয়েছিলো। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাত্রিকালে

---

৩. সহীহ বোখারী ২য় খন্ড, পৃ. ৬৫৫, ৬৫৬, ৯১৬, ৯২৪

৪, বোখারী, কিতাবুল মাগাযি ২য় খন্ড, পৃ. ৫৬৩

৫. রহমতুল লিল আলামীন, ১ম খন্ড, পৃ. ১১৬

৬. মুসলিম, ২য় খন্ড, সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের বৈশিষ্ট শীর্ষক অধ্যায় এবং বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ৪০৪

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যে পাহারার ব্যবস্থা করা হতো। অতপর পবিত্র কোরআনের এই আয়াত নাযিল হলো– 'আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মানুষদের থেকে হেফাযত রাখবেন।' এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর প্রিয় নবী জানালায় মাথা বের করে বললেন, 'হে লোকেরা, তোমরা ফিরে যাও, আল্লাহ তায়ালা আমাকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়েছেন।'[৭]

নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কা শুধুমাত্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিলো না। সকল মুসলমানের ক্ষেত্রেই ছিলো এটা প্রযোজ্য। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবারা মদীনায় আসার পর আনসাররা তাদের আশ্রয় প্রদান করেন। এতে সমগ্র আরব তাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে যায়। ফলে মদীনার আনসাররা অস্ত্র ছাড়া রাত্রি যাপন করতেন না এবং খুব সকালেও তাদের কাছে অস্ত্র থাকতো।

যুদ্ধের অনুমতি

মদীনার মুসলমানদের অস্তিত্বের জন্যে অমুসলিমদের পক্ষ থেকে নিরাপত্তাহীনতা ছিলো বিশেষ হুমকি। অন্যকথায় বলা যায় যে, এটা ছিলো তাদের টিকে থাকা না থাকার জন্যে বিরাট চ্যালেঞ্জ। এর ফলে মুসলমানরা স্পষ্টভাবে বুঝে ফেলেছিলেন যে, কোরায়শরা মুসলমানদের ক্ষতি করার জন্যে সংকল্প থেকে বিরত হবে না। এমনি সময়ে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুসলমানদের যুদ্ধ করার অনুমতি দিলেন। তবে এ যুদ্ধকে ফরয বলে আখ্যায়িত করা হয়নি। এই সময় আল্লাহ তায়ালা কোরআনের এই আয়াত নাযিল করেন, 'যাদের সাথে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকেও যুদ্ধের অনুমতি প্রদান করা যাচ্ছে। কেননা তারা মযলুম। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা তাদের সাহায্য করতে সক্ষম।'

এই আয়াতের প্রেক্ষিতে এরপর আরো কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছিলো। এ সকল আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছিলো যে, যুদ্ধ করার এই অনুমতি নিছক যুদ্ধের জন্যে যুদ্ধ নয় বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে বাতিল বা মিথ্যার মূল উৎপাটন এবং সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। যেমন আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেন, 'আমি ওদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে, সকল কাজের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারে। (সূরা হজ্জ, আয়াত ৪১)

এই অনুমতি হিজরতের পর মদীনায় নাযিল হয়েছিলো, মক্কায় নয়। তবে নাযিলের সঠিক সময় নির্ধারণ করা মুশকিল।

যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়েছে, কিন্তু পরিস্থিতি ছিলো পৌত্তলিক কোরায়শদের অনুকূলে। এ কারণে মুসলমানদের কিছু কৌশলের প্রয়োজন দেখা দেয়। মুসলমানরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণের সীমানা কোরায়শদের বাণিজ্য কাফেলা পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। মক্কা থেকে সিরিয়ার মধ্যবর্তী পথ ছিলো এই সীমানা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ সীমানা বিস্তৃত করার জন্যে দু'টি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

এক) মক্কা থেকে সিরিয়া ও মদীনার যাতায়াতকারী বাণিজ্য কাফেলার পথের পাশে যেসব গোত্রের বাস, তাদের সাথে অনাক্রমণ চুক্তি।

দুই) সেই পথে টহলদানকারী কাফেলা প্রেরণ।

প্রথম পরিকল্পনার আলোকে একথা গুরুত্বপূর্ণ যে, ইতিপূর্বে ইহুদীদের সাথে সম্পাদিত যে সকল চুক্তির কথা তুলে ধরা হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, অনুরূপ একটি অনাক্রমণ চুক্তি

---

৭ জামে তিরমিযি, আবওয়াবুত তাফসীর, ২য় খন্ড, পৃ. ১৩০

জুহাইনা গোত্রের সাথেও সম্পাদিত হয়। এ গোত্র মদীনা থেকে তিন মনযিল অর্থাৎ ৫০ মাইল দূরে বাস করতো। এছাড়া আরো কয়েকটি গোত্রের সাথেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। সেসব চুক্তির বিষয়ে যথাসময়ে উল্লেখ করা হবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্থাপিত দ্বিতীয় পরিকল্পনা যুদ্ধ সম্পর্কিত, যেসব বিষয়ে আলোচনাও যথাস্থানে করা হবে।

ছারিয়্যা ও গোযওয়াহ[৮]

পবিত্র কোরআনের আয়াতে যুদ্ধের অনুমতি প্রদানের পর উল্লিখিত উভয় পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্যে মুসলমানদের পর্যায়ক্রমিক অভিযান শুরু হয়। অস্ত্র সজ্জিত কাফেলা টহল দিতে থাকে। এর উদ্দেশ্য ছিলো মদীনার আশেপাশের রাস্তায় সাধারণভাবে এবং মক্কার আশেপাশের রাস্তায় বিশেষভাবে লক্ষ্য রেখে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে হবে। একই সাথে সেসব রাস্তার আশেপাশে বসতি স্থাপনকারী গোত্রসমূহের সাথে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। এর ফলে মদীনার পৌত্তলিক, ইহুদী এবং আশেপাশের বেদুইনদের মনে এ বিশ্বাস স্থাপন করা সম্ভব হবে যে, বর্তমানে মুসলমানরা যথেষ্ট শক্তিশালী। অতীতের দুর্বলতা ও শক্তিহীনতা তারা কাটিয়ে উঠেছে। উপরন্তু এর মাধ্যমে কোরায়শদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ সাহসিকতা সম্পর্কে তাদের ভীত করে দেয়া সম্ভব হবে। তাদের বুঝিয়ে দেয়া যাবে যে, তারা যেসব চিন্তা এবং ক্রোধ প্রকাশ করছে, তার পরিণাম হবে ভয়াবহ। নির্বুদ্ধিতার যে পাঁক কাদায় তারা গড়াগড়ি খাচ্ছে, তাতে তাদের অর্থনীতিকে হুমকির সম্মুখীন দেখে সন্ধি-সমঝোতার প্রতি তারা ঝুঁকে পড়বে। মুসলমানদের ঘরে প্রবেশ করে তাদের নিশেষ করা, আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করা এবং দুর্বল মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করার যেসব সঙ্কল্প তারা মনে মনে পোষণ করছে, সেসব থেকে বিরত থাকবে। এর ফলে জাযিরাতুল আরবে তওহীদের দাওয়াতের কাজ মুসলমানরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে করতে পারবে।

এসব ছারিয়্যা ও গোযওয়াহ সম্পর্কে নীচে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হচ্ছে

এক) ছ্যারিয়া সিফুল বাহার[৯]

প্রথম হিজরীর রমযান মোতাবেক ৬২৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাস।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হামযা ইবনে আবদুল মোত্তালেব (রা.)-কে এর সেনানায়ক মনোনীত করেন। রাবেগ প্রান্তরে এই কাফেলা আবু সুফিয়ানের মুখোমুখি হয়। আবু সুফিয়ানের সঙ্গীদের সংখ্যা ছিলো দু'শো। উভয় পক্ষ পরস্পরের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে। কিন্তু এ ঘটনা যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়নি।[১০]

এই ছারিয়্যায় মক্কার লোকদের মধ্য থেকে দুই ব্যক্তি মুসলমানদের সাথে এসে মিলিত হয়। এদের একজন হযরত মিকদাদ ইবনে আমর আলবাহরানী এবং অন্যজন ওতবা ইবনে গোজওয়ান আলমাজানি (রা.)। এই দুইজন গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তারা পৌত্তলিকদের সাথে যোগ দেন এই উদ্দেশ্যে যে পথিমধ্যে মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ হলে তাদের কাছে চলে যাবেন।

---

৮ সীরাত রচয়িতাদের পরিভাষা অনুযায়ী ছারিয়্যা বলা হয় সেইসব সামরিক অভিযানকে, যাতে নবী করিম (সঃ) স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেননি। যুদ্ধ হোক বা না হোক। পক্ষান্তরে গোযওয়া বলা হয় সেই সব সামরিক অভিযানকে যেখানে নবী (সাঃ) নিজে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধ হোক বা না হোক

৯. সিফুল বাহার অর্থাৎ সমুদ্র সৈকত

১০. রহমাতুললিল আলামীন

দুই) ছারিয়্যা খাররার[১১]

প্রথম হিজরীর জিলকদ মোতাবেক ৬২৩ সালের মে মাস।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাসকে এর আমীর নিযুক্ত করেন। তাঁর অধীনে বিশজন নিবেদিত প্রাণ মুসলমানকে কাফেরদের একটি কাফেলার সন্ধানে প্রেরণ করেন। এই কাফেলাকে বলে দেয়া হয় যে, তারা যেন খাররার নামক জায়গার পরে না যায়। এই কাফেলা পদব্রজে রওয়ানা হয়েছিলো। এরা রাত্রিকালে সফর করতেন আর দিনে আত্মগোপন করে থাকতেন। পঞ্চম দিন সকালে এই কাফেলা খাররার পৌঁছে খবর পেলো যে, কোরায়শদের বাণিজ্য কাফেলা একদিন আগে খাররার ত্যাগ করেছে।

এর পতাকা ছিলো সাদা এবং হযরত মেকদাদ ইবনে আমর (রা.) তা বহন করছিলেন।

তিন) গোযওয়াহ আবওয়া[১২]

দ্বিতীয় হিজরীর সফর মোতাবেক ৬২৩ সালের আগষ্ট।

এই অভিযানে সত্তরজন মোহাজের সমভিব্যহারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গমন করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সময় মদীনায় হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.)-কে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিলো কোরায়শদের একটি বাণিজ্য কাফেলার পথ রোধ করা। নবী (সাঃ) ওদদান পর্যন্ত পৌঁছেন। কিন্তু কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

এই অভিযানের প্রাক্কালে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু জামরা গোত্রের সর্দার আমর ইবনে মাখশি জমিরির সাথে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করেন। চুক্তির বক্তব্য ছিলো এইরূপ, 'বনু জামরার জন্যে মোহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লেখা। এরা নিজেদের জানমালের ব্যাপারে নিরাপদ থাকবে। এদের ওপর কেউ হামলা করলে সেই হামলার বিরুদ্ধে এদের সাহায্য করা হবে। অবশ্য এরা যদি আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে তবে, এই অঙ্গীকার পালন করা হবে না। সমুদ্র যতোদিন তার সৈকতকে সিক্ত করবে, ততোদিন এই চুক্তির কার্যকারিতা অটুট থাকবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদেরকে সাহায্যের জন্যে ডাকবেন, তখন তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে।'[১৩]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অংশগ্রহণ সম্বলিত এটি ছিলো প্রথম সামরিক অভিযান। মদীনার বাইরে পনের দিন কাটানোর পর তাঁরা ফিরে আসেন।

চার) গোযওয়ায়ে বুয়াত

দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৬২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস।

এই অভিযানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুইশত সাহাবাসহ রওয়ানা হন। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিলো কোরায়শদের একটি বাণিজ্য কাফেলা ধাওয়া করা। এই কাফেলায় উমাইয়া ইবনে খালফসহ কোরায়শদের একশত লোক এবং উট ছিলো আড়াই হাজার। নবী

---

১১. যাহফার নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম

১২. ওদদান মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম। রাবেগ থেকে মদীনা যাওয়ার পথে ২৯ মাইল পর এই জায়গা পড়ে। আবওয়া ওদদানের নিকটবর্তী অন্য জায়গা।

১৩ আলমাওয়াহেবু লাদুন্নিয়া ১ম খন্ড, পৃ ৭৫

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোযওয়া এলাকায় অবস্থিত বুয়াত[১৪] নামক জায়গা পর্যন্ত পৌঁছেন। কিন্তু কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। এ অভিযানে পতাকার রং ছিলো সাদা যা বহন করছিলেন হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)।

এই অভিযানের প্রাক্কালে হযরত সা'দ ইবনে মায়া'য (রা.)-কে মদীনার আমীর নিযুক্ত করা হয়।

পাঁচ) গোযওয়া সফওয়ান

দ্বিতীয় হিজরীর রবিউল আউয়াল মোতাবেক ৬২৩ সালের সেপ্টেম্বর।

এই অভিযানের কারণ ছিলো এই যে, কারজ ইবনে জাবের ফাহারি নামে একজন পৌত্তলিকের নেতৃত্বে একদল লোক মদীনার চারণভূমিতে হামলা করে কয়েকটি গবাদি পশু অপহরণ করে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্তরজন সাহাবাকে সঙ্গে নিয়ে লুটেরাদের ধাওয়া করেন। কিন্তু কারজ এবং তার সঙ্গীদের পাওয়া যায়নি। কোন প্রকার সংঘাত ছাড়াই তারা ফিরে আসেন। এই যুদ্ধকে কেউ কেউ বদরের প্রথম যুদ্ধ বলে অভিহিত করেন। পতাকার রং ছিলো সাদা। হযরত আলী (রা.) তা বহন করছিলেন।

এই অভিযানের সময় মদীনার আমীর হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)-কে নিযুক্ত করা হয়েছিলো।

ছয়) গোযওয়া যিল উশাইরা

দ্বিতীয় হিজরীর জমাদিউল আউয়াল এবং জমাদিউস সানি মোতাবেক ৬২৩ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর

এই অভিযানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দেড় থেকে দু'শ মোহাজের ছিলেন। এতে অংশগ্রহণের জন্যে কাউকে বাধ্য করা হয়নি। সওয়ারীর জন্যে উটের সংখ্যা ছিলো মাত্র ত্রিশ। পালাক্রমে সবাই সওয়ার হয়েছিলেন। মক্কা থেকে সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেছে পৌত্তলিকদের এ ধরনের একটি কাফেলাকে ধাওয়া করতে এ অভিযান চালানো হয়। এই কাফেলায় কোরায়শদের প্রচুর মালামাল ছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কাফেলাকে ধাওয়া করতে যুল উশাইরা[১৫] নামক জায়গা পর্যন্ত পৌঁছেন। কিন্তু কয়েকদিন আগেই কাফেলা চলে গিয়েছিলো। এই কাফেলাই সিরিয়া থেকে ফেরার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের গ্রেফতার করার চেষ্টা চালান। কিন্তু তারা মক্কায় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এই ঘটনার জের হিসাবে পরবর্তীকালে বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

এই অভিযানেও পতাকার রং ছিলো সাদা। হযরত হামযা (রা.) পতাকা বহন করেন।

ইবনে ইসহাকের মতে এই অভিযানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জমাদিউল আউয়ালের শেষদিকে রওয়ানা হয়ে জমাদিউস সানিতে ফিরে আসেন। এ কারণে এই অভিযানের সঠিক সময় নির্ধারণের ক্ষেত্রে সীরাত রচয়িতাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

এই অভিযানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু মুদলাজ এবং তাদের মিত্র বনু জামরার সাথে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করেন।

---

১৪. বুয়াত এবং রিযভি জুহাইনায় পাহাড়ী এলাকার দু'টি পাহাড়। মূলত একটি পাহাড়ের দু'টি শাখা। মক্কা থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে পড়ে। মদীনা থেকে ৪৮ মাইল দূরত্বে অবস্থিত

১৫ উশাইয়া, ইয়ালবুর নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম :

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই অভিযানকালে মদীনার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হযরত আবু সালমা ইবনে আবদুল আছাদ মাখযুমী (রা.) আনজাম দেন।

সাত) ছারিয়্যা নাখলাহ

দ্বিতীয় হিজরীর রজব মোতাবেক ৬২৪ সালের জানুয়ারী

এই অভিযানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.)-এর নেতৃত্বে বারোজন মোহাজেরের একটি দল প্রেরণ করেন। প্রতি দুইজন সৈন্যের জন্যে একটি উট ছিলো। সেনাপতির হাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একখানি চিঠি দেন এবং বলেন যে, দুইদিন সফর শেষে যেন তা পাঠ করা হয়। দুইদিন সফর শেষে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.) চিঠিখানি খুলে পাঠ করেন। তাতে লেখা ছিলো যে, আমার এই চিঠি পাঠ করার পর তোমরা মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী স্থান নাখলাহ-এ অবতরণ করবে এবং সেখানে কোরায়শদের একটি কাফেলার জন্যে ওঁৎ পেতে থাকবে। পাশাপাশি খবরাখবর সম্পর্কে আমাকে অবহিত করবে।

হযরত আবদুল্লাহ (রা.) সঙ্গী সাহাবীদের চিঠির বক্তব্য সম্পর্কে জানিয়ে বলেন যে, কারো ওপর জোর-জবরদস্তি করছি না, শাহাদাত যাদের প্রিয়, তারা থেকে যেতে পারে। আমি যদি একা থেকে যাই তবুও সামনে অগ্রসর হবো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.)-এর বক্তব্য শোনার পর তাঁরা নাখলাহ অভিমুখে রওয়ানা হলেন। যাওয়ার পথ হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং ওতবা ইবনে গোজওয়ান (রা.)-এর উট উধাও হয়ে যায়। এই উটের পিঠে উভয় সাহাবী পালাক্রমে সফর করছিলেন। উট হারিয়ে যাওয়ার কারণে তারা উভয়ে পেছনে পড়ে যান।

সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.) নাখলাহ গিয়ে পৌঁছুলেন। সেখানে গিয়ে শুনলেন যে, সেই পথ দিয়ে কোরায়শদের একটি বাণিজ্য কাফেলা অতিক্রম করেছে। সেই কাফেলায় কিসমিস, চামড়া এবং অন্যান্য সামগ্রী রয়েছে। সেই কাফেলায় আবদুল্লাহ ইবনে মুগীরার দুই পুত্র ওসমান ও নওফেল এবং মুগীরার মুক্ত দাস আমর ইবনে হাযরামী ও হাকীম ইবনে কায়সান রয়েছে। মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলেন যে, কি করবেন। সেদিন ছিলো রজব মাসের শেষ দিন। যুদ্ধ নিষিদ্ধ অর্থাৎ মাহে হারামের অন্যতম মাস হচ্ছে রজব। যুদ্ধ যদি করা হয়, তবে হারাম মাসের অমর্যাদা করা হয়। এদিকে যদি হামলা না করা হয়, তবে কোরায়শদের এই কাফেলা মদীনার সীমানায় প্রবেশ করে। পরামর্শের পর হামলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সাহাবীরা কোরায়শদের বাণিজ্য কাফেলা অনুসরণ করেন এবং আমর ইবনে হাদরামিকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করেন। এতে আমর ধরাশায়ী হয়ে প্রাণ ত্যাগ করে। অন্যরা ওসমান এবং হাকিমকে গ্রেফতার করেন। নওফেল পালিয়ে যায়। তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। অতপর সাহাবারা উভয় বন্দী এবং জিনিসপত্র নিয়ে মদীনায় হাযির হন। সাহাবারা প্রাপ্ত জিনিসের মধ্যে থেকে এক পঞ্চমাংশ গনিমত হিসাবে বের করে নিয়েছিলেন।[১৬]

---

১৬. সীরাত রচয়িতারা এরূপ উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ গণিমত হিসাবে গ্রহণ করা সম্বলিত পাক কোরআনের নির্দেশ বদরের যুদ্ধের সময় নাযিল হয়েছিলো। সেই আয়াতের শানে নযুল পাঠে বোঝা যায় যে, সেই নির্দেশের আগে মুসলমানরা গণিমতের নির্দেশ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না।

এটা ছিলো ইসলামের ইতিহাসের প্রথম গণিমতের মাল, প্রথম নিহত এবং প্রথম বন্দী। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব কথা শোনার পর বললেন, আমি তো তোমাদেরকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করতে বলিনি। তিনি আটককৃত মালামাল এবং বন্দীদের ব্যাপারে কোন রকমের বাড়াবাড়ি হতে দেননি।

এই ঘটনায় অমুসলিমরা এ প্রোপাগান্ডার সুযোগ পায় যে, মুসলমানরা আল্লাহর হারাম করা মাসকে হালাল করে নিয়েছে। এ নিয়ে নানারকম অপপ্রচার চালানো হয়। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা আয়াত নাযিল করে বলেন, 'পৌত্তলিকরা যা কিছু করছে, সেসব তৎপরতা মুসলমানদের কাজের চেয়ে অনেক বেশী অপরাধমূলক এবং ন্যক্কারজনক।'

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে লোকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে। বলো, তাতে যুদ্ধ করা ভীষণ অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দান করা, আল্লাহকে অস্বীকার করা, মসজিদুল হারামে বাধা দেয়া এবং তার বাসিন্দাকে তা থেকে বহিষ্কার করা আল্লাহর কাছে তদপেক্ষা বড় অন্যায়। ফেতনা হত্যা অপেক্ষা ভীষণ অন্যায়।' (সূরা বাকারা, আয়াত ২১৭)

এই ওহীর মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সমালোচনা নিরর্থক। কেননা পৌত্তলিকরা ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই এবং মুসলমানদের ওপর যুলুম অত্যাচারের মাধ্যমে সকল প্রকার নিষেধাজ্ঞা পয়মাল করে দিয়েছে। হিজরতকারী মুসলমানদের অর্থ-সম্পদ যখন কেড়ে নেয়া হয়েছে এবং পয়গাম্বরকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হয়েছে, তখন কি মক্কার মর্যাদা অর্থাৎ শহরে হারামের কথা চিন্তা করা হয়েছিলো? এসব ষড়যন্ত্র কি মক্কার বাইরে কোথাও করা হয়েছিলো? যদি না হয়ে থাকে, তবে হঠাৎ করে মক্কার মর্যাদা নিয়ে এতো উচ্চবাচ্য কেন? প্রকৃতপক্ষে পৌত্তলিকদের প্রোপাগান্ডার ঝড় সুস্পষ্ট নির্লজ্জতা এবং খোলাখুলি বেহায়াপনা থেকে উৎসারিত।

এই আয়াত নাযিল হওয়ায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় বন্দীকে মুক্তি দিয়ে নিহত ব্যক্তির হত্যার ক্ষতিপূরণও প্রদান করেন।[১৭]

বদরের যুদ্ধের আগে সংঘটিত গোযওয়া এবং ছারিয়্যা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। এ সকল ঘটনায় লুটতরাজ, হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনা ঘটেনি। তবে পৌত্তলিকদের পক্ষ থেকে প্রথম হামলার ঘটনা ঘটে। কুরয ইবনে জাবের ফাহরীর নেতৃত্বে এ হামলা চালানো হয়। এর আগেও পৌত্তলিকদের পক্ষ থেকে নানাধরনের বাড়াবাড়ি করা হয়েছিলো।

এদিকে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.)-এর নেতৃত্বে সংঘটিত ছারিয়্যার পর পৌত্তলিকদের মনে আতঙ্ক দেখা দেয়। যে জালে আটকা পড়বে বলে তারা আশঙ্কা করে আসছিলো, সেই জালেই তারা আটকা পড়ে। তারা বুঝতে পেরেছিলো যে, মদীনার নেতৃত্ব অত্যন্ত জাগ্রত বিবেকসম্পন্ন। মদীনায় বসে কোরায়শদের বাণিজ্যিক তৎপরতার খবর রাখছে। মুসলমানরা ইচ্ছে করলে তিনশত মাইলের ব্যবধান ডিঙ্গিয়ে তাদের এলাকায় এসে যা খুশী তা করে যেতে পারে।

---

১৭. উল্লিখিত গোজোয়া এবং ছারিয়ার বিবরণ যেসব গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে, যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ৮৩-৮৫, ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ ৫৯১-৬০৫, রহমাতুল লিল আলামীন ১ম খন্ড. পৃ. ১১৫-১১৬, ২য় খন্ড. পৃ. ২১২১৫-২১৬, ৪৬৮-৪৭০।

উল্লিখিত গ্রন্থাবলীতে কিছুটা মতভেদ পরিলক্ষিত হয়েছে। আমি আল্লামা ইবনে কাইয়েম এবং আল্লামা মনসুরপুরীর বিশ্লেষণ গ্রহণ করেছি।

হত্যা, লুটতরাজ ইত্যাদি সবই তাদের দ্বারা সম্ভব। এসব কিছু করেও তারা নিরাপদে মদীনায় ফিরে যেতে সক্ষম। পৌত্তলিকরা বুঝতে পেরেছিলো যে, সিরিয়ার বাণিজ্য নতুন বিপদের সম্মুখীন। কিন্তু সবকিছু জেনে বুঝেও তারা নিজেদের নির্বুদ্ধিতা থেকে বিরত হয়নি। জুহাইনা এবং বনু জামরার মতো সন্ধি সমঝোতা অর্থাৎ অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদনের পরিবর্তে তারা ক্রোধ প্রকাশের পথ অবলম্বন করে। মুসলমানদের ঘরে প্রবেশ করে তাদেরকে নিঃশেষ করে দেবার হুমকি বাস্তবায়নে তারা সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এই ক্রোধই তাদেরকে বদর প্রান্তরে সমবেত করেছিলো।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.)-এর নেতৃত্বাধীন ছারিয়্যার ঘটনার অল্পকাল পরেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুসলমানদের ওপর দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসে জেহাদ ফরয করেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কয়েকটি আয়াত নাযিল করেন। যেমন 'যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। কিন্তু সীমালংঘন করো না। আল্লাহ তায়ালা সীমালংঘনকারীদের ভালোবাসেন না। যেখানে তাদের পাবে, হত্যা করবে এবং যে স্থান থেকে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে, তোমরাও সেই স্থান থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করবে। হত্যা করা ফেতনা অপেক্ষা উত্তম। মসজিদুল হারামের কাছে তোমরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে না, যে পর্যন্ত তারা সেখানে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে, এটাই কাফেরদের পরিণাম। যদি তারা বিরত হয়, তবে আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকবে, যতক্ষণ না হত্যা করা ফেতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি তারা বিরত হয়, তবে যালেমদের ছাড়া অন্য কাউকে আক্রমণ করা চলবে না।' (সূরা বাকারা, আয়াত ১৯০-৯৩)

প্রায় একই সময়ে একই ধরনের অন্য আয়াতও নাযিল হয়। এতে যুদ্ধের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়। যেমন 'অতএব যখন তোমরা কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ মোকাবেলা করো, তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর। পরিশেষে যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে, তখন ওদেরকে কষে বাঁধবে। অতপর হয় অনুকম্পা নয় মুক্তিপণ। তোমরা জেহাদ চালাবে, যতক্ষণ না যুদ্ধ তার অস্ত্র নামিয়ে ফেলে। এটাই বিধান। এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে ওদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন কিন্তু তিনি চান তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তিনি কখনো তাদের কর্ম বিনষ্ট হতে দেন না। তিনি তাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করে দেন। তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার কথা তিনি তাদের জানিয়েছিলেন। হে মোমেন, যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য করো, আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন।' (সূরা মোহাম্মদ, আয়াত ৪-৭)

পরে আল্লাহ তায়ালা ওসব লোকের সমালোচনা করেছেন, যাদের মন যুদ্ধের আদেশ শুনে কাঁপতে শুরু করে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'অতপর যদি দ্ব্যর্থহীন কোন সূরা অবতীর্ণ হয় এবং ওতে জেহাদের কোন নির্দেশ থাকে, তুমি দেখবে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা মৃত্যু ভয়ে বিহ্বল মানুষের মতো তোমার দিকে তাকাচ্ছে। শোচনীয় পরিণাম ওদের। (সূরা মোহাম্মদ, আয়াত ২০)

প্রকৃতপক্ষে জেহাদ ফরয হওয়া, এ জন্যে তাকিদ দেয়া এবং তার প্রস্তুতির নির্দেশ ছিলো

পরিস্থিতির যথার্থ দাবী। সেই সময়ের অবস্থার প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখা অর্থাৎ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণকারী একজন সেনানায়কের জন্যে এটাই ছিলো স্বাভাবিক যে, তিনি সর্বাত্মক যুদ্ধ প্রস্তুতির নির্দেশ প্রদান করতেন। প্রকাশ্য এবং গোপনীয় সব কিছু সম্পর্কে অবগত সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা কেন জেহাদের আদেশ দেবেন না? সেই সময়ের পরিস্থিতি হক ও বাতিলের মধ্যে অর্থাৎ সত্য মিথ্যার মধ্যে একটি রক্তক্ষয়ী সংঘাত দাবী করছিলো। যাতে করে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হতে পারে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.)-এর আঘাত কাফেরদের ক্রোধের আগুনে ঘৃতাহুতির শামিল ছিলো।

কোরআনের আয়াত থেকে বোঝা যাচ্ছিলো যে, রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের সময় ঘনিয়ে এসেছে। এই সংঘর্ষে জয়লাভ হবে মুসলমানদের। লক্ষনীয় হলো, আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে, কাফেররা তোমাদেরকে যে জায়গা থেকে বের করে দিয়েছে, তোমরাও তাদেরকে সেই জায়গা থেকে বের করে দাও। এছাড়া বন্দীদের আটক এবং বিরোধীদের নির্মূল করে যুদ্ধকে একটি চূড়ান্ত পরিণতি দান করার জন্যে মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া এটাও বলা হয়েছে যে, মুসলমানরা একটি বিজয়ী এবং সফলকাম জাতির অন্তর্ভুক্ত। এই ইঙ্গিত দ্বারা এটাই বোঝানো হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত মুসলমানরাই জয় লাভ করবে। একথা ইশারায় বলার কারণ হলো, আল্লাহর পথে জেহাদে যারা অতিমাত্রায় আগ্রহী, তারা যেন বাস্তব ক্ষেত্রে আগ্রহের প্রমাণ দিতে পারে।

সেই সময়ে অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মোতোবেক ৬২৪ হিজরীর ফেব্রুয়ারী মাসে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন যে, তারা যেন বায়তুল মাকদেসের পরিবর্তে কাবা ঘরকে কেবলা মনোনীত করে এবং নামাযের মধ্যে যেন কাবার দিকে রোখ পরিবর্তন করা হয়। এই পরিবর্তনের ফলে মুসলমানদের ছদ্মবেশে ঘাপটি মেরে থাকা মোনাফেকরা চিহ্নিত হয়ে যায়। তারা মুসলমানদের কাছ থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। ফলে মুসলমানরা বিশ্বাসঘাতক ও খেয়ানতকারীদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। কেবলা পরিবর্তনের মাধ্যমে মুসলমানদের এই ইঙ্গিতও দেয়া হয়েছে যে, এখন থেকে এক নতুন যুগের সূচনা হবে। মুসলমানরা নিজেদের কেবলা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসবে। শত্রুর কবলে কেবলা থাকবে এটা হবে বিস্ময়ের ব্যাপার। সেটি মুক্ত করতে সচেষ্ট হওয়া হবে মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব।

পবিত্র কোরআনের এ সকল নির্দেশ এবং ইশারার পর মুসলমানদের মনে ঈমানী চেতনা বৃদ্ধি পায়। তারা জেহাদ ফি ছাবিলিল্লাহর প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে পড়ে এবং তাদের মনে শত্রুদের সাথে সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধের আকঙ্খা বহুগুণ বেড়ে যায়।

বদরের যুদ্ধ

ইসলামের প্রথম সিদ্ধান্তকর সামরিক অভিযান

উশাইরায় গৃহীত সামরিক অভিযানের বর্ণনায় আমরা উল্লেখ করেছি যে, কোরায়শদের একটি বাণিজ্য কাফেলা মক্কা থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে অল্পের জন্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহীত অভিযান থেকে রক্ষা পায়। এই কাফেলাই সিরিয়া থেকে মক্কা ফেরার পথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরেকটি উদ্যোগ গ্রহণ করেন। হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ এবং সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.)-কে এই কাফেলা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে উত্তর দিকে পাঠানো হয়। উভয় সাহাবী প্রথমে হাওরা নামক জায়গায় পৌঁছে অবস্থান নিয়ে আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যের কাফেলার অতিক্রমের অপেক্ষায় থাকেন। ঐ কাফেলা সেই স্থান অতিক্রমের সাথে সাথে সাহাবাদ্বয় দ্রুতবেগে মদীনায় ছুটে গিয়ে এ সম্পর্কে রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করেন।

এই কাফেলায় মক্কাবাসীদের অনেক সম্পদ ছিলো। এক হাজার উটের পিঠে পঞ্চাশ হাজার দীনারের বিভিন্ন ব্যবসায়িক জিনিসপত্র ছিলো। পঞ্চাশ হাজার দীনার হচ্ছে দুশো সাড়ে বাষট্টি কিলোগ্রাম সোনার তূল্য। এসব জিনিসের হেফাযতে কাফেলায় মাত্র ৪০ জন লোক ছিলো।

মদীনাবাসীদের জন্যে এটা ছিলো এক সুবর্ণ সুযোগ। পক্ষান্তরে এসব জিনিস থেকে বঞ্চিত হওয়া মক্কাবাসীদের জন্যে সামরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট ক্ষতি হয়ে দেখা দেবে। তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার মুসলমানদের মধ্যে ঘোষণা করলেন যে, কোরায়শদের বাণিজ্য কাফেলা বহু সম্পদ নিয়ে আসছে। এই কাফেলার উদ্দেশ্যে তোমরা বেরিয়ে পড়ো। এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা সমুদয় সম্পদ তোমাদেরকে গণিমতের মাল হিসাবে প্রদান করবেন।

ঘোষণা প্রচার করা হলেও এতে যোগদান বাধ্যতামূলক ছিলো না। বিষয়টি ব্যক্তিগত উৎসাহ উদ্দীপনা এবং আগ্রহের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো। কেননা ঘোষণার সময় ধারণা করা যায়নি যে, কাফেলার পরিবর্তে বদরের প্রান্তরে কোরায়শদের সাথে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হবে। এরূপ ধারণা না থাকায় বহুসংখ্যক সাহাবা মদীনায়ই থেকে যান। তারা মনে করেছিলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই অভিযান অতীতের অভিযানসমূহের মতোই হবে। এসব কারণেই এই যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেনি, তাদের সমালোচনাও করা হয়নি।

ইসলামী বাহিনীর সংখ্যা ও দায়িত্বভার

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের উদ্দেশ্যে রওয়ানাকালে তাঁর সঙ্গে তিনশতের কিছু বেশী সংখ্যক সাহাবী ছিলেন। এ সংখ্যা কারো মতে ৩১৩, কারো মতে ৩১৪ এবং কারো মতে ৩১৭। এদের মধ্যে ৮২, মতান্তরে ৮৩, মতান্তরে ৮৬ জন ছিলেন মোহাজের, বাকি সকলেই আনসার। আনসারদের মধ্যে ৬১ জন আওস আর ৭০ জন খাযরাজ গোত্রের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। এরা যুদ্ধের জন্যে তেমন কোন প্রস্তুতিও নেননি। সমগ্র সেনাদলে ঘোড়া ছিলো মাত্র ২টি। একটি হযরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.)-এর অন্যটি হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ কিন্দি (রা.)-এর। ৭০টি উট ছিলো, প্রতিটি উটে দুই বা তিনজন পর্যায়ক্রমে আরোহণ করছিলেন।

একটি উটে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আলী (রা.) এবং হযরত মারশাদ ইবনে আবু মারশাদ গানাভির পালাক্রমে অরোহন করছিলেন।

মদীনার ব্যবস্থাপনা এবং নামাযে ইমামতির দায়িত্ব প্রথমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-এর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিলো। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাওহা নামক জায়গায় পৌঁছে হযরত আবু লোবাবা ইবনে আবদুল মানযার (রা.)-কে মদীনার ব্যবস্থাপক হিসাবে প্রেরণ করেন। সেনাবিন্যাস এভাবে করা হয়েছিলো যে, একদল ছিলো মোহাজের এবং অন্য দল আনসারদের। মোহাজেরদের পতাকা হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা.) এবং আনসারদের পতাকা হযরত সা'দ ইবনে মায়া'য (রা.) বহন করছিলেন। উভয় দলের সম্মিলিত পতাকা ছিলো সাদা। এই পতাকা বহনের দায়িত্ব হযরত মোসয়াব ইবনে ওমায়ের আবদীর ওপর ন্যস্ত করা হয়। অধিনায়ক ছিলেন ডান দিকের হযরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.), আর বাম দিকে হযরত মেকদাদ ইবনে আমর (রা.)। সমগ্র বাহিনীতে এই দু'জন ছিলেন সর্বাধিক রণনিপুণ। হযরত কয়েস ইবনে আবি সাআ (রা.)-কেও অন্যতম অধিনায়ক নিযুক্ত করা হয়। প্রধান সিপাহসালারের দায়িত্ব রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে গ্রহণ করেন।

বদর অভিমুখে অগ্রযাত্রা

রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অসম্পূর্ণ সেনাদলকে সঙ্গে নিয়ে মদীনা থেকে মক্কাভিমুখী প্রধান সড়ক ধরে 'বিরে রাওহা' (রাওহা কূপ)-তে গিয়ে উপনীত হন। সেখান থেকে আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে মক্কার রাস্তা বাম দিকে রেখে ডানদিকের পথে অগ্রসর হতে থাকেন। এই পথে তিনি প্রথমে নাযিয়াহ এবং পরে রাহকান উপত্যকা অতিক্রম করেন। পরে সাফরার মেঠোপথ ধরে এক সময় দাররাহ প্রান্তরে উপনীত হন। সাফর-এ উপনীত হওয়ার পর স্থানীয় জুহাইনা গোত্রের দু'জন লোককে কোরায়শদের কাফেলার খবর সংগ্রহে বদর প্রান্তরে প্রেরণ করেন। এরা ছিলো বাশিশ ইবনে ওমর এবং আদী ইবনে আবু যাগবা।

মক্কায় বিপজ্জনক অবস্থার খবর প্রেরণ

কোরায়শদের বাণিজ্য কাফেলার নেতৃত্বে ছিলো আবু সুফিয়ান। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সে অগ্রসর হচ্ছিলো। সে জানতো যে, মক্কার রাস্তা ঝুঁকিপূর্ণ। এ কারণে প্রতিটি কাফেলার কাছে পথের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতো। আবু সুফিয়ান চলতি পথেই খবর পেলো যে, মদীনায় মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোরায়শদের কাফেলার ওপর হামলা করার জন্যে দাওয়াত দিয়েছেন। এ খবর পাওয়ার সাথে সাথে আবু সুফিয়ান জামজাম ইবনে আমর গেফারীকে মোটা অর্থের বিনিময়ে মক্কায় প্রেরণ করলে সে মক্কা পৌঁছে বাণিজ্য কাফেলার হেফাযতে মক্কাবাসীদের উদ্বুদ্ধ করে। জামজাম অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মক্কায় পৌঁছে আরবদের রীতি অনুযায়ী উটের পিঠে দাঁড়িয়ে নিজের পোশাক ছিঁড়ে চিৎকার করে জরুরী সংবাদ জানালো। সে বললো, কোরায়শরা শোনো, কাফেলা, কাফেলা। তোমাদের যেসব ব্যবসায়িক জিনিস আবু সুফিয়ানের কাছে রয়েছে, মোহাম্মদ এবং তার সঙ্গীরা সেই জিনিসের ওপর হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমার বিশ্বাস, তোমরা ওদের পেয়ে যাবে। সাহায্য- সাহায্য-সাহায্য।

যুদ্ধের জন্যে মক্কাবাসীদের প্রস্তুতি

বিপদের খবর শুনে মক্কার বিশিষ্ট লোকেরা চারিদিক থেকে ছুটে আসলো। তারা বলছিলো, মোহাম্মদ বুঝি মনে করেছেন যে, আবু সুফিয়ানের কাফেলাও ইবনে হাদরামির কাফেলার মতো। না মোটেই তা নয়। আমাদের ব্যাপারটা যে অন্যরকম, এটা তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। মক্কায় সক্ষম লোকদের মধ্যে প্রত্যেকেই যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। কেউ নিজে প্রস্তুত হলো, কেউ বা নিজের পরিবর্তে অন্য কাউকে প্রেরণ করলো। মক্কার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে আবু লাহাব

ব্যতীত অন্য কেউই এ যুদ্ধে যোগদানের প্রস্তুতি থেকে বাদ পড়েনি। আবু লাহাব নিজের পরিবর্তে তার কাছ থেকে ঋণ গ্রহীতা একজন লোককে প্রেরণ করলো। আশেপাশের বিভিন্ন গোত্রের যুবকদেরও কোরায়শরা সেনাদলে ভর্তি করলো। কোরায়শী গোত্রসমূহের মধ্যে একমাত্র বনু আদী ব্যতীত অন্য কোন গোত্র পেছনে থাকেনি। বনু আদী গোত্রের কেউ এ যুদ্ধে অংশ নেয়নি।

শত্রু বাহিনীর সংখ্যা

প্রথমদিকে মক্কার বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিলো তেরোশ। এদের কাছে একশত ঘোড়া এবং ছয়শত বর্ম ছিলো। উটের সংখ্যা ছিলো অনেক, সঠিক সংখ্যা জানা সম্ভব হয়নি।

সেনাবাহিনীর অধিনায়ক ছিলো আবু জেহেল ইবনে হিশাম। কোরায়শদের নয়জন বিশিষ্ট ব্যক্তি খাদ্য ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। একদিন নয়টি, অন্যদিন দশটি এভাবে উট যবাই করা হতো।

মক্কার সেনাদল রওয়ানা হওয়ার সময় হঠাৎ কোরায়শদের মনে পড়লো যে, বনু বকর গোত্রের সাথে তাদের শত্রুতা ও যুদ্ধ চলছে। ওরা তো পেছন থেকে তাদের ওপর হামলা করতে পারে। এতে তারা তো দুই আগুনের মাঝখানে পড়ে যাবে! এ প্রসঙ্গে আলোচনা পর্যালোচনার ফলে কোরায়শদের সামরিক অভিযান স্থগিত হওয়ার উপক্রম হলো। ঠিক সেই সময় অভিশপ্ত ইবলিস বনু কেনানা গোত্রের সর্দার ছোরাকা ইবনে মালেক ইবনে জাশাম মাদলাজির চেহারা ধারণ করে আবির্ভূত হয়ে কোরায়শ নেতাদের বললো, আমি তো তোমাদের বন্ধু। বনু কেনানা তোমাদের অনুপস্থিতিতে আপত্তিকর কোন কাজই করবে না, তোমাদের এ নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

শত্রুদের অগ্রযাত্রা

মক্কার সৈন্যবাহিনী অতপর পথে বেরিয়ে পড়লো। কিভাবে বেরোলো? আল্লাহ তায়ালা বলেন, লোকদের নিজেদের শান দেখিয়ে আল্লাহর পথ থেকে বিরত করে করে গর্বভরে এগিয়ে চললো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ওরা বেরোলো নিজেদের অস্ত্র শস্ত্র, আল্লাহর প্রতি বিরক্তি এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অসন্তুষ্টি নিয়ে। তারা প্রতিশোধ গ্রহণের ক্রোধে অধীর হয়ে উঠেছিলো। তারা দাঁত কিড়মিড় করে বলছিলো, মোহাম্মদ এবং তাঁর সাহাবাদের মক্কার বাণিজ্য কাফেলার প্রতি চোখ তুলে তাকানোর সাহস হলো কি করে?

মোটকথা খুবই দ্রুতগতিতে তারা উত্তর দিকে অর্থাৎ বদর প্রান্তরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলো। উসফান এবং কুদাইদ প্রান্তর অতিক্রম করে তারা যোহফা নামক জায়গায় পৌঁছুলো। সেখানে আবু সুফিয়ানের প্রেরিত নতুন এক খবর পাওয়া গেলো যে, আপনারা কাফেলা এবং নিজেদের সম্পদ রক্ষার জন্যে বেরিয়ে ছিলেন, আল্লাহ যেহেতু সব কিছু হেফাযত করেছেন, কাজেই আপনাদের আর প্রয়োজন নেই, আপনারা এবার ফিরে যান।

বাণিজ্য কাফেলার অন্তর্ধান

আবু সুফিয়ান বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে যাওয়ার সময় খুবই সতর্কতার সাথে পথ চলছিলো। চারিদিকের খোঁজ খবর সংগ্রহ করে পরিস্থিতির ওপর নযর রাখছিলো। বদর প্রান্তরের কাছাকাছি পৌঁছার পর কিছুটা সামনে এগিয়ে মাজদি ইবনে আমরের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তার কাছ মদীনার বাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। মাজদি বললো, তেমন কিছু তো চোখে পড়েনি, তবে দুইজন লোক দেখেছি। তারা পাহাড়ী টিলার কাছে উট বসিয়েছে, এরপর কুয়া থেকে পানি তুলে চলে গেছে। আবু সুফিয়ান এগিয়ে যেয়ে উটের পরিত্যক্ত মল পরীক্ষা করে খেজুরের বীচি পরীক্ষা করে বললো, নিসন্দেহে এই খেজুর ইয়াসরেবের। একথা বলার পরপরই সে নিজের কাফেলার কাছে ছুটে গেলো এবং পশ্চিম দিকে নিয়ে সমুদ্র সৈকত ধরে চলতে শুরু করলো। বদর প্রান্তরে

যাওয়ার প্রধান সড়ক বাঁ দিকে পড়ে রইল। এমনি করে আবু সুফিয়ান তার বাণিজ্য কাফেলা মদীনার বাহিনীর কবলে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করলো। নিরাপদ পথে মক্কাভিমুখে যাওয়ার সময়ে আবু সুফিয়ান মক্কা থেকে আগত সৈন্যদের খবর পাঠালো যে, তোমরা ফিরে যাও। বাণিজ্য কাফেলা আক্রান্ত হওয়ার আর কোন আশংকা নেই, আমি নিরাপদে মক্কা ফিরে যাচ্ছি।

শত্রু বাহিনীর অনৈক্য ও মতবিরোধ

এই খবর পেয়ে মক্কার সাধারণ সৈন্যরা ফিরে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলো। কিন্তু আবু জেহেল রুখে দাঁড়ালো। নিতান্ত অহংকারের সাথে সে বললো, খোদার কসম, বদর প্রান্তরে গিয়ে তিনদিন অবস্থান না করে আমরা ফিরে যাবো না। এই সময়ে সেখানে উট যবাই করবো, লোকদের ডেকে এনে আহার করাবো, মদ পান করাবো, দাসীরা আমাদের মনোরঞ্জনের জন্যে গান গাইবে। এর ফলে সমগ্র আরবে আমাদের এই সফরের খবর ছড়িয়ে পড়বে এবং চিরকালের জন্যে সবার মনে আমাদের সফর বিবরণী উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

আখনাস ইবনে শোরাইক নামে একজন বিশিষ্ট নেতা আবু জেহেলকে বললেন, চলো আমরা মক্কায় ফিরে যাই। কিন্তু তার কথায় আবু জেহেল কর্ণপাত করল না। আখনাস ছিলেন বনু যোহরা গোত্রের মিত্র এবং তিনশত সৈন্যের অধিনায়ক। তিনি আবু জেহেলকে প্রত্যাবর্তনে রাযি করাতে না পেরে বনু যোহরা গোত্রের লোকসহ তার অনুসারী তিনশত সৈন্য নিয়ে মক্কায় ফিরে গেলেন। বনু যোহরা গোত্রের কোন লোক বদরের যুদ্ধের অংশ নেয়নি। পরবর্তী সময়ে বনু যোহরা গোত্র আখনাস ইবনে শোরাইকের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার প্রশংসা করলো এবং তার মর্যাদা সেই গোত্রে স্থায়ীভাবে বসে গেলো।

বনু যোহরা গোত্রের লোকেরা ফিরে যাওয়ার পর বনু হাশেম গোত্রের আবু জেহেল ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো, আমাদের ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত অন্য কেউ ফিরে যেতে পারবে না।

বনু যোহরা গোত্রের লোকদের ফিরে যাওয়ার পর আবু জেহেলের সঙ্গে এক হাজার লোক থাকলো। তারা বদর প্রান্তর অভিমুখে রওয়ানা হলো। বদর প্রান্তরে পৌছে তারা পাহাড়ী টিলার পেছনে তাঁবু স্থাপন করলো। এই টিলা বদরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

মুসলিম বাহিনীর জন্যে নাযুক পরিস্থিতি

মদীনার দূতের মাধ্যমে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীরা জাফরান প্রান্তর অতিক্রম করছিলেন। তিনি কোরায়শদের সম্পর্কে বিশদ খবর পাওয়ার পর দূরদৃষ্টির মাধ্যমে বুঝতে পারলেন যে, কোরায়শদের সাথে একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছে। কাজেই এখন সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। কারণ মক্কার বাহিনীকে যদি বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেয়া হয়, তবে পরিণামে কোরাযেশদের দাপট বেড়ে যাবে এবং তাদের জয় জয়কার মানুষের মুখে মুখে আলোচিত হবে। এতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের প্রতিপত্তি বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের আওয়ায দুর্বল হয়ে পড়বে এবং ইসলাম হয়ে পড়বে প্রাণহীন ও শক্তিহীন। ইসলামের শত্রুরা এবং ইসলাম সম্পর্কে যারা ভালোভাবে জানা ও বোঝার সুযোগ পায়নি, তারা ইসলামের প্রতি ঘৃণার মনোভাব পোষণ করবে এবং শেষ পর্যন্ত ইসলামের শত্রুতায় নেমে পড়বে।

তাছাড়া মক্কার উন্মত্ত সৈন্যরা মদীনা অভিমুখে যে রওয়ানা হবে না, তারও কোন নিশ্চয়তা ছিলো না। তারা মদীনায় গিয়ে মুসলমানদের ঘরে প্রবেশ করে অত্যাচার নির্যাতন করার সুযোগও হাতছাড়া করতো না। মদীনার বাহিনী যদি কিছুমাত্র শিথিল মনোভাব পোষণ করতো এবং মোকাবেলা না করে শান্তিরক্ষার চিন্তায় মদীনায় ফিরে যেতো, তবে উল্লিখিত সব কিছুই হয়ে উঠতো অবধারিত। তাছাড়া কাফেরদের বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দিলে ইসলামের গৌরব ও মর্যাদার ওপর মন্দ প্রভাব পড়তো।

মজলিসে শুরার বৈঠক

পরিস্থিতির আলোকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজলিশে শূরার বৈঠক আহ্বান করলেন। বৈঠকে সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। সেনা অধিনায়ক এবং সাধারণ সৈন্যদের মতামত নেয়া হয়। কিছুসংখ্যক মুসলমান রক্তাক্ত সংঘর্ষের কথা শুনে কাঁপতে শুরু করে। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে বলেছেন, 'এটি এরূপ যেমন তোমার প্রতিপালক তোমাকে ন্যায়ভাবে তোমার গৃহ থেকে বের করেছিলেন অথচ বিশ্বাসীদের একদল তা পছন্দ করেনি। সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তারা তোমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হয়। মনে হচ্ছিলো তারা যেন মৃত্যুর দিকে চালিত হচ্ছে, আর তারা যেন তা প্রত্যক্ষ করছে।' (সূরা আনফাল, আয়াত ৫-৬)

নেতাদের মতামত চাওয়া হলো। হযরত আবু বকর (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) চমৎকার মনোভাব প্রকাশ করলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি নিবেদিত চিত্ততার পরিচয় তাঁদের কথার মাধ্যমে ফুটে উঠলো। এরপর উঠে দাঁড়ালেন হযরত মেকদাদ ইবনে আমর (রা.)। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে যে পথ দেখিয়েছেন, তার ওপর আপনি অবিচল থাকুন। আমরা আপনার সঙ্গে রয়েছি। আল্লাহর শপথ, বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আ.)-কে যে ধরনের কথা বলেছিলো, আমরা আপনাকে ওরকম কথা বলব না। উল্লেখ্য বনী ইসরাঈল হযরত মূসা (আ.)-কে বলেছিলো, 'হে 'মূসা, তারা যতোদিন সেখানে থাকবে, ততোদিন আমরা সেখানে প্রবেশই করবো না। সুতরাং তুমি আর তোমার প্রতিপালক যাও এবং যুদ্ধ করো, আমরা এখানে বসে থাকবো।' (সূরা মায়েদা, আয়াত ২৪)

বরং আমরা বলবো 'আপনি এবং আপনার পরওয়ারদেগার লড়াই করুন, আমরাও আপনার সাথে লড়বো। সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আপনি যদি আমাদের বারকে গেমাদ পর্যন্তও নিয়ে যান, তবুও আমরা সারা পথ লড়াই করতে করতে আপনার সাথে সেখানে পৌঁছুবো।

হযরত মেকদাদ (রা.)-এর কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রশংসা করে তার জন্যে দোয়া করলেন।

মোহাজেরদের মতামত নেয়ার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের মতামত নেয়া প্রয়োজন মনে করলেন। কারণ আনসাররাই ছিলো সংখ্যায় বেশী। যুদ্ধের দায়দায়িত্ব তাদের ওপরই বেশী ন্যস্ত হবে। অথচ বাইয়াতে আকাবার আলোকে মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করার জন্যে তারা বাধ্য ছিলো না। হযরত আবু বকর, হযরত ওমর এবং হযরত মেকদাদ (রা.)-এর মতামত শোনার পর প্রিয় নবী আনসারদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। আনসারদের অধিনায়ক হযরত সা'দ ইবনে মায়া'য (রা.) বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল, আপনি আমাদের মতামত জানতে চেয়েছেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাঁ। হযরত সা'দ ইবনে মায়া'য বললেন, আমরা আপনার ওপর ঈমান এনেছি, আপনাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছি। আমরা সাক্ষ্য দিয়েছি যে, আপনি যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবই সত্য। আমরা আপনার আনুগত্যের জন্যে আপনার সাথে অঙ্গীকার করেছি। কাজেই আপনি যা ভালো মনে করেন, সেদিকে অগ্রসর হউন। সেই আল্লাহর শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, আপনি যদি আমাদের সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে চান, তবে আমরাও ঝাঁপিয়ে পড়বো। আমাদের একজন লোকও পেছনে পড়ে থাকবে না। আগামীকাল আপনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করলেও আমাদের কোন আপত্তি নেই। আমাদের মনে কোন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। আমরা রণনিপুণ। এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের

মাধ্যমে এমন বীরত্বের প্রকাশ ঘটাবেন, যা দেখে আপনার চক্ষু শীতল হয়ে যাবে। আপনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন। আল্লাহ তায়ালা আমাদের যাত্রা পথে বরকত দিন।

এক বর্ণনায় এরূপ উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত সা'দ ইবনে মায়া'য (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, আপনি সম্ভবত ভাবছেন যে, আনসাররা নিজেদের এলাকায় আপনাকে সাহায্য করবে এবং এটাকেই দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করে। এ কারণেই আমি আনসারদের পক্ষ থেকে জবাব দিচ্ছি এবং বলছি। বস্তুত আপনি যেখানে চান চলুন, যার সাথে ইচ্ছা সম্পর্ক স্থাপন করুন। আমাদের অর্থ-সম্পদের যতোটা ইচ্ছা গ্রহণ করুন। যতোটুকু গ্রহণ করবেন, সেটা আমাদের কাছে পরিত্যক্ত অংশের চেয়ে অধিকতর পছন্দনীয় হবে। এ ব্যাপারে আপনার ফয়সালা আমরা চূড়ান্ত বলে মেনে নেবো। আল্লাহর শপথ, আপনি যদি সামনে অগ্রসর হয়ে বার্কে গেমাদ পর্যন্ত যান, তবুও আমরা আপনার সঙ্গে যাব। আর যদি আপনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তাহলেও আমরা আপনার সাথে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়বো।'

হযরত সা'দ ইবনে মা'য (রা.)-এর একথা শুনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুব খুশী হলেন। তিনি বললেন, চলো এবং আনন্দের সাথে চলো। আল্লাহ তায়ালা আমার সাথে দুইটি দলের মধ্যে একটির ওয়াদা করেছেন। আল্লাহর শপথ, আমি যেন বধ্যভূমি দেখতে পাচ্ছি।

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাফরান থেকে সামনে অগ্রসর হলেন। কয়েকটি পাহাড়ী মোড় অতিক্রম করে তিনি আসফের নামক জায়গায় পৌঁছুলেন। হেমান নামক পাহাড় ডানদিকে রেখে পরে তিনি বদর প্রান্তরের কাছাকাছি এসে তাঁবু স্থাপন করলেন।

গোপনে সংবাদ সংগ্রহের উদ্যোগ

এখানে অবতরণের পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর 'গারে ছুরের' সাথী হযরত আবু বকর (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে সংবাদ সংগ্রহে বেরোলেন। দূর থেকে মক্কার সৈন্যদের তাঁবু পর্যবেক্ষণ করছিলেন। এমন সময় আরবের একজন বৃদ্ধের দেখা পেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কোরায়শ এবং মোহাম্মদের সাহাবীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। উভয় বাহিনী সম্পর্কে জিজ্ঞাসার কারণ ছিলো এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে চাচ্ছিলেন না। কিন্তু বুড়ো বেঁকে বসলেন। তিনি বললেন, আপনারা নিজেদের পরিচয় দিন, আপনারা কোন দলের অন্তর্ভুক্ত সেকথা বলুন, অন্যথায় আমি কিছু বলব না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আপনার কাছে যা জানতে চেয়েছি, আপনি আমাদের বলুন, এরপর আমরা আপনাকে নিজেদের পরিচয় দেবো। বৃদ্ধ বললেন, মোহাম্মদ এবং তাঁর সঙ্গীরা যদি আমাকে সত্য কথা জানিয়ে থাকে, তবে আজ তাদের অমুক জায়গায় থাকার কথা। একথা বলে বৃদ্ধ ঠিক সেই জায়গার কথা উল্লেখ করলো, যেখানে সেই সময় সাহাবারা অবস্থান করছিলেন। বৃদ্ধ আরো বললেন, কোরায়শ অমুক দিন বেরিয়েছে। সংবাদ বাহক যদি আমাকে সত্য কথা জানিয়ে থাকে, তবে কোরায়শদের আজ অমুক জায়গায় থাকার কথা। এ কথা বলে বৃদ্ধ ঠিক সেই জায়গারই উল্লেখ করলো, যেখানে আবু জেহেল এবং তার সঙ্গীরা অবস্থান করছিলো।

বৃদ্ধ কথা শেষ করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গীর পরিচয় জানতে চাইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমরা একই পানি থেকে উদ্ভুত। একথা বলেই চলে এলেন। বৃদ্ধ বিড়বিড় করতে লাগলো, 'কোন পানি থেকে? ইরাকের পানি থেকে?'

মক্কার বাহিনী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

সেইদিন শেষ বিকেলে শত্রুদের অবস্থান ও অন্যান্য খবর সংগ্রহের জন্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল গুপ্তচর প্রেরণ করলেন। এই দলে ছিলেন মোহাজেরদের তিনজন নেতা। এরা হলেন, হযরত আলী (রা.), হযরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) এবং হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.)। এই তিনজন বিশিষ্ট সাহাবী অন্য কয়েকজন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে কোরায়শ বাহিনীর খবর সংগ্রহ করতে বেরোলেন। প্রথমে তারা বদরের জলাশয়ের কাছে গেলেন। সেখানে দুইজন ক্রীতদাস কোরায়শ বাহিনীর জন্যে পানি তুলছিলো। সাহাবীরা তাদেরকে পাকড়াও করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে এলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন নামায আদায় করছিলেন। সাহাবারা গ্রেফতারকৃত ক্রীতদাসদের কাছে কোরায়শদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা বললো, আমরা কোরায়শদের লোক। তারা আমাদের পানি তুলে নেয়ার জন্যে পাঠিয়েছে। সাহাবাদের এই জবাব পছন্দ হলো না। তারা ধারণা করেছিলেন যে, এরা আবু সুফিয়ানের লোক হবে। কেননা তাদের মনে এখনো একটা ক্ষীণ আশা ছিলো যে, বাণিজ্য কাফেলা হয়তো অধিকার করা যাবে। সাহাবারা উভয় ক্রীতদাসকে মারাত্মভাবে প্রহার করলেন। প্রহারের চোটে ওরা বাধ্য হয়ে বললো, হাঁ আমরা আবু সুফিয়ানের লোক। একথা শোনার পর প্রহারকারীরা প্রহার বন্ধ করলো।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শেষে সাহাবাদের রুক্ষভাবে বললেন, ওরা যখন সত্য কথা বলেছিলো তখন তোমরা তাদের প্রহার করেছো আর যখন মিথ্যা কথা বলেছে তখন ছেড়ে দিয়েছো। আল্লাহর শপথ, ওরা উভয়েই সত্য কথা বলেছে। ওরা কোরায়শদেরই লোক।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর ক্রীতদাসদের বললেন, আচ্ছা তোমরা এবার আমাকে কোরায়শদের সম্পর্কে কিছু বলো। তারা বললো, প্রান্তরের শেষ সীমায় যে টীলা দেখা যাচ্ছে, কোরায়শরা তার পেছনে রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে চাইলেন লোক কতো? ওরা বললো, আমরা জানি না। দৈনিক কয়টি উট যবাই করে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন। ওরা বললো, একদিন নয়টি এবং একদিন দশটি। একথা শুনে তিনি বললেন, লোকসংখ্যা নয়শত থেকে এক হাজারের মধ্যে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর জিজ্ঞাসা করলেন, ওদের মধ্যে কোরায়শদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে কারা রয়েছে? তারা বললো, রবিয়ার উভয় ছেলে ওতবা এবং শায়বা আবুল বাখতারি ইবনে হিশাম, হাকেম, ইবনে হাজাম, নওফেল ইবনে খুয়াইলাহ, হারেস ইবনে আমর, তুয়াইমা ইবনে আদী, নযর ইবনে হারেস, জামআ ইবনে আসওয়াদ, আবু জেহেল ইবনে হিশাম, উমাইয়া ইবনে খালফ। এরা ছাড়াও উভয় ক্রীতদাস আরো কয়েকজনের নাম বললো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, মক্কা তাদের বড় বড় টুকরাগুলোকে তোমাদের পাশে এনে ফেলেছে।

রহমতের বৃষ্টিপাত ও মুসলমানদের অগ্রাভিযান

সেই রাতেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন বৃষ্টি বর্ষণ করেন। সেই বৃষ্টি কাফেরদের ওপর মুষলধারে বর্ষিত হয়, এতে তাদের অগ্রাভিযানে বাধার সৃষ্টি হয়। মুসলমানদের জন্যে তা ছিলো রহমতের ঝর্ণাধারা। এতে শয়তান সৃষ্ট নোংরামী থেকে মুসলমানরা পাকছাফ হওয়ার সুযোগ পান, পায়ের নীচের বালুকা শক্ত হয় এবং পা রাখার মতো চমৎকার অবস্থার সৃষ্টি হয়, মন মযবুত হয়ে যায়।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর মুসলিম নেতাদের সঙ্গে নিয়ে সামনে অগ্রসর হন। মোশরেকদের আগেই বদরের জলাশয়ের কাছে পৌঁছার জন্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম সচেষ্ট ছিলেন। এ সময় হযরত হাকাব ইবনু মুনযির (রা.) একজন বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সেনা নায়কের মতো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একটি পরামর্শ দেন। প্রথমে তিনি জানতে চান যে, হে আল্লাহর রসূল, আপনি কি এখানে আল্লাহর এমন আদেশে সমবেত হয়েছেন যে, সামনে পেছনে যাওয়ার কোন অবকাশ নেই? নাকি রণকৌশল হিসাবে আপনি এই জায়গা পছন্দ করেছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা স্রেফ রণকৌশলগত কারণ। একথা শোনার পর হযরত খাব্বাব (রা.) বললেন, এই জায়গায় অবস্থান আমি সমীচীন মনে করি না। আমাদের আরো এগিয়ে যেতে হবে এবং কোরায়শদের অবস্থানের সবচেয়ে নিকটবর্তী জলাশয় নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। অন্যান্য জলাশয়ের ওপরও আমরা নযর রাখবো। যুদ্ধ শুরু হলে আমরা পানি পান করবো, কিন্তু কোরায়শরা পানির অভাবে ছটফট করবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি যথার্থ পরামর্শই দিয়েছো। এরপর তিনি সৈন্যদের নিয়ে এগিয়ে চললেন। রাতের মাঝামাঝি সময়ে শত্রুদের কাছাকাছি জলাশয়ের কাছে পৌঁছে তাঁবু ফেললেন। এরপর সাহাবারা হাউজ বানালেন এবং বাকি সব জলাশয় বন্ধ করে দিলেন।

নেতৃত্বের কেন্দ্রস্থল

সাহাবারা জলাশয়ের কাছে অবস্থান নেয়ার পর হযরত সা'দ ইবনে মা'য (রা.) একটি প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি বলেন যে, মুসলমানরা নিজেদের নেতার জন্যে একটি অবস্থান কেন্দ্র তৈরী করতে পারে। এর ফলে আল্লাহ না করুন জয়ের বদলে মুসলমানদের পরাজয় অথবা অন্য কোন ধরনের জরুরী পরিস্থিতি দেখা দিলে আমরা আগে থেকেই সতর্ক থাকতে পারব। এরূপ আলোচনার পর হযরত সা'দ (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আপনার জন্যে আমরা একটা বিশেষ খাট তৈরী করতে চাই। আপনি সেখানে অবস্থান করবেন। আপনার পাশেই আমরা আপনার সওয়ারীও রেখে দেবো। এরপর শত্রুদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হবো। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সম্মান দিলে এবং শত্রুদের ওপর বিজয়ী করলে আপনার এরূপ অবস্থানস্থল আমাদের জন্যে পছন্দনীয় হবে। আমরা পরাজিত হলে আপনি সওয়ারীতে আরোহন করে সেইসব লোকের কাছ যেতে পারবেন, যারা পেছনে রয়েছেন। হে আল্লাহর নবী, আপনার পেছনে এমন লোকেরাই রয়েছে, যারা আপনাকে আমাদের চেয়ে বেশী ভালোবাসে। আপনার প্রতি আমাদের ভালোবাসা তাদের মতো বেশী ও গভীর নয়। তারা যদি জানতেন যে, আপনি যুদ্ধের মুখোমুখি হবেন, তাহলে তারা কিছুতেই পেছনে থাকতেন না। আল্লাহ তায়ালা তাদের মাধ্যমে আপনার হেফাযত করবেন, ওরা আপনার কল্যাণকারী হবেন এবং আপনার সঙ্গে জেহাদ করবেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা শুনে হযরত সা'দ (রা.) এর প্রশংসা করে তাঁর জন্যে দোয়া করলেন। মুসলমানরা যুদ্ধক্ষেত্রের উত্তর পূর্ব দিকে একটি উঁচু টিলায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যে একটি খাট তৈরী করেন। সেখানে বসে পুরো রণাঙ্গন চোখে পড়ে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্যে হযরত সা'দ ইবনে মা'য (রা.)-এর নেতৃত্বে একদল আনসার যুবককে দায়িত্ব দেয়া হয়।

যুদ্ধের জন্যে সেনা বিন্যাস

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর সেনা বিন্যাস করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে রওয়ানা হয়ে যান।[১] সেখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতের ইশারা করে দেখিয়ে বলছিলেন যে, আগামীকাল ইনশাল্লাহ এই জায়গা হবে অমুকের বধ্যভূমি এবং এই জায়গা হবে অমুকের

---

১. জামে তিরমিযি, আবওয়াবুল জেহাদ, ১ম খন্ড, পৃ. ২০১

বধ্যভূমি।

এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে একটি গাছের শেকড়ের কাছে রাত্রিযাপন করেন। সাহাবারাও নিরুদ্বেগ প্রশান্তির সাথে রাত কাটান। তাদের অন্তর ছিলো আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ শান্তি ও নিশ্চিন্ততার সাথে সময় অতিবাহিত করেন। তাদের মনে প্রত্যাশা ছিলো যে, সকালে নিজ চোখে মহান প্রতিপালকের সুসংবাদের প্রমাণ দেখতে পাবেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'স্মরণ কর, তিনি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদেরকে তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করেন এবং আকাশ থেকে তোমাদের ওপর বারি বর্ষণ করেন, তা দ্বারা তোমাদের তিনি পবিত্র করবেন, তোমাদের থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা অপসারণ করবেন, তোমাদের হৃদয় দৃঢ় করবেন এবং তোমাদের পা স্থির রাখবেন।' (সূরা আনফাল, আয়াত ১১)

এটি ছিলো দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ই রমযানের রাত। এই মাসের ৮ বা ১২ তারিখ তিনি মদীনা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন।[২]

শত্রুদের পারস্পরিক মতবিরোধ

কোরায়শরা বদরের শেষ প্রান্তে টিলার ওপাশে নিজেদের তাঁবুতে রাত্রিযাপন করে। সকালে টিলার এ পাশে বদর প্রান্তরে এসে সমবেত হয়। একদল লোক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাউযের দিকে অগ্রসর হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ওদের বাধা দিও না। পরে দেখা গেছে যে, লোকদের মধ্যে যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাউয থেকে পানি পান করে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলো, তারা সবাই নিহত হয়েছিলো। একমাত্র হাকিম ইবনে হিযাম বেঁচে গিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে হাকিম ইসলাম গ্রহণ করে একজন ভালো মুসলমান হয়েছিলেন। তার নিয়ম ছিলো যে, তিনি যখনই কসম খেতেন, তখনই বলতেন, 'লায়াল্লাযি নাজ্জানি মিন ইয়াওমে বাদরিন।' অথাৎ সেই সত্তার শপথ, যিনি আমাকে বদরের দিন মুক্তি দিয়েছেন।

কোরায়শরা মুসলমানদের সৈন্য সমাবেশ লক্ষ্য করার পর এদের শক্তি পরিমাপ করার জন্যে ওমায়ের ইবনে ওয়াহাব জাহামীকে প্রেরণ করলো। ওমায়ের এক চক্কর দিয়ে ফিরে গিয়ে বললো, মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা তিনশত বা কিছু কম বেশী হবে। আমি একটু দেখে আসি তাদের কোন সহায়ক বাহিনী আছে কিনা। বেশ কিছুদূরে ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে এসে ওমায়ের বললো সহায়ক কোন সৈন্য মুসলমানরা পশ্চাতে রেখে আসেনি। তবে একটা ব্যাপার আমি লক্ষ্য করেছি যে, ইয়াসরেবের উটগুলো নির্ভেজাল মৃত্যু বহন করে নিয়ে এসেছে। ওদের সমুদয় শক্তি তলোয়ারের ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহর শপথ, আমি যা বুঝেছি, এতে মনে হয়েছে যে, ওরা কেউ তোমাদের না মেরে মরবে না। যদি তোমাদের বিশিষ্ট লোকদের ওরা মেরেই ফেলে, তবে তোমরা বিশিষ্ট সঙ্গীহারা হয়ে যাবে। কাজেই যা কিছু করবে, ভেবে চিন্তে করাই সমীচীন।

এ সময় আরো একদল যুদ্ধবিরোধী লোক আবু জেহেলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠলো। কিন্তু আবু জেহেল যুদ্ধ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যুদ্ধবিরোধী লোকেরা চাচ্ছিলো যে, যুদ্ধ না করেই মক্কায় ফিরে যাবে। যেমন হাকিম ইবনে হিযাম যুদ্ধ চাচ্ছিলেন না। তিনি এখানে ওখানে ছুটোছুটি করতে লাগলেন। প্রথমে ওতবা ইবনে রবিয়ার কাছে গেলেন। বললেন, হে আবুল ওলীদ, আপনি কোরায়শদের বিশিষ্ট ব্যক্তি। আপনার আনুগত্য সবাই বিনাবাক্যে মেনে নেয়। আপনি একটি ভালো কাজ করুন। এর ফলে সব সময় আপনার আলোচনা মানুষের মুখে মুখে থাকবে। ওতবা বললেন, সেটা কি কাজ হাকিম? হাকিম বললেন, আপনি সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। নাখলার

---

[২]. মেশকাত ২য় খন্ড, পৃ. ৫৪৩

ছারিয়্যায় নিহত আপনার মিত্র আমর ইবনে হাদরামির হত্যার ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব আপনি নিজের ওপর নিয়ে নিন। ওতবা বললো, আমি রাযি আছি। তুমি আমার পক্ষ থেকে যামানত লও। আমর ইবনে হাদরামি আমার মিত্র, তার মৃত্যুর ক্ষতিপূরণের দায়িত্বও আমার ওপরই বর্তায়। তার যে সম্পদ বিনষ্ট হয়েছে, আমি তা পুষিয়ে দেবো।

এরপর ওতবা হাকিম ইবনে হিযামকে বললো, তুমি হানজালিয়ার ছেলে (আবু জেহেলের মায়ের নাম ছিলো হানজালিয়া) অর্থাৎ আবু জেহেলের কাছে যাও। সেই সব কিছু বিগড়াচ্ছে, লোকদের উস্কানি দেয়ার মূলে তার হাতই সক্রিয় রয়েছে।

এরপর ওতবা ইবনে রবিয়া দাঁড়িয়ে বক্তৃতার ভঙ্গিতে বললো, হে কোরায়শরা, তোমরা মোহাম্মদ এবং তার সঙ্গীদের সাথে লড়াই করে বিশেষ কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারবে না। খোদার কসম, যদি তারা তোমাদের মেরে ফেলে, তবে এমন সব চেহারাই দেখতে পাবে, যাদের নিহত অবস্থায় তোমরা দেখতে চাইবে না। কারণ তোমরা তো চাচাতো ভাই, খালাতো ভাই অথবা নিজের গোত্রের অন্য কাউকেই হত্যা করবে। আরবের অন্য লোকেরা যদি মোহাম্মদ এবং তার সঙ্গীদের মেরে ফেলে তবে তোমাদের ইচ্ছাই পূরণ হবে। আর যদি অন্য কোন পরিস্থিতি দেখা দেয়, তবে মনে রেখো, মোহাম্মদ এবং তার সঙ্গীদের হাতে তোমরা এমন অবস্থায় পড়বে যে, তাদের সাথে অতীতে যা করেছে, সবই তারা মনে রেখেছে। কাজেই চলো আমরা ফিরে যাই, আমরা নিরপেক্ষ থাকবো।

হাকিম ইবনে হিযাম আবু জেহেলের কাছে গিয়ে লক্ষ্য করলো যে, সে নিজের বর্ম পরিষ্কার করছে। হাকিম বললো, হে আবুল হাকাম, ওতবা আমাকে আপনার কাছে এই পয়গাম নিয়ে পাঠিয়েছেন। আবু জেহেল বললো, খোদার কসম, মোহাম্মদ এবং তার সঙ্গীদের দেখে ওতবার বুক শুকিয়ে গেছে। কিন্তু আমি কিছুতেই মক্কায় ফিরে যাবো না। খোদাতায়া'লা মোহাম্মদ এবং আমাদের মধ্যে একটা ফয়সালা না করা পর্যন্ত আমরা মক্কায় ফিরে যাবো না। ওতবা যা কিছু বলেছে, সেটা এ জন্যেই বলেছে যে, সে মোহাম্মদ এবং তার সঙ্গীদের ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছে। ওতবার পুত্রও ওদের সঙ্গে রয়েছে এ কারণে সে ওদের ব্যাপারে তোমাদের ভয় দেখাচ্ছে। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ওতবার পুত্র হোযায়ফা অনেক আগেই ইসলাম গ্রহণ হিজরত করে মদীনায় চলে যান।) ওতবা যখন খবর পেলো যে, আবু জেহেল তার সম্পর্কে বলেছে যে, খোদার কসম, ওতবার বুক শুকিয়ে গেছে, তখন সে বললো, আবু জেহেল শীঘ্রই জানতে পারবে যে, কার বুক শুকিয়ে গেছে, আমার না তার। আবু জেহেল ওতবার এই প্রতিক্রিয়ার খবরে ভয় পেয়ে গেলো। এটা যেন দীর্ঘায়িত না হয়, এজন্যে সে নাখলার ছারিয়্যায় নিহত আমর ইবনে হাদরামীর ভাই আমের ইবনে হাদরামিকে ডেকে পাঠালো। আমের আসার পর আবু জেহেল বললো, তোমাদের মিত্র ওতবা লোকদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়। অথচ তোমরা নিজেদের ওপর যুলুম নিজেদের চোখে দেখেছ। কাজেই ওঠো, তোমাদের প্রতি যে যুলুম করা হয়েছে, তোমরা যে মযলুম একথা জোর গলায় বলো, তোমার ভাইয়ের নিহত হওয়ার ঘটনা সবাইকে নতুন করে জানাও। একথা শুনে আমের উঠে দাঁড়ালো এবং নিজের পাছার কাপড় খুলে চিৎকার করতে লাগলো। সে বললো, হায় আমর, আয় আমর, হায় আমর। এই চিৎকার শুনে সবাই জড়ো হলো, যুদ্ধ করার ইচ্ছা সবার মনে প্রবল হয়ে দেখা দিলো। মুসলমানদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। ওতবা যে আহ্বান জানিয়েছিলো, সেটা ব্যর্থ হলো। এমনি করে হুশের ওপর জোশ জয়ী হলো, যুদ্ধ না করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেলো।

উভয় বাহিনী একে অপরের মুখোমুখি

অমুসলিমরা দলে দলে বেরিয়ে এলো এবং উভয় বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি হতে শুরু করলো। এ সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'হে আল্লাহ তায়ালা, কোরায়শরা পরিপূর্ণ অহংকারের সাথে তোমার বিরোধিতায় এবং তোমার রসূলকে মিথ্যা প্রমাণ করতে এগিয়ে এসেছে। হে আল্লাহ তায়ালা, আজ তোমার প্রতিশ্রুত সাহায্য বড় বেশী প্রয়োজন। হে আল্লাহ তায়ালা, তুমি আজ ওদের ছিন্ন ভিন্ন করে দাও।'

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওতবাকে তার লাল উটের ওপর দেখে বললেন, কওমের কারো কাছে যদি কল্যাণ থাকে তবে লাল উটের আরোহীর কাছে রয়েছে। অন্যরা যদি তার কথা মেনে নিতো, তবে সঠিক পথ প্রাপ্ত হতো।'

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সময় মুসলমানদের কাতারবন্দী করলেন। তখন একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটলো।

নবী (সাঃ)-এর হাতে ছিলো একটি তীর। সেটির সাহায্যে তিনি কাতার সোজা করছিলেন। এ সময় তীরের ফলা ছাওয়াদ ইবনে গাযিয়ার পেটে একটু খানি লাগলো। তিনি কাতার থেকে একটুখানি সামনে এগিয়ে এসেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তীরের ফলা ছাওয়াদের পেটে লাগিয়ে বলেছিলেন, ছাওয়াদ, সোজা হয়ে যাও। ছাওয়াদ তৎক্ষণাৎ বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আপনি আমাকে কষ্ট দিয়েছেন, বদলা নিতে দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পেটের ওপর থেকে জামা সরিয়ে বললেন, নাও প্রতিশোধ নাও। ছাওয়াদ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জড়িয়ে ধরে তাঁর পবিত্র পেটে চুম্বন করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ছাওয়াদ তুমি এমন কাজ করতে কিভাবে উদ্বুদ্ধ হলে? ছাওয়াদ বললেন, হে আল্লাহর রসূল, যা কিছু ঘটতে চলেছে, আপনি তো সবই দেখছেন। আমার একান্ত ইচ্ছা হলো যে, আপনার ঘনিষ্ঠতা যেন আমার জীবনের শেষ স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকে। আপনার পবিত্র দেহের সাথে আমার দেহের সংস্পর্শ যেন জীবনের শেষ ঘটনা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা শুনে ছাওয়াদকে দোয়া করলেন।

কাতার সোজা করার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের বললেন, তাঁর পক্ষ থেকে নির্দেশ না পেয়ে কেউ যেন যুদ্ধ শুরু না করে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর যুদ্ধ পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ পথনির্দেশ প্রদান করলেন। তিনি বললেন, পৌত্তলিকরা যখন দলবদ্ধভাবে তোমাদের কাছে আসবে, তখন তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করবে। তীরের অপচয় যেন না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।[৩] ওরা তোমাদের ঘিরে না ফেলা পর্যন্ত তরবারি চালনা করবে না।[৪] এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর (রা.)-কে সঙ্গে নিয়ে অবস্থান কেন্দ্রে চলে গেলেন। হযরত সা'দ ইবনে মায়া'য (রা.) পাহারাদার সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাহারায় নিযুক্ত হলেন।

অন্যদিকে পৌত্তলিকদের অবস্থা ছিলো এই যে, আবু জেহেল আল্লাহর কাছে ফয়সালার জন্যে দোয়া করলো। সে বললো, হে আল্লাহ, আমাদের মধ্যে যে দল আত্মীয়তার সম্পর্ক অধিক ছিন্ন করেছে এবং ভুল কাজ করেছে, আজ তুমি তাদের ধ্বংস করে দাও। হে আল্লাহ, আমাদের মধ্যে যে দল তোমার কাছে অধিক প্রিয় ও পছন্দনীয়, আজ তুমি তাদের সাহায্য করো। পরবর্তী সময়ে আবু জেহেলের এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন, 'তোমরা মীমাংসা

---

৩. সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৬৮

৪ . সুনানে আবু দাউদ, ২য় খন্ড পৃ. ১৩

চেয়েছিলে, তা-তো তোমাদের কাছে এসেছে। যদি তোমরা বিরত হও, তবে সেটা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর, যদি তোমরা পুনরায় তা করো, তবে আমিও পুনরায় শাস্তি দেবো এবং তোমাদের দল সংখ্যায় অধিক হলেও তোমাদের কোন কাজে আসবে না এবং আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের সঙ্গে রয়েছেন।' (সূরা আনফাল, আয়াত ১৯)

যুদ্ধের প্রথম ইন্ধন

এ যুদ্ধের প্রথম ইন্ধন ছিলো আসওয়াদ ইবনে আবদুল আছাদ মাখযুমি। এই লোকটি ছিলো নিতান্ত দুর্বৃত্ত ও অসচ্চরিত্রের। ময়দানে বেরোবার সময় বলছিলো, আমি আল্লাহর সাথে ওয়াদা করছি যে, ওদের হাউজের পানি পান করেই ছাড়ব। যদি তা না পারি, তবে সেই হাউজকে ধ্বংস বা তার জন্যে জীবন দিয়ে দেবো।

এ কথা বলে আসওয়াদ এগিয়ে এলো। অন্যদিকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে থেকে হযরত হামযা ইবনে আবদুল মোত্তালেব এগিয়ে গেলেন। জলাশয়ের কাছেই উভয়ের মুখোমুখি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলো। হযরত হামযা (রা.) তলোয়ার দিয়ে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, কাফের আসওয়াদের পা হাঁটুর নীচে দিয়ে কেটে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। সে ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেলো। কর্তিত পা থেকে অবিরাম ধারায় রক্ত বেরোতে লাগলো। সেই রক্তধারা তার সঙ্গীদের দিকে প্রবাহিত হচ্ছিলো। আসওয়াদ হামাগুড়ি দিয়ে জলাশয়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো। জলাশয়ের কাছে পৌঁছে জলাশয়ের পানি পান করে তার কসম পূর্ণ করতে চাচ্ছিলো। এমন সময় হযরত হামযা (রা.) আসওয়াদের ওপর পুনরায় আঘাত করলেন। এই আঘাতের ফলে সে জলাশয়ের ভেতর পড়ে মরে গেলো।

সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু

আসওয়াদ ইবনে আবুল আছাদের হত্যাকান্ড ছিলো বদরের যুদ্ধের প্রথম ঘটনা। এই হত্যার পর যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়লো। কোরায়শ বাহিনীর মধ্য থেকে তিনজন বিশিষ্ট যোদ্ধা বেরিয়ে এলো। এরা ছিলো একই গোত্রের লোক; তন্মধ্যে রবিয়ার দুই পুত্র ওতবা ও শায়বা এবং ওতবার এক পুত্র ওলীদ। এরা কাতার থেকে বেরিয়ে এসেই প্রতিপক্ষকে মোকাবেলার জন্যে আহ্বান জানালো। তিনজন আনসার যুবক অগ্রসর হলেন। এরা ছিলেন, আওফ, মোয়াওয়েয এবং আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা। প্রথমোক্ত দুইজন ছিলেন হারেসের পুত্র। তাদের মায়ের নাম ছিলো আফরা। কোরায়শরা জিজ্ঞাসা করলো, তোমাদের পরিচয় কি? তারা বললো, আমরা মদীনার আনসার। কোরায়শরা বললো, আপনারা অভিজাত প্রতিদ্বন্দ্বী সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনাদের সাথে আমাদের কোন বিরোধ নেই। আমরা চাই আমাদের চাচাতো ভাইদের। এরপর তিন কোরায়শ যুবক চিৎকার করে বললো, হে মোহাম্মদ, আমাদের কাছে আমাদের রক্তসম্পর্কীয়দের পাঠাও। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওবায়দা ইবনে হারেস, হামযা এবং আলী এগিয়ে যাও। এরা এগিয়ে যাওয়ার পর তিনজন কোরায়শ যুবক না চেনার ভান করে এদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলো। এরা নিজেদের পরিচয় দিলেন। কোরায়শ যুবকত্রয় বললো, হাঁ, আপনারা অভিজাত প্রতিদ্বন্দ্বী। এরপর শুরু হলো সাধারণ যুদ্ধ। হযরত ওবায়দা ইবনে হারেস (রা.) ওতবা ইবনে রবিয়ার সাথে, হযরত হামযা (রা.) শায়বার সাথে এবং হযরত আলী (রা.) ওলীদ ইবনে ওতবার সাথে মোকাবেলা করলেন।[৫]

হযরত হামযা (রা.) এবং হযরত আলী (রা.) নিজ নিজ প্রতিদ্বন্দ্বীদের কাবু করে ফেললেন

---

[৫]. ইবনে হিশাম, মোসনাদে আহমদ। আবু দাউদের বর্ণনায় পার্থক্য রয়েছে। মেশকাত, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৪৩

কিন্তু হযরত ওবায়দা ইবনে হারেস (রা.) এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী ওতবার মধ্যে আঘাত বিনিময় হলো। তারা একে অন্যকে মারাত্মকভাবে আহত করে ফেললেন। ইতিমধ্যে হযরত হামযা এবং হযরত আলী তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীর কাজ শেষ করে হযরত ওবায়দার সাহায্যে এগিয়ে এলেন এবং ওতবার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে শেষ করে ফেললেন। এরপর তারা হযরত ওবায়দাকে উঠিয়ে নিয়ে এলেন। হযরত ওবায়দা (রা.)-এর পা কেটে গিয়েছিলো এবং কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। তার মুখে আর কথা ফুটেনি। চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে মুসলমানরা মদীনা ফিরে যাওয়ার পথে সফরা প্রান্তর অতিক্রম করার সময় হযরত ওবায়দা (রা.) ইন্তেকাল করেন। হযরত আলী (রা.) কসম খেয়ে বলতেন, এই আয়াত আমাদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'এরা দু'টি বিবদমান পক্ষ, তারা তাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্ক করে।' (সূরা হজ্জ, আয়াত ১৯)

পৌত্তলিকদের দুর্ভাগ্য সূচিত হয়ে গেলো। একত্রে তিনজন বিশিষ্ট যোদ্ধাকে তারা হারালো। ক্রোধে দিশাহারা হয়ে তারা সবাই একত্রে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

অন্যদিকে মুসলমানরা তাদের মহান প্রতিপালকের কাছে সাহায্যের জন্যে দোয়া করে এবং দৃঢ়তার সাথে কাফেরদের হামলা মোকাবেলা করছিলেন। তারা 'আহাদ, আহাদ' শব্দ উচ্চারণ করে বিধর্মী কাফেরদের ওপর পাল্টা হামলায় তাদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করছিলেন।

বদর প্রান্তরে নবী (স.)-এর দোয়া

এদিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোজাহেদদের কাতার সোজা করার পর সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা পরওয়ারদেগারের কাছে সাহায্যের জন্যে কাতর কণ্ঠে আবেদন জানাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, হে আল্লাহ তায়ালা, তুমি আমার সাথে যে ওয়াদা করেছো তা পূরণ করো। হে আল্লাহ তায়ালা, আমি তোমার কাছে তোমার প্রতিশ্রুত সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছি।

উভয় পক্ষে প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর দরবারে এই দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ রব্বুল আলামীন, যদি আজ মুসলমানদের এই দল নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তবে দুনিয়ায় এবাদাত করার মতো কেউ থাকবে না। হে আল্লাহ তায়ালা, তুমি কি এটা চাও যে, আজকের পরে কখনোই তোমার এবাদাত করা না হোক?'

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতিশয় বিনয় ও নম্রতার সাথে সকাতর কণ্ঠে এই মোনাজাত করছিলেন। তাঁর কাতরোক্তির একপর্যায়ে উভয় স্কন্ধ থেকে চাদর পড়ে গেলো। হযরত আবু বকর (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাদর ঠিক করে দিলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রসূল, এবার থামুন। আপনি তো আপনার প্রতিপালকের কাছে অতিশয় কাতরতার সাথে মোনাজাত করেছেন। এদিকে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের প্রতি আদেশ পাঠালেন যে, 'স্মরণ করো, তোমাদের প্রতিপালক ফেরেশতাদের প্রতি প্রত্যাদেশ করেন যে, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। সুতরাং তোমরা মোমেনদেরকে অবিচলিত রাখো, যারা কুফুরী করে, আমি তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করবো সুতরাং, তাদের স্কন্ধ ও সর্বাঙ্গে আঘাত করো।' (সূরা আনফাল, আয়াত ১২)

এদিকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ মর্মে ওহী পাঠালেন, 'আমি তোমাদের সাহায্য করবো, এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা, যারা একের পর এক আসবে।' (সূরা আনফাল, আয়াত ৯)

ফেরেশতাদের অবতরণ

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ সময় হযরত জিবরাঈল (আ.) এলেন। তিনি চকিতে মাথা তুলে বললেন, আবু বকর, খুশী হও, জিবরাঈল এসেছেন, ধুলোবালির মধ্যে এসেছেন। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেন, আবু বকর, খুশী হও, তোমাদের কাছে আল্লাহর সাহায্য এসে পৌঁছেছে। জিবরাঈল ঘোড়ার লাগাম ধরে ঘোড়ার আগে আগে আসছেন। ধুলোবালি উড়ছে।

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কামরার বাইরে এলেন। তিনি বর্ম পরিহিত ছিলেন। তিনি উদ্দীপনাময় ভঙ্গিতে সামনে অগ্রসর হতে হতে বলছিলেন, 'এই দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে।' (সূরা কামার, আয়াত ৪৫)

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর এক মুঠো ধূলি কাফেরদের প্রতি নিক্ষেপের সময় বললেন, 'শাহাতিল উজুহ' অর্থাৎ ওদের চেহারা আচ্ছন্ন হোক। একথা বলেই ধুলো কাফেরদের প্রতি নিক্ষেপ করলেন। এই নিক্ষিপ্ত ধূলি প্রত্যেক কাফেরের চোখ, মুখ, নাক ও গলায় প্রবেশ করলো। একজনও বাদ গেলো না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'এবং তখন তুমি নিক্ষেপ করোনি, বরং আল্লাহ তায়ালাই নিক্ষেপ করেছিলেন।' (সূরা আনফাল, আয়াত ১৭)

জবাবী হামলা

এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবী হামলার নির্দেশ এবং যুদ্ধের তাকিদ দিয়ে বলেন, তোমরা এগিয়ে যাও। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মোহাম্মদের প্রাণ এবং ওদের সঙ্গে তোমাদের যে কেউ দৃঢ়তার সাথে পুণ্যের কাজ মনে করে অগ্রগামী হয়ে পেছনে সরে না এসে যুদ্ধ করবে এবং মারা যাবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে অবশ্যই জান্নাত দান করবেন।

কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেন, 'সেই জান্নাতের প্রতি যে ওঠো যে যার দিগন্ত ও বিস্তৃতি আকাশ ও মাটির সমপরিমাণ।' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একথা শুনে ওমায়ের ইবনে হাম্মাম বললেন, চমৎকার, চমৎকার! নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একথা বলার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল অন্য কোন কারণে নয়, আমি আশা করছিলাম যে, আমিও সেই জান্নাতের অধিবাসীদের মধ্যে যদি হতে পারতাম। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সেই জান্নাতীদের মধ্যে তুমিও রয়েছো। এরপর ওমায়ের ইবনে হাম্মাম কয়েকটি খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। হঠাৎ উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে বললেন, এই খেজুরগুলো খেতে অনেক সময় প্রয়োজন। জীবনকে এতো দীর্ঘায়িত করবো কেন। এ কথা বলে তিনি খেজুর ছুঁড়ে ফেলে বিধর্মীদের সাথে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন জবাবী হামলার নির্দেশ দেন তখন শত্রুদের হামলার তীব্রতা কমে আসে। তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনাতেও ভাটা পড়ে। এটা মুসলমানদের অবস্থান দৃঢ় করার ক্ষেত্রে সহায়ক প্রমাণিত হয়। কেননা সাহাবায়ে কেরাম যখন জবাবী হামলার আদেশ লাভ করেন এবং তাঁদের জোশ যখন তুঙ্গে তখন তাঁরা প্রচন্ডবেগে হামলা করেন। এ সময় তাঁরা কাফেরদের কাতার এলোমেলো করে তাদের শিরশ্ছেদ করতে করতে এগিয়ে যান। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে বর্ম পরিধান করে রণক্ষেত্রে এসেছেন দেখে সাহাবাদের উদ্দীপনা আরো বেড়ে গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুস্পষ্টভাবে বলছিলেন, 'শীঘ্রই ওরা পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দীপনায় সাহাবারা বিপুল বিক্রমে লড়াই করেন। এ সময়ে ফেরেশতারাও মুসলমানদের সাহায্য করেন।[৬]

ইবনে সা'দ এর বর্ণনায় হযরত ইকরামা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, সেইদিন মানুষের মাথা কর্তিত হয়ে পড়ছিলো। অথচ বোঝা যাচ্ছিলো না যে, কে তাকে মেরেছে। মানুষের কর্তিত

---

[৬]. মুসলিম, ২য় খন্ড, পৃ. ১৩৯, মেশকাত, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৩১

হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যেতো অথচ কে কেটেছে তা বোঝা যেত না।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একজন আনসারী মুসলমান একজন মোশরেককে দৌড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ সেই মোশরেকের ওপর চাবুকের আঘাতের শব্দ শোনা গেলো কে যেন বলছিলো, যাও, সামনে এগোও। সাহাবী লক্ষ্য করলেন যে, পৌত্তলিক চিৎকাত হয়ে পড়ে গেছে। তার নাকে মুখে আঘাতের চিহ্ন। চেহারা রক্তাক্ত। দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো যে, তাকে চাবুক দিয়ে আঘাত করা হয়েছে অথচ আঘাতকারীকে দেখা যাচ্ছিলো না, সেই আনসারী সাহাবী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি সত্য বলেছো। এটা ছিলো তৃতীয় আসমানের সাহায্য।[৭]

আবু দাউদ মাজানি বলেন, আমি একজন মোশরেককে মারার জন্যে দৌড়াচ্ছিলাম। তার গলায় আমার তলোয়ার পৌঁছার আগেই কর্তিত মস্তক মাটিতে গড়িয়ে পড়লো। আমি বুঝতে পাড়লাম যে, এই কাফেরকে অন্য কেউ হত্যা করেছে।

একজন আনসারী হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালেবকে গ্রেফতার করে নিয়ে এলেন। হযরত আব্বাস তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ, আমাকে তো এই লোকটি কয়েদ করে নিয়ে আসেনি। আমাকে মুন্ডিত মস্তকের একজন লোক কয়েদ করে নিয়ে এসেছে। সুদর্শন সেই লোকটি একটি চিত্রল ঘোড়ার পিঠে আসীন ছিলো। এখন তো সেই লোকটিকে এইসব লোকের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। আনসারী বললেন, হে আল্লাহর রসূল, তাকে তো আমি গ্রেফতার করেছি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, চুপ করো। আল্লাহ তায়ালা একজন সম্মানিত ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের সাহায্য করেছেন।

রণক্ষেত্র থেকে ইবলিসের পলায়ন

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিলো যে, অভিশপ্ত ইবলিস ছোরাকা ইবনে মালেক ইবনে জাশআম মুদলিজীর আকৃতি ধারণ করে এসেছিলো। মোশরেকদের কাছ থেকে সে তখনো পৃথক হয়নি। কিন্তু পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে ফেরেশতাদের ব্যবস্থা গ্রহণ দেখে সে ছুটে পালাতে লাগলো। কিন্তু হারেস ইবনে হিশাম তাকে ধরে ফেললেন। তিনি ভেবেছিলেন, লোকটি প্রকৃতই ছোরাকা ইবনে মালেক। কিন্তু ইবলিস হযরত হারেসের বুকে প্রচন্ড ঘুষি মারলো। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। ইত্যবসরে ইবলিস পালিয়ে গেলো। মোশরেকরা বলতে লাগল, ছোরাকা কোথায় যাচ্ছ? তুমি কি বলো নাই যে, আমাদের সাহায্য করবে, আমাদের কাছ থেকে দূরে থাকবে না? ছোরাকা বললো, আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি, যা তোমরা দেখতে পাওনা। আল্লাহকে আমার ভয় হচ্ছে, তিনি কঠোর শাস্তিদাতা। এরপর ইবলিস সমুদ্রে গিয়ে আত্মগোপন করলো।

কাফেরদের পরাজয়

কিছুক্ষণের মধ্যেই অমুসলিমদের বাহিনীতে ব্যর্থতা ও হতাশার সুস্পষ্ট লক্ষণ ফুটে উঠলো। মুসলমানদের প্রবল আক্রমণের মুখে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। যুদ্ধের পরিণাম হয়ে উঠলো সুস্পষ্ট। কাফের কোরায়শরা পশ্চাদপসারণ করতে লাগলো এবং তাদের মনে হতাশা ছেয়ে গেলো। মুসলমানরা কাউকে হত্যা করছিলেন, কাউকে যখম করছিলেন, কাউকে ধরে নিয়ে আসছিলেন। ফলে কাফেররা সুস্পষ্ট পরাজয় বরণ করলো।

দুর্বৃত্তদের নেতা আবু জেহেল কোরায়শ কাফেরদের ছত্রভঙ্গ হতে দেখে সেই সয়লাব প্রতিরোধের চেষ্টা করলো। নিজের অনুসারীদের উদ্দীপিত করার জন্যে চিৎকার করে সে বলতে লাগলো, ছোরাকার পলায়নে তোমরা সাহস হারিও না। মোহাম্মদের সাথে ছোরাকার যোগসাজস

---

৭. মুসলিম, ২য় খন্ড, পৃ. ৯৩

ছিলো। ওতবা, শায়বা ওলীদ নিহত হয়েছে দেখে তোমরা হিম্মত হারিও না। ওরা তাড়াহুড়ো করেছে। লাত এবং ওযযার শপথ, ততক্ষণ আমরা ফিরে যাব না, যতক্ষণ না ওদের দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলব। দেখো, তোমরা ওদের কাউকে হত্যা করবে না, বরং পাকড়াও করো। পরে আমরা ওদের অশুভ তৎপরতার মজা টের পাইয়ে দেবো।

আবু জেহেল তার এ অহংকারের মজা শিগগির টের পেয়ে গেলো। কেননা অল্পক্ষণের মধ্যেই মুসলমানদের জবাবী হামলার মুখে তাদের মধ্যে ছত্রভঙ্গ অবস্থা দেখা দিলো। আবু জেহেল তার কিছুসংখ্যক অনুসারীকে নিয়ে তখনো ঘেরাও অবস্থায় ছিলো। দুর্বৃত্ত নেতা আবু জেহেলের চারিদিকে ছিলো তীর আর তলোয়ারের পাহারা। মুসলিম মোজাহেদের প্রচন্ড হামলায় সেই পাহারা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। মুসলমানরা লক্ষ্য করলেন যে, আবু জেহেল একটি ঘোড়ার পিঠে রয়েছে। তার মৃত্যু তখন পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছিলো।

আবু জেহেলের হত্যাকান্ড

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বলেন, বদর যুদ্ধের দিনে আমি মুসলমানদের কাতারের মধ্যে ছিলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করে দেখি যে, ডানে বাঁয়ে দু'জন আনসার কিশোর। তাদের উপস্থিতি সম্পর্কে আমি চিন্তা করছিলাম, হঠাৎ একজন চুপিসারে আমাকে বললো, চাচাজান, আবু জেহেল কে তা আমাকে দেখিয়ে দিন। আমি বললাম, ভাতিজা, তুমি তার কি করবে? সে বললো, আমি শুনেছি, আবু জেহেল প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালি দেয়। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যদি আমরা আবু জেহেলকে দেখতে পাই তবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার কাছ থেকে আলাদা হব না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার এবং আমাদের মৃত্যু যার আগে লেখা রয়েছে, তার মৃত্যু না হয়। হযরত আবদুর রহমান (রা.) বলেন, একথা শুনে আমি অবাক হলাম। অন্য একজন আনসার কিশোরও আমাকে চুপিসারে একই কথা বললো। কয়েক মুহূর্ত পরে আমি আবু জেহেলকে লোকদের মধ্যে বিচরণ করতে দেখছিলাম। আমি উভয় আনসার কিশোরকে বললাম, ওই দেখো তোমাদের শিকার। যার সম্পর্কে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছো। একথা শোনামাত্র উভয় আনসার কিশোর আবু জেহেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করে ফেলল। এরপর উভয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন তোমাদের মধ্যে কে আবু জেহেলকে হত্যা করেছ? উভয়ে বললো, আমি করেছি, আমি করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা কি তালোয়ারের রক্ত মুছেছো? তারা বললো, না মুছিনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়ের তালোয়ার দেখে বললেন, তোমরা দু'জনেই হত্যা করেছ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্য আবু জেহেলের পরিত্যাক্ত জিনিসপত্র মায়া'য ইবনে আমর ইবনে জামুহকে প্রদান করলেন। উভয় কিশোরের নাম ছিলো মা'য ইবনে আমর জামুহ এবং মা'উয ইবনে আফরা।[৮]

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, মায়া'য ইবনে আমর ইবনে জামুহ বলেছেন, আবু জেহেল কাফেরদের তীর তলোয়ারের দুর্ভেদ্য পাহারার ভেতর ছিলো। কাফেররা বলছিলো আবু জেহেলের

---

৮. সহীহ বোখারী ১ম খন্ড, পৃ. ৪৪৪, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৬৮, মেশকাত ২য় খন্ড, ৩৫২। অন্যান্য বর্ণনায় দ্বিতীয় কিশোরের নাম মাউয ইবনে আফরা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৬৩৫। আবু জেহেলের পরিত্যক্ত জিনিসপত্র একজনকে এ কারণেই দেয়া হয়েছিলো, যেহেতু মা'য অথবা মাউয ইবনে আফরা সেই যুদ্ধে পরবর্তী সময়ে শহীদ হন। আবু জেহেলের তরবারি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে দেয়া হয়েছিলো। কেননা তিনি আবু জেহেলের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। দ্রষ্টব্য, সুনানে আবু দাউদ, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৭৩

কাছে কেউ যেন পৌঁছুতে না পারে। মায়া'য ইবনে আমর বলেন, একথা শুনে আবু জেহেলকে চিনে রাখলাম এবং তার কাছাকাছি থাকতে লাগলাম। সুযোগ পাওয়া মাত্র আমি তার ওপর হামলা করলাম। তাকে এমন আঘাত করলাম যে, তার পা হাঁটুর নীচে দিয়ে কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। ঝরে পড়া খেজুরের মতো তার পা উড়ে গেলো। এদিকে আবু জেহেলকে আমি আঘাত করলাম আর ওদিকে তার পুত্র একরামা আমার কাঁধ বরাবর তরবারি দিয়ে আঘাত করলো। এতে লড়াই করতে অসুবিধা হচ্ছিলো। কর্তিত হাত পেছনে রেখে অপর হাতে তরবারি চালাচ্ছিলাম। এতেও বেশ অসুবিধা হচ্ছিলো। আমি তখন হাতের কর্তিত অংশ পায়ের নীচে রেখে এক ঝটকায় হাত থেকে পৃথক করে ফেললাম।[৯] এরপর আবু জেহেলের কাছে মাউয ইবনে আফরা পৌঁছুলেন। তিনি ছিলেন আহত। তিনি আবু জেহেলের ওপর এমন আঘাত করলেন যে, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ দুশমন সেখানেই ঢলে পড়লো। আবু জেহেলের শেষ নিঃশ্বাস তখনো বের হয়নি। শ্বাস-প্রশ্বাস চলাচল করছিলো। এরপর হযরত মাউয ইবনে আফরা লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আবু জেহেলের পরিণাম কে দেখবে, দেখে আসো। সাহাবারা তখন আবু জেহেলের সন্ধান করতে লাগলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আবু জেহেলকে এমতাবস্থায় পেলেন যে, তার নিঃশ্বাস চলাচল করছিলো। তিনি আবু জেহেলের ধড়ে পা রেখে মাথা কাটার জন্যে দাড়ি ধরে বললেন, ওরে আল্লাহর দুশমন, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তোকে অপমান অসম্মান করলেন তো? আবু জেহেল বললো, কিভাবে আমাকে অসম্মান করলেন? তোমরা যাকে হত্যা করেছো তার চেয়ে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন কোন মানুষ আছে নাকি? তার চেয়ে বড় আর কে? আহা, আমাকে যদি কিশোর ছাড়া অন্য কেউ হত্যা করতো। এরপর বলতে লাগলো, বলো তো আজ জয়ী হয়েছে কারা? হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূল। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আবু জেহেলের কাঁধে পা চাপা দিয়ে রেখেছিলেন। আবু জেহেল তাঁকে বললো, ওরে বকরির রাখাল, তুই অনেক উঁচু জায়গায় পৌঁছে গেছিস। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) মক্কায় বকরি চরাতেন।

এ কথোপকথনের পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) আবু জেহেলের মাথা কেটে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাযির করে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, এই হচ্ছে আল্লাহর দুশমন আবু জেহেলের মাথা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাঁ সত্যই, সেই আল্লাহর শপথ, যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, হাঁ, সত্য, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, হাঁ, সত্য, তিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তায়ালা সুমহান। সকল প্রশংসা তাঁরই জন্যে নিবেদিত, তিনি নিজের প্রতিশ্রুতি সত্য করে দেখিয়েছেন, নিজের বান্দাদের সাহায্য করেছেন এবং একাকীই সকল দলকে পরাজিত করেছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর বললেন, চলো। আমাকে তার লাশ দেখাও। আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আবু জেহেলের লাশের কাছে নিয়ে গেলাম। তিনি বললেন, ও হচ্ছে এই উম্মতের ফেরাউন।

---

৯. হযরত মা'য ইবনে আমর জামুহ (রাঃ) হযরত ওসমানের (রাঃ) খেলাফতকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

ঈমানের কিছু বিস্ময়কর নিদর্শন

হযরত ওমায়ের ইবনে আল হাম্মাম এবং হযরত আওফ ইবনে হারেস ইবনে আফরার ঈমান সজীব করার মতো কার্যাবলীর উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই অভিযানে পদে পদে এমন সব দৃশ্য চোখে পড়েছে, যার মধ্যে ঈমানের শক্তি এবং নীতির পরিপক্কতা প্রসারিত হয়েছে। এই অভিযানে পিতা-পুত্রের মুখোমুখি এবং ভাই ভাইয়ের মুখোমুখি হয়েছে। নীতির প্রশ্নে তলোয়ারসমূহ কোষমুক্ত হয়েছে এবং মযলুম ও অত্যাচারিতরা যালেম ও অত্যাচারির সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে ক্রোধের আগুন নির্বাপিত করেছে। যেমন-

এক) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের বললেন, আমি জানি বনু হাশেমসহ কয়েকটি গোত্রের লোককে জোর করে যুদ্ধের ময়দানে নেয়া হয়েছে। আমাদের যুদ্ধের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। কাজেই হাশেম গোত্রের কোন লোক যদি কারো সামনে পড়ে যায়, তাকে যেন হত্যা না করা হয়। আবুল বাখতারি ইবনে হিশাম যদি কারো সামনে পড়ে যায়, তাকে যেন হত্যা না করা হয়। আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালেব যদি কারো নিয়ন্ত্রণে এসে যায়, তবে তাঁকেও যেন হত্যা না করা হয়। কেননা তাঁকে জোর করে নিয়ে আসা হয়েছে। একথা শুনে ওতবার পুত্র হযরত আবু হোযায়ফা (রা.) বললেন, আমরা নিজেদের পিতা পুত্র ভাই এবং গোত্রের অন্যান্য লোকদের হত্যা করবো আর আব্বাসকে ছেড়ে দেবো? আল্লাহর শপথ, যদি আব্বাসের সাথে আমার মুখোমুখি সাক্ষাৎ হয়, তবে আমি তাকে তলোয়ারের লাগাম পরিধান করাবো। এ খবর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছুলে তিনি ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-কে বললেন, আল্লাহর রসূলের চাচার চেহারায়ও কি তলোয়ার মারা হবে? হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমাকে ছেড়ে দিন, আমি এ লোকটির গর্দান উড়িয়ে দেবো। কেননা সে মোনোফেক হয়ে গেছে।

পরবর্তী সময়ে হযরত হোযায়ফা (রা.) বলতেন, সেদিন আমি যেকথা বলেছিলাম, সে কারণে কখনোই আমি স্বস্তি পাইনি, নিশ্চিন্ত হতে পারিনি। সব সময় ভয় হতো। শুধু মনে হতো যে, একমাত্র আমার শাহাদাতই সেদিনের বেফাঁস মন্তব্যের কাফফারা হতে পারে। অবশেষে ইয়ামামার যুদ্ধে হযরত হোযায়ফা (রা.) শহীদ হন।

দুই) আবুল বাখতারিকে হত্যা না করার জন্যে এ কারণেই বলা হয়েছে যে, মক্কায় এই লোকটিই কখনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিছুমাত্র কষ্ট দেননি। তার পক্ষ থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে বা আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে অপ্রীতিকর কোন কথাও কখনো শোনা যায়নি। এছাড়া বনি হাশেম এবং বনি মোত্তালেবের বয়কট প্রত্যাহারকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অত্যতম।

কিন্তু এতোসব গুণ সত্তেও বদরের দিনে মুজযির ইবনে যিয়াদ বালভীর সাথে তার মুখোমুখি হয়। আবুল বাখতারির সাথে তাঁর একজন সঙ্গীও ছিলেন। উভয়ে পাশাপাশি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আবুল বাখতারিকে দেখে হযরত মুজযির বললেন, হে আবুল বাখতারি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে হত্যা করতে আমাদের নিষেধ করেছেন। আবুল বাখতারি বললেন, খোদার শপথ, তাহলে আমরা দু'জনেই মরবো। এরপর উভয়ে হযরত মুজযির এর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন। হযরত মুজযির (রা.) বাধ্য হয়ে উভয়কেই হত্যা করলেন।

তিন) মক্কায় জাহেলিয়াতের সময় থেকেই হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) এবং উমাইয়া ইবনে খালফের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিলো। বদর যুদ্ধের দিনে উমাইয়া তার সন্তান আলীর হাত ধরে দাঁড়িয়েছিলো। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) তার সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি শত্রুদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া কয়েকটি বর্ম নিয়ে যাচ্ছিলেন। উমাইয়া

তাকে দেখে বললো, আমি কি তোমার প্রয়োজনে লাগতে পারি? আমি তোমার বর্মগুলোর চেয়ে উত্তম। আজকের মতো দৃশ্য আমি কখনো দেখিনি। তোমাদের কি দুধের প্রয়োজন নেই? অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমাকে বন্দী করবে মুক্তিপণ বা ফিদিয়া হিসাবে আমি তাকে অনেক দুধেল উটনী দেবো। একথা শুনে হযরত আবদুর রহমান বর্মগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং উমাইয়া ও তার পুত্র আলীকে গ্রেফতার করে সামনের দিকে অগ্রসর হলেন।

হযরত আবদুর রহমান (রা.) বলেন, আমি উমাইয়া এবং তার সন্তানের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় উমাইয়া বললো, আপনাদের মধ্যে ওই লোকটি কে ছিলেন যিনি বুকে উট পাখীর পালক লাগিয়ে রেখেছিলেন? আমি বললাম, তিনি হামযা ইবনে আবদুল মোত্তালেব। উমাইয়া ইবনে খালফ বললো, এই লোকটিই আমাদের ধ্বংসলীলা ঘটিয়েছে।

হযরত আবদুর রহমান (রা.) বলেন, আমি উভয়কে নিয়ে যাচ্ছিলাম, এমন সময় হযরত বেলাল (রা.) উমাইয়াকে আমার সঙ্গে দেখে ফেললেন। স্মরণ করা যেতে পারে যে, উমাইয়া হযরত বেলাল (রা.)-কে মক্কায় ব্যাপকভাবে নির্যাতন করেছিলো। হযরত বেলাল (রা.) উমাইয়াকে দেখে বললেন, ওহে কাফেরদের সর্দার উমাইয়া ইবনে খালফ, হয়তো আমি বাঁচবো অথবা সে বাঁচবে। এরপর উচ্চকণ্ঠে বললেন, ওহে আল্লাহর আনসাররা, এই দেখো কুফরের সর্দার উমাইয়া ইবনে খালফ, এবার হয়তো আমি থাকবো অথবা সে থাকবে। হযরত আবদুর রহমান (রা.) বলেন, ততক্ষণে লোকেরা আমাদেরকে ঘিরে ফেলেছে। আমি তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু একজন সাহাবী তলোয়ার তুলে উমাইয়ার পুত্র আলীর পায়ে আঘাত করলেন। সাথে সাথে সে ঢলে পড়লো। এদিকে উমাইয়া এমন জোরে চিৎকার দিয়ে উঠলো যে, আমি অতো জোরে চিৎকার কখনো শুনিনি। আমি বললাম, পালাও, পালাও! কিন্তু আজ তো পালানোর পথ নেই। খোদার শপথ, আমি আজ তোমার কোন উপকারে আসতে পারবো না।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) বলেন, উত্তেজিত সাহাবারা উমাইয়া এবং তার পুত্র আলীকে ঘিরে ফেলে আঘাতে আঘাতে হত্যা করে ফেললো। এরপর আবদুর রহমান (রা.) বললেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত বেলালের ওপর রহমত করুন। আমার বর্মগুলোও গেলো, আমার গ্রেফতার করা বন্দীদের ব্যাপারেও তিনি আমাকে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করে দিলেন।

যাদুল মায়া'দে আল্লামা ইবনে কাইয়েম লিখেছেন, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) উমাইয়া ইবনে খালফকে বললেন, হামাগুড়ি দিয়ে বসে পড়ুন। সে বসে পড়লো। হযরত আবদুর রহমান উমাইয়ার দেহের উপর ঝুঁকে পড়ে তাকে আড়াল করে রাখলেন। কিন্তু সাহাবারা নীচে থেকে তরবারি চালিয়ে উমাইয়াকে হত্যা করলেন। একজন সাহাবীর তরবারির আঘাতে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফেরও পা কেটে গিয়েছিলো।[১০]

চার) হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) তাঁর মামা আস ইবনে হিশাম ইবনে মুগিরাকে হত্যা করেন।

পাঁচ) হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তাঁর পুত্র তদানীন্তন মোশরেক আবদুর রহমানকে ডেকে বললেন, ওরে খবিস, আমার অস্ত্রশস্ত্র কোথায়? আবদুর রহমান বললো, হাতিয়ার, দ্রুতগামী ঘোড়া আর সেই তলোয়ার ছাড়া কিছু বাকি নেই, যা বার্ধক্যের বিভ্রান্তি শেষ করে দেয়।

ছয়) মুসলমানরা যে সময় মোশরেকদের গ্রেফতার করছিলেন, সে সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জন্যে তৈরী হুজরায় অবস্থান করছিলেন। হযরত সা'দ ইবনে মায়া'য

---

১০. যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ৮৯, শহীহ বোখারী কিতাবুল ওকালা, ১ম পৃ, ৩০৮। এতে এ ঘটনা আরো বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়েছে।

(রা.) তলোয়ার উঠিয়ে পাহারা দিচ্ছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লক্ষ্য করলেন যে, হযরত সা'দ (রা.) এর চেহারা বিমর্ষ। তিনি বললেন, সা'দ মুসলমানদের কাজ মনে হয় তোমার পছন্দ নয়। তিনি বললেন, হাঁ; হে আল্লাহর রসূল। অমুসলিমদের সাথে এটি আমাদের প্রথম যুদ্ধ। এই যুদ্ধের সুযোগ আল্লাহ তায়ালা দিয়েছেন। কাজেই আমি মনে করি মোশরেকদের ছেড়ে দেয়ার পরিবর্তে তাদের হত্যা করাই সমীচীন, তাদের নির্মূল করা দরকার।

সাত) এই যুদ্ধে হযরত উকাশা ইবনে মোহসেন আসাদীর তলোয়ার ভেঙ্গে যায়। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে এক টুকরো কাষ্ঠখন্ড দিয়ে বললেন, আকাশা, এটি দিয়ে লড়াই করো। আকাশা সেই কাষ্ঠখন্ড হাত দিয়ে সোজা করতেই সেটি একটি ধারালো চকচকে তলোয়ারে পরিণত হলো। এরপর তিনি সেই তলোয়ার দিয়ে লড়াই করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে মুসলমানরা জয়লাভ করলেন। সেই তলোয়ারের নাম রাখা হলো 'আওন' অর্থাৎ সাহায্য। সেটি হযরত আকাশার কাছেই ছিলো। তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে এই তলোয়ার ব্যবহার করতেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর খেলাফতের সময় ধর্মান্তরিত লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। সেই সময়েও ওই তলোয়ার তাঁর কাছে ছিলো।

আট) যুদ্ধ শেষে হযরত মসয়াব ইবনে ওমাইর আবদারি (রা.) তাঁর ভাই আবু উজাইর ইবনে ওমাইর আবদারির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু উযায়ের মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই করছিলেন। সেই সময় একজন আনসারি সাহাবীর হাতে তার হাত কেটে গেলো। হযরত মসয়াব সেই সাহাবীকে বললেন, এই লোকটির মাধ্যমে হাত মযবুত করো। তার মা বড় ধনী। তিনি সম্ভবত তোমাকে ভালো মুক্তিপণ দেবেন। এতে আবু উযায়ের তাঁর ভাই মসআবকে বললেন, আমার ব্যাপারে কি তোমার এটাই অসিয়ত? হযরত মসআব (রা.) বললেন, হাঁ, তুমি নও, বরং এই আনসারী হচ্ছে আমার ভাই।

নয়) মোশরেকদের লাশ যখন কূয়োর ভেতর ছুঁড়ে ফেলার নির্দেশ দেয়া হলো, তখন ওতবা ইবনে রবিয়ার লাশ কূয়োর দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। সেই সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওতবার পুত্র হোযায়ফার মুখের দিকে তাকালেন। লক্ষ্য করলেন, আবু হোযায়ফা বিমর্ষ গম্ভীর। তাকে কেমন যেন বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হোযায়ফা, সম্ভবত তোমার পিতার ব্যাপারে তোমার মনে খুব কষ্ট হচ্ছে? তিনি বললেন, জ্বীনা, হে আল্লাহর রসূল। আমার মনের মধ্যে আমার পিতা এবং তার হত্যাকান্ড সম্পর্কে কোন শিহরণ নেই। তবে আমি ধারণা করেছিলাম যে, আমার পিতার মাথায় বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে, দূরদর্শিতা আছে। এ কারণে আশা করেছিলাম যে, তাঁর বুদ্ধি-বিবেক এবং দূরদর্শিতার কারণে তিনি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেবেন। কিন্তু এখন তাঁর পরিণাম দেখে, কুফুরীর ওপর তার জীবন শেষ হতে দেখে খুব খারাপ লাগছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হোযায়ফা (রা.)-এর জন্যে দোয়া করলেন এবং তাঁর সম্পর্কে উত্তম মন্তব্য করলেন।

উভয় পক্ষের হতাহতের সংখ্যা

বদরের যুদ্ধ মুসলমানদের বিজয় এবং কাফেরদের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হলো। এই যুদ্ধে ১৪ জন মুসলমান শহীদ হয়েছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন ৬ জন মোহাজের আর ৮ জন আনসার। যুদ্ধে কাফেরদের প্রভূত ক্ষতি হয়েছিলো। তাদের ৭০ জন নিহত এবং ৭০ জন বন্দী হয়েছিলো। এরা ছিলো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং গোত্রের সর্দার।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহতদের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তোমরা তো সবাই ছিলে নেতৃস্থানীয় লোক। তোমরা আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করোনি অথচ

অনেকেই আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। তোমরা আমাকে নিঃসঙ্গ সহায়হীন অবস্থায় ফেলেছিলে, অথচ অনেকে আমাকে সাহায্য করেছে। তোমরা আমাকে বের করে দিয়েছিলে, অথচ অনেকে আমাকে আশ্রয় দিয়েছে।' এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহতদের মৃতদেহ টেনে বদরের একটি কূয়োর ভেতর ছুঁড়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন।

হযরত আবু তালহা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে বদরের দিন কোরায়শদের ২৪ জন বড় বড় সর্দারের লাশ বদরের একটি নোংরা কূয়োয় নিক্ষেপ করা হয়। তখন নিয়ম ছিলো যে, কোন কওমের ওপর জয়ী হলে তিনদিন যুদ্ধক্ষেত্রে কাটানো হতো। বদরের মাঠে তিনদিন কাটানোর পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সওয়ারীর পিঠে আসন সাঁটা হলো। এরপর তিনি পদব্রজে চললেন, সাহাবারা তাঁকে অনুসরণ করলেন। হঠাৎ কূয়োর তীরে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। এরপর তিনি বিভিন্ন ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, 'হে অমুকের পুত্র অমুক, হে অমুকের পুত্র অমুক, তোমরা যদি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করতে, তবে সেটা কি তোমাদের জন্যে ভালো হতো না? আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাথে যে ওয়াদা করেছেন, আমরা তার সত্যতার প্রমাণ পেয়েছি, তোমরা কি তোমাদের প্রতিপালকের কৃত ওয়াদার সত্যতার প্রমাণ পেয়েছো?' হযরত ওমর (রা.) আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল, আপনি এমনসব দেহের সাথে কি কথা বলছেন, যাদের রূহ নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সেই সত্তার শপথ যার হাতে মোহাম্মদের প্রাণ আমি যা কিছু বলছি, তোমরা ওদের চেয়ে বেশী শুনতে পাও না। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তোমরা ওদের চেয়ে বেশী শ্রবণকারী নও। কিন্তু ওরা জবাব দিতে পারে না।[১১]

মক্কায় পরাজয়ের খবর

পরাজয়ের পর মক্কার মোশরেকরা বিশৃঙ্খল অবস্থায় ভীতবিহ্বল হয়ে মক্কার পথে পালালো। লজ্জায় তারা এমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে যে, বুঝতে পারছিলো না, কিভাবে মক্কায় প্রবেশ করবে।

ইবনে ইসহাক বলেন, সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি কোরায়শদের পরাজয়ের খবর নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করে, তার নাম ছিলো হায়ছুমান ইবনে আবদুল্লাহ খোযাঈ। লোকজন তাকে পেছনের খবর জিজ্ঞাসা করলো। তিনি বললেন, ওতবা ইবনে রবিয়া, শায়বা ইবনে রবিয়া, আবুল হাকাম ইবনে হিশাম, উমাইয়া ইবনে খালফ এবং আরো অমুক অমুক সর্দার নিহত হয়েছে। নিহতদের তালিকায় নেতৃস্থানীয় কোরায়শদের নাম শুনে কাবার হাতীমে উপবিষ্ট সফওয়ান ইবনে উমাইয়া বললেন, খোদার কসম, এই লোকটির যদি হুশ থেকে থাকে, তবে ওকে আমার কথা জিজ্ঞাসা করো। উপস্থিত লোকেরা হায়ছুমানকে বললো, সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার কি সংবাদ? তিনি বললেন, ঐ দেখো, তিনি কাবার হাতীমে বসে আছেন। খোদার কসম, তার বাপ এবং তার ভাইকে নিহত হতে আমি নিজে দেখেছি।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্রীতদাস আবু রাফে বর্ণনা করেন যে, সেই সময় আমি হযরত আব্বাসের ক্রীতদাস ছিলাম। আমাদের পরিবারে ইসলাম প্রবেশ করেছিলো। হযরত আব্বাস (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আমিও মুসলমান হয়েছিলাম। হযরত আব্বাস (রা.) তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রেখেছিলেন। আবু লাহাব বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের জয়ের খবর শুনে আবু লাহাব মুষড়ে পড়লো। আমরা নবতর শক্তি ও সম্মান অনুভব করলাম। আমি ছিলাম দুর্বল প্রকৃতির লোক। আমি তীর তৈরী করতাম। যমযম এর

---

[১১]. বোখারী, মুসলিম, মেশকাত, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৪৫

হুজরায় বসে তীরের ফলা সরু করতাম। সেই সময় আমি এক মনে তীর তৈরী করছিলাম। উম্মুল ফযল আমার কাছে বসেছিলেন। যুদ্ধজয়ের খবর পেয়ে আমরা বেশ আনন্দিত ছিলাম। এমন সময় আবু লাহাব পা টেনে টেনে অনেকটা খোঁড়ানোর ভঙ্গিতে এসে হুজরার কাছে বসলো। তার পিঠ ছিলো আমার পিঠের দিকে। এমন সময় আবু সুফিয়ান ইবনে হারব ইবনে আবদুল মোত্তালেব এসে পৌঁছুলো। আবু লাহাব তাকে বললো, আমার কাছে এসো, আমার জীবনের শপথ, তোমার কাছে খবর আছে। আবু সুফিয়ান আবু লাহাবের সামনে বসলো। বেশ কিছু লোক দাঁড়িয়ে রইলো। আবু লাহাব বললো, বলো ভাতিজা, লোকদের কি খবর? আবু সুফিয়ান বললো, কিছুই না। লোকদের সাথে আমাদের মোকাবেলা হলো, আমরা নিজেদের কাঁধ তাদের হাতে ছেড়ে দিলাম। তারা যেভাবে ইচ্ছা আমাদের হত্যা করছিলো, যেভাবে ইচ্ছা আমাদের বন্দী করছিলো। খোদার কসম, এসব সত্তেও আমি আমাদের লোকদের দোষ দেই না। প্রকৃতপক্ষে এমন সব লোকদের সাথে আমাদের মোকাবেলা হয়েছিলো, যারা আকাশ যমিনের মাঝামাঝি চিত্রল ঘোড়ায় সওয়ার ছিলো। খোদার কসম, তারা কোন কিছু ছাড়ছিলো না এবং কোন জিনিস তাদের মোকাবেলায় টিকতেও পারছিলো না।

আবু রাফে বলেন, আমি নিজ হাতে তাঁবুর কিনারা তুললাম। এরপর বললাম, খোদার কসম, তারা ছিলেন ফেরেশতা। একথা শুনে আবু লাহাব আমার মুখে সজোরে চড় দিলো। আমি তার সাথে লেগে গেলাম। সে আমাকে তুলে আছাড় দিলো। এরপর আমাকে প্রহার করতে লাগলো। আমি ছিলাম দুর্বল। ইতিমধ্যে উম্মুল ফযল উঠে তাঁবুর একট কঞ্চি দিয়ে আবু লাহাবকে প্রহার করতে লাগলেন। আবু লাহাব আঘাত পেলো। উম্মুল ফযল তাকে প্রহার করতে করতে বলছিলেন, ওর কোন মালিক নেই, এজন্যে ওকে দুর্বল মনে করছো? আবু লাহাব অপমানিত হয়ে উঠে চলে গেলো। এই ঘটনার মাত্র সাতদিন পর আবু লাহাব প্লেগে আক্রান্ত হয়ে সে রোগেই প্রাণ ত্যাগ করলো। প্লেগের গুটিকে আরবে খুব অপয়া মনে করা হতো। মৃত্যুর পর তিনদিন পর্যন্ত আবু লাহাবের লাশ পড়ে রইলো। তার সন্তানরাও কাছে গেলো না। কেউ তার দাফনের ব্যবস্থা করেনি। তার সন্তানরা তিনদিন পর ভেবে দেখলো যে, এভাবে লাশ ফেলে রাখলে অন্য লোকেরা তাদের নিন্দা সমালোচনা করবে। তখন তারা একটি গর্ত খুঁড়ে সেই গর্তে কাঠের মাধ্যমে ধাক্কা দিয়ে লাশ ফেলে দিলো। তারপর দূর থেকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে গর্তের মুখ বন্ধ করে দিলো।

মক্কায় বদর যুদ্ধের পরাজয়ের খবর পৌঁছার পরে কোরায়শদের মেজায খারাপ হয়ে গেলো। মৃতদের স্মরণে তারা কোন শোক প্রকাশমূলক কোনো অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করেনি। তারা ভেবেছিলো যে, এতে করে মুসলমানরা সমালোচনা করবে। আর মুসলমানদের কোন প্রকার সমালোচনার সুযোগ দিতে তারা রাযি নয়।

একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে। বদরের যুদ্ধে আসওয়াদ ইবনে আবদুল মোত্তালেবের তিন পুত্র নিহত হয়েছিলো। এ কারণে পুত্রদের স্মরণে সে কান্নাকাটি করতে চাচ্ছিলো। আসওয়াদ ছিলো অন্ধ। একরাতে সে একজন বিলাপকারিনী মহিলার কান্নার আওয়ায শুনলো। এই আওয়ায শুনে আসওয়াদ দ্রুত নিজের ক্রীতদাসকে সেই মহিলার কাছে খবর আনতে পাঠালো যে, শোক প্রকাশের অনুমতি পাওয়া গেছে কিনা জেনে এসো। কোরায়শরা কি তাদের নিহতদের স্মরণে কান্নাকাটি করছে? তাহলে আমি আমার তিন পুত্রের মধ্যে অন্তত আবু হাকিমার জন্যে একটু কাঁদতাম। কেননা আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে। ক্রীতদাস ফিরে এসে বললো, সে তার হারিয়ে যাওয়া উটের শোকে বিলাপ করছে। আসওয়াদ একথা শুনে আত্মসম্বরণ করতে পারলো না। নীচে উল্লিখিত কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলো।

সে মহিলা কাঁদছে হায় উট হারালো তাই, উটের শোকে তার বুঝি চোখে ঘুম নাই।
উটের জন্যে কাঁদিসনে যদিও তা হারিয়েছে, বদরের কথা ভেবে কাঁদ, ওরে কপাল পুড়েছে।

হাসীস, মাখযুম আর আবু ওলিদ ছিলো গোত্রের প্রাণ, আকীলের জন্যে হারেসের জন্যে ফেলো চোখের নীর

ওরা ছিলো ব্যাঘ্রের ব্যাঘ্র ওরা ছিলো বীর।

সবার নাম নিওনা তবু কাঁদো ওদের তরে, কেউ হাকিমা হায় আমি বোঝাই কেমন করে

আবু হাকিমার শোক কোনভাবেই সমকক্ষ তার, অজ্ঞাত লোক বদরের কারণে আজ হলো সর্দার।

মদীনায় বিজয়ের সুসংবাদ

মুসলমানদের বিজয় পরিপূর্ণ হওয়ার পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনাবাসীদের তাড়াতাড়ি সুসংবাদ দেয়ার জন্যে দূত পাঠালেন। মদীনা দু'টি এলাকায় খবর দেয়ার জন্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা এবং হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)-কে প্রেরণ করা হলো।

এর আগে ইহুদী এবং মোনোফেকরা মিথ্যা প্রোপাগান্ডা চালিয়ে মদীনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে রেখেছিলো। এমনকি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত হওয়ার খবর পর্যন্ত প্রচার করা হয়েছিলো। হযরত যায়েদ ইবনে হারেসাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাসাওয়া নামক উটনীর পিঠে সওয়ার হয়ে আসতে দেখে একজন মোনাফেক বলেই ফেলল যে, সত্যি সত্যি মোহাম্মদ নিহত হয়েছেন। ওই দেখো তার উটনী। আমরা এ উটনী চিনি। ওই দেখো যায়েদ ইবনে হারেস। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে এসেছে। এমন হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছে যে, কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। উভয় দূত পৌঁছার পর মুসলমানরা তাদের ঘিরে ধরে এবং বিস্তারিত বিবরণ শুনতে লাগলেন। সব শোনার পর বিজয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে মুসলমানরা আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। 'নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে মদীনার আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো। যে সকল মুসলমান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বদর প্রান্তরে যাননি তারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে বদরের পথে বেরিয়ে পড়লেন।

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন, হযরত ওসমান (রা.)-এর সহধর্মিনী নবী নন্দিনী হযরত রোকাইয়া (রা.)-কে দাফন করে যখন আমরা কবরের উপরের মাটি সমান করে দিচ্ছিলাম, সেই সময় আমাদের কাছে বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয়ের খবর এসে পৌঁছুলো। হযরত রোকাইয়া (রা.) অসুস্থ ছিলেন। তাঁর দেখাশোনার জন্যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ওসমান (রা.)-এর সঙ্গে আমাকেও মদীনায় রেখে গিয়েছিলেন।

গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) প্রসঙ্গ

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন দিন বদর প্রান্তরে অবস্থান করলেন। মদীনার পথে রওয়ানা হওয়ার আগেই গনীমতের মাল প্রসঙ্গে মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলো। এ বিষয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিলেন যে, যার কাছে যা কিছু আছে, সবই যেন তাঁর সামনে নিয়ে আসা হয়। সাহাবারা তাই করলেন। এরপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহীর মাধ্যমে এই সমস্যার মীমাংসা করে দিলেন।

হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা.) বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মদীনা থেকে বেরিয়ে বদরে পৌঁছুলাম। লোকদের সাথে যুদ্ধ হলো এবং আল্লাহ তায়ালা শত্রুদের পরাজিত করলেন। এরপর একদল লোক কাফেরদের ধাওয়া করতে লাগলেন, কাউকে গ্রেফতার এবং কাউকে হত্যা করছিলেন। একদল লোক গনীমতের মাল জমা করতে শুরু

করলেন, আর একদল লোক সর্বক্ষণ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ঘেরাও দিয়ে রাখছিলেন। তাঁরা ভাবছিলেন, শত্রুরা ধোকা দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোন প্রকার কষ্ট দিতে পারে। রাত্রিকালে গনীমতের মাল সংগ্রাহকরা বলাবলি করতে লাগলেন যে, আমি এই পরিমাণ সংগ্রহ করেছি, এগুলো সব আমার, আমি এর ভাগ অন্য কাউকে দেবো না। শত্রুদের ধাওয়াকারীরা বললেন, আমরা এই সব মালামাল থেকে শত্রুদের তাড়িয়ে দিয়েছি; কাজেই এসব আমাদের। যে সকল সাহাবী প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন তাঁরা বললেন, আমরা আশঙ্কা করছিলাম যে, শত্রুরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অমনোযোগী মনে করে কষ্ট না দেয়। এ কারণে আমরা তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কাজে নিয়োজিত ছিলাম। এ ধরনের মতবিরোধ দেখা দেয়ার প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন, 'লোকে আপনাকে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে।' বলুন, 'যুদ্ধলব্ধ সম্পদ আল্লাহ তায়ালা এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করো, যদি তোমরা মোমেন হও।' (সূরা আনফাল, আয়াত ১)

আল্লাহর রসূল এরপর সেই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেন।[১২]

মদীনার পথে মুসলিম বাহিনী

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনদিন বদর প্রান্তরে কাটানোর পর চতুর্থ দিন মদীনার পথে যাত্রা করেন। তাঁদের সঙ্গে মক্কার কোরায়শ বন্দীরাও ছিলো গনীমতের মালও ছিলো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কা'বকে এসবের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। ছাফরা প্রান্তর অতিক্রমের পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দারবে এবং নাজিয়ার মাঝামাঝি জায়গায় একটি টিলায় অবস্থান করেন। সেখানেই যুদ্ধলব্ধ সামগ্রীর এক পঞ্চমাংশ পৃথক করে রেখে বাকি সম্পদ মুসলমানদের মধ্যে সমভাবে বন্টন করে দেয়া হয়। ছাফরা প্রান্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নযর ইবনে হারেসকে হত্যার নির্দেশ দেন। বদরের যুদ্ধে এই লোকটি কোরায়শদের পতাকা বহন করছিলো এবং সে অপরাধীদের অন্যতম। ইসলামের শত্রুতায় অগ্রণী ভূমিকা পালনকারীদের অন্যতম ছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে হযরত আলী (রা.) নযর ইবনে হারেসকে হত্যা করেন।

এরপর তাঁরা উবকুজ জাবিয়া পৌঁছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে ওকবা ইবনে আবু মুঈতের হত্যার নির্দেশ দেন। সে ইসলামের শত্রুতায় অগ্রণী ছিলো, এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিতো। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। এই লোকটিই আল্লাহর রসূলের নামায আদায়রত অবস্থায় তাঁর কাঁধে উটের নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে দিয়েছিলো এবং গলায় চাদর জড়িয়ে আল্লাহর রসূলকে হত্যা করতে চেয়েছিলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) হঠাৎ উপস্থিত হয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই দুর্বৃত্তের কবল থেকে উদ্ধার করেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুর্বৃত্তকে হত্যার নির্দেশ দিলে সে বললো, ওহে মোহাম্মদ, সন্তানদের জন্যে কে আছে? তিনি বললেন, আগুন।[১৩]

পরে হযরত আসেম ইবনে ছাবেত আনসারী (রা.) অথবা হযরত আলী (রা.) ওকবার শিরশ্ছেদ করেন।

---

[১২]. মোসনাদে আহমদ, ৫ম খন্ড, পৃ. ৩২৩, ৩২৪, হাকেম ২য় খন্ড, পৃ. ৩২৬

[১৩]. সুনানে আবু দাউদ, সরহে আওনুল মাবুদ, ৩য় খন্ড পৃ. ১২

যুদ্ধের দৃষ্টিকোণ থেকে এই দুই দুর্বৃত্তকে হত্যা করা ছিলো জরুরী। কেননা এরা শুধু ছিলো যুদ্ধাপরাধী।

অভ্যর্থনাকারী প্রতিনিধিদল

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রওয়াহা নামক জায়গায় পৌঁছুলে অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে আসা মুসলমানদের সাথে তার সাক্ষাৎ হলো। এরা দূতদের মুখে মুসলমানদের বিজয় সংবাদ শুনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অভিনন্দন এবং অভ্যর্থনা জানাতে মদীনা থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা মোবারকবাদ জানালে হযরত সালমা ইবনে সালমা (রা.) বলেন, আপনারা আমাদের কিসের মোবারকবাদ জানাতে এসেছেন, আমাদের তো মোকাবেলা হয়েছে মাথা নুয়ে পড়া বৃদ্ধদের সাথে যারা ছিলো উটের মতো। একথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে বললেন, ভাতিজা, এসব লোকইতো ছিলো কওমের নেতা।

এরপর উসায়েদ ইবনে খোযায়ের (রা.) আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আপনাকে কামিয়াবী দান করেছেন এবং আপনার চক্ষু শীতল করেছেন। আল্লাহর শপথ, আমি জানতাম না যে, শত্রুদের সাথে আপনার মোকাবেলা হবে, আমি তো মনে করেছিলাম, আপনি একটি কাফেলার সন্ধানে বেরিয়েছেন। যদি জানতাম যে, শত্রুদের সাথে মোকাবেলা হবে, তবে কিছুতেই পেছনে থাকতাম না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি সত্য বলেছো।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলেন। শহরের আশে পাশের সকল শত্রুরা প্রভাবিত হয়ে পড়লো। মুসলমানদের জয়লাভের প্রেক্ষিতে মদীনায় বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করলো। সেই সময়ই আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার সঙ্গীরাও লোক দেখানো ইসলাম গ্রহণ করলো।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আসার একদিন পর যুদ্ধবন্দীরা এসে পৌঁছুলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে সাহাবাদেরকে ভালো ব্যবহার করার উপদেশ দিলেন। এই উপদেশের ফলে সাহাবায়ে কেরাম নিজেরা খেজুর খেয়ে থাকতেন, কিন্তু কয়েদীদের রুটি খেতে দিতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মদীনায় খেজুরের চেয়ে রুটির মূল্য ও গুরুত্ব ছিলো অধিক।

যুদ্ধবন্দী প্রসঙ্গ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় পৌঁছার পর সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে অবশিষ্ট যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রসূল, ওরাতো চাচাতো ভাই এবং আমাদের আত্মীয়স্বজন। আমার মতে আপনি ওদের কাছ থেকে ফিদিয়া অর্থাৎ মুক্তিপণ নিয়ে ওদের ছেড়ে দিন। এতে করে যা কিছু নেয়া হবে, সেসব কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের শক্তি হিসাবে কাজে আসবে। এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের হেদায়াত দেবেন এবং তারা আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের মতামত জানতে চাইলেন। তিনি বললেম, আমি হযরত আবু বকরের মতের ভিন্ন মত পোষণ করি। আমি মনে করি যে, আপনি আমার আত্মীয় অমুককে আমার হাতে তুলে দিন, আমি তার শিরশ্ছেদ করবো। একইভাবে আকীল ইবনে আবু তালেবকে হযরত আলীর হাতে তুলে দিন, আলী তার শিরশ্ছেদ করবেন। একইভাবে হামযার ভাই অমুককে হামযার হাতে তুলে দিন, হামযা তার শিরশ্ছেদ করবেন। এতে আল্লাহ তায়ালা বুঝতে পারবেন যে, কাফেরদের জন্যে আমাদের মনে সমবেদনা নেই। এ সকল যুদ্ধবন্দী হচ্ছে কাফেরদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ।

হযরত ওমর (রা.) বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়ের কথা শোনার পর হযরত আবু বকরের পরামর্শ গ্রহণ করেন, আমার পরামর্শ গ্রহণ করেননি। ফলে কয়েদীদের কাছ থেকে ফিদিয়া গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। পরদিন খুব সকালে আমি আল্লাহর রসূলের কাছে গিয়ে দেখি, তিনি এবং হযরত আবু বকর উভয়ে কাঁদছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, আপনারা কেন কাঁদছেন, আমাকে বলুন। যদি কান্নার কারণ ঘটে থাকে, তবে আমিও কাঁদবো। যদি কারণ না ঘটে, তবে আপনাদের কান্নার কারণে আমিও কাঁদবো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ফিদিয়া দেয়ার শর্ত গ্রহণ করার কারণে তোমার সঙ্গীদের ওপর যে জিনিস পেশ করা হয়েছে, সেই কারণে কাঁদছি। একথা বলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিকটবর্তী একটি গাছের প্রতি ইশারা করে বললেন, আমার কাছে ওদের আযাব এই গাছের চেয়ে নিকটতর করে পেশ করা হয়েছে।[১৪] আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেছেন, দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন নবীর জন্যে সঙ্গত নয়। 'তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ তায়ালা চান পরকালের কল্যাণ। আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। আল্লাহর পূর্ব বিধান না থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছো, সে জন্যে তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত হতো।' (সূরা আনফাল, আয়াত ৭৬-৬৮)

আল্লাহ তায়ালা উপরোক্ত আয়াতে পূর্ব বিধানের যে উল্লেখ করেছেন, সেটা হচ্ছে সূরা মোহাম্মদের চতুর্থ আয়াতের একটি নির্দেশ। তাতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'অতপর হয় অনুকম্পা না হয় মুক্তিপণ।'

এই আয়াতে যুদ্ধবন্দীদের কাছ থেকে ফিদিয়া নেয়ার অনুমতি থাকায় বন্দীদের ব্যাপারে ফিদিয়ার সিদ্ধান্ত দেয়ায় সাহাবায়ে কেরামকে আযাব দেয়া হয়নি, বরং ধমক দেয়া হয়েছে। ধমকও আবার এ কারণে দেয়া হয়েছে যে, তারা কাফেরদের ভালোভাবে নিশ্চিহ্ন না করেই বন্দী করেছে। এ কারণেও ধমক দেয়া হয়েছে যে তারা এমন সব কাফের থেকে ফিদিয়া বা মুক্তিপণ নেয়ার ব্যবস্থা করেছেন, যারা শুধু যুদ্ধবন্দীই ছিলো না বরং গুরুতর অপরাধীও ছিলো। আধুনিক আইনও তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের না করে ছাড়ে না। এ ধরনের অপরাধীদের ব্যাপারে দায়েরকৃত মামলার শাস্তি হয়তো মৃত্যুদন্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদন্ড।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর মতামত অনুযায়ী যেহেতু সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে, এ কারণে মোশরেকদের কাছ থেকে ফিদিয়া নেয়া হয়েছে। ফিদিয়ার পরিমাণ ছিলো এক হাজার দিরহাম তিন হাজার এবং চার হাজার দিরহাম পর্যন্ত। মক্কাবাসীরা লেখাপড়া জানতো। পক্ষান্তরে মদীনাবাসীরা পড়ালেখার সাথে তেমনি পরিচিত ছিলো না। এ কারণে এরূপ সিদ্ধান্তও রাখা হয়েছিলো যে, যাদের মুক্তিপণ প্রদানের সামর্থ নেই, তারা মদীনায় দশটি করে শিশুকে লেখাপড়া শেখাবে। শিশুরা ভালোভাবে লেখাপড়া শিক্ষা করলে শিক্ষক কয়েদীদের জন্যে সেটাই হবে মুক্তিপণ।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন বন্দীকে বিশেষ দয়া করায় তাদের কাছ থেকে ফিদিয়া গ্রহণ করা হয়নি, এমনিতেই মুক্তি দেয়া হয়। এরা ছিলো মোত্তালেব ইবনে হানতাব, সাঈফি ইবনে আবু রেফায়া এবং আবু আযযা জুমাহী। শেষোক্ত ব্যক্তিকে ওহুদের যুদ্ধে পুনরায় কয়েদ এবং পরে হত্যা করা হয়। এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পরে আছে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জামাতা আবুল আসকে এই শর্তের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি নবী নন্দিনী হযরত যয়নব (রা.)-এর পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না।

---

[১৪] তারীখে ওমর ইবনে খাত্তাব, ইবনে জওযি, পৃ. ৩৬

এর কারণ ছিলো যে, হযরত যয়নব আবুল আস এর ফিদিয়া হিসাবে কিছু সম্পদ পাঠিয়েছিলেন। এর মধ্যে একটি হারও ছিলো। হারটির মালিকানা ছিলো প্রকৃতপক্ষে হযরত খাদিজা (রা.)-এর। হযরত যয়নব (রা.)-কে আবুল আস-এর ঘরে পাঠানোর বিদায়কালীন সময়ে তিনি আপন কন্যাকে উপহার স্বরূপ সেটি দিয়েছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা দেখামাত্র তাঁর দুইচোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে, আবেগে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। তিনি আবুল আসকে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে সাহাবাদের মতামত চান। সাহাবারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই প্রস্তাব সশ্রদ্ধভাবে অনুমোদন করেন। অতপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জামাতা আবুল আসকে এই শর্তে ছেড়ে দেন যে, আস হযরত যয়নব (রা.)-কে মুক্তি দেবেন। মুক্তি পেয়ে যয়নব (রা.) হিজরত করে মদীনায় চলে আসেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা এবং অন্য একজন আনসারী সাহাবীকে মক্কায় প্রেরণ করেন। তাদের বলা হয় যে, তোমরা মক্কার উপকণ্ঠ অথবা জায নামক জায়গায় থাকবে। হযরত যয়নব (রা.) তোমাদের কাছে দিয়ে যখন যেতে থাকবেন, তখন তাকে সঙ্গে নিয়ে আসবে। এই দুইজন সাহাবী মক্কায় গিয়ে হযরত যয়নব (রা.)-কে মদীনায় নিয়ে আসেন। হযরত যয়নব (রা.)-এর হিজরতের ঘটনা অনেক দীর্ঘ এবং মর্মস্পর্শী।

যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে সোহায়েল ইবনে আমরও ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতিমান বক্তা। হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রসূল, সোহায়েল ইবনে আমরের সামনের দু'টি দাঁত ভেঙ্গে ফেলার ব্যবস্থা করুন, এতে তার কথা মুখে জড়িয়ে যাবে। এতে সে সুবক্তা হিসাবে আপনার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে সুবিধা করতে পারবে না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন। কেননা মানুষের অঙ্গহানি করা ইসলামী পরিভাষায় 'মোছলা' করার শামিল। কেয়ামতের কঠিন দিনে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে।

হযরত সা'দ ইবনে নো'মান (রা.) ওমরাহ পালনের জন্যে বেরিয়েছিলেন। এ সময় আবু সুফিয়ান তাকে গ্রেফতার করে। আবু সুফিয়ানের পুত্র আমর যুদ্ধবন্দী ছিলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমরকে আবু সুফিয়ানের হাতে ন্যস্ত করায় বিনিময়ে তিনি হযরত সা'দকে মুক্তি দিলেন।

পবিত্র কোরআনের পর্যালোচনা

আল্লাহ তায়ালা বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা আনফাল নাযিল করেন। প্রকৃতপক্ষে, এটি হচ্ছে বদরের যুদ্ধ সম্পর্কে আল্লাহর পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন। দুনিয়ার অন্যান্য বাদশাহ, সেনানায়ক বা অন্য যে কারো মূল্যায়নের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। আল্লাহর পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা যাচ্ছে।[১৫]

আল্লাহ রব্বুল আলামীন সর্বপ্রথম মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতা এবং চারিত্রিক দুর্বলতার প্রতি আলোকপাত করেন। এই সংকীর্ণতা ও দুর্বলতা তাদের মধ্যে ছিলো, যা যুদ্ধশেষে অনেকটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে আলোকপাত করেন এজন্যে যে, মুসলমানদের তা থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এতে করে তারা ঈমানের পূর্ণতা লাভে সক্ষম হবে।

অতপর এই যুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য এবং গায়েবী সাহায্য সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেন। এর উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, মুসলমানরা যেন নিজেদের বীরত্ব ও বাহাদুরির ধোকায় না পড়ে। কেননা এর ফলে তাদের মনে অহংকার দেখা দেবে কিন্তু আল্লাহ তায়ালা চান যে, মুসলমানদের মধ্যে

---

[১৫]. সাইয়েদ কুতুব শহীদ রচিত তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনে [সূরা আনফাল খন্ডে] এ ব্যাপারে কিছু মূল্যবান আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালার ওপর নির্ভরতা এবং রসূলের প্রতি আনুগত্যের গুণই যেন দেখা দেয়।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে নিয়ে এ ভয়াবহ ও রক্তাক্ত অভিযানের পথে পা রেখেছিলেন, এরপর সে বিষয়ে অপরিহার্য চারিত্রিক গুণাবলী ও বৈশিষ্টের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অতপর মোশরেক, মোনাফেক, ইহুদী ও যুদ্ধবন্দীদের উদ্দেশ্যে এমন উচ্চাঙ্গের উপদেশ দেয়া হয়েছে যাতে করে, তারা সত্যের সামনে মাথা নত করে সত্যের অনুসারীতেই পরিণত হয়।

এরপর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে মৌলিক নীতিমালা ব্যাখ্যা করা হয়।

যুদ্ধ ও সন্ধির বিধানও এখানে ব্যাখ্যা করা হয়। ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে এর অপরিহার্যতা ও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই ব্যাখ্যা ও নীতিমালা এ কারণেই দেয়া হয়েছে যাতে, মুসলমানরা ইসলাম পূর্ব যুদ্ধ এবং ইসলাম পরবর্তীকালের যুদ্ধের পার্থক্য করতে পারে।এছাড়া নৈতিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে যেন তারা উচ্চতর মর্যাদা লাভেও সক্ষম হয়। বিশ্ববাসী যেন এর মাধ্যমে জানতে পারে যে, ইসলাম শুধু একটি আদর্শ মাত্র নয়, বরং ইসলাম যে নীতিমালা ও বিধি বিধানের দাওয়াত দেয়, সেই অনুযায়ী অনুসারীদের বাস্তব প্রশিক্ষণও দিয়ে থাকে।

এরপর ইসলামী রাষ্ট্রের নীতিমালা সম্পর্কে কয়েকটি ধারার উল্লেখ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ মুসলমান এবং এর বাইরের সীমারেখার মুসলমানদের মধ্যকার পার্থক্য বোঝা যায়।

আরো ঘটনা

দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে রোযা এবং সদকাতুল ফেতের ফরয করা হয়। যাকাতের পরিমাণ অর্থাৎ নেছাবও এই সময়ে নির্ধারণ করা হয়। মোহাজেরদের মধ্যে কিছুসংখ্যক ছিলেন খুবই গরীব। তাদের রুটি রুজির সমস্যা ছিলো প্রকট। পেটের ক্ষুধা নিবারণের জন্যে বিভিন্ন স্থানে ছুটোছুটি করা তাদের জন্যে ছিলো কষ্টকর। সদকায়ে ফেতের এবং যাকাত সম্পর্কিত বিধান তাদেরকে অন্ন-বস্ত্রের কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়।

মুসলমানরা প্রথমবারের মতো ঈদ উদযাপন করেছিলো দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে। বদরের যুদ্ধের সুস্পষ্ট বিজয়ের পর এই ঈদ উদযাপিত হয়েছিলো। মুসলমানদের মাথায় বিজয় ও সম্মানের মুকুট রাখার পর আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাদেরকে এই ঈদ উদযাপনের সুযোগ দেন। ঈদ মুসলমানদের জন্যে অসামান্য সম্মান ও সৌভাগ্য বয়ে এনেছিলো। সেই ঈদের নামায আদায়ের দৃশ্য ছিলো খুবই মনোমুগ্ধকর। আল্লাহর হামদ, তাকবীর, তাসবীহ ও তাওহীদের ঘোষণা উচ্চস্বরে করতে করতে মুসলমানরা ময়দানে বেরিয়ে আসেন। সেই সময় মুসলমানদের মন আল্লাহর দেয়া নেয়ামত এবং সাহায্যের কারণে পরিপূর্ণ ছিলো।

তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি আরো বেশী পরিমাণে লাভ করার জন্যে আগ্রহী ছিলেন। তাদের মাথা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে ছিলো অবনত। আল্লাহ রব্বুল আলামীন পবিত্র কোরআনের এই আয়াতে সেই নেয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'স্মরণ করো, যখন তোমরা ছিলে স্বল্পসংখ্যক। পৃথিবীতে তোমরা দুর্বলরূপে পরিগণিত হতে, তোমরা আশঙ্কা করতে যে, লোকেরা তোমাদের আকস্মিকভাবে ধরে নিয়ে যাবে। অতপর তিনি তোমাদের আশ্রয় দেন, স্বীয় সাহায্য দ্বারা তোমাদের শক্তিশালী করেন এবং তোমাদের উত্তম বস্তুসমূহ জীবিকারূপে দান করেন যাতে, তোমরা কৃতজ্ঞ হও।' (সূরা আনফাল, আয়াত ২৬)

বদর যুদ্ধের পরবর্তী সামরিক তৎপরতা

বদরের যুদ্ধ ছিলো মুসলমান এবং মোশরেকদের মধ্যে প্রথম সশস্ত্র এবং সিদ্ধান্তমূলক সংঘর্ষ। এতে মুসলমানরা 'ফতহে মুবিন' অর্থাৎ সুস্পষ্ট বিজয় লাভ করেন। সমগ্র আরব জাহান এই বিজয় প্রত্যক্ষ করেছে। এই যুদ্ধের ফলাফলে ওরাই মানসিক কষ্টে জর্জরিত ছিলো, যারা এই যুদ্ধের পরাজয়ের কারণে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরা ছিলো মোশরেক। এছাড়া অন্য একটি দল ছিলো, যারা মুসলমানদের বিজয় এবং উচ্চমর্যাদা অর্জনকে তাদের ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অস্তিত্বের জন্যে আশঙ্কার বিষয় বলে মনে করতো। এরা ছিলো ইহুদী। মুসলমানরা বদরের যুদ্ধে জয়লাভ করলে এই দু'দল অর্থাৎ মোশরেক ও ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রোধে আক্রোশে ফেটে পড়ছিলো। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'অবশ্য মোমেনদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইহুদী ও মোশরেকদেরই তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখবে।' (সূরা মায়েদা, আয়াত ৮২)

কিন্তু মদীনার কিছু লোক এই উভয় দলের হিতাকাঙ্খী ছিলো। তাই তারা যখন লক্ষ্য করলো যে, নিজেদের সম্মান বজায় রাখার অন্য কোন পথ খোলা নেই, তখন তারা লোক দেখানো ইসলামে প্রবেশ করলো। এরা ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তাঁর বন্ধু-বান্ধব। এরা মুসলমানদের প্রতি ইহুদী ও মোশরেকদের চেয়ে কম ক্রোধান্বিত ছিলো না।

এরা ছাড়া চতুর্থ একটি দলও ছিলো। তারা হলো আরব বেদুইন, তারা মদীনার আশে পাশে বসবাস করতো। ইসলাম বা কুফুরী কোনটির প্রতি তাদের মনের কোন টান ছিলো না। এরা ছিলো লুটেরা ও ডাকাত। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের সাফল্যে এরাও মনে কষ্ট পেয়েছিলো। তারা আশঙ্কা করছিলো যে, মদীনায় একটি শক্তিশালী সরকার কায়েম হলে তাদের লুটতরাজের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এ কারণে তাদের মনেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা জেগে উঠলো এবং হয়ে পড়লো মুসলমানদের দুশমন।

এভাবে করে মুসলমানরা চৌতুর্মুখী সমস্যার মুখোমুখি হয়ে পড়লো। তবে মুসলমানদের ব্যাপারে এই চারটি দলের প্রত্যেকেরই কর্মপদ্ধতি ছিলো পৃথক। প্রত্যেকে নিজেদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পূরণের ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করছিলো। তারা ভাবছিলো যে, এতেই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে।

মদীনায় একদল শত্রু ইসলামের ছদ্মবেশ ধারণ করলো। মুখে ইসলামের কথা বললেও আড়ালে অন্তরালে তারা ষড়যন্ত্র, কুটিলতা এবং পারস্পরিক ঝগড়া ফাসাদ সৃষ্টির পথ অবলম্বন করলো। ইহুদীদের একটি দল ইসলামের প্রতি তাদের শত্রুতা ও ক্রোধ খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করলো। এদিকে মক্কাবাসীরা কোমর ভাঙ্গা মারের প্রতিশোধ গ্রহণের হুমকি দিতে লাগলো। তারা খোলাখুলি প্রতিশোধ গ্রহণের হুমকির পাশাপাশি যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করলো। তারা যেন মুসলমানদের বলছিলো, 'পেতে হবে এমন দিন, যেই দিন হবে সমুজ্জল, শুনতে পাবো বিলাপধ্বনি দেখবো চোখের জল।'

এক বছর পরে মক্কার কোরায়শরা যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলো।

ইসলামের ইতিহাসে এই অভিযান ওহুদের যুদ্ধ নামে খ্যাত। এই যুদ্ধ মুসলমানদের খ্যাতি ও গৌরবের ওপর কিছু বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

এ সকল আশঙ্কার মোকাবেলায় মুসলমানরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এগুলোর দ্বারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্ব, যোগ্যতা ও বৈশিষ্টের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া একথাও বোঝা যায় যে, মদীনার নেতৃত্ব চারিদিকের বিপদ সম্পর্কে সদা জাগ্রত ও সতর্ক ছিলো। এমনকি শত্রুদের মোকাবেলায় একাধিক পরিকল্পনাও করা হয়েছিলো। এখানে আমরা সংক্ষেপে সে বিষয়ে আলোচনা করবো।

এক. বনু সালিমের সাথে যুদ্ধ

বদরের যুদ্ধের পর মদীনার তথ্য বিভাগ সর্বপ্রথম খবর পায় যে, গাতফান গোত্রের শাখা বনু সুলাইমের লোকেরা মদীনায় হামলা করতে সৈন্য সংগ্রহ করছে। এই খবর পাওয়ার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুইশত মোজাহেদ সমেত আকস্মিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন এবং তাদের মনযিল কুদার নামক জায়গায় গিয়ে পৌঁছান।[১]

বনু সুলাইম গোত্র এ ধরনের আকস্মিক হামলার জন্যে প্রস্তুত ছিলো না। তারা হতবুদ্ধি হয়ে পলায়ন করলো। যাওয়ার সময় পাঁচশত উট রেখে গেলো। মুসলমানরা সেইসব উট অধিকার করে নিলো। রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই উটের চার পঞ্চমাংশ ভাগ করে দিলেন। প্রত্যেকে দু'টি করে উট পেলেন। এই অভিযানে ইয়াসার নামে একজন ক্রীতদাসও মুসলমানদের হাতে আসে। একে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি বনু সালিমদের এলাকায় তিনদিন অবস্থানের পর মদীনায় ফিরে আসেন।

দ্বিতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে বদর যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার মাত্র ৭ দিন পর এই ঘটনা ঘটে। এই অভিযানের সময় সাবা ইবনে আরফাতা, মতান্তরে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-কে মদীনায় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়।

দুই) রসূল (স.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র

আল্লাহর রসূলকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে একবার ব্যর্থ এবং পরবর্তী কালে বদরের যুদ্ধেও পরাজিত হয়ে মোশরেকরা ক্রোধে আগুন হয়ে উঠেছিলো। সমগ্র মক্কা আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিলো। অবশেষে দুই নরাধম যুবক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, সকল প্রেরণার উৎস রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই শেষ করে দেবে।

বদরের যুদ্ধের কয়েকদিন পরের কথা। ওমায়ের ইবনে ওয়াহাব জুমহি নামে এক কোরায়শ দুষ্কৃতকারী ছিলো। এই দুর্বৃত্ত মক্কায় আল্লাহর রসূলকে নানাভাবে কষ্ট দিতো। তার পুত্র ওয়াহাব ইবনে ওমায়ের বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিলো। এই ওমায়ের একদিন কাবার হাতীমে বসে সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার সাথে আলাপ করছিলো। বদরের যুদ্ধে নিহতদের লাশ বদরের একটি নোংরা কূয়োয় নিক্ষেপ করার দুঃখজনক ঘটনা সম্পর্কে তারা আলোচনা করছিলো। সফওয়ান বললো, খোদার কসম, ওদের অনুপস্থিতিতে বেঁচে থাকার মধ্যে কোন স্বাদ নেই। জবাবে ওমায়ের বললো, খোদার কসম, তুমি সত্য কথাই বলেছো। দেখো, আমি যদি ঋণগ্রস্ত না হতাম এবং আমার পরিবার পরিজনের চিন্তা না থাকতো, তাহলে আমি মদীনায় গিয়ে মোহাম্মদকে শেষ করে দিতাম। কিন্তু ঋণ পরিশোধেরও সামর্থ নেই, পরিবার পরিজনও আমার অবর্তমানে

---

১. প্রকৃতপক্ষে কুদার হলো ধূসর রঙের একটি পাখী। কিন্তু এখানে বনু সালিম গোত্রের একটি আবাসস্থল বোঝানো হয়েছে। মক্কা থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে মহাসড়কে এটি অবস্থিত।

বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। আর অজুহাত রয়েছে একটা। আমার সন্তান ওদের হাতে বন্দী।

সফওয়ান সব কথা শুনে মনে মনে ভাবলো, চমৎকার সুযোগ। ওমায়েরকে বললো, শোনো, তোমার ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব আমার, তোমার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করবো। আর তোমার পরিবারকে আমি নিজের পরিবারের মতো দেখবো, আজীবন তাদের দেখাশোনা আমি করবো, আমার কাছে কোন জিনিস থাকা অবস্থায় তারা পাবে না— এমন কখনো হবে না।

ওমায়ের বললো, ঠিক আছে। তবে আমাদের একথা যেন গোপন থাকে। সফওয়ান বললো, হাঁ, গোপনই থাকবে।

এরপর ওমায়ের তার তরবারি ধারালো করে তাতে বিষ মেশালো। মদীনার দিকে রওয়ানা হয়ে এক সময় সে মদীনায় পৌঁছালো। মসজিদে নববীর সামনে সে তার উট বসাচ্ছিলো, এমন সময় হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের দৃষ্টি তার ওপর পড়লো। তিনি মুসলমানদের সমাবেশে বদরের যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত সম্মান সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। ওমায়েরকে দেখা মাত্র তিনি বললেন, এই নরাধম আল্লাহর দুশমন, নিশ্চয়ই তুমি কোন খারাপ উদ্দেশ্যে এসেছো।

হযরত ওমর (রা.) এরপর আল্লাহর রসূলের সামনে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহর দুশমন ওমায়ের তরবারি ঝুলিয়ে এসেছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওকে আমার কাছে নিয়ে এসো। ওমায়ের এলে হযরত ওমর (রা.) তার তলোয়ার তারই গলার কাছে চেপে ধরলেন। কয়েকজন আনসারকে বললেন, তোমরা আল্লাহর রসূলের কাছে ভেতরে যাও, সেখানে বসে থাকো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে এই খবিসের তৎপরতা সম্পর্কে সজাগ থাকবে। কেননা একে বিশ্বাস করা যায় না। এরপর হযরত ওমর (রা.) ওমায়েরকে মসজিদের ভেতরে নিয়ে যান। হযরত ওমর (রা.) ওমাইরকে যেভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন সেদিকে লক্ষ্য করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওকে ছেড়ে দাও ওমর। ওমায়েরকে বললেন, তুমি কাছে এসো। ওমায়ের আল্লাহর রসূলের কাছে এসে বললো, আপনাদের সকাল শুভ হোক। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে এমন এক সম্বোধন শিক্ষা দিয়েছেন, যা তোমাদের কথা থেকে উত্তম। এটি হচ্ছে আস্‌সালামু আলাইকুম। এটি বেহেশতীদের সম্বোধন।

এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে ওমায়ের তুমি কেন এসেছ? সে বললো, আপনাদের কাছে যে বন্দী রয়েছে সে ব্যাপারে এসেছি। আপনারা আমার বন্দীর ব্যাপারে অনুগ্রহ করুন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে তোমার গলায় তরবারি কেন? সে বললো, আল্লাহ এই তরবারির নিপাত করুন। এটি কি আর আমাদের কোন কাজে আসবে?

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সত্যি করে বলো যে কেন এসেছ? সে বললো, বললাম তো, যুদ্ধবন্দী সম্পর্কে আলোচনার জন্যে এসেছি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না তা নয়। তুমি এবং সফওয়ান কাবার হাতীমে বসেছিলে এবং নিহত কোরায়শদের লাশ কূয়ায় ফেলার প্রসঙ্গে আফসোস করছিলে। এরপর তুমি বলেছিলে, আমি যদি ঋণগ্রস্ত না হতাম এবং আমার যদি পরিবার পরিজন না থাকতো, তবে আমি এখান থেকে যেতাম এবং মোহাম্মদকে হত্যা করতাম। একথা শোনার পর সফওয়ান তোমার ঋণ এবং পরিবার পরিজনের দায়িত্ব নিয়েছে। তবে শর্ত হচ্ছে যে, তুমি মোহাম্মদকে হত্যা করবে। কিন্তু মনে রেখো, আল্লাহ তায়ালা আমার এবং তোমাদের মধ্যে অন্তরায় হয়ে আছেন।

ওমায়ের বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রসূল। হে আল্লাহর রসূল, আপনি আমাদের কাছে আকাশের যে খবর নিয়ে আসতেন এবং আপনার ওপর যে ওহী নাযিল হতো,

সেসব আমরা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু এটাতো এমন ব্যাপার যে, আমি এবং সফওয়ান ছাড়া সেখানে অন্য কেউ উপস্থিত ছিলো না। কাজেই আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলছি যে, এই খবর আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ আপনাকে জানাননি। সেই আল্লাহর জন্যে সকল প্রশংসা যিনি আমাকে ইসলামের হেদায়াত দিয়েছেন এবং এই জায়গা পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে এসেছেন। একথা বলে ওমায়ের কালেমা তাইয়েবার সাক্ষ্য দিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের ভাইকে দ্বীন শেখাও, কোরআন পড়াও এবং তার বন্দীকে মুক্ত করে দাও।[২]

এদিকে সফওয়ান মক্কায় বলে বেড়াচ্ছিলো যে, সুখবর শোনো কয়েকদিনের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটবে, যাতে আমরা বদরের দুঃখ কষ্ট ভুলে যাবো। সফওয়ান মদীনা থেকে আসা লোকদের কাছে প্রত্যাশিত খবর জানতে চাচ্ছিলো। অবশেষে একজনের কাছে খবর পেলো যে, ওমায়ের ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গেছে। এ খবর শুনে সফওয়ান কসম খেয়ে বললো যে, ওমায়েরের সাথে কখনো কথা বলবে না এবং তার কোন উপকার করবে না। এদিকে ইসলাম গ্রহণের পর ওমায়ের মক্কায় এসে পৌঁছুলো এবং ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলো। তার আহ্বানে বহু লোক ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিলো।[৩]

তিন) বনু কাইনুকার যুদ্ধ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় আসার পর ইহুদীদের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন, তার শর্তসমূহ ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপ্রাণ চেষ্টা করে মনে মনে আশা করছিলেন যে, চুক্তির ধারাসমূহ বাস্তবায়িত হোক। এ কারণে মুসলমানদের তরফ থেকে চুক্তি লংঘিত হতে পারে, এ ধরনের সামান্যতম কোন পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়নি। কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে বিশ্বাসঘাতক ও খেয়ানতকারী ইহুদীরা খুব শীঘ্রই তাদের পুরনো ঐতিহ্যের দিকে এগিয়ে গেলো। তারা মুসলমানদের মধ্যে ষড়যন্ত্র বিস্তার, যুদ্ধের উস্কানি সৃষ্টি, দাঙ্গাহাঙ্গামা সৃষ্টি এবং বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর কাজে কোন প্রকার কার্পণ্য করেনি। এখানে একটি উদাহরণ উল্লেখ করা হচ্ছে।

ইহুদীদের বিশ্বাসঘাতকতা

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, শাশা ইবনে কায়েস নামে একজন ইহুদী ছিলো। এ লোকটি এতো বৃদ্ধ ছিলো যে, দেখে মনে হতো যে, এক পা তার কবরে চলে গেছে। মুসলমানদের প্রতি তার শত্রুতা ও ঘৃণা ছিলো সীমাহীন। একবার সে আওস এবং খাযরাজ গোত্রের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলো। সেখানে উভয় গোত্রের লোক বসে কথা বলছিলো। উভয়ের মধ্যে আগের মতো শত্রুতা নেই। বরং কি চমৎকার মিল মহব্বত দেখা যাচ্ছে। এ অবস্থা দেখে বৃদ্ধ ইহুদীর মনে খুবই কষ্ট হলো। সে বলতে লাগলো, বাহরে বাহ, এখানে তো দেখছি বনু কাইলা পরিবারের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ সমবেত হয়েছে। এই অভিজাতদের একত্রিত হওয়ার পর আমরা তো অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছি। বৃদ্ধ ইহুদীর সঙ্গে একজন যুবক ছিলো। যুবকটিকে সে বললো, ওদের কাছে বলো, বুআস যুদ্ধের কথা এবং তারও আগের কিছু ঘটনা আলোচনা করো এবং যুদ্ধের বিষয়ে উভয় পক্ষে যেসব কবিতা আবৃত্তি করা হয়েছিলো, সে সব কবিতা কিছু কিছু ওদের শোনাও। সে ইহুদী তা-ই করলো। এরূপ করার ফলে আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদের মধ্যে আস্তে আস্তে কথা কাটাকাটি হতে লাগলো। উপস্থিত মুসলমানরা ঝগড়া শুরু করে একে অন্যের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব যাহির

---

২. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৬৬০

৩. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৬৬১, ৬৬২, ৬৬৩

করতে লাগলেন। উভয় গোত্রের একজন করে প্রতিনিধি হাঁটু গেড়ে বসে নিজের গোত্রীয় সাফল্য সম্পর্কে বড় বড় কথা বলতে লাগলেন। একজন বললেন, যদি চাও, তবে আমরা সেই যুদ্ধ এখনো তাজা করে দিতে পারি। অর্থাৎ ইতিপূর্বে সংঘটিত যুদ্ধের জন্যে আমরা প্রস্তুত রয়েছি। একথা শুনে উভয় পক্ষ ক্ষেপে গেলো। বললো, চলো আমরা প্রস্তুত। হাবরা নামক জায়গায় যুদ্ধ হবে, চলো। অস্ত্র লও, অস্ত্র লও। উভয় পক্ষের মুসলমানরা অস্ত্র নিয়ে হাবরা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হতে যাবে, এমন সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে খবর পৌঁছুলো। তিনি দ্রুত মোহাজের সাহাবাদের সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বললেন, হে মুসলমানরা, হায়, হায় আল্লাহ! আমার জীবদ্দশায়ই তোমরা জাহেলিয়াতে ফিরে যাচ্ছ? ইসলাম গ্রহণের পরও তোমাদের এই কাজ? ইসলামের মাধ্যমে তোমরা জাহেলিয়াতের রুসম-রেওয়ায থেকে মুক্ত হয়েছো, কুফুরী থেকে মুক্তি লাভ করেছো, তোমাদের অন্তর পরস্পরের জন্যে সম্প্রীতিতে পূর্ণ হয়েছে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা শুনে আনসার সাহাবারা বুঝতে পারলেন যে, তারা শয়তানের ধোঁকায় পড়েছেন। দুশমনের প্ররোচনার শিকার হয়েছেন। এসব ভেবে তারা কাঁদতে শুরু করলেন। আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকেরা একে অন্যের গলা জড়িয়ে ধরলেন। এরপর আল্লাহর রসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে এমনভাবে ঘরে ফিরলেন যে, আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের দুশমন ইহুদী শাশা ইবনে কায়েসের ষড়যন্ত্রের আগুন নিভিয়ে দিয়েছেন।[৪]

মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টির জন্যে ইহুদীদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ও অপচেষ্টার এটি একটি উদাহরণ। ইসলামের দাওয়াতের পথে ইহুদীদের বাধা সৃষ্টির পরিচয় এই ঘটনা থেকেই পাওয়া যায়। এ উদ্দেশ্যে ইহুদীরা নানা ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলো। তারা মিথ্যা প্রোপাগান্ডা করতো। সকালে মুসলমান হয়ে বিকেলে পুনরায় কাফের হয়ে যেতো। এটা এরা এজন্যেই করতো যে, এর ফলে দুর্বল চিত্তের মানুষদের মনে ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারবে। কারো সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক থাকলে সে যদি মুসলমান হতো, তাহলে টাকা-পয়সা দেয়া বন্ধ করে দিতো। আর টাকা পাওনা থাকলে সকাল-বিকাল তাগাদা দিয়ে তাকে অতিষ্ঠ করে তুলতো। সেই নয়া মুসলমান পাওনাদার হলে তার পাওনা আদায় করতো না বরং অন্যায়ভাবে সে টাকা আত্মসাৎ করতো। এরপরও যদি সেই মুসলমান টাকা চাইতেন, তখন কুচক্রী ইহুদী বলতো যে, তোমার পাওনা তো আমার ওপর ততোদিন পরিশোধের দায়িত্ব ছিলো যতোদিন তুমি পূর্ব পুরুষদের ধর্ম বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলে। তুমি তোমার ধর্ম বিশ্বাস পরিবর্তন করেছো, কাজেই এখন তোমার এবং আমার মধ্যে কোন রকম সম্পর্ক থাকতে পারে না, থাকার কোন কারণও নেই।[৫]

প্রকাশ থাকে যে, ইহুদীরা এ ধরনের কর্মকান্ড বদরের যুদ্ধের আগেই শুরু করে দিয়েছিলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি লংঘন করেই তারা এসব করছিলো। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম ইহুদীদের হেদায়াত পাওয়ার আশায় সব কিছু নীরবে সয়ে যাচ্ছিলেন। আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ বজায় রাখার আকাঙ্খাও তাদের মনে বিদ্যমান ছিলো।

---

৪. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫৫, ৫৫৬

৫. তাফসীরকারকরা সূরা আলে ইমরানসহ বিভিন্ন সূরার তাফসীরে ইহুদীদের এ ধরনের ঘৃণ্য তৎপরতার ঘটনা উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে সাইয়েদ কুতুব শহীদের তাফসীর ফী যিলালিল কোরআনে এ বর্ণনা খুবই চিত্তাকর্ষক।

বনু কাইনুকার অঙ্গীকার ভঙ্গ

ইহুদীরা যখন লক্ষ্য করলো যে, বদরের প্রান্তরে আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুসলমানদের বিরাট সাহায্য করেছেন এবং তাদের মর্যাদা ও প্রভাব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, তখন তারা ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুতা শুরু করলো। প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে বিশ্বাসঘাতকতা শুরু করলো এবং মুসলমানদের কষ্ট দেয়ার জন্যে উঠে পড়ে লাগলো।

এদের মধ্যে সবচেয়ে হিংসুটে এবং দুর্বৃত্ত ছিলো কা'ব ইবনে আশরাফ। তার সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে। তিনটি ইহুদী গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ ছিলো বনু কাইনুকা। এরা মদীনার ভেতরে থাকতো এবং তাদের মহল্লা তাদের নামেই পরিচিত ছিলো। এরা পেশায় ছিলো কর্মকার, স্বর্ণকার এবং থালাবাটি নির্মাতা। এ কারণে এদের কাছে সব সময় প্রচুর সমর সরঞ্জাম বিদ্যমান থাকতো। যুদ্ধ করার মতো বলদর্পী লোকের সংখ্যা তাদের মধ্যে ছিলো সাতশত। তারা ছিলো মদীনায় সবচেয়ে বাহাদুর ইহুদী গোত্র। এরাই সর্বপ্রথম মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করে। ঘটনার বিবরণ এই,

আল্লাহ রব্বুল আলামীন যখন বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের সফলতা দান করলেন তখন ইহুদীদের শত্রুতার মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। তারা তাদের দুর্বৃত্তপনা, ঘৃণ্য কার্যকলাপ এবং উস্কানিমূলক কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখে। মুসলমানরা বাজারে গেলে তারা তাদের প্রতি উপহাসমূলক মন্তব্য করতো এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ চালাতো সব সময়। এমনি করে মুসলমানদের মানসিকভাবে কষ্ট দিতো। তাদের ঔদ্ধত্য এমন সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো যে, তারা মুসলিম মহিলাদেরও উত্যক্ত করতো।

ক্রমে অবস্থা নাজুক হয়ে উঠলো। ইহুদীদের ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতা সীমা ছাড়িয়ে গেলো। এ সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীদের সমবেত করে একদিন ওয়ায নসিহত করে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। এছাড়া তাদের নিপীড়নমূলক কাজের মন্দ পরিণাম সম্পর্কেও সতর্ক করে দিলেন। কিন্তু এতে তাদের হীন ও ঘৃণ্য কার্যকলাপ আরো বেড়ে গেলো।

আবু দাউদ প্রমুখ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের দিনে কোরায়শদের পরাজিত করেন। এরপর মদীনায় ফিরে এসে বনু কাইনুকার বাজারে ইহুদীদের এক সমাবেশ আহ্বান করেন। এই সমাবেশে তিনি বলেন, হে ইহুদী সম্প্রদায়, কোরায়শদের ওপর যে রকম আঘাত পড়েছে, সে রকম আঘাত তোমাদের ওপর আসার আগেই তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। তারা বললো, হে মোহাম্মদ, তুমি আমাদের ব্যাপারে ভুল ধারণা করেছো। কোরায়শ গোত্রের আনাড়ি ও অনভিজ্ঞ লোকদের সাথে তোমাদের মোকাবেলা হয়েছে। এতেই তোমরা ধরাকে সরা জ্ঞান করেছো। তোমরা ওদের মেরেছো, সেটা পেরেছো ওরা আনাড়ি বলেই। আমাদের সাথে যদি তোমাদের যুদ্ধ হয়, তবে তোমরা বুঝতে পারবে যে, পুরুষ কাকে বলে। আমরা হচ্ছি বাহাদুর। তোমরা তো আমাদের কবলে পড়োনি। তাই আমাদের ব্যাপারে ভুল ধারণা করে বসে আছ। তাদের এ উক্তির জবাবে আল্লাহ রব্বুল আলামীন এই আয়াত নাযিল করেন।

'যারা কুফুরী করে, তাদের বলো, তোমরা শীঘ্রই পরাভূত হবে এবং তোমাদেরকে জাহান্নামে একত্র করা হবে। আর সেটা কতোই না নিকৃষ্ট আবাসস্থল। দু'টি দলের পরস্পর সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে। একদল আল্লাহর পথে সংগ্রাম করছিলো আর অন্য দল ছিলো কাফের। ওরা তাদেরকে চোখের দেখায় দ্বিগুণ দেখছিলো। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজ সাহায্য

দ্বারা শক্তিশালী করেন। নিশ্চয় এতে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্যে শিক্ষা রয়েছে।'[৬] (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১২-১৩)

মোটকথা, বনু কাইনুকা যে জবাব দিয়েছিলো তার অর্থ হচ্ছে সুস্পষ্ট যুদ্ধ ঘোষণা। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রোধ সম্বরণ এবং ধৈর্য ধারণ করেন। মুসলমানরাও ধৈর্য ধারণ করে ভবিষ্যতের অপেক্ষায় থাকেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীদের ইসলামের দাওয়াত প্রদান এবং তাদের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করার পর তাদের ঔদ্ধত্য আরো বেড়ে যায়। কয়েকদিন পরেই মদীনায় তারা সন্ত্রাসমূলক তৎপরতা শুরু করে। এর ফলে তারা নিজেরাই নিজেদের কবর খনন করে নেয়। জীবনের সকল পথ নিজেদের জন্যে বন্ধ করে ফেলে।

ইবনে হিশাম আবু আওন থেকে বর্ণনা করেছেন যে, একজন আরব মহিলা কাইনুকার বাজারে দুধ বিক্রি করতে আসে। দুধ বিক্রির পর সেই মহিলা কি এক প্রয়োজনে এক ইহুদী স্বর্ণকারের দোকানে বসে। ইহুদী তার চেহারা অনাবৃত করতে বলে কিন্তু মহিলা রাযি হননি। এতে স্বর্ণকার চুপিসারে সেই মহিলার কাপড়ের একাংশ তার পিঠের সাথে গিঁট বেঁধে দেয়। মহিলা কিছুই বুঝতে পারেননি। মহিলা উঠে দাঁড়ানোর সাথে সাথে তার লজ্জাস্থান অনাবৃত হয়ে গেলো। এতে ইহুদীরা খিল খিল করে হেসে উঠলো। মহিলা এভাবে অপমানিত হয়ে চিৎকার ও কান্নাকাটি শুরু করলেন। তার কান্না শুনে একজন মুসলমান কারণ জানতে চাইলেন। সব শুনে ক্রোধে অস্থির হয়ে তিনি সেই ইহুদীর ওপর হামলা করে তাকে মেরে ফেললেন। ইহুদীরা যখন দেখলো যে, তাদের একজন লোককে মেরে ফেলা হয়েছে এবং মেরেছে তাদের শত্রু মুসলমান, তখন তারা সম্মিলিত হামলা চালিয়ে সেই মুসলমানকেও মেরে ফেললো। নিহত মুসলমানের পরিবারবর্গ চিৎকার কান্নাকাটি শুরু করে ইহুদীদের বিরুদ্ধে সকল মুসলমানদের কাছে অভিযোগ করলেন। এর ফলে মুসলমান এবং বনু কাইনুকা গোত্রের ইহুদীদের মধ্যে যুদ্ধের সাজ সাজ রব পড়ে গেলো।[৭]

অবরোধ, আত্মসমর্পণ ও বহিষ্কার

এই ঘটনার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেলো। তিনি মদীনার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আবু লোবাবা ইবনে আবদুল মানযারকে অর্পণ করলেন। হযরত হামযা ইবনে আবদুল মোত্তালেবের হাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের পবিত্র হাতে মুসলমানদের পতাকা তুলে দিয়ে একদল মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে বনু কাইনুকা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। ইহুদীরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে দুর্গের প্রধান ফটক বন্ধ করে দিলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুর্গের চারিদিক অবরোধ করে রাখলেন। সেদিন ছিলো জুমার দিন। দোসরা হিজরীর শওয়াল মাসের ১৫ তারিখ। পনের দিন পর্যন্ত অর্থাৎ জিলকদ মাসের প্রথম দিন পর্যন্ত ১৫ দিন অবরোধ অব্যাহত রাখা হলো। এরপর আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদের মনে মুসলমানদের প্রভাব বসিয়ে দিলেন। আল্লাহর নিয়ম এই যে, তিনি কোন কওমকে পরাজিত করতে চাইলে তাদের মনে প্রতিপক্ষের প্রভাব বসিয়ে দেন। বনু কাইনুকা গোত্র এই শর্তে আত্মসমর্পণ করলো যে, তারা আল্লাহর রসূলের সিদ্ধান্ত মেনে নেবে। তাদের জানমাল, মহিলা ও শিশুদের ব্যাপারে আল্লাহর রসূলের দেয়া ফয়সালাই হবে চূড়ান্ত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে এরপর ইহুদীদের বেঁধে ফেলা হলো।

---

[৬]. সুনানে আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, পৃ. ১১২, ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৫২

[৭]. ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ৪৭, ৪৮

মাত্র একমাস আগে ইসলামের ছদ্মবেশ ধারণকারী মোনাফেক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এ সময় ইহুদী প্রীতির নযীর স্থাপন করলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কপট অনুনয়ে সে ইহুদীদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলো। সে বললো, হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমার মিত্রদের ব্যাপারে অনুগ্রহ করুন। উল্লেখ্য, বনু কাইনুকা ছিলো খাযরাজ গোত্রের মিত্র। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সিদ্ধান্ত তখনো দেননি। মোনাফেক নেতা তার কথার পুনরাবৃত্তি করলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। দুর্বৃত্ত মোনাফেক তখন আল্লাহর রসূলের জামার আস্তিনে হাত দিলো। তিনি এতে বিরক্ত হলেন, বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও। তিনি এত ক্রুদ্ধ হলেন যে, তার চেহারায় ক্রোধের ঝলক ফুটে উঠলো। তিনি বললেন, তোমার জন্যে আমার আফসোস হচ্ছে, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। কিন্তু মোনাফেক তার অনুরোধ অব্যাহত রাখলো। সে বললো, আপনি আমার মিত্রদের ব্যাপারে অনুগ্রহ ঘোষণা না করা পর্যন্ত আপনাকে ছাড়ব না। চারশত খালি দেহের যুবক এবং তিনশত বর্ম পরিহিত যুবক, যারা আমাকে নানা বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে, আপনি তাদেরকে এক সকালেই মেরে ফেলবেন? আল্লাহর কসম, সময়ের আবর্তনের ভয়ে আমি অত্যন্ত ভীত।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশেষে দৃশ্যত আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর কথা রাখলেন। তিনি ইহুদীদের প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা করলেন। তবে নির্দেশ দিলেন যে, তারা মদীনা বা মদীনার আশেপাশে থাকতে পারবে না। ইহুদীরা তখন যতোটা জিনিস সঙ্গে নেয়া সম্ভব ততোটা নিয়ে সিরিয়ার দিকে চলে গেলো। সেখানে কিছুদিনের মধ্যে বহু ইহুদী মৃত্যু বরণ করলো।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীদের পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করলেন। এর মধ্যে তিনটি কামান, দু'টি বর্ম, তিনটি তলোয়ার এবং তিনটি বর্শা নিজের জন্যে রাখলেন। অবশিষ্ট ধন-সম্পদ থেকে এক পঞ্চমাংশ বের করে নিলেন। গণিমতের মাল সংগ্রহের দায়িত্ব মোহাম্মদ ইবনে মাসলামার ওপর ন্যস্ত করা হয়।[৮]

চার) ছাভিকের যুদ্ধ

একদিকে সফওয়ান ইবনে উমাইয়া ইহুদী এবং মোনাফেকরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো। অন্যদিকে আবু সুফিয়ানও তার চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছিলো। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সে এমন কিছু করতে চাচ্ছিলো যাতে নিজ কওমের ইযযত আবরু রক্ষা হতে পারে এবং নিজেদের শক্তির প্রকাশ ঘটানো যায়। আবু সুফিয়ান এ মর্মে প্রতিজ্ঞা করেছিলো যে, মোহাম্মদের সাথে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত সে ফরয গোসল করবে না। এই প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্যে আবু সুফিয়ান দুইশত সওয়ারী নিয়ে রওয়ানা হয়ে কানাত প্রান্তরে অবস্থিত নাইব নামক পাহাড়ের পাদদেশে তাঁবু স্থাপন করলো। মদীনা থেকে এর দূরত্ব বারো মাইল। আবু সুফিয়ান মদীনায় সরাসরি হামলার সাহস করলো না। তবে সে এমন একটা কাজ করলো, যাকে খোলাখুলি ডাকাতি রাহাজানি বলে অবিহিত করা যায়।

ঘটনার বিবরণ এই যে, রাতের অন্ধকারে আবু সুফিয়ান মদীনার উপকণ্ঠে এসে হুয়াই ইবনে আখতারের কাছে গিয়ে তাকে দরজা খোলার অনুরোধ জানায়। হুয়াই পরিণাম আশঙ্কায় দরজা খুলতে অস্বীকার করে। আবু সুফিয়ান তখন বনু নাযিরের অন্য একজন সর্দার সালাম ইবনে মাশকামের কাছে গমন করে। এ লোকটি ছিলো বনু নাযির গোত্রের কোষাধ্যক্ষ। আবু সুফিয়ান ভেতরে যাওয়ার অনুমতি চায়। সালাম ইবনে মাশকাম ভেতরে আসা অনুমতি প্রদান করে এবং আতিথেয়তা করে। আহার করায়, মদ পরিবেশন করে এবং মদীনার বিশদ পরিস্থিতি সম্পর্কে

---

৮. যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ৭১, ৯১ ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড পৃ. ৪৭, ৪৮, ৪৯

অবহিত করে। আবু সুফিয়ান এরপর দ্রুত তার সঙ্গীদের কাছে যায় এবং একদল সশস্ত্র লোক পাঠিয়ে মদীনার উপকণ্ঠে আরিয নামক জায়গায় হামলা করায়। কোরায়শ গোত্রের এই দুর্বৃত্তরা সেখানে কয়েকটি খেজুর গাছ কেটে ফেলে এবং কয়েকটি গাছে আগুন ধরিয়েও দেয়। এরপর একজন আনসারী এবং তার মিত্রকে ফসলের ক্ষেতে পেয়ে হত্যা করে উর্ধশ্বাসে মক্কামুখে পালিয়ে যায়।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর পাওয়ার পর আবু সুফিয়ান এবং তার সঙ্গীদের দ্রুত ধাওয়া করেন। কিন্তু দুর্বৃত্তরা এর চেয়ে দ্রুত মক্কার পথে উর্ধশ্বাসে ছুটে পালিয়ে যায়। তারা বোঝা হালকা করার জন্যে বহু জিনিস পথে ফেলে রেখে যায়। এসব জিনিস মুসলমানদের হস্তগত হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গীরা আবু সুফিয়ানকে কারকারাতুল কুদার পর্যন্ত ধাওয়া করে ফিরে আসেন। মুসলমানরা ফেলে যাওয়া ছাতুসহ বিভিন্ন জিনিস তুলে নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। এ অভিযানের নামকরণ করা হয় ছাভিকের যুদ্ধ। আরবী ভাষায় ছাভিক মানে ছাতু। বদরের যুদ্ধের মাত্র দুই মাস পরে দ্বিতীয় হিজরীর জিলহজ্জ মাসে এই ঘটনা ঘটে। এই অভিযানের সময় মদীনার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব আবু লোবাবা ইবনে আবদুল মানযারের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিলো।[৯]

পাঁচ) যি-আমরের যুদ্ধ

বদরের যুদ্ধের পর এই অভিযান ছিলো সবচেয়ে বড় সামরিক অভিযান। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন। তৃতীয় হিজরীর মহররম মাসে এই অভিযান পরিচালিত হয়েছিলো। এর কারণ, মদীনার তথ্য বিভাগ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানায় যে, বনু ছালাবা এবং মোহারেব গোত্রের এক বিরাট দল মদীনায় হামলা করতে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। এ খবর পাওয়ার পরপরই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দিলেন। সওয়ারী এবং পায়ে হেটে লোকজনসহ সাড়ে চারশত মোজাহেদ সমন্বয়ে এক অভিযান পরিচালিত হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই সময় হযরত ওসমান (রা.)-কে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন।

পথে মোজাহেদরা বনু ছালাম গোত্রের জাব্বার নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে আল্লাহর রসূলের সামনে হাযির করেন। লোকটিকে তিনি ইসলামের দাওয়াত দেন। সে ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর লোকটি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাদের শত্রু এলাকা পর্যন্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

এদিকে শত্রুরা মুসলমানদের সামরিক অভিযানের খবর পেয়ে আশেপাশের পাহাড়ী এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অগ্রাভিযান অব্যাহত রাখেন এবং মোজাহেদদের নিয়ে শত্রুদের অবস্থান স্থল পর্যন্ত গিয়ে পৌছেন। সেখানে একটি জায়গা ছিলো, এই জায়গা 'যি-আমর' নামে পরিচিত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে বেদুইনদের ওপর প্রভাব বিস্তার এবং মুসলমানদের শক্তি সম্পর্কে তাদের ধারণা দেয়ার জন্যে তৃতীয় হিজরীর সফর মাসের পরেও কিছু দিন সেখানে অতিবাহিত করে পরে মদীনায় ফিরে আসেন।[১০]

---

৯. যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ৯০, ৯১, ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ৪৪, ৪৫

১০. ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ৪৬, যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ৯১। বলা হয়ে থাকে যে, গাওয়াছ মাহারেবী নামে এক ব্যক্তি এই অভিয়ানের সময় আল্লাহর রসূলকে হত্যার চেষ্টা চালায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই অভিযানের সময় নয়, অন্য আভিযানের সময় এই চেষ্টা করা হয়েছিলো। দেখুন বোখারী ২য় খন্ড পৃ. ৫৯৩

ছয়) কা'ব ইবনে আশরাফের পরিণাম

ইহুদীদের মধ্যে এই লোকটি মুসলমানদের প্রচন্ড ঘৃণা করতো। মুসলমানদের প্রতি তার শত্রুতা এবং মুসলমানদের কাজকর্মে তার মনে যন্ত্রণা হতো সব সময়। এই লোকটি আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দিতো এবং তাঁর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধের দাওয়াত দিয়ে বেড়াতো।

তাঈ গোত্রের বনু নাবহান শাখার সাথে তার সম্পর্ক ছিলো। তার মায়ের গোত্রের নাম ছিলো বনু নাযির। এই লোকটি ছিলো ধনী এবং প্রভাবশালী। আরবে তার দৈহিক সৌন্দর্যেরও সুনাম ছিলো। বিখ্যাত কবি হিসাবেও তার পরিচিতি ছিলো। এই লোকটির দুর্গ ছিলো মদীনার দক্ষিণাংশে বনু নাযিরের গোত্রের জনপদের পেছনে।

বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় এবং কোরায়শ নেতাদের হত্যাকান্ডের খবর শোনার সাথে সাথে সে বলে উঠেছিলো, আসলেই কি এ রকম ঘটেছে? ওরা ছিলো আরবদের মধ্যে অভিজাত এবং লোকদের বাদশাহ। মোহাম্মদ যদি ওদের মেরেই থাকে, তাহলে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ এর উপরিভাগ থেকে উত্তম হবে। অর্থাৎ বেঁচে থাকার চেয়ে আমাদের মরে যাওয়াই উত্তম।

নিশ্চিতভাবে মুসলমানদের বিজয়ের খবর পাওয়ার পর আল্লাহর শত্রু কা'ব ইবনে আশরাফ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানদের কুৎসা এবং ইসলামের শত্রুদের প্রশংসা শুরু করলো। এতেও তৃপ্ত হতে না পেরে সে মক্কায় কোরায়শদের কাছে পৌঁছে এবং মোত্তালেব ইবনে আবু অদাআ সাহমীর মেহমান হয়ে পৌত্তলিকদের মনে উত্তেজনার আগুন প্রজ্বলিত করার চেষ্টা করলো। আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধে কোরায়শদের যুদ্ধে প্ররোচিত করতে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করলো। নিহত কোরায়শদের প্রশংসামূলক কবিতা আবৃত্তি করলো। মক্কায় কা'ব এর অবস্থানকালে আবু সুফিয়ান তাকে জিজ্ঞাসা করলো যে, তোমার কাছে আমাদের মধ্যেকার কোন্ দ্বীন অধিক পছন্দীয়? এই উভয় দলের মধ্যে কারা হেদায়াত প্রাপ্ত? কা'ব ইবনে আশরাফ বললো, তোমরা মুসলমানদের চেয়ে অধিক হেদায়াতপ্রাপ্ত এবং উত্তম। আল্লাহ তায়ালা এই সময় এই আয়াত নাযিল করেন।

'তুমি কি তাদের দেখোনি, যাদেরকে কেতাবের এক অংশ দেয়া হয়েছিলো তারা 'জিব্‌ত' এবং 'তাগুতে'র উপর ঈমান রাখে। তারা কাফেরদের সম্পর্কে বলে যে, এদেরই পথ মোমেনদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর।' (সূরা নেসা, আয়াত ৫১)

কা'ব ইবনে আশরাফ মক্কায় এসব কাজ করার পর মদীনায় ফিরে আসে। মদীনায় এসে সাহাবায়ে কেরামদের স্ত্রীদের সম্পর্কে ঘৃণ্য ধরনের কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করে। এছাড়া যা মুখে আসছিলো, তাই বলছিলো এমনি করে সে মুসলমানদের কষ্ট দিচ্ছিলো।

এমতাবস্থায় অতিষ্ঠ হয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা বললেন, কা'ব ইবনে আশরাফের সাথে বোঝাপড়ার মতো কে আছো? এই লোকটি আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূলকে কষ্ট দিয়েছে।

আল্লাহর রসূলের এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে মোহাম্মদ ইবনে মোহম্মদ ইবনে মাযলামা, ওব্বাদ ইবনে বশর, আবু নায়েলা ওরফে সালকান ইবনে সালামা, হারেস ইবনে আওস, আবু আব্বাস ইবনে জাবার (রা.) উঠে দাঁড়ালেন। আবু নায়েলা ওরফে সালকান ইবনে সালামা (রা.) ছিলেন কা'ব ইবনে আশরাফের দুধভাই। মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা এই দলের নেতা মনোনীত হলেন।

কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যাকান্ড সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনার মূল কথা এই যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বললেন, রসূলকে সে কষ্ট দিয়েছে। কা'ব ইবনে আশরাফের সাথে কে বোঝাপড়া করতে পারবে? এই লোকটি আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর আহ্বান শোনার সাথে সাথে মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা উঠে দাঁড়িয়ে আরয করলেন, আমি হাযির রয়েছি, হে আল্লাহর রসূল।

আপনি কি চান যে, আমি তাকে হত্যা করি? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, তবে আপনি আমাকে কিছু কথা বলার অনুমতি দিন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ বলতে পারো।

পরে মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) কা'ব ইবনে আশরাফকে গিয়ে বললেন, ওই লোকটি আমাদের কাছে সদকা চায়। প্রকৃতপক্ষে এই চাওয়া আমাদেরকে কষ্টে ফেলে দিয়েছে।

কা'ব বললো, আল্লাহর শপথ, তোমরা আরো অতিষ্ঠ হবে।

মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) বললেন, আমরা তার অনুসরণ যখন করেই ফেলেছি, এমতাবস্থায় তাকে পরিত্যাগ করা সমীচীন মনে হয় না। এই অনুসরণের পরিণাম কি, সেটা দেখা আবশ্যক। সে যাই হোক, আমি আপনার কাছে এক দুই ওয়াসক খাদ্যদ্রব্য ধার চাই।

কা'ব বললো, আমার কাছে কিছু জিনিস বন্ধক রাখো।

মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) বললেন, আপনি কি জিনিস পছন্দ করবেন? কা'ব বললো, তোমার নারীদের আমার কাছে বন্ধক রাখো।

মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) বললেন, সেটা কি করে সম্ভব, আপনি হলেন আরবের সবচেয়ে সুদর্শন পুরুষ।

কা'ব বললো, তবে তোমার কন্যাদের বন্ধক রাখো।

মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রা.) বললেন, সেটাই বা কি করে সম্ভব? এটা তো আমার জন্যে লজ্জার কারণ হবে। লোক বলাবলি করবে যে, অমুকে সামান্য কিছু খাদ্যের জন্যে নিজ কন্যাদের অমুকের কাছে বন্ধক রেখেছে। তবে হাঁ, আপনার কাছে আমি আমার অস্ত্র বন্ধক রাখতে পারি।

এরপর উভয়ের মধ্যে কথা হলো যে, মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা তার অস্ত্র নিয়ে কা'ব ইবনে আশরাফের কাছে আসবেন।

আবু নায়েলাও একই ধরনের কাজ করলেন। তিনি ছিলেন কা'ব এর দুধভাই। তিনি কা'ব এর কাছে এসে কিছুক্ষণ কবিতা নিয়ে আলোচনা করলেন। কিছু কবিতা শুনলেন কিছু শোনালেন। এরপর বললেন, ভাই একটা প্রয়োজনে আপনার কাছে এসেছিলাম। প্রয়োজনের কথা আপনাকে বলতে চাই, তবে বিষয়টি গোপনীয়। আপনাকে বলার পর আপনি সে কথা গোপন রাখবেন।

কা'ব বললো, হাঁ, তাই করবো।

আবু নায়েলা আল্লাহর রসূলের প্রতি ইঙ্গিত করে বললো এই লোকটির আগমন আমাদের জন্যে পরীক্ষা হয়ে দেখা দিয়েছে। সমগ্র আরব আমাদের শত্রু হয়ে পড়েছে। আমাদের সব পথ বন্ধ হয়ে গেছে। পরিবার-পরিজন ধ্বংস হতে চলেছে। জীবন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। ছেলে-মেয়েরা দারুণ দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। আবু নায়েলা এরপর মোহাম্মদ ইবনে মাসলমার কণ্ঠস্বরের মতোই কিছু কথা বললেন। কথা বলার সময় আবু নায়েলা একথাও বললেন, যে, আমার কিছু বন্ধু রয়েছে, তারাও আমার মতো ধারণাই পোষণ করে। ওদেরকেও আমি আপনার কাছে নিয়ে আসতে চাই। আপনি ওদের কাছেও কিছু জিনিস বিক্রি করে ওদের প্রতি দয়া করুন।

মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা এবং আবু নায়েলা কথার মাধ্যমে লক্ষ্যপথে সফলভাবে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কেননা এরূপ আলোচনার পর কা'ব এর বাড়ীতে তাদের অস্ত্রসহ আসার কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

প্রাথমিক উদ্যোগ গ্রহণের পর তৃতীয় হিজরীর ১৪ই রবিউল আউয়াল চাঁদনী রাতে এই ছোট দল আল্লাহর রসূলের সামনে অভিন্ন উদ্দেশ্যে হাযির হলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাকিঈ গারকাদ পর্যন্ত তাদের সঙ্গ দিলেন। এরপর বললেন, যাও, বিসমিল্লাহ! হে আল্লা- তায়ালা, ওদের সাহায্য করুন। রসূল এরপর গৃহে ফিরে এসে নামায ও মোনাজাতে মশগুল

হলেন।

এদিকে সাহাবারা বাড়ীর সামনে যাওয়ার পর আবু নায়েলা উচ্চস্বরে কা'বকে ডাক দিলেন। আওয়ায শুনে কা'ব উঠে দাঁড়ালে তার নব পরিণীতা স্ত্রী বললো, এতো রাতে কোথায় যাচ্ছো? আমি এমন আওয়ায শুনছি যে, আওয়ায থেকে যেন রক্ত ঝরে পড়ছে।

কা'ব বললো, ওরাতো আমার ভাই মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা এবং দুধভাই আবু নায়েলা। সম্ভ্রান্ত লোককে যদি বর্শার আঘাতের দিকেও ডাকা হয়, তবুও তারা সেই ডাকে সাড়া দেয়।

এরপর কা'ব বাইরে এলো। তার মাথা থেকে সুবাস ভেসে আসছিলো।

আবু নায়েলা তার সঙ্গীদের বলছিলেন, সে যখন আসবে আমি তখন তার মাথার চুল ধরে শুঁকতে শুরু করবো। তোমরা যখন দেখবে যে, আমি তার মাথা ধরে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছি, তোমরা তখন তার ওপর হামলা করে মেরে ফেলবে। কা'ব আসার পর কিছুক্ষণ বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা হলো। এরপর আবু নায়েলা (রা.) বললেন, কা'ব চলো না একটু আজুজ ঘাঁটি পর্যন্ত যাই। আজ রাত কথা বলেই কাটাতে চাই। কা'ব বললো, তোমরা যদি চাও, তবে চলো। এ কথার পর সবাই চললো। আবু নায়েলা (রা.) বললেন, আজকের মতো এমন মন মাতানো সুবাসতো কখনো শুঁকিনি। একথা শুনে কা'বের মন অহংকারে ভরে উঠলো। সে বললো, আমার কাছে আরবের সবচেয়ে সুবাসিনী অধিক সুগন্ধ ব্যবহারকারী মহিলা আছে। সে বললো, হাঁ, হাঁ, অবশ্যই। আবু নায়েলা কা'ব এর মাথার চুলে হাত দিয়ে তার চুলে ঘ্রাণ নিলেন এবং সঙ্গীদেরও সে চুলের ঘ্রাণ শুঁকতে দিলেন। খানিকক্ষণ পরে আবু নায়েলা (রা.) বললেন, আর একবার শুঁকতে চাই ভাই। কা'ব নিশ্চিতভাবে বললো, হাঁ হাঁ। আবু নায়েলা পুনরায় কা'ব এর মাথার চুলের ঘ্রাণ নিলেন। কা'ব তখন বেশ প্রফুল্ল এবং পুরোপুরি নিশ্চিন্ত।

আরো কিছুপথ হাঁটার পর আবু নায়েলা পুনরায় কা'ব ইবনে আশরাফের মাথার চুলের ঘ্রাণ নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। কা'ব বললো ঠিক আছে। একথা বলে খানিকটা ঝুঁকে পড়লে আবু নায়েলা কা'ব এর মাথা নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে সঙ্গীদের বললেন, এবার নিয়ে নাও আল্লাহর এই দুশমনকে। সাথে সাথে তার ওপর তরবারির আঘাত করা হলো। কিন্তু কোন কাজ হলো না। এ অবস্থা দেখে মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা সক্রিয় হলেন এবং অস্ত্র তুলে এমন আঘাত করলেন যে, আল্লাহর দুশমন সেখানেই শেষ হয়। তার ওপর হামলা করার পর সে এমন জোরে চিৎকার করলো যে, আশে পাশে হৈচৈ পড়ে গেলো। সকল বাড়ীতে আলো জ্বালিয়ে সবাই উৎকণ্ঠিত হলো। কিন্তু এতে কিছুই হলো না।

কা'ব ইবনে আশরাফের ওপর হামলার সময়ে হযরত হারেস ইবনে আওস (রা.)-এর দেহে একজন সঙ্গীর তরবারির সামান্য আঘাত অসতর্কভাবে লেগে যায়। এতে তিনি আহত হন। তাঁর দেহ থেকে রক্ত ঝরছিলো। ফেরার পথে হোররা আরিজ নামক জায়গায় পৌঁছার পর তারা লক্ষ্য করলেন, হারেস সঙ্গে নেই। তাঁরা তখন সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর হারেস এসে পৌঁছুলেন। হারেসকে সঙ্গে নিয়ে তারা বাকিঈ গারকাদ নামক জায়গায় পৌঁছুলেন এবং জোরে শোরে তকবির ধ্বনি দিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও সেই তবকির ধ্বনি শুনতে পেলেন। এতে তিনি বুঝতে পারলেন যে, অভিযান সফল হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিলেন। তিনি বললেন, 'আফলাহাতিল উজুহ' অর্থাৎ এই চেহারাগুলো কামিয়াব হোক। সাহাবারা বললেন, 'ওয়া ওয়াজহুকা ইয়া রসূলুল্লাহ' অর্থাৎ আপনার চেহারাও, হে আল্লাহর রসূল। একথা বলার পর পরই অভিযানে অংশগ্রহণকারীরা কা'ব ইবনে আশরাফের কর্তিত মস্তক আল্লাহর রসূলের সামনে রেখে দিলেন। দুর্বৃত্ত নেতা কা'ব এর হত্যাকান্ডে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং হারেসের

ক্ষতস্থানে থু থু লাগিয়ে দিলেন। এতে তিনি সুস্থ হলে গেলেন। এরপর সেই ক্ষতস্থানে আর কখনো ব্যথা হয়নি।[১১]

ইহুদীরা কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যাকান্ডের খবর পেয়ে দমে গেলো। তারা স্পষ্টত বুঝে ফেললো যে, শান্তিভঙ্গের জন্যে যারা দায়ী হবে, যারা সম্পাদিত চুক্তি লংঘন করবে, তাদেরকে সদুপদেশ দেয়ার পর যদি তারা ভালোভাবে না চলে, তাহলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগেও দ্বিধা করবেন না। এ কারণে তারা কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যার খবর শুনেও কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি। তারা নিজেদের চালচলনে এমন ভাব প্রকাশ করলো যে, তারা শান্তিরক্ষা চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলছে। তারা শক্তি প্রদর্শনের কোন চেষ্টাও আর করেনি। বলা যায় যে, বিষাক্ত সাপ সুড়সুড় করে গর্তে প্রবেশ করলো। এভাবে মদীনার আভ্যন্তরীণ শত্রুদের মাথা তোলার আশঙ্কা তিরোহিত হলো।

এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার বাইরে থেকে আসা বিপদের হুমকি মোকাবেলার জন্যে সময় পেলেন।

সাত) বাহরানের যুদ্ধ

এটা ছিলো বড় ধরনের এক সামরিক অভিযান। এই অভিযানে তিনশত মোজাহেদ অংশগ্রহণ করেন। এই বাহিনী নিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৃতীয় হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে বাহরান নামক এলাকা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে যান। এটি হেজাযের অন্তর্ভুক্ত ফারাহ অঞ্চলের একটি জায়গা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সঙ্গী মোজাহেদরা রবিউস সানি এবং জমাদিউল আউয়াল এই দুই মাস সেখানেই অবস্থান করেন। এরপর তিনি মদীনা ফিরে আসেন। তাকে কোন প্রকার লড়াই-এর সম্মুখীন হতে হয়নি।[১২]

আট) ছারিয়্যা যায়েদ ইবনে হারেছা

ওহুদের যুদ্ধের আগে এটি ছিলো মুসলমানদের শেষ সফল অভিযান। তৃতীয় হিজরীর জমাদিউস সানিতে এই অভিযান পরিচালিত হয়েছিলো। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এরূপ,

বদরের যুদ্ধের পর কোরায়শদের মনে শান্তি ছিলো না। এরপর গ্রীষ্মকাল এসে পড়লো। এসময়ই সিরিয়ায় বাণিজ্য কাফেলা পাঠানো হয়। বাণিজ্য কাফেলার নিরাপত্তার চিন্তাও তাদের মাথা ব্যথার কারণ হলো। সেই বছর সিরিয়াগামী বাণিজ্য কাফেলার নেতা সফওয়ান ইবনে উমাইয়া কোরায়শদের বললো, মোহাম্মদ এবং তার সঙ্গীরা আমাদের বাণিজ্য অভিযানে ব্যবহৃত পথ বিপজ্জনক করে তুলেছে। বুঝতে পারছি না, তাদের সাথে কিভাবে মোকাবেলা করবো। ওরা সমুদ্র উপকূল ভিন্ন অন্য কোথাও যায় না। উপকূলবাসীরাও তাদের সাথে ভাব জমিয়ে নিয়েছে। সাধারণ লোকেরাও তাদের পক্ষে রয়েছে। বুঝতে পারছি না, আমরা কোন পথ অবলম্বন করবো।

---

১১. এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ যেসব গ্রন্থাবলী থেকে গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে, ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ৫১, ৫৭, সহীহ বোখারী ১ম খন্ড পৃ. ৩৪১, ৪২৫, ২য় খন্ড, ৫৭৭, সুনানে আবুদাউদ, ২য় খন্ড, পৃ. ৪২, ৪৩ যাদুল মায়াদ ২য় খন্ড, পৃ. ৯১।

১২. ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ৫০, ৫১, যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ৯১। এই অভিযানের কারণ সম্পর্কে নানা কথা উল্লেখ রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, মদীনায় এ খবর পৌঁছে যে, বনু সালিম গোত্র মদীনা ও তার আশে পাশে হামলার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। এটাও বলা হয়ে থাকে যে, আল্লাহর রসূল কোরায়েশদের একটি কাফেলার খোঁজে বেরিয়েছিলেন। ইবনে হিশাম এই কারণ উল্লেখ করেছেন। ইবনে কাইয়েমও এই অভিমত প্রকাশ করেন। প্রথম কারণ আলোচিত হয়নি। অন্য কারণটিই বিশ্বাসযোগ্য। কেননা বনু সালিম গোত্র ফারা এলাকায় বসবাস করতো না বাস করতো নজদে। এই এলাকা ফারা থেকে বহু দূরে অবস্থিত।

এদিকে, আমরা যদি ঘরে বসে থাকি, তবে তো পুঁজি শেষ হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত কিছুই বাকি থাকবে না। কেননা মক্কায় আমাদের জীবিকার ব্যবস্থাই হচ্ছে দুই মৌসুমের ব্যবসার ওপর- গ্রীষ্মকালে সিরিয়া আর শীতকালে আবিসিনিয়ার সাথে।

সফওয়ানের এ প্রশ্নের পর বিষয়টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা শুরু হলো। আসওয়াদ ইবনে আবদুল মোত্তালেব সফওয়ানকে বললো, তুমি সমুদ্র উপকূলের পথ ছেড়ে ইরাকগামী পথ ধরে যেয়ো। এ পথ অনেক ঘোরা। নজদ হয়ে সিরিয়ায় যেতে হবে। মদীনার পূর্ব দিকের এই পথ সম্পর্কে কোরায়শরা ছিলো অনবহিত। আসওয়াদ ইবনে আবদুল মোত্তালেব সফওয়ানকে পরামর্শ দিলো যে, তুমি বকর ইবনে ওবায়েল গোত্রের সাথে সম্পর্কিত ফোরাত ইবনে হাইয়ানের সাথে যোগাযোগ করো। তাকে প্রস্তাবিত সফরে পথ প্রদর্শক হিসাবে রাখবে।

এই ব্যবস্থার পর কোরায়শদের বাণিজ্য কাফেলা সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার নেতৃত্বে নতুন পথ ধরে অগ্রসর হলো। কিন্তু এই সফর পরিকল্পনার বিস্তারিত খবর মদীনায় পৌঁছে গেলো। কিভাবে পৌঁছুল এই খবর? ঘটনা ছিলো এই- সালিত ইবনে নোমান নঈম ইবনে মাসুদের সাথে মদের একটি আড্ডায় মিলিত হয়েছিলো। এদের মধ্যে প্রথমোক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ ছালিত সেই সময় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি অর্থাৎ নঈম তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। তখনো পর্যন্ত মদ পান নিষিদ্ধ হয়নি। মদের আড্ডায় নঈম ছালিতের কাছে নেশার ঘোরে কোরায়শদের বাণিজ্য যাত্রার সব কথা প্রকাশ করে দেয়। ছালিত সাথে সাথে মদীনা রওয়ানা হয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সব কথা প্রকাশ করে দেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর পাওয়ার পর কোরায়শী কাফেলার ওপর অবিলম্বে হামলার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। একশত সওয়ারের একটি বাহিনী হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.)-এর নেতৃত্বে প্রেরণ করা হয়। হযরত যায়েদ (রা.) দ্রুত গিয়ে কারদাহ নামক জায়গায় কাফেলার দেখা পেয়ে যান। তারা তখনই কেবল সেখানে পৌঁছেছিলো। একটি জলাশয়ের তীরে তাদের অবতরণের প্রাক্কালে আকস্মিক হামলায় তারা হতবুদ্ধি হয়ে যায়। সফওয়ান ইবনে উমাইয়া এবং তার সঙ্গীরা পলায়ন ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে পারেনি।

মুসলমানরা ফোরাত ইবনে হাইয়ানকে কাফেলার পথ প্রদর্শক নিযুক্ত করেন। অন্য দুইজন লোককে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। ব্যবসায়ের বিভিন্ন মালামাল মুসলমানদের হস্তগত হয়। সেসব দ্রব্যের মূল্য ছিলো এক লাখ দেরহামের কাছাকাছি।

মদীনায় পৌঁছার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক পঞ্চমাংশ সম্পদ বের করে নেন। সম্পদ সমাগ্রী মোজাহেদদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। আর ফোরাত ইবনে হাইয়ান রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৩]

বদরের যুদ্ধের পর এটি ছিলো কোরায়শ কাফেরদের জন্যে সবচেয়ে হৃদয়বিদারক ঘটনা। এর ফলে তাদের মানসিক যন্ত্রণা বহুগুণ বেড়ে যায়। তাদের সামনে তখন দুটি পথ খোলা ছিলো। হয়তো সব ভুলে মুসলমানদের সাথে আপোষ মীমাংসা, অন্যথায় নতুন উদ্দীপনায় উজ্জীবিত হয়ে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তাদের শক্তি চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়া, যেন ভবিষ্যতে তারা পুনরায় মাথা তুলতে না পারে। মক্কার নেতৃস্থানীয় কোরায়শরা দ্বিতীয় পথটিই গ্রহণ করলো। বাণিজ্য অভিযানে সর্বস্ব হারানোর পর তাদের প্রতিশোধস্পৃহা বহুগুণ বেড়ে যায়। মুসলমানদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার জন্যে তাদের ঘরে প্রবেশ করে তাদের ওপর হামলা করার জন্যে কোরায়শরা সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে। অতীতের ঘটনাবলী ছাড়াও বাণিজ্য অভিযান ব্যর্থ হওয়ার ক্ষোভও ওহুদের যুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ।

---

১৩. ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ৫০, ৫১, রহমতুল লিল আলামীন, ২য় খন্ড, পৃ. ২১৯

ওহুদের যুদ্ধ

প্রতিশোধের জন্যে কোরায়শদের প্রস্তুতি

বদরের যুদ্ধে মক্কাবাসীদের পরাজয় ও অবমাননা এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অনেকের নিহত হওয়ার যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছিলো। এ কারণে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রোধে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু নিহতদের জন্যে শোক প্রকাশ ও আহাযারি করতে কোরায়শ নেতারা নিহতদের আত্মীয়স্বজনকে নিষেধ করে দিয়েছিলো। যুদ্ধবন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধেও তাড়াহুড়ো করতে নিষেধ করা হয়। তাদের শোকের গভীরতা এবং মানসযন্ত্রণা তারা মুসলমানদের জানতে দিতে চাচ্ছিলো না। বদরের যুদ্ধের পর কাফেররা সম্মিলিতভাবে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে আরেকটি যুদ্ধ করে তারা নিজেদের মনের জ্বালা জুড়াবে। এই যুদ্ধে তাদের ক্রোধও প্রশমিত হবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরপরই তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করলো। কোরায়শ নেতাদের মধ্যে এ যুদ্ধ প্রস্তুতিতে ইকরামা ইবনে আবি জেহেল, সফওয়ান ইবনে উমাইয়া, আবু সুফিয়ান ইবনে হরব এবং আবদুল্লাহ ইবনে যিয়াদ ছিলো অগ্রগণ্য।

আবু সুফিয়ানের যে কাফেলা বদর যুদ্ধের কারণ হয়েছিলো, সেই কাফেলা মালামালসহ আবু সুফিয়ান সরিয়ে নিতে সফল হয়েছিলো। সেই কাফেলার সমুদয় মালামাল যুদ্ধের জন্যে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। মালামালের মালিকদের বলা হয় যে, কোরায়শ বংশের লোকেরা, শোনো, মোহাম্মদ তোমাদেরকে কঠিন আঘাত হেনেছে। কাজেই তার সাথে যুদ্ধ করতে তোমরা তোমাদের এই মালামাল দিয়ে সহায়তা করো। তোমাদের নির্বাচিত সর্দারদের ওরা হত্যা করেছে। পুনরায় যুদ্ধ করলে আমরা হয়তো প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম হবো। কোরায়শরা এ আবেদনে সাড়া দিয়ে নিজেদের সমুদয় মাল যুদ্ধের জন্যে দান করতে রাযি হয়। সেই মালামালের পরিমাণ ছিলো এক হাজার উট, এবং পঞ্চাশ হাজার দীনার। যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্যে উটগুলো বিক্রি করে দেয়া হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা রব্বুল আলামীন এ আয়াত নাযিল করেন। 'আল্লাহর পথ থেকে লোকদের নিবৃত্ত করার জন্যে কাফেররা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে। অতপর সেটা তাদের মনস্তাপের কারণ হবে। এরপর তারা পরাভূত হবে এবং যারা কুফুরী করে, তাদেরকে জাহান্নামে একত্র করা হবে।' (সূরা আনফাল, আয়াত ৩, ৬)

এরপর কোরায়শরা স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজের জন্যে উদাত্ত আহ্বান জানালো। মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বিভিন্ন গোত্রের লোকদের উদ্বুদ্ধ করা হলো। সবাইকে কোরায়শদের পতাকাতলে সমবেত হতে বললো। নানা প্রকার লোভও দেখানো হলো। আবু ওযযা নামের একজন কবি বদরের যুদ্ধে বন্দী হয়েছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বিনা মুক্তিপণেই মুক্তি দিয়েছিলেন। তার কাছ থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয়েছিলো যে, সে ভবিষ্যতে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন কাজ করবে না। কিন্তু মক্কায় ফিরে আসার পর সফওয়ান ইবনে উমাইয়া তাকে বুঝালো যে, তুমি বিভিন্ন গোত্রের লোকদের কাছে যাও, তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষার কবিতার মাধ্যমে ক্ষেপিয়ে তোলো। আমি যদি যুদ্ধ থেকে ভালোভাবে ফিরে আসতে পারি তবে তোমাকে প্রচুর অর্থ-সম্পদ দেবো অথবা তোমার কন্যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবো। এ প্রলোভনে গলে গিয়ে আবু ওযযা রসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভেঙ্গে ফেললো। বিভিন্ন গোত্রে গিয়ে সে লোকদের উদ্দীপনাময় কবিতার মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাতে লাগলো। কোরায়শ নেতারা একইভাবে অন্য একজন কবি মোসাফা ইবনে আবদে মন্নাফ জুহামিকেও দলে টেনে এনেছিলো। এমনিভাবে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কাফেরদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা বেড়ে চললো।

বছর পূর্ণ হতেই কোরায়শদের যুদ্ধ প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হলো। নিজেদের ঘনিষ্ঠ লোক ছাড়াও কোরায়শদের মিত্র মিলে সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ালো তিন হাজার। কোরায়শ নেতারা কিছুসংখ্যক সুন্দরী মহিলাকেও যুদ্ধে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করলো। সে অনুযায়ী পনের জন সুন্দরীকেও যুদ্ধক্ষেত্রে নেয়া হলো। এদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে নেয়ার যুক্তি দেখানো হলো, এদের নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষার প্রেরণায় যুদ্ধে বীরত্ব ও আত্মত্যাগের মানসিকতা বেশী কাজ করবে। যুদ্ধে তিন হাজার উট এবং দু'শো ঘোড়া নেয়ার জন্যে প্রস্তুত করা হলো।[১] ঘোড়াগুলোকে অধিকতর সক্রিয় রাখতে যুদ্ধক্ষেত্র পর্যন্ত পুরো পথ তাদের পিঠে কাউকে আরোহণ করানো হয়নি। এছাড়া নিরাপত্তামূলক অস্ত্রের মধ্যে তিন হাজার বর্মও অন্তর্ভুক্ত ছিলো।

আবু সুফিয়ান ছিলো সৈন্যদের সিপাহসালার। খালেদ ইবনে ওলীদকে সাহায্যকারী ঘোড় সওয়ার বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া হলো। ইকরামা ইবনে আবু জেহেলকে তার সহকারী নিযুক্ত করা হলো। নির্ধারিত নিয়ম অনুযায়ী বনি আবদুদ দার গোত্রের কাছে যুদ্ধে পতাকা দেয়া হলো।

মদীনা অভিমুখে অমুসলিমদের যাত্রা

এ ধরনের প্রস্তুতির পর মক্কার এ বাহিনী মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলো। মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে ক্রোধে তারা উন্মত্তপ্রায় হয়ে পড়েছিলো। যুদ্ধের রক্তপাত ও ভয়াবহতা থেকে তাদের ক্রোধের পরিমাণ আন্দায করা যায়।

হযরত আব্বাস (রা.) কোরায়শদের যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রতি নযর রাখছিলেন। মদীনার দিকে রওয়ানা হওয়ার খবর জেনেই তিনি সমুদয় বিবরণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করার জন্যে মদীনায় দ্রুত একজন দূত পাঠালেন।

হযরত আব্বাস (রা.)-এর প্রেরিত দূত মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী পাঁচশত কিলোমিটার পথের দূরত্ব মাত্র তিন দিনে অতিক্রম করলেন। মদীনায় পৌঁছেই তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হযরত আব্বাস (রা.)-এর চিঠি প্রদান করলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই সময় মদীনার কোবা মসজিদে অবস্থান করছিলেন।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হযরত আব্বাস (রা.)-এর চিঠি পড়ে শোনালেন। চিঠির বক্তব্য হযরত উবাই (রা.)-কে গোপন রাখার নির্দেশ দিয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসার ও মোহাজের নেতাদের সাথে জরুরী পরামর্শ করলেন।

পরিস্থিতি মোকাবেলায় জরুরী ব্যবস্থা

যে কোন অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্যে এরপর মদীনার মুসলমানরা অস্ত্র সঙ্গে রাখতে শুরু করলেন। এমনকি নামাযের সময়েও অস্ত্র দূরে সরিয়ে রাখা হতো না।

কয়েকজন আনসারকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিরাপত্তা রক্ষায় নিযুক্ত করা হলো। এদের মধ্যে ছিলেন হযরত সা'দ ইবনে মায়া'য (রা.), উসায়েদ ইবনে খোযায়ের (রা.) এবং সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.)। এরা সশস্ত্র অবস্থায় সারা রাত প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

১. অবশ্য ফাতহুল বারী গ্রন্থে ঘোড়ার সংখ্যা বলা হয়েছে একশত (৭তম খন্ড, ৩৪৬ পৃ)

সাল্লামের গৃহে পাহারায় থাকতেন।

মদীনার বিভিন্ন প্রবেশ পথেও বেশ কয়েকজন মুসলমানকে নিয়োগ করা হলো। যে কোন ধরনের আকস্মিক হামলা মোকাবেলায় এরা প্রস্তুত ছিলেন। ছোট ছোট কয়েকটি বাহিনীকে শত্রুদের গতিবিধির ওপর নযর রাখতে মদীনার বাইরের রাস্তায়ও নিযুক্ত করা হলো।

মদীনার সন্নিকটে কাফেরদের উপস্থিতি

মক্কার বাহিনী মদীনা অভিমুখে এগিয়ে চললো। আবওয়ার নামক জায়গায় পৌঁছার পর আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দ বিনতে ওতবা প্রস্তাব দিলো যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মা বিবি আমেনার কবর খুঁজে তাকে ছিন্ন ভিন্ন করা হোক। কিন্তু এ নারীর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে কোরায়শ নেতারা রাযি হলো না। তারা ভেবে দেখলো যে, এ কাজের পরিণাম হবে খুবই ভয়াবহ।

আবওয়া থেকে কাফেররা সফর অব্যাহত রাখলো। মদীনার কাছে পৌঁছে আকিক প্রান্তর অতিক্রম করলো। এরপর কিছুটা ডানে গিয়ে ওহুদ পর্বতের নিকটবর্তী আইনাইন নামক জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করলো। আইনাইন মদীনার উত্তরে কানাত প্রান্তরের কাছে একটি উর্বর ভূমি। এটা তৃতীয় হিজরীর ৬ই শাওয়াল রোজ শুক্রবারের ঘটনা।

মজলিসে শূরার বৈঠক

অমুসলিমদের গতিবিধির পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর মুসলিম সংবাদ বাহকরা মদীনায় পৌঁছে দিচ্ছিলেন। তাদের অবস্থান গ্রহণের খবরও মদীনায় পৌঁছে গেলো। সেই সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজলিসে শূরার বৈঠক আহ্বান করলেন। সেই বৈঠকে মদীনার প্রতিরক্ষা সম্পর্কে জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার চিন্তা করা হচ্ছিলো। শুরুতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর দেখা একটি স্বপ্নের কথা সাহাবাদের জানালেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহর শপথ আমি একটা ভালো জিনিস দেখেছি। আমি দেখলাম কিছুসংখ্যক গাভীকে যবাই করা হচ্ছে। আমি দেখলাম আমার তরবারির ওপর পরাজয়ের কিছু চিহ্ন। আমি আরো দেখলাম যে, আমি আমার হাত একটি নিরাপদ বর্মের ভেতর প্রবেশ করিয়েছি। অতপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাভী যবাই করা হচ্ছে এ কথার ব্যাখ্যা করে বললেন, কয়েকজন সাহাবা শহীদ হবেন। তলোয়ারে পরাজয়ের চিহ্নের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন যে, আমার পরিবারের কোন একজন শহীদ হবেন। নিরাপদ বর্মের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বললেন, এর অর্থ হচ্ছে মদীনা শহর।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতপর আভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা কৌশল সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করলেন যে, মুসলমানরা শহর থেকে বের হবে না। তারা মদীনার ভেতরেই অবস্থান করবে। কাফেররা তাদের তাঁবুতে অবস্থান করতে থাকুক। যদি তারা মদীনায় প্রবেশ করে তাহলে মুসলমানরা মদীনার অলিগলিতে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। মহিলারা ছাদের ওপর থেকে তাদের ওপর আঘাত হানবে। এই অভিমতই ছিলো সঠিক। মোনাফেক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও এই অভিমতের সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করলো। মজলিসে শূরায় এই মোনাফেক খাযরাজ গোত্রের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেছিলো। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভিমতের সাথে এই মোনাফেক ঐকমত্য প্রকাশের কারণ এটা নয় যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভিমত ও প্রতিরক্ষা কৌশল তার পছন্দ হয়েছিলো, বরং সে এ কারণেই পছন্দ করেছিলো যে, এতে একদিকে সে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকতে পারবে, অথচ কেউ সেটা বুঝতেও পারবে না। কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামীনের ইচ্ছা ছিলো অন্যরকম। তিনি চেয়েছিলেন, প্রথমবারের মতো সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে চিহ্নিত ও অপমানিত এবং মুসলমানিত্বের আবরণে

তার কুফুরীর পর্দা উন্মোচিত হোক। এছাড়া মুসলমানরা নিজেদের সঙ্কটকালীন সময়ে জেনে নিক যে, তাদের আস্তিনে কতো বিষাক্ত সাপ লুকিয়ে আছে।

বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি- এমন কয়েকজন বিশিষ্ট সাহাবা ময়দানে গিয়ে কাফেরদের সাথে মোকাবেলা করার জন্যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরামর্শ দিলেন। তাঁরা জেহাদে অংশগ্রহণের জন্যে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগলেন। কোন কোন সাহাবা বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমরা তো এই দিনের জন্যে আকাঙ্খা করছিলাম এবং আল্লাহ রব্বুল আলামীনের কাছে মোনাজাতও করছিলাম। আল্লাহ রব্বুল আলামীন আজ আমাদের সেই সুযোগ প্রদান করেছেন। আজ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ এসেছে। কাজেই হে আল্লাহর রসূল, আপনি শত্রুদের সামনে এগিয়ে চলুন, একথা মনে করবেন না যে, আমরা ভয় পাচ্ছি।

এ ধরনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রকাশকারীদের মধ্যে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা হযরত হামযা ইবনে আবদুল মোত্তালেবও ছিলেন। বদরের যুদ্ধে তিনি বিশেষ বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, সেই পবিত্র সত্ত্বার শপথ, যিনি আপনার ওপর কোরআন নাযিল করেছেন, মদীনার বাইরে কাফেরদের সাথে খোলা ময়দানে যুদ্ধ করার আগে আমি কোন আহার মুখে তুলবো না।[২]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সাহাবার মতামতের প্রেক্ষিতে নিজ মতামত প্রত্যাহার করায়। শেষে সিদ্ধান্ত হলো যে, মদীনার বাইরে খোলা ময়দানেই কাফেরদের মোকাবেলা করা হবে।

ইসলামী বাহিনীর বিন্যাস এবং যুদ্ধ যাত্রা

এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমার নামায পড়ালেন। নামায শেষে ওয়ায নসিহত করলেন। তিনি বললেন, ধৈর্য এবং দৃঢ় সংকল্পের মাধ্যমেই জয়লাভ করা সম্ভব হবে। সাথে সাথে মুসলমানদের নির্দেশ দিলেন তারা যেন শত্রুর মোকাবেলার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। একথা শোনার পর মুসলমানদের মনে আনন্দের স্রোত বয়ে যায়।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আসরের নামায আদায় করলেন তখন দেখলেন যে, বেশ কিছু সংখ্যক লোক সমবেত হয়েছে। মদীনার উপকণ্ঠ থেকেও কিছু লোক এসেছে। নামাযের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভেতরে প্রবেশ করলেন। হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমর (রা.) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথায় পাগড়ি বাঁধলেন এবং পোশাক পরিধান করালেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিচে এবং ওপরে বর্ম পরিধান করলেন, তলোয়ার সঙ্গে নিয়ে অন্যান্য অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সকলের সামনে হাযির হলেন।

সকলেই ছিলেন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের প্রতীক্ষায়। হঠাৎ করে হযরত সা'দ ইবনে মায়া'য (রা) এবং হযরত উসায়েদ ইবনে খুযায়ের (রা.) সাহাবাদের বললেন, আপনারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জোর করে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে যাচ্ছেন। আপনারা তাঁকে বাধ্য করছেন। কাজেই বিষয়টি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ছেড়ে দিন। একথা শুনে সকলেই শরমিন্দা হলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইরে এলে তাঁর কাছে সবাই আরয করলেন যে, হে আল্লাহর রসূল, আমরা আপনার বিরোধিতা করেছি, এটা ঠিক হয়নি। আপনি যা ভালো মনে করেন, তাই করুন। আপনি যদি আমাদের মদীনায় থাকাই সমীচীন মনে করেন তবে আমরা ওতেই রাযি। আপনি তাই করুন।

---

২. সীরাতে হালবিয়াহ দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১৪

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কোন নবী যখন অস্ত্র পরিধান করে নেন, তখন তা খুলে ফেলা তাঁর জন্যে সমীচীন নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর এবং তাঁর শত্রুদের মধ্যে ফয়সালা না করে দেন।[৩]

এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৈন্যদের এভাবে তিনভাগে ভাগ করলেন:

এক) মোহাজের বাহিনী। এই বাহিনীর পতাকা হযরত মসআব ইবনে ওমায়ের (রা.)-কে প্রদান করা হয়।

দুই) আনসারদের আওস গোত্রের বাহিনী। হযরত উসায়েদ ইবনে খুযায়ের (রা.)-কে এই বাহিনীর নেতৃত্ব দেন।

তিন) খাযরাজ গোত্রের বাহিনী। হযরত হাব্বাব ইবনে মুনযের (রা.) এই বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেন।

মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা ছিলো সর্বসাকুল্যে এক হাজার। এদের মধ্যে একশত জন বর্ম পরিহিত এবং পঞ্চাশজন ঘোড় সওয়ার ছিলেন।[৪]

অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, ঘোড় সওয়ার সৈন্য একজনও ছিলো না।

যুদ্ধ চলাকালে মদীনায় অবস্থানরত সাহাবীদের নামায পড়ানোর দায়িত্ব হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-এর ওপর দিয়ে পরে মুসলিম সৈন্যদের রওয়ানা হওয়ার নির্দেশ প্রদান দেয়া হয়। মুসলিম সৈন্যরা উত্তর দিকে রওয়ানা হন। হযরত সা'দ ইবনে মায়া'য (রা.) এবং হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.) বর্ম পরিহিত অবস্থায় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে থাকা অবস্থায় এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

'ছানিয়াতুল বিদা' নামক স্থানে পৌঁছার পর একটি সৈন্যদল দেখা গেলো। এরা উৎকৃষ্ট অস্ত্রে সজ্জিত এবং পুরো সেনাবাহিনী থেকে পৃথক ছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তারা বললো, তারা খাযরাজ গোত্রের মিত্র এবং[৫] ইহুদী। কিন্তু তারা মক্কার কাফেরদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে লড়াই করতে চায়। তাদের মুসলমান হওয়ার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানানো হলো যে, তারা মুসলমান হয়নি এবং হওয়ার ইচ্ছাও নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফেরদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালেন।

সৈন্যদল পরিদর্শন

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাইখান নামক জায়গায় পৌঁছে মুসলিম সৈন্যদের পরিদর্শন করলেন। এই জায়গায় পরিদর্শন শেষে অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং যুদ্ধের জন্যে অনুপযোগিদের ফেরত পাঠানো হলো। যাদের ফেরত পাঠানো হয়েছিলো তাঁরা হলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.), হযরত ওসামা ইবনে যায়েদ (রা.), হযরত ওসায়েদ ইবনে যহির (রা.), যায়েদ

---

৩. মোসনাদে আহমদ, নাসাঈ, ইবনে ইসহাক।

৪. ইবনে কাইয়েম যাদুল মায়াদ গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ডের ৯২ পৃষ্ঠায় একথা লিখেছেন। হাফেজ ইবনে হাজার বলেন, এটা ভুল। মূসা ইবনে ওকবা দৃঢ়তার সাথে বলেছেন, ওহুদের যুদ্ধে কোন ঘোড়া ব্যবহার করা হয়নি। ওয়াকেদী লিখেছেন, মাত্র ২টি ঘোড়া ছিলো। একটি রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে এবং অন্যটি আবু যোবদা (রা)-এর কাছে ছিলো। ফতহুল বারী সপ্তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৫০।

৫. এই ঘটনা ইবনে সা'দ বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওরা ছিলো বনি কায়নুকা গোত্রের ইহুদী। কিন্তু এ তথ্য সঠিক নয়। কেননা বনি কায়নুকা গোত্রের লোকদের বদর যুদ্ধের কিছুদিন পরই মদীনা থেকে বের করে দেয়া হয়।

ইবনে সাবেত (রা.), হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.), হযরত ওসামা ইবনে আওস (রা.), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.), হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা আনসারী (রা.) এবং হযরত সা'দ ইবনে হিব্বাহ (রা.)। এই তালিকায় হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.)-এর নামও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু সহীহ বোখারীর মতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ওহুদের যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন।

কম বয়স্ক হওয়া সত্তেও হযরত রাফে ইবনে খাদিজ (রা.) এবং হযরত সামুরা ইবনে জুন্দব (রা.)-কে জেহাদে অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছিলো। এর কারণ ছিলো এই যে, হযরত রাফে ইবনে খাদিজ (রা.) তীরন্দাজ হিসাবে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁকে অনুমতি দেয়ার পর হযরত সামুরা ইবনে জুন্দব (রা.) বললেন, আমি তো রাফের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। কুস্তিতে তাকে আমি আছড়ে দিতে পারি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা জানানো হলে তিনি উভয়কে কুস্তি লড়ার আদেশ দিলেন। সেই কুস্তিতে হযরত সামুরা ইবনে জুন্দব (রা.) সত্যিই হযরত রাফেকে আছড়ে দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সামুরা (রা.)-কেও অংশগ্রহণের অনুমতি দিলেন।

ওহুদ ও মদীনার মাঝামাঝি স্থানে রাত্রিযাপন

শাইখান নামক জায়গাতেই সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে মাগরেব এবং এশার নামায আদায় করে রাত্রি যাপনের সিদ্ধান্ত করলেন। মুসলমানদের তাঁবুর চারদিকে পাহারাদারদের নেতা ছিলেন হযরত মোহাম্মদ ইবনে মাসলামা আনসারী (রা.)। তিনিই ইহুদী কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যাকান্ডে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আর সাফওয়ান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে কয়েস (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন।

মোনাফেকদের বিশ্বাসঘাতকতা

মোনাফেক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর দুরভিসন্ধি সফল হওয়ার কাছাকাছি ছিলো। তার ও তার সঙ্গীদের পিছুটান দেখে আওস গোত্রের বনু হারেসা এবং খাযরাজ গোত্রের বনু সালমার দলও দ্বিধান্বিত হয়ে পড়েছিলো। তারা ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছিলো। কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামীন এই দুই গোত্রের লোকদের মনে ঈমানী চেতনা জাগ্রত করে দেয়ায় তারা যুদ্ধের জন্যে সঙ্কল্পে অটল হয়ে রইলেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন, 'যখন তোমাদের মধ্যেকার দু'টি দল ভীরুতার পরিচয় দেয়ার ইচ্ছা করেছিলো এবং আল্লাহ তায়ালা তাদের বন্ধু। মোমেনদের আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত।'

মোনাফেকরা মদীনায় ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে এমনি নাযুক পরিস্থিতিতে তাদের কর্তব্য সম্পর্কে হযরত জাবের (রা.)-এর পিতা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারাম (রা.) সচেতন করতে চাইলেন। তিনি প্রত্যাবর্তন প্রত্যাশী মোনাফেকদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে তাদের পেছনে কিছুদুর গিয়ে বললেন, এখনো ফিরে চলো, আল্লাহর পথে লড়াই করো। কিন্তু তারা জবাব দিলো যে, যদি আমরা জানতাম যে, আপনারা যুদ্ধ করবেন তাহলে আমরা ফিরে যেতাম না। একথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারাম (রা.) বললেন, ওহে আল্লাহর শত্রুরা, তোমাদের ওপর আল্লাহর শাস্তি নাযিল হবে। স্মরণ রেখো, আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে তোমাদের মুখাপেক্ষি রাখবেন না।

সেই মোনাফেকদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করলেন, 'এবং মোনাফেকদের জানবার জন্যে তাদেরকে বলা হয়েছিলো', এসো, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো অথবা প্রতিরোধ করো। তারা বললো, যদি যুদ্ধ জানতাম, তবে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করতাম। সেদিন তারা ঈমান অপেক্ষা কুফুরীর নিকটতর ছিলো। যা তাদের অন্তরে নেই, তা তারা মুখে বলে। যা তারা গোপন রাখে, আল্লাহ তায়ালা তা বিশেষভাবে অবহিত। (আলে ইমরান, আয়াত ১৬৭)

ওহুদের পাদদেশে

মোনাফেকদের ফিরে যাওয়ার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশিষ্ট সাতশত মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে শত্রুদের দিকে অগ্রসর হলেন। শত্রুদের অবস্থান ছিলো ওহুদ পর্বতের উল্টো দিকে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন, বেশী ঘুরে গন্তব্যে যেতে হবে না, এমন পথের সন্ধান দিতে কেউ পারবে?

একথা শুনে হযরত আবু খায়ছুমা (রা.) এগিয়ে এসে বললেন, একাজের জন্যে আমি হাযির রয়েছি, হে আল্লাহর রসূল। এরপর তিনি একটি সংক্ষিপ্ত পথ ধরে এগিয়ে চললেন। শত্রুদের পশ্চিম-পাশে রেখে সেই পথ ধরে বনু হারেসা গোত্রের জমির ওপর দিয়ে মুসলমানরা এগিয়ে যাচ্ছিলো। এই পথে যাওয়ার সময় মরবা ইবনে কায়জা নামক এক ব্যক্তির বাগানের ওপর দিয়ে যাচ্ছিলো। এ লোকটি একদিকে ছিলো অন্ধ, অন্যদিকে মোনাফেক। মুসলমানদের আগমন অনুভব করে সে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে ধুলি নিক্ষেপ করতে শুরু করলো। এ সময়ে সে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছিলো, আপনি যদি আল্লাহর রসূল হয়ে থাকেন, তবে মনে রাখবেন যে, আমার বাগানে আপনার আসার অনুমতি নেই। মুসলমানরা তাকে হত্যা করতে চাইলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওকে হত্যা করো না। সে মন এবং চোখ উভয় দিক থেকেই অন্ধ।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনে অগ্রসর হয়ে প্রান্তরের সীমায় অবস্থিত ওহুদ পাহাড়ের ঘাঁটিতে পৌঁছে সেখানেই শিবির স্থাপন করলেন। সামনে ছিলো মদীনা আর পেছনে ছিলো ওহুদের উঁচু পাহাড়। শত্রু বাহিনী তখন মুসলমান এবং মদীনার মাঝামাঝি অবস্থান করছিলো।

প্রতিরোধ পরিকল্পনা

এখানে পৌঁছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৈন্যদের বিন্যস্ত ও সংগঠিত করলেন। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি সৈন্যদের কয়েকটি সারিতে বিভক্ত করলেন। তীরন্দাজদের একটি বাহিনী গঠন করলেন। এদের সংখ্যা ছিলো পঞ্চাশ। এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাবের ইবনে নোমান আনসারী (রা.)-কে এই বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়া হলো। কানাত উপত্যকার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত একটি গিরিপথে তাদের নিযুক্ত করা হলো। এই গিরিপথ বর্তমানে জাবালে রুমাত নামে পরিচিত। এই গিরিপথ মুসলিম বাহিনীর অবস্থান থেকে দেড়শত মিটার দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই তীরন্দাজদের নেতার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'তোমরা ঘোড় সওয়ার শত্রুদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করে তাদেরকে আমাদের কাছ থেকে দূরে রাখবে। লক্ষ্য রাখবে তারা যেন পেছনের দিক থেকে আমাদের ওপর হামলা করতে না পারে। আমরা জয়লাভ করি অথবা পরাজিত হই, উভয় অবস্থায়ই তোমরা নিজেদের অবস্থানে অবিচল থাকবে। তোমরা যেখানে অবস্থান নিয়েছো সেদিক থেকে যেন আমাদের ওপর কোন হামলা আসতে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।[৬] এরপর সকল তীরন্দাজকে লক্ষ্য করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমাদের পেছনের দিক তোমরা হেফাযত করবে। যদি দেখো যে, আমরা মারা পড়েছি তবুও আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসো না। যদি দেখো যে, আমরা গনীমতের মাল আহরণ করছি, তবুও আমাদের সাথে তোমরা অংশ নিও না।'[৭]

---

৬. ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ৬৫-৬৬।

৭. আহমদ তিবরানী হাকেম হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। ফতহুল বারী সপ্তম খন্ডের ৩৫০ পৃ. দ্রষ্টব্য।

সহীহ বোখারীতে উল্লেখিত বক্তব্য অনুযায়ী জানা যায়, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, যদি তোমরা দেখো যে, আমাদেরকে চড়ুই পাখী ঠোকরাচ্ছে তবুও নিজের জায়গা ছাড়বে না— যদি আমি ডেকে না পাঠাই। যদি তোমরা দেখো যে, আমরা শত্রুদের পরাজিত করছি এবং এক সময়ে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছি, তবুও নিজের জায়গা ছাড়বে না— যদি আমি ডেকে না পাঠাই।[৮]

এমনি কঠোর সামরিক নির্দেশসহ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তীরন্দাজ সৈন্যদেরকে নিযুক্ত করে গিরিপথ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কারণ সেই পথের বিপরীত থেকে এসে শত্রুরা মুসলমানদের ওপর সহজেই হামলা করতে সক্ষম হতো।

বাকি সৈন্য থেকে হযরত মোনযের ইবনে আমর (রা.)-কে ডানদিকে এবং হযরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) সহকারী হিসাবে হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা.)-কে নিযুক্ত করা হলো। হযরত যোবায়ের (রা.)-কে এই দায়িত্বও দেয়া হয়েছিলো যে, তিনি খালেদ ইবনে ওলীদের নেতৃত্বাধীন ঘোড় সওয়ারদের গতিরোধ করে রাখবেন। খালেদ তখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি। এই শ্রেণী বিন্যাস ছাড়াও সম্মুখভাগে বিশিষ্ট ও নির্বাচিত সাহাবাদের মোতায়েন করা হয়েছিলো। এ সকল সাহাবার বীরত্ব সাহসিকতার খ্যাতি এতো বেশী ছিলো যে, তাদের এক একজনকে এক হাজার শত্রুর মোকাবেলায়ও যথেষ্ট মনে করা হতো।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেনা বিন্যাসের এ পরিকল্পনা ছিলো সূক্ষ্ম কৌশল ও সামরিক প্রজ্ঞার পরিচায়ক। সামরিক নেতৃত্ব এবং সমর কৌশলে তাঁর নৈপুণ্য ও বিচক্ষণতার পরিচয় এতে পাওয়া যায়। এতে এটাও প্রমাণিত হয় যে, সুযোগ্য ও দূরদর্শী কোন সেনানায়কই সমর কৌশলের ক্ষেত্রে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সমর পরিকল্পনা প্রণয়নে সক্ষম হবেন না। শত্রু সৈন্যদের পরে এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের অবস্থানের জন্যে উৎকৃষ্ট স্থান নির্বাচন করেছিলেন। পাহাড়ের সম্মুখভাগে অবস্থান গ্রহণ করে তিনি শত্রুদের হামলা থেকে পেছন দিক এবং ডান দিক নিরাপদ করলেন। বাম দিক থেকে শত্রুরা এসে যে জায়গায় পৌঁছে হামলা করবে বলে আশঙ্কা করা যাচ্ছিলো সেই জায়গায় তিনি সুদক্ষ তীরন্দাজ বাহিনী মোতায়েন করলেন। পেছনে উঁচু জায়গা বাছাই করে তিনি এটাই স্থির করলেন যে, যদি খোদা না করুন পরাজিত হলে পলায়নও করতে হবে না এবং শত্রুদের ধাওয়ার মুখে পড়ে নাজেহালও হতে হবে না বরং শিবিরে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ সম্ভব হবে। এমতাবস্থায় শত্রুরা শিবিরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের জন্যে হামলা চালালে তাদেরকে শোচনীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে। পক্ষান্তরে শত্রুদের এমন জায়গায় থাকতে বাধ্য করা হলো যে, তারা জয়লাভ করলেও জয়ের সুফল তেমন লাভ করতে পারবে না। আর মুসলমানরা জয়লাভ করলে কাফেররা মুসলমানদের ধাওয়া থেকে আত্মরক্ষায় সমর্থ হবে না। পাশাপাশি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশিষ্ট সাহাবাদের একটি দলকে সম্মুখভাগে রেখে সামরিক সংখ্যার তাত্ত্বিক শূন্যতাও পূরণ করে দিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোসরা হিজরী সালের ৭ই শাওয়াল শনিবার সকালে সেনা বিন্যাসের এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করলেন।

দায়িত্বশীলদের উদ্দেশে রসূলুল্লাহ (স.)-এর বাণী

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর ঘোষণা করলেন যে, আমি আদেশ না দেয়া পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ শুরু করবে না। তিনি সেদিন দুটি বর্ম পরিধান করেছিলেন। সাহাবাদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, শত্রুর সাথে মোকাবেলার সময় বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দেবে।

---

৮. সহীহ বোখারী, কিতাবুল জেহাদ, প্রথম খন্ড, পৃ. ৪২৬।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের মধ্যে উদ্দীপনা ও জেহাদী জযবা, জো'শ সৃষ্টি প্রাক্কালে একটি ধারালো তলোয়ার খাপমুক্ত করে বললেন, এই তলোয়ার খাপমুক্ত করে এর হক আদায় করতে পারবে এমন কে আছে? একথা শুনে কয়েকজন সাহাবা তলোয়ার নেয়ার জন্যে অগ্রসর হলেন। এদের মধ্যে হযরত আলী ইবনে আবু তালেব, হযরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম এবং ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-ও ছিলেন। হযরত আবু দোজানা সাম্মাক ইবনে খায়শা (রা.) সামনে অগ্রসর হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, এর হক কী? প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই তরবারি দিয়ে শত্রুর চেহারায় এমনভাবে আঘাত করবে যেন, সে চেহারা বাঁকা হয়ে যায়। হযরত আবু দোজানা (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমি এই তলোয়ার গ্রহণ করে এর হক আদায় করতে চাই। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তলোয়ার হযরত আবু দোজানা (রা.)-এর হাতে দিলেন।

হযরত আবু দোজানা (রা.) ছিলেন নিবেদিত প্রাণ সৈনিক। লড়াই-এর সময় বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করতেন। তাঁর কাছে একটি লাল পট্টি ছিলো। সেটি বেঁধে নিলে লোকে বুঝতো যে, এবার তিনি আমৃত্যু লড়াই করবেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেয়া তলোয়ার গ্রহণ করে তিনি মাথায় পট্টি বেঁধে মুসলমান ও কাফের সৈন্যদের মাঝখান দিয়ে বুক টান করে হাঁটতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ ধরনের চলাচল আল্লাহ রব্বুল আলামীন পছন্দ করেন না, কিন্তু এই ক্ষেত্রে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য নয়।

মক্কা থেকে আগত সৈন্যদের বিন্যস্তকরণ

মোশরেকরা কাতারবন্দী করে সৈন্য সমাবেশ করলো। তাদের প্রধান ছিলো আবু সুফিয়ান। সৈন্যদের মাঝামাঝি জায়গায় সে নিজের কেন্দ্র তৈরী করলো। ডানদিকে ছিলো খালেদ ইবনে ওলীদ। বাঁ দিকে ছিলো ইকরামা ইবনে আবু জেহেল। পদাতিক সৈন্যদের নেতৃত্বে ছিলো সফওয়ান ইবনে উমাইয়া। আর তীরন্দাজ সৈন্যদের মোকাবেলায় আবদুল্লাহ ইবনে রবিয়াকে নিযুক্ত করা হলো।

যুদ্ধের পতাকা বহন করছিলো বনু আবদুদ দারের একটি ছোট দল। বনু আবদে মানাফ কুসাই এর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে মর্যাদা পরস্পরের মধ্যে বন্টনের সময় বনু আবদুদ দার এই মর্যাদা লাভ করে। গ্রন্থের প্রথমদিকে এ সম্পর্কিত বিবরণ বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। পূর্বপুরুষ থেকে শুরু করে প্রচলিত এ রীতি সম্পর্কে কেউ কোন প্রকার কলহ সৃষ্টিও করতে পারত না। কিন্তু আবু সুফিয়ান তাদের স্মরণ করিয়ে দিলো যে, বদরের যুদ্ধে নিশান বরদার নযর ইবনে হারেস গ্রেফতার হওয়ার পর কোরায়শদের কিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। সেকথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার সাথে সাথে আবু সুফিয়ান নিশান বরদারদের ক্রোধের উদ্রেক করার জন্যে বললো, হে বনু আবদুদ দার, বদরের যুদ্ধের দিনে আপনারাই আমাদের পতাকা বহন করছিলেন। কিন্তু সেই সময় আমাদেরকে কিরূপ পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হয়েছিলো, সেটা আপনারা দেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধের পতাকাই হচ্ছে যুদ্ধের প্রাণ। পতাকা পতিত হলে সাধারণ সৈন্যদের পদস্খলন ঘটে। এবার আপনারা হয় আমাদের পতাকা ভালোভাবে রক্ষা করবেন, অথবা একে বহন করা থেকে বিরত থাকবেন। আমরা নিজেরাই এটি বহনের ব্যবস্থা করবো। এই বক্তব্যের মধ্যে আবু সুফিয়ানের যে উদ্দেশ্য ছিলো, তা সফল হলো। তার জ্বালাময়ী কথা শুনে বনু আবদুদ দারের মনে প্রচন্ড ক্রোধের উদ্রেক হলো। আমরা পতাকা তোমাদের হাতে তুলে দেবো? আগামীকাল লড়াই শুরু হলে দেখে নিও, আমরা কি করি। পরদিন যুদ্ধ শুরু হলে বনু আবদুদ দারের প্রতিটি লোক দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার সাথে পতাকা ধরে রাখলো। তবে শেষ পর্যন্ত একে একে সবাই জাহান্নামে পৌঁছে গেলো।

কোরায়শদের রাজনৈতিক চালবাজি

যুদ্ধ শুরুর কিছুক্ষণ আগে কোরায়শরা মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে ভাঙ্গন এবং পারস্পরিক কলহ সৃষ্টির চেষ্টা করলো। আবু সুফিয়ান আনসারদের কাছে পয়গাম পাঠালো যে, আপনারা যদি আমাদের এবং আমাদের চাচাতো ভাই মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাঝখান থেকে সরে যান, তবে আমরা আপনাদের প্রতি হামলা করবো না। কেননা আপনাদের সাথে লড়াই করার কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। কিন্তু যে ঈমানের সামনে পাহাড়ও টিকতে পারে না তার সামনে এ ধরনের কূটনৈতিক চাল কিভাবে সফল হতে পারে? আনসাররা আবু সুফিয়ানকে কঠোর ভাষায় জবাব পাঠিয়ে কিছু রূঢ় কথাও শুনিয়ে দিলেন।

পরস্পরের কাছাকাছি হওয়ার পর কোরায়শরা আরেকটি কূট চালের আশ্রয় নিলো। কাফেরদের ক্রীড়নক ফাসেক আবু আমের মুসলমানদের সামনে হাযির হলো। এই লোকটির নাম আবদে আমর ইবনে সাইফী। তাকে রাহেব বলা হতো। কিন্তু রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নাম রেখেছিলেন ফাসেক। এই লোকটি আইয়ামে জাহেলিয়াতে আওস গোত্রের সরদার ছিলো। ইসলামের আবির্ভাবের পর ইসলাম তার গলার কাঁটা হয়ে দেখা দিলো। সে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুতা শুরু করলো। মদীনা থেকে বেরিয়ে সে মক্কায় কোরায়শদের কাছে পৌঁছুলো এবং তাদেরকে যুদ্ধের জন্যে প্ররোচিত ও উদ্বুদ্ধ করলো। সে কাফেরদের এ মর্মেও নিশ্চয়তা প্রদান করলো যে, আমার কওমের যেসব গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে, তারা যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে দেখে আমার কাছে ছুটে আসবে।

মক্কাবাসীদের সাথে আবদে আমর নামের এই লোকটি প্রথমে মুসলমানদের সামনে এসে নিজের কওমের লোকদের আহ্বান জানালো। নিজের পরিচয় প্রকাশ করে সে বললো, হে আওস গোত্রের লোকেরা, আমি আবু আমের। এই পরিচয় শুনে আওস গোত্রের লোকেরা বললো, ওহে ফাসেক, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তোমার চোখকে যেন খুশী নসীব না করেন। একথা শুনে আবু আমের বললো, ওহে আমার কওম, আমি চলে যাওয়ার পর খারাপ হয়ে গেছো। পরে যুদ্ধ শুরু হলে এই লোকটি কাফেরদের পক্ষে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ করছিলো। সে মুসলিম মোজাহেদদের প্রতি প্রচুর পাথর নিক্ষেপ করেছিলো।

এমনিভাবে কোরায়শদের পক্ষ থেকে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির দ্বিতীয় চেষ্টাও ব্যর্থ হলো। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, সংখ্যাধিক্য এবং প্রচুর অস্ত্রবল থাকা সত্ত্বেও পৌত্তলিকদের মনে মুসলমানদের ভয় কতো প্রবল ছিলো এবং মুসলমানদের ব্যক্তিত্বের সামনে তারা নিজেদের কতো ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ মনে করতো।

অমুসলিম নারীদের ভূমিকা

কোরায়শ মহিলারাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলো। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলো আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দ বিনতে ওতবা। যুদ্ধরত সৈন্যদের মাঝে ঘুরে ঘুরে দফ বাজিয়ে বাজিয়ে এসব মহিলা সৈন্যদের উদ্দীপ্ত করে তুলছিলো। যুদ্ধের জন্যে অনুপ্রেরণা দেয়ার পাশাপাশি বর্শা নিক্ষেপ, তলোয়ার এবং তীর ব্যবহারে দক্ষতার পরিচয় দিতে বলছিলো। পতাকাবাহীদের লক্ষ্য করে তারা কবিতার ভাষায় বলছিলো,

'দেখো বনু আবদুদ দার
দেখো তোমরাই উত্তর পুরুষের গৌরব
তলোয়ারের ব্যবহারে দক্ষতা দেখাও।'

নিজ কওমের লোকদের যুদ্ধের জন্যে উদ্বুদ্ধ করে কখনো বলছিলো,

'যদি এগিয়ে যাও, তবে কোলাকুলি করবো

তোমাদের বুকে জড়িয়ে ধরবো।
নরম বিছানা সাজিয়ে দেবো।
যদি পেছনে সরে যাও অভিমান করবো
দূরে চলে যাবো তোমাদের ছেড়ে।'

যুদ্ধের প্রথম ইন্ধন

এরপর উভয় দল মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো এবং যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। কোরায়শদের পক্ষ থেকে তালহা ইবনে আবু তালহা আবদারি সামনে এগিয়ে এলো। এই লোকটি কোরায়শদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বীর হিসাবে পরিগণিত ছিলো। মুসলমানরা তাকে বলতেন সেনাদলের কোলাব্যাঙ। উটের পিঠে সওয়ার হয়ে তালহা তার সাথে মোকাবেলার জন্যে আহ্বান জানালো। তার অসাধারণ বীরত্বের কথা ভেবে সাধারণ মুসলমানরা ইতস্তত করছিলেন। হঠাৎ হযরত যোবায়ের (রা.) সামনে অগ্রসর হয়ে চোখের পলকে বাঘের মতো তালহার উটের উপর লাফিয়ে উঠলেন। পরক্ষণে তালহাকে নিজের কাবুতে এনে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তালহাও নীচে পড়ে গেলো। হযরত যোবায়ের (রা.) তলোয়ার বের করে তালহাকে যবাই করে দিলেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যোবায়ের (রা.)-এর অসীম সাহসিকতা দেখে আনন্দে অভিভূত হয়ে আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিলেন। মুসলমানরাও উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবর। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর হযরত যোবায়ের (রা.)-এর প্রশংসা করে বললেন, 'সকল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একজন 'হাওয়ারী' থাকে, আমার 'হাওয়ারী' হচ্ছে যোবায়ের।'[৯]

সাধারণ যুদ্ধ শুরু ও কাফেরদের বিপর্যয়

এরপর চারদিকে যুদ্ধের দাবানল ছড়িয়ে পড়লো। সমগ্র ময়দানে চললো এলোপাতাড়ি হামলা, জবাবী হামলা। কোরায়শদের পতাকা রণক্ষেত্রের মাঝামাঝি জায়গায় ছিলো। বনু আবদুদ দার তাদের কমান্ডার তালহা ইবনে আবু তালহার হত্যাকান্ডের পর নিজেদের মধ্যে পর্যায়ক্রমে পতাকা বহন করছিলো। কিন্তু একে একে তারা সবাই নিহত হলো। তালহা নিহত হওয়ার পর তার ভাই ওসমান ইবনে আবু তালহা পতাকা হাতে তুলে নিলো এবং সামনে অগ্রসর হয়ে বললো,

'পতাকা বহনকারীর কর্তব্য কঠিন
বর্শা রক্তাক্ত হোক বা ভেঙ্গে যাক'

হযরত হামযা ইবনে আবদুল মোত্তালেব (রা.) ওসমানের ওপর হামলা করলেন। হযরত হামযা (রা.) ওসমানের কাঁধে তলোয়ার দিয়ে এমন আঘাত করলেন যে, ওসমানের হাতসহ স্কন্ধ কেটে নাভির কাছে তরবারি পৌঁছে গেলো। তরবারি বের করার পর তার নাড়িভুড়ি দেখা যাচ্ছিলো।

ওসমানের হত্যাকান্ডের পর আবু সা'দ ইবনে আবু তালহা সামনে এগিয়ে এলো। হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) তাঁর ওপর তীর নিক্ষেপ করলেন। সেই তীর তার গলায় বিদ্ধ হয়ে জিভ বেরিয়ে এলে আবু সা'দ সাথে সাথে ভবলীলা সাঙ্গ করলো। কোন কোন সীরাতুন নবী রচয়িতা লিখেছেন আবু সা'দ এগিয়ে এসে মোকাবেলার আহ্বান জানালে হযরত আলী (রা.) এগিয়ে গেলেন। উভয়ে একে অন্যের ওপর একবার করে আঘাত করলেও হযরত আলী (রা.) অক্ষতই রইলেন। কিন্তু আবু সা'দ নিহত হলো।

আবু সা'দ নিহত হওয়ার পর মোসাফা ইবনে তালহা পতাকা তুলে নিল। কিন্তু হযরত আসেম ইবনে সাবেত ইবনে আবু আফলাহ (রা.) তীর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করলেন।

---

৯. সীরাতে হালবিয়া গ্রন্থের লেখক এ কথা লিখেছেন। হাদীস শরীফে হযরত যোবায়ের (রাঃ) সম্পর্কিত নবী (সঃ)-এর উক্তি অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

মোসাফা নিহত হওয়ার পর তার ভাই অর্থাৎ তালহার পুত্র কেলাব ইবনে তালহা পতাকা বহন করে সামনে এগিয়ে এলো। হযরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) তার সামনে গিয়ে হাযির হয়ে ক্ষণিকের মোকাবেলার পর তাকেও তার পিতার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

পরে পতাকা নিল মোসাফা ও কেলাবের ভ্রাতুষ্পুত্র জিলাস ইবনে আবু তালহা। হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা.) বর্শা নিক্ষেপে তাকে হত্যা করলেন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, জেলাসকে হযরত আসেম ইবনে ছাবেত ইবনে আবু আফলাহ (রা.) তীর নিক্ষেপে হত্যা করেন।

একই পরিবারের ছয়জন পর্যায়ক্রমে নিহত হলো। এরা ছিলো আবু তালহা আবদুল্লাহ ইবনে ওসমান ইবনে আবদুদ দারের পুত্র ও পৌত্র। পৌত্তলিকদের পতাকা বহন ও রক্ষা করতে গিয়ে এরা সবাই প্রাণ হারায়।

এরপর বনু আবদুদ দার গোত্রের আরতাত ইবনে শুরাহবিল নামক আর একটি লোক পতাকা উঠিয়ে নেয়। কিন্তু হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা.), মতান্তরে হযরত হামযা ইবনে আবদুল মোত্তালেব (রা.) তাকে হত্যা করেন। এরপর শুরাইহ ইবনে কারেয পতাকা তুলে ধরে। কিন্তু কুযমান তাকে হত্যা করে। কুযমান ছিলো মোনাফেক এবং ইসলামের পরিবর্তে গোত্রের মর্যাদা রক্ষার প্রেরণায় যুদ্ধ করতে এসেছিলো।

শুরাইহর পর আবু যায়েদ আমর ইবনে আবদে মান্নাফ আবদারী পতাকা তুলে ধরে। কিন্তু কুযমান তাকেও হত্যা করে। তারপর শুরাহবিল ইবনে হাশেম আবদারীর এক পুত্র পতাকা তোলে। কিন্তু কুযমানের হাতে সেও মারা যায়।

বনু আবদুদ দার গোত্রের এই দশ ব্যক্তি যারা পৌত্তলিকদের পতাকা তুলেছিলো তারা সবাই একে একে মারা গেলো। এরপর পতাকা তোলার মত কেউ জীবিত রইল না। কিন্তু সেই সময় মওয়াব নামে তাদের এক ক্রীতদাস পতাকা তুলে নিয়ে তার পূর্ববর্তী পতাকাবাহী মনিবদের চেয়ে অধিক বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে। শেষ পর্যন্ত একে একে তার দু'টি হাত কাটা যায়। কিন্তু হাঁটুর ওপর ভর করে বুক ও কাঁধের সাহায্যে পতাকা তুলে ধরে রাখে। অবশেষে কুযমানের হাতে সেও নিহত হয়। সেই সময় সে বলেছিলো, হে আল্লাহ, এখন তো আমি কোন ওযর অবশিষ্ট রাখিনি। ওই ক্রীতদাস অর্থাৎ মওয়াবই নিহত হওয়ার পর পতাকা মাটিতে পড়ে যায় এবং ওটা ওঠাতে পারে, এমন কেউ বেঁচে ছিলো না। এ কারণে পতাকা মাটিতেই পড়ে রইলো।

একদিকে পৌত্তলিকদের পতাকা বহনের জায়গায় যুদ্ধ চলছিলো, অন্যদিকে ময়দানের বিভিন্ন অংশে তুমুল যুদ্ধ চলছিলো। মুসলমানদের প্রাণে ঈমানের তেজ ছিলো শক্তিশালী। এ কারণে তারা কাফেরদের ওপর স্রোতের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছিলেন। তারা উচ্চারণ করছিলেন 'আমতে আমেত' অর্থাৎ মরণ, মরণ।

হযরত আবু দোজানা (রা.) মাথায় লাল পট্টি বেঁধে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তলোয়ার হাতে নিয়ে সেই তলোয়ারের হক আদায় করছিলেন। তিনি লড়াই করতে করতে অনেক দূরে চলে যাচ্ছিলেন। তিনি যে বিধর্মীর সাথে লড়ছিলেন, তাকেই দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিচ্ছিলেন। কাফেরদের কাতারের পর কাতার তিনি সাফ করে ফেললেন।

হযরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) বলেন, আমি যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তলোয়ার চেয়েছিলাম, তিনি আমাকে দেননি। এতে আমার মন খারাপ হয়ে গেলো। মনে মনে ভাবলাম, আমি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফু হযরত সফিয়া (রা.)-এর সন্তান, আমি কোরায়শ বংশোদ্ভুত এবং তাঁর কাছে গিয়ে আবু দোজানার আগেই আমি তলোয়ার চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে তলোয়ার দিলেন না, দিলেন আবু দোজানাকে। কাজেই আল্লাহর শপথ, আমি লক্ষ্য করবো, আবু দোজানা সেই তলোয়ার নিয়ে কি এমন বীরত্ব দেখায়। এরপর আমি আবু দোজানার পেছনে লেগে রইলাম। আবু দোজানা প্রথমে মাথায় লালপট্টি বাঁধলেন। এটা দেখে আনসাররা বললেন, আবু দোজানা মৃত্যুর পট্টি বের করে নিয়েছে। এরপর তিনি ময়দানের দিকে এই কবিতা আবৃত্তি করতে করতে অগ্রসর হলেন,

'ঐ পাহাড়ের পাদদেশে আমি আমার বন্ধুর সাথে অঙ্গীকার করেছি।
কখনো আমি কাতারের পেছনে থাকবো না
সামনে গিয়ে আল্লাহ ও তাঁর তলোয়ার চালাতে থাকবো'

এই কবিতা আবৃত্তি করতে করতে হযরত আবু দোজানা যাকে সামনে পেতেন তাকেই হত্যা করতেন। একজন কাফের রণক্ষেত্রে ঘুরে ঘুরে আহত মুসলমানদের হত্যা করছিলো। এই লোকটি এবং হযরত আবু দোজানা (রা.) ক্রমেই নিকটতর হচ্ছিলো। আমি মনে মনে কামনা করলাম, আল্লাহ করুন উভয়ের মধ্যে যেন সংঘর্ষ বেধে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে গেলো। ওরা একে অন্যের ওপর হামলা করলো। প্রথমে মোশরেক লোকটি হযরত আবু দোজানা (রা.)-এর ওপর হামলা করলো। তিনি সেই হামলা ঢালের ওপর প্রতিরোধ করলেন। মোশরেকের তরবারি সেই ঢালে আটকে গেলো। এরপর হযরত আবু দোজানা (রা.) তরবারির এক আঘাতে পৌত্তলিককে জাহান্নামে ঠেলে দিলেন।[১০]

এরপর হযরত আবু দোজানা (রা.) কাতারের পর কাতার ছিন্ন ভিন্ন করে সামনে এগিয়ে গেলেন। এক সময় কোরায়শী নারীদের নেত্রীর কাছে গিয়ে পৌঁছুলেন। তিনি জানতেন না যে, ওরা নারী। তিনি বলেছেন, আমি দেখলাম একজন লোক যোদ্ধাদের আরো বেশী সাহসিকতার পরিচয় দেয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করছে। আমি তাকে নিশানা করলাম। কিন্তু তলোয়ার দিয়ে হামলা করতে চাইলে সে মরণ চিৎকার দিয়ে উঠলো। এই চিৎকার শুনে হযরত আবু দোজানা (রা.) বুঝলেন যে, সে মহিলা। তিনি বলেন, আমি ভাবলাম, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তলোয়ার দিয়ে কোন মহিলাকে হত্যা করে এই তলোয়ার কলঙ্কিত করবো না।

এই মহিলা ছিলো নাম হেন্দ বিনতে ওতবা। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী। হযরত যোবায়ের (রা.) বলেন, আমি দেখলাম. হযরত আবু দোজানা (রা.) হেন্দের মাথার ওপর তরবারি উঠিয়ে পুনরায় নামিয়ে ফেললেন। আমি তখন বললাম, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভালো জানেন।[১১]

এদিকে হযরত হামযা (রা.) ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মতো লড়াই করছিলেন। তুলনাবিহীন বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে তিনি শত্রুদের ব্যূহ ভেদ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর সামনে বড় বড় বীর বাহাদুর কালবৈশাখীর ঝড়ে উড়ে যাওয়া পাতার মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিলো। পৌত্তলিকদের নিশ্চিহ্ন করার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালনে তিনি রণক্ষেত্রে কাফেরদের জন্যে ত্রাস হয়ে উঠেছিলেন। কিছুসংখ্যক পৌত্তলিক এই অবস্থা দেখে তাঁর সামনে গিয়ে মোকাবেলা করার সাহস না পেয়ে ভীরু কাপুরুষের মতো তাঁকে চুপিসারে আঘাত করলো। সেই আঘাতে সাইয়েদুশ শোহাদা হযরত হামযা (রা.) লুটিয়ে পড়লেন।

শেরে খোদা হযরত হামযা (রা.)-এর শাহাদাত

হযরত হামযা (রা.)-এর আততায়ীর নাম ছিলো ওয়াহশী ইবনে হারব। আমরা হযরত হামযা (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনা আততায়ীর ওয়াহশীর ভাষায়ই প্রকাশ করছি। মুসলমান হবার পর তিনি বলেন, আমি ছিলাম যোবায়ের ইবনে মোয়াত্তামের ক্রীতদাস। তার চাচা তুয়াইমা ইবনে আদী বদরের যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। কোরায়শরা ওহুদ যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে যোবায়ের ইবনে মোয়াত্তাম আমাকে বললেন, যদি তুমি মোহাম্মদের চাচা হামযাকে আমার চাচার হত্যার প্রতিশোধস্বরূপ হত্যা করতে পারো, তবে তুমি মুক্তি পাবে। এই প্রস্তাব পাওয়ার পর কোরায়শদের সাথে ওহুদের যুদ্ধের জন্যে আমি রওয়ানা হলাম। আমি ছিলাম আবিসিনিয়ার অধিবাসী। আবিসিনীয়দের মতো আমিও ছিলাম বর্শা নিক্ষেপে সুদক্ষ। আমার নিক্ষিপ্ত বর্শা কম

---

১০. ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৫৮-৬৯

১১. ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৬৯

সময়েই লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো। ব্যাপকভাবে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার পর আমি হযরত হামযা (রা.)-কে খুঁজতে শুরু করলাম। এক সময় তাঁকে দেখতেও পেলাম। তিনি জেদী উটের মতো সামনের লোকদের ছিন্নভিন্ন করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর সামনে কোন বাধাই টিকতে পারছিলো না। কেউ তাঁর সামনে দাঁড়াতেই পারছিলো না।

আল্লাহর শপথ, আমি হযরত হামযা (রা.)-এর ওপর হামলার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলাম এবং একটি পাথর অথবা বৃক্ষের আড়ালে ছিলাম, এমন সময় সাবা ইবনে আবদুল ওযযা আমাকে ডিঙ্গিয়ে তাঁর কাছে পৌঁছে গেলো। হযরত হামযা (রা.) হুঙ্কার দিয়ে সাবাকে বললেন, ওরে লজ্জাস্থানের চামড়া কর্তনকারীর সন্তান এই নে। একথা বলে তিনি সাবার ঘাড়ে এমনভাবে তরবারির আঘাত করলেন এবং তার মাথা এমনভাবে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো যেন তার ঘাড়ে মাথা ছিলোই না। আমি তখন বর্শা তুলে হযরত হামযা (রা.)-এর প্রতি নিক্ষেপ করলাম। বর্শা নাভির নীচে বিদ্ধ হয়ে দুই পায়ের মাঝখান দিয়ে পেছনে পৌঁছে গেলো। তিনি পড়ে গিয়ে উঠতে চাইলেন কিন্তু সক্ষম হননি। তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত আমি তাকে যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় রেখে দিলাম। এক সময় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। আমি তখন তাঁর কাছে গিয়ে বর্শা বের করে কোরায়শদের মধ্যে গিয়ে বসে রইলাম। হযরত হামযা (রা.) ছাড়া অন্য কাউকে আঘাত করার কোন ইচ্ছা ও প্রয়োজনই আমার ছিলো না। আমি মুক্তি পাওয়ার জন্যেই হযরত হামযা (রা.)-কে হত্যা করেছি। এরপর মক্কা ফিরে এসেই আমি মুক্তি লাভ করলাম।[১২]

মুসলমানদের সাফল্য

শেরে খোদা শেরে রসূল হযরত হামযা (রা.)-এর শাহাদাতে মুসলমানদের মারাত্মক ও অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও যুদ্ধে মুসলমানদের সাফল্যের লক্ষণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। হযরত আবু বকর, হযরত ওমর, হযরত আলী, হযরত যোবায়ের, হযরত মসআব ইবনে ওমাইয়ের, হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লা, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ, হযরত সা'দ ইবনে মায়া'য, হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা, হযরত সা'দ ইবনে রবি, হযরত নযর ইবনে আনাস (রা.) এমন বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে লড়াই করলেন যে, কাফেরদের পিলে চমকে গেলো, মনোবল ভেঙ্গে পড়লো, তাদের শক্তি সাহস শিথিল হয়ে গেলো।

বাসর শয্যা থেকে জেহাদের ময়দানে

নিবেদিত প্রাণ মোজাহেদদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত হানযালা (রা.)। তিনি আজ এক অনন্য গৌরবের সাথে জেহাদের ময়দানে হাযির হয়েছেন। তিনি ছিলেন আবু আমের রাহেবের পুত্র। পরে আবু আমের ফাসেক উপাধি পায়। তার পরিচয় ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত হানযালা (রা.) নতুন বিয়ে করেছিলেন। জেহাদের জন্যে যখন আহ্বান জানানো হচ্ছিলো, তখন তিনি ছিলেন বাসর শয্যায়। জেহাদের আহ্বান পাওয়ার সাথে সাথে তিনি জেহাদের জন্যে রওয়ানা হয়ে যান। যুদ্ধ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ার পর হযরত হানযালা (রা.) কাফেরদের ব্যূহ ভেদ করে তীব্র বেগে আবু সুফিয়ানের কাছে হাযির হন। কাফের সেনাপতিকে তিনি আঘাত করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর শাহাদাত নির্ধারিত করে রেখেছিলেন। আবু সুফিয়ানকে লক্ষ্য করে তলোয়ার তোলার সাথে সাথে শাদ্দাদ ইবনে আওস দেখে ফেলে এবং হযরত হানযালা (রা.)-এর ওপর আকস্মিক হামলা চালায়। এতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

---

১২. ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্টা. ৬৯-৭২। সহীহ বোখারী দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্টা ৫৮৩। তায়েফের যুদ্ধের পর ওয়াহশী ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত হামযা (রাঃ)-কে যে বর্শার আঘাতে হত্যা করেছিলেন, সেই বর্শা দিয়ে তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রাঃ) খেলাফতের সময়ে ইয়ামামার যুদ্ধে মোসায়লামা কাযযাবকে হত্যা করেন। রোমকদের বিরুদ্ধে সংঘটিত ইয়ারমুকের যুদ্ধেও তিনি অংশ গ্রহণ করেন।

তীরন্দাজদের কৃতিত্ব

জাবালে রুমাতে যেসকল তীরন্দাজকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দিষ্ট দায়িত্বে নিযুক্ত করেছিলেন তারা যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় ও সাফল্য নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মক্কায় অমুসলিমরা খালেদ ইবনে ওলীদের নেতৃত্বে এবং আবু আমের ফাসেক এর সহায়তায় ইসলামী ফৌজের বাম বাহু ভেঙ্গে মুসলমানদের পরাজিত করতে পর্যায়ক্রমে তিনবার হামলা চালায়। কিন্তু মুসলমানরা তাদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। তীর বর্ষণ করে তারা কোরায়শদেরকে ঝাঁঝরা করে দেয়।[১৩]

মোশরেকদের পরাজয়

কিছুক্ষণ যাবত তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। স্বল্পসংখ্যক মুসলমানের এ বাহিনী সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রে ছেয়ে থাকে। অবশেষে পৌত্তলিকদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। তাদের মধ্যে পিছু হটার ভাবনা দেখা দেয়। তারা ডানে বামে সামনে পেছনে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। তিন হাজার সৈন্যের মোকাবিলায় মুসলমানরা যুদ্ধ করছিলো। তারা ঈমান, একিন, বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে তলোয়ার চালনার জওহর প্রদর্শন করছিলেন।

মুসলমানদের অপ্রতিরোধ্য হামলার মুখে কাফেররা দিশেহারা হয়ে পড়লো। তারা কি করবে কিছুই স্থির করতে না পেরে পলায়ন শুরু করলো। যুদ্ধের পতাকাবাহীদের শোচনীয় পরিণতি দেখে কেউ আর সে পতাকা ধরে রাখতে সাহস পাচ্ছিলো না। তাদের মনোবল ভেঙ্গে গেলো। মুসলমানদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ, নিজেদের মর্যাদা ও সম্মান পুনদ্ধার ইত্যাদি যতো বড় বড় কথা তারা বলেছিলো, সব এলোমেলো হয়ে গেলো।

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের ওপর তাঁর সাহায্য নাযিল করেছেন এবং যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তা পূর্ণ করেছেন। মুসলমানরা তলোয়ারের মাধ্যমে পৌত্তলিকদের এমনভাবে কচুকাটা করলো যে, ওরা শিবির ছেড়েও দূরে পালিয়ে গেলো। মোটকথা তারা শোচনীয় পরাজয়ের সম্মুখীন হলো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা.) বলেন, তাঁর পিতা বলেছেন, আল্লাহর শপথ, আমি লক্ষ্য করেছি যে, হেন্দ বিনতে ওতবা এবং তার সঙ্গিনী মহিলাদের হাঁটু দেখা যাচ্ছে। তারা কাপড় তুলে ছুটে পালাচ্ছিলো। তাদের গ্রেফতার করার ব্যাপারে ছোট বড় কোন অন্তরায়ই ছিলো না।[১৪]

সহীহ বোখারীতে হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, কাফেরদের সঙ্গে আমাদের মোকাবেলা হলে তাদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে যায়। মহিলাদের আমি দেখলাম, ওরা হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে দ্রুত পাহাড়ি এলাকায় পালিয়ে যাচ্ছে। তাদের পায়ের অধিকাংশ দেখা যাচ্ছিলো।[১৫] এ ধরনের বিশৃঙ্খলা ও হট্টগোলের মধ্যে মুসলমানরা পৌত্তলিকদের ওপর তলোয়ার চালাচ্ছিলেন এবং মালামাল সংগ্রহ করে তাদের তাড়া করছিলেন।

তীরন্দাজদের আত্মঘাতী ভুল

স্বল্পসংখ্যক মুসলমান মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে যখন ইতিহাসের পাতায় এক বৈশিষ্টপূর্ণ বিজয় চিহ্নিত করছিলেন, ঠিক তখনই তীরন্দাজদের অধিকাংশ ব্যক্তি এক ভয়াবহ ভুল করে ফেললেন। অথচ মুসলমানদের সাফল্য এই যুদ্ধে বদরের যুদ্ধের চেয়ে কোন অংশে কম ছিলো না। কিন্তু তীরন্দাজদের এক ভয়াবহ ভুলে যুদ্ধের চিত্রই পরিবর্তিত হয়ে গেলো। মুসলমানরা মারাত্মক ক্ষতির

---

[১৩]. দেখুন ফতহুল বারী, সপ্তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৪৬

[১৪]. ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা. ৭৭

[১৫]. সহীহ বোখারী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা. ৫৭৯

সম্মুখীন হলেন। স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাহাদাত বরণ থেকে অল্পের জন্যে রক্ষা পেলেন। এই ভুলের কারণে বদরের যুদ্ধে অর্জিত মুসলমানদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়ে পড়েছিলো।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজয় ও পরাজয় উভয় অবস্থাতেই তীরন্দাজদের স্বস্থানে অটল ও অবিচল থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কঠোর নির্দেশ সত্তেও অন্য মুসলমানদের গনীমতের মালামাল সংগ্রহ করতে দেখে তীরন্দাজরা লোভ সামলাতে পারল না। একে অন্যকে বললেন, গনীমত, গনীমত। তোমাদের সঙ্গীরা জয়ী হয়েছে, এখন আর কিসের প্রতীক্ষা।

তীরন্দাজদের মধ্যে থেকে এ ধরনের আওয়ায ওঠার পর তাদের কমান্ডার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) তাদেরকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন, তোমরা কি ভুলে গেছো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের কি আদেশ দিয়েছেন? কিন্তু অধিকাংশ তীরন্দাজ হযরত আবদুল্লাহর (রা.) কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলেন না। তারা বললেন, আল্লাহর শপথ, আমরাও ওদের কাছে যাবো এবং কিছু গনীমতের কিছু মাল অবশ্যই সংগ্রহ করবো।[১৬]

এরপর চল্লিশজন তীরন্দাজ নিজেদের দায়িত্ব উপেক্ষা করে গনীমতের মাল সংগ্রহ শুরু করলেন। আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাবের (রা.) এবং তাঁর নয় জন সঙ্গী পাহারায়ই নিযুক্ত রইলেন। তাঁরা দৃঢ় সংকল্পের সাথে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তাঁরা বলছিলেন, এখান থেকে যাওয়ার জন্যে যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তখনই যাবো অথবা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করবো।

শত্রুদের নিয়ন্ত্রণে মুসলিম সেনাদল

খালেদ ইবনে ওলীদ এই গিরিপথে এসে তিনবার ব্যর্থ হয়ে ফিরে গিয়েছিলো। এবার এ সুবর্ণ সুযোগ সে হাতছাড়া করলো না। অল্পক্ষণের মধ্যে খালেদ আবদুল্লাহ ইবনে জাবের (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের নিহত করে মুসলমানদের ওপর পেছনের দিক থেকে হামলা করলো। খালেদ ইবনে ওলীদের সঙ্গীরা উচ্চস্বরে শ্লোগান দিলো। এতে পরাজিত কাফেররা যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হলো এবং মুসলমানদের ওপর পুনোরোদ্যামে হামলা চালালো। এদিকে বনু হারেস গোত্রের আসরাহ বিনতে আলকামা নামের এক মহিলা কাফেরদের ধুলি ধুসরিত পতাকা উচ্চে তুলে ধরলো। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কাফেররা তার চারদিকে জড়ো হতে শুরু করলো। একে অন্যকে ডেকে সজাগ করলো। ফলে অল্পক্ষণের মধ্যেই কাফেররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই শুরু করলো। মুসলমানরা তখন সামনে এবং পেছনে উভয় দিক থেকেই ঘেরাও-এর মধ্যে পড়ে গেলো। মনে হয় যেন, যাঁতাকলের মাঝখানে তাদের অবস্থান।

আল্লাহর রসূলের কঠোর সিদ্ধান্ত ও সাহসী পদক্ষেপ

সেই সঙ্কট সন্ধিক্ষণে মাত্র নয় জন সাহাবী নবী হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলেন। তারা সাহাবাদের শৌর্যবীর্য এবং শত্রুদের তৎপরতা লক্ষ্য করছিলেন।[১৮] হঠাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খালেদ ইবনে ওলীদের সওয়ারী দেখতে পেলেন। এরপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দু'টি পথ খোলা ছিলো। নয়জন

---

১৬. সহীহ বোখারীতে একথা হযরত বারা ইবনে আজেব (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে, পৃষ্ঠা ৪২৬ দেখুন,

১৮. এর প্রমাণ এই আয়াত। এতে আল্লাহ পাক বলেন, রসূল তোমাদের পেছনে থেকে তোমাদের ডাকছিলেন।

সঙ্গীসহ নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়া এবং শত্রুদের নিয়ন্ত্রণে থাকা সাহাবাদের তাদের ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দেয়া। অথবা নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিচ্ছিন্ন সাহাবাদের ডেকে একত্রিত করে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যুহ তৈরী করে কাফেরদের ঘেরাও ছাড়িয়ে অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় যাওয়ার পথ করে নেয়া।

পরীক্ষার এহেন কঠিন সময়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুলনাবিহীন বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিলেন। জীবন রক্ষার জন্যে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার চিন্তা বাদ দিয়ে তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে সাহাবাদের প্রাণ রক্ষার সিদ্ধান্ত নিলেন।

খালেদ ইবনে ওলীদের সওয়ারী এবং তার সঙ্গীদের দেখে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের উচ্চস্বরে ডেকে বললেন, হে আল্লাহর বান্দারা, এদিকে আসো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতেন এই আওয়ায মুসলমানদের কানে যাওয়ার আগে কাফেরদের কানে গিয়ে পৌঁছুবে। হলোও তাই, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আওয়ায শুনে কাফেররা বুঝতে পারলো যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানেই রয়েছেন। এটা বোঝার পর একদল কাফের মুসলমানদের আগেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে গেলো। অন্যান্য কাফেররা দ্রুত মুসলমানদের ঘেরাও করতে লাগলো। এবার আমরা উভয় বাহিনীর তৎপরতা সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে আলোকপাত করবো।

মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা

কাফেরদের ঘেরাও-এর মধ্যে পড়ে যাওয়ার পর একদল মুসলমান কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। নিজের জীবন রক্ষার চিন্তাও তাদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিলো। ফলে তারা রণক্ষেত্র থেকে পলায়নের পথ ধরলো। পেছনে কি হচ্ছে, সে সম্পর্কে তারা কিছু জানতো না। এদের মধ্যেকার কয়েকজন মদীনায় গিয়ে উঠলেন, কয়েকজন পাহাড়ের ওপরে আশ্রয় নিলেন। অন্য একদল পেছনের দিকে গিয়ে কাফেরদের সাথে মিশে গেলেন। কে যে কাফের আর কে যে মুসলমান সেটা চিহ্নিত করা যাচ্ছিলো না। এর ফলে মুসলমানদের হাতে মুসলমানরা নিহত হতে লাগলো। সহীহ বোখারীতে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, ওহুদের দিনে মোশরেকদের পরাজয় হয়েছিলো। এরপর ইবলিস এসে আওয়ায দিলো যে, ওহে আল্লাহর বান্দারা, পেছনে যাও। এতে সামনের কাতারের লোকেরা পেছনের দিকে গেলো এবং পরস্পর সম্পৃক্ত হয়ে পড়লো। হযরত হোযায়ফা (রা.) লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর পিতা ইয়ামানের ওপর হামলা করছে। তিনি বললেন, ওহে আল্লাহর বান্দারা, এ হচ্ছে আমার পিতা। কিন্তু আল্লাহর শপথ, লোকেরা তার ওপর থেকে হাত নামিয়ে নেয়নি। শেষ পর্যন্ত তাকে মেরেই ফেললো। হযরত হোযায়ফা (রা.) তখন বললেন, আল্লাহ রব্বুল আলামীন আপনাদের মাগফেরাত করুন। হযরত ওরওয়া (রা.) বলেন, আল্লাহর শপথ, হযরত হোযায়ফা (রা.) সব সময় কল্যাণের ওপর অবিচল ছিলেন। এই অবস্থায় তিনি আল্লাহর সাথে গিয়ে মিলিত হন।।[১৯]

মোটকথা এই দলের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থা দেখা দেয়। অনেকে ছিলেন বিস্ময়াভিভূত। তারা বুঝতে পারছিলেন না যে, কোনদিকে যাবেন। সেই সময় এক ব্যক্তি

---

১৯. সহীহ বোখারী প্রথম খন্ড, ৫৩৯ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় খন্ড ৫৮১ পৃষ্ঠা, ফতহুল বারী সপ্তম খন্ড, ৩২৫১, ৩৬২, ৩৬৩ পৃষ্ঠা বোখারী ছাড়াও কোন কোন বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, রসূলে করিম (স.) হযরত হোযায়ফা (রা.)-এর পিতার হত্যাকান্ডের ক্ষতিপূরণ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হযরত হোযায়ফা (রা.) বললেন, আমি সেই ক্ষতিপূরণ মুসলমানদের ওপর সদকা করে দিলাম। এ কারণে নবী করিম (স.)-এর কাছে হযরত হোযায়ফা (রা.)-এর গুরুত্ব ও মর্যাদা বেড়ে গিয়েছিলো। দেখুন শেষ আবদুল ওয়াহাব নাজদির লেখা মুখতাসারুস সিয়ার, পৃ. ২৪৬।

উচ্চস্বরে ঘোষণা করলো যে, মোহাম্মদকে হত্যা করা হয়েছে। এতে মুসলমানদের অবশিষ্ট মনোবলও নষ্ট হয়ে গেলো। কোন কোন মুসলমান এ ঘোষণা শোনার পর যুদ্ধ করা বন্ধ করে হতোদ্যম হয়ে হাতের অস্ত্র ছুঁড়ে ফেললেন। কিছুসংখ্যক মুসলমান এতোটুকু পর্যন্ত ভাবলো যে, মোনাফেক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে বলা হোক যে, আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে আমাদের জন্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করো।

এই লোকদের কাছ দিয়ে কিছুক্ষণ পর হযরত আনাস ইবনে নযর (রা.) যাচ্ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, বেশ কয়েকজন সাহাবী চুপচাপ বসে আছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কার প্রতীক্ষায় রয়েছ? তারা জবাব দিলেন, রসূলুল্লাহকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করা হয়েছে। হযরত আনাস ইবনে নযর বললেন, তাহলে তোমরা বেঁচে থেকে কি করবে ? ওঠো, যে কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবন দিয়েছেন, সেই একই কারণে তোমরাও জীবন দাও। এরপর বললেন, হে আল্লাহ রব্বুল আলামীন, ওরা অর্থাৎ এই মুসলমানরা যা কিছু করেছে, তা থেকে আমি তোমার দরবারে পানাহ চাই। একথা বলে তিনি সামনের দিকে অগ্রসর হলেন। সামনে যাওয়ার পর হযরত সা'দ ইবনে মায়া'য (রা.) এর সাথে দেখা হলো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আবু ওমর কোথায় যাচ্ছেন? হযরত আনাস (রা.) বললেন, জান্নাতের সুবাসের কথা কি আর বলবো। হে সা'দ, ওহুদ পাহাড়ের ওপার থেকে জান্নাতের সুবাস অনুভব করছি। একথা বলার পর হযরত আনাস (রা.) আরো সামনে এগিয়ে গেলেন এবং কাফেরদের সাথে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। যুদ্ধশেষে তাঁকে সনাক্ত করাই সম্ভব হচ্ছিলো না। তাঁর বোন তাঁর আঙ্গুলের ফাঁক দেখে তাঁকে সনাক্ত করেছিলো। বর্শা, তীর ও তলোয়ার দিয়ে তাঁর পবিত্র দেহে আশিটি আঘাত করা হয়েছিলো।[২০]

হযরত ছাবেত ইবনে দাহদাহ (রা.) মুসলমানদের সম্বোধন করে বললেন, মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যদি হত্যা করা হয়েই থাকে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তো যিন্দা রয়েছেন। তিনি তো চিরঞ্জীব। তোমারা নিজেদের দ্বীনের জন্যে লড়ো। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তোমাদেরকে বিজয় ও সাহায্য দান করবেন।

এই আহবান জানানোর পর একদল আনসার জেহাদের জন্যে পুনরায় প্রস্তুত হলেন। হযরত ছাবেত (রা.) তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে খালেদ ইবনে ওলীদের বাহিনীর ওপর হামলা করে লড়াই করতে করতে এক সময় খালেদ ইবনে ওলীদের হাতে নিহত হলেন। তাঁকে বর্শার আঘাতে হত্যা করা হয়। তাঁর মতোই তাঁর সঙ্গী আনসাররাও লড়াই করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন।[২১]

একজন মোহাজের সাহাবী রক্তাক্ত একজন আনসার সাহাবীর কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মোহাজের সাহাবী বললেন, ও ভাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিহত হয়েছেন ? আনসারী বললেন, মোহাম্মদ যদি নিহত হয়েই থাকেন, তবে তিনি তো আল্লাহর দ্বীন পৌঁছে দিয়েছেন। এখন সেই দ্বীনের হেফাযতের জন্যে লড়াই করা তোমাদের দায়িত্ব।[২২]

এ ধরনের সাহস প্রদান এবং উদ্দীপনাময় কথায় ইসলামী বাহিনী চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। তারা অস্ত্র ফেলে দেয়া এবং মোনাফেক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মধ্যস্থতায় কাফের আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা চাওয়ার পরিবর্তে অস্ত্র তুলে নিলেন। এরপর

---

২০ যাদুল-মায়াদ। দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯২-৯৩। সহী বোখারী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৭৯।

২১. আস সিরাতুল হালাবিয়াহ দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ২২

২২.. যাদুল-মায়াদ। দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৯

কাফেরদের দুর্ভেদ্য ঘেরাও ভেদ করে নিজেদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে পৌঁছে যাওয়ার পথ তৈরীর চেষ্টা করতে লাগলেন। এমন সময় শোনা গেলো যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হত্যাকান্ডের খবর একটি ভিত্তিহীন গুজব। এতে মুসলমানদের সাহস ও মনোবল বহুগুণ বেড়ে যায় এবং তারা দুর্ধর্ষ লড়াইয়ের মাধ্যমে কাফেরদের বেষ্টনী ভেদ করে নিজেদের শক্তিশালী অবস্থানের কাছে পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়।

ইসলামী বাহিনীর তৃতীয় একটি দল একমাত্র রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিরাপত্তার কথা ভাবছিলেন। এরা কাফেরদের বেষ্টনীর খবর পাওয়ার পরই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে ছুটে গেলেন। এসকল সাহাবার মধ্যে ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.), হযরত ওমর (রা.), হযরত আলী (রা.) প্রমুখ। যুদ্ধক্ষেত্রেও এরা ছিলেন প্রথম সারিতে, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনাশঙ্কা দেখা দেয়ায় তাঁরা তাঁর হেফাযতের জন্যে তাঁর কাছে ছুটে এলেন।

রসূলুল্লাহ (স.)-এর চারপাশে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ

সাহাবায়ে কেরাম কাফেরদের যাঁতাকলের মত বেস্টনীতে এসে যখন পিষ্ট হচ্ছিলেন, সেই একই সময়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আশেপাশেও চলছিলো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাফেরদের বেষ্টনীর শুরুতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারপাশে মাত্র নয়জন সাহাবী ছিলেন। তিনি যখন মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এই আহ্বান জানালেন যে, আমার দিকে এসো, আমি আল্লাহর রসূল। সেই আহ্বান মুসলমানদের আগেই কাফেরদের কানে পৌঁছেছিলো। এতে তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনে ফেলেছিলো। কেননা সে সময় কাফেররা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছেই ছিলো। ফলে তারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর হামলা করে বসলো। মুসলমানদের সমবেত হওয়ার আগেই তারা প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করলো। সে সময় সেই হামলা প্রতিরোধে নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারিপাশে বিদ্যমান নয়জন সাহাবার সাথে কাফেরদের সংঘর্ষ হচ্ছিলো, সাহাবাদের সেই সংঘর্ষে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অসামান্য ভালোবাসা বীরত্ব ও সাহসিকতার দুর্লভ পরিচয় ফুটে উঠে।

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, ওহুদের দিনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক পর্যায়ে ঐ নয়জন সাহাবীর সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এদের মধ্যে ছিলেন সাতজন আনসার এবং দুইজন ছিলেন মোহাজের। আততায়ীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খুব কাছে পৌঁছে যাওয়ার পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, কে আছো, ওদেরকে আমার কাছে থেকে প্রতিরোধ করতে পারো? তার জন্যে জান্নাত রয়েছে। অথবা তিনি বলেছিলেন, সে ব্যক্তি জান্নাতে আমার সাথী হবে। এরপর একজন আনসার সাহাবী সামনে অগ্রসর হলেন এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। মোশরেকরা এরপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরো কাছে পৌঁছে গেলো। প্রতিরোধ যুদ্ধে একে একে সাতজন আনসার সাহাবা শাহাদাত বরণ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সঙ্গের দুইজন মোহাজের কোরায়শী সাহাবাকে বললেন, আমরা আমাদের সঙ্গীদের সাথে সুবিচার করিনি।[২৩]

---

[২৩]. সহীহ মুসলিম, ওহুদ যুদ্ধ অধ্যায়। দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১০৭

উল্লিখিত সাতজন আনসার সাহাবার মধ্যে সর্বশেষ ছিলেন হযরত আম্মারা ইবনে ইয়াযিদ ইবনে সাকান (রা.)। লড়াই করতে করতে তিনিও ক্ষতবিক্ষত হয়ে এক সময় ঢলে পড়লেন।[২৪]

হযরত আম্মারা ইবনে ইয়াযিদের (রা.) ঢলে পড়ার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মাত্র দুইজন কোরায়শী সাহাবা ছিলেন। বোখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু ওসমান (রা.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সময় লড়াই করছিলেন, তার এই লড়াইয়ে তার সঙ্গে হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা.) ব্যতীত অন্য কেউ ছিলেন না।[২৫]

সেই সময় ছিলো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের চরম সঙ্কটময় মুহূর্ত। আর কাফেরদের জন্যে সেটা ছিলো একটা সুবর্ণ সুযোগ। প্রকৃতপক্ষে কাফেররা সেই সুযোগ কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে কোন অলসতাও করেনি। তারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর সর্বাত্মক হামলা চালিয়ে তাঁকে শেষ করেই দিতে চেয়েছিলো। সেই সময়ে ওতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাস রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাথর নিক্ষেপ করেছিলো। সেই আঘাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর নীচের মাড়ির ডানদিকের 'রোবায়ী দাঁত' ভেঙ্গে গিয়েছিলো।[২৬] তাঁর নীচের ঠোঁট কেটে গিয়েছিলো। আবদুল্লাহ ইবনে শেহাব যুহরী সামনে অগ্রসর হয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কপালে আঘাত করলো। আবদুল্লাহ ইবনে কামআহ নামের এক দুর্বৃত্ত দুরাচার সামনে এসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাঁধে তলোয়ারের এমন জোরে আঘাত করলো যে পরবর্তীকালে এক মাস পর্যন্ত তিনি সেই আঘাতের যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন। তবে আঘাত তাঁর দেহের লৌহবর্ম কাটতে পারেনি। দুর্বৃত্ত ইবনে কামআহ তরবারি তুলে প্রিয় নবীকে দ্বিতীয়বার আঘাত করলো। এ আঘাত ডান চোখের নীচের হাড়ে লাগলো এবং দু'টি কড়া চেহারায় বিঁধে গেলো।[২৭]

সাথে সাথে সে দুর্বৃত্ত বললো, এই নাও, আমি কামআহ অর্থাৎ ভাঙ্গনকারীর পুত্র। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পবিত্র মুখমন্ডলের রক্ত মুছতে মুছতে বললেন, আল্লাহ তায়ালা তোকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলুন।[২৮]

---

২৪. পরক্ষণে রসূলে করিম (স.)-এর কাছে একদল সাহাবা এসে পৌঁছে গেলেন। তারা কাফেরদের হযরত আম্মারার (রা) পেছনে সরিয়ে দিলেন এবং হযরত আম্মারা (রা.)-কে রসূলে করিম (স.)-এর কাছে নিয়ে এলেন। নবী করিম (স.) তাঁকে নিজের উরুর উপর শুইয়ে দিলেন। সেই অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। প্রিয় নবীর (স.) চরণ ছোঁয়া অবস্থায় তার শাহাদাতকে কবির ভাষায় বলা যায় 'তোমার পায়ের ওপর যেন আমার মরণ হয়, এইতো আমার মনের আরযু, আর তো কিছুই নয়।

২৫. সহীহ বোখারী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫২৭, দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা ৫৮১।

২৬. মুখের ভেতর উপরের ও নীচের মাড়ির সামনের উপর ও নীচের দু'টি করে দাঁতকে ছানারা বলা হয়। এর ডানের ও বামের দাঁতগুলোকে বলে রোবায়ী।

২৭. লোহা বা পাথরের শিরাস্ত্রাণ। যুদ্ধ চলাকালে মাথা ও মুখমন্ডল নিরাপদ রাখার জন্য এ ধরনের শিরস্ত্রাণ পরিধান করা হয়। শিরস্ত্রাণের দু'টি কড়া তলোয়ারের আঘাতে প্রিয় নবীর (স.) চেহারায় ডানদিকে চোখের নীচে বিঁধে গিয়েছিলো, সোবহানাল্লাহ!

২৮. আল্লাহ রসূলে করিম (স.)-এর এই দোয়া কবুল করেছিলেন। ইবনে আয়েজ বর্ণনা করেছেন, ইবনে কোম্মা যুদ্ধ শেষে ঘরে ফিরে যাওয়ার পর নিজের বকরির খোঁজে বেরোলো। দেখা গেল যে,তার বকরি একটি পাহাড়ে রয়েছে। সে বকরি নামিয়ে আনার জন্য পাহাড়ে উঠলো। হঠাৎ একটি পাহাড়ি বকরি শিং এর আঘাতে তাকে পাহাড়ের নিচে ফেলে দিল। ফতহুল বারী, সপ্তম খন্ড, পৃষ্ঠা, ৩৭৩। তিবরানীর বর্ণনায় রয়েছে যে, আল্লাহ পাক

সহীহ বোখারীতে বর্ণিত আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রোবায়ী দাঁত ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং মাথায় আঘাত করা হয়। সেই সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মুখমন্ডলে প্রবাহিত রক্ত মুছছিলেন আর বলছিলেন, সেই কওম কি করে সফল হতে পারবে, যারা নিজেদের নবীর চেহারা যখমী করে দিয়েছে। তাঁর দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছে। অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পথে দাওয়াত দিচ্ছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একথা বলার পর আল্লাহ রব্বুল আলামীন এই আয়াত নাযিল করেন[২৯], 'তিনি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা তাদের শাস্তি দেবেন, এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছু নেই, কারণ তারা যালেম।' (আলে ইমরান, আয়াত ১২৮)

তিবরানীর বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিন বলেছিলেন, সেই কওমের ওপর আল্লাহর কঠিন আযাব হোক, যারা নিজেদের নবীর চেহারা রক্তাক্ত করে দিয়েছে। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, হে আল্লাহ রব্বুল আলামীন, আমার কওমকে ক্ষমা করো, কেননা ওরা জানে না।[৩০]

সহীহ মুসলিম শরীফেও এ বর্ণনা রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বারবার বলেছিলেন, হে পরওয়ারদেগার, আমার কওমকে ক্ষমা করে দাও, ওরা জানে না।[৩১]

কাজী আয়াযের আশ শাফা গ্রন্থেও একথা উল্লেখ রয়েছে, হে আল্লাহ তায়ালা, আমার কওমকে হেদায়াত দাও, ওরা জানে না।[৩২]

নিসন্দেহে কাফেররা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রাণে মেরে ফেলতে চেয়েছিলো। কিন্তু হযরত তালহা (রা.) এবং হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) তুলনাবিহীন আত্মত্যাগ, অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতার মাধ্যমে কাফেরদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।[৩৩] এরা উভয়ে ছিলেন আরবের সুদক্ষ তীরন্দাজ। তারা তীর নিক্ষেপ করে করে কাফেরদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের (রা.) দক্ষতা ও নৈপুণ্য এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য কোন সাহাবীর ক্ষেত্রে কোন ব্যাপারেই পিতা মাতা উৎসর্গিত অর্থাৎ নিবেদিত হওয়ার কথা বলেননি।[৩৪]

হযরত তালহা (রা.)-কে বীরত্বের বিবরণ নাসাঈ শরীফে বর্ণিত একটি হাদীস থেকে জানা যায়। সেই হাদীসে হযরত জাবের (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর কাফেরদের সেই সময়ের হামলার কথা উল্লেখ করেছেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে মুষ্টিমেয় সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। হযরত জাবের (রা.) বলেন, মোশরেকরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘেরাও করে ফেললে তিনি বলেছিলেন, এদের সাথে লড়াই করার মতো কে আছো? হযরত তালহা (রা.) তখন বললেন, আমি আছি। এরপর হযরত

ইবনে কোম্মার ওপর একটি বকরি লেলিয়ে দিয়েছিলেন। সেই বকরি শিং এর আঘাতে আঘাতে ইবনে কোম্মাকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেললো। ফতহুল বারী সপ্তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৬৬।

২৯. সহি মোসলেম ২য় খন্ড, ১০৮ পৃঃ

৩০. ফহতুল বারী, সপ্তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩২৩।

৩১. সহীহ মুসলিম. ওহুদ যুদ্ধ অধ্যায় দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১০৮।

৩২. কিতাবুশ শাফা তারিফে মোস্তাফা, প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ৮১।

৩৩. সহিহ বোখারী ১ম খন্ড, পৃঃ ৪০৭

৩৪. সহীহ বোখারী, প্রথম খন্ড, ৪০৭ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় খন্ড ৫৮০-৫৮১ পৃষ্ঠা।

জাবের (রা.) আনসারদের সামনে অগ্রসর হওয়া এবং একে একে শহীদ হওয়ার বিবরণ উল্লেখ করেন। সহীহ মুসলিম শরীফের বরাত দিয়ে ইতিপূর্বে আমরা সেই বিবরণ উল্লেখ করেছি।

হযরত জাবের (রা.) বলেন, আনসাররা শহীদ হওয়ার পর হযরত তালহা (রা.) সামনে এগিয়ে একাই এগারজনের সমান বীরত্বের পরিচয় দেন। এক সময় তাঁর হাতে জনৈক কাফেরের তরবারির আঘাত লাগে। এতে তাঁর একটি আঙ্গুল কেটে যায়। সাথে সাথে তিনি 'ইস সি' শব্দ উচ্চারণ করলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি যদি এখন বিসমিল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করতে, তাহলে আল্লাহর ফেরেশতা সকলের সামনে তোমাকে উর্ধে তুলে নিয়ে যেতেন। হযরত জাবের (রা.) বলেন, এরপর আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন।[৩৫]

একাধিক গ্রন্থে হাকেমের বর্ণনায় রয়েছে, ওহুদের দিনে তালহার দেহে উনচল্লিশ বা পঁয়ত্রিশটি আঘাত লেগেছিলো। তাঁর শাহাদাত আঙ্গুলসহ দু'টি আঙ্গুল নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিলো।[৩৬]

ইমাম বোখারী কায়েস ইবনে আবু হাজেম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন, আমি লক্ষ্য করলাম, তালহা (রা.)-এর হাত নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিলো। এই হাত দ্বারা ওহুদের দিনে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষা করেছিলেন।[৩৭]

তিরমিযি শরীফে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিন বলেছিলেন, যে ব্যক্তি কোন শহীদকে ভূপৃষ্ঠে চলাফেরা করা অবস্থায় দেখতে চায়, সে যেন তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহকে (রা.) দেখে।[৩৮]

আবু দাউদ তায়ালেসী হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ওহুদের যুদ্ধের প্রসঙ্গ আলোচনার সময়ে বলতেন, সেদিনের যুদ্ধের একক কৃতিত্ব ছিলো তালহার।[৩৯] অর্থাৎ সেই যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষা করার দায়িত্ব তিনিই সর্বাধিক পালন করেন। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত তালহা (রা.) সম্পর্কে একথাও বলেছেন,

'হে তালহা, তোমার জন্যে জান্নাতসমূহ ওয়াজেব হয়ে গেছে।
সেখানে তোমার নিবাসে রয়েছে অগনন ডাগর চোখের হুর।'[৪০]

সেই সঙ্কট সন্ধিক্ষণে আল্লাহ রব্বুল আলামীন গায়েব থেকে সাহায্য প্রেরণ করেন। হযরত সা'দ (রা.) বলেন, আমি ওহুদের দিনে লক্ষ্য করেছি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সাদা পোশাক পরিহিত দু'জন লোক। এরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে বীরত্বের সাথে লড়াই করছিলেন। এর আগে বা পরে সেই দুইজন লোককে আমি কখনো দেখিনি। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, ওরা দু'জন ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আ.) ও হযরত মিকাইল (আ.)।[৪১]

---

৩৫. ফতহুল বারী, সপ্তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৬১, সুনানে নাসাই দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫২, ৫৩।

৩৬. ফতহুল বারী, সপ্তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৬১।

৩৭. সহীহ বোখারী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫২৭, ৫৮১।

৩৮. তিরমিযি।

৩৯ ফতহুল বারী, সপ্তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৬১।

৪০. মুখতাসার তারীখে দামেশক, সপ্তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮২, হাশিয়া শরহে যাজুরুজ যাহাব, পৃষ্ঠা ১১৪।

৪১. বোখারী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৮০।

নবীর পাশে সাহাবাদের সমবেত হওয়া

উল্লিখিত দুর্ঘটনা আকস্মিকভাবে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে ঘটে গিয়েছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্বাচিত সাহাবারা, যাঁরা যুদ্ধের শুরু থেকেই প্রথম কাতারে গিয়ে যুদ্ধ করছিলেন তাঁরা পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহ্বান শোনার অল্পক্ষণের মধ্যেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছুটে এসেছিলেন। তাঁরা চেষ্টা করছিলেন যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। কিন্তু এসব সাহাবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে পৌঁছার আগেই তিনি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। ততক্ষণে ছয়জন আনসার সাহাবা শহীদ হয়ে গেছেন, সপ্তম আনসার সাহাবা আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে ঢলে পড়েছেন। হযরত সা'দ (রা.) এবং হযরত তালহা (রা.) প্রাণপণ প্রচেষ্টায় কাফেরদের হামলা থেকে প্রিয় নবীকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রক্ষার জন্যে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সাহাবারা এসেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে কাফেরদের সর্বাত্মক হামলার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিচ্ছিলেন। তাঁরা সেই সময় অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সেই সময় প্রথমে ছুটে এসেছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)।

ইবনে হাব্বান তাঁর সহীহ গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, ওহুদের দিনে সকল সাহাবা নবী সঃ)-এর কাছ থেকে চলে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁর দেহরক্ষীরা ছাড়া অন্য সবাই যুদ্ধ করতে সামনের কাতারে চলে গিয়েছিলেন। কাফেরদের ঘেরাও-এর দুর্ঘটনার পর সর্বপ্রথম আমিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছুটে গিয়েছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে দেখি একজন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রক্ষার জন্যে লড়াই করছেন। আমি মনে মনে বললাম, আপনার নাম তো তালহা (রা.)। আপনার ওপর আমার মা বাবা কোরবান হোক। এমন সময় হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহ (রা.) দ্রুত ছুটে আমার কাছে এসে পৌঁছুলেন। আমরা উভয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে গেলাম। আমরা লক্ষ্য করলাম, হযরত তালহা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে পড়ে আছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের ভাইকে তোলো। সে নিজের জন্যে জান্নাত ওয়াজেব করে নিয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমরা পৌঁছে আরো দেখলাম, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তীক্ষ্ণ কড়া তাঁর চোখের নীচে চেহারায় গেঁথে গেছে। আমি সেগুলো বের করতে চাইলাম। আবু ওবায়দা (রা.) বললেন, আল্লাহর নামে শপথ নিচ্ছি ওগুলো আমাকে বের করতে দিন। এরপর তিনি দাঁত দিয়ে একটি কড়া কামড়ে ধরে ধীরে ধীরে বের করতে লাগলেন যাতে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যথা কম পান। শেষ পর্যন্ত একটি কড়া বের করলেন। এতে হযরত আবু ওবায়দার নীচের মাড়ির একটি দাঁত পড়ে গেলো। দ্বিতীয় কড়াটি আমি বের করতে চাইলাম। কিন্তু আবু ওবায়দা (রা.) বললেন, আবু বকর (রা.) আপনাকে আল্লাহর শপথ দিচ্ছি, আমাকে বের করতে দিন। এরপর তিনি দ্বিতীয় কড়াটিও বের করলেন। এতে তাঁর নীচের মাড়ির আরেকটি দাঁত ভেঙ্গে গেলো। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের ভাই তালহাকে সামলাও। সে নিজের জন্যে জান্নাত ওয়াজেব করে নিয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এরপর আমরা হযরত তালহা (রা.)-এর প্রতি মনোনিবেশ করলাম। তার দেহে আশিটির বেশী আঘাত লেগেছিলো।[৪২]

---

৪২. যাদুল-মায়াদ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৫।

হযরত তালহা (রা.) সেদিন কি রূপ বীরত্ব, আত্মত্যাগ ও সাহসিকতার সাথে লড়াই করেছিলেন তা এতেই বোঝা যায়।

সেই সঙ্কটময় মুহূর্তে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিবেদিত প্রাণ সাহাবাদের একটি দল এসে পৌঁছুলেন। তাঁদের নাম হচ্ছে, হযরত আবু দোজানা, হযরত মসআব ইবনে ওমায়ের, হযরত আলী ইবনে আবু তালেব, হযরত সহল ইবনে হুনাইফ, হযরত মালেক ইবনে সানান (হযরত আবু সাঈদ খুদরী (র.)-এর পিতা) হযরত উম্মে আম্মারা নুসাইবা বিনতে কা'ব মাজেনা, হযরত কাতাদা ইবনে নো'মান, হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব, হযরত হাতেব ইবনে আবু বলতাআ এবং হযরত আবু তালহা (রা.)।

মুসলমানদের ওপর শত্রুদের প্রচন্ড আঘাত

এদিকে শত্রুদের সংখ্যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারদিকে বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। ফলে তাদের হামলাও বাড়ছিলো। এক পর্যায়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গর্তের ভেতর পড়ে গিয়ে হাঁটুতে আঘাত পেলেন। আবু আমের ফাসেক শয়তানী প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে মুসলমানদের ক্ষতি করতে এ ধরনের কয়েকটি গর্ত খনন করেছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গর্তে পড়ে যাওয়ার পর হযরত আলী (রা.) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত ধরলেন এবং হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জড়িয়ে ধরে উপরে উঠিয়ে নিলেন।

নাফে ইবনে জাবির বলেন, আমি একজন মোহাজের সাহাবীকে বলতে শুনেছি, তিনি বলছিলেন, ওহুদের যুদ্ধে আমি হাযির ছিলাম। আমি লক্ষ্য করলাম, চারদিক থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর তীর নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। তিনি তীরের মাঝখানে রয়েছেন। কিন্তু নিক্ষিপ্ত সেই সব তীর সাহাবারা গ্রহণ করছিলেন। আমি আরো লক্ষ্য করলাম যে, আবদুল্লাহ ইবনে শেহাব যুহরী বলছিলো , বলো, মোহাম্মদ কোথায়? এবার আমি থাকবো অথবা তিনি থাকবেন। অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পাশেই ছিলেন। তাঁর কাছে সে সময় অন্য কেউ ছিলো না। ইবনে শেহাব এক সময় সামনে এগিয়ে গেলো। এতে সফওয়ান তাকে ধমক দিলো। জবাবে ইবনে শেহাব বললো, আল্লাহর শপথ, আমি তাকে দেখতে পাইনি। আমাদের দৃষ্টি থেকে তাকে হেফাযত করা হয়েছে। এরপর আমরা চারজন প্রতিজ্ঞা করে বেরুলাম যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করবো (নাউযুবিল্লাহ)। কিন্তু তাঁর ধারে কাছেও পৌঁছুতে পারলাম না।[৪৩]

অভূতপূর্ব আত্মত্যাগ ও সাহসিকতা

সেই সময় মুসলমানরা এমন অসাধারণ বীরত্ব ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছিলেন যার উদাহরণ ইতিহাসে আর পাওয়া যায় না। হযরত আবু তালহা (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বুক টান করে দাঁড়ালেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তীর থেকে রক্ষা করতে হযরত আবু তালহা কিছুটা উঁচুতে দাঁড়ালেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, ওহুদের দিনে সাধারণ মুসলমানরা পরাজিত হয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে না এসে এদিক ওদিক ছুটে পালাচ্ছিলো। হযরত আবু তালহা (রা.) একটি ঢাল নিয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে প্রতিরোধ ব্যূহ হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি ছিলেন দক্ষ তীরন্দাজ। নিপুণ হাতে তীর নিক্ষেপ করতেন। সেদিন তিনি দু'টি না যেন তিনটি ধনুক ভেঙ্গে ফেলেছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশ দিয়ে

৪৩. যাদুল-মায়াদ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৭।

কেউ ধনুক নিয়ে যাওয়ার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, এটি আবু তালহা (রা.)-কে দাও। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের প্রতি মাথা উঁচু করে তাকালে হযরত আবু তালহা (রা.) বলেন, আমার মা-বাবা আপনার উপর কোরবান হোন, আপনি মাথা উঁচু করে তাকাবেন না। খোদা না করুন, আপনার পবিত্র দেহে তীর বিদ্ধ হতে পারে। আমার বুক আপনার বুকের সামনে রয়েছে।[৪৪]

হযরত আনাস (রা.) থেকে আরো বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু তালহা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিক থেকে একটি ঢাল দিয়ে প্রতিরোধ ব্যূহ রচনা করেন। হযরত আবু তালহা (রা.) ছিলেন দক্ষ তীরন্দাজ। তিনি তীর নিক্ষেপের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথা উঁচু করে দেখতেন যে, তীর কোথায় গিয়ে বিদ্ধ হলো।[৪৫]

হযরত আবু দোজানা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এসে তাঁর দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন এবং নিজের পিঠকে ঢাল স্বরূপ পেতে দিলেন, তাঁর পিঠে এসে শত্রুদের নিক্ষিপ্ত তীর বিঁধছিলো, কিন্তু তিনি একটুও নড়াচড়া করছিলেন না।

হযরত হাতেব ইবনে আবু বলতাআ (রা.) ওতবা ইবনে আবু ওয়াক্কাসের পিছু নিলেন। ওতবা প্রচন্ড শক্তিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহে তরবারি দিয়ে আঘাত করছিলো। হযরত হাতেব (রা.) ওতবার তরবারি এবং ঘোড়া কেড়ে নিয়ে তাকে হত্যা করলেন। হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) নিজের ভাই ওতবাকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজছিলেন। কিন্তু সেই সৌভাগ্য হযরত হাতেব (রা.) অর্জন করলেন।

হযরত সহল বিনে হুনাইফও (রা.) বিশিষ্ট তীরন্দাজ ছিলেন। তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মরণের জন্যে বাইয়াত করেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে বীর বিক্রমে লড়াই করেছিলেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও তীর নিক্ষেপ করছিলেন। হযরত কাতাদা ইবনে নো'মান (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ধনুক থেকে বহু তীর নিক্ষেপ করেছিলেন। এতে ধনুকের একটি কোন্ ভেঙ্গে গিয়েছিলো। সেই ধনুক পরে হযরত কাতাদা ইবনে নো'মান নিয়েছিলেন এবং তাঁর কাছেই ছিলো। সেদিন হযরত কাতাদা (রা.)-এর চোখে এমন আঘাত লেগেছিলো যে, চোখ চেহারার ওপর বেরিয়ে পড়েছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার পবিত্র হাতে সেই চোখ ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। পরবর্তী সময়ে দু'টি চোখের মধ্যে সেই চোখটিই বেশী সুন্দর দেখাতো। সেই চোখের দৃষ্টি ছিলো অধিক প্রখর।

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) লড়াই করতে করতে মুখে প্রচন্ড আঘাত পেলেন। এতে তাঁর সামনের মাড়ির দাঁত ভেঙ্গে গেলো। তিনি বিশ বাইশটি আঘাত পেয়েছিলেন। পায়েও আঘাত লেগেছিলো। এতে তিনি খোঁড়া হয়ে গিয়েছিলেন।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, মালেক ইবনে মানানা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারার রক্ত চুষে পরিষ্কার করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, থু থু ফেলে দাও। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ আমি থু থু ফেলব না। এরপর মুখ ফিরিয়ে তিনি লড়াই করতে লাগলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কেউ

---

৪৪. সহীহ বোখারী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৭।

৪৫. সহীহ বোখারী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪০৬।

যদি কোন জান্নাতী মানুষকে দেখতে চায় তবে সে যেন মালেক ইবনে মানানাকে (রা.) দেখে। এরপর তিনি লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

ওহুদ যুদ্ধে মুসলমান মহিলাদের ভূমিকাও ছিলো অনন্য। মহিলা সাহাবী হযরত উম্মে আম্মারা নুসাইবা বিনতে কা'ব (রা.) অসাধারণ সাহসিকতার পরিচয় দেন। তিনি কয়েকজন মুসলমানের সাথে লড়াই করতে করতে ইবনে কোম্মার সামনে গিয়ে পৌঁছেন। ইবনে কোম্মা তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলে তাঁর কাঁধে যখম হয়। তিনিও নিজের তলোয়ার দিয়ে ইবনে কোম্মাকে কয়েকবার আঘাত করেন। কিন্তু ইবনে কোম্মা বর্ম পরিহিত থাকার কারণে কোন আঘাত তার দেহে লাগেনি। হযরত উম্মে আম্মারা লড়াই করতে করতে বারোটি আঘাত পান।

হযরত মসআব ইবনে ওমায়ের (রা.) অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দেন। তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ইবনে কোম্মা ও অন্যদের আঘাত প্রতিরোধ করেন। তাঁর হাতেই ছিলো ইসলামের পতাকা। শত্রু সৈন্যরা তাঁর ডান হাতে এমন আঘাত করে যে, তাঁর হাত কেটে যায়। তিনি তখন তিনি বাম হাতে ইসলামের পতাকা তুলে ধরেন। কিন্তু শত্রুদের হামলায় বাম হাতও কেটে যায়। তিনি তখন বাহু দিয়ে বুকের সাথে জড়িয়ে পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরেন। সেই অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেণ। তাঁর হত্যাকারী ছিলো আবদুল্লাহ্ ইবনে কোম্মা। এই দুর্বৃত্ত হযরত মসআব (রা.)-কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে করেছিলো। হযরত মসআবের (রা.) চেহারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারার সাথে কিছুটা মিল ছিলো। হযরত মসআবকে (রা.) হত্যা করার পর ইবনে কোম্মা কাফেরদের কাছে গিয়ে চিৎকার করে বলছিলো, মোহাম্মদকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হত্যা করা হয়েছে।[৪৬]

নবীর শাহাদাতের খবর ও তার প্রতিক্রিয়া

ইবনে কোম্মা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিহত হওয়ার খবর ছড়িয়ে দিলে, মুহূর্তের মধ্যে তা মুসলমান এবং কাফেরদের কাছে পৌঁছে গেলো। এটা ছিলো খুবই নাযুক মুহূর্ত। এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে দূরে যুদ্ধরত সাহাবাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়লো। অনেকেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। সাহাবারা ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লেন। চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিলো। তবে একটা লাভ এই হলো যে, কাফেরদের হামলা সাময়িকভাবে থেমে গেলো। কেননা তারা ভাবছিলো তাদের আসল উদ্দেশ্য পুরো হয়ে গেছে। বহুসংখ্যক মোশরেক মুসলমানদের ওপর হামলা বন্ধ করে দিয়ে শোহাদায়ে কেরামের লাশের ওপর মনের পৈশাচিক ঝাল মেটাচ্ছিলো। তারা শহীদদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলছিলো।

মুসলমানদের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ

হযরত মসআব ইবনে ওমায়ের (রা.)-এর শাহাদাতের পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পতাকা হযরত আলী (রা.)-এর হাতে তুলে দিলেন। হযরত আলী (রা.) বীরত্বের সাথে লড়াই করলেন। সেখানে উপস্থিত অন্য কয়েকজন সাহাবাও তুলনাবিহীন বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং পাল্টা আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করলেন। বেশ কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর এ ধরনের সম্ভাবনা দেখা দিলো যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে অবস্থানরত সাহাবাদের কাছে যাওয়ার জন্যে পথ তৈরী করে নেবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের কাছে নিরাপদ আশ্রয় পাওয়ার জ ন্য পা বাড়ালেন। এ সময়ে প্রথমে হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) তাঁকে চিনে ফেললেন। আনন্দে চিৎকার করে তিনি বললেন, ওহে মুসলমানরা, তোমাদের জন্যে সুসংবাদ, তিনি হলেন আল্লাহর রসূল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে চুপ

---

৪৬. ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা, ৭৩, ৮০। ৮৩, যাদুউল মায়াদ দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৭

করার ইঙ্গিত দিলেন, যাতে শত্রুরা তাকে চিনতে না পারে। কিন্তু মুসলমানরা সেই আওয়ায শুনে ফেলেছিলেন, ফলে অল্পক্ষণের মধ্যে সাহাবাগণ প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে আসতে শুরু করলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে ত্রিশজন সাহাবা হাযির হলেন।

এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাহাড়ের ঘাঁটিতে অর্থাৎ মুসলমানদের শিবিরের দিকে যেতে শুরু করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিবিরে গিয়ে পৌঁছুলে কাফেরদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে, এ কারণে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গতিপথ রুদ্ধ করতে প্রাণান্তকর প্রয়াস চালালো। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কয়েকজন নিবেদিতপ্রাণ সাহাবার বেষ্টনীর মধ্যে এগিয়ে চললেন। এ সময়ে ওসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুগিরা নামের এক দুর্বৃত্ত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি অগ্রসর হতে হতে বললো, হয়তো আমি থাকবো অথবা তিনি থাকবেন। কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হতে পারল না। কেননা আবু আমের ফাসেকের খনন করা একটা গর্তের মধ্যে তার ঘোড়া পড়ে গেলো। ইত্যবসরে হযরত হারেস (রা.) হুঙ্কার দিয়ে তার সামনে গিয়ে পায়ে তলোয়ারের প্রচন্ড আঘাত করে তাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। এরপর তার অস্ত্র খুলে নিয়ে হযরত হারেস (রা.) রসূলে করিমের কাছে এসে পৌঁছুলেন। এরই মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে জাবের নামের এক শত্রু সৈন্য হযরত হারেস (রা.)-এর কাঁধে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলো। কিন্তু মুসলমানরা তাঁকে ধরে ফেললেন। পরক্ষণে মাথায় লাল পট্টি পরিহিত হযরত আবু দোজানা (রা.) আবদুল্লাহ ইবনে জাবেরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তলোয়ারের আঘাতে তার শিরশ্ছেদ করলেন।

কুদরতের কারিশমা দেখুন, এই ধরনের জীবন-মরণ যুদ্ধের মধ্যেও মুসলমানদের চোখে ঘুম পাচ্ছিলো। পবিত্র কোরআনের বাণী অনুযায়ী এটা ছিলো আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত প্রশান্তির নিদর্শন। হযরত আবু তালহা (রা.) বলেন, ওহুদের বিভীষিকাময় যুদ্ধের সময় যাদের ঘুম পাচ্ছিলো আমিও ছিলাম তাদের একজন। ঘুমের ঝোঁকে কয়েকবার আমার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গিয়েছিলো। অবস্থা এমন হয়েছিলো যে, তরবারি পড়ে যাচ্ছিলো, আর আমি তা তুলে নিচ্ছিলাম। একাধিকবার এরকম হয়েছিলো।[৪৭]

মোটকথা প্রাণপণ প্রচেষ্টায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সীমিতসংখ্যক সাহাবা পাহাড়ের ঘাঁটিতে অবস্থিত মুসলমানদের শিবিরে গিয়ে পৌঁছুলেন। এরা অন্য মুসলমানদের জন্যেও পথ করে দিলেন। ফলে অন্য সাহাবারাও সেখানে এসে পৌঁছুলেন। এতে খালেদ ইবনে ওলীদের রণকৌশল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রণকৌশলের সামনে ম্লান হয়ে গেলো।

উবাই ইবনে খালফের হত্যাকান্ড

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘাঁটিতে পৌছার পর উবাই ইবনে খালফ একথা বলে সামনে অগ্রসর হলো যে, মুহাম্মদ কোথায়? হয়তো আমি থাকবো অথবা তিনি থাকবেন। সাহাবারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমরা কি তার ওপর হামলা করবো? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওকে আসতে দাও। এই দুর্বৃত্ত কাছে এলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হারেস (রা.)-এর কাছ থেকে ছোট একটি বর্শা নিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেলেন। এটা ছিলো ঠিক তেমনি, যেমন গায়ে মাছি বসলে উট একটুখানি ঝাঁকুনি দেয় এতে মাছি উড়ে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর উবাই-এর মুখোমুখি গেলেন। ইবনে উবাইয়ের শিরস্ত্রাণ এবং বর্মের

---

[৪৭]. সহীহ বোখারী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা, ৫৮২

মাঝামাঝি জায়গায় একটুখানি জায়গা গলার কাছে খালি ছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই স্থান লক্ষ্য করে বর্শা নিক্ষেপ করলেন। এতে উবাই ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নিয়ে স্বগোত্রীয়দের কাছে ফিরে গেলো।

তার গলার কাছে সামান্য ছিড়ে গিয়েছিলো। আঘাতও তেমন ছিলো না। রক্তও বেরোয়নি। তবুও সে চিৎকার করে বলতে লাগলো, আল্লাহর শপথ, মোহাম্মদ আমাকে হত্যা করেছেন। লোকেরা তাকে বললো, কি বাজে বকছো, তোমার আঘাত তো তেমন নয়। সামান্য আঁচড় লাগার মতো দেখা যাচ্ছে। উবাই বললো তিনি মক্কায় আমাকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে হত্যা করবো।[৪৮] কাজেই আল্লাহর শপথ, আমার প্রাণ চলে যাবে। পরিশেষে আল্লাহর এই চিহ্নিত দুশমন মক্কায় ফেরার পথে ছারফ নামক জায়গায় মারা গেলো।[৪৯] আবুল আসওয়াদ হযরত ওরওয়া (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উবাই গাভীর মতো চিৎকার করতো আর বলতো, সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আমি যে যন্ত্রণা অনুভব করছি, সেই কষ্ট ও যন্ত্রণা যদি যিল মাযাযের অধিবাসীরা অনুভব করতো, তাহলে তারা সাবই মরে যেতো।[৫০]

হযরত তালহার আন্তরিকতা

পাহাড়ের দিকে নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে যাওয়ার সময়ে একটি উঁচু জায়গা দেখা গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরে উঠতে পারছিলেন না, একে তো তাঁর দেহ ভারি হয়ে গিয়েছিলো, যেহেতু তিনি দুটো বর্ম পরিধান করেছিলেন। তাছাড়া তিনি ছিলেন মারাত্মকভাবে আহত। হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা.) নীচে বসে গেলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাঁধে তুলে ওপরে উঠতে সহায়তা করলেন। এতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই উঁচু জায়গা অতিক্রম করলেন। এরপর তিনি বললেন, তালহা নিজের জন্যে জান্নাত অবধারিত করে নিয়েছে।[৫১]

শত্রুদের সর্বশেষ হামলা

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘাঁটির ভেতরে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার পর শত্রুরা মুসলমানদের পরাস্ত করতে সর্বশেষ চেষ্টা চালালো। ইবনে ইসহাক বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘাঁটির ভেতরে চলে যাওয়ার র আবু সুফিয়ান এবং খালেদ ইবনে ওলীদের নেতৃত্বে একদল অমুসলিম ওপরে ওঠার চেষ্টা করলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করলেন, হে আল্লাহ তায়ালা, ওরা যেন ওপরে উঠতে না পারে। এরপর হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) এবং একদল মোহাজের সাহাবা যুদ্ধ করে ওদের পাহাড়ের নীচে নামিয়ে দিলেন।[৫২]

শত্রু সৈন্যদের কয়েকজন ওপরে উঠে এলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সা'দ (রা.)-কে বললেন, ওদের পেছনে ঠেলে দাও।। হযরত সা'দ বললেন, আমি একাকী কিভাবে পারবো? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার কথাটি উচ্চারণ করলেন। পরে

---

৪৮. ঘটনা ছিলো এই যে, মক্কায় রসূলে করিমের (স.) দেখা হলে উবাই গর্বভরে বলতো, হে মোহাম্মদ, আমার কাছে আওদ নামের একটি ঘোড়া রয়েছে। ওকে আমি প্রতিদিন তিন সাআ অর্থাৎ সাড়ে সাত কিলো খাবার খাওয়াচ্ছি, সেই ঘোড়ার পিঠে বসে আমি একদিন আপনাকে হত্যা করবো। জবাবে রসূলে করিম (স.) বলতেন, বরং উল্টোও হতে পারে। ইনশাল্লাহ আমিই তোমাকে হত্যা করবো।

৪৯. ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা, ৮৪ : যাদুল-মায়াদ দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৭

৫০. মুখতাসার সীরাতুর রসূল। শেখ আবদুল্লাহ. পৃষ্ঠা ২৫০

৫১. ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৬

৫২. ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৬

হযরত সা'দ (রা.) তাঁর তূন থেকে একটি তীর বের করে একজন শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করলেন। সেই দুর্বৃত্ত সেখানেই নিহত হলো। হযরত সা'দ (রা.) বলেন, এরপর আমি সেই তীর নিক্ষেপ করলাম, এই লোকটিকে আমি চিনতাম। সে সেখানেই প্রাণ ত্যাগ করলো। সেই তীর নিক্ষেপে আরেকজনকে হত্যা করলাম। এরপর শত্রু সৈন্যরা নীচে নেমে গেলো। আমি বললাম, এটি হচ্ছে বরকতসম্পন্ন তীর। পরে আমি সেই তীর আমার তূনের মধ্যে রেখে দিলাম। ইতিমধ্যে শত্রুরা নীচে নেমে গেছে। পরবর্তীকালে এই তীর হযরত সা'দ (রা.)-এর কাছে ছিলো। তাঁর পরে তাঁর সন্তানরা সেটি সংরক্ষণ করেন।[৫৩]

শহীদদের অঙ্গচ্ছেদন

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে এটা ছিলো শত্রু সৈন্যদের সর্বশেষ হামলা। তারা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা সম্পর্কে তখনো স্পষ্ট কিছু বুঝতে পারেনি। তবে ধরেই নিয়েছিলো যে, তিনি নিহত হয়েছেন। এ কারণে তারা নিজেদের শিবিরে ফিরে গিয়ে মক্কায় ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করলো। এ সময়ে কিছু মোশরেক নারী-পুরুষ শহীদদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কাটতে শুরু করলো। শহীদদের লজ্জাস্থান, কান, নাক, প্রভৃতি অঙ্গ কেটে ফেললো। কারো কারো পেট চিরে ফেললো। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দ বিনতে ওতবা হযরত হামযার (রা.) বুক চিরে কলিজা বের করে চিবোতে লাগলো। গিলে ফেলার চেষ্টা করে না পারায় ফেলে দিলো। এছাড়া কর্তিত নাক ও কান দিয়ে মালা গেঁথে গলা এবং পায়ে মলের মতো পরিধান করলো।[৫৪]

সর্বশেষ যুদ্ধের জন্যে মুসলমানদের উদ্যোগ

শেষদিকে এমন দু'টি ঘটনা ঘটলো, যা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, নিবেদিত প্রাণ মুসলমানরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে কিরূপ দৃঢ় সংকল্প ছিলেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জনে জীবন বিসর্জন দিতে তাঁদের আগ্রহ যে ছিলো অপরিসীম, এ থেকে তাও বোঝা যায়।

প্রথম ঘটনা, হযরত কা'ব ইবনে মালেক বললেন, আমি ছিলাম তাদের মধ্যে অন্যতম। আমি লক্ষ্য করলাম যে, মুসলমানদের হাতে শহীদদের অবমাননা হচ্ছে। আমি খানিকটা থেমে সামনে এগিয়ে গেলাম। লক্ষ্য করলাম যে, বর্ম পরিহিত বিশালদেহী একটি লোক শহীদদের লাশ অতিক্রম করছে। আর একজন মুসলমান এই লোকটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি উভয়ের প্রতি তাকালাম। মনে মনে উভয়ের শক্তি পরিমাপ করলাম। আমার মনে হলো যে, কাফের লোকটির অস্ত্রশস্ত্র মুসলমানের অস্ত্রের চেয়ে ভালো। আমি উভয়ের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। এক সময়ে উভয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হলো। সেই মুসলমান ওই কাফেরকে তরবারি দিয়ে এমন আঘাত করলেন যে, কাফের দ্বিখন্ডিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। সেই মুখোশ পরিহিত মুসলমান নিজের মুখোশ খুললেন। এরপর বললেন, ও কা'ব, কেমন হলো কাজটা? আমি হচ্ছি আবু দোজানা[৫৫]

দ্বিতীয় ঘটনা, যুদ্ধ শেষে কিছুসংখ্যক মুসলিম যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে মদীনা পৌঁছুলেন। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা.) এবং উম্মে সুলাইম (রা.)-কে

---

৫৩. যাদুল-মায়াদ দ্বিতীয়, খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৫

৫৪. ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯০

৫৫. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া চতুর্থ খন্ড. পৃষ্ঠা ১৭

দেখলাম, তারা পায়ের গোড়ালির ওপর কাপড় তুলে পিঠে পানির মশক বয়ে নিয়ে আসছেন এবং মুসলমানদের সেই পানি পান করাচ্ছেন।[৫৬]

হযরত ওমর (রা.) বলেন, ওহুদের দিনে হযরত উম্মে সালীত (রা.) আমাদের জন্যে মশক ভর্তি করে পানি নিয়ে আসছিলেন।[৫৭]

পানি নিয়ে আগত মহিলাদের মধ্যে হযরত উম্মে আইমানও ছিলেন। তিনি পরাজিত মুসলমানদের মদীনায় প্রবেশ করতে দেখে তাদের মুখে ধুলি নিক্ষেপ করে বলছিলেন, এই নাও সূতা কাটার যন্ত্র, আর তোমাদের তলোয়ার আমাদের হাতে দাও।[৫৮] এরপর তিনি দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছে আহতদের পানি পান করাতে লাগলেন। হযরত উম্মে আইমান (রা.)-এর প্রতি হেব্বান ইবনে আরকা নামক এক ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করলো। এতে হযরত উম্মে আইমান (রা.) পড়ে গেলে তাঁর পর্দা খুলে গেলো। আল্লাহর দুশমন তা দেখে খিলখিল করে হাসলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যাপারটি লক্ষ্য করছিলেন। তাঁর খুব খারাপ লাগলো। তিনি হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.)-কে একটি তীর দিয়ে বললেন, এটি নিক্ষেপ করো। সা'দ তীর নিক্ষেপ করলেন। হযরত সা'দ (রা.)-এর তীর হেব্বানের গলায় বিদ্ধ হলো এবং সে চিৎ হয়ে পড়ে গেলো। তার পর্দা খুলে গেলো। এতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একচোট হাসলেন। এরপর বললেন, সা'দ-উম্মে আইমানের বদলা গ্রহণ করেছে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার দোয়া কবুল করুন।[৫৯]

ঘাঁটিতে আশ্রয় গ্রহণ করার পর

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাহাড়ের ঘাঁটিতে আশ্রয় নেয়ার পর হযরত আলী (রা.) তাঁর ঢালে করে মিহরাস থেকে পানি নিয়ে এলেন। মিহরাস হচ্ছে পাথরের তৈরী এক ধরনের কূয়া। বলা হয়ে থাকে যে, মেহরাম ওহুদের একটি ঝর্ণা। সেই পানি এনে হযরত আলী (রা.) পান করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দিলেন। কিন্তু কিছুটা গন্ধ অনুভব হওয়ায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই পানি পান না করে চেহারার ক্ষত ধুয়ে নিলেন এবং কিছু পানি মাথায় ঢাললেন। সেই সময়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছিলেন, সেই ব্যক্তির উপর আল্লাহর কঠিন গযব, যে ব্যক্তি আল্লাহর রসূলের চেহারাকে রক্তাক্ত করেছে।[৬০]

হযরত সাহল (রা.) বলেন, আমি দেখেছি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারার রক্ত কে ধুয়েছেন পানি কে ঢেলেছেন এবং চিকিৎসা কে করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.) তাঁর ক্ষত ধুয়ে দিচ্ছিলেন। হযরত আলী (রা.) পানি দিচ্ছিলেন। হযরত ফাতেমা (রা.) লক্ষ্য করলেন যে, পানি ঢেলে দেয়ার পরও রক্ত ঝরছে, কিছুতেই রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। তখন তিনি চাটাই-এর একটি টুকরো নিয়ে আগুনে পুড়ে সে ছাই

---

৫৬. সহীহ বোখারী। প্রথম খন্ড পৃ. ৪০৩, দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা ৫৮১

৫৭. সহী বোখারী, প্রথম খনড, পৃষ্ঠা ৪০৩

৫৮. সেকালে আরবের মেয়েরা টাকা দিয়ে সূতা কাটতো। আমাদের দেশের মেয়েদের হাতের চুড়ির মতোই সূতোর রকমারি অলঙ্কার অনেকে পরিধান করতো। এখানে আমাদের দেশীয় পরিভাষায় বলা যায়, এই চুড়ি তোমরা পরিধান করো, তলোয়ার আমাদের হাতে দাও।

৫৯. আস সিরাতুল হালাবিয়া। দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ২২

৬০. ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৫

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিলেন। সাথে সাথে রক্ত বন্ধ হয়ে গেলো।[৬১]

এদিকে হযরত মোহাম্মদ ইবনে মোসলমা (রা.) শীতল ও সুমিষ্ট পানি নিয়ে এলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই পানি পান করে তাঁর কল্যাণের জন্যে দোয়া করলেন।[৬২]

যখমের যন্ত্রণার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের নামায বসে আদায় করলেন। সাহাবায়ে কেরামও তাঁর পেছনে বসে নামায আদায় করলেন।[৬৩]

আবু সুফিয়ানের দম্ভ

মক্কার বিধর্মী পৌত্তলিকরা ফিরে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। আবু সুফিয়ান তখন ওহুদ পাহাড়ের উপর উঠে জিজ্ঞাসা করলো, তোমাদের মধ্যে কি মোহাম্মদ আছেন? কেউ কোন জবাব দিলেন না। সে আবার বললো, তোমাদের মধ্যে কি আবু কোহাফার পুত্র আছেন? কেউ কোন জবাব দিলেন না। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো, তোমাদের মধ্যে কি ওমর ইবনে খাত্তাব আছেন? কেউ এবারও কোন জবাব দিলেন না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিতে নিষেধ করেছিলেন। আবু সুফিয়ান উল্লিখিত তিনজন ছাড়া অন্য কারো কথা জিজ্ঞাসা করলো না। কারণ, সে ভালো করেই জানতো যে, এই তিনজনের মাধ্যমেই ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটছে। কোন জবাব না পেয়ে আবু সুফিয়ান স্বগতোক্তি করলো, যাক এই তিনজন থেকেই রেহাই পাওয়া গেলো। একথা শুনে হযরত ওমর (রা.) আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না, তিনি বললেন, ওরে, আল্লাহর দুশমন, তুমি যাদের নাম উচ্চারণ করেছো, তারা সবাই জীবিত আছেন। আল্লাহ তায়ালা তোমার অবমাননার আরো বীভৎস উপকরণ রেখেছেন। একথা শুনে আবু সুফিয়ান বললো, তোমাদের নিহত লোকদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে বীভৎস করা হয়েছে। আমি এসব করতে বলিনি। তবে এতে আমি নাখোশও নই। এরপর সে ধ্বনি দিলো, হোবালের জয় হোক!

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা জবাব দিচ্ছো না কেন? সাহাবয়ে কেরাম বললেন, কি জবাব দেব? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বলো, আল্লাহ তায়ালা মহান এবং সর্ব শক্তিমান।

আবু সুফিয়ান উচ্চস্বরে বললো, আমাদের জন্যে ওযযা আছে, তোমাদের ওযযা নেই।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা জবাব দিচ্ছো না কেন? সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, কি জবাব দেবো? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বলো 'আল্লাহু মওলানা ওয়া-লা মওলা লাকুম।' অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রভু, তোমাদের কোন প্রভু নেই।

এরপর আবু সুফিয়ান বললো, কি চমৎকার কৃতিত্ব। আজ বদরের যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণের দিন। যুদ্ধ হচ্ছে একটা বালতি।[৬৪]

হযরত ওমর (রা.) জবাবে বললেন, সমান নয়। আমাদের যারা নিহত হয়েছেন, তারা জান্নাতে রয়েছেন, আর তোমাদের যারা নিহত হয়েছে, তারা জাহান্নামে রয়েছে।

---

৬১. সহীহ বোখারী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা. ৫৮৪

৬২ আস সিরাতুল হালাবিয়া, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩০

৬৩. ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৭

৬৪. কখনো এক পক্ষ জয় লাভ করে কখনো অন্য পক্ষ। যেমন বালতি দিয়ে কখনো একজন টেনে পানি তোলে, কখনো অন্যজন তোলে।

এরপর আবু সুফিয়ান বললো, ওহে ওমর, একটু কাছে আসো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যাও, দেখো কি বলে। হযরত ওমর (রা.) এগিয়ে গেলেন। আবু সুফিয়ান বললো, ওহে ওমর, তোমাকে আল্লাহর নামে শপথ দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আমরা কি মোহাম্মদকে হত্যা করতে পেরেছি? হযরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহর শপথ, পারো নাই। বরং এখন তিনি তোমার কথা শুনছেন। আবু সুফিয়ান বললো, ওমর, তুমি আমার কাছে ইবনে কোম্মার চাইতেও অধিক সত্যবাদী ব্যক্তি।[৬৫]

আরেকটি বদরের সঙ্কল্প

ইবনে ইসহাক (রা.) বলেন, আবু সুফিয়ান এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা ফিরে যাওয়ার সময় বললো, আগামী বছর বদর প্রান্তরে পুনরায় লড়াই করার প্রতিজ্ঞা রইলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন সাহাবীকে বললেন, বলে দাও, আচ্ছা, ঠিক আছে, তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে একথাই রইলো।[৬৬]

শত্রুদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা.)-কে কাফেরদের পেছনে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বললেন, ওদের পেছনে যাও, দেখো, ওরা কি করছে। ওদের পরবর্তী ইচ্ছাই বা কি? যদি ওরা ঘোড়া ও উটের পিঠে সওয়ার হয়ে থাকে তবে বুঝতে হবে ওরা মক্কার দিকে যাচ্ছে। যদি ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে উট হাঁকিয়ে নিয়ে যায়, তবে বুঝতে হবে, ওরা মদীনায় আসছে। এরপর বললেন, সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, ওরা যদি মদীনার পথে রওয়ানা দিয়ে থাকে, তবে মদীনায় গিয়ে ওদের সাথে মোকাবেলা করবো। হযরত আলী (রা.) বলেন, এরপর আমি কাফেরদের অনুসরণ করে লক্ষ্য করলাম, ওরা ঘোড়া ও উটের পিঠে সওয়ার হয়ে মক্কায় ফিরে যাচ্ছে।[৬৭]

শহীদ এবং গাজীদের দেখাশোনা

কাফেরদের চলে যাওয়ার পর মুসলমানরা শহীদান এবং আহতদের খোঁজ নিতে শুরু করলেন। হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) বলেন, ওহুদের দিনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সা'দ ইবনে রবির (রা.) খোঁজ নিতে পাঠালেন। আমাকে বলে দিলেন যে, যদি সা'দকে পাওয়া যায় তবে তাকে আমার সালাম জানাবে এবং জিজ্ঞাসা করবে, সে এখন কেমন বোধ করছে। হযরত যায়েদ (রা.) বলেন, আমি শহীদদের লাশের মধ্যে খুঁজে খুঁজে তাকে বের করলাম। কাছে গিয়ে দেখি তিনি মুমূর্ষ অবস্থায় কাতরাচ্ছেন। তাঁর দেহে বর্শা, তীর ও তলোয়ারের সত্তরটি আঘাত লেগেছিলো। আমি বললাম, হে সা'দ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং আপনি কেমন অনুভব করছেন সেকথা জানতে চেয়েছেন। হযরত সা'দ ইবনে রবি (রা.) বললেন, আল্লাহর রসূলকে আমার সালাম। তাঁর কাছে বলবে যে, আমি বলেছি, আমি জান্নাতের খুশবু পাচ্ছি। আমার আনসার ভাইদের বলবে যে, যদি তোমাদের একটি চোখের স্পন্দন বাকি থাকাতেও শত্রুরা আল্লাহর রসূলের কাছে পৌঁছুতে পারে,

---

[৬৫] ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৩-৯৪। যাদুল-মায়াদ দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৪। সহীহ বোখারী দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা ৫৭৯

[৬৬]. ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড. পৃষ্ঠা ৯৪

[৬৭]. ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬৪। হাফেজ ইবনে হাজার ফতহুল বারী গ্রন্থের সপ্তম খন্ডের ৩৪৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, পৌত্তলিকদের ইচ্ছা সম্পর্কে জানার জন্য হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা.) রওয়ানা হয়েছিলেন।

তবে আল্লাহর দরবারে তোমাদের কোন ওজর আপত্তি কাজে আসবে না। একথা বলার পর পরই তিনি ইন্তেকাল করলেন।[৬৮]

আহতদের মধ্যে উসাইরামকেও দেখা গেলো। তাঁর নাম ছিলো আমর ইবনে সাবেত (রা.)। তখনো তাঁর প্রাণ-স্পন্দন অবশিষ্ট ছিলো। ইতিপূর্বে তাঁকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি সে দাওয়াত গ্রহণ করেননি। অনেকে অবাক হয়ে বললেন, উসাইরাম এখানে এলো কিভাবে? আমরা তাকে তো ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি। কিন্তু তিনি তো গ্রহণ করেননি। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, আপনি কিভাবে এখানে এলেন? ইসলামের প্রতি ভালোবাসায় নাকি স্বজাতীয়দের শক্তি বৃদ্ধির জন্যে? তিনি বললেন, ইসলামের প্রতি ভালোবাসায় এসেছি। আমি আল্লাহ রব্বুল আলামীন এবং তাঁর প্রিয় রসূলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমর্থনে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। বর্তমানে যে অবস্থায় আছি, সেটা তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এরপরই তিনি ইন্তেকাল করলেন। তার সম্পর্কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, সে জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, অথচ তিনি আল্লাহ তায়ালার জন্যে এক ওয়াক্ত নামাযও আদায় করেননি।[৬৯] (ইসলাম গ্রহণের পর কোন নামাযের ওয়াক্ত হওয়ার আগেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন।)

আহতদের মধ্যে কোজমান নামে এক ব্যক্তিকেও পাওয়া গেলো। সে এই যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে লড়াই করেছিলো। সাত বা আটজন মোশরেককে হত্যা করেছিলো। তার দেহে ছিলো বহুসংখ্যক আঘাতের চিহ্ন। তাকে বনু যোফর মহল্লায় নিয়ে যাওয়া হলো। মুসলমানরা তাকে সুসংবাদ শোনালেন। সে বললো, আল্লাহর শপথ, আমিতো আমার গোত্রের সুনামের জন্যে লড়াই করেছি। গোত্রের সুনাম রক্ষার চিন্তা না থাকলে আমি তো লড়াই করতাম না। জখমের যন্ত্রণা তীব্র হয়ে গেলে কোজমান নিজেকে যবাই করে আত্মহত্যা করে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হলে তিনি বললেন, সে তো জাহান্নামী।[৭০] এই ঘটনায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি ভবিষ্যতবাণীর সত্যতা প্রমাণিত হলো।

আল্লাহর কালেমা বুলন্দের উদ্দেশ্য ছাড়া দেশের জন্যে বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে যারা যুদ্ধ করে, তাদের সকলের পরিণাম কোজমানের মতো হবে। এমনকি যদি তারা ইসলামের পতাকাতলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বা সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করে, তবুও তাদের এই পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে।

নিহতদের মধ্যে বনু ছা'লাব গোত্রের একজন ইহুদীও ছিলো। সে তার স্বগোত্রীয়দের বললো, আল্লাহর শপথ, তোমরা তো জানো যে, মোহাম্মদকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। ইহুদীরা বললো, আজ শনিবার। সেই ইহুদী বললো, তোমাদের জন্যে কোন শনিবার নেই। এরপর সেই ইহুদী তলোয়ার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে রওয়ানা হলো। রওয়ানা হওয়ার সময় বললো, যদি আমি যুদ্ধে নিহত হই, তবে আমার অর্থ-সম্পদের মালিকানা মোহাম্মদের। তিনি যা চান, তাই করবেন। এরপর সে যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করতে করতে মারা গেলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব কথা শুনে বললেন, সে ছিলো একজন ভালো ইহুদী।[৭১]

---

৬৮. যাদুল-মায়াদ। দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা. ৯৬

৬৯. যাদুল মায়াদ। দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৪। ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯০

৭০. যাদুল-মায়াদ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৭-৯৮, ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৮

৭১. ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৮

এ সময়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও শহীদদের লাশ পরিদর্শন করলেন এবং বললেন, আমি এদের জন্যে সাক্ষী থাকব। প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহত হয়, আল্লাহ তায়ালা তাকে কেয়ামতের দিন এমন অবস্থায় ওঠাবেন যে, তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে। সেই রক্তের রং তো রক্তের মতোই হবে, কিন্তু সেই রক্ত থেকে কস্তুরীর সুবাস নির্গত হবে।[৭২]

কয়েকজন সাহাবা তাদের ঘনিষ্ঠ শহীদ সাহাবাদের লাশ মদীনায় স্থানান্তর করলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটা জানার পর সেই সব শহীদের লাশ শাহাদাত বরণের জায়গাতেই দাফন করার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, শহীদদের অস্ত্র এবং পুস্তিনের পোশাক খুলে নিয়ে তাদেরকে বিনা গোসলে দাফন করো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই তিনজন সাহাবার লাশ একই কবরে দাফন করার নির্দেশ দিলেন। দুইজন সাহাবার লাশ একই কাফনে জড়িয়ে দাফন করারও নির্দেশ দিলেন। দুইজন সাহাবাকে একই কাফনে জড়ানোর পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করতেন যে, এই দুইজনের মধ্যে কোরআনে করিম কার বেশী মুখস্থ ছিলো? সাহাবারা যার প্রতি ইশারা করতেন তাকে কবরের নীচের দিকে রাখার জন্যে বলতেন। তিনি বলছিলেন, আমি কেয়ামতের দিন এদের সম্পর্কে সাক্ষ্য দেব। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম (রা.) এবং ওমর ইবনে জামুহ (রা.)-কে একই কবরে দাফন করা হলো। কেননা তাদের দু'জনের মধ্যে ছিলো ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব।[৭৩] হযরত হানযালা (রা.)-এর লাশ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না। সন্ধান করার পর এক জায়গায় পাওয়া গেলো, তার লাশ থেকে পানি ঝরছিলো। লাশ ছিলো মাটি থকে কিছুটা উপরে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের বললেন, ফেরেশতাগণ তাকে গোসল করাচ্ছেন। এরপর বললেন, তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করো ব্যাপারটা কি? জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ঘটনা বললেন। সেই থেকে হযরত হানযালা (রা.)-এর নাম হলো গাসিলুল মালায়েকা অর্থাৎ এমন ব্যক্তি, যাকে ফেরেশতারা গোসল দিয়েছেন।[৭৪]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাচা হামযার অবস্থা দেখে খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফু হযরত সাফিয়্যা (রা.) এলেন। তিনি হযরত হামযা (রা.)-কে দেখতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সাফিয়্যার পুত্র হযরত যোবায়ের (রা.)-কে বললেন, ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। তিনি যেন নিজ ভাই-এর অবস্থা দেখতে না পান। কিন্তু হযরত সাফিয়্যা (রা.) বললেন, তা কেন ? আমি জানি, আমার ভাইয়ের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে। হযরত হামযা (রা.) আল্লাহর পথে ছিলেন। কাজেই যা কিছু হয়েছে, তা আমরা মেনে নিয়েছি। আমি সওয়াবের আশায় ইনশাআল্লাহ ছবর করবো। এরপর তিনি হযরত হামযা (রা.)-এর কাছে এলেন, দেখলেন, ইন্নালিল্লাহ পড়লেন, তার জন্যে দোয়া করলেন। এবং মাগফেরাত কামনা করলেন। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ দিলেন যে, হযরত হামযা (রা.)-কে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের সাথে দাফন করো। তিনি হযরত হামযার (রা.) ভ্রাতুষ্পুত্র এবং দুধভাই ছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হামযা (রা.)-এর জন্যে যেভাবে কেঁদেছিলেন, তাঁকে অন্য কোন সময়েই ওরকম কাঁদতে দেখা যায়নি। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হামযা (রা.)-কে কেবলার

[৭২]. ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৮

[৭৩]. যাদুল-মায়াদ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৮, সহীহ বোখারী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৮৪

[৭৪]. যাদুল-মায়াদ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৪

দিকে রাখলেন এরপর তার জানাযার পাশে দাঁড়িয়ে এমনভাবে কাঁদলেন যে, আমরা তাঁর কান্নার হু হু শব্দ শুনতে পেলাম।[৭৫]

শহীদদের অবস্থা ছিলো বড়ই হৃদয়বিদারক। হযরত খাব্বাব ইবনে আরত (রা.) বলেন, হযরত খাব্বাবের (রা.) জন্যে কালো পাড় বিশিষ্ট একটি চাদর ছাড়া অন্য কোন কাফন পাওয়া যায়নি। এই চাদর মাথার দিকে টেনে দেয়া হলে পায়ের দিক খালি হয়ে যেতো, আর পায়ের দিকে টেনে দেয়া হলে মাথার দিক খালি হয়ে যেতো। শেষ পর্যন্ত পা খালি রেখে ইযখির[৭৬] ঘাস দিয়ে পা ঢেকে দেয়া হয়।[৭৭]

হযরত আবদুর রহমান ইবনে ওমায়ের (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনা ঘটলো। তিনি ছিলেন আমার চেয়ে ভালো। একটি মাত্র চাদর দিয়ে তাঁকে কাফন দেয়া হলো। সেই চাদর দিয়ে তাঁর মাথা ঢেকে দেয়া হলে পা খুলে যেতো পা ঢেকে দেয়া হলে মাথা খুলে যেতো। তাঁর কাফনের এরূপ অবস্থার কথা হযরত খাব্বাব (রা.)ও বর্ণনা করেছেন। তবে এটুকু বেশী বর্ণনা করেছেন যে, তাঁর এই অবস্থা দেখে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বলতেন, চাদর দিয়ে তাঁর মাথা ঢেকে দাও এবং পায়ের উপর ইযখির ঘাস চাপিয়ে দাও।[৭৮]

আল্লাহর দরবারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোয়া

ইমাম আহমদের বর্ণনায় রয়েছে, ওহুদের দিনে মোশরেকরা ফিরে যাওয়ার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের বললেন, তোমরা কাতারবন্দী হও, আমি আমার প্রতিপালকের কিছু প্রশংসা করবো। এরপর তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ রব্বুল আলামীন, সকল প্রশংসা তোমারই জন্যে। তুমি যা প্রশস্ত করে দাও, তা কেউ সংকীর্ণ করতে পারে না। তুমি যা সংকীর্ণ করে দাও, কেউ তা প্রশস্ত করতে পারে না। তুমি যাকে পথভ্রষ্ট করে দাও, কেউ তাকে হেদায়াত করতে পারে না, পক্ষান্তরে তুমি যাকে হেদায়াত দাও, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। যে জিনিস তুমি আটক করে দাও, সে জিনিস কেউ দিতে পারে না। পক্ষান্তরে যে জিনিস তুমি দাও, কেউ তা আটক করতে পারে না। যে জিনিস তুমি দূরে সরিয়ে দাও, সে জিনিস কেউ কাছে আনতে পারে না পক্ষান্তরে যে জিনিস তুমি কাছে এনে দাও, সে জিনিস কেউ দূরে সরিয়ে দিতে পারে না। হে আল্লাহ রব্বুল আলামীন, আমাদের উপর তোমার বরকত, রহমত, ফযল ও রেযেক বিস্তৃত করো।

হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে স্থায়ী নেয়ামতের জন্যে আবেদন করছি, যে নেয়ামত কখনো শেষ হবে না। হে আল্লাহ তায়ালা, আমি তোমার কাছে দারিদ্র্যের দিনে সাহায্য এবং ভয়ের দিনে নিরাপত্তার আবেদন জানাচ্ছি। হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে যা কিছু দিয়েছো, তার মন্দ থেকে, আর যা কিছু দাওনি তারও মন্দ থেকে আমি তোমার কাছে পানাহ চাই। হে আল্লাহ আমাদের ঈমানকে প্রিয় করে দাও এবং আমাদের অন্তরকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে দাও। কুফুরী, ফাসেকী এবং নাফরমানী আমরা যেন পছন্দ না করি, সেই ব্যবস্থা করো এবং আমাদেরকে হেদায়াতপ্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও। হে আল্লাহ, আমাদেরকে মুসলমান থাকা অবস্থায় মৃত্যু দাও এবং মুসলমান অবস্থায় পরকালে জীবিত করো। অবমাননা ও ফেত্না ফাসাদ থেকে

---

৭৫. ইহা ইবনে শাজানের বর্ণনা। মুখতাসারুস সিয়ারু লিশ শাইখ আবদুল্লাহ, পৃষ্ঠা ৩৫৫ দেখুন,

৭৬ এক ধরনের সুগন্ধযুক্ত ঘাস। অনেক স্থানে এই ঘাস চায়ের সাথে মিশিয়ে রান্না করা হয়।

৭৭. মুসনাদে আহমদ, শেফাত, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪০

৭৮ সহীহ বোখারী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫৭৯-৫৮৪

আমাদের দূরে রেখো। তোমার সালেহীন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও। হে আল্লাহ, তুমি সে সকল কাফেরকে মেরে ফেলো, তাদের সাথে কঠোর ব্যবহার করো ও আযাবে নিক্ষেপ করো যারা তোমার পয়গাম্বরকে মিথ্যাবাদী বলে এবং তোমার পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। হে আল্লাহ, সেসব কাফেরকেও মারো, যাদেরকে কেতাব দেয়া হয়েছে।'[৭৯]

মদীনায় প্রত্যাবর্তন

শহীদদের দাফন এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার পথে রওয়ানা হলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সাহাবারা যে ধরনের নিবেদিতচিত্ততা ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছিলেন, শহীদদের আত্মীয়স্বজনও একই ধরনের আত্মত্যাগ ও ধৈর্যের পরিচয় দিলেন।

মদীনায় যাওয়ার পথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হযরত হামনা বিনতে জাহাশ (রা.)-এর সাক্ষাৎ হলো। তাঁর ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.) যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। হযরত হামনা শাহাদাতের খবর শুনে ইন্নালিল্লাহ পাঠ করলেন এবং ভাইয়ের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করলেন। এরপর তাকে তার মামা হযরত হামযা ইবনে আবদুল মোত্তালেব (রা.)-এর শাহাদাতের খবর দেয়া হলো। তিনি পুনরায় ইন্নালিল্লাহ পাঠ করলেন এবং মাগফেরাতের দোয়া করলেন। এরপর তাঁর স্বামী হযরত মসআব ইবনে ওমায়েরের (রা.) শাহাদাতের খবর দেয়া হলো। একথা শুনে তিনি চিৎকার দিয়ে উঠে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নারীর স্বামী তাঁর কাছে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।[৮০]

বনু দীনার গোত্রের এক মহিলার সাথে সাহাবাদের দেখা হলো। তার স্বামী, ভাই এবং পিতাও শহীদ হয়েছিলেন। এদের শাহাদাতের খবর তাকে জানানো হলো। তিনি শুনে বললেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কি খবর? তাঁকে বলা হলো যে, তিনি ভালো আছেন। মহিলা বললেন, তাঁকে আমি একটু দেখতে চাই। সাহাবারা ইশারায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখিয়ে দিলেন। মহিলা সাথে সাথে ডুকরে কেঁদে উঠে বললেন, 'কুল্লু মুসিবাতিন বা'দুকা জালালুন' অর্থাৎ আপনি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সকল বিপদই তুচ্ছ।[৮১] এই সময়ে হযরত সা'দ ইবনে মায়া'য (রা.)-এর মা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছুটে এলেন। সেই সময় হযরত সা'দ (রা.) প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘোড়ার লাগাম ধরে রেখেছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল, এই হচ্ছে আমার মা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে মারহাবা। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই মহিলার সম্মানে ঘোড়া থামালেন। মহিলা কাছে এলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলার এক পুত্র হযরত আমর ইবনে মায়া'য (রা.) এর শাহাদাতের খবর জানিয়ে তাঁকে ধৈর্য ধারণ করতে বললেন। মহিলা বললেন, আপনাকে ভালো অবস্থায় দেখার পর সকল বিপদ আমার কাছে তুচ্ছ। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহুদের শহীদদের জন্যে দোয়া করলেন এবং বললেন, হে উম্মে সা'দ, তুমি খুশী হও। শহীদদের পরিবারে গিয়ে সুসংবাদ দাও যে, ওদের সকল শহীদ একত্রে জান্নাতে রয়েছে এবং নিজের পরিবার পরিজনের ব্যাপারে তাদের সাফায়াত কবুল করা হয়েছে। মহিলা বললেন, হে আল্লাহর রসূল, শহীদদের পরিবার পরিজনের জন্যে দোয়া

[৭৯]. বোখারী, আল আদাবুল মোফরাদ, মুসনাদে আহমদ, তৃতীয় খন্ড. পৃষ্ঠা ৩২৪।

[৮০]. ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা. ৯৮

[৮১]. ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড. পৃষ্ঠা ৯৯।

করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, ওদের মনের শোকের যাতনা দূর করে দাও। ওদের মুসিবতের বিনিময় দাও এবং অন্য সবাইকে হেফাযত করো।[৮২]

মদীনায় আল্লাহর রসূল

তৃতীয় হিজরীর ৭ই শাওয়াল রোবিবার বিকেলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় পৌঁছুলেন। ঘরে গিয়ে তাঁর তলোয়ার হযরত ফাতেমা (রা.)-কে দিয়ে বললেন, এই তলোয়ারে লেগে থাকা রক্ত ধুয়ে দাও। আল্লাহর শপথ, এই তরবারি আজ আমার জন্যে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। হযরত আলীও (রা.) তাঁর তরবারি হযরত ফাতেমা (রা.)-কে দিয়ে রক্ত ধুয়ে দিতে বললেন। আরো বললেন, আল্লাহর শপথ, এই তরবারি আমার জন্যে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। এতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি যুদ্ধে বীরত্ব দেখিয়েছো তবে মনে রেখো, সুহায়েল ইবনে হুনাইফ এবং আবু দোজানা (রা.) বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে।[৮৩]

ওহুদের যুদ্ধে ৭০ জন মুসলমান শহীদ হয়েছেন। বর্ণনাকারীদের অধিকাংশই এই সংখ্যার ব্যাপারে একমত। শহীদদের মধ্যে ৬৫ জন ছিলেন আনসার। এদের মধ্যে ৪১ জন খাযরাজ গোত্র এবং ২৪ জন আওস গোত্র থেকে শহীদ হন। একজন ইহুদীও নিহত হয়েছিলো। আর মোহাজের শহীদ ছিলেন মাত্র চারজন। কোরায়শ কাফেরদের মধ্যে কতজন নিহত হয়েছিলো? ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাকের মতে তাদের ২২ জন নিহত হয়েছিলো। কিন্তু যুদ্ধবিশারদ, সীরাত রচয়িতারা ওহুদ যুদ্ধের যে বিবরণ উল্লেখ করেছেন এবং বিভিন্ন পর্যায়ে নিহত হওয়ার যে বিবরণ দিয়েছেন তার আলোকে দেখা যায় যে, ২২ ব্যক্তি নয় বরং ৩৭ জন নিহত হয়েছিলো। আল্লাহ তায়ালাই এ সম্পর্কে ভালো জানেন।[৮৪]

মদীনায় জরুরী অবস্থা

ওহুদ থেকে ফিরে আসার পর তৃতীয় হিজরীর ৮ই সওয়াল রাতে মুসলমানরা জরুরী পরিস্থিতি অতিবাহিত করেন। তাঁরা সকলেই রণক্লান্ত হওয়া সত্তেও সারারাত মদীনার পথে পথে এবং মদীনার প্রবেশপথসমূহে কাটিয়ে দেন। হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ হেফাযতের ব্যবস্থাতেও তাঁরা নিয়োজিত ছিলেন। কেননা নানাদিক থেকে তাঁরা আশঙ্কা বোধ করছিলেন।

হামরাউল আছাদের যুদ্ধ

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা রাত যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট পরিস্থিতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করেন।

তিনি এরূপ আশঙ্কা করছিলেন যে, যদি শত্রুরা এরূপ ভেবে থাকে যে, যুদ্ধের ময়দানে সংখ্যায় বেশী হয়েও আমরা কোন ফায়দা অর্জন করতে পারিনি, তবে নিশ্চয়ই তারা লজ্জিত হবে। এর ফলে তারা মক্কার পথ থেকে ফিরে এসে মদীনায় হামলা করতে পারে। এ কারণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিদ্ধান্ত নিলেন যে, মক্কার সৈন্যদের অনুসরণ করতে হবে।

সীরাত রচয়িতারা লিখেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহুদ যুদ্ধের পরদিন অর্থাৎ তৃতীয় হিজরীর ৮ই শাওয়াল সকালে ঘোষণা করলেন যে, শত্রুদের মোকাবেলার জন্যে রওয়ানা হতে হবে, ওহুদের যুদ্ধে যারা শরিক হয়েছিলো তারাই শুধু আমাদের সাথে যেতে পারবে। মোনাফেক আবদুল্লাহ ইবনে উবাই অনুমতি চাইল, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

---

৮২. আস সিরাতুল হালাবিয়াহ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৭।

৮৩. ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা, ১০০

৮৪. ইবনে হিশাম ২য় খন্ড পৃঃ ১২২ 'গোযওয়ায়ে ওহুদ' পৃঃ ২৮০

তাকে অনুমতি দিলেন না। শারীরিকভাবে আহত, স্বজন হারানোর শোকে কাতর, আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন মুসলমানরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আহ্বানের সামনে মাথা নত করে দিলেন। হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) ওহুদের যুদ্ধে হাযির হতে পারেননি। তিনি অনুমতি চাইলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমি সকল যুদ্ধে আপনার সঙ্গে থাকতে আগ্রহী। ওহুদের যুদ্ধে আমার কন্যাদের দেখাশোনার জন্যে আমার পিতা আমাকে রেখে গিয়েছিলেন, এ কারণে আমি যুদ্ধে যেতে পারিনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি প্রদান করলেন। কর্মসূচী অনুযায়ী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং মদীনা থেকে আট মাইল দূরে 'হামরাউল আছাদ' নামক স্থানে পৌঁছে শিবির স্থাপন করলেন।

এ সময়ে মা'বাদ ইবনে আবু মা'বাদ খাজায়ী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেন। এর আগে তিনি শেরেকের ওপর অটল ছিলেন। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কল্যাণ কামনা করতেন। খাযাআ এবং বনু হাশেম গোত্রের মধ্যে মৈত্রী চুক্তি বিদ্যমান ছিলো। এই চুক্তির কারণেই তিনি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিতকামী ছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনি বললেন, আপনি এবং আপনার সঙ্গীরা যুদ্ধের ময়দানে যেরূপ কষ্টের সম্মুখীন হয়েছেন, এতে আমি খুবই মর্মাহত হয়েছি। আমি মনে প্রাণে কামনা করেছিলাম, আপনি যেন ভালো থাকেন। এ ধরনের সমবেদনা প্রকাশের পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মা'বাদ (রা.)-কে বললেন, আবু সুফিয়ানের কাছে যাও এবং তার উদ্যম নষ্ট করে তাকে নিরুৎসাহিত করো।

মোশরেকেরা পুনরায় মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হতে পারে বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে আশঙ্কা করেছিলেন, সেটাই সত্য হলো। মদীনা থেকে ছত্রিশ মাইল দূরবর্তী রওহা নামক জায়গায় পৌঁছে মোশরেকেরা একে অন্যকে দোষারোপ করতে লাগলো। তারা একদল অন্য দলকে বলছিলো, তোমরা কিছুই করোনি। ওদের শক্তিহীন করার পরও ছেড়ে দিয়েছ। ওদের এতো বেশী মাথা এখনো বিদ্যমান রয়েছে, যা কিনা পুনরায় তোমাদের মাথা ব্যথার কারণ হবে। চলো ফিরে যাই, ওদেরকে সমূলে উৎপাটন করি।

যারা এ প্রস্তাব দিয়েছিলো, মনে হয় তারা উভয় পক্ষের শক্তি সম্পর্কে সঠিক অবহিত ছিলো না। এ কারণে দায়িত্বশীল একজন সফওয়ান ইবনে উমাইয়া এই অভিমতের বিরোধিতা করে বললো, তোমরা অমন করো না। আমি আশঙ্কা করছি যে, যেসকল মুসলমান ওহুদের যুদ্ধে অংশ নেয়নি, এবার তারাও আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। কাজেই জয়লাভ আমরাই করেছি এরূপ আত্মপ্রসাদ নিয়ে মক্কায় ফিরে চলো। অন্যথায় মদীনার ওপর হামলা করলে বিপদে জড়িয়ে পড়বে। কিন্তু অধিকাংশ কাফের এ মতামত গ্রহণ করলো না এবং তারা মদীনার ওপর হামলা করার সিদ্ধান্তে অটল থাকলো। তারা মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার আগেই মা'বাদ ইবনে মা'বাদ খাযায়ী সেখানে পৌঁছুলেন। আবু সুফিয়ান তখনো জানত না যে, মা'বাদ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন। সে জিজ্ঞাসা করলো, মা'বাদ, পেছনের খবর কি? মা'বাদ কৌশলের মাধ্যমে বললেন, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে তোমাদের অনুসরণে বেরিয়ে পড়েছেন। তারা সংখ্যায় এতো বেশী যে, এতো বড় সৈন্যদল এর আগে আমি কখনো দেখিনি। সবাই তোমাদের বিরুদ্ধে ক্রোধে জ্বলছেন। ওহুদের যুদ্ধে যারা যোগদান করেনি, এবার তারাও যোগদান করেছেন। তারা যুদ্ধে যা কিছু হারিয়েছেন, সে জন্যে লজ্জিত। বর্তমানে তোমাদের বিরুদ্ধে এমন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন যে, আমি এ রকম ক্রোধের উদাহরণ ইতিপূর্বে দেখিনি।

আবু সুফিয়ান বললো, আরে ভাই, তুমি এসব কি বলছো?

মা'বাদ বললেন, হাঁ, সত্যি বলছি। আমার ধারণা তোমরা এখান থেকে চলে যাওয়ার আগেই ঘোড়ার দলটি দেখতে পাবে। সৈন্যদের অগ্রবর্তী দল এই টিলার পেছনে থেকে বেরিয়ে আসবে।

আবু সুফিয়ান বললো, আল্লাহর শপথ, আমরা শপথ নিয়েছি, ওদের ওপর পাল্টা হামলা করে তাদের নির্মূল করে দেবো।

মা'বাদ বললেন, অমন করো না। আমি তোমাদের ভালোর জন্যে বলছি।

এসব কথা শুনে কাফেরদের মনোবল ভেঙ্গে গেলো। তারা মক্কায় ফিরে যাওয়াই কল্যাণকর মনে করলো। তবে আবু সুফিয়ান মুসলিম বাহিনীকে নিরুৎসাহিত করতে এবং তাদের সাথে সংঘর্ষ এড়ানোর জন্যে একটা কৌশল অবলম্বন করলো। মদীনার পথে চলমান বনু আবদে কায়সের একটি কাফেলার লোকদের ডেকে আবু সুফিয়ান বললো, আপনারা কি মোহাম্মদের কাছে আমার একটি পয়গাম পৌঁছে দিতে পারবেন? যদি পৌঁছে দেন, তবে আমি কথা দিচ্ছি যে, আপনারা মক্কায় এলে ওকাযের বাজারে আপনাদের এতো বেশী কিসমিস দেবো, যতোটা এই উটনী বহন করতে পারে।

বনু আবদে কায়েসের লোকেরা আবু সুফিয়ানের অনুরোধ রক্ষা করতে রাজি হলো।

আবু সুফিয়ান বললো, আপনারা মোহাম্মদকে বলবেন যে, আমরা তাকে এবং তার সঙ্গীদের নির্মূল করার উদ্দেশ্যে পাল্টা হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

এরপর এই কাফেলা 'হামরাউল আছাদ' নামক জায়গা অতিক্রম করার সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানদের কাছে আবু সুফিয়ানের এই বার্তা পৌঁছালো। সাথে সাথে বললো এও যে, ওরা আপনাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে, কাজেই ওদেরকে ভয় করুন। কাফেলার লোকদের কাছে এই খবর পেয়ে মুসলমানদের ঈমান আরো চাঙ্গা হয়ে উঠলো। তারা বললো, আল্লাহ তায়ালাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্ম সম্পাদনকারী।

ঈমানের এই শক্তির কারণে মুসলমানরা আল্লাহর নেয়ামত এবং ফযলের সাথে মদীনার পথে রওয়ানা হলেন। কোন প্রকার অকল্যাণ তাদের স্পর্শ করতে পারেনি। তারা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের রেযামন্দির অনুসরণ করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা অপরিসীম রহস্যের অধিকারী। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোববার দিন, হামরাউল আছাদে গমন করেন। সোম, মঙ্গল ও বুধ অর্থাৎ তৃতীয় হিজরীর ৯, ১০ ও ১১ই শাওয়াল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন। এরপর তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। মদীনায় ফিরে আসার আগেই আবু আযযা জুমাই তাঁর নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। এই লোকটি বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়েছিলো। কিন্তু দারিদ্র্য এবং কন্যা সন্তানের সংখ্যাধিক্য থাকায় তাকে মুক্তিপণ ছাড়াই মুক্তি দেয়া হয়েছিলো। তবে সে অঙ্গীকার করেছিলো যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করবে না। কিন্তু তার সে কথা রাখেনি। কবিতার মাধ্যমে সে আল্লাহ, রসূল এবং সাহাবায়ে কেরামদের বিরুদ্ধে সাধারণ লোকদের উদ্দীপিত করতে থাকে। ইতিপূর্বে এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। এরপর মুসলমানদের বিরুদ্ধে ওহুদের যুদ্ধে অংশও নিয়েছে। এই লোকটিকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাযির করা হলো। সে বললো মোহাম্মদ, আমার ভুল ক্ষমা করে দাও। আমার ওপর দয়া করো। আমার কন্যা সন্তানদের কথা ভেবে আমাকে ছেড়ে দাও। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ আর করবো না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এখন আর এটা হতে পারে না যে, তুমি মক্কায় গিয়ে মুখমন্ডলে হাত বুলাতে বুলাতে বলবে, মোহাম্মদকে আমি দ্বিতীয়বার ধোঁকা দিয়েছি। মোমেন এক গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম হযরত যোবায়ের, মতান্তরে হযরত আসেম ইবনে ছাবেতকে নির্দেশ দিলেন এবং তারা সেই বেঈমানের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন।

এমনি করে মক্কার অন্য একজন গুপ্তচরও নিহত হয়। তার নাম ছিলো মাবিয়া ইবনে মুগিরা ইবনে আবুল আস। সে ছিলো আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের নানা। ওহুদের দিনে মক্কার মোশরেকরা মক্কা ছেড়ে যাওয়ার পর এই লোকটি মদীনায় তার চাচাতো ভাই হযরত ওসমানের (রা.) মাধ্যমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তার নিরাপত্তার আবেদন জানায়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই শর্তে তাকে নিরাপত্তা দেন যে, সে সর্বোচ্চ তিনদিন মদীনায় থাকতে পারবে। এরপরও যদি তাকে মদীনায় দেখা যায়, তবে হত্যা করা হবে। মুসলিম মোহাজেররা ওহুদের যুদ্ধে যাওয়ার পর মাবিয়া ইবনে মুগিরা কোরায়শদের গুপ্তচর বৃত্তির জন্যে মদীনায় তিনদিনের পরও থেকে যায়। মুসলিম মোহাজেররা ফিরে আসার পর সে পলায়নের চেষ্টা করে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা এবং হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসেরকে নির্দেশ দেন। উভয় সাহাবী মাবিয়াকে তাড়া করে পাকড়াও করে হত্যা করেন।[৮৫]

ওহুদের যুদ্ধে জয়-পরাজয় সম্পর্কিত পর্যালোচনা

ওহুদের যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণের পর উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যা কিছু আলোচিত হয়েছে, তার আলোকে জয় পরাজয় কিভাবে নির্ধারিত হবে? এ যুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহের আলোকে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা যাবে কি যে, মুসলমানরা জয়লাভ করেছে অথবা পরাজিত হয়েছে? বাস্তবতাকে অস্বীকার না করলে বলতেই হবে যে, এই যুদ্ধের দ্বিতীয় রাতে কাফেররা প্রাধান্য লাভ করেছিলো এবং যুদ্ধের ময়দান তাদের হাতেই একরকম ছিলো। প্রাণহানিও মুসলমানদের পক্ষেই বেশী হয়েছে এবং ভয়াবহভাবেই তা হয়েছে। মুসলমানদের একটি অংশ নিশ্চিতভাবে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছেন। সেই সময় যুদ্ধের গতি কাফেরদের পক্ষেই ছিলো। কিন্তু এতো কিছু সত্তেও এমন কিছু ব্যাপার রয়েছে, যার কারণে ওহুদের যুদ্ধে কাফেরদের জয় হয়েছে এমন কথা কিছুতেই বলা যায় না। মক্কার সৈন্যরা মুসলমানদের শিবির দখল করে নিতে পারেনি, এটা স্পষ্টতই জানা যায়। মদীনার সৈন্যদের এক বিরাট অংশ ভয়াবহ উথাল-পাথাল অবস্থা ও বিশৃঙ্খলা সত্তেও পলায়ন করেনি। তারা সীমাহীন সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সাথে সিপাহসালারে আযম রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে সমবেত হয়েছিলেন। মুসলমানদের সংখ্যা এতো কমেনি যে, মক্কার সৈন্যরা তাদের ধাওয়া করতে সক্ষম হবে। তাছাড়া একজন মুসলমানও কাফেরদের হাতে বন্দী হননি। কাফেররা কোন গনীমতের মালও হস্তগত করতে পারেনি। উপরন্তু কাফেররা মুসলমানদের সাথে তৃতীয় দফা লড়াই করতে প্রস্তুত হয়নি। অথচ মুসলিম বাহিনী তখনো তাদের শিবিরেই অবস্থান করছিলেন। কাফেররা যুদ্ধক্ষেত্রে এক দিন ও অবস্থান করেনি। অথচ সেকালে বিজয়ীরা যুদ্ধক্ষেত্রে নিজেদের শিবিরে কমপক্ষে তিন দিন অবস্থান করতো। এটাকে যুদ্ধ জয়ের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নিদর্শন মনে করা হতো। বিজয় সংহত করার প্রমাণ দেয়াই ছিলো এর উদ্দেশ্য। কিন্তু কাফেররা চটপট যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পতিতাড়ি গুটিয়েছিলো। মদীনায় প্রবেশ, অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠন বা নাগরিকেদের গ্রেফতার করার মতো সাহসও তাদের হয়নি। অথচ ওহুদ প্রান্তর থেকে অল্প দূরেই ছিলো মদীনা নগরী। মদীনায় তখন নিরাপত্তার ব্যবস্থাও তেমন ছিলো না।

---

[৮৫]. ওহুদের যুদ্ধ এবং হামরাউল আছাদের বিস্তারিত বিবরণ যেসব গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে সেগুলো হচ্ছে, ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, ৬০-১২৯, যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড পৃ. ৯১-১০৯, ফতহুল বারী সপ্তম খন্ড, ৩৪৫-৩৭৭, মুখতাছারুস সিরাত ২৪২-২৫৭।

মুসলমান যোদ্ধারা সবাই ছিলেন রণক্ষেত্রে। মদীনায় প্রবেশের পথে কাফেররা কোন প্রকার বাধার সম্মুখীনও হতো না।

এসকল কথার সারমর্ম হলো, মক্কার কোরায়শ সৈন্যরা একটি সাময়িক সুযোগ পেয়ে মুসলমানদের হতচকিত করে দিতে পেরেছিলো বটে, কিন্তু মুসলিম বাহিনীকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার পর সবাইকে হত্যা বা বন্দী করে লাভবান হওয়ার অত্যাবশ্যকীয় সামরিক কৌশল তারা প্রয়োগ করতে পারেনি। পক্ষান্তরে মুসলিম সৈন্যরা সাময়িক ক্ষয়ক্ষতির সকল ধকল কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন। বিজয়ীদেরকে এ ধরনের সাময়িক ক্ষতির সন্মুখীন হতে হয়েছে এরকম উদাহরণ অনেক রয়েছে। কাজেই মুসলমানদের সাময়িক কষ্টকর অবস্থার কারণে ওহুদের যুদ্ধে কাফেরদের কিছুতেই বিজয়ী মনে করা যায় না।

যুদ্ধের তৃতীয় দফা শুরু না করে আবু সুফিয়ানের মক্কার পথে দ্রুত পলায়ন দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, সে আশঙ্কা করছিলো যে, পুনরায় যুদ্ধ শুরু হলে তার সৈন্যদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি অবধারিত। হামরাউল আছাদ যুদ্ধে আবু সুফিয়ানের ভূমিকায় এরই প্রমাণ পাওয়া যায়।

এমতাবস্থায় ওহুদের যুদ্ধে কোন পক্ষের জয় পরাজয় হয়েছে, এ কথা না বলে একে একটি অমীমাংসিত যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করতে পারি। উভয় পক্ষই নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে লাভবান ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন না করে এবং নিজেদের শিবির শত্রুদের নিয়ন্ত্রণের জন্যে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে না রেখে যুদ্ধ বন্ধ করা হয়েছে। এ ধরনের যুদ্ধকেই বলা হয় অমীমাংসিত যুদ্ধ। এদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তায়ালা রব্বুল আলামীন বলেন, 'শত্রু সম্প্রদায়ের সন্ধানে তোমরা হতোদ্যম হয়ো না। যদি তোমরা যন্ত্রণা পাও, তবে তারাও তোমাদের মতো যন্ত্রণা পায় এবং আল্লাহর কাছে তোমরা যা আশা করো তারা তা করে না। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়।' (সূরা নেসা, আয়াত ১০৪)

এই আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলামীন কষ্ট দেয়া এবং তা অনুভব করার ক্ষেত্রে এক বাহিনীকে অন্য বাহিনীর সাথে তুলনা করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে, উভয় দলই সমান সমান অবস্থায় ছিলো এবং কেউ কারো ওপর জয়লাভ করেনি।

এ যুদ্ধ সম্পর্কে কোরআনের মূল্যায়ন

পরবর্তী সময়ে কোরআনে এই যুদ্ধের প্রতিটি দিকের ওপর আলোকপাত করা হয়। পর্যালোচনা করে এমন সব কারণ চিহ্নিত করা হয়, যেসব কারণে মুসলমানদের এতোবড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। কোরআনে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে, এই অভিযানে ঈমানদার এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মতদের কি কি দুর্বলতা ছিলো। এই উম্মতকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত হওয়ার স্বতন্ত্র মর্যাদা দেয়া হয়েছে। এই উম্মতের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যেকার দুর্বলতা চিহ্নিত করা হয়।

এছাড়া পবিত্র কোরআন মোনাফেকদের ভূমিকা উল্লেখ করে তাদের অবস্থা খোলাখুলি প্রকাশ করেছে। তাদের অন্তকরণে আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে লুকিয়ে থাকা শত্রুতার প্রকাশ করে তাদের মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে। সহজ সরল মুসলমানদের মধ্যে মোনাফেক এবং তাদের সাথী ইহুদীরা যেসব প্ররোচনা চালিয়েছে তাও তুলে ধরা হয়েছে। এরপর এই যুদ্ধের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্য তুলে ধরা হয়েছে।

এই যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা আলে ইমরানের ৫০টি আয়াত নাযিল হয়েছে। সর্বাগ্রে যুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'স্মরণ করো যখন তুমি তোমার পরিজনবর্গের কাছ হতে প্রত্যুষে বের হয়ে যুদ্ধের জন্যে মোমেনদের ঘাঁটি স্থাপন করছিলে এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।' (সূরা আলে এমরান, আয়াত ১২১)

পরিশেষে এই অভিযানের ফলাফল ও হেকমত সম্পর্কে সুবিন্যস্তভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন, 'অসৎকে সৎ হতে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছ, আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের সেই অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না। অদৃশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদেরকে অবহিত করবার নন, তবে আল্লাহ তাঁর রসূলদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন। 'সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের ওপর ঈমান আন। তোমরা ঈমান আনলে ও তাকওয়া অবলম্বন করে চললে তোমাদের জন্যে মহাপুরস্কার রয়েছে।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭৯)

এই যুদ্ধে আল্লাহর সন্নিহিত হেকমত

আল্লামা ইবনে কাইয়েম উল্লিখিত বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন।[৮৬]

ওলামায়ে কেরাম বলেন, ওহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের যে সঙ্কট ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো, এর মধ্যে আল্লাহর হেকমত লুকায়িত ছিলো। যেমন, মুসলমানদের তাদের কাজের মন্দ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া। তীরন্দাজদের নিজেদের অবস্থানস্থলে অবিচল থাকার যে নির্দেশ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছিলেন, তারা তা লংঘন করেছে। এ কারণেই তাদেরকে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। এছাড়া পয়গাম্বরের কাছে সেই সুন্নতের কথা প্রকাশ করাও উদ্দেশ্য যে, প্রথমে তারা পরীক্ষার সম্মুখীন হন, এরপর সফলতা লাভ করেন। যদি মুসলমানরা সব সময় জয়লাভ করতে থাকে, তাহলে ঈমানদারদের মধ্যে এমন লোকও প্রবেশ করবে, যারা প্রকৃত ঈমানদার নয়। এর ফলে সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদীর মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হবে না। এদিকে যদি সব সময় পরাজয়ের সম্মুখীন তারা হয়, তাহলে আল্লাহর নবীর আবির্ভাবের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। এ কারণে আল্লাহর হেকমতের কারণেই উভয়রকম অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এতে করে সত্য মিথ্যার পার্থক্য নিরূপিত হতে পারে। কেননা মোনাফেকদের নেফাক মুসলমানদের মধ্যে লুকায়িত রয়েছে। এই ঘটনা প্রকাশ এবং কথা ও কাজের মাধ্যমে মোনাফেকদের পরিচয় পাওয়ার পর মুসলমানরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাদের ঘরের ভেতরেই শত্রু রয়েছে। এতে মুসলমানরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক হন এবং মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

একটা হেকমত এটাও ছিলো যে, অনেক সময় সাহায্য আসতে দেরী হলে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়। মুসলমানরা পরীক্ষার সম্মুখীন হওয়ার পর ধৈর্য ধারণ করেন। অথচ মোনাফেকদের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে যায় এবং তারা আহাযারি শুরু করে।

একটা হেকমত এটাও ছিলো যে, আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের জন্যে মর্যাদার বাসস্থান জান্নাতে এমন কিছু শ্রেণী রেখেছেন যেসকল শ্রেণীতে স্বাভাবিক আসনের সওয়ারীর মাধ্যমে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়। এ কারণে বিপদ-মুসিবতের কিছু উপকরণ তৈরী করে রাখা হয়েছে যাতে, ঈমানদাররা সেই মর্যাদার শ্রেণীতে উন্নীত হতে পারেন।

এছাড়া একটা হেকমত এটাও ছিলো যে, আউলিয়া অর্থাৎ আল্লাহর বন্ধুদের জন্যে উচ্চতর মর্যাদা যে শাহাদাত, সেই মর্যাদা তাদের দান করা।

একটা হেকমত এটাও ছিলো যে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন চান যে, তাঁর দুশমনরা ধ্বংস হোক, এ কারণে তাদের জন্যে ধ্বংসের উপকরণও সৃষ্টি করেছেন। কুফুরী, যুলুম, অত্যাচার এবং

---

৮৬. যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ৯৯-১০৮
(সাইয়েদ কুতুব শহীদ তার মহান তাফসীর 'ফী যিলালিল কোরআনে'-ওও এ পর্যায়ে এক হৃদয়গ্রাহী আলোচনা পেশ করেছেন। বাংলা অনুবাদের ৪র্থ খন্ড দেখুন)

আউলিয়ায়ে কেরামকে কষ্ট দেয়ার ক্ষেত্রে তারা সীমাহীন ঔদ্ধত্য এবং বাড়াবাড়ির পরিচয় দিয়েছে। তাদের এসব আমলের পরিণামে ঈমানদারদের ধৈর্য সহিষ্ণুতায় খুশী হয়ে আল্লাহ পাক ঈমানদারদের পাকসাফ এবং কাফেরদের ধ্বংস করে দিয়েছেন।[৮৭]

ওহুদের পরবর্তী সামরিক অভিযান

মুসলমানদের সুখ্যাতির ওপর ওহুদের যুদ্ধের আপাতত পরাজয় গভীর প্রভাব বিস্তার করলো। ইসলামের শত্রুদের মনে তাদের প্রভাব হ্রাস পেলো। এর ফলে ঈমানদারদের আভ্যন্তরীণ ও বাইরের সমস্যা বেড়ে গেলো। মদীনার ওপর চারদিক থেকে হামলার আশঙ্কা বেড়ে গেলো। ইহুদী, মোনাফেক এবং বেদুইনরা প্রকাশ্য শত্রুতা শুরু করলো। সকল দলের পক্ষ থেকে মুসলমানদের কষ্ট দেয়ার চেষ্টা চলতে লাগলো। তারা এ ধরনের প্রত্যাশাও ব্যক্ত করলো যে, ইচ্ছা করলে তারা মুসলমানদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। ফলে ওহুদের যুদ্ধের পর দুই মাস যেতে না যেতেই বনু আছাদ গোত্রের লোকেরা মদীনায় হামলা করার উদ্যোগ গ্রহণ করলো। চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে আদল এবং কারাহ গোত্রের লোকেরা এমন এক ষড়যন্ত্র করলো যে, দশজন সাহাবীকে শাহাদাত বরণ করতে হলো। সেই মাসেই বনু আমের গোত্রের নেতার এক প্রতারণার ফলে ৭০ জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। এই দুর্ঘটনা বীরে মাউনার দুর্ঘটনা নামে পরিচিত। এই সময়ে বনু নাযির গোত্রের লোকেরাও প্রকাশ্য শত্রুতা শুরু করলো। তারা চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শহীদ করার চেষ্টা করলো। এদিকে বনু গাতফান গোত্রের দুঃসাহস এতো বেড়ে গিয়েছিলো যে, তারা চতুর্থ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে মদীনায় হামলা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলো।

মোটকথা মুসলমানদের যে প্রভাব ওহুদের যুদ্ধে ক্ষুণ্ন হয়েছিলো তার ফলে দীর্ঘকাল যাবত তারা ছিলো আশঙ্কার সম্মুখীন। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মকুশলতার কারণে মুসলমানদের মর্যাদা ও প্রভাব পুনরায় ফিরে আসে। এক্ষেত্রে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম পদক্ষেপ ছিলো হামরাউল আছাদ পর্যন্ত মোশরেকদের ধাওয়া করার ঘটনা। এতে মুসলিম মোহাজেরদের সম্মান বহুলাংশে পুনরুজ্জীবিত হয়। এই সামরিক পদক্ষেপে ইসলামবিরোধী শক্তি বিশেষত মোনাফেকরা হতভম্ব হয়ে যায়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর পর্যায়ক্রমে এমন ধরনের সামরিক তৎপরতা শুরু করেন যার দ্বারা মুসলমানরা শুধু পূর্বের হৃত মর্যাদা ফিরেই পায়নি বরং তা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। পরবর্তী পাতাগুলোতে সে বিষয়েই আলোকপাত করবো।

এক) ছারিয়া'য়ে আবু সালমা

ওহুদের যুদ্ধের পর মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম বনু আছাদ ইবনে খোজাইমা গোত্র মাথা তুলে দাঁড়ায়। এ সম্পর্কে মদীনায় খবর পৌঁছে যে, খোয়াইলেদের দুই পুত্র তালহা এবং সালমা তার গোত্র এবং অন্যান্য সাথীদের নিয়ে বনু আছাদ গোত্রকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর হামলার আয়োজন করছিলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অল্প সময়ের মধ্যে দেড়শত আনসার ও মোহাজেরের সমন্বয়ে একটি বাহিনী তৈরী করেন। হযরত আবু সালমা (রা.)-কে সেই বাহিনীর অধিনায়কত্ব প্রদান করা হয়। বনু আছাদ গোত্র সংগঠিত হয়ে অভিযান শুরুর আগেই হযরত আবু সালমা (রা.) তাদের ওপর এমন অতর্কিত হামলা করেন যে, তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে যায়। তাঁদের মুখোমুখি সংঘর্ষেই অবতীর্ণ হতে হয়নি। মুসলমানরা তাদের

---

৮৭. ফতহুল বারী, ৭ম খন্ড, পৃ. ৩৪৭

উট এবং বকরির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন। গনীমতের মালসহ নিরাপদে তারা মদীনায় ফিরে আসেন।

চতুর্থ হিজরীতে মহররমের চাঁদ উদয়ের রাতে মুসলমানরা যাত্রা শুরু করেন। মদীনায় ফেরার পর হযরত আবু সালমা (রা.) গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ওহুদের যুদ্ধে তিনি আহত হয়েছিলেন, সেই ক্ষতযন্ত্রণা বেড়ে যায় এবং কিছু দিন পরেই তিনি ইন্তেকাল করেন।[১]

আব্দুল্লাহ্ বিন উনাইস (রা.) মদীনার বাইরে ১৮ দিন অবস্থানের পর মোহররমের ২৩ তারিখে প্রত্যাবর্তন করেন। আসার সময় তিনি খালেদকে হত্যা করে তার মাথা সঙ্গে নিয়ে আসেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে তিনি সেই মাথাটি তাঁর সামনে রাখলে তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাতে একটি লাঠি দিয়ে বলেন, 'এটি কেয়ামতের দিন আমার ও তোমার মাঝে একটি নিদর্শন হয়ে থাকবে। যখন তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো তখন তিনি সেই লাঠিটিকে তাঁর লাশের সঙ্গে কবরে দিতে ওসিয়ত করেন।[২]

দুই) রাজীর ঘটনা

চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে 'আযল এবং কারা' গোত্রের কয়েক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ করে যে তাদের মধ্যে ইসলামের কিছু কিছু চর্চা হচ্ছে। কাজেই তাদের কোরআন ও দ্বীন শিক্ষাদানের জন্যে কয়েকজন সাহাবী (রা.)-কে সেখানে পাঠানো দরকার। সেই মোতাবেক ইবনে ইসহাকের মতে ছয় এবং সহীহ্ বোখারীর মতে দশজন সাহাবাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সঙ্গে পাঠান। ইবনে ইসহাকের মতে মুরশেদ ইবনে আবি মুরশেদ গানাভীকে এবং সহীহ বোখারীর বর্ণনা মতে আসেম বিন ওমর বিন খাত্তাবের নানা হযরত আসেম বিন সাবেতকে দলনেতা বানানো হয়। এরা যখন রাবেগ এবং জেদ্দাহর মধ্যবর্তী স্থানের হোযাইল গোত্রের 'রাজী' নামক ঝর্ণার কাছে পৌঁছুলেন তখন আযল এবং কারার উল্লিখিত ব্যক্তিরা হোযাইল গোত্রের শাখা বানু লেহয়ানকে তাদের ওপর হামলা চালাতে লেলিয়ে দেয়।

সেই গোত্রের একশত তীরন্দাজ সাহাবাদের তালাশ করতে থাকে।

তিন) আবদুল্লাহ ইবনে উনাইসের অভিযান

চতুর্থ হিজরীর মহররমের ৫ তারিখে মদীনায় খবর আসে যে, খালেদ ইবনে সুফিয়ান হুযালী মুসলমানদের ওপর হামলা করতে সৈন্য সংগ্রহ করছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা.)-কে প্রেরণ করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস (রা.) মদীনা থেকে ১৮ দিন বাইরে অবস্থান করেন। এসময় তারা হোজাইল গোত্রের একট শাখা বনু লেহইয়ানকে তাঁদের ওপর লেলিয়ে দেয়। ফলে বনু লেহইয়ান গোত্রের প্রায় একশত তীরন্দাজ তাঁদের ওপর চড়াও হয়। সাহাবারা একটি টীলার ওপর আশ্রয় নেন। তীরন্দাজরা তাঁদের ঘিরে ফেলে এবং বলে যে, আমরা তোমাদের সাথে অঙ্গীকার করছি যে, যদি তোমরা নীচে নেমে আসো তবে আমরা তোমাদের কাউকে হত্যা করবো না। ইবনে উনাইস (রা.) অবতরণ করতে অস্বীকৃতি জানান এবং সঙ্গীদের নিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করেন। তীব্র তীর বৃষ্টিতে সাতজন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। বাকি তিনজন তখনো বেঁচেছিলেন। এঁরা হচ্ছেন হযরত খোবায়েব (রা.) হযরত যায়েদ ইবনে দাছানা এবং অন্য একজন, বনু লেহইয়ান গোত্রের তীরন্দাজরা তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করে এদের নীচে নেমে আসার অনুরোধ জানান।

---

[১] যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ১০৮

[২]. যা'দুল মায়াদ ২য় খঃ ১০৯ পৃষ্ঠা। ইবনে হিশাম ২য় খঃ ৬১৯ ও ৬২০ পৃষ্ঠা।

অনন্যোপায় তিনজন সাহাবী নীচে নেমে আসেন। তাদের নিয়ন্ত্রণে পাওয়ার সাথে সাথে তারা সাহাবী তিনজনকে বেঁধে ফেলে। এতে উল্লিখিত তৃতীয় সাহাবী বললেন, তোমরা তো প্রথমেই অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছ, আমি তোমাদের সঙ্গে কিছুতেই যাব না। এতে তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এতেও ব্যর্থ হওয়ায় তারা তাঁকে হত্যা করে। হযরত খোবায়েব এবং হযরত যায়েদ ইবনে দাছানাকে মক্কায় নিয়ে বিক্রি করে দেয়। এই দুই সাহাবী বদরের দিনে মক্কায় কাফের সরদারদের হত্যা করেছিলেন। হযরত খোবায়েব (রা.) কিছুদিন মক্কায় আটক থাকেন। মক্কার দুর্বৃত্তরা এরপর তাঁকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং হরম-এর বাইরে তানঈম নামক জায়গায় নিয়ে যায়। শূলীতে উঠানোর সময়ে তিনি বলেন, আমাকে ছেড়ে দাও। দুই রাকাত নামায আদায় করবো। পৌত্তলিকরা ছেড়ে দেয়। তিনি দুই রাকাত নামায আদায় করেন। ছালাম ফেরানোর পর তিনি বললেন, 'আল্লাহর শপথ, যদি আশঙ্কা না করতাম যে, তোমরা বলাবলি করবে, আমি যা কিছু করছি ভয়ের কারণে করছি, তবে নামায আরো কিছু দীর্ঘায়িত করতাম।' এরপর বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, ওদেরকে গুণে নিন, এরপর ওদেরকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে মারুন এবং ওদের একজনকেও ছাড়বেন না। হযরত খোবায়েব (রা.) এরপর এই কবিতা আবৃত্তি করেন,

'ওরা সবাই দলে দলে আমায় ঘিরে রাখলো
গোত্রে গোত্রে জড়ো হলো, কেউ বাকি না থাকলো।
নারী শিশু থাকলো না কেউ এলো দলে দলে
আমায় ওরা নিয়ে এলো বড়ো গাছের তলে।
স্বদেশ থেকে দূরে আজ আমি সহায়হীন
তোমার কাছেই ফরিয়াদ, রব্বুল আলামীন!
আরশের মালিক দিয়ো ধৈর্যশীল অন্তর
মনোদৈহিক সাহস আমায় দিয়ো প্রভু নিরন্তর।
বললো ওরা কাফের হতে, ঢের ভালো মরণ
অশ্রুবিহীন ডুকরে কাঁদে আমার দু'নয়ন।
মুসলিম হয়ে মরতে যাচ্ছি আমার কিসের ভয়
আল্লার পথে মরবো যখন চাই না দিক নির্ণয়।
আল্লাহ পাকের খুশীর জন্যে আমার শাহাদাত
ইচ্ছা হলে টুকরো গোশতে দেন যে বারাকাত।'

হযরত খোবায়েবের (রা.) কবিতা আবৃত্তি শেষ হলে আবু সুফিয়ান তাকে বললো, তুমি কি চাও যে, তোমার পরিবর্তে আমরা মোহাম্মদকে ধরে নিয়ে আসি, তাঁর শিরশ্ছেদ করি এবং তুমি তোমার পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে যাও? হযরত খোবায়েব (রা.) দৃঢ়তার সাথে বললেন, আল্লাহর শপথ, পরিবার পরিজনের কাছে আমার থাকার বিনিময়ে মোহাম্মদ(সঃ)-এর পায়ে একটা কাঁটা বিঁধবে এবং তিনি যেখানে আছেন সেখানে বসেও সেই কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণা ভোগ করবেন, এটাও আমার পছন্দ নয়।

আল্লাহর দুশমন পৌত্তলিকরা এরপর হযরত খোবায়েব (রা.)-কে শুলীতে ঝুলায় এবং তার লাশ পাহারা দেয়ার জন্যে লোক নিয়োগ করে। হযরত আমর ইবনে উমাইয়া এসে রাত্রিকালে লাশ তুলে দাফন করেন। হযরত খোবায়েবকে (রা.) ওকবা ইবনে হারেস হত্যা করেছিলো। বদরের যুদ্ধে তার বাবাকে হযরত খোবায়েব (রা.) হত্যা করেছিলেন।

সহীহ বোখারী শরীফে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত খোবায়েব (রা.) হচ্ছেন প্রথম বুজুর্গ, যিনি মৃত্যুদন্ডের পূর্বক্ষণে দুই রাকাত নামায আদায়ের রীতি প্রবর্তন করেন। কাফেরদের হাতে বন্দী থাকাকালে তাকে তাজা আঙ্গুর খেতে দেখা গেছে। অথচ সেই সময় মক্কায় খেজুরও পাওয়া যেতো না।

গ্রেফতারকৃত অপর সাহাবী হযরত যায়েদ ইবনে দাছানা (রা.)-কে সফওয়ান ইবনে উমাইয়া ক্রয় করে এবং তার পিতার হত্যার বদলে হত্যা করে।

হযরত আসেম (রা.) এর আগেই কাফেরদের তীর বর্ষণে নিহত হয়েছিলেন। মক্কার কোরায়শরা হযরত আসেমের (রা.) দেহের কোনো অংশ হলেও নিয়ে আসার জন্যে লোক পাঠালো। কেননা বদরের যুদ্ধে কাফেরদের একজন বিশিষ্ট নেতাকে তিনি হত্যা করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা মৌমাছির ঝাঁক পাঠিয়ে তাঁর লাশ হেফাযত করেন। ফলে কাফেররা হযরত আসেম (রা.)-এর পবিত্র লাশের সামান্য অংশও নিতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে হযরত আসেম (রা.) আল্লাহর কাছে এ আবেদন করে রেখেছিলেন যে, তাকে যেন কোন মোশরেক স্পর্শ করতে না পারে এবং তিনিও যেন কোন মোশরেককে স্পর্শ না করেন। পরবর্তী সময়ে এই ঘটনা শোনার পর হযরত ওমর (রা.) প্রায়ই বলতেন, আল্লাহ রব্বুল আলামীন মোমেন বান্দার হেফাযত তার ইন্তেকালের পরেও ঠিক সেই রকমই করেন, যেমন করে থাকেন জীবদ্দশায়।[৩]

চার) বীরে মাউনার মর্মন্তুদ ঘটনা

রাজিঈ এর ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সেই মাসেই ঘটেছিলো বীরে মাউনার ঘটনাও। রাজিঈ এর ঘটনার চেয়ে এ ঘটনাও কম মর্মন্তুদ নয়। এ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই, আবু বারা আমের ইবনে মালেক মদীনায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হলো। সে 'মালায়েকুল আসনা' অর্থাৎ বর্শা খেলোয়াড় উপধিতে ভূষিত ছিলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু সে ইসলাম এবং গ্রহণ করেনি ইসলাম যে তার অপছন্দ এ কথাও বলেনি। সে বললো, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনি যদি আপনার সাহাবাদেরকে নজদের অধিবাসীদের কাছে প্রেরণ করেন, তবে আমার বিশ্বাস, তারা ইসলামের দাওয়াত কবুল করবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার সাহাবাদের ব্যাপারে নজদের অধিবাসীদের আমার সন্দেহ হয়। আবু বারা বললো, তারা আমার আশ্রয়ে থাকবেন। একথার পর আল্লার রসূল ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মোতাবেক ৪০ জন সাহাবাকে আবু বারা'র সাথে প্রেরণ করেন। ইমাম বোখারী সহীহ বোখারীতে যে ৭০ জন সাহাবীর কথা বলেছেন, সেই বর্ণনাই সত্য। সেই ৭০ জন সাহাবীর আমীর নিযুক্ত করা হয়েছিলো মুনযার ইবনে আমরকে। তিনি বনু সায়েদা গোত্রের অধিবাসী এবং মুতাকলিল মউত উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। উল্লিখিত ৭০ জন সাহাবীর মধ্যে সকলেই ছিলেন ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন এবং অত্যন্ত পরহেযগার। তাঁরা দিনের বেলায় কাঠ কেটে সেই টাকায় আহলে সোফফার অধিবাসীদের জন্যে খাবার ক্রয় করতেন, নিজেরা কোরআন পড়তেন এবং অন্যদেরও পড়াতেন। রাত্রিকালে তারা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সামনে মোনাজাত ও নামাযে কাটিয়ে দিতেন। পথ চলতে চলতে ইসলামের দাঈ এ ৭০জন সাহাবা মাউনার জলাশয়ের কাছে গিয়ে পৌঁছুলেন। এই জলাশয় বনু আমের এবং হোররা বনি সালিমের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থিত। সেখানে পৌঁছার পর পরই

---

[৩]. ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ৬৯-৭৯, যাদুল মায়াদ ২য় খন্ড, পৃ. ২০৯, সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৬৮, ৫৬৯, ৫৮৫

সাহাবারা উম্মে সুলাইমের ভাই হারাম ইবনে মালহানের হাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেরিত চিঠি ইসলামের কট্টর দুশমন আমের ইবনে তোফায়েলের কাছে পাঠালেন। এই দুর্বৃত্ত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র চিঠিখানি খুলেও দেখেনি বরং একজন লোককে ইশারা করলো। সেই লোকটি হযরত হারাম ইবনে মালহান (রা.)-এর পেছন দিক থেকে এত জোরে বর্শা দিয়ে আঘাত করলো যে, বর্শার ফলা সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলো। রক্ত দেখে হযরত হারাম ইবনে মালহান (রা.) বললেন, আল্লাহু আকবর, কাবার প্রভুর কসম, আমি কামিয়াব হয়ে গেছি।

এর কিছুক্ষণ পরই দুশমনে খোদা কট্টর, দুর্বৃত্ত, কাফের আমের ইবনে তোফায়েল অন্য সাহাবাদের ওপর হামলা করতে তার গোত্র বনি আমের-এর লোকদের আওয়ায দিলো। কিন্তু তারা আবু বারা'র আশ্রয়ের কারণে আমেরের ডাকে সাড়া দেয়নি। এদিক থেকে হতাশ হয়ে আমের বনি সালিম গোত্রের লোকদের আওয়ায দিলো। বনি সালিমের তিন শাখা আছিয়্যা বাআল এবং জাকোয়ান সে ডাকে সাড়া দিয়ে সাহাবায়ে কেরামকে এসে ঘেরাও করলো। প্রত্যুত্তরে সাহাবারাও লড়াই করলেন। কিন্তু তাঁরা প্রায় সবাই শহীদ হয়ে গেলেন। হযরত কা'ব ইবনে যায়েদ নাজ্জার (রা.) শুধু জীবিত ছিলেন। তাঁকে শাহাদাতপ্রাপ্ত সাহাবাদের মধ্য থেকে আহত অবস্থায় তুলে নেয়া হয়। তিনি খন্দকের যুদ্ধ পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। হযরত আমর ইবনে উমাইয়া জামারি একা হযরত মোনযার ইবনে ওকবা আমেরের (রা.) উট চরাচ্ছিলেন। তারা ঘটনাস্থলে পাখীর উড্ডয়ন দেখে সেখানে পৌঁছালেন। হযরত মোনযার (রা.) তার বন্ধুদের সাথে লড়াই করতে করতে শহীদ হন। হযরত আমর ইবনে উমাইয়া জামারিকে বন্দী করা হয়। তিনি ছিলেন মোদার গোত্রের লোক। এই পরিচয় পাওয়ার পর আমের ইবনে তোফায়েল তাঁর কপালের উপরের দিকের কিছু চুল কেটে তার মায়ের পক্ষ থেকে তাকে মুক্ত করে দেয়। এই দুর্বৃত্তের মা একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেবে বলে ইতিপূর্বে মানত করেছিলো।

হযরত আমর ইবনে উমাইয়া জামারি এই হৃদয় বিদারক খবর নিয়ে মদীনায় পৌঁছুলেন। ৭০ জন বিশিষ্ট সাহাবার শাহাদাতের ঘটনা ওহুদের দুর্বিপাকের ঘটনাই স্মরণ করিয়ে দিলো। ওহুদের যুদ্ধে তো সংঘর্ষে উভয় পক্ষে হতাহত হওয়ার সুযোগ ছিলো, কিন্তু সরল প্রাণ সাহাবারা এখানে এক নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হন। হযরত আমর ইবনে উমাইয়া জামারি ফেরার পথে কানাত প্রান্তরের কাছে কারকারা নামক জায়গায় পৌঁছে একটি গাছের ছায়াতলে নেমে পড়েন। সেখানে বনু কেলাব গোত্রের দুইজন লোকও এসে হাযির হয়েছিলো। উভয়ে ঘুমিয়ে পড়ার পর হযরত আমর ইবনে উমাইয়া উভয়কে হত্যা করেন। তাঁর ধারণা মতে তিনি সঙ্গীদের হত্যার প্রতিশোধ নিচ্ছেন। অথচ এই দুইজন লোকের কাছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে নিরাপত্তামূলক চিঠি ছিলো। কিন্তু হযরত আমর সেকথা জানতেন না। মদীনায় এসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ ঘটনা জানানোর পর তিনি বললেন, তুমি এমন দুইজন লোককে হত্যা করেছো যাদের হত্যার ক্ষতিপূরণ আমাকে অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমান এবং তাদের ইহুদী মিত্রদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের অর্থ সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন।[৪] এই ঘটনার কারণেই বনু নাযিরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যে সম্পর্কে পরে আলোচনা করা হবে।

---

[৪]. ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, ১৮৩-১৮৭, যাদুল মায়াদ ২য় খন্ড, ১০৯, ১১০, সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, ৫৮৪, ৫৮৬

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বীরে মাউনা এবং রাজিঈ-এর ঘটনায়[৫] এতো বেশী মর্মাহত হয়েছিলেন এবং এতো বেশী আঘাত পেয়েছিলেন, যা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।[৬] উভয় ঘটনার ব্যবধান ছিলো মাত্র কয়েক দিনের। যে সকল কওম ও গোত্র সাহাবায়ে কেরামের সাথে এ ধরনের নিষ্ঠুর বিশ্বাঘাতকতা করেছিলো, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একমাস যাবত তাদের উপর বদদোয়া করেছিলেন। সহীহ বোখারী শরীফে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, বীরে মাউনার যে সকল লোক সাহাবায়ে কেরামকে শহীদ করেছিলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ওপর ত্রিশ দিন যাবত বদদোয়া করেন। ফজরের নামাযের পর তিনি বাআল, জাকওয়ান, লেহইয়ান এবং উছাইয়ার জন্যে বদদোয়া করে বলতেন, আছিয়্যা গোত্রের লোকেরা আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূলের নাফরমানি করেছে। আল্লাহ তায়ালা এই সম্পর্কে তাঁর রসূলের মনোবেদনা দূর করতে কোরআনের আয়াত নাযিল করেন। সেই আয়াত পরবর্তী সময়ে মনসুখ অর্থাৎ হয়ে গেছে। কোরআনে পাকের সেই আয়াতের বক্তব্য ছিলো এই যে, আমাদের স্বজাতীয়দের জানিয়ে দাও যে, আমাদের প্রতিপালকের সাথে আমরা এমন অবস্থায় দেখা করেছি যে, তিনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং আমরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট।

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদদোয়া দেয়া বন্ধ করেন।[৭]

পাঁচ) বনু নাযিরের যুদ্ধ

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইহুদীরা ইসলাম এবং মুসলমানের নামে জ্বলতো, পুড়তো। কিন্তু তারা বীর যোদ্ধা ছিলো না, ছিলো ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকারী। এ কারণে তারা যুদ্ধের পরিবর্তে ঘৃণা এবং শত্রুতা প্রকাশ করতো। তারা মুসলমানদের সাথে চুক্তি ও অঙ্গীকার সত্ত্বেও তাদের কষ্ট দিতেও তাদের ওপর নির্যাতন চালাতে নানা প্রকার অজুহাত খুঁজে বেড়াতো। বনু কাইনুকা গোত্রের বহিষ্কার এবং কাব ইবনে আশরাফের হত্যাকান্ডের পর ইহুদীদের সাহস কমে যায়। তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে চুপচাপ থাকে। কিন্তু ওহুদের যুদ্ধের পর তাদের সাহস ফিরে আসে। তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা করতে শুরু করে। মদীনার মোনাফেকরা মক্কার মোশরেকদের সাথে গোপনে গাঁটছড়া বাঁধে এবং ইহুদীরা মোশরেকদের সহায়তা করতে থাকে।[৮]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব কিছু জেনেও ধৈর্য ধরেন। কিন্তু রাজিঈ এবং মাউনার দুর্ঘটনার পর তাদের সাহস বহুলাংশে বেড়ে যায় এবং তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শেষ করে দেয়ার কর্মসূচী গ্রহণ করে। ঘটনার বিবরণ এই, আল্লাহর রসূল হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কয়েকজন সাহাবাকে সঙ্গে নিয়ে ইহুদীদের কাছে গমন করেন। তাদের সাথে বনু কেলাবের নিহত দুই ব্যক্তির মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে আলোচনা করেন, যাদেরকে হযরত আমর ইবনে উমাইয়া জামারি ভুলক্রমে হত্যা করেছিলেন। ইহুদীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী হত্যার উল্লিখিত ক্ষতিপূরণে মুসলমানদের সহায়তা করতে তারা বাধ্য ছিলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সেকথা বলার

---

৫. ওয়াকেদী লিখেছেন, রাজিঈ এবং মাউনা উভয় ঘটনার খবর আল্লাহর রসূল একই রাতে পেয়েছিলেন।

৬. ইবনে সা'দ হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রসূল (স.) বীরে মাউনার ঘটনায় যতোটা মর্মাহত এবং শোকাহত হন, অন্য কোন ঘটনায় ততোটা হননি। মুখতাছারুছ ছিরাত, শেখ আবদুল্লাহ পৃ.২৬০

৭. সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, ৫৮৬, ৫৮৭, ৫৮৮

৮ সুনানে আবু দাউদ শরহে আওনুল মাবুদ ৩য় খন্ড, পৃ. ১১৬, ১১৭

পর তারা বললো, হে আবুল কাসেম, আমরা তাই করবো। আপনি আপনার সঙ্গীদের নিয়ে এখানে অপেক্ষা করুন, আমরা ব্যবস্থা করছি। একথার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীদের একটি দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসে অপেক্ষা করছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ওমর (রা.) হযরত আলী (রা.) এবং অন্য কয়েকজন সাহাবা সেই সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলেন।

ইহুদীরা একটু দূরে যাওয়ার পর তাদের কাঁধে শয়তান সওয়ার হলো। তাদের ভবিষ্যত দুর্ভাগ্যকে শয়তান সৌভাগ্য হিসাবে দেখালো। ইহুদীরা নিজেদের মধ্যে কুপরামর্শ করলো যে, এই তো চমৎকার সুযোগ, চলো আমরা মোহাম্মদকে প্রাণে মেরে ফেলি। দেয়ালের ওপার থেকে ভারি চাক্কি ফেলে আল্লাহর রসূলকে মেরে ফেলতে কে রাযি আছে ? এটা জানতে চাওয়ায় আমর ইবনে জাহাশ নামে একজন ইহুদী রাজি হলো। সালাম ইবনে মাশকাম নামের একজন ইহুদী বললো, সাবধান, অমন কাজ করো না। আল্লাহর কসম, তোমার ইচ্ছার খবর আল্লাহর রসূল পেয়ে যাবেন। আল্লাহ তায়ালাই তাঁকে খবর দেবেন। তাছাড়া মুসলমানদের সাথে আমাদের যে অঙ্গীকার রয়েছে, তাও লংঘন করা হবে। কিন্তু দুর্বৃত্ত স্বভাব দুর্ভাগা ইহুদীরা কোন কথাই কানে তুললো না তারা নিজেদের অসদুদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অটল রইলো।

এদিকে রব্বুল আলামীন আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় রসূলের কাছে হযরত জিবরাইল (আ.)-কে প্রেরণ করলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্রুত সেই জায়গা থেকে উঠে মদীনার পথে রওয়ানা হলেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁকে অনুসরণ করে তাঁকে বললেন, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি এতো দ্রুত চলে এলেন যে, আমরা কিছুই বুঝতে পারিনি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, কুচক্রী ইহুদীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সাহাবাদের অবহিত করলেন।

মদীনা ফিরে আসার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোহাম্মদ ইবনে মোসলমাকে বনু নাযির গোত্রের কাছে প্রেরণ করেন এবং তাদের এ নোটিশ দেন যে, তোমরা অবিলম্বে মদীনা থেকে বেরিয়ে যাও। এখানে তোমরা আমাদের সাথে থাকতে পারবে না। তোমাদের দশ দিনের সময় দেয়া যাচ্ছে। এরপর যাদের পাওয়া যাবে, তাদের শিরশ্ছেদ করা হবে। এই নোটিশ পাওয়ার পর ইহুদীরা বহিষ্কার হওয়া ব্যতীত অন্য কোন উপায় খুঁজে পেলো না। কয়েক দিনের সফরের প্রস্তুতি তারা শুরু করলো। কিন্তু মোনাফেক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইহুদীদের খবর পাঠালো যে, তোমরা নিজের জায়গায় অটল থাকো, বাড়ীঘর ছেড়ে যেয়ো না। আমার নিয়ন্ত্রণে ২ হাজার যোদ্ধা রয়েছে যারা তোমাদের সঙ্গে দুর্গে প্রবেশ করবে। এরা তোমাদের নিরাপত্তায় জীবন দিয়ে দেবে। তবুও তোমাদের বের করে দেয়া হলে আমরাও তোমাদের সাথে বেরিয়ে যাব। তোমাদের ব্যাপারে কারো হুমকিতে আমরা প্রভাবিত হব না। তোমাদের সাথে যুদ্ধ করা হলে আমরা তোমাদের সাহায্য করবো। এছাড়া বনু কোরায়যা এবং বনু গাতফান গোত্র তোমাদের মিত্র, তারাও তোমাদের সাহায্য করবে।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মোনাফেকের প্রেরিত এই খবরে ইহুদীরা চাঙ্গা হলো। তারা সিদ্ধান্ত নিলো যে, বহিষ্কৃত হওয়ার চেয়ে যুদ্ধ করবে। ইহুদী নেতা হুয়াই ইবনে আখতার আশা করেছিলো যে, মোনাফেক নেতা তার কথা রাখবে। তাই সে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে খবর পাঠালো যে, আমরা নিজেদের বাড়ীঘর ছেড়ে যাব না। আপনার যা করার, তা করুন।

মুসলমানদের জন্যে এই চ্যালেঞ্জ ছিলো নাযুক এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই পট পরিবর্তনের সময়ে শত্রুদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার পরিণতি সংশয়মুক্ত ছিলো না। বিপজ্জনক পরিস্থিতি যে কোন সময় সৃষ্টি হতে পারে। সমগ্র আরব

ছিলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে সোচ্চার। মুসলমানদের দু'টি তাবলীগী প্রতিনিধিদলকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছিলো। বনু নাযির গোত্রের ইহুদীরা এতো বেশী শক্তিশালী ছিলো যে, তাদের অস্ত্র সমর্পণ করানো সহজ কাজ ছিলো না। এছাড়া তাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ঝুঁকি নেয়াও ছিলো বিপজ্জনক। বীরে মাউনা এবং তার আগের মর্মান্তিক ঘটনার পর মুসলমানরা হত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি অপরাধ সম্পর্কে অনেক বেশী সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। এ ধরনের অপরাধে মুসলমানরা মানসিকভাবে জর্জরিত এবং বিরক্ত ছিলেন। ফলে এ কারণে তাঁরা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, বনু নাযির যেহেতু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছে, একারণে তাদের সাথে লড়াই করতেই হবে—পরিণাম যাই হোক না কেন। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুয়াই ইবনে আখতারের পয়গাম পাওয়ার সাথে সাথে সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহু আকবর বলে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যান। এ সময়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাকতুমকে মদীনার দেখাশোনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। এরপর সাহাবায়ে কেরামসহ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু নাযিরের বসতি এলাকা অভিমুখে রওয়ানা হন। হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা.)-এর হাতে পতাকা দেয়া হয়েছিলো। বনু নাযিরের এলাকায় গিয়ে তাদের অবরোধ করা হয়।

এদিকে বনু নাযির তাদের দুর্গের ভেতর আশ্রয় নিয়ে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। দুর্গদ্বার বন্ধ করে দিয়ে তারা তীর ও পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করে। ঘন খেজুরের বাগানগুলো তারা ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছিলো, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সময় আদেশ দিলেন যে, খেজুর গাছগুলো কেটে পুড়ে ফেলা হোক। সেদিকে ইঙ্গিত করেই বিখ্যাত কবি হাসসান ইবনে ছাবেত (রা.) লিখেছিলেন,

'বনু লুওয়াই সর্দারদের জন্যে সেতো মামুলী ব্যাপার
দাউ দাউ জ্বলবে অগ্নিশিখা বুয়াইবার চারিধার।'

বুয়াইবা ছিলো বনু নাযির গোত্রের খেজুরের বাগান ঘেরা এলাকা। এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন, 'তোমরা খেজুর গাছগুলো কেটেছ এবং যেগুলি কান্ডের উপরে স্থির রেখে দিয়েছ সে তো আল্লাহরই অনুমতিক্রমে। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ তায়ালা পাপাচারীদের লাঞ্ছিত করবেন।' (সূরা হাশর, আয়াত, ৫)

বনু নাযিরকে অবরোধ করার পর বনু কোরায়যা গোত্র তাদের ধারে কাছেও আসেনি। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও কথা রাখেনি। বনু নাযিরের মিত্র গোত্র গাতফান গোত্রের লোকেরাও সাহায্যের জন্যে অগ্রসর হয়নি। মোটকথা কেউই ইহুদী বনু নাযিরদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেনি বা তাদের বিপদ দূর করার কাজে উদ্যোগী হয়নি। এ কারণেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ ঘটনার উদাহরণ পেশ করতে গিয়ে বলেছেন, 'এদের তুলনা শয়তান, যে মানুষকে বলে, কুফরী করো। তারপর যখন সে কুফুরী করে, শয়তান তখন বলে, তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমি জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।' (সূরা হাশর, আয়াত ১৬)

অবরোধ দীর্ঘায়িত হয়নি। ছয় সাত রাত, মতান্তরে পনেরো রাত। এই সময়ের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদের মনে মুসলমানদের প্রভাব ফেলে দেন, তাদের মনোবল নষ্ট হয়ে যায়। তারা স্বেচ্ছায় অস্ত্র সমর্পণ করতে রাজি হয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে পাঠায় যে, আমরা মদীনা ছেড়ে চলে যেতে প্রস্তুত রয়েছি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীদের প্রস্তাব অনুমোদন করেন। তিনি এটাও অনুমোদন করেন যে তারা অস্ত্র ব্যতীত অন্য জিনিসপত্র যতোটা সাথে নিয়ে যেতে পারে, নিয়ে যাবে এবং সপরিবারে মদীনা ত্যাগ করবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে এ মর্মে অনুমোদন পাওয়ার পর বনু নাযির অস্ত্র সমর্পণ করে

এবং নিজেদের হাতে ঘর দোর ভেঙ্গে প্রয়োজনীয় জিনিস বাঁধাছাঁদা করতে থাকে। দরজা জানালা যতোটা সম্ভব সঙ্গে নেয়ার ব্যবস্থা করে। কেউ কেউ ছাদের কড়া এবং দেয়ালের খুঁটিও সঙ্গে নিয়ে যায়। এরপর নারী ও শিশুদের উটের পিঠে তুলে মদীনা ছেড়ে চলে যায়। অধিকাংশ ইহুদী খয়বরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। এদের মধ্যে হুয়াই ইবনে আখতার এবং সালাম ইবনে আবুল হাকিক নামক বিশিষ্ট ইহুদীরা খয়বরে যায়। একদল সিরিয়ার পথে রওয়ানা দেয়। তবে ইয়ামিন ইবনে আমর এবং আবু সাঈদ ইবনে ওয়াহাব ইসলাম গ্রহণ করে। এ কারণে তাদের জিনিসপত্র মুসলমানরা স্পর্শও করেননি।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শর্তানুযায়ী বনু নাযির গোত্রের অস্ত্রশস্ত্র, জমি, ঘর ও বাগান, নিজের নিয়ন্ত্রণে নেন। অস্ত্রের মধ্যে ৫০টি বর্ম, ৫০টি খুদ এবং ৩৪০টি তরবারি ছিলো।

বনু নাযির গোত্রের বাগান, জমি, এবং ঘরদোর ছিলো শুধুমাত্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মালিকানাধীন। নিজের জন্যে রাখা বা কাউকে দান করে দেয়ার ব্যাপারে তাঁর একক অধিকার ছিলো। এ কারণে গনীমতের মালের মতো এইসব সম্পদ থেকে তিনি এক পঞ্চমাংশ বের করে নেননি। কেননা আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় রসূল (রা.)-কে এই সম্পদ 'ফাঈ' হিসাবে দান করেছেন। মুসলমানরা যুদ্ধ করে এই সম্পদ অর্জন করেননি। বিশেষ ক্ষমতা ও অধিকারের কারণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই সম্পদ শুধু প্রথম পর্যায়ে হিজরতকারী মোহাজেরদের প্রদান করেন। দুইজন আনসার সাহাবী আবু দোজানা এবং ছহল ইবনে হোনায়েফ (রা.)-কে তাদের দারিদ্র্যের কারণে কিছু সম্পদ প্রদান করা হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জন্যে সামান্য কিছু সম্পদ রেখে দেন। সেই সংরক্ষিত সম্পদ ব্যয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবন সঙ্গিনীদের সারা বছরের ব্যয় নির্বাহ করতেন।

বনু নাযিরের এই অভিযান ৬২৫ ঈসায়ী সালের ৪ঠা আগস্ট সংঘটিত হয়েছিলো। আল্লাহ তায়ালা এই ঘটনার প্রেক্ষিতে পুরো সূরা হাশর নাযিল করেন। এতে ইহুদীদের দুর্বৃত্তপনার পরিচয় তুলে ধরে মোনাফেকদের স্বরূপ উন্মোচন করা হয়।

'ফাঈ' এর নীতিমালা বর্ণনার পর মোহাজের ও আনসারদের প্রশংসা করা হয় এবং একথাও বলা হয় যে, রণকৌশলের প্রেক্ষিতে শত্রুদের গাছপালা কেটে ফেলা এবং ওতে আগুন ধরিয়ে দেয়া যায়। এ ধরনের কাজ যমিনে ফাছাদ সৃষ্টি করা নয়। এরপর ঈমানদারদের তাকওয়া অর্জন এবং আখেরাতের প্রস্তুতির তাকিদ দেয়া হয়। পরে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর নিজের হামদ ছানা প্রকাশ এবং নিজের নাম ও গুণবৈশিষ্ট বর্ণনা করে সূরা সমাপ্ত করেন।

তাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, এই সূরাকে সূরায়ে বনু নাযির বলাই সমীচীন।[৯]

ছয়) নজদের যুদ্ধ

বনু নাাযিরের যুদ্ধে কোন প্রকার ত্যাগ তিতিক্ষা ছাড়াই মুসলমানরা প্রশংসনীয় সাফল্য লাভ করেছেন। এতে মদীনায় মুসলমানদের ক্ষমতা আরো মযবুত ও সংহত হয়। মোনাফেকরা হতাশ হয়ে যায় এবং তাদের মুখ কালো হয়ে ওঠে। তারা প্রকাশ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে সাহস পাচ্ছিলো না। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেইসব বেদুইনদের খবর নেয়ার জন্যে সচেষ্ট হন, যারা ওহুদের যুদ্ধের পর থেকেই মুসলমানদের কঠিন সমস্যায় ফেলে রেখেছিলো। ইসলামের দাঈ বা প্রচারকদের ওপর অত্যন্ত নৃশংসভাবে হামলা করে তাদের জীবন

---

৯. ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ১৯০, ১৯১, ১৯২, যাদুল মায়াদ ২য় খন্ড, পৃ. ৭১, ১১০, সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৭৪, ৫৭৫

শেষ করে দিয়েছিলো। পরে তাদের সাহস এতো বেড়ে যায় যে, তারা মদীনায় হামলা করারও চিন্তা করতে থাকে।

বনু নাযিরের যুদ্ধ শেষে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় অবস্থানের অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই খবর পেলেন যে, বনু গাতফানের বনু মাহারেব ও বনু ছালাবা গোত্র মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে বেদুইনদের সমবেত করতে শুরু করেছে। এই খবর পাওয়ার পরপরই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নজদে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন। নজদ এর প্রান্তর পেরিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানরা বহুদূর অগ্রসর হন। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিলো কঠোর প্রাণ বেদুইনদের মনে ভয় ধরানো, যেন, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগের মতো তৎপরতার পুনরাবৃত্তি করতে সাহসী না হয়।

লুটতরাজ, ডাকাতি, রাহাযানি, হঠকারিতা ইত্যাদিতে অভ্যস্ত ও অভিজ্ঞ বেদুইনরা মুসলমানদের এ আকস্মিক অভিযানের খবর শোনামাত্রই ভীত হয়ে পালিয়ে গিয়ে পাহাড়ে আশ্রয় নেয়। মুসলমানরা এসব লুটেরাদের ওপর প্রভাব বিস্তারের পর মদীনার পথে রওয়ানা হন।

যুদ্ধ সম্পর্কে উল্লেখকারীরা এ পর্যায়ে নির্দিষ্ট একটি যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন। চতুর্থ হিজরীর রবিউস সানি বা জমাদিউল আউয়ালে নজদের মাটিতে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই 'যুদ্ধকে যাতুর রেকা' যুদ্ধ নামে অভিহিত করা হয়। যতোটা তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে বোঝা যায় যে, সেই সময় নজদের ভেতরেই একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। কেননা মদীনার অবস্থা ছিলো কিছুটা সেই রকম। আবু সুফিয়ান ওহুদ যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে পরের বছর বদর প্রান্তরে যে যুদ্ধের হুমকি দিয়েছিলো, মুসলমানরা সেই হুমকির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময় আবার ঘনিয়ে আসছিলো। বেদুইনদেরকে তাদের হঠকারিতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়ে যেতে দিয়ে বদরের মতো অনুরূপ বড় ধরনের কোন যুদ্ধে যাওয়ার জন্যে মদীনা খালি করে দেয়া বুদ্ধিমানের কাজ ছিলো না। বরং বদরের প্রান্তরে যেরকম ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো, সেই রকম যুদ্ধের জন্যে বেরোবার আগে বেদুইনদের বাড়াবাড়ির ওপর আঘাত হানা দরকার, সেই আঘাতের কথা ভেবে ভবিষ্যতে তারা যেন মদীনার ওপর হামলা করার চিন্তা কখনো মনের কিনারায়ও আনতে না পারে।

চতুর্থ হিজরীতে রবিউস সানী বা জমাদিউল আউয়ালে যে যুদ্ধ হয়েছিলো, সেই যুদ্ধ যাতুর রেকা যুদ্ধ নয় বলেই মনে হয়। যতোটা তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে, এতে ওরকম যুদ্ধ সেই সময় হয়নি। কারণ যাতুর রেকা যুদ্ধে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) এবং হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা.) উপস্থিত ছিলেন। আবু হোরায়রা (রা.) খয়বর যুদ্ধের অল্প কয়েকদিন আগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আবু মুসা আশয়ারী (রা.) খয়বরেই আল্লাহর রসূলের খেদমতে হাযির হয়েছিলেন।

৪র্থ হিজরীর বেশ কিছু কাল পরেই যে যাতুর রিকা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো, তার দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে এই যে, এতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাওফের নামায[১০] আদায় করেছিলেন। খাওফের নামায সর্বপ্রথম আদায় করা হয় গাযওয়ায়ে আসফানে। আর গাযওয়ায়ে

---

১০. যুদ্ধাবস্থার নামাযকে খওফের নামায বলা হয়। এই নামাযের একটা নিয়ম হচ্ছে এই যে, অর্ধসংখ্যক সৈন্য অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত অবস্থাতেই ইমামের পেছনে নামায পড়বেন, বাকী অর্ধেক সৈন্য অস্ত্র-সজ্জিত অবস্থায় শত্রুদের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। এক রাকাত নামাযের পর দ্বিতীয় অর্ধেক ইমামের পেছনে চলে আসবেন এবং প্রথম অর্ধেক শত্রুদের প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য সামনে চলে যাবেন। ইমাম দ্বিতীয় রাকাত পুরো করে নেবেন এবং সেনাবাহিনীর উভয় দল নিজ নিজ নামায পালাক্রমে পুরো করে নেবেন। এর সঙ্গে সঙ্গতিশীল এই নামাযের আরো কয়েকটি নিয়ম রয়েছে, যা যুদ্ধের অবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে আদায় করা হয়ে থাকে। বিস্তারিত বিবরণ হাদীসের কেতাবসমূহ দেখুন।

আসফান যে খন্দক যুদ্ধের পরে সংঘটিত হয়েছিলো, এতে কোনই সন্দেহ নেই। খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো ৫ম হিজরীর শেষ ভাগে। প্রকৃতপক্ষে, গাযওয়ায়ে আসফান ছিলো হোদায়বিয়া সফরের একটি প্রাসঙ্গিক ঘটনা। আর হুদায়বিয়া সফর ছিলো ৬ষ্ঠ হিজরীর শেষ ভাগে। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খায়বর অভিমুখে রওয়ানা হয়েছিলেন। এই সূত্র থেকেও প্রমাণিত হচ্ছে যে, যাতুর রিকা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো খায়বর যুদ্ধের পরেই।

সাত) বদরের দ্বিতীয় যুদ্ধ

মদীনার আশেপাশের শত্রুদের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে এবং বেদুইনদের দুর্বৃত্তপনা স্তব্ধ করে দেয়ার পর মুসলমানরা বড়ো দুশমন কোরায়শের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করলেন। কেননা খুব দ্রুত বছর শেষ হয়ে যাচ্ছিলো এবং ওহুদের সময়ে নির্ধারণ করা সময়ও খুব দ্রুত এগিয়ে আসছিলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামের কর্তব্য ছিলো সেই সময় বেরিয়ে পড়া এবং আবু সুফিয়ান এবং তার কওমের সাথে যুদ্ধ করে হয়ে তাদের বুঝিয়ে দেয়া যে, মুসলমানরা দুর্বল নয়। এছাড়া এই যুদ্ধে হেদায়াতপ্রাপ্ত ও বিশ্ব স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী দলই টিকে থাকার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। পরিস্থিতিও থাকবে তাদেরই অনুকূলে।

চতুর্থ হিজরীর শাবান মাস অর্থাৎ ৬২৬ হিজরীর জানুয়ারী মাসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহার ওপর মদীনার দায়িত্বভার ন্যস্ত করে পরিকল্পিত যুদ্ধের উদ্দেশ্যে বদর অভিমুখে রওয়ানা হন। তাঁর সাথে ছিলো দেড় হাজার মোজাহেদ এবং দশটি ঘোড়া। সেনাবাহিনীর পতাকা হযরত আলীর (রা.) হাতে প্রদান করা হয়। বদরের প্রান্তরে পৌঁছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানরা শত্রুর জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন।

অন্যদিকে আবু সুফিয়ান পঞ্চাশটি সওয়ারীসহ দুই হাজার পৌত্তলিক সৈন্যের এক দল নিয়ে রওয়ানা হয় এবং মক্কা থেকে এক প্রান্তর দূরবর্তী মাররাজ জাহরানের মাজনা নামের বিখ্যাত জলাশয়ের তীরে তাঁবু স্থাপন করে। কিন্তু মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় থেকেই আবু সুফিয়ানের মন ছিলো ভীতবিহ্বল। ইতিপূর্বে মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করে কি লাভ হয়েছে? আবু সুফিয়ান অতীত অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন করতে লাগলো। মুসলমানদের বীরত্ব ও ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা ভেবে আবু সুফিয়ান এগোতে সাহস পাচ্ছিলো না। মাররাজ জাহরান নামক জায়গায় পৌঁছে তার মনোবল পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেলো। সে মক্কায় ফিরে যাওয়ার বাহানা খুঁজতে শুরু করলো। অবশেষে সঙ্গীদের সে বললো, শোনো সঙ্গীরা যুদ্ধ তো সেই সময় করা যায়, যখন প্রাচুর্য থাকে। ঘাস থাকে প্রচুর। এতে পশুরা মনের সুখে ঘাস খাবে, আর তোমরা তাদের দুধ পান করবে। এবারতো শুষ্ক মৌসুম। কাজেই আমি ফিরে চললাম, তোমরাও ফিরে চলো।

কোরায়শ দলের সৈন্যদের সবাই যেন ভয়ে কাতর হয়ে পড়েছিলো। আবু সুফিয়ানের কথার পর নতুন করে যুক্তি দেখানো কারো পক্ষেই সম্ভব হলো না। মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে কারোই আগ্রহ রইল না। ফলে তারা সবাই ফিরে চললো।

এদিকে মুসলমানরা বদর প্রান্তরে আটদিন যাবত শত্রু সৈন্যের জন্যে অপেক্ষা করেন। এ সময় ব্যবসার জিনিস বিক্রি করে এক দিরহামকে দুই দিরহামে পরিণত করতে লাগলেন। আটদিন পর মনে আনন্দ নিয়ে বীরদর্পে মুসলমানরা মদীনায় ফিরে এলেন।

পরিস্থিতি সেই সময় পুরোপুরি মুসলমানদের অনুকূলে। এই যুদ্ধ প্রতিশ্রুত যুদ্ধ, বদরের দ্বিতীয় যুদ্ধ, বদরের আরেক যুদ্ধ তথা বদরের ছোট যুদ্ধ নামে পরিচিত।[১১]

দওমাতুল জন্দলের যুদ্ধ

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদর থেকে ফিরে এসেছেন। চারিদিকে শান্তি ও স্বস্তির পরিবেশ। সমগ্র এলাকায় ইসলামের জয় জয়াকার, প্রশান্তিময় ও স্নিগ্ধ সুরভিত অবস্থা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরবের শেষ সীমান্ত পর্যন্ত নযর দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। এটার প্রয়োজনও ছিলো। কেননা এর ফলে পরিস্থিতির ওপর মুসলমানদের সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ থাকবে এবং শত্রুমিত্র সকলেই সেকথা বুঝতে পারবে এবং স্বীকার করবে।

বদরের ছোট যুদ্ধের পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছয় মাস যাবত শান্তি ও স্বস্তির সাথে মদীনায় অতিবাহিত করেন। এরপর তাঁকে জানানো হলো যে, সিরিয়ার নিকটবর্তী দওমাতুল জন্দল এর আশে পাশে গোত্রসমূহ পথ চলতি কাফেলাগুলোর ওপর ডাকাতি ও লুটপাট করছে। মদীনায় হামলা করতে তারা এক বিরাট দলও প্রস্তুত করেছে। এসকল খবরের প্রেক্ষিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাবা ইবনে আরফাতা গেফারীকে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে এক হাজার মুসলমানসহ রওয়ানা হলেন। পঞ্চম হিজরীর ২৫শে রবিউল আউয়াল এ ঘটনা ঘটে। পথ চিনিয়ে দেয়ার জন্যে বনু আযরা গোত্রের মাযকুর নামের একজন লোককে সঙ্গে নেয়া হয়।

এই অভিযানের সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নত ছিলো এ রকম যে, তিনি রাতে সফর করতেন এবং দিনে লুকিয়ে থাকতেন। শত্রুদের ওপর আকস্মিক হামলা করার জন্যেই এ ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হয়। দওমাতুল জন্দলে পৌঁছে জানা গেলো যে, তারা অন্যত্র সরে পড়েছে। তাদের পশুপাল এবং রাখালদের ওপর কবযা করা হলো। কিছুসংখ্যক পালিয়েও গেলো।

দওমাতুল জন্দলের অধিবাসীরাও যে যেদিকে পারলো পালিয়ে গেলো। মুসলমানরা দওমাতুল জন্দল ময়দানে পৌঁছার পর স্থানীয় অধিবাসীদের কাউকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন। আশেপাশের বিভিন্ন স্থানে সেনাদল প্রেরণ করা হয় কিন্তু কাউকে পাওয়া যায়নি। কয়েকদিন পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ফিরে আসেন। এই অভিযানের সময় উয়াইনা ইবনে হাচনের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়। দওমাতুল জন্দল সিরিয়া সীমান্তের একটি শহর। এখান থেকে দামেশকের দূরত্ব পাঁচ এবং মদীনার দূরত্ব পনের রাত।

এ ধরনের সুচিন্তিত পদক্ষেপ এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ পরিকল্পনার ফলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের গৌরব শক্তি ও শান্তির আদর্শ দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। সময়ের গতি মুসলমানদের দিকে আসে এবং আভ্যন্তরীণ ও বাইরের সমস্যা ও সঙ্কট কমে আসে। অথচ কিছুকাল উভয় ধরনের সমস্যা মুসলমানদের ঘিরে রেখেছিলো। এসকল সফল অভিযানের ফলে মোনাফেকরা নিশ্চুপ হয়ে যায়। ইহুদীদের একটি গোত্রকে বহিষ্কার করা হয়, অন্য গোত্র সৎ প্রতিবেশীসুলভ আচরণের প্রতিশ্রুতি দেয়। কোরায়শদের শক্তিও হ্রাস পায়। মুসলমানরা ইসলামের সুমহান শিক্ষার প্রচার এবং আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দ্বীনের পয়গাম তাবলীগ করার সুযোগ লাভ করেন।

---

[১১]. ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ২০৯, যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ১১২

খন্দকের যুদ্ধ

এক বছরে বেশী সময় যাবত মুসলমানদের সামরিক তৎপরতা চালানোর ফলে জাজিরাতুল আরব তথা আরব উপদ্বীপে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। চারিদিকে মুসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তির বিস্তার ঘটে। এই সময়ে ইহুদীরা তাদের ঘৃণ্য আচরণ, ষড়যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতার কারণে নানা ধরনের অবমাননা ও অসম্মানের সম্মুখীন করে। কিন্তু তবু তাদের আক্কেল হয়নি, তারা কোন শিক্ষাও গ্রহণ করেনি। খয়বরে নির্বাসনের পর ইহুদীরা অপেক্ষায় থাকে যে, মুসলমান এবং মূর্তিপূজকদের মধ্যে যে সংঘাত চলছে, তার পরিণাম কোথায় গিয়ে পৌঁছে, দেখা যাক। কিন্তু পরিস্থিতি ক্রমেই মুসলমানদের অনুকূলে যাচ্ছিলো, দূর দূরান্তে ইসলামের জয় জয়কার ছড়িয়ে পড়ছিলো। এসব দেখে ইহুদীরা হিংসায় জ্বলে-পুড়ে ছারখার হতে লাগলো। তারা নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করলো। মুসলমানদের ওপর সর্বশেষ আঘাত হানার জন্যে তারা প্রস্তুতি নিতে লাগলো। তারা মুসলমানদের চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাচ্ছিলো। কিন্তু সরাসরি সংঘাতের সংঘর্ষের সাহস তাদের ছিলো না, এ কারণে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে তারা এক ভয়ানক পরিকল্পনা গ্রহণ করলো।

ঘটনার বিবরণ এই, বনু নাযির গোত্রের ২০ জন সর্দার ও নেতা মক্কায় কোরায়শদের কাছে হাযির হলো। তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে কোরায়শদের উদ্বুদ্ধ করে বললো যে, তারাও সর্বাত্মক সাহায্য করবে। কোরায়শরা রাজি হয়ে গেলো। ওহুদের যুদ্ধের সময় কোরায়শরা পরের বছর বদরের প্রান্তরে যুদ্ধ করবে বলেও করতে পারেনি। একারণে তারা ভাবলো যে, নতুন করে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কোরায়শদের সুনাম সুখ্যাতিও বহাল রাখা যাবে, আর ইতিপূর্বে কৃত অঙ্গীকারও পূরণ করা যাবে।

ইহুদী প্রতিনিধিদল এরপর বনু গাতফানের কাছে গিয়ে তাদেরকেও কোরায়শদের মতোই যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করলো। তারাও প্রস্তুত হয়ে গেলো। এরপর ইহুদীদের এই প্রতিনিধিরা আরবের বিভিন্ন গোত্রের কাছে ঘুরে ঘুরে তাদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাতে লাগলো এবং একটি যুদ্ধের জন্যে আহ্বান জানালো। এতে বহু লোক যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলো। মোটকথা, ইহুদী রাজনীতিকরা সফলতার সাথে কাফেরদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধলো এবং বহু লোককে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর দাওয়াত এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করলো।

এরপর পরিকল্পিত কর্মসূচী অনুযায়ী দক্ষিণ দিক থেকে কোরায়শ, কেনানা এবং তোহামায় বসবাসকারী অন্যান্য মিত্র গোত্র মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলো। এদের অধিনায়ক ছিলো কাফের নেতা আবু সুফিয়ান। সম্মিলিত সৈন্যসংখ্যা ছিলো ৪ হাজার। এরা মাররাজ জাহরাহন পৌঁছালে বনু সালিম গোত্রের লোকেরাও তাদের সাথে শামিল হলো। এদিকে এই সময়ে পূর্ব দিক থেকে সাতফান গোত্র, ফাজরাহ, মাররা এবং আশজাআ রওয়ানা হলো।

ফাজরাহ গোত্রের সেনানায়ক ছিলো উয়াইনা ইবনে হাসান। বনু মাররা গোত্রের সেনাপতি ছিলো হারেস ইবনে আওফ-এবং বনু আশজা- এর সেনাপতি ছিলো মাছারাহ ইবনে রাখিল। এদের সাথে বনু আছাদ এবং অন্যান্য গোত্রের বহু লোকও জোটবদ্ধ হলো।

নির্দিষ্ট দিনে পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচী মোতাবেক এসকল লোক মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হলো। অল্পদিনের মধ্যেই মদীনার পাশে ১০ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী সমবেত হলো। এর সৈন্য সংখ্যা হিসাব করলে এতো বড় ছিলো যে, মদীনার নারী শিশুসহ মোট জনসংখ্যাও তাদের সমান ছিলো না। এ বিরাট সেনাদল যদি হঠাৎ করে মদীনায় গিয়ে চড়াও হতো, তবে মুসলমানদের জন্যে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো। এটাও বিচিত্র ছিলো না যে, মুসলমানদের তারা পুরোপরি নিশ্চিহ্ন করে দিতো। কিন্তু মদীনায় মুসলমানদের নেতা ছিলেন অত্যন্ত জাগ্রত ও বিবেক সচেতন। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুযায়ী তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। বিভিন্ন গোত্রের সৈন্যরা মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়েছে এখবর যথাসময়ে ইসলামী রাষ্ট্রে তথ্য সরবরাহে নিযুক্ত গুপ্তচররা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করলেন।

এ খবর পাওয়ার সাথে সাথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশিষ্ট সাহাবাদের সঙ্গে নিয়ে মজলিসে শূরার বৈঠকে বসে মদীনার প্রতিরক্ষার কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন। আলোচনা পর্যালোচনার পর হযরত সালমান ফারসী (রঃ)-এর একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। হযরত সালমান (রা.) তাঁর প্রস্তাব এভাবে পেশ করেছিলেন, হে আল্লাহর রসূল, পারস্যে আমাদের ঘেরাও করা হলে আমরা চারিদিকে পরিখা খনন করতাম।

এটা ছিলো সুচিন্তিত প্রতিরক্ষা প্রস্তাব। আরবের জনগণ এ ধরনের কৌশল সম্পর্কে অবহিত ছিলো না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ প্রস্তাব অনুমোদন করে অবিলম্বে খনন কাজ শুরুর নির্দেশ দেন। সাহাবাদের ১০ জনের গ্রুপে গ্রুপে বিভক্ত করা হয়। প্রতি গ্রুপের ৪০ হাত করে দীর্ঘ পরিখা খননের দায়িত্ব ন্যস্ত ছিলো। মুসলমানরা অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পরিখা খনন শুরু করলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই এ কাজ দেখা শোনা করতেন। তিনি নিজেও পরিখা খননে অংশগ্রহণ করেন। সহীহ বোখারী শরীফে হযরত ছহল ইবনে সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে খন্দকে ছিলাম, লোকেরা খনন করছিলেন এবং আমরা কাঁধে মাটি বহন করে দূরে ফেলে আসছিলাম। এই সময়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, আখেরাতের জীবনই তো প্রকৃত জীবন। ওগো করুণাময়, আনসার আর মোহাজেরদের ক্ষমা করে দাও।[১]

অপর এক বর্ণনায় হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খন্দকের দিকে গমন করে দেখতে পেলেন যে, এক শীতের সকালে মোহাজের ও আনসাররা পরিখা খননের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। তাদের কাছে কোন ক্রীতদাস ছিলো না, যারা তাদের পরিবর্তে একাজ করে দিতো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের কষ্ট এবং ক্ষুধার্ত অবস্থা দেখে বললেন,

'হে আল্লাহ, জীবন তো আখেরাতের জীবন সে নিশ্চয়
মোহাজের ও আনসারদের করো ক্ষমা ওগো দয়াময়।'

আনসার এবং মোহাজেররা এর জবাবে বলেন,

যতোদিন আমাদের থাকবে হায়াত
মোহাম্মদের হাতে জেহাদের জন্যে করলাম বাইয়াত।'[২]

সহীহ বোখারী শরীফে হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) থেকে বর্ণনা রয়েছে যে, আল্লাহর রসূলকে আমি দেখেছি, তিনি খন্দকের যুদ্ধে মাটি খনন করছেন। ধুলোবালিতে তাঁর দেহ আচ্ছন্ন

---

১. সহীহ বোখারী, পরিখা যুদ্ধ অধ্যায়, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৮৮

২. বোখারী, ১ম খন্ড ৩৯৭, ২য় খন্ড, ৫৮৮।

হয়ে গিয়েছিলো। তাঁর চুল ছিলো অনেক। সেই অবস্থাতেই, তিনি মাটি খনন করছেন আর বলছেন,

'তুমি বিনে হেদায়াত পেতাম না হে রাজাধিরাজ
দিতাম না যাকাত আর পড়তাম না নামায।
শান্তি দাও যেন আমাদের শক্ত থাকে মন
লড়াই হলে অটল রেখো আমাদের চরণ।
আমাদের বিরুদ্ধে ওরা দিলো লোকদের উস্কানি
ফেতনাতে শির হবে না নত সেতো আমরা জানি।'

হযরত বারা' বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষের কথাগুলো দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ করতেন। অন্য এক বর্ণনায় কবিতার শেষ দুই লাইন এভাবে লেখা রয়েছে,

ওরা যদি যুলুম করে ফেতনায় ফেলতে চায়
আমরা হবো তারা, যারা মাথা না নোয়ায়।[৩]

মুসলমানরা একদিকে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে কাজ করছিলেন, অন্যদিকে প্রচন্ড ক্ষুধা সহ্য করছিলেন। সে কথা চিন্তা করলে বুক ধ্বক করে ওঠে। হযরত আনাস (রা.) বলেন, পরিখা খননকারীদের কাছে কিছু যব নিয়ে আসা হতো এবং গরম করা কিছু চিকনাই নিয়ে আসা হতো। নীরস ও বিস্বাদ এ খাবারই তারা খেতেন।[৪]

আবু তালহা (রা.) বলেন, আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ক্ষুধার কথা বললাম এবং পেটের কাপড় খুলে একটি পাথর দেখালাম, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পেটে বাঁধা দুটি পাথর আমাদের দেখালেন।[৫]

পরিখা খননকালে নবুয়তের কয়েকটি নিদর্শনও প্রকাশ পেয়েছিলো। সহীহ বোখারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ক্ষুধায় কাতর দেখে একটি বকরির বাচ্চা যবাই করেন। তাঁর স্ত্রী এক সাআ (প্রায় আড়াই কেজি) যবের রুটি তৈরী করেন। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গোপনভাবে বলেন যে, আপনার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সাহাবাকে নিয়ে আমার বাসায় একটু আসুন। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খনন কাজে নিয়োজিত সকল সাহাবাকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হন। সাহাবাদের সংখ্যা ছিলো এক হাজার। অতপর সকল সাহাবা পেটভরে রুটি গোশত খেলেন। উনুনের উপর গোশতের হাড়ি তখনো টগবগ করে ফুটছিলো। রুটি যতো তৈরী করা হচ্ছিলো, তার সবই পরিবেশন করা হচ্ছিলো, কিন্তু শেষ হচ্ছিলো না। একের পর এক রুটি তৈরী করা হচ্ছিলো।[৬]

হযরত নোমান ইবনে বশীরের বোন খন্দকের কাছে কিছু খেজুর নিয়ে এলেন। তিনি এনেছিলেন এ জন্যে যে, তার ভাই এবং মামা খাবেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি খেজুরগুলো চেয়ে নিয়ে একটা কাপড় বিছিয়ে তার ওপর ছড়িয়ে দিলেন। এরপর খনন কাজে নিয়োজিত সাহাবাদের খেতে ডাকলেন। সাহাবারা খেতে শুরু

---

৩. বোখারী ২য় খন্ড, পৃ. ৫৮৯

৪. বোখারী ২য় খন্ড, পৃ. ৫৮৮

৫. জামে তিরমিযি, মেশকাত, ২য় খন্ড, পৃ. ৪৪৮

৬. সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৮৮, ৪৮৯

করলেন। তারা যতো খাচ্ছিলেন খেজুর ততোই বাড়ছিলো। সবাই পেট ভরে খেয়ে কাজে চলে গেলেন, খেজুর তখনো বিছানো কাপড়ের বাইরে পড়ে যাচ্ছিলো।[৭]

উল্লিখিত দুইটি ঘটনার চেয়ে বিস্ময়কর একটি ঘটনা সেই সময় ঘটেছিলো। ইমাম বোখারী হযরত জাবের (রা.) থেকে সেই ঘটনা বর্ণনা করেন। হযরত জাবের (রা.) বলেন, আমরা পরিখা খনন করছিলাম, হঠাৎ একটি বড় পাথর পড়লো। কিছুতেই সেটি আমরা নড়াতে পারছিলাম না। আমরা তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে একথা জানালাম। তিনি বললেন, আমি আসছি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেটে তখন পাথর বাঁধা। তিনি কোদাল দিয়ে পরিখার ভেতর সেই পাথরের ওপর আঘাত করলেন। সাথে সাথে সেই পাথর ধুলোবালির স্তূপে পরিণত হলো।[৮]

হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.) বলেন, পরিখা খননের সময় একটি বিরাট পাথর অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো। কোদাল দিয়ে আঘাত করলে কোদাল ফিরে আসছিলো। এ ব্যাপারটি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমরা জানালাম। তিনি কোদাল হাতে নিয়ে এবং বিসমিল্লাহ বলে আঘাত করলেন। পাথরের একাংশ ভেঙ্গে গেলো। তিনি বললেন, 'আল্লাহু আকবর, আমাকে শাম দেশ অর্থাৎ সিরিয়ার চাবি দেয়া হয়েছে। আল্লাহর শপথ, আমি এখন সেখানে লাল মহল দেখতে পাচ্ছি। এরপর দ্বিতীয় আঘাত করলেন। আরো একটি টুকরো বের হলো। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি এখন মাদায়েনের শ্বেত মহল দেখতে পাচ্ছি। এরপর তৃতীয় আঘাত করে বললেন, বিসমিল্লাহ। এতে পাথরের বাকি অংশ কেটে গেলো। তিনি বললেন, আল্লাহু আকবর, আমাকে ইয়েমেনের চাবি দেয়া হয়েছে। আমি এখন সানআর ফটক দেখতে পাচ্ছি।'[৯]

ইবনে ইসহাক একই ধরনের বর্ণনা হযরত সালমান ফারসী (রা.) থেকেও উল্লেখ করেছেন।

মদীনা শহর উত্তর দিকে খোলা, অন্য তিনদিকে পাহাড় পর্বত এবং খেজুর বাগানে ঘেরা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন বিচক্ষণ সমর বিশারদ ছিলেন। তিনি জানতেন যে, মদীনায় অমুসলিমরা হামলা করতে উত্তর দিক থেকেই আসবে। তাই তিনি শুধু উত্তরই পরিখা খনন করেন।[১০]

মুসলমানরা পরিখা খননের কাজ সমভাবে চালিয়ে যান। সারা দিন তারা খনন কাজ করতেন, সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে যেতেন। কাফের বাহিনী মদীনার উপকণ্ঠে আসার আগেই পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিখা খননের কাজ শেষ হয়ে যায়।[১১]

কোরায়শরা তাদের ৪ হাজার সৈন্যসহ এসে মদীনার রওমা, জারফ এবং জাগাবার মাঝামাঝি মাজমাউল আসয়ালে তাঁবু স্থাপন করলো। অন্যদিকে গাতফান এবং তাদের নজদের মিত্ররা ৬ হাজার সৈন্যসহ এসে ওহুদের পূর্বদিকে জাম্ব নকমি এলাকায় তাঁবু স্থাপন করলো।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, মোমেনরা যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখলো, তখন বলে উঠলো 'এটা তো তাই, যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্যই বলেছিলেন। আর এতে তাঁদের ঈমান ও আনুগত্য বৃদ্ধি পেলো।' (সূরা আল আহযাব, আয়াত ২২)

---

৭. ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ২১৮

৮ সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৮৮

৯. সুনানে নাসাঈ, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৬

১০. ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ২১৯

১১. ইবনে হিশাম, ৩য় খন্ড, পৃ. ২২০, ২২১

কিন্তু মোনাফেক ও দুর্বলচিত্তের লোকদের দৃষ্টি ওদের ওপর পতিত হলে তারা ভয়ে কেঁপে উঠলো। আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন, 'এবং মোনাফেকরা ও যাদের অন্তরে ছিলো ব্যাধি, তারা বলছিলো, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয়।' (সূরা আহযাব, আয়াত ১২)

অমুসলিমদের সম্মিলিত বাহিনীর সাথে মোকাবেলার জন্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১০ হাজার সৈন্যের একটি বাহিনী প্রস্তুত করেন। তাঁরা সালাআ পাহাড়ের দিকে পিঠ রেখে দুর্গ অবরোধের রূপ গ্রহণ করেন। সামনে ছিলো খন্দক বা পরিখা। মুসলমানদের সাংকেতিক ভাষা ছিলো, হা-মীম, লা ইউনছারুন। অর্থাৎ ওদের সাহায্য যেন না করা হয়। মদীনার দায়িত্ব আবদুল্লাহ ইবনে মাকতুমের ওপর ন্যস্ত করা হয়। নারী ও শিশুদের মদীনার বিভিন্ন দুর্গ এবং সংরক্ষিত বাড়ীতে রাখা হয়।

বিধর্মীরা মদীনায় হামলা করে এসে দেখতে পেলো যে, এক সুগভীর প্রশস্ত পরিখা তাদের এবং মদীনার মধ্যে অন্তরায় হয়ে রয়েছে। ফলে তারা অবরোধ করে পড়ে থাকলো। তারা মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার সময়ে এ ধরনের বাধার সম্মুখীন হওয়ার কথা ভাবেনি, এরূপ কোন মানসিক প্রস্তুতিও ছিলো না। তারা বলাবলি করছিলো যে, এ ধরনের প্রতিরক্ষা কৌশল তো আরবদের জন্যে সম্পূর্ণ নতুন। অভিনব এ প্রতিরক্ষা কৌশলের কথা যেহেতু চিন্তা করেনি, এ কারণে কাফেররা হতবুদ্ধি হয়ে পড়লো।

পরিখার কাছে পৌঁছে বিধর্মীরা ক্রোধে দিশেহারা হয়ে পড়লো। তারা ভেবেছিলো যে, মুসলমানদের সহজেই কুপোকাত করে ফেলবে। এদিকে মুসলমানরা কাফেরদের গতিবিধির ওপর নযর রাখে এবং তাদেরকে পরিখার ধারে কাছে আসতে দিচ্ছিলো না। কাছে এলে তীর নিক্ষেপ করছিলো। ফলে বিধর্মীরা দারুণ বেকায়দায় পড়লো। তারা পরিখার কাছে আসার সাহস পাচ্ছিলো না, মাটি ফেলে পরিখা ভরাট করাও ছিলো অচিন্তনীয়।

কোরায়শ সৈন্যরা খন্দকের কাছে অবরোধ আরোপ করে বিনা লাভে অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করবে, তা কি করে হয়? এটা তাদের অভ্যাস ও মর্যাদার পরিপন্থী। তাদের মধ্যে কয়েকজনের একটি গ্রুপ একটি সংকীর্ণ জায়গা দিয়ে খন্দক বা পরিখা অতিক্রম করে। এরপর তাদের মধ্যে কেউ কেউ ঘোড়ায় চড়ে পরিখা ও সালায়ার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। এরা হচ্ছে আমর ইবনে আবদে ইকরামা ইবনে আবু জেহেল, যাররার ইবনে খাত্তাব প্রমুখ। হযরত আলী (রা.) কয়েকজন মুসলমান সঙ্গে নিয়ে বেরোলেন। যে জায়গা দিয়ে তারা প্রবেশ করেছিলো সেই জায়গা নিয়ন্ত্রণে এনে তাদের প্রত্যাবর্তনের পথ বন্ধ করে দিলেন। এর ফলে আমর ইবনে আবদেউদ্দ মুখোমুখি তর্কযুদ্ধের জন্যে হযরত আলী (রা.)-কে হুঙ্কার দিয়ে আহ্বান জানালো। শেরে খোদা হযরত আলী (রা.) এমন এক কথা বললেন, যে, আমর ক্রোধান্ধ হয়ে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামলো। পরে ঘোড়াকে হত্যা করে হযরত আলী (রা.)-এর মুখোমুখি হাযির হলো। সে ছিলো বড় বীর। উভয়ের মধ্যে প্রচন্ড সংঘর্ষ বেধে গেলো। একজন অন্যজনকে কাবু করতে হামলা চালাচ্ছিলো। পরিশেষে হযরত আলী (রা.) তাকে শেষ করে দিলেন। অন্য মোশরেকরা পরিখার অপর প্রান্তে ছুটে পালালো। তারা ভীষণ ভয় পেয়েছিলো। আবু জেহেলের পুত্র ইকরামা নিজের বর্শা ফেলে রেখেই পালালো।

মোশরেকরা পরিখা অতিক্রম অথবা পরিখা ভরাট করে রাস্তা তৈরীর সব রকম চেষ্টা করলো। কিন্তু মুসলমানরা তাদেরকে পরিখার কাছে আসতে দিচ্ছিলেন না। তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ অথবা বর্শা তাক করে এমনভাবে প্রতিহত করলেন যে, তাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হলো।

এ ধরনের প্রচন্ড মোকাবেলার কারণে সাহাবায়ে কেরামের কয়েক ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে গিয়েছিলো। বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত যাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর (রা.) খন্দকের দিনে এলেন এবং কাফেরদের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আজ আমি সূর্য ডুবু অবস্থায় নামায আদায় করেছি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আর আমি তো এখনো নামায আদায়ই করিনি। সাহাবারা এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওযু করার পর ওযু করলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আছরের নামায আদায় করলেন। ততক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে। এরপর মাগরেবের নামায আদায় করলেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আছরের নামায কাযা পড়তে বাধ্য হওয়ায় মনে খুব কষ্ট পেলেন। তিনি পৌত্তলিকদের জন্যে বদদোয়া করলেন। সহীহ বোখারী শরীফে হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খন্দকের দিনে বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, সকল মোশরেকসহ তাদের ঘর এবং কবরকে আগুনে ভরে দিন। ওদের কারণে আমাদের আছরের নামায কাযা করতে হয়েছে, ইতিমধ্যে সূর্য ডুবে গেছে।[১৩]

মোসনাদে আহমদ এবং মোসনাদে শাফেয়ীতে বর্ণিত রয়েছে যে, মোশরেকরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যোহর, আছর, মাগরেব এবং এশার নামায যথাসময়ে আদায় করতে দেয়নি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব নামায একত্রে আদায় করেছিলেন। ইমাম নববী বলেন, উল্লিখিত হাদীসসমূহের বর্ণনার বৈপরীত্য সম্পর্কে বলা যায় যে, সবগুলো হাদীসের বক্তব্য যথার্থ। খন্দকের যুদ্ধ কয়েকদিন যাবত চলেছিলো, একদিন হয়েছে এক অবস্থা অন্য দিন অন্য অবস্থা।

এসব হাদীস থেকেই বোঝা যায় যে, মোশরেকরা পরিখা অতিক্রম করে মদীনায় হামলা করতে কয়েকদিন যাবত প্রাণপণ চেষ্টা করছিলো এবং মুসলমানরা সে চেষ্টা প্রতিহত করছিলেন। উভয় দলের মাঝখানে পরিখা অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এ কারণে মুখোমুখি রক্তাক্ত সংঘর্ষের সুযোগ হয়নি। বরং পরস্পরের প্রতি তীর নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

তীর নিক্ষেপে উভয় পক্ষে কয়েকজন নিহত হয়েছে। তবে তাদের সংখ্যা হাতে গোনা। শাহাদাতপ্রাপ্ত মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো ছয়, আর নিহত পৌত্তলিকদের সংখ্যা ছিলো দশ। নিহত পৌত্তলিকদের মধ্যে দুই জন কি একজন তলোয়ারের আঘাতে প্রাণ হারিয়েছে।

হযরত সা'দ ইবনে মায়া'য (রা.)-এর গায়ে একটি তীর বিদ্ধ হয়েছিলো। এতে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হন। তাকে হাব্বান ইবনে আরকা নামে একজন পৌত্তলিক তীর নিক্ষেপ করেছিলো। এই লোকটি ছিলো কোরায়শ বংশোদ্ভূত। আহত হওয়ার পর হযরত সা'দ (রা.) দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ তায়ালা, তুমি তো জানো, যে কওমের লোকেরা তোমার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবিশ্বাস করেছে, তাদের বাড়ীঘর থেকে বের করে দিয়েছে, তাদের সাথে তোমার রাস্তায় জেহাদ করা আমার এতো প্রিয় যে, অন্য কোন কওমের সাথে জেহাদ করা এতো প্রিয় নয়। হে আল্লাহ তায়ালা, আমি মনে করি যে, তুমি আমাদের ও ওদের মধ্যেকার যুদ্ধকে শেষ পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছো। হে আল্লাহ তায়ালা, কোরায়শদের সাথে যুদ্ধ যদি বাকি থাকে, তবে সেই যুদ্ধের জন্যে আমাকে বাকি রাখো, যেন, আমি তাদের সাথে জেহাদ করতে পারি। যদি তুমি কাফেরদের সাথে আমাদের যুদ্ধ শেষ করে দিয়ে থাকো, তবে আমার এই

---

[১৩]. সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৯০

আহত হওয়ার আঘাতের ঘা যেন না শুকায় এবং এই আঘাতকেই আমার মৃত্যুর কারণ করো।[১৫] দোয়ার শেষে তিনি বলেন, হে আল্লাহ তায়ালা, বনু কোরায়যার ব্যাপারে আমার চক্ষু শীতল না হওয়া পর্যন্ত যেন আমার মৃত্যু না হয়।'[১৬]

মোটকথা মুসলমানরা একদিকে যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্যার সম্মুখীন ছিলো, অন্যদিকে ষড়যন্ত্র ও কুচক্রের ঘৃণ্য তৎপরতা অব্যাহত ছিলো। ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তকারীরা মুসলমানদের দেহে বিষ ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছিলো। বনু নাযির গোত্রের দুর্বৃত্তনেতা হুয়াই ইবনে আখতাব বনু কোরায়যা গোত্রের লোকদের কাছে এসে তাদের সর্দার কা'ব ইবনে আছাদের কাছে হাযির হলো। এই কা'ব ইবনে আছাদই ছিলো বনু কো'রায়জার পক্ষ থেকে অঙ্গীকার সম্পাদনের মধ্যস্থতাকারী। এই লোকটি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এ মর্মে চুক্তি করেছিলো যে, যুদ্ধের সময় তাঁকে সাহায্য করবে। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

হুয়াই এসে কা'ব-এর দরজায় আওয়ায দিলো। হুয়াইকে দেখামাত্র কা'ব দরোজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলো। কিন্তু হুয়াই এমন সব কথা বললো যে, শেষ পর্যন্ত দরজা খুলে দিলো। দরজা খোলার পর হুয়াই বললো, হে কা'ব আমি তোমার জন্যে যমানার সম্মান এবং উদ্বেলিত সমুদ্র নিয়ে এসেছি। আমি সব কোরায়শ সর্দারসহ সব কোরায়শকে রুমার মাজমাউল আসয়ালে এনে সমবেত করেছি। বনু গাতফান গোত্রের লোকদেরকে তাদের সব সর্দারসহ ওহুদের নিকটবর্তী জামবে নকমিতে একত্রিত করেছি। তারা আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, মোহাম্মদ এবং তার সঙ্গীদের পুরোপুরি নির্মূল না করে তারা সেই স্থান ত্যাগ করবে না।

কা'ব বললো, খোদার কসম, তুমি আমার যুগের অপমান এবং বৃষ্টিবর্ষণকারী মেঘ নিয়ে হাযির হয়েছ। সেই মেঘ থেকে শুধু বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, গর্জন বেরোচ্ছে। কিন্তু ওতে ভালো কিছু অবশিষ্ট নেই। হুয়াই, তোমার জন্যে আফসোস, আমাকে আমার অবস্থার ওপর ছেড়ে দাও। আমি মোহাম্মদের মধ্যে সত্য এবং আনুগত্য ব্যতীত অন্য কিছু দেখিনি। কিন্তু হুয়াই কা'ব এর গায়ে মাথায় হাত বুলাতে লাগলো, ছদ্ম আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরে তার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা প্রকাশ করতে লাগলো। এমনি করে এক সময় সে কা'বকে রাজি করিয়েই ফেললো। তবে তাকে এ অঙ্গীকার করতে হলো যে, কোরায়শ যদি মোহাম্মদকে খতম না করেই ফিরে আসতে বাধ্য হয়, তবে আমিও তোমার সাথে তোমার দুর্গে প্রবেশ করবো। এরপর তোমার যে পরিণাম হবে আমি সেই পরিণাম মেনে নেব। হুয়াই এর এ প্রতিশ্রুতির পর কা'ব ইবনে আছাদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ এবং মুসলমানদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি লংঘন করে তাদের বিরুদ্ধে পৌত্তলিকদের পক্ষ থেকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলো।[১৭]

এরপর বনু কোরায়যার ইহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নিতে লাগলো। ইবনে ইসহাক বলেছেন, হযরত সাফিয়্যা বিনতে আবদুল মোত্তালেব, হযরত হাস্‌সান ইবনে সাবেতের ফারে নামক দুর্গের ভেতর ছিলেন। হযরত হাস্‌সান মহিলা ও শিশুদের সঙ্গে সেখানেই ছিলেন। হযরত সাফিয়্যা (রা.) বলেন, আমাদের কাছে দিয়ে একজন ইহুদী গেলো এবং দুর্গের চারিদিক ঘুরতে লাগলো। এটা সেই সময়ের কথা, যখন বনু কোরায়যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পাদিত চুক্তি লংঘন করে তাঁর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলো। সেই সময় আমাদের এবং চুক্তি ভঙ্গকারী ইহুদীদের মধ্যে এমন কেউ ছিলো না যারা আমাদের নিরাপত্তা

---

১৫. সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৯১

১৬. ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ২২৭

১৭. ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড. পৃ. ২২০, ২২১

নিশ্চিত করবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের সঙ্গে নিয়ে সম্মিলিত শত্রু বাহিনীর মোকাবেলায় ব্যস্ত রয়েছেন। আমাদের ওপর কেউ হামলা করলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে আসতে পারতেন না। এমন সময় আমি হাস্সানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম,.হে হাস্সান, একজন ইহুদী দুর্গের চারিদিকে ঘুর ঘুর করছে। আমার সন্দেহ হচ্ছে যে, সে অন্য ইহুদীদের আমাদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবারা অন্য কাজে এতো ব্যস্ত যে, এখানে তো আমাদের কাছে আসতে পারবেন না। কাজেই আপনি যান এবং তাকে হত্যা করুন। হযরত হাস্সান (রা.) বললেন, আপনি তো জানেন যে, আমি ওরকম কাজের মানুষ নই। হযরত সাফিয়্যা (রা.) এরপর ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেন, আমি কোমরে কাপড় বাঁধলাম। একটা কাঠ নিয়ে দুর্গের বাইরে ইহুদীর কাছে গিয়ে নির্মমভাবে প্রহার করে তাকে মেরে ফেললাম। এরপর দুর্গে ফিরে এসে হাস্সানকে বললাম, যান সে লোকটির অস্ত্রশস্ত্র এবং অন্যান্য জিনিস খুলে নিন। লোকটি পুরুষ, এ কারণে আমি তার অস্ত্র খুলে নিইনি। হযরত হাস্সান (রা.) বললেন, ওর অস্ত্র এবং জিনিসপত্রে আমার কোন প্রয়োজন নেই।[১৮]

মুসলমান নারী ও শিশুদের নিরাপত্তায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফুফুর এই বীরত্বপূর্ণ কাজের দারুণ প্রভাব পড়লো। ইহুদীরা মনে করলো যে, দুর্গের ভেতর মুসলমানদের সহায়ক সেনা ইউনিট রয়েছে। ইহুদীরা এ কারণে সেই দুর্গের কাছে অন্য কাউকে পাঠাতে সাহসী হয়নি। অথচ সেখানে কোন সৈন্যই ছিলো না।

তবে মূর্তিপূজক কোরায়শ সৈন্যদের সাথে নিজেদের একাত্মতা প্রকাশের প্রমাণ দেয়ার জন্যে তারা তাদেরকে নিয়মিতভাবে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করছিলো। এক পর্যায়ে মুসলমানরা সেই রসদের মধ্য থেকে ২০টি উট কেড়ে নেয়।

মোটকথা ইহুদীদের অঙ্গীকার ভঙ্গের খবর পাওয়ার সাথে সাথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে ব্যাপারে মনোযোগী হলেন। তিনি প্রথমে ব্যাপারটির সত্যতা যাচাই করতে চাইলেন, যাতে বনু কোরায়যার প্রকৃত ভূমিকা স্পষ্ট হয়। সম্পাদিত চুক্তি শর্ত লংঘনের প্রমাণ পাওয়া গেলে সেই আলোকে প্রয়োজনীয় সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এ জন্যে আল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রসূল কয়েকজন সাহাবাকে প্রেরণ করলেন। তারা হচ্ছেন হযরত সা'দ ইবনে মায়া'য (রা.), হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রা.) এবং হযরত খাওয়াত ইবনে যোবায়ের (রা.)। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা যাও, বনু কোরায়যা সম্পর্কে যেসব কথা শোনা যাচ্ছে, দেখে এসো, সেসব সত্য কিনা। যদি সত্য হয় তবে ফিরে এসে আমাকে সে সব কথা ইশারায় জানাবে। আর যদি গুজব হয়ে থাকে, তবে ওদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির ওপর ওদের অবিচল থাকার কথা প্রকাশ্যে সবাইকে জানিয়ে দেবে।

সাহাবারা বনু কোরায়যা গোত্রের লোকদের কাছে গিয়ে লক্ষ্য করলেন যে, তারা আল্লাহর রসূল এবং মুসলমানদের সম্পর্কে অসম্মানজনক উক্তি করছে। তারা বলছে, আল্লাহর রসূল আবার কে? আমাদের এবং মোহাম্মদের মধ্যে কোন চুক্তি নেই। একথা শুনে সাহাবারা ফিরে এলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে ইশারায় শুধু বললেন, আদল এবং কারাহ। অর্থাৎ আদল এবং কারাহ গোত্রের লোকেরা মুসলিম প্রতিনিধিদলের সাথে যে রকম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো, বনু কোরায়যাও সেই ধরনের বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত রয়েছে।

---

[১৮]. ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ২২৮

ইশারায় বোঝাতে চাইলেও অন্য সাহাবারা বুঝে ফেললেন। ফলে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেন সকলেই।

প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের সামনে তখন জটিল অবস্থা। পেছনে রয়েছে বনু কোরায়যা গোত্র। তারা হামলা করলে সেই হামলা ঠেকানোর মতো কেউ নেই। সামনে রয়েছে কাফেরদের সম্মিলিত সেনাদল। ওদের প্রতি অমনোযোগী হওয়ারও উপায় নেই। মুসলমান নারী ও শিশুদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা ছিলো না, তারা বিশ্বাসঘাতক ইহুদীদের নাগালের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। এসব কারণে মুসলমানদের মানসিক অবস্থা খুবই নাযুক হয়ে পড়েছিলো। সে অবস্থার কথাই আল্লাহ তায়ালা এভাবে ব্যক্ত করেছেন, 'যখন তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিলো উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল থেকে, তোমাদের চক্ষু বিকশিত হয়েছিলো, তোমাদের প্রাণ হয়েছিলো কণ্ঠগত এবং তোমরা আল্লাহ তায়ালা সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করছিলে। তখন মোমেনরা পরীক্ষিত এবং তারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হয়েছিলো।' (সূরা আহযাব, আয়াত ১০, ১১)

সেই সময় কিছুসংখ্যক মোনাফেকও সক্রিয় হয়ে উঠেছিলো। তারা বলাবলি করছিলো যে, মোহাম্মদ আমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন, আমরা কায়সার কিসরার ধনভান্ডার ভোগ করবো অথচ এখানে এমন অবস্থা হয়েছে যে, পেশাব পায়খানার জন্যে বেরোলেও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বেরোতে হয়। কোন কোন মোনাফেক তাদের দলের নেতাদের কাছে গিয়ে বলছিলো যে, আমাদের ঘর শত্রুদের সামনে খোলা পড়ে আছে। নিজের ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্যে আমাদের অনুমতি প্রদান করুন। আমাদের ঘর তো শহরের বাইরে।

পরিস্থিতি এমন হয়েছিলো যে, বনু সালমা গোত্রের লোকদের মন টলটলায়মান হয়ে উঠলো। তারা পশ্চাদপসারণের কথা ভাবছিলো। এদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'এবং মোনাফেকরা, যাদের অন্তরে ছিলো ব্যাধি, তারা বলছিলো, আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা প্রতারণা ব্যতীত কিছুই নয় এবং ওদের এক দল বলেছিলো, হে ইয়াসরেববাসী, এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই, তোমরা ফিরে চলো এবং ওদের মধ্যে এক দল নবীর কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলছিলো, আমাদের বাড়ীঘর অরক্ষিত। আসলে ওগুলো অরক্ষিত ছিলো না। প্রকৃতপক্ষে পলায়ন করাই ছিলো তাদের উদ্দেশ্য।' (সূরা আহযাব আয়াত ১২, ১২)

একদিকে এমনি অবস্থা অন্যদিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলেন। তাঁকে এভাবে দীর্ঘক্ষণ শুয়ে থাকতে দেখে সাহাবাদের মানসিক অস্থিরতা আরো বেড়ে গেলো। কিছুক্ষণ পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তরে নতুন চেতনা সঞ্চারিত হলো। তিনি আল্লাহু আকবর বলে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হে মুসলমানরা, তোমরা আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয়ের সুখবর শুনে নাও।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর বিদ্যমান পরিস্থিতি মোকাবেলার কর্মসূচী গ্রহণ করলেন। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একদল মুসলমানকে প্রেরণ করলেন। তিনি আশঙ্কা করছিলেন যে, মুসলমানদের অমনোযোগী দেখে ইহুদীরা মুসলিম নারী শিশুদের ওপর হঠাৎ করে হামলা না করে। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী ছিলো, যার মাধ্যমে শত্রুদের বিভিন্ন গ্রুপকে পরস্পর থেকে যেন বিচ্ছিন্ন করে দেয়া যায়। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিন্তা করলেন যে, বনু গাতফানের উভয় সর্দার উয়াইনা ইবনে হাচন ও হারেস ইবনে আওফের সাথে একটি মীমাংসা করবেন।

সেই মীমাংসার মাধ্যমে মদীনার এক তৃতীয়াংশ উৎপাদিত ফসল বনু গাতফানকে দেয়া হবে। যদি এরূপ সুবিধা দেয়া যায়, তাহলে ইহুদীরা ফিরে যাবে। পরিণামে মুসলমানরা কোরায়শ

শক্রুদের সাথে ভালোভাবে মোকাবেলা করতে পারবে। এ ধরনের একটি প্রস্তাব সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনাও করা হলো। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সা'দ ইবনে মায়া'য এবং সা'দ ইবনে ওবাদা নামক দুইজন বিশিষ্ট সাহাবীর সাথে আলোচনা করলেন, তখন তারা ভিন্ন মত প্রকাশ করলেন। তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল, যদি এই আদেশ আল্লাহ তায়ালা আপনাকে দিয়ে থাকেন, তবে আমরা নির্বিবাদে মেনে নেবো। কিন্তু আপনি যদি শুধু আমাদের কারণে এরূপ করতে চান তবে বলছি, আমাদের তার প্রয়োজন নেই। আমরা এবং ওরা যখন মূর্তিপূজা করতাম, তখন তো ওরা আতিথেয়তা এবং বেচাকেনা ছাড়া একটা শস্যদানাও আমাদের কাছে আশা করতে পারেনি। বর্তমানে আল্লাহ তায়ালা আপনার মাধ্যমে আমাদের হেদায়াত দান করেছেন, আমরা মুসলমান হয়েছি, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন, এমতাবস্থায় আমরা নিজেদের ধন-সম্পদ তাদের দেব ? আল্লাহর শপথ, আমরা তো তাদের দেবো শুধু আমাদের তলোয়ার। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় সাহাবীর অভিমত যথার্থ বলে মন্তব্য করে বললেন, আমি ভেবেছিলাম, অন্যকথা। সমগ্র আরব ঐক্যবদ্ধভাবে তোমাদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। একথা ভেবে শুধু তোমাদের জন্যেই আমি একাজ করতে চেয়েছিলাম।

এরপরই আল্লাহর ইচ্ছায় শক্রদলে ভাঙ্গন দেখা দিলো। তাদের ঐক্যে ফাটল দেখা দিলো। তাদের ধার ভোঁতা হয়ে গেলো। বনু গাতফান গোত্রের নাঈম ইবনে মাসুদ ইবনে আমের আশজাঈ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে চুপিসারে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি কিন্তু একথা কওমের লোকদের কাছে প্রকাশ করিনি। আপনি আমাকে কোনো আদেশ করুন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওদের বিরুদ্ধে কোন সামরিক ব্যবস্থা তো নিতে পারবে না তবে যতোটা পারো ওদের মধ্যে ফাটল ধরাও এবং মনোবল নষ্ট করো। যুদ্ধ তো হচ্ছে চালবাজি।

একথা শোনার পর হযরত নঈম (রা.) দেরী না করে বনু কোরায়যার কাছে গেলেন। এক সময় ওদের সাথে তার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিলো। তাদের কাছে গিয়ে বললেন, আপনারা জানেন, আপনাদের প্রতি আমার ভালোবাসা আছে এবং আপনাদের সাথে বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। তারা বললো, জী হাঁ। নঈম বললেন, তবে শুনুন, কোরায়শদের ব্যাপারে আপনাদের মতামত আমার চেয়ে ভিন্ন। এ এলাকা আপনাদের নিজস্ব এলাকা। আপনাদের বাড়ীঘর, ধন-সম্পদ, পরিবার-পরিজন সব এখানে রয়েছে। আপনারা এসব ছেড়ে যেতে পারবেন না। কোরায়শ এবং গাতফান গোত্রের লোকেরা যুদ্ধ করতে এসেছে মুসলমানদের বিরুদ্ধে, আপনারা তাদের প্রতি সমর্থন ও সংহতি প্রকাশ করবেন। এটা আপনারা কি করলেন? কোরায়শ এবং গাতফান গোত্রের কি আছে এখানে? বাড়ীঘর ধন-সম্পদ এবং পরিবার পরিজন কিছুই নেই। যদি তারা সুযোগ পায় তবে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। অন্যথায় বিছানা বেঁধে বিদায় নেবে। এরপর থাকবেন আপনারা আর মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সেই সময় মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যেভাবে ইচ্ছা, সেভাবেই আপনাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। একথা শুনে বনু কোরায়যা চমকে উঠলো। তারা বললো, নঈম বলুনতো এখন কি করা যায় ? নঈম বললেন, কোরায়শদের বলুন তারা যেন কিছু লোককে জামিন হিসাবে আপনাদের কাছে দেয়। যদি না দেয় তবে কিছুতেই তাদের সাথে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবেন না। কোরায়যা গোত্রের লোকেরা বললো, আপনি যথার্থ ও যুক্তিপূর্ণ কথাই বলেছেন।

এরপর হযরত নঈম (রা.) সোজা কোরায়শ নেতাদের কাছে গেলেন। তাদের বললেন, আপনাদের প্রতি আমার ভালোবাসা এবং আপনাদের কল্যাণ কামনায় আমার আন্তরিকতা

আপনাদের অজানা নয়। নঈমের কথা শুনে তারা বললো, জ্বী হাঁ। হযরত নঈম বললেন, তবে শুনুন, ইহুদীরা মোহাম্মদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করার কারণে লজ্জিত। বর্তমানে তাদের মধ্যে এ মর্মে লিখিত চুক্তি হয়েছে যে, ইহুদীরা আপনাদের কাছ থেকে কিছু লোককে জামিন হিসাবে গ্রহণ করে মোহাম্মদের হাতে তুলে দেবে। এরপর তারা মোহাম্মদের সাথে নিজেদের সম্পর্ক পুনরায় পুর্নবিন্যাস করে নেবে। কাজেই ইহুদীরা যদি আপনাদের কাছে জামিনস্বরূপ কয়েকজন লোক চায়, তবে কিছুতেই দেবেন না। হযরত নঈম (রা.)-এরপর বনু গাতফান গোত্রের লোকদের কাছে গিয়েও একই রকমের কথা বলে কোরায়শদের প্রতি তাদেরকে সন্দিহান করে তুললেন। ফলে গাতফান গোত্রের লোকেরাও হয়ে সতর্ক গেলো।

এরপর শুক্র ও শনিবার দিনের মাঝামাঝি রাতে কোরায়শরা ইহুদীদের খবর পাঠালো যে, আমাদের অবস্থানস্থল তেমন ভালো নয়। ঘোড়া উট মারা যাচ্ছে। কাজেই আসুন একযোগে মোহাম্মদের ওপর হামলা করি। আপনারা ওদিক থেকে হামলা করুন আমরা এদিক থেকে করছি। ইহুদীরা জবাব পাঠালো যে, আজ শনিবার আপনারা জানেন। অতীতে যারা এইদিন সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশ লংঘন করেছিলো, তারা কি ধরনের শাস্তি পেয়েছিলো। তাছাড়া আপনারা যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের কিছু লোক জামিন স্বরূপ আমাদের কাছে না দেবেন, ততক্ষণ আমরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবো না। দূত ইহুদীদের জবাব শুনে এসে বলার পর কোরায়শ এবং গাতফান বললো, আল্লাহর শপথ, নঈম সত্য কথাই বলেছিলো। এরপর তারা ইহুদীদের খবর পাঠালো যে, খোদার কসম, আমরা জামিন স্বরূপ কোনো লোক পাঠাতে পারব না। আপনারা এখনই আপনাদের অবস্থান থেকে হামলা করুন। আমরা এদিক থেকে হামলা করছি। একথা শুনে কোরায়জা গোত্রের লোকেরা বললো, নঈম তো সত্য কথাই বলেছে। এভাবে উভয় দলের মধ্যে অবিশ্বাস দেখা দিলো। দলের সৈন্যদের মধ্যেও হতাশা দেখা দিলো, জোটভুক্ত সৈন্যদের মধ্যেও ফাটল দেখা দিলো।

সেই সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানরা আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে দোয়ার জন্যে হাত তুললেন। মুসলমানরা এ দোয়া করছিলেন, 'হে আল্লাহ তায়ালা, আমাদের হেফাযত করো এবং আমাদের বিপদ থেকে মুক্ত করো।'

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দোয়া করছিলেন, হে আল্লাহ তায়ালা তুমি কেতাব নাযিল করেছো, তুমি শীঘ্র হিসাব নেবে। ওই সৈন্যদের পরাজিত করো, হে আল্লাহ তায়ালা, ওদের পরাজিত করো এবং তাদের প্রকম্পিত করো।[১৯]

আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং নিবেদিত প্রাণ মুসলমানদের দোয়া কবুল করলেন। পৌত্তলিকদের জোটে ভাঙ্গন ধরা এবং তাদের মধ্যে হতাশা ও পারস্পরিক অবিশ্বাস সৃষ্টির পর আল্লাহ তাদের ওপর ঝড়ো বাতাস পাঠিয়ে দিলেন। সেই বাতাস তাদের তাঁবু উল্টে দিলো। জিনিসপত্র তছনছ করে দিলো। তাঁবুর খুঁটি উপড়ে গেলো। কোন জিনিসই যথাস্থানে থাকলো না। সেই সাথে একদল ফেরেশতা আল্লাহ তায়ালা পাঠিয়ে দিলেন। এর ফলে কাফেরদের অন্তর থর থর করে কেঁপে উঠলো, তাদের মনে মুসলমানদের প্রবল প্রভাব রেখাপাত করলো।

সেই শীত ও ঝড়ো হাওয়ার রাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হোযায়ফা ইবনে ইয়ামানকে কাফেরদের খবর নিয়ে আসতে প্রেরণ করলেন। তিনি সেখানে গিয়ে দেখেন যে, মোশরেকরা পলায়নের প্রস্তুতি নিচ্ছে। হযরত হোযায়ফা (রা.) এসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

[১৯] বোখারী, কিতাবুল জেহাদ, ১ম খন্ড, পৃ. ৪১১, কিতাবুল মাগাজি, ২য় খন্ড. পৃ ৫৯০

ওয়া সাল্লামকে সে খবর জানালেন। সকাল বেলা দেখা গেলো যে, গোটা ময়দান খালি। কোন প্রকার লাভ ছাড়াই শত্রু সৈন্যদের ফিরে যেতে আল্লাহ তায়ালা বাধ্য করেছেন। এমনি করে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের সাথে করা তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করলেন। তিনি তাঁর প্রিয় বান্দাদের সম্মান দিয়েছেন, তাদের সাহায্য করেছেন এবং কাফের সৈন্যদের পরাজিত করেছেন। কাফেরদের ফিরে যাওয়ার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ফিরে এলেন।

সঠিক বর্ণনা মোতাবেক খন্দকের যুদ্ধ পঞ্চম হিজরীর শওয়াল মাসে সংঘটিত হয়েছিলো। পৌত্তলিকরা এক মাস বা এক মাসের কাছাকাছি সময় মুসলমানদের অবরোধ করে রেখেছিলো। সব কিছু পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, অবরোধের শুরু শওয়াল, আর শেষ হয়েছিলো জিলকদ মাসে। ইবনে সা'দ বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেদিন খন্দক থেকে ফিরে এসেছিলেন, সেদিন ছিলো বুধবার। জিলকদ মাস শেষ হতে তখনো সাত দিন বাকি।

খন্দক বা পরিখার যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে পরাজয়ের যুদ্ধ ছিলো না, বরং মুসলমানরা এ যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। এ যুদ্ধে কোন রক্তাক্ত সংঘর্ষ তেমন হয়নি। তবুও এটি ইসলামের ইতিহাসে একটি সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধ। এই যুদ্ধে পৌত্তলিকদের মনোবল সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গিয়েছিলো এবং এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো যে, আরবের কোন শক্তিই মদীনায় বিকাশমান শক্তিকে নিশেষ করে দিতে পারবে না। খন্দকের যুদ্ধে মোশরেকরা যতো সৈন্য সমাবেশ করেছিলো এর চেয়ে বেশী সৈন্য সমাবেশ করা তাদের পক্ষে ভবিষ্যতে সম্ভব হবে না এবং তখনো সম্ভব ছিলো না। এ কারণেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খন্দকের যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বলেছিলেন, এবার আমরা ওদের ওপর হামলা করবো, ওরা আর আমাদের ওপর হামলা করতে পারবে না। এবার আমাদের সৈন্য তাদের দিকে যাবে। (সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৯০)

বনু কোরায়যার যুদ্ধ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খন্দক থেকে ফিরে আসার পর যোহরের নামাযের সময় হযরত উম্মে সালমার গৃহে এক পর্যায়ে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় হযরত জিবরাঈল (আ.) এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আপনি অস্ত্র রেখে দিয়েছেন, অথচ ফেরেশতারা এখনো অস্ত্র রাখেনি। কওমের অনুসরণ করে আমিও আপনার কাছে এসেছি। উঠুন, আপনার বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে বনু কোরায়যার কাছে চলুন। আমি আগে আগে যাচ্ছি। ওদের দুর্গে কাঁপন এবং মনে ভয় ও আতঙ্ক ধরিয়ে দেব। একথা বলে হযরত জিবরাইল (আ.) ফেরেশতাদের সাথে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

এদিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন সাহাবীকে দিয়ে ঘোষণা করালেন যে, যারা শুনতে পাচ্ছে এবং আনুগত্য করার মন যাদের রয়েছে তারা যেন আছরের নামায বনু কোরায়যায় গিয়ে আদায় করে। পরে মদীনার দেখাশোনার দায়িত্ব হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.)-এর ওপর ন্যস্ত করে হযরত আলী (রা.)-এর হাতে পতাকা দিয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু কোরায়যার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। হযরত আলী (রা.) বনু কোরায়যার দুর্গের কাছে পৌঁছার পর সেই গোত্রের ইহুদীরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গালাগাল দিতে শুরু করলো।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুক্ষণ পরই মোহাজের ও আনসার সাহাবাদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে হাযির হলেন। প্রথমে তিনি আনা নামক একটি জলাশয়ের কাছে থামলেন। মুসলমানরাও যুদ্ধের ঘোষণা শুনে বনু কোরায়যা গোত্র অভিমুখে রওয়ানা হলেন। পথে আছরের নামাযের সময় হলো। কেউ কেউ বললেন, আমাদেরকে বনু কোরায়যায় গিয়ে আছরের নামায

আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমরা সেখানে গিয়েই নামায আদায় করবো। এরা আছরের নামায এশার নামাযের পর আদায় করলেন। অন্য কয়েকজন সাহাবা পথে আছরের নামাযের সময় হওয়ায় সেখানেই নামায আদায় করলেন। তাঁরা বললেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের তাড়াতাড়ি পৌঁছার উপর গুরুত্ব দেয়ার জন্যেই বনু কোরায়যায় গিয়ে আছরের নামায আদায় করতে বলেছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে তিনি উভয় দলের কাউকেই সমালোচনা করেননি।

মোটকথা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে সাহাবায়ে কেরাম বনু কোরায়যায় পৌঁছে এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিলিত হলেন। এরপর তাঁরা বনু কোরায়যার দুর্গসমূহ অবরোধ করলেন। সাহাবাদের সংখ্যা ছিলো তিন হাজার। তাঁদের সঙ্গে ত্রিশটি ঘোড়া ছিলো। অবরোধ কঠোররূপ ধারণ করলে ইহুদীদের সর্দার কা'ব ইবনে আছাদ সকল ইহুদীর সামনে তিনটি প্রস্তাব পেশ করলো।

এক) ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে দ্বীনে মোহাম্মদীতে প্রবেশ এবং এর মাধ্যমে নিজেদের জানমাল ও পরিবার পরিজন রক্ষা করা। আল্লাহর শপথ, তোমাদের কাছে এটাতো স্পষ্ট হয়েছে যে, মোহাম্মদ প্রকৃতই নবী ও রসূল এবং এই তিনি হলেন সেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার কথা তোমাদের কেতাবে উল্লেখ রয়েছে।

দুই) নিজ পরিবার পরিজনকে আপন হাতে হত্যা করা এবং তলোয়ার নিয়ে সর্বশক্তিতে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া। এরপর হয় তো জয় অথবা পরাজিত হতে হবে। এমনও হতে পারে যে, যুদ্ধে সবাইকে নিহতও হতে হবে।

তিন) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবাদের ধোঁকা দিয়ে শনিবার দিন তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া। কারণ তাঁরা নিশ্চিত থাকবেন যে, আজকের দিনে কোন লড়াই হবে না।

কিছু ইহুদীরা উল্লিখিত তিনটি প্রস্তাবের একটিও গ্রহণ করলো না। এতে বিরক্ত হয়ে কা'ব ইবনে আছাদ বললেন, মাতৃগর্ভ থেকে জন্মলাভের পর তোমাদের মধ্যে কেউ বুদ্ধি-বিবেচনার সাথে একটি রাতও কাটাওনি।

তিনটি প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করার পর বনু কোরায়যার সামনে একটি মাত্র পথই খোলা থাকে, সেটি হচ্ছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে অস্ত্র সমর্পণ এবং নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের দায়িত্ব তাঁর হাতে তুলে দেয়া। কিন্তু অস্ত্র সমর্পণের আগে ইহুদীরা তাদের কিছুসংখ্যক মুসলমান মিত্রের সাথে আলোচনার ইচ্ছা প্রকাশ করলো। তারা ভাবছিলো যে, এই আলোচনার মাধ্যমে মুসলমানদের কাছ থেকে অস্ত্র সমর্পণের পরিণতি সম্পর্কে হয়তো আভাস পাওয়া যাবে। এরূপ চিন্তা করে ইহুদীরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রস্তাব পাঠালো যে, দয়া করে আবু লোবাবাকে আমাদের কাছে প্রেরণ করুন। আমরা তাঁর সাথে কিছু পরামর্শ করতে চাই। আবু লোবাবা ছিলেন ইহুদীদের মিত্র। তাঁর বাগান এবং পরিবার পরিজনও ছিলো ইহুদীদের এলাকায়। হযরত আবু লোবাবা (রা.) সেখানে পৌঁছার পর ইহুদী নারী ও শিশুরা তাঁর কাছে ছুটে এলো এবং হাউ মাউ করে কাঁদতে লাগলো। এ অবস্থা দেখে তাঁর দুই চোখও অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। ইহুদীরা তাঁকে বললো, আবু লোবাবা আপনি কি চান যে, আমরা মোহাম্মদের ফয়সালা সাপেক্ষে অস্ত্র সমর্পণ করি? তিনি বললেন, হাঁ চাই। পরক্ষণে নিজের গলার প্রতি ইশারা করলেন। এই ইশারার অর্থ হচ্ছে যে, অস্ত্র সমর্পণ করতে পারো তবে অস্ত্র সমর্পণের পর তোমাদের যবাই করে দেয়া হবে। এইরূপ ইশারা করার সাথে সাথে হযরত আবু লোবাবার মনে পড়লো যে, তিনি আল্লাহ তায়ালা এবং তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে খেয়ানত করেছেন। একথা মনে হওয়ার সাথে সাথে তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফিরে আসার

পরিবর্তে সোজা মসজিদে নববীতে গিয়ে হাযির হলেন। এরপর নিজেকে মসজিদে নববীর একটি খুঁটির সাথে বেঁধে কসম করলেন যে, অন্য কেউ নয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ই নিজের পবিত্র হাতে আমার এ বাঁধন খুলবেন। এছাড়া তিনি এ মর্মেও প্রতিজ্ঞা করলেন যে, ভবিষ্যতে কখনো বনু কোরায়যার ভূখণ্ডে প্রবেশ করবেন না। এদিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত দূত আবু লোবাবার দেরী দেখে নানা কথা ভাবছিলেন। পরে সবকিছু শোনার পর তিনি বললেন, সে যদি আমার কাছে ফিরে আসতো, তবে তার মাগফেরাতের জন্যে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করতাম। কিন্তু সে যখন এমন কাজই করেছে, এখন তো আমি তার বাঁধন ততক্ষণ খুলতে পারবো না, যতক্ষণ আল্লাহ তায়ালা তার তওবা কবুল না করেন।

এদিকে আবু লোবাবার ইশারা সত্তেও ইহুদীরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে অস্ত্র সমর্পণের সিদ্ধান্ত করলো। তারা ভাবলো যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সিদ্ধান্ত দেবেন, তারা সেটাই মেনে নেবে। অথচ বনু কোরায়যা ইচ্ছা করলে দীর্ঘকাল যাবত অবরোধের শাস্তি ভোগ করতে পারতো। তাদের ছিলো পর্যাপ্ত খাদ্য-সামগ্রী, পানির কূপ এবং মযবুত দুর্গ। পক্ষান্তরে মুসলমানরা খোলা ময়দানে রক্ত জমে বরফ হওয়া শীত এবং ক্ষুধায় কাতর ছিলেন। খন্দকেরও আগে থেকে একাধিক যুদ্ধের কারণে তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে ছিলেন খুবই ক্লান্ত। কিন্তু বনু কোরায়যার যুদ্ধ ছিলো প্রকৃতপক্ষে একটি স্নায়বিক যুদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা ইহুদীদের মনে মুসলমানদের প্রভাব প্রবল করে দিয়েছিলেন। তাদের মনোবল নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। এদিকে হযরত আলী (রা.)-এর এক ঘোষণায় তারা একেবারে ভেঙ্গে পড়লো। হযরত আলী (রা.) এবং হযরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম বনু কোরায়যা গোত্রের বসতি এলাকার দিকে এগিয়ে গেলেন। এরপর হযরত আলী (রা.) বীর বিক্রমে ঘোষণা করলেন, ঈমানদার মোহাজেররা শোনো, তোমরা শোনো, আর দেরী নয়, আল্লাহর শপথ, এবার আমিও তাই পান করবো, হযরত হামযা (রা.) যা পান করেছিলেন অথবা এই দুর্গ জয় করবো।

হযরত আলী (রা.)-এর বীরত্বব্যঞ্জক এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনে বনু কোরায়যা আর দেরী করলো না। তারা নিজেদেরকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে সমর্পণ করে বললো, আপনি যা ভালো মনে হয় তাই করুন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পুরুষদের বেঁধে ফেলো। মোহাম্মদ ইবনে মোসলমা আনসারীর তত্ত্বাবধানে সকল পুরুষের হাত বেঁধে ফেলা হলো। নারী ও শিশুদের পৃথক করা হলো। আওস গোত্রের লোকেরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অনুনয় বিনয় শুরু করলো যে, বনু কায়নুকার সাথে আপনি যে ব্যবহার করেছেন, সেটাতো আপনার মনে আছে। বনু কায়নুকা ছিলো আমাদের ভাই খাযরাজের মিত্র। এরাও আমাদের মিত্র। কাজেই আপনি এদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আপনাদেরই একজন লোক আপনাদের ব্যাপারে ফয়সালা দেবে এতে কি আপনারা খুশী হবেন? তারা বললো, হাঁ, হাঁ, অবশ্যই। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সা'দ ইবনে মায়া'য এ ব্যাপারে ফয়সালা দেবেন। আওস গোত্রের লোকেরা বললো, আমরা এতে সন্তুষ্ট।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর হযরত সা'দ ইবনে মায়া'যকে ডেকে পাঠালেন। তিনি ছিলেন মদীনায়। মুসলিম মোহাজেরদের সাথে তিনি আসতে পারেননি। খন্দকের যুদ্ধের সময় এক শত্রু সৈন্যের তীর নিক্ষেপের ফলে তাঁর হাতের রগ কেটে গিয়েছিলো। একটি গাধার পিঠে করে তাঁকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাযির করা হলো। বনু কোরায়যা এলাকায় তাঁর প্রবেশের সাথে সাথে ইহুদীরা তাকে ঘিরে ধরলো এবং বলতে লাগলো যে, হে সা'দ আপনার মিত্রদের প্রতি দয়া করুন, তাদের জন্যে কল্যাণকর ফয়সালা দিন। রসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকেই বিচারক মনোনীত করেছেন। হযরত সা'দ চুপ করে রইলেন, কোন জবাব দিলেন না। চারিদিক থেকে আবেদন-নিবেদনে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে তিনি বললেন, এখন সময় এসেছে যে, সা'দ আল্লাহর ব্যাপারে কোন শক্তিধরের রক্তচক্ষুকে পরোয়া করে না। একথা শুনে কিছু লোক তখনই মদীনায় ছুটে গেলো এবং বন্দীদের মৃত্যুর ঘোষণা প্রচার করলো।

হযরত সা'দ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছাকাছি পৌঁছুলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীদের বললেন, তোমাদের সর্দারের দিকে অগ্রসর হও। হযরত সা'দ (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাযির হলে তিনি বললেন, হে সা'দ, ওরা তোমার ফয়সালা মেনে নিতে রাজি হয়েছে। হযরত সা'দ (রা.) বললেন, আমার ফয়সালা তাদের ওপর প্রয়োজ্য হবে? সবাই বললো হাঁ, তিনি বললেন, মুসলমানদের ওপরও প্রযোজ্য হবে? তারা বললো, হাঁ। তিনি বললেন, যিনি এখানে উপস্থিত রয়েছেন তাঁর ওপরও প্রযোজ্য হবে? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি ইঙ্গিত করেই তিনি একথা বলেছিলেন। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জৌলুসপূর্ণ চেহারার দিকে সরাসরি তাকাতে তাঁর সাহস হচ্ছিলো না। তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে একথা বলেছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন, জ্বী হাঁ। আমার ওপরও প্রযোজ্য হবে। হযরত সা'দ (রা.) বললেন, তবে বলছি, ওদের ব্যাপারে আমার ফয়সালা এই যে, পুরুষদের হত্যা করা হবে, মহিলা ও শিশুদের বন্দী করা হবে। তাদের ধন-সম্পদ বন্টন করে দেয়া হবে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি ওদের ব্যাপারে সেই ফয়সালাই দিয়েছ, যে ফয়সালা আল্লাহ তায়ালা সাত আসমানের উপর করে রেখেছিলেন।

হযরত সা'দ ইবনে মায়া'য (রা.) এর এই ফয়সালা ছিলো অত্যন্ত সুষ্ঠু ও ন্যায়ানুগ। কেননা বনু কোরায়যা মুসলমানদের জীবন মৃত্যুর ক্রান্তিলগ্নে যে ভয়াবহ বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো, সেটা তো ছিলোই, এছাড়া মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারুক বা না পারুক তারা ছিলো তাতে বদ্ধপরিকর। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে তারা দেড় হাজার তলোয়ার দুই হাজার বর্শা তিনশত বর্ম এবং পাঁচশত ঢাল মজুদ করেছিলো। বিজয়ের পর মুসলমানরা সেসব অস্ত্র উদ্ধার করেন।

এ ফয়সালার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে বনু কোরায়যাকে মদীনায় হাযির করে বনু নাজ্জার গোত্রের হারেযের কন্যার বাড়ীতে তাদের আটক করে রাখা হয়। সেই মহিলা ছিলো বনু নাজ্জার গোত্রের হারেস নামক এক ব্যক্তির কন্যা। এরপর মদীনার বাজারে পরিখা খনন করা হয়। গভীর গর্ত বা পরিখা খননের পর হাত বাঁধা ইহুদীদের দলে দলে নিয়ে আসা হয় এবং শিরশ্ছেদ করে সেই গর্তে ফেলে দেয়া হয়। পাইকারী হত্যাকান্ড শুরু হওয়ার পর কয়েকজন ইহুদী তাদের সর্দার কা'ব ইবনে আছাদকে বললো, আমাদের সাথে যে আচরণ করা হচ্ছে, এ ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া কি? তিনি রূঢ়ভাবে বললেন, তোমরা কি কিছুই বোঝো না? দেখতে পাচ্ছো না যে যাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সে আর ফিরে আসছে না। নতুন করে ডেকে নেয়াও বন্ধ হচ্ছে না। হত্যা করা হচ্ছে, স্রেফ ডেকে নিয়ে হত্যা করা হচ্ছে। মোদ্দকথা সকল হাত বাঁধা ইহুদীকে মদীনায় হত্যা করা হয়। তাদের সংখ্যা ছিলো ছয় থেকে সাত শয়ের মাঝামাঝি।

এ তৎপরতার ফলে বিশ্বাসঘাতকতার এই বিষাক্ত সাপগুলোকে নিশ্চিহ্ন করা হয়। এরা মুসলমানদের সাথে পাকাপোক্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিলো। মুসলমানদের নির্মূল করতে তারা নায়ক

সময়ে শত্রুদের সাথে সহযোগিতা করে মারাত্মক যুদ্ধাপরাধ করেছিলো। মৃত্যুদন্ডই ছিলো এ গুরুতর অপরাধের একমাত্র সাজা। তাদের প্রতি কোনই অবিচার করা হয়নি।

বনু কোরায়যার এই ধ্বংসের সাথে সাথে বনু নাযিরের শয়তান এবং খন্দকের যুদ্ধের বড় অপরাধী হুয়াই ইবনে আখতাবও নিজের কর্মফলের চূড়ান্তে পৌঁছে যায়। এই লোকটি ছিলো উম্মুল মোমেনীন হযরত সাফিয়্যার (রা.) পিতা। কোরায়শ ও বনু গাতফানের ফিরে যাওয়ার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানরা বনু কোরায়যাকে অবরোধ করেন। তারা অবরুদ্ধ হওয়ার পর হুয়াই ইবনে আখতাবও অবরুদ্ধ হয়। কেননা খন্দকের যুদ্ধের সময় এই লোকটি কা'ব ইবনে আছাদকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতায় উদ্বুদ্ধ করার সময়ে কথা দিয়েছিলো যে, তাদের বিপদকালে তাদের সঙ্গেই থাকবে। এখন সে কথা রক্ষা করছিলো। তাকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাযির করা হলে দেখা গেলো যে, তার পরিধানের পোশাক সবদিকে এক আঙ্গুল করে ছেঁড়া। সে এভাবে একারণেই ছিড়েছিলো যাতে, তার পোশাক গনীমতের মালের মধ্যে রাখা না যায়। মুসলমানরা তার দুই হাত ঘাঁড়ের পেছনে নিয়ে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাযির হয়ে সে বললো, শুনুন আপনার বিরুদ্ধে শত্রুতা করার কারণে আমি অনুতপ্ত নই। তবে কথা হলো যে, আল্লাহর সাথে যারা লড়াই করে, তারা পরাজিত হয়। এরপর সবাইকে সম্বোধন করে বললো, হে লোক সকল, আল্লাহর ফয়সালায় কোন আক্ষেপ নেই। এটা তো তকদিরের লিখন এবং বড় ধরনের হত্যাকান্ড, যা কিনা আল্লাহ তায়ালা বনি ইসরাইলের জন্যে লিখে দিয়েছেন। এরপর সেও বসলো এবং তার শিরশ্ছেদ করা হলো।

এই ঘটনায় বনু কোরায়যার একজন মহিলাকেও হত্যা করা হয়। এই মহিলা খাল্লাদ ইবনে ছুয়াইদের ওপর গম পেশাইর চাক্কি ছুঁড়ে তাকে হত্যা করেছিলেন। সেই হত্যাকান্ডের বদলে তাকে হত্যা করা হয়।

রসূল আদেশ দিয়েছিলেন যে, যার নাভির নিচে চুল গজিয়েছে তাকেই যেন হত্যা করা হয়। আতিয়া কারাযির নাভির নীচে তখনো চুল গজায়নি, এ কারণে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো। পরে তিনি ইসলামের ছায়াতলে এসে জীবন ধন্য করেছিলেন।

হযরত ছাবেত ইবনে কয়েস আবেদন করলেন যে, যোবায়ের ইবনে বাতা এবং তার পরিবার-পরিজনকে তার হাতে হেবা করে দেয়া হোক। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আবেদন মনজুর করেন। এরপর ছাবেত ইবনে কয়েস যোবায়েরকে বললেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাকে এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন। আমি তোমাদের আযাদ করে দিচ্ছি। এখন থেকে তোমরা মুক্ত। যোবায়ের ইবনে বাতা যখন খবর পেলো যে, তার স্বজাতীয়দের হত্যা করা হয়েছে, সে তখন হযরত ছাবেত ইবনে কয়েসকে বললো, ছাবেত তোমার প্রতি এক সময় আমি যে অনুগ্রহ করেছিলাম, তার দোহাই দিয়ে বলছি, আমাকেও আমার বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দাও। এরপর তাকে হত্যা করা হয়। যোবায়ের ইবনে বাতার পুত্র আবদুর রহমানকে হত্যা করা হয়নি, আবদুর রহমান পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বনু নাজ্জার গোত্রের উম্মুল মানযার সালমা বিনতে কয়েস রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন জানালেন যে, সামোয়াল কারযির পুত্র রেফায়াকে যেন তার জন্যে হেবা করে দেয়া হয়। এই আবেদনও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গ্রহণ করেন এবং রেফায়াকে তার হাতে তুলে দেন। উম্মুল মানযার রেফায়াকে জীবিত রাখেন। পরবর্তী সময়ে রেফায়া ইসলাম গ্রহণ করেন।

সেই রাতে অস্ত্র সমর্পণের ঘটনার পূর্বে কয়েকজন লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, এতে তাদের জানমাল এবং পরিবার-পরিজনকে নিরাপত্তা প্রদান করা হয়। সেই রাতে আমর নামে একজন লোক বেরিয়ে আসে। এই লোকটি বনু কোরায়যার বিশ্বাসঘাতকতায় যোগদান করেনি। প্রহরীদের কমান্ডার হযরত মোহাম্মদ ইবনে মোসলমা (রা.) তাকে চিনতে পারেন এবং চেনার পর ছেড়ে দেন। পরে এই লোকটি নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, তার আর কোন খবর পাওয়া যায়নি।

বনু কোরায়যার ধন-সম্পদ থেকে এক পঞ্চমাংশ বের করে রেখে বাকি সব কিছু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের মধ্যে বন্টন করে দেন। ঘোড় সওয়ারদের তিন অংশ প্রদান করেন, এক অংশ তার নিজের জন্যে আর বাকি দুই অংশ ঘোড়ার জন্যে। পদব্রজে আগমনকারীদের এক অংশ প্রদান করা হয়। কয়েদী এবং শিশুদের হযরত সা'দ ইবনে যায়েদ আনসারীর নেতৃত্বে নজদে পাঠিয়ে তাদের বিনিময়ে অস্ত্র এবং ঘোড়া ক্রয় করা হয়।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু কোরায়যার মহিলাদের মধ্যে রায়হানা বিনতে আমর ইবনে খানাফাকে তাঁর নিজের জন্যে পছন্দ করেন। ইবনে ইসহাকের বর্ণনা মোতাবেক এই মহিলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত পর্যন্ত তাঁর কাছে ছিলো।[১]

কালবি বর্ণনা করেছেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রায়হানাকে মুক্ত করে দিয়ে তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর হযরত রায়হানা (রা.) ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হয়।[২]

বনু কোরায়যার ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর আল্লাহর নেক বান্দা হযরত সা'দ ইবনে মায়া'য (রা.) এর দোয়া কবুল হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসে। খন্দকের যুদ্ধের আলোচনার সময় সে কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত সা'দ এর (রা.) যখম ফেটে যায়। সেই সময় তিনি মসজিদে নববীতে ছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানেই তাঁর জন্যে তাঁবু স্থাপন করেন যাতে করে, কাছে থেকে তাঁর সেবা শুশ্রূষা করা যায়। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, যখম ফেটে গিয়েছিলো। মসজিদে বনু শেফারের কয়েকটি তাঁবু ছিলো। তারা হযরত সা'দ এর রক্তপ্রবাহ দেখে চমকে উঠলো। তারা বললো, ওহে তাঁবুবাসীরা, এটা কি ব্যাপার? তোমাদের দিক থেকে আমাদের দিকে আসছে। লক্ষ্য করে দেখা গেলো যে, হযরত সা'দ এর রক্ত অবিরল ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। অবশেষে এই যখমের ফলেই হযরত সা'দ ইবনে মায়া'য (রা.) ইন্তেকাল করেন।[৩]

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সা'দ ইবনে মায়া'য (রা.)-এর ইন্তেকালে রহমানের আরশ হেলে যায়।[৪]

ইমাম তিরমিযি হযরত আনাস (রা.) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করে সেটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। সেই হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত সা'দ এর জানাযা ওঠানোর পর

---

১. ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড. পৃ. ২৪৫

২. তানকিহুল ফুহুম, পৃ. ১২

৩. সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৯১

৪. সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড. পৃ. ৫৩৬, মুসলিম, ২য় খন্ড. পৃ. ২৯৪. জামে তিরমিজি, ২য় খন্ড, পৃ. ২২৫

লোকেরা বললো, তার জানাযা কতো হালকা। রসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ফেরেশতারা তার জানাযা বহন করছেন।[৫]

বনু কোরায়জায় অবরোধের সময় একজন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। বনু কোরায়যার একজন মহিলা এই সাহাবীর প্রতি গম পেশাইর চাক্কি বা যাঁতাকল নিক্ষেপ করেছিলো। এছাড়া হযরত আকাশার ভাই আবু ছানান ইবনে মোহসেন অবরোধকালে ইন্তেকাল করেন।

হযরত আবু লোবাবা (রা.) ছয় রাত ক্রমাগতভাবে মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে বাঁধা অবস্থায় অতিবাহিত করে। নামাযের সময় হলে তাঁর স্ত্রী এসে খুলে দিতেন, এরপর নামায শেষে পুনরায় বেঁধে রাখতেন। ছয় দিন পর এক সকালে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ওহী আসে যে, আবু লোবাবার তওবা কবুল হয়েছে। সেই সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উম্মে সালমার গৃহে অবস্থান করছিলেন। হযরত আবু লোবাবা (রা.) বলেন, উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে সালমা (রা.) তাঁর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আমাকে বললেন, হে আবু লোবাবা, সন্তুষ্ট হও, আল্লাহ তায়ালা তোমার তওবা কবুল করেছেন। একথা শুনে সাহাবারা তাঁর বাঁধন খুলে দিতে এগিয়ে আসেন। কিন্তু রাজি হননি। তিনি বললেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আমার বাঁধন কেউ খুলবে না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামায আদায়ের জন্যে যাওয়ার সময় আবু লোবাবার বাঁধন খুলে দেন।

জেলকদ মাসে এই অবরোধের ঘটনা ঘটে। দীর্ঘ ২৫ দিন পর্যন্ত অবরোধ কার্যকর থাকে।[৬]

আল্লাহ তায়ালা বনু কোরায়যা ও খন্দকের যুদ্ধ সম্বন্ধে পবিত্র কোরআনের সূরা আহযাবে বহু সংখ্যক আয়াত নাযিল করেন। এতে উভয় যুদ্ধের বিভিন্ন বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। মোমেন ও মোনাফেকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়। শত্রুদের বিভিন্ন দলের মধ্যে বিভেদ এবং ভীরুতার কথা উল্লেখ করা হয়। আহলে কেতাবদের বিশ্বাসঘাতকতার পরিণামও ব্যাখ্যা করা হয়।

---

৫ জামে তিরমিযি ২য় খন্ড, পৃ. ২২৫

৬. ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ২৩৭, ২৩৮ . যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য দেখুন, ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, ২৩৩-২৭৩, সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৯০-৫৯১, যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ৭২-৭৩, ৭৪, মুখতাছারুছ ছিয়ার, শেখ আবদুল্লাহ, পৃ. ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০

খন্দক ও কোরায়যার যুদ্ধের পরের সামরিক অভিযান

এক) সালাম ইবনে আবুল হাকিকের হত্যাকান্ড

সালাম ইবনে আবুল হাকিকের কুনিয়ত ছিলো আবু রাফে। এই লোকটি ছিলো ইহুদীদের সেইসব নিকৃষ্ট অপরাধীদের অন্যতম, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ধন-সম্পদ এবং খাদ্য-সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করেছিলো। এছাড়া রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও সে কষ্ট দিয়েছিলো। এসব কারণে মুসলমানরা বনু কোরায়যা থেকে মুক্ত হওয়ার পরে খাযরাজ গোত্রের কয়েকজন সাহাবা আবু রাফেকে হত্যার অনুমতি চাইলেন। এর আগে কা'ব ইবনে আশরাফের হত্যাকান্ডে আওস গোত্রের কয়েকজন সাহাবা অংশগ্রহণ করেছিলেন, এ কারণে খাযরাজ গোত্রের সাহাবাদের আগ্রহ ছিলো যে, তারাও ওই ধরনের কোন কৃতিত্বের পরিচয় দেবেন। তাই, তারা আবু রাফেকে হত্যার জন্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতি চাইলেন।[১]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের অনুমতি দিলেন বটে তবে তাকিদ দিলেন যে, নারী ও শিশুদের হত্যা করো না। এরপর পাঁচজন সাহাবার সমন্বয়ে গঠিত একটি দল নিজেদের অভিযানে রওয়ানা হলেন। এ সকল সাহাবা খাযরাজ গোত্রের বনু সালমা শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর তাদের কমান্ডার নিযুক্ত হলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আতিক।

এই ক্ষুদ্র দল খয়বর অভিমুখে রওয়ানা হলেন। কেননা আবু রাফের দুর্গসদৃশ বাসভবন সেখানেই ছিলো। সাহাবারা খয়বর গিয়ে যখন পৌঁছুলেন, তখন সূর্য ডুবে গেছে। সবাই নিজের জিনিসপত্র নিয়ে ঘরে ফিরছে। আবদুল্লাহ ইবনে আতিক তার সঙ্গীদের বললেন, তোমরা এখানেই অপেক্ষা করো, আমি যাচ্ছি। দরজার প্রহরীর সাথে কোন বাহানা করে আমি ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করছি। এরপর তিনি গেলেন। দরজার কাছাকাছি গিয়ে মাথায় কাপড় ঢাকা দিয়ে এমনভাবে বসে পড়লেন যে, দেখে মনে হয় কেউ প্রস্রাব করতে বসেছে। প্রহরী আওয়ায দিলো, ওহে আল্লাহর বান্দা, ভেতরে যেতে চাইলে যাও, আমি দরজা বন্ধ করছি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আতিক বলেন, আমি ভেতরে প্রবেশ করে আত্মগোপন করে রইলাম। সব লোক ভেতরে গেছে মনে করে প্রহরী দরজা বন্ধ করে একটি খুঁটির সাথে চাবি ঝুলিয়ে রাখলো। বেশ কিছুক্ষণ পর চারিদিক নীরব নিঝুম হয়ে এলে আমি উঠে চাবি নিলাম এবং দরজা খুলে দিলাম। আবু রাফে দোতালায় একটি কামরায় থাকতো। সেখানে আমোদ-প্রমোদের মজলিস হতো। মজলিসের লোকেরা চলে গেলে আমি ওপরের দিকে উঠতে লাগলাম। কোন দরজা খুললেই সেটি ভেতর থেকে বন্ধ করে দিতাম। মনে মনে ভাবলাম কেউ যদি আমার আগমন টের পেয়েও যায় তবু তার আসার আগেই আমি আবু রাফেকে হত্যা করবো। এক সময়ে আবু রাফের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম, কিন্তু ছেলেমেয়েদের নিয়ে সে একটা ঘরে শুয়েছিলো। সে ঘর ছিলো অন্ধকার। আবু রাফে কোন জায়গায় ছিলো সেটা বোঝা যাচ্ছিলো না। আবু রাফেকে

---

[১]. ফতহুল বারী, সপ্তম খন্ড, পৃ. ৩৪৩

আওয়ায দিলাম। সে বললো, কে ডাকে? আমি দ্রুত আওয়ায লক্ষ্য করে অগ্রসর হলাম এবং তরবারি দিয়ে আঘাত করলাম। কিন্তু খুব উত্তেজনার মধ্যে থাকায় কিছু করতে পারিনি। আঘাত লক্ষ্যচ্যুত হলো। এদিকে আবু রাফে চিৎকার করে উঠলো। আমি দ্রুত কামরা থেকে বেরিয়ে কণ্ঠস্বর পরিবর্তন করে বললাম, আবু রাফে, কিসের আওয়ায শুনলাম? সে বললো তোমার মা বরবাদ হোক, একজন লোক এখনই আমাকে এক কামরায় তরবারি দিয়ে আঘাত করেছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আতিক বলেন, এবার আমি কাছে গিয়ে আবু রাফেকে পুনরায় আঘাত করলাম। এ আঘাত লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো না। ফলে আবু রাফে রক্তাক্ত হয়ে গেলো। কিন্তু তখনো তাকে আমি হত্যা করতে পারিনি। এ কারণে তলোয়ারের মাথা তার পেটে ঢুকিয়ে দিলাম। তলোয়ারের ধারালো মাথা তার পেট ভেদ করে পিঠ পর্যন্ত ঢুকে গেলো। মনে মনে ভাবলাম, তাকে হত্যা করতে পেরেছি। এরূপ চিন্তার পর বাইরে বেরোতে শুরু করলাম। একটা দরজা খুলছি আর বেরুচ্ছি। একটা দরজা খুলে সিঁড়ির কাছে রাখলাম। ভেবেছিলাম যে, নীচে পৌঁছে গেছি। কিন্তু সেটা ছিলো ভুল। অতর্কিতে নীচে পড়ে গেলাম। জোৎস্না রাত ছিলো। পায়ের গোড়ালি মচকে গেলো। পাগড়ি খুলে ভালোভাবে পা বাঁধলাম। এরপর দরজায় এসে বসে রইলাম। মনে মনে ভাবলাম, আবু রাফেকে প্রকৃতই হত্যা করতে পেরেছি কিনা, এটা না জানা পর্যন্ত এখান থেকে যাবো না।

ভোররাতে মোরগ ডাকার পর একজন লোক বাড়ীর ছাদে উঠে উচ্চস্বরে বলতে লাগলো যে, হেজাযের অধিবাসী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আবু রাফের মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা করছি।

আবদুল্লাহ ইবনে আতিক বলেন, আমি তখন সঙ্গীদের কাছে গিয়ে বললাম, পালাও আল্লাহর ইচ্ছায় আবু রাফে তার কৃতকর্মের ফল লাভের জায়গায় পৌঁছে গেছে। এরপর আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছে আমি সব ঘটনা খুলে বললাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, পা বাড়িয়ে দাও, আমি পা বাড়িয়ে দিলাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের হাত একটুখানি ছুঁয়ে দিলেন। সাথে সাথে মনে হলো যে, আমার পায়ে কোন ব্যথা ছিলোই না।[২]

এটি সহীহ বোখারীর বর্ণনা। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, আবু রাফের ঘরে পাঁচজন সাহাবাই প্রবেশ করেছিলেন এবং সবাই হত্যার কাজে অংশ গ্রহণ করেন। যিনি আবু রাফের দেহে আঘাত করেছিলেন তাঁর নাম ছিলো আবদুল্লাহ ইবনে উনাইস। এ বর্ণনায় একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, রাত্রিকালে আবু রাফেকে হত্যা করার পর আবদুল্লাহ ইবনে আতিকের গোড়ালির হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিলো। অন্য সাহাবারা তাঁকে তুলে নিয়ে এসে দুর্গের দেয়াল সংলগ্ন একটি জলাশয়ের কাছে লুকিয়ে রইলেন। এদিকে ইহুদীরা আগুন জ্বালালো এবং চারিদিক থেকে ছুটে এলো। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কাউকে না পেয়ে তারা নিহত লোকটির কাছে ফিরে গেলো। সাহাবায়ে কেরাম ফিরে আসার সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আতিককে ধরাধরি করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে এলেন।[৩]

পঞ্চম হিজরীর জিলকদ অথবা জিলহজ্জ মাসে এই সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়।[৪]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খন্দক ও কোরায়যার যুদ্ধের পর এবং যুদ্ধাপরাধীদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার পর নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করলেন। সেইসব গোত্র এবং

---

[২]. সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৭৭

[৩]. ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ২৮৪, ২৮৫

[৪]. রহমতুল লিল আলামীন, ২য় খন্ড, পৃ. ২২৩

লোকদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলেন, যারা শান্তি ও স্থিতিশীলতার পথে বাধা সৃষ্টি করছে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতীত শান্তির আশা ছিলো সুদূর পরাহত।

দুই) ছারিয়্যা মোহাম্মদ ইবনে মোসলামা

খন্দক ও কোরায়যার যুদ্ধের পর এটি ছিলো প্রথম সামরিক অভিযান। ত্রিশজন সাহাবার সমন্বয়ে গঠিত একটি দল এই অভিযানে অংশ নেন।

নজদের অভ্যন্তরে বাকরাত এলাকার রিয়ায় এই সেনাদল প্রেরণ করা হয়। হিজরীর ১০ই মহররম এই সেনাদল প্রেরিত হয়। যারিয়া এবং মদীনার মধ্যে সাত রাতের দূরত্ব। লক্ষ্য ছিলো বনু বকর ইবনে কেলাব গোত্রের একটি শাখা। মুসলমানরা ধাওয়া করলে শত্রুরা সকলেই পালিয়ে যায়। মুসলমানরা বকরিসহ বেশ কিছু চতুষ্পদ জন্তু অধিকার করে এবং মহররমের একদিন বাকি থাকতেই মদীনায় এসে পৌঁছেন। এরা বনু হানিফা গোত্রের সর্দার ছামামা ইবনে আছাল হানাফীকেও গ্রেফতার করে নিয়ে আসেন। ছামামা ভন্ড নবী মোসায়লামা কাযযাবের নির্দেশে ছদ্মবেশ ধারণ করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করতে বেরিয়েছিলো।[৫]

কিন্তু মুসলমানরা ছামামাকে গ্রেফতার করে মসজিদে নববীর একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ছামামা, তোমার কাছে কি আছে? সে বললো, হে মোহাম্মদ, আমার কাছে আছে কল্যাণ। যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন তবে এমন একজন লোককে হত্যা করবেন যার দেহে প্রচুর রক্ত আছে। যদি অনুগ্রহ করেন, তবে এমন একজন লোককেই অনুগ্রহ করবেন যে লোক অকৃতজ্ঞ নয়। যদি ধন-সম্পদ চান, তবে বলুন কি পরিমাণ প্রয়োজন। এসব কথা শোনার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সেই অবস্থাই ফেলে রাখলেন, দ্বিতীয়বার এসে তিনি একই প্রশ্ন করলেন এবং ছামামা একই জবাব দিলো। এরপর তৃতীয়বার এসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই প্রশ্ন করলেন এবং সেই একই জবাব দিলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর নির্দেশ দিলেন যে, ছামামাকে মুক্ত করে দাও। তাকে মুক্ত করে দেয়া হলো। ছামামা তখন মসজিদে নববীর কাছে একটি খেজুর বাগানে গিয়ে গোসল করে পবিত্র হলো এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলো। ইসলাম গ্রহণের পর সে বললো, আল্লাহর শপথ, সমগ্র পৃথিবীতে কোন মানুষের চেহারা আমার দৃষ্টিতে আপনার চেহারার চেয়ে অপ্রিয় ছিলো না। কিন্তু আজ কোন মানুষের চেহারা আপনার চেহারার চেয়ে প্রিয় নয়। আল্লাহর শপথ, বিশ্ব জগতে আপনার দ্বীনের চেয়ে অপ্রিয় দ্বীন আমার কাছে আর ছিলো না কিন্তু বর্তমানে আপনার দ্বীন আমার কাছে অন্য সকল দ্বীনের চেয়ে প্রিয়। আপনার সওয়াররা আমাকে এমতাবস্থায় গ্রেফতার করেছে যে, আমি ওমরাহ পালনের ইচ্ছা করছিলাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সুসংবাদ দিলেন এবং পালনের নির্দেশ দিলেন। কোরায়শদের কাছে পৌঁছার পর তারা বললো, ছামামা, তুমি বেদ্বীন হয়ে গেছো। তিনি বললেন, না আমি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে মুসলমান হয়েছি। শোনো, তোমাদের কাছে ইয়ামামার কোনো গম আসবে না যতক্ষণ না রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি প্রদান করেন। ইয়ামামা হচ্ছে মক্কাবাসীদের কাছে ক্ষেতের মতো। হযরত ছামামা (রা.) দেশে পৌঁছে মক্কায় গম রফতানী বন্ধ করে দিলেন। এতে কোরায়শরা ভীষণ মুশকিলে পড়ে গেলো। তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিকটাত্মীয়তার সম্পর্কের দোহাই দিয়ে লিখলো যেন তিনি

---

[৫] সীরাতে হালবিয়াহ, ২য় খন্ড, পৃ. ২৯৭

ছামামাকে মক্কায় গম রফতানির নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার অনুরোধ জানান। দয়াল নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই করলেন।[৬]

তিন) গোযওয়ায়ে বনু লেহইয়ান

বনু লেহইয়ান গোত্রের লোকেরাই রাজিঈ নামক জায়গায় দশজন সাহাবাকে ধোঁকা দিয়ে নিয়ে আটজনকে হত্যা এবং দুইজনকে মক্কাবাসীদের হাতে বিক্রি ছিলো। সেখানে তারা সেই দুইজনকে নির্মমভাবে হত্যা করে। কিন্তু বনু লেহইয়ানদের এলাকা যেহেতু মক্কার কাছাকাছি, অথচ কোরায়শ ও মুসলমানদের সাথে চরম বিরোধ চলছিলো। তাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শত্রুদের অতো কাছাকাছি যাওয়া সমীচীন মনে করছিলেন না। ইতিমধ্যে কোরায়শদের বিভিন্ন দলের মধ্যে ফাটল ধরেছে, মুসলমানদের বিরোধিতার ক্ষেত্রে তাদের সঙ্কল্পের জোর অনেকটা কমে গেছে এবং পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতও তারা মেনে নিয়েছে। এ কারণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে করলেন যে, বনু লেহইয়ানের কাছ থেকে রাজিঈ-এর শহীদদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের সময় এসেছে। ষষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়াল অথবা জমাদিউল আউয়াল মাসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুইশত সাহাবাসহ বনু লেহইয়ান গোত্র অভিমুখে রওয়ানা হলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। অন্যদের বলা হলো, তিনি সিরিয়া যাবেন। রসূল প্রথমে উমায এবং উসফান স্থলদ্বয়ের মধ্যখানে অবস্থিত বাতনে গাররান নামক উপত্যকায় পৌঁছেন। সাহাবাদের সেখানেই হত্যা করা হয়। রসূল সেখানে সাহাবাদের জন্যে আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন। এদিকে বনু লেহইয়ান গোত্রের লোকেরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের খবর শুনে পাহাড়ী এলাকায় পালিয়ে গেলো। তাই তাদের কাউকেই আটক করা সম্ভব হলো না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে দুইদিন অবস্থান করেন। বিভিন্ন এলাকায় খন্ড খন্ড দলে বিভক্ত করে সাহাবাদের প্রেরণ করেন। কিন্তু কারো হদিস পাওয়া যায়নি। পরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসফান নামক জায়গায় গিয়ে সেখান থেকে দশজন ঘোড় সওয়ার সাহাবাকে কোরাউল গামীম নামক জায়গায় প্রেরণ করেন। কোরায়শদের তাঁর আগমন সংবাদ জানাতেই তাদের প্রেরণ করা হয়। মোট চৌদ্দদিন বাইরে অবস্থানের পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ফিরে আসেন।

এ অভিযান থেকে ফিরে এসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যায়ক্রমে কয়েকটি সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। এখানে সেসব সংক্ষেপে তুলে ধরা হচ্ছে।

চার) ছ্যারিয়্যা গামর

ষষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়াল বা রবিউস সানিতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চল্লিশজন সাহাবাকে গামর নামক জায়গায় এক অভিযানে প্রেরণ করেন। গামার বনু আছাদ গোত্রের একটি জলাশয়ের নাম। হযরত মুহম্মদ বিন মাসলামা (রা.) এর নেতৃত্ব দেন। মুসলমানদের আগমনের খবর পেয়ে শত্রুরা পালিয়ে যায়। মুসলমানরা তাদের দুইশত উট মদীনায় নিয়ে আসে।

পাঁচ) ছ্যারিয়া যুল কেস্‌সা (১)

ষষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়াল বা রবিউস সানিতে মোহাম্মদ ইবনে মোসলমার নেতৃত্বে দশজন সাহাবার একটি সেনাদল যুল কেস্‌সা নামক স্থান অভিমুখে রওয়ানা হন। এই স্থান বনু ছালাবা গোত্রের বসতি এলাকায় অবস্থিত। শত্রুদের সংখ্যা ছিলো একশত তারা পালিয়ে গিয়ে

[৬] যাদুল মায়াদ, ২য় পৃ. ১১৯, মোখতাছারুস সিয়ার শেখ আবদুল্লাহ, পৃ. ২৯২, ২৯৬

আত্মগোপন করে। সাহাবায়ে কেরাম ঘুমিয়ে পড়লে শত্রুরা আকস্মিক হামলা করে তাদের নয় জনকে হত্যা করে। একমাত্র দল নেতা মোহাম্মদ ইবনে মোসলমা বেঁচে যান। তিনি আহত অবস্থায় মদীনায় ফিরে আসেন।

ছয়) ছারিয়্যা যুল কেস্‌সা (২)

মোহাম্মদ ইবনে মোসলমার (রা.) নেতৃত্বে প্রেরিত সেনাদলের শাহাদাতের পর ষষ্ঠ হিজরীর রবিউস সানিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু ওবায়দা (রা.)-কে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে একদল সাহাবাকে যুল কেস্‌সায় প্রেরণ করেন। চল্লিশ জন সাহাবার এই সেনাদল পূর্বোক্ত নয় জন সাহাবার শাহাদাতের জায়গা অভিমুখে রওয়ানা হন। সারারাত পায়ে হেঁটে তাঁরা যুল কেস্‌সায় পৌঁছেন। সেখানে যাওয়ার পরই শত্রুদের খুঁজতে শুরু করেন। বনু ছালাবা গোত্রের এই শত্রু দল খুব দ্রুত পাহাড়ী এলাকায় পালিয়ে যায়। মুসলমানরা কিছুতেই তাদের হদিস করতে পারেননি। শুধুমাত্র একজন লোককে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়। সেও ইসলাম গ্রহণ করে। এ অভিযানে বেশ কিছু বকরিসহ পশুপাল মুসলমানদের অধিকারে আসে।

সাত) ছারিয়্যা জামুম

এই সামরিক অভিযান হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.)-এর নেতৃত্বে ষষ্ঠ হিজরীর রবিউস সানিতে জামুম নামক এলাকায় প্রেরণ করা হয়। জামুম মাররাজ জাহরান বর্তমান ফাতেমা প্রান্তরে বনু ছুলাইম গোত্রের একটি জলাশয়ের নাম। হযরত যায়েদ (রা.) সেখানে পৌঁছার পর মুজাইনা গোত্রের হালিমা নামের এক মহিলাকে গ্রেফতার করেন। সেই মহিলা বনু ছুলাইমের একটি জায়গার নাম মোজাহেদদের জানিয়ে দেন। সেখান থেকে বকরিসহ বহু পশু এবং কয়েদী মুসলমানদের অধিকারে আসে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই মেয়েটিকে মুক্ত করে বিয়ে দিয়ে দেন।

আট) ছারিয়্যা গাইছ

এই অভিযানে সৈন্য সংখ্যা ছিলো ১১৭। এই অভিযানও হযরত যায়েদ ইবনে হারেছার (রা.) নেতৃত্বে ষষ্ঠ হিজরীর জমাদিউল উলায় এই একই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। এতে কোরায়শদের একটি বাণিজ্য কাফেলার মালামাল মুসলমানদের হাতে আসে। সেই কাফেলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামাতা হযরত আবুল আসের নেতৃত্বে সফর করছিলো। আবুল আস তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। তাঁকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। তিনি দ্রুত পলায়ন করে মদীনা এসে স্ত্রী হযরত যয়নবের (রা.) কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এরপর নিজ স্ত্রীকে অনুরোধ করেন তিনি যেন তাঁর আব্বা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলে অধিকৃত কাফেলার মালামালগুলো ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করেন। হযরত যয়নব (রা.) আব্বাকে স্বামীর অনুরোধের কথা জানান। হযরত যয়নব (রা.)-এর অনুরোধের প্রেক্ষিতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের মালামাল ফেরত দেয়ার ইঙ্গিত করেন। কোন চাপ সৃষ্টি করেননি। সাহাবায়ে কেরাম সব ধন-সম্পদ ফেরত দেন। এসব মালামালসহ আবুল আস মক্কায় চলে যান এবং কোরায়শদের সব মালামাল তাদের বুঝিয়ে দিয়ে পুনরায় মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইতিপূর্বেকার বিবাহ অনুযায়ীই হযরত যয়নবকে (রা.) হযরত আবুল আসের হাতে তুলে দেন।[৭]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কন্যা-জামাতার বিবাহ নবায়ন করাননি যেহেতু তখনো মুসলমান মহিলাদের জন্যে কাফের স্বামীর সাথে বসবাস করা হারাম হওয়ার আয়াত

---

৭. ছুনানে আবু দাউদ, দ্রষ্টব্য

নাযিল হয়নি। তবে একটি হাদীসে আছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যয়নব ও আবুল আস-এর বিবাহ নতুন করে দিয়েছিলেন। এই হাদীসটি অর্থ ও ছনদের দিক থেকে সঠিক নয়।[৮] উভয় দিক থেকেই দুর্বল। যারা এই যয়ীফ হাদীসের বরাত দেন, তারা আশ্চর্য রকমের বিপরীতধর্মী কথা বলেন। তারা বলেন যে, আবুল আস অষ্টম হিজরীর শেষদিকে মক্কা বিজয়ের কিছুদিন আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তারা এও উল্লেখ করেন যে, অষ্টম হিজরীর প্রথমদিকে হযরত যয়নব (রা.) ইন্তেকাল করেন। অথচ বিপরীতধর্মী এ দু'টি বক্তব্য মেনে নেয়া যায় না। কারণ, এরূপ অবস্থায় আবুল আস-এর ইসলাম গ্রহণ এবং হিজরত করে মদীনায় পৌঁছার সময় হযরত যয়নব তো (রা.) জীবিতই ছিলেন না। এমতাবস্থায় পূর্বতন বিয়ে বা নতুন বিবাহের মাধ্যমে কিভাবে তাঁকে আবুল আস-এর হাতে তুলে দেয়া হয়েছিলো?

প্রখ্যাত লেখক হযরত মূসা ইবনে ওকবা (রা.) উল্লেখ করেছেন যে, এই ঘটনা সপ্তম হিজরীতে আবুল বাছির এবং তার বন্ধুদের হাতে ঘটেছিলো। কিন্তু এ তথ্য সহীহ বা যঈফ কোন হাদীস অনুযায়ীই নির্ভুল নয়।

নয়) ছ্যারিয়্যা তরফ বা তরক

এই অভিযান হযরত যায়েদ ইবনে হারেছার (রা.) নেতৃত্বে জমাদিউস সানিতে তরফ বা তরক এলাকায় পাঠানো হয়। এটি বনু ছালাবা এলাকায় অবস্থিত। হযরত যায়েদ (রা.)-এর সাথে পনের জন সাহাবা ছিলেন। বেদুইনরা খবর পেয়েই পালিয়ে যায়। তারা আশঙ্কা করছিলো যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসছেন। হযরত যায়েদ (রা.) চারটি উট অধিকার করেন এবং চারদিন পর মদীনায় ফিরে আসেন।

দশ) ছারিয়্যা ওয়াদিউল কোরা

এ অভিযানে সৈন্যসংখ্যা ছিলো বারো। এরও নেতা ছিলেন হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.)। ষষ্ঠ হিজরীর রজব মাসে তিনি ওয়াদিউল কোরা অভিমুখে রওয়ানা হন। শত্রুদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখাই ছিলো উদ্দেশ্য। কিন্তু ওয়াদিউল কোরার অধিবাসীরা তাঁদের ওপর হামলা করে। এতে নয়জন সাহাবা শহীদ হন। হযরত যায়েদসহ তিনজন সাহাবা বেঁচে যান।[৯]

এগার) ছারিয়্যা খাবাত

অষ্টম হিজরীর রযব মাসে এটি পরিচালিত হয়। তবে ঘটনা প্রবাহে লক্ষ্য করলে মনে হয় যে, হোদায়বিয়ার সন্ধির আগে তা পরিচালিত হয়েছিলো। হযরত জাবের (রা.) বলেন, হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহর নেতৃত্বে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনশত সওয়ারীকে প্রেরণ করেন। কোরায়শদের একটি বাণিজ্য কাফেলার সন্ধানই ছিলো এর উদ্দেশ্য। এ অভিযানের সময় আমরা ভীষণ ক্ষুধার্ত ছিলাম। এমনকি গাছের পাতা পর্যন্ত খেয়েছি। এ কারণে এ অভিযানের নামকরণ হয়েছে খাবাত। গাছ থেকে পেড়ে নেয়া পাতাকে বলা হয় খাবাত। এরপর চরম ক্ষুধায় অতিষ্ঠ হয়ে তিনটি করে পর্যায়ক্রমে নয়টি উট যবাই করা হয়। আবু ওবায়দা (রা.) এরপর আর কোন উট যবাই করতে দেননি। পরে সমুদ্র থেকে আম্বর নামক একটি মাছ নদীর কিনারায় এসে ধরা দেয়। সেই মাছ থেকে আমরা পনের দিন যাবত আহার এবং এর তেল ব্যবহার করেছি।

---

৮. তোহফাতুল আহওয়াজি, ২য় খন্ড. পৃ. ১৯৫, ১৯৬

৯. রহমতুল লিল আলামীন, ২য় খন্ড, পৃ. ২২৬, যাদুল মায়াদ ২য় খন্ড, প. ১২০, ১২১, ১২২ এবং তালকিহুল ফুহুমি আললিল আছার-এর হাশিয়া, ২৮, ২৯ দ্রষ্টব্য

এতে আমাদের স্বাস্থ্য স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। হযরত আবু ওবায়দা (রা.) সেই বিশাল মাছের পিঠের একটা কাঁটা তুলে নেন। সৈন্যদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা এবং উটের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু উট একপাশে নেয়া হয়। এরপর লম্বা লোকটিকে উটের পিঠে বসিয়ে কাঁটার নিচু দিয়ে যেতে বলা হয়। উটের পিঠে সওয়ার হয়ে সেই লোক অনায়াসে কাঁটার নিচু দিয়ে পেরিয়ে যায়। আমরা সেই মাছের কিছু অংশ রেখে দিয়েছিলাম। মদীনায় পৌঁছার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। তিনি বললেন, এটি হচ্ছে আল্লাহর রেযেক। এই রেযেক তিনি তোমাদের জন্যে ব্যবস্থা করেছেন। এই মাছের অংশ যদি তোমাদের কাছে থাকে তবে আমাকেও খাওয়াও। আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাসায় কিছু মাছ পাঠিয়ে দিলাম। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ এখানেই সমাপ্ত।[১০]

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ঘটনাপ্রবাহে বোঝা যায়, এটি হোদায়বিয়ার সন্ধির আগের ঘটনা। কারণ, এই সন্ধির পরে মুসলমানরা কোরায়শদের কোন বাণিজ্য কাফেলা অধিকারের চেষ্টা করেনি।

গোযওয়া বনি মুস্তালেক

এ অভিযান সামরিক দৃষ্টিতে বড় কিন্তু ছিলো না। তবে এ অভিযানের প্রাক্কালে এমন কিছু ঘটনা ঘটে, যার কারণে ইসলামী সমাজে অস্থিরতা এবং হৈ চৈ পড়ে যায়। এ কারণে একদিকে মোনাফেকদের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে অন্যদিকে এমন কিছু আইন-কানুন নাযিল হয়েছে যেসব কারণে ইসলামী সমাজ মর্যাদার ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র লাভ করে। ইসলামী সমাজ একটি বিশেষ রূপরেখা ও অবয়ব অর্জন করে। প্রথমে আমরা গোযওয়া বা সামরিক অভিযানের কথা উল্লেখ করবো পরে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করবো।

সীরাত রচয়িতাদের বিবরণ অনুযায়ী পঞ্চম বা ষষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে এ অভিযান পরিচালিত হয়।[১] ঘটনাক্রমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারেন যে, বনু

---

১০. সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৬২৫, ৬২৬, সহীহ মুসলিম, ২য় খন্ড. পৃ:. ১৪৫, ১৪৬

১. যুক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই সামরিক অভিযান থেকে ফেরার পথেই 'ইফ্‌কের' ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.)-এর নামে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হয়েছিলো। হযরত যয়নব (রা.)-এর সাথে আল্লাহর রসূলের বিয়ে এবং মুসলিম মহিলাদের জন্য পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পরে এই ঘটনা ঘটেছিলো। হযরত যয়নব (রা.)-এর বিয়ে হয়েছিলো পঞ্চম হিজরীর শেষদিকে অর্থাৎ জিলকদ বা জিলহজ্জ মাসে। একথা সর্বসম্মত যে, এ সামরিক অভিয়ান শাবান মাসে পরিচালিত হয়েছিলো। কাজেই পঞ্চম হিজরীর শাবান নয় বরং ষষ্ঠ হিজরীর শাবান মাস হতে পারে। পক্ষান্তরে যারা এ সামরিক অভিযানের সময়কাল পঞ্চম হিজরীর শাবান মাস বলে উল্লেখ করেছেন, তাদের যুক্তি এই যে, 'ইফক' বিষয়ক হাদীসে এই ঘটনার বিবরণীতে হযরত সা'দ ইবনে মা'য এবং হযরত সা'দ ইবনে ওবাদার (রা.) মধ্যে উত্তপ্ত কথাকাটাকাটির উল্লেখ রয়েছে। জানা যায়, হযরত সা'দ ইবনে মা'য (রা.) পঞ্চম হিজরীর শেষদিকে বুনু কোরায়যার সামরিক অভিযানের পরে ইন্তেকাল করেন। এ কারণে 'ইফ্‌কের' ঘটনার সময় তাঁর উপস্থিত থাকার যুক্তি এই যে, এ ঘটনা এ সামরিক অভিযান ষষ্ঠ হিজরীতে নয় বরং পঞ্চম হিজরীতে পরিচালিত হয়েছিলো।

প্রথম পক্ষ এর জবাবে বলেছেন যে, ইফ্‌কের হাদীসে হযরত সা'দ ইবনে মা'য এর উল্লেখ রাবীর অর্থাৎ বর্ণনাকারীর ভুল। কেননা এ হাদীসই হযরত আয়েশা (রা.) থেকে ইবনে ওতবা বর্ণনা করেছেন। সনদ হচ্ছে হযরত আয়েশা (রা.) থেকে আবদুল্লাহ ইবনে ওতবা এবং আবদুল্লাহ ইবনে ওতবা থেকে যুহরী। এতে সা'দ ইবনে মা'য-এর পরিবর্তে উছাইদ ইবনে খুযাইর-এর উল্লেখ রয়েছে। ইমাম আবু মোহাম্মদ ইবনে হাযম বলেন, নিঃসন্দেহে এটিই সহীহ, সা'দ ইবনে মা'য-এর উল্লেখ কল্পনাপ্রসূত। (দ্রষ্টব্য যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ১১৫)

মোসতালিক এর সরদার হারেস বিন আবি যারার নিজ গোত্র ও অন্যান্য আরব গোত্রের সাথে নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছে। এ খবরের সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে হযরত বুরাইদা ইবনে হুছাইব আসলামি (রা.)-কে প্রেরণ করেন। তিনি গিয়ে হারেছ ইবনে আবি যেরারের সাথে আলোচনা করেন। ফিরে আসার পর তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবকিছু অবহিত করেন।

রসূল সব কিছু জেনে নিশ্চিত হওয়ার পর সাহাবায়ে কেরামকে প্রস্তুতির নির্দেশ দেন। অবিলম্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। শাবান মাসের দুই তারিখে সাহাবারা রওয়ানা হন। এ অভিযানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কিছু সংখ্যক মোনাফেকও ছিলো, যারা এর আগে অন্য কোন যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেনি। মদীনার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব রসূল হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা মতান্তরে হযরত আবু যর মতান্তরে নুমাইল ইবনে আবদুল্লাহ লাইছি (রা.)-কে অর্পণ করেন। হারেছ ইবনে আবি যেরার এবং তার সঙ্গীরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওয়ানা হওয়ার খবর পেয়ে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো। তারা এ খবরও পেয়েছিলো যে, তাদের প্রেরিত গুপ্তচরকে হত্যা করা হয়েছে। হারেছের সঙ্গী বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোরিসিঈ জলাশয়ের[২] সামনে উপস্থিত হলে বনু মুস্তালিক গোত্র যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবারাও প্রস্তুত হন।

সমগ্র ইসলামী সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন হযরত আবু বকর সিদিক (রা.)। আনসারদের পতাকা হযরত সা'দ ইবনে ওবাদার (রা.) হাতে দেয়া হয়। কিছুক্ষণ যাবত তীর বিনিময় হয়। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে সাহাবায়ে কেরাম একযোগে হামলা করে জয়লাভ করেন। পৌত্তলিকদের কিছুসংখ্যক নিহত হয়। মহিলা ও শিশুদের বন্দী করা হয়। বকরিসহ পশুপালও মুসলমানদের অধিকারে আসে। মুসলমানদের মধ্যে শুধু একজন নিহত হন। তাও একজন আনসার তাকে ভুলে শত্রুপক্ষের লোক মনে করে আঘাত করেছিলেন।

এ যুদ্ধ সম্পর্কে সীরাত রচয়িতারা এটুকুই লিখেছেন। আল্লামা ইবনে কাইয়েম এসব বিবরণ কল্পনাপ্রসূত বলে বাতিল করে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, এ অভিযানে লড়াই হয়নি বরং শত্রুদের ওপর হামলা করে নারী শিশু এবং পশুপাল অধিকার করা হয়। সহীহ বোখারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু মুস্তালেকের ওপর যখন হামলা করেন, সেই সময় তারা গাফেল ছিলো। অর্থাৎ এ ধরনের হামলার জন্যে তারা প্রস্তুত ছিলো না। হাদীস দ্রষ্টব্য।[৩]

যদিও প্রথম পক্ষের বক্তব্য যথেষ্ট জোরালো মনে হয় এবং সে কারণে প্রথমে আমিও তার সাথে একমত হয়েছিলাম, কিন্তু চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এ ব্যাখ্যার মূলকথা হচ্ছে, আল্লাহর রসূলের সাথে হযরত যয়নবের (রা.) বিয়ে পঞ্চম হিজরীর শেষদিকে হয়েছিলো। ইঙ্গিতধর্মী কিছু কথা ছাড়া এক্ষেত্রে সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ উফুকের ঘটনায় এবং পরে হযরত সা'দ ইবনে মা'য-এর (ইন্তেকাল পঞ্চম হিজরী) বিদ্যমান থাকার ঘটনা বিভিন্ন সহীহ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত থাকার ঘটনা বিভিন্ন সহীহ বর্ণনা থেকে প্রমাণিত। সেসব বর্ণনাকে কল্পনাপ্রসূত বলে আখ্যায়িত করা মুশকিল। কাজেই এটাই সত্য যে, হযরত যয়নবের (রা.) বিয়ে চতুর্থ হিজরীর শেষ বা পঞ্চম হিজরীর প্রথমদিকে হয়েছিলো। পরবর্তীতে সেকথাই বলা হয়েছে। উফুকের ঘটনা এবং বনু মুস্তালিকের সামারিক অভিযান পঞ্চম হিজরীর শাবান মাসে পরিচালিত হয়েছিলো।

২. মোরিসিঈ কাদিদ এলাকার সমুদ্র উপকূলে বনি মুস্তালিক গোত্রের একটি জলাশয়ের নাম। দেখুন সহীহ বোখারীর কিতাবুল আতাক ১ম খন্ড, পৃ. ৩৪৫, ফতহুল বারী, ৭ম খন্ড পৃ. ৪৩১

৩. সহীহ বোখারী, কিতাবুল আতাক ১ম খন্ড ১ম কনড. পৃ. ৩৪৫, ফতহুল বারী, সপ্তম খন্ড, পৃ. ৪৩১

বন্দীদের মধ্যে হযরত জুয়াইরিয়াহও (রা.) ছিলেন। ইনি বনি মুস্তালেক গোত্রের সর্দার হারেস ইবনে আবি যেরারের কন্যা ছিলেন। তিনি ছাবেত ইবনে কয়েসের মালিকানাধীন ছিলেন। হযরত ছাবেত জুয়াইরিয়াহকে মাকাতেব করে নেন।[৪] এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্ধারিত অর্থের বিনিময়ে তাঁকে মুক্ত করে বিয়ে করেন। এই বিয়ের কারণে মুসলমানরা বনু মুস্তালেক গোত্রের একশত পরিবারকে মুক্ত করে দেন। এরা সবাই ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্বশুরকূলের লোক হিসাবে তাদের মুক্তি প্রদান করা হয়।[৫]

এই হচ্ছে যুদ্ধের বিবরণ। এই যুদ্ধের সময়ের অন্যান্য ঘটনা উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেই ঘটনাবলীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য উফুকের ঘটনা। এই ঘটনার জন্যে মোনাফেক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই দায়ী। এই মোনাফেক এবং তার বন্ধু-বান্ধবরা এই ঘটনা রটিয়েছিলো। কাজেই প্রথমে ইসলামী সমাজে তাদের ন্যক্কারজনক ভূমিকার ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করে পরে ঘটনার বিবরণ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হবে।

বনি মুস্তালেকের যুদ্ধের আগে মোনাফেকদের ভূমিকা

ইতিপূর্বে একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি সাধারণভাবে এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি বিশেষভাবে শত্রুতা ছিলো। আওস ও খাযরাজ গোত্র তার নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল হয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলো। তার অভিষেকেরও আয়োজন করা হয়েছিলো। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের মাথায় পরানোর জন্যে মুং-এর মুকুট তৈরী করা হচ্ছিলো। এমনি সময়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিপ্লবী আলোর আভা নিয়ে মদীনায় আগমন করেন। এর ফলে মদীনার সর্বস্তরের জনসাধারণের দৃষ্টি আবদুল্লাহর ওপর থেকে সরে যায়। এই লোকটি অতপর ভাবতে শুরু করে যে, আল্লাহর রসূলই তার বাদশাহী কেড়ে নিয়েছেন।

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর জিঘাংসা ও ক্রোধের প্রকাশ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের শুরুতেই ঘটেছিলো। সে তখনো ইসলামের প্রতি বাহ্যিক আনুগত্য প্রকাশ করেনি। পরবর্তী সময়ে ইসলামের প্রতি বাহ্যিক আনুগত্য প্রকাশ করলেও তার মনোভাবে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। ইসলামের প্রতি বাহ্যিক আনুগত্য প্রকাশের আগে একদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে হযরত সা'দ ইবনে ওবাদার সেবার জন্যে যাচ্ছিলেন।

পথে এক জনসমাবেশের কাছে দিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাচ্ছিলেন। সেই সমাবেশে ভবিষ্যতের মোনাফেক আবদুল্লাহ ইবনে উবাইও ছিলো। সে চাদরে নিজের নাক ঢেকে বললো, আমাদের উপর ধুলো উড়িও না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমাবেশের লোকদের উদ্দেশ্যে আল্লাহর পাক কালাম তেলাওয়াত করছিলেন। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বললো, আপনি নিজের ঘরে বসে থাকুন, আমাদের মজলিসে এসে বিরক্ত করবেন না।[৬]

---

৪. 'মাকাতের' সেই ক্রীতদাস বা দাসীকে বলা হয়, যারা মালিকের সাথে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করে মুক্তি অর্জন করবে।

৫. যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড. পৃ. ১১২, ১১৩, ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড., পৃষ্ঠা. ২৮৯, ২৯০, ২৯৪, ২৯৫

৬. ইবনে হিশাম, ২ম খন্ড. পৃ. ৫৮৪, ৫৮৭ সহীহ বোখারী ২য় খন্ড, পৃ. ৯২৪, সহীহ মুসলিম, ২য় খন্ড. পৃ. ১০৯

এটা হচ্ছে ইসলামের প্রতি তার বাহ্যিক আনুগত্যের আগের কথা। বদরের যুদ্ধের পর বাতাসের গতিবেগ লক্ষ্য করে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পরও এই ঘৃণীত লোকটি ছিলো আল্লাহ তায়ালা, তাঁর প্রিয় রসূল এবং মুসলমানদের শত্রু। ইসলামী সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং ইসলামের আওয়ায দুর্বল করার কাজে সে বিন্দুমাত্র কসুর করেনি। সে পর্যায়ক্রমে ইসলামবিরোধী কাজ চালিয়ে যায়। ইসলামের শত্রুদের সাথে তার নির্ভেজাল ও আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিলো। বনু কায়নুকা গোত্রের ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই অত্যন্ত আপত্তিকরভাবে নাক গলিয়েছিলো। এ সম্পর্কে পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে। একইভাবে এই দুর্বৃত্ত ওহুদের যুদ্ধেও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ, বিশৃঙ্খলা, হতাশা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলো। এ সম্পর্কেও পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই মোনাফেক ইসলাম গ্রহণের পর প্রতি শুক্রবার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খোতবা দেয়ার আগে মসজিদে নববীতে উঠে দাঁড়িয়ে বলতো, হে লোক সকল, তিনি তোমাদের মাঝে আল্লাহর রসূল, আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাধ্যমে তোমাদের মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করেছেন। কাজেই তাঁকে সাহায্য করো, তাঁর হাতকে শক্তিশালী করো, তাঁর কথা শোনো এবং মানো। এসব কথা বলে সে বসে পড়তো। এরপর তার বেহায়াপনা এবং হঠকারিতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিলো যে, ওহুদের যুদ্ধের পর প্রথম জুমার সময়েও সে একই রকম কথা বলতে শুরু করলো। অথচ ওহুদের যুদ্ধে তার ইসলাম বিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে সকলেই ছিলেন অবহিত। এবার কথা বলার সময়ে বিভিন্ন দিক থেকে মুসলমানরা তার কাপড় টেনে ধরে বললেন, হে আল্লাহর দুশমন বসে যাও। তুমি যে কাজ করেছ এরপর তোমার মুখে এ ধরনের কথা শোভা পায় না। এ ধরনের প্রতিকূলতার মুখে সে লম্বা লম্বা পা ফেলে উদ্ধতভাবে বাইরে বেরিয়ে গেলো। যাওয়ার সময় বিড়বিড় করে বলছিলো, আমি ওদের সহযোগিতার জন্যে দাঁড়ালাম, মনে হয় যেন অপরাধ করে ফেলেছি। আমি কি কোন দোষের কথা বলেছি? দরজায় একজন আনসারের সাথে দেখা হলো। তিনি বললেন, তোমার ধ্বংস হোক, ফিরে চলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করবেন। সে বললো, খোদার কসম, আমি চাই না যে তিনি আমার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করুন।[৭]

এছাড়া আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বনু নাযির গোত্রের সাথেও সম্পর্ক স্থাপন করে এবং তাদের সাথে মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র করতে থাকে।

একইভাবে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার বন্ধুরা খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং তাদেরকে প্রভাবিত করার নানারকম ষড়যন্ত্র করতে থাকে। আল্লাহ তায়ালা সূরা আহযাবে এ সম্পর্কে বলেন, 'এবং ওদের এক দল বলেছিলো, হে ইয়াসরেববাসী, এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই, তোমরা ফিরে চলো এবং ওদের একদল নবীর কাছে অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলছিলো, আমাদের বাড়ীঘর অরক্ষিত অথচ সেগুলো অরক্ষিত ছিলো না। আসলে পলায়ন করাই ছিলো ওদের উদ্দেশ্য। যদি শত্রুরা নগরীর বিভিন্ন দিক হতে প্রবেশ করে ওদের বিদ্রোহের জন্যে প্ররোচিত করতো, ওরা অবশ্যই তাই করে বসতো। ওরা এতে কালবিলম্ব করত না। এরা তো পূর্বেই আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিলো যে, এরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে। বল, তোমাদের কোন লাভ হবে না, যদি তোমরা মৃত্যু বা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর এবং সেই ক্ষেত্রে তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে। বল, কে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে, যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা

---

৭. ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ১০৫

করেন এবং তিনি যদি তোমাদেরকে অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন, কে তোমাদের ক্ষতি করবে? ওরা আল্লাহ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। আল্লাহ অবশ্যই জানেন, তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধা দেয় এবং তাদের ভাইদের বলে, আমাদের সঙ্গে এসো। ওরা অল্পই যুদ্ধে অংশ নেয়, (নিলেও তা নেয়) তোমাদের ব্যাপারে কৃপণতাবশত। যখন বিপদ আসে তখন তুমি দেখবে, মৃত্যুভয়ে মূর্চ্ছাতুর ব্যক্তির মত চোখ উল্টিয়ে ওরা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু যখন বিপদ চলে যায়, তখন ওরা ধনের লালসায় তোমাদের তীক্ষ্ণ ভাষায় বিদ্ধ করে। ওরা ঈমান আনেনি, এ জন্যে আল্লাহ ওদের কার্যাবলী নিষ্ফল করেছেন এবং আল্লাহর পক্ষে এটা সহজ। ওরা মনে করে, সম্মিলিত বাহিনী চলে যায়নি। যদি সম্মিলিত বাহিনী পুনরায় এসে পড়ে, তখন ওরা কামনা করবে যে, ভালো হতো যদি ওরা যাযাবর মরুবাসীদের সঙ্গে থেকে তোমাদের সংবাদ নিত। ওরা তোমাদের সঙ্গে অবস্থান করলেও ওরা অল্পই যুদ্ধ করতো।' (সূরা আহযাব, আয়াত ১৩-২০)

উল্লিখিত আয়াতগুলোতে মোনাফেকদের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-ভাবনা, কাজকর্ম, মানসিক অবস্থা, স্বার্থপরতা মোটকথা সুযোগ সন্ধানী চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।

এসব কিছু সত্তেও ইহুদী, মোনাফেক এবং পৌত্তলিক অর্থাৎ ইসলামের সকল শত্রুরা একথা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলো যে, ইসলামের বিজয়ের কারণ বস্তুগত শক্তি এবং অস্ত্রশস্ত্রের আধিক্য নয়। এই বিজয় প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আনুগত্য এবং চারিত্রিক মূল্যবোধের মধ্যে নিহিত। এর দ্বারা সমগ্র ইসলামী সমাজ এবং ইসলামের সাথে সম্পর্কিত সকল মানুষই সাফল্য লাভ করে। ইসলামের এসব শত্রু একথাও জানতো যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যক্তিত্বই এ সকল সাফল্যের উৎস, যাঁর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব হচ্ছে তুলনাবিহীন আদর্শ।

ইসলামের এ সকল শত্রু পাঁচ বছর যাবত চেষ্টা করার পর বুঝেছিলো যে, এই দ্বীনের অনুসারীদের অস্ত্রের দ্বারা নাস্তানাবুদ করা সম্ভব নয়। এ কারণে তারা সম্ভবত এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলো যে, চারিত্রিক ক্ষেত্রে কলঙ্ক আরোপের মাধ্যমে এই দ্বীনের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রোপাগান্ডা চালানো যাবে। এ উদ্দেশ্যে তারা আল্লাহর রসূলকেই বেছে নিয়েছিলো। মোনাফেকরা যেহেতু মুসলমানদের মধ্যেই থাকতো এবং মদীনায় বসবাস করতো, তাই মুসলমানদের সাথে অনায়াসে মেলামেশার সুযোগ পেতো। এ কারণে মুসলমানদের অনুভূতিতে তারা সহজেই আঘাত দিতে সক্ষম ছিলো। সুতরাং এ প্রোপাগান্ডার দায়িত্ব মোনাফেকরা নিজেদের ওপরেই নিয়েছিলো। মোনাফেক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এ প্রোপাগান্ডার দায়িত্ব নিজের ওপর তুলে নিয়েছিলো।

এ পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র একবার সেই সময় প্রকাশ পেয়েছিলো, যখন হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.) হযরত যয়নবকে (রা.) তালাক দিলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। আরবের নিয়ম ছিলো যে, পালক পুত্রকে তারা নিজ সন্তানের মতোই মনে করতো এবং তার স্ত্রীকে ও আপন পুত্র বধূর মতোই হারাম মনে করতো। এ কারণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যয়নব (রা.)-কে বিবাহ করার পর মোনাফেকরা তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারণায় লিপ্ত হয়। এতে তারা অপপ্রচারের দু'টি মোক্ষম বিষয় খুঁজে পায়।

প্রথমত হযরত যয়নব (রা.) ছিলেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পঞ্চম স্ত্রী। অথচ পবিত্র কোরআনে একজন মুসলমানের জন্যে চারজনের বেশী স্ত্রী রাখার অনুমতি ছিলো না। কাজেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ বিবাহ কিভাবে বৈধ হতে পারে?

দ্বিতীয়ত হযরত যয়নব (রা.) ছিলেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পালক পুত্র হযরত যায়েদ (রা.)-এর স্ত্রী। এ কারণে আরবদের রীতি অনুযায়ী পালকপুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ করা ছিলো গুরুতর অপরাধ এবং মহাপাপ। অপপ্রচারকারীরা এক্ষেত্রে অনেক প্রোপাগান্ডা চালালো

এবং নানারকম কথাও রটালো। তারা এমনও বলাবলি করছিলো যে, মোহাম্মদ যয়নবকে হঠাৎ দেখেছিলেন এবং তার রূপসৌন্দর্য দেখে এতোই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তখনই যয়নবকে ভালোবেসে ফেলেন। তাঁর পালকপুত্র যায়েদ একথা জানার পর যয়নবের পথ মোহাম্মদের জন্যে পরিষ্কার করে দেন।

মোনাফেকরা এ কাহিনী এমনভাবে প্রচার করেছিলো যে, এ সম্পর্কিত আলোচনা সমালোচনা তখনো অব্যাহত রয়েছে। সরল সহজ মুসলমানদের মনে এ প্রচারণা এতো প্রভাব বিস্তার করেছিলো যে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে আয়াত নাযিল করেন। তাতে এতদ বিষয়ের সমুচিত জবাব দেয়া হয়। বিষয়টির গুরুত্ব এটা থেকেই বোঝা যায় যে, সূরা আহযাবের শুরুতেই আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ বিষয়ে উল্লেখ করে বলেন, 'হে নবী, আল্লাহকে ভয় করো এবং কাফের ও মোনাফেকদের আনুগত্য করবে না। আল্লাহতো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' (সূরা আহযাব, আয়াত ১)

মোনাফেকদের কর্মতৎপরতার প্রতি এখানে ইঙ্গিত করে তাদের রূপরেখা সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোনাফেকদের এসব কর্মতৎপরতা ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও নম্রতার সাথে সহ্য করছিলেন। সাধারণ মুসলমানরাও মোনাফেকদের কর্মতৎপরতা থেকে আত্মরক্ষা করে ধৈর্যের সাথে দিন কাটাচ্ছিলেন। কেননা তারা জানতেন যে, মোনাফেকদের আল্লাহ তায়ালা নানাভাবে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'ওরা কি দেখে না যে, প্রতি বছর দুই একবার বিপর্যয় হয়? এরপরও ওরা তাওবা এবং উপদেশ গ্রহণ করে না। (সূরা তাওবা, আয়াত ১২৬)

বনু মোস্তালেকের গোযওয়ায় মোনাফেকদের কর্মকান্ড

বনু মোস্তালেকের সামরিক অভিযানের সময় মোনাফেকরাও অংশগ্র করেছিলো। এ অভিযানের সময় তারা যা করেছিলো, আল্লাহ তায়ালা পাক কালামে তার পরিচয় তুলে ধরেছেন, 'ওরা তোমাদের সাথে বের হলে তোমাদের বিভ্রান্তিই বৃদ্ধি করতো এবং তোমাদের মধ্যে ফেতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মধ্যে ছুটাছুটি করতো।' (সূরা তাওবা, আয়াত ৪৭)

এই অভিযানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে মনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ প্রকাশের জন্যে তাদের দু'টি সুযোগ এসেছিলো। তারা মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিলো এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপপ্রচার চালিয়েছিলো। ঘটনা দু'টির মোটামুটি বিবরণ এই—

এক) নিকৃষ্টতম ব্যক্তিকে বহিষ্কারের কথা

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনু মোস্তালেকের সামরিক অভিযান শেষে মোরিসিঈ জলাশয়ের পাশে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় কিছু লোক সেই জলাশয়ে পানি তোলার জন্যে গেলো। তাদের মধ্যে হযরত ওমর (রা.)-এর একটি কাজের লোকও ছিলো। তার নাম যাহজা গেফারী। পানি আনতে গিয়ে ছেনান ইবনে অবর জুহানির সাথে তার প্রথমে কথা কাটাকাটি এবং পরে উভয়ের হাতাহাতি শুরু করলো। এরপর জুহানি বললো, হে আনসাররা, সাহায্য করো। যাহজাও চিৎকার করে বললো, হে মোহাজেররা সাহায্য করো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর পাওয়ার সাথে সাথে সেখানে গিয়ে বললেন, আমি তোমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছি, অথচ তোমরা আইয়ামে জাহেলিয়াতের মতো আওয়ায দিচ্ছো? ওকে ছেড়ে দাও, সে দুর্গন্ধময়।

এ ঘটনার খবর পেয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ক্রোধে ফেটে পড়লো। সে বললো, ওরা বুঝি এমন কাজ করেছে? আমাদের এলাকায় এসে আমাদের প্রতিপক্ষ এবং শত্রু হয়ে গেছে? আমাদের এ অবস্থা দেখে তো প্রাচীনকালের প্রবাদের সত্যতাই প্রমাণিত হয়, নিজের কুকুরকে লালন-পালন করে মোটাতাজা করো যাতে, সে তোমাকেই কামড়ে ছিন্ন ভিন্ন করতে পারে। শোনো, মদীনায় পৌঁছানোর পর আমাদের মধ্যেকার সম্মানিত ব্যক্তি নিকৃষ্টতম ব্যক্তিকে মদীনা থেকে বের করবে। পরে উপস্থিত লোকদের উদ্দেশ্যে বললো, এ বিপদ তোমরাই ডেকে এনেছে। তোমরা তাকে নিজের শহরে থাকতে এবং নিজেদের ধন-সম্পদের অংশ দিয়েছ। দেখো, তোমাদের কাছে যা কিছু আছে, সেসব দেয়া যদি বন্ধ করো, তবে সে তোমাদের শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে।

সেই সময় একজন উঠতি বয়সের সাহাবা হযরত যায়েদ ইবনে আরকামও সেখানে ছিলেন। তিনি এসে তার চাচার কাছে সব কথা বললেন। তার চাচা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করলেন। সেই সময় হযরত ওমরও উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল, ওব্বাদ ইবনে বিশরকে বলুন, ওকে হত্যা করে ফেলুক। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওমর এটা কি করে সম্ভব? মোহাম্মদ তার সঙ্গীদের হত্যা করবে। তুমি বরং আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়ার কথা ঘোষণা করো। সেই সময় কখনো কোথাও রওয়ানা হওয়ার সময় নয়। এরূপ সময়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও রওয়ানা হতেন না। সাহাবারা যাত্রা শুরু করলে হযরত উসাইদ ইবনে খোজাইর (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তাঁকে সালাম জানিয়ে বললেন, আজ আপনি অসময়ে রওয়ানা হয়েছেন? তিনি বললেন, তোমাদের সঙ্গী যা কিছু বলেছে, সে সব কি তুমি জানো? হযরত উসাইদ বললেন, কি বলেছে? তিনি বললেন, সে বলেছে, মদীনায় যাওয়ার পর মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি নিকৃষ্টতম ব্যক্তিকে মদীনা থেকে বের করবে। হযরত উসাইদ বললেন, হে আল্লাহর রসূল, যদি আপনি চান তবে তাকে মদীনা থেকে বের করে দিন। আল্লাহর শপথ, সে নিকৃষ্ট এবং আপনি সম্মানিত। এরপর তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল, ওর সাথে নরম ব্যবহার করুন। আল্লাহর শপথ, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে আমাদের মধ্যে এমন সময় এনেছিলেন, যখন স্বজাতীয়রা ওর অভিষেক অনুষ্ঠানের জন্যে মনিমুক্তার মুকুট তৈরী করেছিলো। এ কারণে সে মনে করে যে, আপনিই তার বাদশাহী কেড়ে নিয়েছেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতপর সেদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত এবং পরদিন সূর্য অনেক ওপরে উঠে আসা পর্যন্ত একাধারে হাঁটতে চলতে লাগলেন। এরপর যাত্রা বিরতি দেয়ার সাথে সাথে সবাই মাটিতে শরীর রাখার পরই বেখবর হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাই চেয়েছিলেন। সাহাবারা আরামে বসে গালগল্প করবেন, এটা তিনি চাননি।

এদিকে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যখন খবর পেলো যে, যায়েদ ইবনে আরকাম সব কথা ফাঁস করে দিয়েছে, তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে কসম খেতে লাগলো। সে বলতে লাগলো যে, আপনি যা শুনেছেন, তা সত্য নয়, ওসব কথা কস্মিনকালেও আমি বলিনি। আমি ওরকম কথা মুখেও আনিনি। সেই সময় উপস্থিত আনসাররা বললেন, হে আল্লাহর রসূল, যায়েদ এখনো ছেলে মানুষ। মনে হয় সে ভুল শুনেছে। আবদুল্লাহ যা বলেছে, যায়েদ তা ভালোভাবে মনে রাখতে পারেনি। তাই আপনি আবদুল্লাহ ইবনে উবাই সম্পর্কে যা শুনেছেন, সব বিশ্বাস করেছেন।

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) বলেন, এরপর আমি এতো ব্যথিত হয়েছি যে, ওরকম ব্যথিত আর কখনো হইনি। মনের দুঃখে আমি ঘরে বসে রইলাম। এরপর আল্লাহ তায়ালা সূরা মোনাফেকূন নাযিল করেন। আল্লাহ তায়ালা সেই সূরায় সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, 'ওরা বলে, আল্লাহর রসূলের সহচরদের জন্যে ব্যয় করো না, যতক্ষণ না ওরা সরে পড়ে।'

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, 'ওরা বলে, আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলে সেখানে থেকে প্রবল দুর্বলকে বহিষ্কৃত করবো।'

হযরত যায়েদ (রা.) বলেন, এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর আল্লাহর রসূল লোক পাঠিয়ে আমাকে ডেকে নিলেন এবং অবতীর্ণ আয়াত পাঠ করে শোনালেন, এরপর বললেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার কথার সত্যতার সাক্ষী দিয়েছেন।[৮]

এই মোনাফেকের এক পুত্রের নামও ছিলো আবদুল্লাহ। তিনি ছিলেন পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত। অত্যন্ত পুণ্যশীল, সৎস্বভাব একজন সাহাবা ছিলেন তিনি। পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে মদীনার ফটকে এসে তিনি তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন। তার পিতা আবদুলল্লাহ ইবনে উবাই সেখানে এলে তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ, যতোক্ষণ না রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি দেবেন, ততক্ষণ আপনি সামনে এক পাও এগুতে পারবেন না। কেননা আল্লাহর রসূল সম্মানিত এবং আপনি অপমানিত। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে গিয়ে মোনাফেক সর্দারকে মদীনায় প্রবেশের অনুমতি দান। এই আবদুল্লাহই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিলেন, হে আল্লাহর রসূল, আপনি যদি তাকে হত্যা করতে চান তবে আমাকে বলুন, আল্লাহর শপথ, আমি তার মাথা কেটে এনে আপনার সামনে হাযির করবো।[৯]

দুই) ইফকের ঘটনা

এ অভিযানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে 'ইফ্ক' অর্থাৎ চারিত্রিক অপবাদের ঘটনা। এই ঘটনার বিবরণ এই যে, আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও সফরে যাওয়ার সময় সহধর্মিনীদের নাম লিখে লটারি করতেন। যার নাম উঠতো, তাকে সফরসঙ্গিনী করতেন। এ যুদ্ধে যাওয়ার সময় হযরত আয়েশার (রা.) নাম উঠেছিলো।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সঙ্গে নিয়ে যান। ফেরার পথে এক জায়গায় যাত্রাবিরতি করা হয়। হযরত আয়েশা (রা.) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে গলার একখানি হার হারিয়ে ফেলেন। এই হারখানি তিনি তার বোনের কাছ থেকে ধার হিসাবে নিয়েছিলেন। হার নেই দেখে সাথে সাথে খুঁজতে যান। ইতিমধ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবারা মদীনার পথে রওয়ানা হয়ে যান। হযরত আয়েশার (রা.) হাওদাজ যারা উটের পিঠে রেখে দিতেন, তারা ভেবেছিলেন যে, তিনি হাওদাজের ভেতরেই রয়েছেন। এ কারণে হাওদাজ উটের পিঠে তুলে তারা বেঁধে দেন। হাওদাজ যে বেশী ভারি ছিলো না, একথা তাঁদের মনে আসেনি। কেননা অল্পবয়স্কা হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন হালকা পাতলা। কয়েকজন ধরে হাওদাজ তুলেছিলেন, এ কারণে তারা বুঝতে পারেননি যে, ভেতরে মানুষ নেই। দুই একজন হাওদাজ তুললে হালকা হওয়ার ব্যাপারটি হয়তো বুঝতে পারতেন।

---

৮. সহীহ বোখারী, ২ম খন্ড, পৃ. ৪৯৯, ২য় খন্ড, পৃ. ২২৭, ২২৮, ২২৯, ইবনে হিশাম ২য় খন্ড, ২৯০, ২৯১, ২৯২

৯. ইবনে হিশাম, মুখতাছারুস সিরাত, শেখ আবদুল্লাহ পৃ. ২৭৭

মোটকথা, হযরত আয়েশা (রা.) হার খুঁজে অবস্থান স্থলে এসে দেখেন সকলেই চলে গেছে, ময়দান খালি। তিনি তখন এই ভেবে বসে পড়লেন যে, তাকে না পেয়ে নিশ্চয়ই কেউ খুঁজতে আসবে। আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই যা ইচ্ছা করেন তাই হয়ে থাকে। হযরত আয়েশা (রা.) শুয়ে পড়লেন এবং এক সময় ঘুমিয়ে পড়লেন। 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহধর্মিনী?' একথা শুনে হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঘুম ভেঙ্গে গেলো। একথা বলেছিলেন, হযরত সফওয়ান ইবনে মোয়াত্তাল (রা.)। তাঁর ঘুম ছিলো বেশী। ঘুমকাতুরে এই সাহাবাও পিছিয়ে পড়েছিলেন। তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে দেখেই চিনে ফেললেন। কেননা পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার আগেই তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে দেখেছিলেন। তিনি ইন্নালিল্লাহে পড়ে নিজের সওয়ারী হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে নিয়ে বসিয়ে দিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) সওয়ারীতে আরোহণ করলেন। হযরত সফওয়ান ইন্নালিল্লাহ ব্যতীত একটি কথাও বলেননি। তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে কিছু জিজ্ঞাসাও করেননি। চুপচাপ উটের রশি ধরে হেঁটে হেঁটে কাফেলার কাছে এসে পৌঁছেন।

তখন ছিলো ঠিক দুপুর। কাফেলার সকলে সেই সময় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। হযরত সফওয়ানকে এভাবে আসতে দেখে সাহাবাদের মধ্যে আলোচনা সমালোচনা হতে লাগলো। আল্লাহর দুশমন আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মনের ক্লেদ প্রকাশের একটা সুযোগ পেয়ে গেলো। তার অন্তরে ঘৃণা ও হিংসার যে ধিকি-ধিকি আগুন জ্বলছিলো সেই আগুন আরো উস্কে দেওয়ার সে সুযোগ পেলো। সে আল্লাহর রসূলের সহধর্মিনীর নামে অপবাদ রটাতে শুরু করলো। তার সঙ্গী-সাথীরাও তার কাছে প্রিয় হওয়ার জন্যে নানা কথা রটনা শুরু করলো। মদীনায় আসার পর ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অপবাদের পত্রপল্লব বিস্তার করা হলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব শুনে চুপচাপ রইলেন। তিনি কোন কথাই এ প্রসঙ্গে বললেন না। বেশ কিছুদিন যাবত ওহীও আসেনি। এ অবস্থা দেখে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ সাহাবাদের সাথে আলোচনা করলেন। হযরত আলী (রা.) ইশারা ইঙ্গিতে বললেন যে, আপনি তাঁর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্য কাউকে বিয়ে করুন। হযরত উসামা (রা.) এবং অন্য কয়েকজন সাহাবা বলেন যে, হে আল্লাহর রসূল, হযরত আয়েশাকে তালাক দেবেন না, আপনি শত্রুদের কথায় কান দেবেন না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন মসজিদে নববীর মিম্বরে দাঁড়িয়ে আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের দেয়া যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে সাহাবাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আল্লাহর রসূলের একথা শুনে হযরত সা'দ ইবনে মায়া'য আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে হত্যা করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.)-এর একথা ভালো লাগল না। তিনি খাযরাজ গোত্রের সর্দার। আবদুল্লাহও তাঁরই গোত্রের লোক। এ কারণে তাঁর মনে গোত্রপ্রীতি চাঙ্গা হয়ে উঠলো। এতে সা'দ ইবনে মায়া'য এবং সা'দ ইবনে ওবাদার মধ্যে কথা কাটাকাটি হলো। ফলে উভয় গোত্রের লোকেরা গর্জে উঠলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক বুঝিয়ে উভয় পক্ষ কে শান্ত করলেন, এরপর নিজ চুপ রইলেন।

এদিকে হযরত আয়েশা (রা.) সফর থেকে এসেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি একমাস শয্যাশায়ী রইলেন। তাঁর নামে রটনা করা অপবাদ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না। তবে, মাঝে মাঝে ভাবছিলেন যে, ইতিপূর্বে অসুস্থতার সময়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে

সমবেদনাপূর্ণ ব্যবহার করতেন, এবার তা করছেন না। রোগ মুক্তির পর হযরত আয়েশা (রা.) এক রাতে উম্মে মেসতাহের সাথে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে ময়দানে গিয়েছিলেন। ঘটনাক্রমে উম্মে মেসতাহ নিজের চাদরে পা জড়িয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। এতে তিনি নিজের পুত্রকে বদদোয়া করলেন।

হযরত আয়েশা (রা.) এতে উম্মে মেসতাহর সমালোচনা করলে তিনি বললেন, আমার পুত্র প্রোপাগান্ডার অপরাধের অংশীদার। একথা বলেই তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে তাঁর নামে রটিত অপবাদের ঘটনা শোনালেন। হযরত আয়েশা (রা.) সব কিছু ভালোভাবে জানতে আব্বা আম্মার কাছে যাওয়ার জন্যে আল্লাহর রসূলের কাছে অনুমতি চাইলেন। অনুমতি পেয়ে তিনি নিজের বাড়ীতে গেলেন। সেখানে সব কিছু শোনার পর অঝোর ধারায় কাঁদতে লাগলেন। দুই রাত একদিন কেঁদে কাটালেন। এ সময়ে তিনি চোখও মুছলেন না, ঘুমুতেও গেলেন না। তিনি অনুভব করছিলেন যে, কাঁদতে কাঁদতে যেন বুক ফেটে যাবে। সেই অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করলেন। তিনি কালেমা শাহাদাত পাঠ করে এক ভাষণে বললেন, হে আয়েশা, তোমার সম্পর্কে আমার কানে এ ধরনের কথা এসেছে। যদি তুমি এসব থেকে মুক্ত থাকো তবে শীঘ্রই আল্লাহ তায়ালা সেকথা প্রকাশ করবেন। যদি আল্লাহ না করুন, তুমি কোন পাপ করে থাকো, তবে তুমি আল্লাহর কাছে মাগফেরাত চাও, তওবা করো। বান্দা যখন নিজের পাপের কথা স্বীকার করে এবং আল্লাহর কাছে তওবা করে, তখন আল্লাহ তায়ালা সেই তওবা কবুল করেন।

একথা শোনার সাথে সাথে হযরত আয়েশার কান্না থেমে গেলো। একফোটা পানিও তাঁর চোখে এলো না। তিনি তাঁর আব্বা-আম্মাকে জবাব দিতে বললেন। কিন্তু তাঁরা বুঝতে পারছিলেন না যে, কি জবাব দেবেন। পরে হযরত আয়েশা (রা.) নিজেই বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি জানি, শুনতে শুনতে একথা আপনাদের মনে গেঁথে গেছে। আপনারা একথা সত্য বলেই মনে করছেন। এখন যদি আমি নির্দোষ হওয়ার কথা বলি, তাহলেও আপনারা বিশ্বাস করবেন না। পক্ষান্তরে যদি আমি দোষ স্বীকার করি, তবে আপনারা সেটাই বিশ্বাস করবেন। আল্লাহ তায়ালা ভালোই জানেন যে, আমি নির্দোষ। কাজেই এমতাবস্থায় আমার এবং আপনাদের অবস্থা হচ্ছে সেই রকম, যেমন হযরত ইউসুফের (আ.) পিতা হযরত ইয়াকুব (আ.) বলেছিলেন, সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়, তোমরা বলছো, সে বিষয়ে আল্লাহ তায়ালাই আমার একমাত্র সাহায্যস্থল।

একথার পর হযরত আয়েশা (রা.) একপাশে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। ঠিক তখনই আল্লাহর রসূলের ওপর ওহী নাযিল হতে শুরু করলো। ওহী নাযিলের কষ্টকর অবস্থা শেষ হওয়ার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিটিমিটি হাসছিলেন। তিনি প্রথমেই বললেন, হে আয়েশা, আল্লাহ তায়ালা তোমার নির্দোষ হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। তাঁর আম্মা খুশীর সাথে বললেন, আয়েশা, আল্লাহর রসূলের কাছে যাও। হযরত আয়েশা (রা.) কৃত্রিম অভিমানের সুরে বললেন, আমি যাব না, আমি তো শুধু আল্লাহর প্রশংসা করবো।

এই ঘটনা সম্পর্কে যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে, সেগুলো সূরা নূর-এর অন্তর্ভুক্ত। উক্ত সূরার দশম আয়াত থেকে শুরু হয়েছে।

এরপর অপবাদ রটানোর অভিযোগে মেসতাহ ইবনে আছাছা, হাস্সান ইবনে ছাবেত এবং হামনা এই তিনজন সাহাবার প্রত্যেককে ৮০টি করে বেত্রাঘাত করা হয়।[১০]

মোনাফেক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পিঠ সাজা থেকে রক্ষা পায়। অথচ এই অপবাদ রটনায় সে ছিলো শীর্ষস্থানে। এ ব্যাপারে সে দুর্বৃত্তই প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলো। তাকে কোন প্রকার শাস্তি দেয়া কেন হয়নি?

এর কারণ যাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়, সেই শাস্তির পরিবর্তে তারা পরকালে ক্ষমা পেয়ে যায়। এই শাস্তি তাদের জন্যে কাফফারা স্বরূপ। আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে যেহেতু আল্লাহ তায়ালা পরকালে কঠোর শাস্তি দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন তাই তাকে কোন শাস্তি দেয়া হয়নি। অথবা যে কারণে তাকে হত্যা করা হয়নি, সে কারণেই তাকে কোন শাস্তি দেয়া হয়নি।[১১]

এমনি করে এক মাস পর মদীনার পরিবেশ থেকে সন্দেহ, সংশয় ও মানসিক অস্থিরতার কালোমেঘ কেটে গেলো। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এমনভাবে অপমানিত হলো যে, এই দুর্বৃত্ত পরে আর কখনো মাথা তুলতে পারেনি। ইবনে ইসহাক বলেন, সে এরপর বাড়াবাড়ি করলে তার কওমের লোকেরাই তাকে নাজেহাল করতো। এ অবস্থা দেখে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন হযরত ওমর (রা.)-কে বললেন, ওমর, তোমার কি মনে হয়? দেখো, সেদিন তুমি যদি ওকে হত্যা করতে, তবে অনেক নাক উঁচু লোকই সমালোচনায় মুখর হতো। আর আজ? এখন যদি ওদেরকেই হত্যার নির্দেশ দেয়া হয় তবে ওসব সমালোচকরাই তাকে হত্যা করবে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি বুঝেছি যে, আল্লাহর রসূলের বিবেচনা আমার বিবেচনার চেয়ে উত্তম।[১২]

---

১০. কারো ওপর ব্যভিচারের অভিযোগ দিয়ে তা প্রমাণ করা না গেলে তবে অপবাদ রটনাকারীকে ৮০টি বেত্রাঘাত করা ইসলামী শরীয়তের আইন।

১১. সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৬৪, ২য় খন্ড, পৃ. ৬৯৬, ৬৯৭, ৬৯৮. যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ১১৩, ১১৪, ১১৫, ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ২৯৭-৩০৭

১২. ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড. পৃ. ২৯৩

মোরিসিঈ যুদ্ধের পরবর্তী সামরিক অভিযান

এক) ছারিয়্যা দিয়ারে বনি কেলাব (এলাকা দুমাতুল জান্দাল)

হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফের (রা.) নেতৃত্বে ষষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে এ অভিযান পরিচালিত হয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের সামনে বসিয়ে নিজ হাতে আবদুর রহমানের মাথায় পাগড়ি বাঁধেন এবং লড়াইয়ের সময় ভালোভাবে কাজ করার ওসিয়ত করেন। তিনি বলেন, যদি ওরা তোমার আনুগত্য মেনে নেয়, তবে ওদের বাদশাহর মেয়েকে বিয়ে করবে। দুমাতুল জান্দালে পৌঁছে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) তিনদিন ক্রমাগতভাবে তাদের ইসলামের দাওয়াত দেন। অবশেষে তারা ইসলাম গ্রহণ করে। এরপর হযরত আবদুর রহমান (রা.) তামাদর বিনতে আসবাগের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই মহিলা ছিলেন হযরত আবদুর রহমানের পুত্র আবু সালমার মাতা। আর এই মহিলার পিতা ছিলেন নিজ কওমের সর্দার এবং বাদশাহ।

দুই) ছ্যারিয়্যা দিয়ারে বনি সা'দ (এলাকা ফেদেক)

ষষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে হযরত আলীর (রা.) নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর পেলেন যে, বনু সা'দ গোত্রের একদল লোক মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের সাহায্য করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ খবর পাওয়ার পর তিনি দুইশত লোকসহ হযরত আলীকে (রা.) প্রেরণ করেন। এরা রাত্রিকালে সফর করে এবং দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকতেন। অবশেষে একজন গুপ্তচরকে গ্রেফতার করা হয়। সে স্বীকার করে যে, তারা খয়বরের খেজুরের বিনিময়ে ইহুদীদের সাহায্য করার প্রস্তাব দিয়েছে। গুপ্তচর একথাও জানায় যে, বনু সা'দ অমুক জায়গায় দলবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে। হযরত আলী (রা.) রাত্রিকালে হঠাৎ হামলা চালিয়ে পাঁচশত উট এবং দুই হাজার বকরি অধিকার করেন। বনু সা'দ গোত্রের লোকেরা তাদের মহিলা ও শিশুদের নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তাদের সর্দারের নাম ছিলো অবর ইবনে আলিম।

তিন) ছারিয়্যা ওয়াদিল কোরা

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) অথবা হযরত যায়েদ ইবনে হারেছার (রা.) নেতৃত্বে ষষ্ঠ হিজরীর রমযান মাসে এটি পরিচালিত হয়। এর কারণ ছিলো এই যে, বনু ফাজারা গোত্রের একটি শাখা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। তাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু বকর (রা.)-কে প্রেরণ করেন। হযরত সালমা ইবনে আকওয়া বলেন, এ অভিযানে আমিও তাঁর সাথে ছিলাম। ফযরের নামায আদায়ের পর আমরা হযরত আবু বকরের (রা.) নির্দেশে হামলা করলাম।

হযরত আবু বকর (রা.) কিছুসংখ্যক লোককে হত্যা করেন। আমি একদল লোককে দেখলাম। তাদের মধ্যে মহিলা এবং শিশুও ছিলো। আশঙ্কা করছিলাম যে, ওরা পাহাড়ে পালিয়ে

যেতে পারে। এরূপ চিন্তা করে আমি এগিয়ে গিয়ে তাদের ও পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় তীর নিক্ষেপ করলাম। এতে ওরা দাঁড়িয়ে গেলো। তাদের মধ্যে উম্মে কুরফা নামে একজন মহিলা

ছিলো। তার দেহে একটি পুরাতন পুস্তিন ছিলো। তার সঙ্গে ছিলো তার যুবতী মেয়ে। সে ছিলো আরবের বিশিষ্ট সুন্দরী মেয়েদের অন্যতম। আমি তাদেরকে তাড়িয়ে হযরত আবু বকরের (রা.) কাছে নিয়ে এলাম। তিনি মেয়েটি আমাকে দিয়ে দিলেন। আমি কখনো তার পোশাক উন্মোচন করিনি। পরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মেয়েটির দায়িত্ব সালমা ইবনে আকওয়ার কাছ থেকে চেয়ে নেন এবং তাকে মক্কায় প্রেরণ করেন। এই মেয়েটির বিনিময়ে মক্কায় আটক কয়েকজন মুসলমানকে মুক্ত করে আনা হয়।[১]

উম্মে কারফা ছিলো একজন শয়তানী মহিলা। এই মহিলা আল্লাহর রসূলকে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতো। এ উদ্দেশ্যে সে তার গোত্রের ত্রিশজন সওয়ারীকে প্রস্তুত করেছিলো। এ অভিযানে সে যথার্থ বদলা পেয়েছিলো। তার ত্রিশজন সওয়ারীই নিহত হয়েছিলো।

চার) ছারিয়্যা উরনাইয়াইন

ষষ্ঠ হিজরীর শওয়াল মাসে হযরত কারজ ইবনে জাবের ফাহরীর (রা)[২] নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়। এর কারণ ছিলো এই যে, আকল এবং উরাইনা গোত্রের কিছুসংখ্যক লোক মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে এবং মদীনাতেই অবস্থান করতে থাকে। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের জন্যে সহনীয় ছিলো না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে কয়েকটি উটসহ এক চারণ ভূমিতে পাঠিয়ে এ নির্দেশ দেন যে, তোমরা উটের দুধ এবং পেশাব পান করবে। এরা সুস্থ হওয়ার পর আল্লাহর রসূলের প্রেরিত উটের রাখালদের হত্যা করে উটগুলো নিয়ে উধাও হয়ে যায়। ইসলাম গ্রহণের পর তারা পুনরায় কুফুরী গ্রহণ করে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সন্ধানে কারয ইবনে জাবের ফাহরীর নেতৃত্বে বিশজন সাহাবীর একটি দল প্রেরণ করেন। তিনি এসব অকৃতজ্ঞ ও ধর্মান্তরিত্যের জন্যে বদদোয়া করে বলেন, 'হে আল্লাহ তায়ালা, ওদের ওপর পথ অন্ধ করে দাও, এবং কংকনের চেয়ে সংকীর্ণ করে দাও।'

সাহাবারা ধাওয়া করে তাদের পাকড়াও করেন। মুসলমান রাখালদের হত্যা করার শাস্তি হিসাবে অন্যান্য শাস্তিসহ তাদের হাত পা কেটে দেয়া হয়। এরপর তাদের হারলা নামক এলাকায় ছেড়ে দেয়া হয়। সেখানে তারা মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে কৃতকর্মের ফল ভোগ করে।[৩] বোখারী এবং অন্যান্য গ্রন্থে এই ঘটনা হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে।[৪]

সীরাত রচয়িতারা আরো একটি সামরিক অভিযানের কথা উল্লেখ করেছেন। সেটি ষষ্ঠ হিজরীর শওয়াল মাসে হযরত সালমা ইবনে আবু সালমার নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এর বিবরণ এই যে, হযরত আমর ইবনে উমাইয়া জামরি আবু সুফিয়ানকে হত্যা করতে মক্কা গমন করেন। কেননা আবু সুফিয়ান রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করতে একজন বেদুইনকে মদীনায় প্রেরণ করেছিলো। কিন্তু উভয়ের কেউই উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম হয়নি।

---

১. সহীহ মুসলিম, ২য় খন্ড. পৃ. ৮৯, এ সামরিক অভিযান সপ্তম হিজরীতে পরিচালিত হয়েছে বলেও উল্লেখ রয়েছে।

২. এই সেই কারয ইবনে জাবের ফাহরি, যিনি বদরের যুদ্ধের আগে সফওয়ানের সামরিক অভিযানে মদীনায় পশুপালের ওপর খেলা করেছে। পরে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মক্কা বিজয়ের সময় শাহাদাত বরণ করেন।

৩. যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ১২২

৪. সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৬০২

সীরাত রচয়িতারা একথাও লিখেছেন যে, এ অভিযানে হযরত আমর ইবনে উমাইয়া যামারি তিনজন কাফেরকে হত্যা করেন। তিনি হযরত খোবায়েবের (রা.) লাশও উঠিয়ে নিয়ে আসেন। অথচ হযরত খোবায়েব (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনা রাযী অভিযানের দিনে অথবা কয়েক মাস পরে ঘটেছিলো। রাযী এর ঘটনা চতুর্থ হিজরীর সফর মাসে ঘটে। কাজেই উভয় ঘটনা হচ্ছে পৃথক সফরের সময়ের ঘটনা কিন্তু সীরাত রচয়িতারা কেন এ রকম এলোমেলোভাবে উল্লেখ করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করলেন একথা আমি বুঝতে পারছি না। তাঁরা দু'টো ঘটনাকেই একই সফরের সময়ের বলে উল্লেখ করেছেন। অথবা এমনও হতে পারে যে, ঘটনাক্রমে উভয় ঘটনা একই সফরের সময় ঘটেছিলো। কিন্তু সীরাত রচয়িতারা সাল নির্ধারণে চতুর্থ হিজরীর পরিবর্তে ষষ্ঠ হিজরী বলে ভুল করেছেন।

আল্লামা মনসুরপুরী (র.) ও এ ঘটনাকে সামরিক অভিযান বা ছারিয়্যা বলে স্বীকার করতে আপত্তি জানিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালাই সব কিছু ভালো জানেন।

আহযাব ও বনু কোরায়যার পর এসকল সামরিক অভিযানই পরিচালিত হয়েছিলো। এসকল অভিযানে মারাত্মক সংঘর্ষ বা যুদ্ধ একটিতেও হয়নি। কয়েকটি অভিযানে সাধারণ হামলা এবং সংঘর্ষ ঘটেছিলো। এসকল অভিযানের উদ্দেশ্য ছিলো শত্রুদের ভীতসন্ত্রস্ত ও প্রভাবিত করা।

সব কিছু পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আহযাবের যুদ্ধের পর পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। ইসলামের শত্রুদের মনোবল ভেংগে যায়। ইসলামের দাওয়াত বিনষ্ট করা এবং ইসলামের গৌরব ম্লান করার আশাও শত্রুরা ছেড়ে দেয়। তবে হোদায়বিয়ার সন্ধির পর পরিস্থিতির লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। এই সন্ধি প্রকৃতপক্ষে ছিলো ইসলামের শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ। এর মাধ্যমে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো যে, আরব জাহানে ইসলামের অগ্রাভিযান বন্ধ করার মতো কোন শক্তিই আর অবশিষ্ট নেই এবং ইসলামের বিজয় অবধারিত।

হোদায়বিয়ার সন্ধি

ওমরাহর প্রস্তুতি

আরব জাহানের পরিস্থিতি মুসলমানদের প্রায় অনুকূলে এসে গিয়েছিলো। ইসলামী দাওয়াতের সাফল্য এবং বড়ো ধরনের বিজয়ের লক্ষণ পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পাচ্ছিলো। মসজিদে হারামের দরজা পৌত্তলিকরা মুসলানদের জন্যে ছয় বছর যাবত বন্ধ করে রেখেছিলো। সেই পবিত্র মসজিদে মুসলমানদের এবাদাতের অধিকারের স্বীকৃতি আদায়ের প্রাথমিক উদ্যোগ শুরু হয়ে গিয়েছিলো।

মদীনা মোনাওয়ারায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্ন দেখানো হলো যে, তিনি এবং সাহাবায়ে কেরাম মসজিদে হারামে প্রবেশ করেছেন। তিনি এও স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি কাবাঘরের চাবি নিয়েছেন এবং সাহাবারাসহ কাবাঘর তওয়াফ ও ওমরাহ পালন করেন। এরপর কয়েকজন সাহাবা চুল কাটেন। কয়েকজন শুধু নখ কাটেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের এই স্বপ্নের কথা জানান। সাহাবারা শুনে খুব খুশী হলেন। তারা মনে মনে আশা করছিলেন যে, এ বছর মক্কায় যাওয়া সম্ভব হবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের একথাও জানালেন যে, তিনি ওমরাহ পালন করবেন। একথা বলার পর সাহাবায়ে কেরাম সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করলেন।

মুসলমানদের রওয়ানা দেয়ার ঘোষণা

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সঙ্গে মক্কায় যাওয়ার জন্যে মদীনাও আশেপাশে ঘোষণা করে দিলেন। অধিকাংশ আরব ইতস্তত করছিলেন। ইতিমধ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের জামা-কাপড় পরিষ্কার করলেন। মদীনার দায়িত্ব আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম মতান্তরে নামিলা লাইসী (রা)-কে প্রদান করলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাসওয়া নামক উটনীতে আরোহণ করে ষষ্ঠ হিজরীর পহেলা যিলকদ মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তাঁর সহধর্মিনী হযরত উম্মে সালমা (রা.) সঙ্গী হলেন। সাহাবাদের মধ্যে চৌদ্দশ, মতান্তরে পনেরশ জন যাত্রা করেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোসাফেরসুলভ অস্ত্র সঙ্গে নিলেন, কোষবদ্ধ তলোয়ার ছাড়া অন্য কোন অস্ত্র নেননি।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানরা মক্কাভিমুখে চলছেন। যুল হোলায়ফা নামক জায়গায় পৌঁছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হোদীকে[১] সজ্জিত করলেন। উটের কোহান চিরে চিহ্ন দিলেন। ওমরাহর জন্যে এহরাম বাঁধলেন। তিনি এসব এ কারণেই করলেন যাতে, সবাই নিশ্চিন্ত হতে পারে যে, তিনি কেবল ওমরাহ পালনের জন্যেই যাচ্ছেন, যুদ্ধের কোন ইচ্ছা নেই। কাফেলার আগে খাযাআ গোত্রের একজন গুপ্তচরকে কোরায়শদের

---

১. 'হোদী' এমন জানোয়ারকে বলা হয়, যে জানোয়ার হজ্জ ও ওমরাহকারীরা মক্কা বা মিনায় যবাই করেন। আইয়ামে জাহেলিয়াতে নিয়ম ছিলো যে, হোদীর পশু ভেড়া বা বকরি হলে চিহ্ন হিসাবে গলায় বস্ত্রখন্ড বেধে দেয়া হতো। তবে উট হলে কোহান চিরে রক্ত চিহ্ন দেয়া হতো। এ পশুর কোন ক্ষতি কেউ করতো না। ইসলামী শরীয়তে এই রীতি অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে।

মনোভাব জানতে প্রেরণ করা হলো। আসফান নামক জায়গায় পৌঁছার পর গুপ্তচর এসে খবর দিলো যে, কা'ব ইবনে লুয়াইকে দেখে এলাম। সে আপনার সাথে মোকাবেলা করতে তাদের মিত্র গোত্র আহাবিশ-এর লোকদের সমবেত করছে। এছাড়া অন্যান্য জায়গা থেকেও লোক জড়ো করা হচ্ছে। তারা আপনার সাথে লড়াই করা এবং মক্কায় প্রবেশ রোধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ খবর পেয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের সাথে পরামর্শ করলেন।

তিনি বললেন, তোমাদের কি অভিমত? কোরায়শদের সাহায্য সহায়তা করতে যেসব গোত্র প্রস্তুতি নিয়েছে, আমরা কি তাদের এলাকায় গিয়ে হামলা করবো? এরপর যদি তারা চুপচাপ থাকে তবুও যুদ্ধের বিভীষিকা তাদের মন ঘিরে থাকবে। যদি তারা পলায়নপর হয়, তবে আল্লাহর ইচ্ছায় হয়তো কারো না কারো গর্দান কাটা যাবে। নাকি তোমরা চাও যে, আমরা কাবাঘরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবো এবং যারা পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, তাদের সাথে লড়াই করবো? একথা শুনে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বললেন, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূলই ভালো জানেন। কিন্তু আমরা তো ওমরাহর উদ্দেশ্যে এসেছি, কারো সাথে লড়াই করতে আসিনি। তবে আমাদের এবং বায়তুল্লাহর মধ্যে যারা অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে তাদের সাথে লড়াই করবো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঠিক আছে, চলো। পরে সকলে মক্কাভিমুখে এগিয়ে চললেন।

বায়তুল্লাহ থেকে মুসলমানদের ফিরিয়ে রাখার চেষ্টা

এদিকে কোরায়শ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রওয়ানা হওয়ার খবর পেয়ে পরামর্শ সভার বৈঠকে বসে এ মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, যে কোন মূল্যে মুসলমানদের বায়তুল্লাহ থেকে দূরে রাখতে হবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আহাবিশ গোত্র পেরিয়ে সফর অব্যাহত রাখলে বনি কা'ব গোত্রের একজন লোক এসে বললো, কোরায়শরা যী তাওয়া নামক জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করেছে। খালেদ ইবনে ওলীদ দু'শো সওয়ারের এক বাহিনী নিয়ে কুরাউল গামিম-এ প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। এই স্থান মক্কাভিমুখী প্রধান সড়কে অবস্থিত। খালেদ ইবনে ওলীদ মুসলমানদের বাধা দেয়ার চেষ্টা করলো। সে তার সৈন্যদলকে এমন জায়গায় রাখলো, যে জায়গা থেকে উভয় পক্ষ পরস্পরকে দেখতে পায়।

মুসলমানদের যোহরের নামায আদায়ের সময় খালেদ লক্ষ্য করলেন যে, মুসলমানরা রুকু সেজদা করছে। খালেদ নামায শেষে মন্তব্য করলো যে, নামাযের সময় ওরা গাফেল ছিলো। এ সময়ে যদি আমরা হামলা করতাম, তবে ওদের কাবু করতে পারতাম। এরপর খালেদ সিদ্ধান্ত নিলো যে, আছরের নামাযের সময় মুসলমানরা যখন নামাযে দাঁড়াবে তখন হঠাৎ করে তাদের ওপর হামলা করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা সেই সময়ে সালাতুল খাওফ-এর নির্দেশ দেন। খালেদ ইবনে ওলীদ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের ওপর হামলা করতে পারেনি।

রক্তাক্ত সংঘাত এড়িয়ে চলার চেষ্টা

এদিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাউল গামিমের প্রধান সড়ক ছেড়ে অন্য এক পথ ধরে অগ্রসর হলেন। পাহাড়ী এলাকা দিয়ে ছিলো সেই পথ। অর্থাৎ ডান দিকে ঘুরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হামশ-এর মাঝখান দিয়ে এমন এক পথে গেলেন, যে পথ সানিয়াতুল মারার নামক জায়গায় গিয়ে ঠেকেছে। ছানিয়াতুল মারার থেকে তাঁরা গেলেন হোদায়বিয়া। এই স্থান ছিলো মক্কার অদূরে। কুরাউল গামিম থেকে অন্য পথে মুসলমানদের যেতে দেখে অর্থাৎ পথ পরিবর্তন করতে দেখে খালেদ কোরায়শদের নয়া পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করতে সঙ্গীদের নিয়ে দ্রুত মক্কায় গেলো।

এদিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সফর অব্যাহত রাখলেন। সানিয়াতুল মারার নামক জায়গায় পৌঁছার পর উটনী বসে গেলো। লোকেরা বললো, হল্ হল্। কিন্তু উটনী বসেই রইল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই উটনীর তো এভাবে বসে পড়ার অভ্যাস নেই। তিনি একে থামিয়ে রেখেছেন যিনি হাতিকে থামিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি বললেন, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, ওরা এমন কিছু দাবী করবে না যাতে আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজের প্রতি শ্রদ্ধার প্রমাণ থাকবে। কিন্তু আমি অবশ্যই তা মেনে নেব। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উটনীকে ওঠার জন্যে তাকিদ দিতেই উটনী উঠে দাঁড়ালো। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পথের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করে হোদায়বিয়ায় একটি জলাশয়ের কাছে অবতরণ করলেন। জলাশয়ে পানির পরিমাণ বেশী ছিলো না। অল্প অল্প করে নেয়ার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই পানি শেষ হয়ে গেলো। সাহাবারা আল্লাহর রসূলের কাছে পিপাসার কথা জানালেন। তিনি শরাধার থেকে একটি তীর বের করে সেটি জলাশয়ে নিক্ষেপের নির্দেশ দিলেন। সাহাবারা তাই করলেন। জলাশয় থেকে এরপর অবিরল ধারায় পানি উঠতে শুরু করলো এবং সাহাবাদের পানির কষ্ট দূর হয়ে গেলো।

বুদাইল ইবনে ওরাকার আগমন

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চিত মনে অবস্থানের এক পর্যায়ে খাযাআ গোত্রের বুদাইল ইবনে ওরাকা খাজাআ গোত্রের কয়েকজন লোকসহ আল্লাহর রসূলের সাথে সাক্ষাতের জন্যে এলেন। তোহামার অধিবাসীদের মধ্যে এই গোত্রের লোকেরা ছিলো আল্লাহর রসূল ও মুসলমানদের হিতাকাঙ্খী। বুদাইল বললেন, আমি কা'ব ইবনে হুওয়ায়কে দেখে এলাম যে হোদায়বিয়ার পর্যাপ্ত পানির জলাশয় নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। তার সঙ্গে নারী ও শিশুরা রয়েছে। সে আপনার সাথে লড়াই করতে এবং বায়তুল্লাহ থেকে আপনাদের দূরে রাখার জন্যে সংকল্পবদ্ধ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমরা কারো সাথে লড়াই করতে আসিনি। লড়াই কোরায়শদের ভেঙ্গে ফেলেছে এবং মারাত্মক ক্ষতি করেছে। কাজেই তারা যদি চায় তবে আমি তাদের সাথে একটা সময় নির্ধারণ করে নেব এবং তারা আমার ও আমার লোকদের মাঝখান থেকে সরে যাবে। যদি তারা চায় তবে লোকেরা যে বিষয়ে প্রবেশ করেছে, সে সম্পর্কেও গাফেল হয়ে যাবে, অন্যথায় তারা শান্তি তো লাভ করবে। যদি তারা লড়াই ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থায় রাজি না হয় তবে সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, আমি দ্বীনের ব্যাপারে ততক্ষণ যাবত তাদের সাথে লড়াই করবো, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার দেহে প্রাণ থাকে অথবা যতক্ষণ যাবত আল্লাহর ইচ্ছার বাস্তবায়ন না ঘটে।

বুদাইল বললেন, আপনার বক্তব্য আমি কোরায়শদের কাছে পৌঁছে দেব। পরে তিনি কোরায়শদের কাছে গিয়ে বললেন, আমি ওদের কাছ থেকে আসছি। আমি তাদের কাছে একটা কথা শুনেছি, যদি তোমরা শুনতে চাও তবে বলতে পারি। নির্বোধরা বললো, আমাদের শোনার দরকার নেই। আমরা তাদের কোন কথা শুনতে চাই না। বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন কয়েকজন বললো, শুনো তো দেখি, কি বলেছে? বুদাইল সবকথা খুলে বললেন। এরপর কোরায়শরা মোকরেয ইবনে হাফসকে প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করলো। তাকে দেখে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই লোকটি বিশ্বাসঘাতক। মোকরেয এসে আল্লাহর রসূলের সাথে আলাপ করার পর তিনি এর আগে বুদাইলকে যেসব কথা বলেছিলেন, সেসব কথাই বললেন, মোকরেয ফিরে গিয়ে কোরায়শদের কাছে সব কথা জানালো।

কোরায়শদের দূত প্রেরণ

এরপর বনু কেনানা গোত্রের হালিস ইবনে আলকামা নামক এক ব্যক্তি বললো, আমাকে ওদের কাছে যেতে দাও। কোরায়শরা অনুমতি প্রদান করলো। ওকে দেখে প্রিয় নবী সাহাবাদের বললেন, এই লোকটি অমুক। সে এমন কওমের সাথে সম্পর্কিত যারা হোদীর পশুর সম্মান করে। কাজেই পশুপালকে দাঁড় করাও। সাহাবারা পশুপাল দাঁড় করালেন এবং নিজেরা লাব্বায়েক বলে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন। এই লোকটি এ অবস্থা দেখে বললো, সুবহানাল্লাহ, বায়তুল্লাহ থেকে এদের ফিরিয়ে রাখা মোটেই সমীচীন নয়। অন্য কোন কথা না বলে সে সোজা কোরায়শদের কাছে চলে গেলো এবং বললো, আমি হোদীর অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যবাইয়ের জন্যে আনীত পশু দেখেছি। তাদের গলায় বস্ত্রখন্ড বাঁধা রয়েছে এবং বহু পশুর কোহান রক্তাক্ত করে চিহ্ন দেয়া হয়েছে। কাজেই ওদেরকে বায়তুল্লাহ থেকে ফিরিয়ে রাখা আমি সমীচীন মনে করি না। এরপর কোরায়শদের এবং তার মধ্যে এমন কিছু কথা হলো যে, সে ক্ষেপে গেলো।

ওরওয়া ইবনে মাসউদ ছাকাফি এ সময় হস্তক্ষেপ করে বললো, তিনি তোমাদের কাছে একটি প্রস্তাব দিয়েছেন। এই প্রস্তাব গ্রহণ করো এবং আমাকে তার কাছে যেতে দাও। কোরায়শরা তাকে অনুমতি দিলো। সে এসে আল্লাহর রসূলের সাথে কথা বলতে লাগলো। বুদাইল এবং তার সঙ্গীদের যেসব কথা বলেছিলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেসব কথাই পুনরায় বললেন। সেসব শুনে ওরওয়া বললো, হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, বলুন তো আপনি যদি নিজের কওমকে নির্মূল করে দেন তবে আপনি কি আপনার আগে কোন আরব সম্পর্কে এমন কথা শুনেছেন যে, তিনি নিজের কওমকে নির্মূল নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন? যদি ভিন্নরকম পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তবে খোদার কসম, আমি এমন সব চোহারা এবং এমন সব উদভ্রান্ত লোকদের দেখেছি, যারা আপনাকে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার মতোই মনে হয়। একথা শোনার পর হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, লাত-এর লজ্জাস্থানের ঝুলন্ত চামড়া চোষো গিয়ে। আমরা আল্লাহর রসূলকে ছেড়ে পালিয়ে যাব? ওরওয়া বললো, এই লোকটি কে? সাহাবারা বললেন, এই ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত আবু বকর (রা.)। ওরওয়া তখন হযরত আবু বকর (রা.)-কে সম্বোধন করে বললো, দেখো, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, তুমি এক সময় আমাকে অনুগ্রহ করেছিলে। যদি তা না হতো এবং আমার সেই প্রতিদান না দেয়া থাকতো, তবে অবশ্যই আমি ওকথার জবাব দিতাম।

এরপর ওরওয়া রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বলতে লাগলো। সে কথা বলার সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাড়ি স্পর্শ করছিলো। মুগিরা ইবনে শোবা (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিয়রে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর হাতে ছিলো তলোয়ার। ওরওয়া আল্লাহর রসূলের দাঁড়িতে হাত দেয়া মাত্র হযরত মুগিরা তলোয়ারের বাঁট দিয়ে তার হাত সরিয়ে দিতেন এবং বলতেন, নিজের হাত আল্লাহর রসূলের দাঁড়ি থেকে দূরে রাখো। এক পর্যায়ে ওরওয়া মাথা তুলে হযরত মুগিরার পরিচয় জানতে চাইল। সাহাবারা বললেন, মুগির ইবনে শো'বা (রা.)। ওরওয়া বললো, বিশ্বসঘাতক। আমি কি তোর কাজে ছুটোছুটি করিনি? ঘটনা ছিলো এই যে, হযরত মুগিরা ইবনে শো'বা কিছু লোকের সঙ্গে ছিলেন। এরপর তাদেরকে হত্যা করে তাদের ধন-সম্পদ সঙ্গে নিয়ে মদীনায় এসেছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, তোমার মুসলমান হওয়া আমি মেনে নিচ্ছি কিন্তু সে ধন-সম্পদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে ওরওয়া ছুটোছুটি করেছিলো। এখন সে কথাই বলছে। উল্লেখ্য, হযরত মুগিরা ছিলেন ওরওয়ার ভ্রাতুস্পুত্র।

এরপর ওরওয়া রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাহাবাদের বিশেষ সম্পর্ক দেখতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর মক্কায় ফিরে গিয়ে নিজের সঙ্গীদের বললেন, হে কওম, আমি কায়সার কিসরা এবং নাজ্জাশীর মতো সম্রাটদের কাছে গিয়েছি। আল্লাহর শপথ, আমি কোন বাদশাহকে দেখিনি, যিনি তার সঙ্গীদের কাছ থেকে এতো মর্যাদা লাভ করেন। যতোটা সম্মান ও মর্যাদা মোহাম্মদকে লাভ করতে দেখেছি। আল্লাহর শপথ, তিনি যখন থুথু ফেলেন, সেই থুথু কেউ না কেউ হাত বাড়িয়ে নিয়ে নেয় এবং মুখে দেহে মাখিয়ে দেয়। তিনি কোন আদেশ করলে সে আদেশ পালনে সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তিনি ওজু করতে শুরু করলে তার পরিত্যক্ত পানি গ্রহণে সঙ্গীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি লেগে যায়। তিনি কথা বলতে শুরু করলে তার সঙ্গীরা কণ্ঠস্বর নীচু করে ফেলে। শ্রদ্ধার আতিশয্যে সঙ্গীরা তাঁর প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় না। এমন একজন ব্যক্তি তোমাদের একটি ভালো প্রস্তাব দিয়েছেন। এ প্রস্তাব গ্রহণের জন্যে আমি তোমাদের অনুরোধ করছি।

কোরায়শের যুদ্ধবাজ যুবকরা যখন লক্ষ্য করলো যে, প্রবীণরা আপোস নিষ্পত্তির ফর্মূলা নিয়ে ব্যস্ত, তখন তারা যুদ্ধ বাধানোর পাঁয়তারা করলো। তারা সিদ্ধান্ত করলো যে, রাত্রিকালে চুপিসারে মুসলমানদের শিবিরে গিয়ে এমন হাঙ্গামা শুরু করবে যাতে উভয় পক্ষে যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যে এরপর তারা অগ্রসর হয়। রাতের অন্ধকারে ৭০ অথবা ৮০ জন যুবক তানঈম পাহাড় থেকে নেমে চুপিসারে মুসলমানদের শিবিরে প্রবেশের চেষ্টা করে। কিন্তু মুসলিম সৈন্য কমান্ডার মোহাম্মদ ইবনে মোসলমা (রা.) ওদের সবাইকে গ্রেফতার করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হাযির করেন। দয়াল নবী সন্ধির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে তাদের সবাইকে ক্ষমা ও মুক্ত করে দেন। এই সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেন, 'তিনি মক্কা উপত্যকায় ওদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত ওদের হতে নিবারিত করেছেন, ওদের ওপর তোমাদের বিজয়ী করার পর।' (সূরা ফাতেহ, আয়াত, ২৪)

হযরত ওসমান (রা.)-এর মক্কায় গমন

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় একজন দূত পাঠিয়ে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য কোরায়শদের কাছে সুষ্ঠভাবে ব্যক্ত করার প্রয়োজন অনুভব করলেন। একাজে তিনি ওমর ইবনে খাত্তাবকে (রা.) ডাকলেন। হযরত ওমর (রা.) এটি বলে অপারগতা প্রকাশ করলেন যে, হে আল্লাহর রসূল, যদি অমুসলিমরা আমার ওপর নির্যাতন করে তবে মক্কায় বনি কা'ব গোত্রের একজন লোকও আমার সমর্থনে এসে দাঁড়াবে না। হযরত ওসমানই আমার বিবেচনায় এ কাজের উপযুক্ত। তাকে প্রেরণের আমি আবেদন জানাচ্ছি। তাঁর গোত্রের লোকেরা মক্কায় রয়েছে এবং তিনি কোরায়শদের কাছে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন হযরত ওসমানকে ডাকলেন এবং কোরায়শদের কাছে যাওয়ার আদেশ দিয়ে বললেন, তুমি ওদের গিয়ে বলবে যে, আমরা যুদ্ধ করতে আসিনি, ওমরাহ পালনের জন্যেই আমরা এসেছি। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ওসমান (রা.)-কে একথাও বললেন যে, তিনি যেন মক্কার ঈমানদার পুরুষ ও মহিলাদের কাছে গিয়ে তাদের সান্ত্বনা দেন। তিনি যেন তাদের বলেন যে, আল্লাহ তায়ালা জাল্লা শানুহু শীঘ্রই মক্কায় ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবেন। ঈমানদার হওয়ার কারণে তখন কাউকে চুপিসারে আল্লাহর এবাদাত-বন্দেগী করতে হবে না। হযরত ওসমান (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পয়গাম নিয়ে রওয়ানা হলেন। বালদাহ নামক জায়গায় কয়েকজন কোরায়শী লোকের সাথে দেখা হলো। তারা বললো, কোথায় যাচ্ছেন? হযরত ওসমান (রা.) বললেন, আল্লাহর রসূল হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে এই

বক্তব্যসহ তোমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। কোরায়শী লোকেরা বললো, আপনার আনীত বক্তব্য আমরা আগেই শুনেছি। আপনি নিজের কাজে যান। এদিকে সাঈদ ইবনে আস উঠে হযরত ওসমানকে (রা.) বললেন, মারহাবা। এরপর নিজের ঘোড়ায় জিন বেঁধে হযরত ওসমানকে (রা.) পিঠে তুলে মক্কায় বাসভবনে নিয়ে গেলেন। সেখানে হযরত ওসমান (রা.) কোরায়শ নেতাদের কাছে আল্লাহর রসূলের বক্তব্য ব্যাখ্যা করলেন। কোরায়শরা হযরত ওসমান (রা.)-কে কাবাঘর তওয়াফের প্রস্তাব দিলো, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগে কাবাঘর তওয়াফ করা তিনি পছন্দ করলেন না।

হযরত ওসমান (রা.)-এর শাহাদাতের গুজব ও বাইয়াতে রেজোয়ান

হযরত ওসমান (রা.) তাঁর ওপর অর্পিত কাজ সম্পন্ন করলেন। কিন্তু কোরায়শরা তাঁকে তাদের কাছেই রেখে দিলো। সম্ভবত তারা চাচ্ছিলো যে, উদ্ভুত পরিস্থিতির আলোকে পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। এরপর তারা হযরত ওসমান (রা.)-এর আনীত বক্তব্যের জবাব পাঠাবে। দীর্ঘ সময় হযরত ওসমানের (রা.) ফিরে না আসায় মুসলমানদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, তাকে হত্যা করা হয়েছে। আল্লাহর রসূলকে এ খবর জানানো হলে তিনি বললেন, কোরায়শদের সাথে যুদ্ধ না করে আমরা এ জায়গা থেকে যাব না। একথা বলার পর তিনি সাহাবাদের বাইয়াতের জন্যে আহ্বান জানালেন। সাহাবায়ে কেরাম অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়ে এবং এ মর্মে বাইয়াত করলেন যে, যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে কেউ পলায়ন করবে না। সর্বাগ্রে বাইয়াত করলেন আবু ছানান আছাদী। হযরত সালমা ইবনে আকোয়া (রা.) তিনবার বাইয়াত করলেন। শুরু, মাঝামাঝি সময়ে এবং শেষদিকে। আল্লাহর রসূল নিজের এক হাত অন্য হাতে নিয়ে বললেন, এ হাত ওসমানের। বাইয়াত গ্রহণ শেষ হলে হযরত ওসমান (রা.) এসে হাযির হলে তিনিও বাইয়াত করলেন। বাইয়াতে জাদ ইবনে কয়েস নামক একজন লোক অংশ নেয়নি। সে ছিলো মোনাফেক।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি গাছের নীচে এই বাইয়াত গ্রহণ করেন। হযরত ওমর (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত ধরে রেখেছিলেন। হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াছার (রা.) গাছের কয়েকটি শাখা ধরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর থেকে সরিয়ে রাখছিলেন। এই বাইয়াত সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কোরআনে করিমে এই আয়াত নাযিল করেন, 'মোমেনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করলো, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন।' (সূরা ফাতেহ, আয়াত ১৮)

ঐতিহাসিক সন্ধির শর্তসমূহ

কোরায়শরা পরিস্থিতির নাজুকতা উপলব্ধি করলো। এরপর খুব দ্রুত সোহায়েল ইবনে আমরকে সন্ধি করতে প্রেরণ করলো। সোহায়েলকে তাকিদ দিয়ে বলে দেয়া হলো, আল্লাহর রসূল যেন এ বছর ফিরে যান। কেননা আরবরা বলাবলি করতে পারে যে, তিনি আমাদের শহরে জোর করে প্রবেশ করেছেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোহায়েলকে দেখে সাহাবাদের বললেন, তোমাদের কাজ তোমাদের জন্যে সহজ করে দেয়া হয়েছে। এই লোকটিকে প্রেরণের অর্থ হচ্ছে, কোরায়শরা সন্ধি চায়। সোহায়েল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বেশ কিছুক্ষণ তাঁর সাথে আলাপ করলেন। এরপর সন্ধির শর্তাবলী প্রণয়ন করা হলো, শর্তাবলী নিম্নরূপ।

এক) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ বছর মক্কায় প্রবেশ না করেই ফিরে যাবেন। আগামী বছর মুসলমানরা মক্কায় আসবেন এবং তিনদিন অবস্থান করবেন। তাঁদের সঙ্গে আত্মরক্ষামূলক অস্ত্র থাকবে। তলোয়ার থাকবে কোষবদ্ধ। কেউ তাদের উত্যক্ত করবে না।

দুই) উভয় পক্ষ দশ বছর যাবত যুদ্ধ বন্ধ রাখবে। এই সময়ে জনসাধারণ নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ থাকবে। কেউ কারো ওপর হাত তুলবে না।

তিন) মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতাদর্শে যারা ইচ্ছা করে, তারা প্রবেশ করতে পারবে কোরায়শদের মতাদর্শে যারা থাকতে চায়, তারা থাকতে পারবে। যে গোত্র অন্য গোত্রে প্রবেশ করবে, সে সেই গোত্রের একাংশ হিসাবে বিবেচিত হবে। কাজেই এমন কোন গোত্রের ওপর বাড়াবাড়ি করা হলে সেই প্রবিষ্ট গোত্রের লোকদের ওপরও বাড়াবাড়ি করা হয়েছে মনে করতে হবে।

চার) কোরায়শদের কোন লোক যদি নেতাদের অনুমতি ছাড়া অর্থাৎ পালিয়ে মোহাম্মদের কাছে যায় তিনি তাকে ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু মোহাম্মদের সঙ্গীদের মধ্যে কেউ যদি আশ্রয় লাভের জন্যে কোরায়শদের কাছে যায়, তবে কোরায়শরা তাকে ফেরত দেবে না।

চুক্তির খসড়া প্রণীত হওয়ার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেরে খোদা হযরত আলী (রা.)-কে ডেকে শর্তাবলী লেখালেন। শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' লেখার জন্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন। অর্থাৎ পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। এতে সোহায়েল বললো, আমরা তো জানি না রহমান কি? আপনি বরং এভাবে লিখতে বলুন, বি-ইসমিকা আল্লাহুম্মা। অর্থাৎ আপনার নামে হে আল্লাহ। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী (রা.)-কে তাই লিখতে বললেন। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নিম্নোক্ত বক্তব্যসমূহের ওপর আল্লাহর রসূল মোহাম্মদ সন্ধি করেছেন। এ কথা শুনে সোহায়েল বললো, আমরা যদি জানতাম যে, আপনি আল্লাহর রসূল, তবে কাবাঘরে তওয়াফে আপনাকে বাধা দিতাম না এবং আপনার সাথে যুদ্ধও করতাম না। আপনি মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ লিখতে বলুন। তিনি বললেন, তোমরা স্বীকার না করলেও আমি আল্লাহর রসূল। এরপর হযরত আলী (রা.)-কে বললেন, মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ লেখো এবং রসূলুল্লাহ শব্দ মুছে দাও। হযরত আলী (রা.) রাযি হলেন না, আল্লাহর রসূল নিজ হাতে শব্দটি মুছে দিলেন। এরপর সন্ধির শর্তাবলী পুরোপুরি লিপিবদ্ধ করা হলো।

সন্ধি সম্পন্ন হওয়ার পর বনু খাযাআ গোত্র রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মতাদর্শে প্রবেশ করলো। এই গোত্রের লোকেরা প্রকৃতপক্ষে আবদুল মোত্তালেবের সময়েও বনু হাশেমের মিত্র ছিলো। গ্রন্থের শুরুতেই এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। মতাদর্শে প্রবেশ বা মতাদর্শ গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে প্রাচীন মিত্রের মিত্রতার স্বীকারোক্তি এবং মিত্রতা সম্পর্কের সুদৃঢ়করণ। অন্যদিকে বনু বকর গোত্র কোরায়শদের মতাদর্শে প্রবেশ করে।

আবু জান্দালের প্রত্যাবর্তন

সন্ধির শর্তাবলী লেখা হচ্ছিলো এমন সময় শেকল পরিহিত অবস্থায় শেকল টানতে টানতে সেখানে এসে হাযির হলেন সোহায়েলের পুত্র আবু জান্দাল। তিনি মক্কা থেকে এসে নিজেকে মুসলমানদের মধ্যে ফেলে দিলেন। সোহায়েল বললো, ওর সম্পর্কে সর্বপ্রথম আমি আপনার সাথে সন্ধির শর্ত বাস্তবায়ন করছি। আপনি ওকে ফিরিয়ে দিন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সন্ধির কাজ এখনো তো শেষ হয়নি। সোহায়েল বললো, আবু জান্দালকে ফেরত না দিলে আপনার সাথে আমি সন্ধিই করবো না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোহায়েলকে বললো, আচ্ছা, তুমি ওকে আমার খাতিরে ছেড়ে দাও। সোহায়েল বললো, আপনার খাতিরেও

ওকে ছেড়ে দিতে পারব না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় অনুরোধ জানালেন, দাওনা ছেড়ে!

সোহায়েল বললো, না, না, দিতে পারব না। এরপর সোহায়েল আবু জান্দালের মুখে থাপ্পড় মারলো এবং মক্কায় ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে জামার কলার ধরে টানাটানি করতে লাগলো। আবু জান্দাল তখন চিৎকার করে বললেন, হে মুসলমানরা, আমি কি পুনরায় পৌত্তলিকদের কাছে ফিরে যাব? ওরা আমার দ্বীনের ব্যাপারে আমাকে ফেতনার মধ্যে ফেলে দেবে। আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আবু জান্দাল, তুমি ধৈর্যধারণ করো এবং এই ধৈর্যকেই সওয়াবের কারণ মনে করো। আল্লাহ তায়ালা তোমার এবং তোমার সঙ্গী অন্যান্য কমযোর মুসলমানদের জন্যে প্রশস্ততা এবং আশ্রয়ের জায়গা করে দেবেন। আমরা কোরায়শদের সাথে সন্ধি করেছি। আমরা তাদের সাথে এবং তারা আমাদের সাথে আল্লাহর নামে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছি। কাজেই আমরা সন্ধির শর্ত লংঘন করতে পারি না।

হযরত ওমর (রা.) দ্রুত আবু জান্দালের কাছে গেলেন। তিনি তার পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলছিলেন, আবু জান্দাল ধৈর্যধারণ করো, ওরা মোশরেক, পৌত্তলিক। ওদের রক্ত কুকুরের রক্ত। একথা বলার সাথে সাথে হযরত ওমর(রা.) নিজের তলোয়ার আবু জান্দালের কাছে নিয়ে যাচ্ছিলেন। হযরত ওমর (রা.) পরে বলেছেন, আমি আশা করেছিলাম যে, আবু জান্দাল আমার কাছ থেকে তলোয়ার নিয়ে তার পিতাকে শেষ করে দেবে। কিন্তু আবু জান্দাল তা করেননি। অবশেষে সন্ধির শর্ত বাস্তবায়িত হলো।

ওমরাহ শেষ মনে করে কোরবানী করা এবং চুলকাটা

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্ধির শর্তাবলী লেখানোর পর বললেন, ওঠো এবং নিজ নিজ পশু কোরবানী করো। সাহাবাদের কেউ উঠলেন না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার একই কথা বললেন, একই আদেশ করলেন। কিন্তু কেউ কোন আগ্রহ দেখালেন না। অতপর তিনি উম্মুল মোমেনীন হযরত উম্মে সালমার (রা.) কাছে একথা ব্যক্ত করলেন। নবীসহধর্মিনী বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আপনি যদি মনে করে থাকেন যে, হোদীর পশু যবাই করা প্রয়োজন, আপনি নিজেই যান, কাউকে কিছু না বলে নিজের হোদীর পশু যবাই করুন। এরপর আপনার নাপিতকে ডেকে মাথার চুল কামিয়ে ফেলুন। উম্মুল মোমেনীনের পরামর্শ অনুযায়ী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের হোদীর পশু যবাই করলেন এবং নিজের মাথার চুল কামানোর ব্যবস্থা করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সাহাবারা আল্লাহর রসূলের দেখাদেখি নিজ নিজ হোদীর পশু যবাই করলেন। এরপর একে অন্যের মাথার চুল কাটতে শুরু করলেন। কেউ সব চুল কামিয়ে ফেললেন কেউ চুল ছাঁটাই করিয়ে ছোট করালেন। সবাই গম্ভীর এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। প্রত্যেকের মনের অবস্থা এতো খারাপ ছিলো যে, মনে হয় তারা চিন্তার আতিশয্যে একে অন্যকে খুন করবেন। এ সময়ে গাভী এবং উট সাত সাতজন লোকের পক্ষ থেকে যবাই করা হয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু জেহেলের একটি উট যবাই করেন। এই উটটির নাকে একটি রূপার বালি ছিলো। এ কাজের উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, মোশরেকরা এ খবর পাওয়ার পর যেন নিষ্ফল ক্রোধে অধীর হয়ে ওঠে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতপর যারা মাথা কামিয়েছেন, তাদের জন্যে তিনবার এবং যারা চুল কাঁচি দিয়ে ছোট করেছেন তাদের জন্যে একবার মাগফেরাতের দোয়া করেন। এই সফরে আল্লাহ রব্বুল আলামীন হযরত কা'ব ইবনে আযারার ক্ষেত্রে এ নির্দেশ নাযিল করেন, যে ব্যক্তি কষ্টের কারণে এহরাম অবস্থায় নিজের না মাথা কামায়, সে যেন রোযা, সদকা বা পশু যবাইয়ের মাধ্যমে ফিদিয়া প্রদান করে।

মোহাজের মহিলাদের ফেরত দিতে অস্বীকৃতি

মক্কা থেকে কিছুসংখ্যক মোমেন মহিলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। তাদের আত্মীয় স্বজন হোদায়বিয়ার সন্ধি অনুযায়ী তাদের ফেরত দাবী করলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দাবী প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি যুক্তি দেখালেন যে, এ বিষয়ে চুক্তিতে লিখিত বক্তব্য হচ্ছে এই চুক্তি এই শর্তের ওপর করা হচ্ছে যে, আমাদের যে পুরুষ আপনাদের কাছে যাবে তারা যে ধর্ম বিশ্বাসের ওপরই থাকুক না কেন তাদের অবশ্যই ফিরিয়ে দিতে হবে। এখানে মহিলাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়নি।[১] কাজেই মহিলারা সন্ধির এ শর্তের আওতা বহির্ভূত। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এরপর এই আয়াত নাযিল করেন। 'হে মোমেনরা, তোমাদের কাছে মোমেন নারীরা দেশত্যাগী হয়ে এলে তাদেরকে পরীক্ষা করিও। আল্লাহ তাদের ঈমান সমন্ধে সম্যক অবগত আছেন। যদি তোমরা জানতে পারো যে, তারা মোমেন, তবে তাদের কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিও না। মোমেন নারীরা কাফেরদের জন্যে বৈধ নয় এবং কাফেররা মোমেন নারীদের জন্যে বৈধ নয়। কাফেররা যা ব্যয় করেছে, তা ওদের ফিরিয়ে দিও। তোমরা তাদের বিয়ে করলে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না, যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহরানা দাও। তোমরা কাফের নারীদের সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রেখো না।' (সূরা মুমতাহানা, আয়াত ১০)

এই আয়াত নাযিল হওয়ার পর কোন মোমেন মহিলা হিজরত করে এলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ সম্পর্কে বলেন, 'হে নবী, মোমেন নারীরা যখন তোমার কাছে এসে বাইয়াত করে এ মর্মে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন শরিক স্থির করবে না, চুরি করবে না, ব্যাভিচার করবে না, নিজেদের সন্তানকে হত্যা করবে না, তারা সজ্ঞানে কোন অপবাদ রচনা করে রটাবে না এবং সৎকাজে তোমাকে অমান্য করবে না, তখন তাদের বাইয়াত গ্রহণ করো এবং তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা মুমতাহানা, আয়াত ১২)

হিজরত করে আসা মহিলারা উক্ত আয়াতের শর্তাবলী অনুযায়ী অঙ্গীকার করতেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, আমি তোমাদের কাছ থেকে বাইয়াত নিলাম। এরপর তাদের ফেরত পাঠাতেন না।

এ নির্দেশ অনুযায়ী মুসলমানরা তাদের অমুসলিম অর্থাৎ কাফের স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দেন। সেই সময় হযরত ওমরের (রা.) দুইজন স্ত্রী ছিলেন কাফের। তিনি তাদের তালাক দিলেন। এদের একজনকে মুয়াবিয়া, অন্যজনকে সফওয়ান ইবনে উমাইয়া বিয়ে করেন।

সন্ধির শর্তাবলীর মোদ্দাকথা

এই হচ্ছে হোদায়বিয়ার সন্ধি। এ সন্ধির শর্তাবলী গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় যে, এটা ছিলো মুসলমানদের এক বিরাট বিজয়। কেননা এতাদিন যাবত কোরায়শরা মুসলমানদের অস্তিত্বই স্বীকার করছিলো না। তাঁদের নাস্তানাবুদ করতে তারা ছিলো সংকল্পবদ্ধ। তারা অপেক্ষায় ছিলো যে, একাদিন না একদিন এ শক্তি নিশেষ হয়ে যাবেই। এছাড়া কোরায়শরা জাযিরাতুল আরবে দ্বীনী ও দুনিয়াবী কাজকর্মে নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত থাকায় ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মধ্যে সর্বশক্তিতে বাধা সৃষ্টিতে সচেষ্ট থাকতো। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সন্ধি সম্পর্কে একটুখানি চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, এটা ছিলো মুসলমানদের শক্তির স্বীকৃতি এবং একথার ঘোষণা যে, এখন আর কোরায়শদের পক্ষে মুসলমানদের শক্তিকে নস্যাৎ

---

১. সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড. পৃ. ৩০৭

করার সাধ্য কারো নেই। সন্ধির তৃতীয় দফার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এই যে, কোরায়শরা দ্বীনী ও দুনিয়াবী ক্ষেত্রে যে দায়িত্ব লাভ করেছিলো, সে দায়িত্ব পালনে তারা ব্যর্থ হয়েছে। তারা এখন শুধু নিজের স্বার্থ চিন্তায় বিভোর। অন্য লোকদের জন্যে তাদের কোন চিন্তা বা মাথা ব্যথা নেই। অর্থাৎ সমগ্র জাযিরাতুল আরবের জনসাধারণও যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবু কোরায়শদের ওতে কিছু আসে যায় না। এ ব্যাপারে তারা কোনরকম হস্তক্ষেপ করবে না। কোরায়শদের সঙ্কল্প এবং উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে এটা কি তাদের সুস্পষ্ট পরাজয় নয়? মুসলমানদের অবস্থার প্রেক্ষিতে এটা কি তাদের সুস্পষ্ট বিজয় নয়? ইসলামের অনুসারী এবং ইসলামের শত্রুদের মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছিলো, তার উদ্দেশ্য তো এটাই ছিলো যে, ধর্ম-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মানুষ যেন পূর্ণ স্বাধীনতা এবং স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ করে। অর্থাৎ স্বাধীন ইচ্ছার মাধ্যমে যার খুশী মুসলমান হবে, যার খুশী কাফের থেকে যাবে। কোন শক্তি তাদের এ ইচ্ছা বাস্তবায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। মুসলমানদের তো এ উদ্দেশ্য কখনোই ছিলো না যে, তারা কাফেরদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেবে, তাদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেবে অথবা জোর করে তাদের মুসলমান করবে। মুসলমানদের উদ্দেশ্যে তো ছিলো সেটাই আল্লামা ইকবালের ভাষায় এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে,

'মোমেন বান্দার মকসুদ—সে তো হচ্ছে শাহাদাত
চায়না সে বাহাদুরি চায় না মালে গনীমত।'

লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, হোদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে মুসলমানরা তাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য পুরোপুরি অর্জনে সক্ষম হয়েছে। যুদ্ধ জয়ের সাফল্যের চেয়ে এ সাফল্যের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনেক বেশী। এ স্বাধীনতার কারণে মুসলমানরা দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য লাভে সক্ষম হয়েছে। এই সন্ধির আগ পর্যন্ত মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা কখনোই তিন হাজারের বেশী ছিলো না, সেই সংখ্যা দুই বছরের মধ্যে মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে দশ হাজারে উন্নীত হয়েছে।

সন্ধির দ্বিতীয় দফাও সুস্পষ্ট বিজয়ের একটি অংশ। কেননা যুদ্ধের সূচনা মুসলমানরা নয় বরং কাফেররাই করেছিলো। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'ওরাই প্রথমে তোমাদের সাথে শুরু করেছে।'

মুসলমানরা সামরিক অভিযানের মাধমে কোরায়শদেরকে নির্বুদ্ধিতামূলক আচরণ অর্থাৎ আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা ও হঠকারিতা থেকে ফিরিয়ে রাখতে চেয়েছেন। পারস্পরিক ক্ষেত্রে সমান অধিকার লাভই ছিলো মুসলমানদের দাবী। নিজ নিজ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষ সমভাবে কাজ করবে, সমান অধিকার ভোগ করবে এবং স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করবে। কিন্তু অমুসলিমরা তা দেয়নি। অবশেষে দশ বছর যুদ্ধ বন্ধ রাখার শর্ত সন্ধিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এর অর্থ হচ্ছে যে,তারা আর আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করবে না। এর অর্থ হচ্ছে যে, যুদ্ধের সূচনাকারীরা দূর্বল, নিরুপায় এবং চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

সন্ধির প্রথম দফায় উল্লিখিত বক্তব্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এটা প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের সাফল্যের নিদর্শন। ব্যর্থতা কিছুতেই নয়। কেননা কাফেররা মুসলমানদের জন্যে কাবা শরীফে যাওয়া নিষিদ্ধ করেছিলো, এই দফার মাধ্যমে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারেরই ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তবে কাফেরদের এ দফায় সান্ত্বনা পাওয়ার মতো বিষয় রয়েছে। সেটা এই যে, তারা এক বছরের জন্যে মুসলমানদেরকে তাদের প্রিয় বায়তুল্লাহ থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এটা যে সাময়িক এবং নিরর্থক সাফল্য, সে কথা না বললেও বোঝা যায়।

হোদায়বিয়ার সন্ধি আরো ভালোভাবে পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, কোরায়শরা মুসলমানদের তিনটি সুবিধা দিয়ে নিজেরা একটি সুবিধা লাভ করেছে। সে সুবিধার কথা সন্ধির চতুর্থ দফায় উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু এই সুবিধা খুবই মামুলি এবং মূল্যহীন। এতে মুসলমানদের

কোন ক্ষতি ছিলো না। কেননা এটাতো জানা কথা যে, মুসলমানরা যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান থাকবে ততক্ষণ তারা মদীনা থেকে পালিয়ে মক্কায় যাবে না। একমাত্র ধর্মান্তরিত বা মোরতাদ হলেই তারা পালিয়ে যেতে পারে। সেটা প্রকাশ্য বা গোপনীয় মোরতাদ হওয়া যে কোন প্রকারই হতে পারে। কোন মুসলমান ধর্মান্তরিত হওয়ার পর মুসলমানদের কাছে তার প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়। তখন তার ইসলামী সমাজে থাকার চেয়ে বেরিয়ে যাওয়াই মুসলমানদের জন্যে কল্যাণকর। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিকে ইঙ্গিত করেই বলেছিলেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছেড়ে মোশরেকদের কাছে পালিয়ে গেছে, আল্লাহ তায়ালা তাকে দূর করে দিয়েছেন।[২]

মক্কার যেসকল মানুষ মুসলমান হয়েছেন বা হবেন, তাদের বিষয়ে তো সন্ধির শর্তাবলীতে কোন সুবিধা রাখা হয়নি। কাজেই তাদের মদীনায় আশ্রয় লাভের কোন সুযোগ নেই। কিন্তু মহান আল্লাহর পৃথিবী তো অনেক প্রশস্ত। নাযুক সময়ে হাবশার যমিন কি মুসলমানদের জন্যে আশ্রয়স্থল হয়নি? সেই সময় মদীনার অধিবাসীরাতো ইসলামের নামও জানতো না। এখনো দুনিয়ার কোন না কোন অংশ মুসলমানদের জন্যে বক্ষ বিস্তার করবে। এদিকে ইঙ্গিত করেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ওদের যে লোক আমাদের কাছে আসবে, আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে প্রশস্ততা এবং বেরিয়ে যাওয়ার বন্দোবস্ত করে দেবেন।'

এ ধরনের ব্যবস্থাপনায় দৃশ্যত কোরায়শরা লাভবান হয়েছিলো কিন্তু এটা প্রকৃতপক্ষে কোরায়শদের মানসিক ভয়-ভীতি, পেরেশানি, আতঙ্ক, অস্থিরতা এবং পরাজয়ের নিদর্শন। এতে বোঝা যায় যে, তারা তাদের মূর্তিনির্ভর সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পড়েছিলো। তারা অনুভব করছিলো যে, তাদের এ সমাজদেহ এমন এক ক্ষণভঙ্গুর অন্তসারশূন্য অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, যা যে কোন মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে। কাজেই এর হেফাযতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা অপরিহার্য। অন্যদিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেরূপ উদারচিত্তে এ শর্ত মেনে নিয়েছেন যে, কোরায়শদের কাছে আশ্রয়গ্রহণকারী কোন মুসলমানকে ফেরত চাইবেন না, এতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী সমাজের পরিপক্কতা এবং দৃঢ়তা সম্পর্কে তার আস্থা ছিলো পূর্ণ মাত্রায়। তাই এরূপ ধরনের শর্তে কোন প্রকার ক্ষতি হবে না।

হযরত ওমর (রা.)-এর সংশয়

হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্তাবলী বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনা করা হলো। এ শর্তাবলীর মধ্যে দু'টি বিষয় এমন ছিলো যে, তার কারণে মুসলমানরা মানসিক দিক থেকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রথমত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন যে, তিনি বায়তুল্লাহ শরীফে যাবেন এবং তওয়াফ করবেন কিন্তু তওয়াফ না করেই তিনি ফিরে যাচ্ছিলেন। দ্বিতীয়ত তিনি আল্লাহর রসূল এবং সত্যের ওপর ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। কাজেই আল্লাহর রসূল কেন প্রভাবিত হয়ে এবং নতি স্বীকার করে সন্ধি করলেন? এ দু'টি বিষয় নানা সংশয় এবং প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছিলো এবং মুসলমানদের অনুভূতিতে এতো বেশী আঘাত লেগেছিলো যে, তারা দুঃখ-দুশ্চিন্তায় মুষড়ে পড়েছিলেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবই সম্ভবত সবচেয়ে বেশী মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন। তিনি আল্লাহর রসূলের কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমরা কি হক এবং ওরা কি বাতিলের ওপর নেই? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কেন নয়? তিনি বললেন, আমাদের নিহতরা জান্নাত আর ওদের নিহতরা কি জাহান্নামের অধিবাসী নয়? আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন কেন নয়? তিনি বললেন তবে আমরা কেন দ্বীনের ব্যাপারে প্রভাবিত হলাম, এরূপ শর্ত গ্রহণ করলাম এবং

---

২. সহীহ মুসলিম, হোদায়বিয়ার সন্ধি ২য় খন্ড, পৃ. ১০৫

এমন অবস্থায় পতিত হলাম? অথচ আল্লাহ তায়ালা এখনো আমাদের এবং ওদের মধ্যে ফয়সালা করেননি। আল্লাহর রসুল বললেন, খাত্তাবের পুত্র ওমর, আমি আল্লাহর রসূল। কাজেই আমি আল্লাহর নাফরমানি করতে পারি না। আল্লাহ তায়ালা আমাকে সাহায্য করবেন এবং কিছুতেই আমাকে ধ্বংস করবেন না। তিনি বললেন, আপনি কি আমাদের বলেননি যে, বায়তুল্লাহ শরীফে যাবেন এবং তওয়াফ করবেন? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন কেন নয়? কিন্তু আমি কি বলেছিলাম যে, আমরা এবারই সফল হবো? তিনি বললেন জ্বী না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, শোনো তবে, অবশ্যই বায়তুল্লাহর কাছে তোমরা যাবে এবং তার তওয়াফও করবে।

কিন্তু হযরত ওমর (রা.) অসন্তুষ্ট মনে হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে গিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যেসব কথা বলেছিলেন, তা তাকে বললেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ওমর (রা.)-কে যেরূপ জবাব দিয়েছিলেন, হযরত আবু বকরও সেরূপ জবাব দিলেন। পরে হযরত আবু বকর (রা.) আরো বললেন, আল্লাহর রসূলের প্রতি আনুগত্যে মৃত্যুকাল পর্যন্ত অবিচল থাকো।

পরে আল্লাহ রব্বুল আলামীন সূরা ফতেহ-এ সেসব আয়াত নাযিল করলেন, যার শুরুতে রয়েছে, 'নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে দিয়েছি সুস্পষ্ট বিজয়। এই সূরায় হোদায়বিয়ার সন্ধিকে মুসলমানদের জন্যে সুস্পষ্ট বিজয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতসমূহ নাযিল হওয়ার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ওমরকে ডেকে এনে এবং আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনালেন।

হযরত ওমর (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রসূল, এটা কি বিজয়? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাঁ বিজয়। একথা শুনে হযরত ওমর (রা.)-এর মন শান্ত হলো এবং তিনি ফিরে এলেন।

পরবর্তীকালে হযরত ওমর (রা.) নিজের ভুল বুঝতে পেরে খুবই লজ্জিত হলেন। তিনি বলেন, সেদিন যে ভুল করেছিলাম, যে কথা বলেছিলাম, সে জন্যে ভয়ে আমি অনেক নেক আমল করেছি, নিয়মিত সদকা খয়রাত করেছি, রোযা রেখেছি, নামায আদায় করেছি, ক্রীতদাস মুক্ত করেছি। এরপর এখন আমি কল্যাণের ব্যাপারে আশাবাদী।[৩]

দুর্বল মুসলমানদের সমস্যার সমাধান

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় এসে নিশ্চিন্ততা অনুভব করলেন। এ সময় মক্কা থেকে আবু বাছির নামে একজন মুসলমান কাফেরদের অত্যাচার-নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে মদীনায় পালিয়ে এলেন। ছাকিফ গোত্রের অধিবাসী ছিলেন আবু বাছির। এই গোত্র ছিলো কোরায়শদের মিত্র। কোরায়শরা আবু বাছিরের ফেরতের জন্যে দুইজন লোককে মদীনায় পাঠালো। তাদের বলে পাঠানো হলো যে, আমাদের এবং আপনাদের মধ্যে যে সন্ধি হয়েছে তার শর্ত বাস্তবায়ন করুন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবাগত আবু বাছিরকে তাদের সঙ্গে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন। ওরা তিনজন যুল হোলায়ফা নামক জায়গায় পৌঁছে খেজুর খেতে লাগলো। এমন সময় আবু বাছির ওদের দুইজনের একজনকে বললেন, আল্লাহর শপথ, তোমার

---

৩. ফতহুল বারী, সপ্তম খন্ড. পৃ. ৩৩৯-৪৩৯, সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, ৩৭৮-৪৮১, ২য় খন্ড. পৃ. ৫৯৮-৬০০, ৭১৭, সহীহ মুসলিম, ২য় খন্ড, পৃ. ১০৪, ১০৫, ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, ৩০৮-৩২২ যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, ১২২-১২৭, ও মুখতাছারুস সিরাত, শেখ আবদুল্লাহ, পৃ. ২০৭-৩০৫, তারীখে ওমর ইবনে খাত্তাব, ইবনে জওজী প্রণীত, পৃ. ৩৯-৪০

তলোয়ারটা তো দেখতে বেশ সুন্দর। লোকটি খুশীতে গদগদ হয়ে বললো হাঁ, তাই। আমি একাধিকবার পরীক্ষা করে দেখেছি। হযরত আবু বাছির বললেন, আমাকে একটু দেখাও, আমিও দেখি। লোকটি আবু বাছিরের হাতে তলোয়ার তুলে দিলো। আবু বাছির সাথে সাথে লোকটিকে হত্যা করলেন।

অন্য লোকটি পালিয়ে মদীনায় এসে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দেখে মন্তব্য করলেন যে, এই লোকটি বিপদ দেখেছে। সেই লোক আল্লাহর রসূলের কাছে এসে বললো, আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে। আর আমাকেও হত্যা করা হবে। এমন সময় আবু বাছির ফিরে এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহ তায়ালা আপনার অঙ্গীকার পূর্ণ করে দিয়েছেন। আপনি আমাকে তাদের সঙ্গে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, এরপর আল্লাহ তায়ালা আমাকে ওদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওর মায়ের ক্ষতি হোক। ওর কোন সাক্ষী মিলে গেলে তো সে যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়ে দেবে। একথা শুনে আবু বাছির বুঝলেন যে, এবার তাকে কাফেরদের হাতে তুলে দেয়া হবে। এ কারণে তিনি মদীনা থেকে বেরিয়ে সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় চলে গেলেন। এদিকে আবু জান্দাল ইবনে সোহায়েল মক্কা থেকে পালিয়ে আবু বাছিরের সঙ্গে মিলিত হলেন। কোরায়শদের মধ্যেকার যারাই ইসলাম গ্রহণ করতো, তারাই আবু বাছিরের সাথে এসে মিলিত হতো। সেখানে একটি দল গড়ে উঠলো। এরপর এরা সিরিয়ায় যাতায়াতকারী কোরায়শদের বাণিজ্য কাফেলা লুণ্ঠন করতো এবং কাফেলার লোকদের নির্মমভাবে প্রহার করতো। কোরায়শরা অতিষ্ঠ হয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিকটাত্মীয়তার দোহাই দিয়ে আবেদন জানালো যে, আপনি ওদেরকে নিজের কাছে ডেকে নিন। এরপর থেকে মক্কার কোন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করে আপনার কাছে গেলে তারা নিরাপদ থাকবে। তাদের ব্যাপারে আমরা প্রশ্ন তুলব না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর সমুদ্র উপকূলীয় মুসলমানদের মদীনায় ডেকে আনলেন।[৪]

কোরায়শদের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ইসলাম গ্রহণ

সন্ধির পর সপ্তম হিজরীর প্রথম দিকে হযরত আমর ইবনুল আস, খালেদ ইবনে ওলীদ ও ওসমান ইবনে তালহা (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। এরা আল্লাহর রসূলের কাছে হাযির হলে তিনি বললেন, মক্কা তাদের কলিজার টুকরোদের আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে।[৫]

হোদায়বিয়ার সন্ধি ছিলো প্রকৃতপক্ষে ইসলাম এবং মুসলমানদের জীবনে পরিবর্তনের সূচনা। ইসলামের প্রতি শত্রুতায় কোরায়শরা সবচেয়ে মজবুত, হঠকারি এবং যুদ্ধংদেহী ছিলো। যুদ্ধের ময়দান থেকে শান্তির ক্ষেত্রে আসার ফলে খন্দকের যুদ্ধের সময়কালের তিনবাহু অর্থাৎ কোরায়শ, গাতফান এবং ইহুদী এই তিনটির একটি বাহু ভেঙ্গে গেলো। কোরায়শরা ছিলো সমগ্র জাযিরাতুল আরবে মূর্তিপূজার একচ্ছত্র প্রতিনিধি ও পৃষ্ঠপোষক। যুদ্ধের ময়দান থেকে দূরে সরে যাওয়ার পর তাদের মূর্তিপূজার উদ্দীপনাও যেন স্তিমিত হয়ে গেলো। তাদের শত্রুতামূলক আচরণের ক্ষেত্রেও

---

৪. ৩ নং টীকায় উল্লেখ্য গ্রন্থাবলী দ্রষ্টব্য।

৫. উল্লিখিত সাহাবাদের ইসলাম গ্রহণের সময় সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। আসমায়ে রেজালের বিভিন্ন গ্রন্থে অষ্টম হিজরীর কথা উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু আমর ইবনুল আস নাজ্জাশীর দরবারে ইসলাম গ্রহণ করেছেন বলে সবাই জানে। এটা হচ্ছে অষ্টম হিজরীর ঘটনা। আমর হাবশা থেকে ফেরার পথে খালেদ এবং ওসমান ইবনে তালহার সাথে তার সাক্ষাৎ হয় এবং তিনজন একত্রে আল্লাহর রসূলের কাছে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এতে বোঝা যায় যে, এরাও সপ্তম হিজরীর প্রথমদিকে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। আল্লাহ পাকই সবকিছু ভালো জানেন।

লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন সূচিত হলো। এ কারণেই দেখা যায় যে, সন্ধির পর গাতফান গোত্রের পক্ষ থেকে তেমন কোন শত্রুতামূলক আচরণ করা হয়নি। তারা কিছু করলেও ইহুদীদের উস্কানিতেই করেছে।

ইহুদীরা মদীনা থেকে বহিষ্কারের পর খয়বরকেই নিজেদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের আখড়া হিসাবে গড়ে তোলে। সেখানে তাদের শয়তান আন্ডাবাচ্চা দিচ্ছিলো। তারা ফেতনার আগুন জ্বালানোর কাজে নিয়োজিত ছিলো। ইহুদীরা মদীনার আশেপাশের বেদুইনদের উস্কানি দিচ্ছিলো এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের ধ্বংস করে দেয়া অথবা বড় ধরনের কোন ক্ষতি করার চক্রান্ত করছিলো। এসব কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হোদায়বিয়ার সন্ধির পর সর্বপ্রথম ইহুদীদের দুষ্কৃতির আখড়া সমূলে উৎপাটনে মনোযোগী হন।

মোটকথা হোদায়বিয়ার সন্ধির পর শান্তির যে নবযুগ শুরু হয়েছিলো, এতে মুসলমানরা ইসলামের দাওয়াত, প্রচার এবং দ্বীনের তাবলীগ করার গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ লাভ করেছিলো। দাওয়াত ও তাবলীগের ময়দানে মুসলমানদের তৎপরতা এ সময়ে তাই বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিলো। যুদ্ধের তৎপরতাকে এই তাবলীগী তৎপরতা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। সেই সময়কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

যুদ্ধের তৎপরতায় আগে দাওয়াত ও তাবলীগের তৎপরতার প্রতি প্রথমে আলোকপাত করাই সমীচীন। কেননা তাবলীগী কাজই অগ্রাধিকার পাওয়ার উপযুক্ত এবং ইসলামের প্রকৃত কাজও সেটাই। এই তাবলীগী কাজের প্রচার প্রসারের জন্যেই মুসলমানরা এতোবেশী বিপদ, মুসিবত, অশান্তি, যুদ্ধ, হাঙ্গামা ও বিশৃঙ্খলা সহ্য করেছিলেন।

বাদশাহ এবং আমীরদের নামে চিঠি

ষষ্ঠ হিজরীর শেষদিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হোদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার পর বিভিন্ন বাদশাহ ও আমীরের নামে চিঠি প্রেরণ করে তাদের ইসলামের দাওয়াত দেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব চিঠি প্রেরণের ইচ্ছা করলে তাঁকে বলা হয় যে, চিঠিতে সীলমোহর দেয়া হলেই বাদশাহ তা গ্রহণ করবেন। এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রূপার আংটি তৈরী করেন, এতে মোহাম্মদ, রসূল ও আল্লাহ এইশব্দ তিনটি খোদাই করা হয়েছিলো। আল্লাহ ১ম, রসূল ২য় এবং মোহম্মদ ৩য় লাইনে লেখা হয়।[১]

চিঠি লেখানোর পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সাহাবাদের কয়েকজনকে চিঠিসহ বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন। খয়বর রওয়ানা হওয়ার কয়েকদিন আগে সপ্তম হিজরীর ১লা মহররম তারিখে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সকল দূত প্রেরণ করেন।[২] নীচে সে সম্পর্কে আলোকপাত করা যাচ্ছে।

এক) হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর নামে—

নাজ্জাশীর প্রকৃত নাম ছিলো আসহাম ইবনে আলজাবার। আল্লাহর রসূল চিঠি লেখানোর পর আমর ইবনে উমাইয়া জামরির হাতে ষষ্ঠ হিজরীর শেষে বা সপ্তম হিজরীর শুরুতে এটি প্রেরণ করেন। আল্লামা তিবরি চিঠির বক্তব্যও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু চিঠির বক্তব্য ভালোভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, হোদায়বিয়ার সন্ধির পর লেখা চিঠি এটি নয়। মক্কায় অবস্থানকালে আল্লাহর রসূল হযরত জাফর তাইয়ারকে হাবশায় হিজরতের সময় যে চিঠি দিয়েছিলেন নাজ্জাশীকে দেয়ার জন্যে এটি মনে হয় সেই চিঠি। কেননা চিঠির শেষে মোহাজেরদের প্রসঙ্গ এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, আমি আপনার কাছে আমার চাচাতো ভাই জাফরকে মুসলমানদের একটি জামাতের সাথে পাঠিয়েছি। ওরা আপনার কাছে পৌঁছুলে আপনি ওদের আপনার তত্ত্বাবধানে রাখবেন এবং কোন প্রকার জবরদস্তি করবেন না।

ইমাম বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে আরো একখানি চিঠির কথা উল্লেখ করেছেন সেটিও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজ্জাশীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। চিঠির বক্তব্য এরূপ: 'এই চিঠি নবী মোহাম্মদের পক্ষ থেকে হাবশার বাদশাহ আসহামের নামে। যিনি হেদায়েতের অনুসরণ করবেন এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবেন তার ওপর সালাম। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত এবাদাতের উপযুক্ত কেউ নেই। তাঁর স্ত্রী পুত্র কিছু নেই। আমি একথাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মোহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রসূল। আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি, কেননা আমি আল্লাহর রসূল। কাজেই ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। হে আহলে কেতাব, এমন একটি বিষয়ের প্রতি আসুন, যা আমাদের এবং আপনাদের মধ্যে সমান। আমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো এবাদাত করবো না। তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবো না, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে প্রভু হিসাবে স্বীকার করবো না। যদি কেউ এ বিশ্বাস গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়,

---

১. সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড ৮৭২, ৮৭২

২. রহমতুল লিল আলামীন, ১ম খন্ড, পৃ. ১৭১

তবে তাকে বলুন যে, সাক্ষী থাকো, আমি মুসলমান। যদি আপনি এই দাওয়াত গ্রহণ না করেন, তবে আপনার ওপর আপনার কওমের নাছারাদের সমুদয় পাপ বর্তাবে।

প্যারিসের ডক্টর মোঃ হামিদুল্লাহ আরো একখানি চিঠির বক্তব্য উল্লেখ করেছেন। সেটির সন্ধান পাওয়া গেছে। এ চিঠিখানি একটি শব্দের পার্থক্যসহ আল্লামা ইবনে কাইয়েমের লেখা গ্রন্থ যাদুল মায়াদ-এ উল্লেখ রয়েছে। ডক্টর সাহেব চিঠির বক্তব্যের সততা নিরূপণের যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন।

বর্তমান যুগে প্রকাশিত এ চিঠির ফটোকপি ডক্টর হামিদুল্লাহ তাঁর গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। এর অনুবাদ নিম্নরূপ। পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

'আল্লাহর রসূল মোহাম্মদের পক্ষ থেকে হাবশার নাজ্জাশী আযমের প্রতি। সালাম সেই ব্যক্তির ওপর যিনি হেদায়াতের অনুসরণ করেন। আমি আপনার কাছে মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। যিনি কুদ্দুস, যিনি সালাম, যিনি নিরাপত্তা ও শান্তি দেন, যিনি হেফাযতকারী ও তত্ত্বাবধায়নকারী। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ঈসা ইবনে মরিয়ম আল্লাহর রূহ এবং তাঁর কলেমা। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পবিত্র ও সতী মরিয়মের ওপর স্থাপন করেছেন। আল্লাহর রূহ এবং ফুঁ-এর কারণে হযরত মরিয়ম (আ.) গর্ভবতী হলেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম আলাইহিস সালামকে নিজের হাতে তৈরী করেছিলেন। এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর আনুগত্যের প্রতি পরস্পরকে দাওয়াত দিচ্ছি। এছাড়া একথার প্রতিও দাওয়াত দিচ্ছি যে, আপনি আমার আনুগত্য করুন এবং আমি যা কিছু নিয়ে এসেছি, তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করুন। কেননা আমি আল্লাহর রসূল, আমি আপনাকে এবং আপনার সেনাদলকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আমি তাবলীগ ও নসিহত করেছি। কাজেই আমার তাবলীগ ও নসিহত কবুল করুন। (পরিশেষে) সালাম সেই ব্যক্তির ওপর, যিনি হেদায়াতের আনুগত্য করেন।[৩]

ডক্টর মোঃ হামিদুল্লাহ দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেছেন যে, এই চিঠিই সেই চিঠি, যা হোদায়বিয়ার সন্ধির পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজ্জাশীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। এই চিঠি সম্পর্কিত বর্ণনাসূত্রের প্রতি লক্ষ্য করলে এ বক্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন কারণ থাকে না। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হোদায়বিয়ার সন্ধির পর এই চিঠিই পাঠিয়েছিলেন, এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং ইমাম বায়হাকি যে চিঠি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা.) বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, তার সাথে অন্যান্য বাদশাহর চিঠির বিবরণ অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয়। কেননা ইমাম বায়হাকি সঙ্কলিত চিঠিপত্রের সাথে কোরআনের 'হে আহলে কেতাবরা' সম্বোধন সম্বলিত আয়াত রয়েছে। এ ধরনের আয়াত অন্যান্য ইমামদের সংকলিত চিঠির মধ্যেও উল্লেখ রয়েছে। ইমাম বায়হাকি সঙ্কলিত চিঠিতে হাবশার বাদশাহর নাম আসহামা উল্লেখ রয়েছে। ডক্টর হামিদুল্লাহ সঙ্কলিত চিঠিতে কারো নাম উল্লেখ নেই। এমতাবস্থায় আমার ধারণা হচ্ছে যে, ডক্টর সাহেবের চিঠি প্রকৃতপক্ষে সেই চিঠি, যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসহামের মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্তের নামে লিখেছিলেন। সম্ভবত এ কারণেই চিঠিতে কারো নাম ছিলো না।

---

৩. রসূলুল্লাহর রাজনৈতিক জীবন, ডক্টর মোঃ হামিদুল্লাহ। পৃ. ১০৮, ১০৯, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, যাদুল মায়াদ গ্রন্থে শেষ শব্দ যে ব্যক্তি হেদায়াতের আনুগত্য করেন-এর পরিবর্তে রয়েছে 'যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন।' দেখুন যাদুল মায়াদ, তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৬০।

এ বিষয়ে আমার কাছে কোন প্রমাণ নেই। বরং সেইসব অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্যই হচ্ছে ভিত্তি, যা চিঠির বক্তব্য থেকে গ্রহণ করা যায়। তবে ডক্টর হামিদুল্লাহ সাহেব সম্পর্কে বিস্ময় জাগে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত বায়হাকির উদ্ধৃত চিঠিতে পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে আল্লাহর রসূলের সেই চিঠি বলে উল্লেখ করেছেন যে চিঠি আসহামার মৃত্যুর পর তার উত্তরসূরীর নামে লিখা হয়েছিলো। অথবা আসহামাকে লেখা চিঠিতে সুস্পষ্টভাবে তার নাম লেখা রয়েছে।

মোটকথা, আমর ইবনে উমাইয়া জামরি আল্লাহর রসূলের চিঠি নাজ্জাশীর কাছে প্রদান করেন। নাজ্জাশী সেই চিঠি চোখে লাগান এবং সিংহাসন ছেড়ে নীচে নেমে আসেন। এরপর তিনি হযরত জাফর ইবনে আবু তালেবের হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রেরিত চিঠির জবাবে তিনি একখানি চিঠি মদীনায় প্রেরণ করেন। সেই চিঠির বক্তব্য নিম্নরূপ।

পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আল্লাহর রসূল মোহাম্মদের নামে

নাজ্জাশী আসহামার পক্ষ থেকে।

হে আল্লাহর নবী, আপনার উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে ছালাম, তাঁর রহমত ও বরকত নাযিল হোক। সেই আল্লাহর পক্ষ থেকে, যিনি ব্যতীত এবাদাতের উপযুক্ত কেউ নেই। অতপর, হে আল্লাহর রসূল, আপনার চিঠি আমার হাতে পৌঁছেছে। এ চিঠিতে আপনি হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। আসমান ও যমিনের মালিক আল্লাহর শপথ, আপনি যা কিছু উল্লেখ করেছেন হযরত ঈসা (আ.) এর চেয়ে বেশী কিছু ছিলেন না। তিনি সেইরূপ ছিলেন আপনি যেরূপ উল্লেখ করেছেন।[৫] আপনি আমার কাছে যা কিছু লিখে পাঠিয়েছেন, আমি তা জেনেছি এবং আপনার চাচাতো ভাই এবং আপনার সাহাবাদের মেহমানদারী করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর সত্য ও খাঁটি রসূল। আমি আপনার কাছে বাইয়াত করছি, আপনার চাচাতো ভাইয়ের বাইয়াত করছি এবং তাঁর হাতে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের জন্যে ইসলাম কবুল করেছি।[৬]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাজ্জাশীর কাছে একথাও দাবী করেছেন, তিনি যেন হযরত জাফর এবং হাবশায় অন্যান্য মোহাজেরদের পাঠিয়ে দেন। সেই অনুযায়ী নাজ্জাশী হযরত আমর ইবনে উমাইয়া জামরির সাথে দু'টি কিসতিতে করে সাহাবাদের দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। একটি কিসতিতে হযরত জাফর, হযরত আবু মূসা আশয়রী এবং অন্য কয়েকজন সাহাবা ছিলেন। তাঁরা প্রথমে খয়বরে পৌঁছে সেখান থেকে মদীনায় হাযির হন। অন্য একটি কিসতিতে অধিকাংশ ছিলো শিশু-কিশোর, তারা হাবশা থেকে সরাসরি মদীনায় পৌঁছে।[৭]

উল্লেখ্য, নাজ্জাশী তবুক যুদ্ধের পর নবম হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। আল্লাহর রসূল নাজ্জাশীর ইন্তেকালের তারিখেই তার মৃত্যু সংবাদ সাহাবাদের জানান এবং গায়েবানা জানাযার ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীতে নাজ্জাশীর স্থলাভিষিক্ত বাদশাহর কাছেও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

---

৫. হযরত ঈসা (আঃ) সম্পর্কে নাজ্জাশীর অর্থাৎ আসহামার এই বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর উল্লেখিত চিঠিটি আসহামার নামেই প্রেরিত হয়েছিলো।

৬. যাদুল মায়াদ, ৩য় খন্ড, পৃ. ৬১

৭. যাদুল মায়াদ, ৩য় খন্ড, পৃ. ৬১

ওয়া সাল্লাম একখানি চিঠি লিখেছিলেন, কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন কিনা, সেটা জানা যায়নি।[৮]

দুই) মিসরের বাদশাহ মুকাওকিসের নামে—

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা জোরাইজ ইবনে মাতা'র[৯] কাছেও একখানা চিঠি লিখেছিলেন। জুরাইজের উপাধি ছিলো মুকাওকিস। চিঠির বিবরণ নিম্নরূপ—

'পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল মোহাম্মদের পক্ষ থেকে মুকাওকিস আযম কিবতের নামে। তাঁর প্রতি সালাম, যিনি হেদায়াতের আনুগত্য করেন।

আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। ইসলাম গ্রহণ করলে আল্লাহ তায়ালা আপনাকে দু'টি পুরস্কার দেবেন। আর যদি ইসলাম গ্রহণ না করেন, তবে কিব্তের অধিবাসীদের পাপও আপনার ওপর বর্তাবে। হে কিবতিরা, 'এমন একটি বিষয়ের প্রতি এসো যা আমাদের এবং তোমাদের জন্যে সমান। সেটি এই যে, আমরা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো এবাদাত করবো না এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবো না। আমাদের মধ্যে কেউ যেন আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কাউকে প্রভু হিসাবে না মানে।' যদি কেউ এই দাওয়াত থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, তবে বলে দাও, সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলমান।'[১০]

এই চিঠি পৌঁছানোর জন্যে হযরত হাতেব ইবনে আবি বালতাআকে মনোনীত করা হয়। তিনি মোকাওকিসের দরবারে পৌঁছার পর বলেছিলেন, এই যমিনে আপনার আগেও একজন শাসনকর্তা ছিলেন, যে নিজেকে রব্বে আ'লা মনে করতো। আল্লাহ তায়ালা তাকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদের জন্যে দৃষ্টান্ত করেছেন। প্রথমে তার দ্বারা অন্য লোকদের ওপর প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে এরপর তাকে প্রতিশোধের লক্ষ্যস্থল করা হয়েছে। কাজেই অন্যের ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। এমন যেন না হয় যে, অন্যরা আপনার ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ করবে।'

মুকাওকিস জবাবে বললেন, আমাদের একটি ধর্ম-বিশ্বাস রয়েছে সেই ধর্ম বিশ্বাস আমরা পরিত্যাগ করতে পারি না। যতক্ষণ পর্যন্ত তার চেয়ে উত্তম কোন ধর্ম-বিশ্বাস পাওয়া না যায়।

হযরত হাতেব (রা.) বলেন, আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। এই দ্বীনকে আল্লাহ তায়ালা পূর্ববর্তী সকল দ্বীনের পরিবর্তে যথেষ্ট মনে করেছেন। ইসলামের অর্থাৎ আল্লাহর মনোনীত দ্বীনের নবী মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার পর তার বিরুদ্ধে কোরায়শরা প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। ইহুদীরাও শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র শুরু করে। নাছারারা ছিলো কাছে কাছে। আল্লাহর শপথ,

---

৮. একই গ্রন্থ একই পৃষ্ঠা,

৯. আল্লামা মনসুরপুরী রহমতুল লিল আলামীন গ্রন্থের ১৭৮ পৃষ্ঠায় তার প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। ডক্টর হামিদুল্লাহ তাঁর লিখিত রসূলুল্লাহর রাজনৈতিক জীবন গ্রন্থে এই বাদশাহর নাম বনি ইয়ামিন বলে উল্লেখ করেছেন।

১০. যাদুল মায়াদ গ্রন্থের ৩য় খন্ডের ৬১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কাছে অতীতে এই চিঠি আবিষ্কৃত হয়েছে। ডক্টর হামিদুল্লাহ মুদ্রিত ফটোকপির বিবরণে এবং যাদুল মায়াদ- এর উল্লিখিত বিধির বিবরণের মধ্যে মাত্র দু'টি শব্দের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। রসূলুল্লাহর রাজনৈতিক জীবন, পৃ. ১৩৬-১৩৭ দেকন,

১০. যাদুল মায়াদ গ্রন্থের ৩য় খন্ডের ৬১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিকট অতীতে এই চিঠি আবিষ্কৃত হয়েছে। ডক্টর হামিদুল্লাহ মুদ্রিত ফটোকপির বিবরণে এবং যাদুল মায়াদ- এর উল্লিখিত বিধির বিবরণের মধ্যে মাত্র দু'টি শব্দের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। রসূলুল্লাহর রাজনৈতিক জীবন, পৃ. ১৩৬-১৩৭ দেখুন,

হযরত মূসা (আ.) যেমন হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়েছিলেন একই নিয়মে আমরা আপনাকে কোরআনের দাওয়াত দিচ্ছি, যেমন আপনারা তওরাতের অনুসারীদের ইঞ্জিলের দাওয়াত দিয়ে থাকেন। যে নবী যে কওমকে পেয়ে যান, সেই কওম সেই নবীর উম্মত হয়ে যায় এরপর সেই নবীর আনুগত্য করা উক্ত কওমের জন্যে অত্যাবশ্যক হয়ে যায়।

আপনারা নবাগত নবীর যমানা পেয়েছেন, কাজেই তাঁর আনুগত্য করুন। আপনাকে আমরা দ্বীনে মসীহ থেকে ফিরে আসতে বলছি না, বরং আমরা মূলত সেই দ্বীনের দাওয়াতই দিচ্ছি।

মুকাওকিস বলেন, সেই নবী সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে আমি শুনেছি যে, তিনি কোন অপছন্দীয় কাজের আদেশ দেন না এবং পছন্দনীয় কোন কাজ করতে নিষেধ করেন না। তিনি পথভ্রষ্ট যাদুকর নন, মিথ্যাবাদী জ্যোতিষী নন। বরং আমি দেখেছি যে, তার সাথে নবুয়তের এ নিশানা রয়েছে যে, তিনি গোপনীয় বিষয়কে প্রকাশ করেন এবং অপ্রকাশ্য জিনিস সম্পর্কে খবর দেন। আমি তার দাওয়াত সম্পর্কে আরো চিন্তা-ভাবনা করবো।

মুকাওকিস আল্লাহর রসূলের চিঠি নিয়ে হাতীর দাঁতের একটি কৌটোয় রাখেন এরপর মুখ বন্ধ করে সীল লাগিয়ে তার এক দাসীর হাতে দেন। এরপর আরবী ভাষার কাতেবকে ডেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিম্নোক্ত চিঠি লেখেন।

'পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নাম শুরু করছি। মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর নামে মুকাওকিস আযিম কিবত-এর পক্ষ থেকে। আপনার প্রতি সালাম। আপনার চিঠি পাঠ করেছি। আপনার চিঠির বক্তব্য এবং দাওয়াত আমি বুঝেছি। আমি জানি যে, এখনো একজন নবী আসার বাকি রয়েছে। আমি ধারণা করেছিলাম যে, তিনি সিরিয়া থেকে আবির্ভূত হবেন। আমি আপনার দূতের সম্মান করেছি। আপনার খেদমতে দুইজন দাসী পাঠাচ্ছি। কিবতিদের মধ্যে এদের যথেষ্ট মর্যাদা রয়েছে। আপনার জন্যে কিছু পোশাকও পাঠাচ্ছি। আপনার সওয়ারীর জন্যে একটি খচ্চরও হাদিয়া স্বরূপ পাঠাচ্ছি। আপনার প্রতি সালাম।

মুকাওকিস আর কোন কথা লেখেননি। তিনি ইসলামও গ্রহণ করেননি। তাঁর প্রেরিত দাসীদের নাম ছিলো মারিয়া কিবতিয়া এবং শিরিন। খচ্চরটির নাম ছিলো দুলদুল। এটি হযরত মুয়াবিয়ার (রা.) সময় পর্যন্ত জীবিত ছিলো।[১১] রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারিয়াকে নিজের কাছে রেখেছিলেন। মারিয়ার গর্ভ থেকেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্র ইবরাহীম জন্ম গ্রহণ করেন। শিরিনকে কবি হাস্‌সান ইবনে ছাবেত আনসারীকে দান করা হয়।

তিন) পারস্য সম্রাট খসরু পারভেযের নামে—

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পারস্য সম্রাট কিসরার কাছেও একখানি চিঠি প্রেরণ করেন, সেটি ছিলো নিম্নরূপ —

'পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি—

আল্লাহর রসুল মোহাম্মদের পক্ষ থেকে পারস্যের পারভেযের নামে।'

সালাম সেই ব্যক্তির প্রতি, যিনি হেদায়াতের আনুগত্য করেন এবং আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস-স্থাপন করেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরিক নেই, মোহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রসূল। আমি আপনাকে আল্লাহর প্রতি আহবান জানাচ্ছি। কারণ আমি সকল মানুষের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত।

---

[১১]. যাদুল মায়াদ, ৩য় খন্ড. পৃ. ৬১

যারা বেঁচে আছে, তাদেরকে পরিণাম সম্পর্কে ভয় দেখানো এবং কাফেরদের ওপর সত্য কথা প্রমাণিত করাই আমার কাজ। কাজেই, আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন যদি এতে অস্বীকৃতি জানান, তবে সকল অগ্নি উপাসকের পাপও আপনার ওপরই বর্তাবে।

এ চিঠি নিয়ে যাওয়ার জন্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফা ছাহমিকে (রা.) মনোনীত করা হয়। তিনি চিঠিখানি বাহরাইনের শাসনকর্তার হাতে দেন। বাহরাইনের শাসনকর্তা কোন দূতের মাধ্যমে এ চিঠি পাঠিয়েছিলেন নাকি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হোযাফাকেই প্রেরণ করেছিলেন, সেটা জানা যায়নি। মোটকথা, চিঠিখানি পারভেযকে পড়ে শোনানোর পর সে চিঠিখানি ছিঁড়ে ফেলে অহংকারের সাথে বলে, আমার প্রজাদের মধ্যে একজন সাধারণ প্রজা নিজের নাম আমার নামের আগে লিখেছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর পাওয়ার পর বলেছিলেন, আল্লাহ তায়ালা তার বাদশাহী ছিন্ন ভিন্ন করে দিন। এরপর তাই হয়েছিলো, যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন।

সম্রাট তার ইয়েমেনের গভর্ণর বাযানকে লিখে পাঠালো যে, তোমার ওখান থেকে তাগড়া দু'জন লোককে পাঠাও, তারা যেন হেজাজ গিয়ে সে লোককে আমার কাছে ধরে নিয়ে আসে। বাযান সম্রাটের নির্দেশ পালনের জন্যে দু'জন লোককে তার চিঠিসহ আল্লাহর রসূলের কাছে প্রেরণ করে। প্রেরিত দু'জন লোক মদীনায় আল্লাহর রসূলের কাছে গেলো। তাদের একজন বললো, শাহানশাহ একখানি চিঠি লিখে বাযানকে নির্দেশ দিয়েছে আপনাকে যেন তার দরবারে হাযির করা হয়। বাদশাহ বাযান আমাদেরকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন কাজেই, আপনি আমাদের সঙ্গে পারস্যে চলুন। সাথে সাথে উভয় আগন্তুক হুমকিপূর্ণ কিছু কথাও বললো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শান্তভাবে তাদের বললেন, তোমরা আগামীকাল দেখা করো।

এদিকে পারস্যের খসরু পারভেজের পারিবারিক বিদ্রোহ ও কলহ তীব্ররূপ ধারণ করলো। কায়সারের সৈন্যদের হাতে পারস্যের সৈন্যরা একের পর এক পরাজয় স্বীকার করে যাচ্ছিলো। পরিণামে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে সম্রাটের পুত্র শিরওয়াই নিজের পিতাকে হত্যা করে নিজেই ক্ষমতা দখল করলো। সময় ছিলো মঙ্গলবার রাত্রি। সপ্তম হিজরীর ১০ই জমাদিউল আউয়াল[১২] রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহীর মাধ্যমে এ খবর পেলেন। পরদিন সকালে দুই প্রতিনিধি আল্লাহর রসূলের দরবারে এলে তিনি তাদের এ খবর জানালেন। তারা বললো, আপনি এসব আবোল-তাবোল কি বলছেন? এর চেয়ে ছোট কথাও আমরা আপনার অপরাধ হিসাবে গণ্য করেছি। আমরা কি আপনার এ কথা বাদশাহর কাছে লিখে পাঠাব! রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাঁ, লিখে দাও। সাথে সাথে একথাও লিখে দাও যে, আমার দ্বীন এবং আমার হুকুমত সেখানেও পৌঁছুবে, যেখানে তোমাদের বাদশাহ পৌঁছেছে। শুধু তাই নয়, বরং এমন জায়গায়ও পৌঁছুবে, যার পরে উট বা ঘোড়া যেতে পারবে না। তোমরা তাকে একথাও জানিয়ে দিয়ো যে, যদি সে মুসলমান হয়ে যায়, তবে যা কিছু তার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সেসব তাকে দিয়ে দেয়া হবে এবং তাকেই আমরা তার কওমের বাদশাহ করে দেবো।

উভয় দূত এরপর মদীনা থেকে ইয়েমেনে বাযানের কাছে যায় এবং তাকে সবকথা জানায়। কিছুক্ষণ পরই ইয়েমেনে এক চিঠি এসে পৌঁছায় যে, শিরওয়াই তার পিতাকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। নতুন সম্রাট তার চিঠিতে ইয়েমেনের গবর্নর বাযানকে এ নির্দেশও দিয়েছেন যে, আমার পিতা যার সম্পর্কে লিখেছিলেন পরবর্তী নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত তাকে বিরক্ত করবেন না।

---

১২. ফহতুল বারী, ৮ম খন্ড, পৃ. ১২৭

এই ঘটনার কারণে বাযান এবং তার পারস্যের বন্ধু-বান্ধব, যারা সেই সময় ইয়েমেনে উপস্থিত ছিলেন, সকলেই ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যান।[১৩]

চার) রোমক সম্রাট কায়সারের নামে—

সহীহ বোখারীতে একটি দীর্ঘ হাদীসে এ চিঠির বিবরণ উল্লেখ রয়েছে। রসূল রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে যে চিঠি লিখেছিলেন, সে চিঠির বিবরণ নিম্নরূপ—

পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল মোহাম্মদের পক্ষ থেকে রোমের মহান হিরাক্লিয়াসের প্রতি।

সালাম সেই ব্যক্তির প্রতি, যিনি হেদায়াতের আনুগত্য করেন। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে শান্তিতে থাকবেন। যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে দুই রকমের পুরস্কার পাবেন। যদি অস্বীকৃতি জানান, তবে আপনার প্রজাদের পাপও আপনার ওপর বর্তাবে। হে আহলে কিতাব, এমন একটি বিষয়ের প্রতি আসুন, যা আমাদের ও আপনাদের জন্যে একই সমান। সেটি হচ্ছে যে, আমরা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা আনুগত্য করবো না। আল্লাহ ব্যতীত আমাদের কাউকে শরিক করবো না। আল্লাহ ব্যতীত আমাদের কেউ পরস্পরকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করবো না। যদি লোকেরা অমান্য করে, তবে তাদের বলে দিন যে, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি।[১৪]

এই চিঠি পৌঁছানোর জন্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত দেহিয়া ইবনে খলীফা কালবিকে মনোনীত করেন। তাকে বলা হয়, তিনি যেন এই চিঠি বসরার শাসনকর্তার হাতে দেন। বসরার শাসনকর্তা সেটি সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে পৌঁছে দেবেন। এরপর যা কিছু হয়েছে, তার বিবরণ সহীহ বোখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব তাকে বলেছেন যে, সম্রাট হিরাক্লিয়াস তাকে কোরায়শদের একদল লোকের সাথে তাঁর দরবারে আমন্ত্রণ জানান। হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্তানুযায়ী এই কাফেলা ব্যবসায়ের মালামাল নিয়ে সিরিয়ার ব্যবসার জন্যে গিয়েছিলো। কাফেলা ইলিয়া অর্থাৎ বায়তুল মাকদেসে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দরবারে হাযির হলেন।[১৫] সম্রাট তাদের কাছে ডাকলেন। সে সময় দরবারে দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সম্রাট হিরাক্লিয়াস মক্কার বাণিজ্য প্রতিনিধিদলকে সামনে রেখে তার দোভাষীকে তলব করেন। এরপর দোভাষীর মাধ্যমে জিজ্ঞাসা করেন যে, যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করেন তার সাথে বংশগত সম্পর্কের দিক থেকে তোমাদের মধ্যে কে কাছাকাছি? আবু সুফিয়ান বলেন, আমি তখন বাদশাহকে জানালাম যে, আমিই তার কাছাকাছি। হিরাক্লিয়াস তখন বললেন, ওকে আমার কাছাকাছি নিয়ে এসো। আর তার সঙ্গীদের তার পেছনে বসাও। এরপর হিরাক্লিয়াস তার

---

১৩. মুহাদিরাতে খাযরামি, ১ম খন্ড, পৃ. ১৪৭, ফতহুল বারী, অষ্টম খন্ড, পৃ. ১২৭, ১২৮, রহমতুল লিল আলামিন

১৪. সহীহ বোখারী, ২ম খন্ড, পৃ. ৪, ৫

১৫. সেই সময় সম্রাট হিরাক্লিয়াস হামস থেকে বায়তুল মাকদেস গিয়েছিলেন। পারস্যের সাথে যুদ্ধে জয়লাভ করায় আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্যই সম্রাট বায়তুল মাকদেস গিয়েছিলেন। দেখুন সহীহ মুসলিম, ২য় খন্ড, পৃ. ৪-৫। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, খসরু পারভেজের হত্যাকান্ডের পর রোমকরা তাদের হারানো এলাকা পুনরুদ্ধারের শর্তে পারস্য সম্রাটের সাথে সন্ধি করে। সেই ক্রুশও পারস্য ফেরত দেয় যার সম্পর্কে খৃষ্টানদের বিশ্বাস ছিলো যে, ঐ ক্রুশেই হযরত ঈসাকে (আঃ) ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিলো এই সন্ধির পর ফিরে পাওয়া ক্রুশ যথাস্থানে স্থাপন এবং বিরাট বিজয়ের প্রেক্ষিতে আল্লাহ পাকের শোকরিয়া আদায়ের জন্যই সম্রাট হিরাক্লিয়াস ৬২৯ ঈসায়ী সপ্তম হিজরীতে ইলিয়া অর্থাৎ বায়তুল মাকদেস গমন করেন।

দোভাষীকে বললেন, এ লোকটিকে আমি সেই নবীর দাবীদার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবো। যদি সে কোন কথার জবাবে মিথ্যা বলে, তবে তার সঙ্গীদের বলে দাও, তারা যেন সাথে সাথে প্রতিবাদ করে। আবু সুফিয়ান বলেন, আল্লাহর শপথ, যদি মিথ্যা বলার দুর্নাম হওয়ার ভয় না থাকতো, তবে আমি তাঁর সম্পর্কে অবশ্যই মিথ্যা বলতাম।

আবু সুফিয়ান বলেন, সামনে এনে বসানোর পর হিরাক্লিয়াস সর্বপ্রথম আমাকে প্রশ্ন করেন যে, তোমাদের মধ্যে সে লোকটির বংশ মর্যাদা কেমন?

আমি ঃ তিনি উচ্চ বংশ মর্যাদার অধিকারী।

হিরোক্লিয়াস ঃ তিনি যা বলেন, এ রকম কথা কি তাঁর আগে তোমাদের মধ্যে অন্য কেউ বলেছিলেন?

আমি ঃ না।

হিরাক্লিয়াস ঃ তার পিতামহের মধ্যে কেউ কি সম্রাট ছিলেন?

আমি ঃ না।

হিরাক্লিয়াস ঃ বড়লোকেরা তার আনুগত্য করেছে, না দূর্বল লোকেরা?

আমি ঃ দূর্বল লোকেরা।

হিরাক্লিয়াস ঃ তাদের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে?

আমি ঃ বেড়েই চলেছে।

হিরাক্লিয়াস ঃ এই ধর্ম বিশ্বাস গ্রহণের পর কেউ কি ধর্মান্তরিত হয়েছে?

আমি ঃ না।

হিরাক্লিয়াস ঃ তিনি যা বলছেন এসব বলার আগে কেউ কি তাকে মিথ্যা বলার জন্যে কখনো অভিযুক্ত করেছে?

আমি ঃ না।

হিরাক্লিয়াস ঃ তিনি কি বিশ্বাসঘাতকতা করেন?

আমি ঃ জ্বী না। তবে বর্তমানে তার সাথে একটি সন্ধিসূত্রে আমরা আবদ্ধ রয়েছি। এ ব্যাপারে তিনি কি করবেন আমরা জানি না। আবু সুফিয়ান বলেন, এই একটি কথা ছাড়া আমি কোন কথা নিজে থেকে সংযোজনের সুযোগ পাইনি।

হিরাক্লিয়াস ঃ তোমরা কি তার সাথে যুদ্ধ করেছো?

আমি ঃ হাঁ।

হিরাক্লিয়াস ঃ তোমাদের এবং তার যুদ্ধ কেমন ছিলো?

আমি ঃ যুদ্ধ আমাদের এবং তার মধ্যে বালতির মতো। কখনো তিনি আমাদের পরাজিত করেন, কখনো আমরা তাকে পরাজিত করি।

হিরাক্লিয়াস ঃ তিনি তোমাদের কি কাজের আদেশ দেন?

আমি ঃ তিনি বলেন, তোমরা শুধু আল্লাহর এবাদাত করো, তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না। তোমাদের পিতা-পিতামহ যা বলতেন সত্যবাদিতা, পরহেযগারি, পাক-পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতা এবং নিকটাত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহারের আদেশ দিয়ে থাকেন।

এরপর হিরাক্লিয়াস তার দোভাষীকে বললেন, এই লোকটিকে বলো যে, আমি যখন নবুয়তের দাবীদারের বংশ মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি, তখন সে বলেছে, তিনি উচ্চ বংশ মর্যাদা সম্পন্ন। নিয়ম হচ্ছে যে, পয়গাম্বর উচ্চ বংশ মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের মধ্য থেকেই প্রেরিত হয়ে থাকেন। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করেছি যে, তাঁর আগে তোমাদের মধ্যে অন্য কেউ এ ধরনের

কথা বলেছিলো কিনা। সে বলেছে যে, বলেনি। যদি অন্য কারো বলা কথারই সে পুনরাবৃত্তি করতো, তবে আমি বলতাম যে এই লোকটি অন্যের বলা কথারই প্রতিধ্বনি করছে। আমি জিজ্ঞাসা করেছি যে, তার বাপ-দাদাদের মধ্যে কেউ বাদশাহ ছিলো কিনা? তুমি বলেছ না, ছিলো না। যদি তার বাপ -দাদাদের মধ্যে কেউ বাদশাহ থাকতো তবে আমি বলতাম যে, এই লোক বাপ-দাদার বাদশাহী দাবী করছে। আমি জিজ্ঞাসা করেছি যে, তিনি যা বলছেন, এর আগে তোমরা তাকে মিথ্যাবাদী হিসাবে অভিযুক্ত করেছিলে কিনা? তুমি বলেছো, না, কাজেই মানুষের ব্যাপারে যিনি মিথ্যা কথা বলেন না, তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে মিথ্যা বলবেন এটা হতেই পারে না। আমি একথাও জিজ্ঞাসা করেছি যে, বড়লোকেরা তার আনুগত্য করছে নাকি দূর্বল লোকেরা? তুমি বলেছ দুর্বল লোকেরা। প্রকৃতপক্ষে দূর্বল লোকেরাই পয়গাম্বরের আগে আনুগত্য করে। আমি জিজ্ঞাসা করেছি যে, তার ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণের পর কেউ ধর্মান্তরিত হয়েছে কিনা, তুমি বলেছো, না। প্রকৃতপক্ষে ঈমানের সজীবতা অন্তরে প্রবেশের পর এরকমই হয়ে থকে। আমি জিজ্ঞাসা করেছি যে, তিনি তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেন কিনা। তুমি বলেছ, না। প্রকৃতপক্ষে পয়গাম্বর এরকমই হয়ে থাকেন। তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না, বিশ্বাসঘাতকতা করেন না। আমি জিজ্ঞাসা করেছি যে, তিনি কি কি কাজের আদেশ দিয়ে থাকেন? তুমি বলেছো যে, তিনি তোমাদেরকে আল্লাহর এবাদাতের আদেশ করেন, তার সাথে কাউকে শরিক না করার আদেশ করেন, মূর্তিপূজা করতে নিষেধ করেন এবং নামায, সত্যবাদিতা, পরহেযগারি, পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার আদেশ দেন। তুমি যা কিছু বলেছো, যদি এসব সত্য হয়ে থাকে তবে তিনি খুব শীঘ্রই আমার দুই পায়ের নীচের জায়গারও মালিক হয়ে যাবেন। আমি জানতাম যে, এই নবী আসবেন কিন্তু আমার ধারণা ছিলো না যে, তিনি তোমাদের মধ্য থেকেই আসবেন। আমি যদি তার কাছে পৌছার কষ্ট স্বীকার করতে সক্ষম হতাম, তবে তাঁর কাছে থেকে তার দুই চরণ ধুয়ে দিতাম।

এরপর হিরাক্লিয়াস রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিঠি চেয়ে নিয়ে পাঠ করলেন। হিরাক্লিয়াস চিঠি পড়া শেষ করার পরই সেখানে শোরগোল শুরু হলো এবং উচ্চস্বরে কথা শোনা গেলো। হিরাক্লিয়াস আমাদের ব্যাপারে আদেশ দিলেন এবং আমাদেরকে বাইরে বের করে দেয়া হলো। বাইরে এসে সঙ্গীদের আমি বললাম, আবু কাবশার[১৬] পুত্রের ঘটনাতো বেশ সিরিয়াস হয়ে উঠেছে। ওকে তো দেখছি বনু আসফারের[১৭] অর্থাৎ রোমীয়দের বাদশাহও ভয় পায়। এরপর আমি সব সময় এ বিশ্বাস পোষণ করতাম যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বীন বিজয়ী হবেই। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এরপর আমার মাঝে ইসলামের আলো জ্বেলে দিয়েছেন।

রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের প্রতি আল্লাহর রসূলের প্রেরিত চিঠির প্রভাবই ছিলো আবু সুফিয়ানের এই বিবরণী। এ চিঠির একটি প্রভাব এটাও ছিলো যে, সম্রাট হিরাক্লিয়াস রসূল

---

১৬. আবু কাবশার পুত্র বলতে আল্লাহর রসূলকেই বোঝানো হয়েছে। আবু কাবশা তার দাদা বা নানাদের মধ্যে কারো কুনিয়ত ছিলো। এমনও বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর দুধ মা হালিমার স্বামীর কুনিয়ত ছিলো আবু কাবশা। মোটকথা আবু কাবশা নাম তেমন পরিচিত নয়। আরবদের নিয়ম ছিলো যে, তারা কারো সমালোচনা করলে তাকে তার বাপদাদাদের মধ্যেকার অপরিচিত কোন লোকের সাথে সম্পৃক্ত করা হতো।

১৭. বনু আসফার। আসফারের সন্তান। আসফার অর্থ পীত। রোমীয়দের বনু আসফার বলা হতো। রোমের যে লোকের সাথে রোমীয়দের বংশগত সম্পর্ক ছিলো, সে কোন কারণে আসফার অর্থাৎ পীত উপাধিতে পরিচিত হয়েছেন।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পত্র বাহক হযরত দেহিয়া কালবিকে (রা.) বেশ কিছু ধন-সম্পদ ও মালামাল প্রদান করেন। হযরত দেহইয়া (রা.) সেসব জিনিস নিয়ে মদীনায় ফেরার পথে হুসমা নামক জায়গায় জোযাম গোত্রের কিছু লোক ডাকাতি করে সব কিছু নিয়ে যায়। মদীনায় পৌঁছে হযরত দেহইয়া (রা.) নিজের বাড়ীতে না গিয়ে প্রথমে আল্লাহর রসূলের দরবারে গিয়ে সব কথা তাঁর কাছে ব্যক্ত করেন। সব শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যায়েদ ইবনে হারেছার (রা.) নেতৃত্বে পাঁচশত সাহাবাকে হুসমা অভিযানে প্রেরণ করেন। হযরত যায়েদ (রা.) জোযাম গোত্রের লোকদের ওপর অতর্কিতে হামলা চালিয়ে তাদের বেশ কিছু লোককে হত্যা করেন। এরপর তাদের পশুপাল ও মহিলাদের মদীনায় হাঁকিয়ে নিয়ে আসেন। পশুপালের মধ্যে এক হাজার উট এবং পাঁচ হাজার বকরি ছিলো। বন্দীদের মধ্যে একশত নারী ও শিশু ছিলো।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং জোযাম গোত্রের মধ্যে আগে থেকেই সমঝোতা চুক্তি চলে আসছিলো। এ কারণে উক্ত গোত্রের একজন সর্দার যায়েদ ইবনে রেফায়া তড়িঘড়ি করে আল্লাহর রসূলের দরবারে গিয়ে প্রতিবাদ ও ফরিয়াদ জানান। যায়েদ ইবনে রেফায়া অনেক আগেই জোযাম গোত্রের বেশ কিছু লোকসহ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত দেহইয়া কালবীর ওপর হামলা হলে তাঁরা তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রতিবাদ ও ফরিয়াদ গ্রহণ করেন এবং গনীমতের মাল বন্দীদের ফেরত দেন। সীরাত রচয়িতাদের অনেকেই এ ঘটনা হোদায়বিয়ার সন্ধির আগে ঘটেছে বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা ভুল। কেননা কায়সার হিরাক্লিয়াসের কাছে হোদায়বিয়ার সন্ধির পরই চিঠি প্রেরণ করা হয়েছিলো। এ কারণে আল্লামা ইবনে কাইয়েম লিখেছেন, এ ঘটনা নিঃসন্দেহে হোদায়বিয়ার সন্ধির পরের ঘটনা।[১৮]

পাঁচ) মুনযের ইবনে ছাদির নামে—

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুনযের ইবনে ছাদির কাছে একখানি চিঠি লিখে তাকেও ইসলামের দাওয়াত দেন। মুনযের ছিলেন বাহরাইনের শাসনকর্তা। এ চিঠি হযরত আলা ইবনে হাযরামির হাতে প্রেরণ করা হয়েছিলো। জবাবে মুনযের আল্লাহর রসূলকে লিখেছিলেন, হে আল্লাহর রসূল, আপনার চিঠি আমি বাহরাইনের অধিবাসীদের পড়ে শুনিয়েছি। কিছু লোক ইসলামকে পছন্দ করেছেন ও পবিত্রতার দৃষ্টিতে দেখেছেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেছেন, আবার অনেকে পছন্দ করেননি। এখানে ইহুদী এবং অগ্নি উপাসকও রয়েছে। আপনি ওদের ব্যাপারে আমাকে নির্দেশ দিন। এর জবাবে রসূল সঃ) যে চিঠি লিখেছেন, তা নিম্নরূপ।

পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর'নামে শুরু করছি।

আল্লাহর রসূল মোহাম্মদের পক্ষ থেকে মুনযের ইবনে ছাদির নামে। আপনার প্রতি সালাম। আমি আপনার কাছে আল্লাহর প্রশংসা করছি যিনি ব্যতীত এবাদাত পাওয়ার উপযুক্ত কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মোহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল।

অতপর আমি আপনাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। মনে রাখবেন, যে ব্যক্তি ভালো কাজ করবেন, তিনি নিজের জন্যেই সেসব করবেন। যে ব্যক্তি আমার দূতদের আনুগত্য করবে এবং তাদের আদেশ মান্য করবে, সে ব্যক্তি আমারই আনুগত্য করেছে বলে মনে করা হবে। যারা আমার দূতদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে তারা আমার সাথে ভালো ব্যবহার করেছে বলে মনে করা হবে। আমার দূতরা আপনার প্রশংসা করেছেন। আপনার জাতি সম্পর্কে

---

১৮. যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ১২২. হাশিয়া তালকিহুল ফুহুম. পৃ. ২৯

আপনার সুপারিশ আমি গ্রহণ করেছি। কাজেই মুসলমান যে অবস্থায় ঈমান আনে, তাদের সেই অবস্থায় ছেড়ে দিন। আমি দোষীদের ক্ষমা করে দিয়েছি, আপনিও ওদের ক্ষমা করুন। আপনি যতদিন সঠিক পথ অনুসরণ করবেন, ততোদিন আপনাকে আমি বরখাস্ত করবো না। যারা ইহুদী ধর্ম-বিশ্বাসের ওপর রয়েছে এবং যারা অগ্নি উপাসনা করছে, তাদেরকে জিযিয়া দিতে হবে।[১৯]

ছয়) ইয়ামামার শাসনকর্তার নামে—

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামামার শাসনকর্তা হাওজা ইবনে আলীর কাছে নিম্নোক্ত চিঠি প্রেরণ করেন।

পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আল্লাহর রসূল মোহাম্মদের পক্ষ থেকে হাওজা ইবনে আলীর কাছে চিঠি।

সেই ব্যক্তির ওপর সালাম, যিনি হেদায়েতের অনুসরণ করেন। আপনার জানা থাকা উচিত যে, আমার দ্বীন উট ও ঘোড়ার গন্তব্যস্থল পর্যন্ত প্রসার লাভ করবে। কাজেই ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। আপনার অধীনে যা কিছু রয়েছে, যে সবকে আপনার জন্যে অক্ষুণ্ন রাখা হবে।

এ চিঠি পৌঁছানোর জন্যে দূত হিসাবে সালীত ইবনে আমর আমেরিকে মনোনীত করা হয়। হযরত ছালীত সীলমোহর লাগানো এই চিঠি নিয়ে ইয়ামামায় শাসনকর্তা হাওযার দরবারে পৌঁছেন। হাওযা তাকে নিজের মেহমান হিসাবে গ্রহণ করে মোবারকবাদ দেন। হযরত ছালিত চিঠিখানি শাসনকর্তাকে পড়ে শোনান। তিনি মাঝামাঝি ধরনের জবাব দেন। এরপর আল্লাহর রসূলের কাছে লিখিত জবাব দেন। জবাব নিম্নরূপ।

'আপনি যে জিনিসের দাওয়াত দিচ্ছেন, তার কল্যাণময়তা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রশ্নাতীত। আরবদের ওপর আমার প্রভাব রয়েছে। কাজেই আপনি আমাকে কিছু কাজের দায়িত্ব দিন, আমি আপনার আনুগত্য করবো।'

শাসনকর্তা হাওযা আল্লাহর রসূলের দূতকে কিছু উপঢৌকনও প্রদান করেন। মূল্যবান পোশাকও সেই উপঢৌকনের মধ্যে ছিলো। হযরত ছালীত সেইসব সামগ্রী নিয়ে আল্লাহর রসূলের দরবারে আসেন এবং তাঁকে সব কিছু অবহিত করেন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ চিঠি পাঠ শেষে মন্তব্য করেন যে, সে যদি এক টুকরো জমিও আমার কাছে চায়, তবু আমি তাকে দেব না। সে নিজেও ধ্বংস হবে এবং যা কিছু তার হাতে রয়েছে, সেসবও ধ্বংস হবে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয় থেকে ফিরে আসার পর হযরত জিবরাঈল (আ.) তাঁকে খবর দিলেন যে, হাওযা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতপর সাহাবাদের বললেন, শোনো, ইয়ামামায় একজন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে এবং আমার পরে সে নিহত হবে। একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসূল, তাকে কে হত্যা করবে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি এবং তোমার সাথী।

পরবর্তীকালে আল্লাহর রসূলের কথাই সত্য প্রমাণিত হয়েছিলো।

---

১৯. যাদুল মায়াদ, ৩য় খন্ড, পৃ. ৬১-৬২, এ চিঠি নিকট অতীতে আবিষ্কৃত হয়েছে। ডক্টর হামিদুল্লাহ এ চিঠির ফটোকপি প্রকাশ করেছেন। যাদুল মায়াদ এবং ফটোকপির বিবরণের মধ্যে একটি শব্দের রদবদল রয়েছে। ফটোকপিতে রয়েছে 'লা ইলাহা ইল্লা হুয়া' এবং যাদুল মাআদে রয়েছে 'লা ইলাহা গায়রুহু'।

সাত) দামেশকের শাসনকর্তা গাসসানির নামে—

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দামেশকের শাসনকর্তা হারেছ ইবনে আবু শিমার গাসসানির কাছে নিম্নোক্ত চিঠি প্রেরণ করেন।

পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আল্লাহর রসূল মোহাম্মদের পক্ষ থেকে হারেছ ইবনে আবু শিমারের নামে।

সেই ব্যক্তির প্রতি সালাম, যিনি হেদায়াতের অনুসরণ করেন, ঈমান আনেন এবং সত্যতা স্বীকার করেন। আপনাকে আমি আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দিচ্ছি, যিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং যাঁর কোন শরিক নেই। ইসলামের দাওয়াত কবুল করুন। আপনাদের জন্যে আপনাদের রাজত্ব স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

এই চিঠি আছাদ ইবনে খোজায়মা গোত্রের সাথে সম্পর্কিত সাহাবী হযরত সুজা ইবনে ওয়াহাবের হাতে প্রেরণ করা হয়। হারেছের হাতে এ চিঠি দেয়ার পর তিনি বলেন, আমার বাদশাহী আমার কাছ থেকে কে ছিনিয়ে নিতে পারে? শীঘ্রই আমি তার বিরুদ্ধে হামলা করতে যাচ্ছি। এই বদনসীব ইসলাম গ্রহণ করেনি।

আট) আম্মানের বাদশাহের নামে

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম আম্মানের বাদশাহ যেফার এবং তার ভাই আবদের নামেও একখানা চিঠি লিখেন। তাদের পিতার নাম ছিলো জলনদি। চিঠির বক্তব্য নিম্নরূপ—

‘পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি,

আবদুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদের পক্ষ থেকে জলনদির দুই পুত্র যেফার ও আবদের নামে।

সালাম সেই ব্যক্তির ওপর, যিনি হেদায়াতের অনুসরণ করেন। অতপর আমি আপনাদের উভয়কে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। কেননা আমি সকল মানুষের প্রতি আল্লাহর রসুল। যারা জীবিত আছে, তাদের পরিণামের ভয় দেখানো এবং কাফেরদের জন্যে আল্লাহর কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যেই আমি কাজ করছি। আপনারা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করলে আপনাদেরকেই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখা হবে। যদি অস্বীকৃতি জানান, তবে আপনার বাদশাহী শেষ হয়ে যাবে। আপনাদের ভূখন্ড ঘোড়ার খুরের নিচে যাবে। আপনাদের বাদশাহীর ওপর আমার নবুয়ত বিজয়ী হবে।’

এ চিঠি পৌঁছানোর জন্যে হযরত আমর ইবনুল আসকে মনোনীত করা হয়। তিনি বলেন, আমি রওয়ানা হয়ে আম্মান গেলাম এবং আবদের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। দুই ভাইয়ের মধ্যে আবদ ছিলেন নরম মেযাজের। তাকে বললাম, আমি আপনার এবং আপনার ভাইয়ের কাছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে দূত হিসাবে এসেছি। তিনি বললেন, আমার ভাই বয়স এবং বাদশাহী উভয় দিক থেকেই আমার চেয়ে বড় এবং অগ্রগণ্য। কাজেই আমি আপনাকে তার কাছে পৌঁছে দিচ্ছি, তিনি নিজেই আপনার আনীত চিঠি পড়বেন। একথার পর আবদ বললেন, আচ্ছা আপনারা কিসের দাওয়াত দিয়ে থাকেন?

আমি ঃ আমরা আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিয়ে থাকি। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর কোন শরীক নেই। আমরা বলে থাকি যে, আল্লাহ ব্যতীত যার এবাদত করা হয়, তাকে ছেড়ে দিন এবং এ সাক্ষ্য দিন যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রসূল।

আবদ ঃ হে আমর, আপনি আপনার কওমের সর্দারের পুত্র। বলুন, আপনার পিতা কি করেছিলেন? আপনার পিতার কর্মপদ্ধতি আমাদের জন্যে অনুসরণযোগ্য হবে?

আমি : তিনি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর বিশ্বাস স্থাপনের আগেই ইন্তেকাল করেছেন। আমার খুবই আফসোস হচ্ছে, যদি তিনি ইসলাম গ্রহণ এবং আল্লাহর রসূলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতেন, কি যে ভালো হতো। আমি নিজেও অবিশ্বাসী ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাকে ইসলামের হেদায়াত দিয়েছেন।

আবদ : আপনি কবে থেকে তাঁর অনুসরণ শুরু করেছেন?

আমি : বেশী দিন হয়নি।

আবদ : আপনি কোথায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন?

আমি : নাজ্জাশীর সামনে। নাজ্জাশীও মুসলমান হয়েছিলেন।

আবদ : তার স্বজাতীয়দের ইসলাম গ্রহণের পর তার বাদশাহীর কি করেছে?

আমি : অক্ষুণ্ন রেখেছে এবং তার অনুসরণ করেছে।

আবদ : গীর্জার পাদ্রী এবং অন্যরাও অনুসরণ করেছে?

আমি : হাঁ, সবাই করেছে।

আবদ : হে আমর, ভেবে দেখুন, আপনি কি বলছেন। মনে রাখবেন, মিথ্যার চেয়ে বদগুণ একজন মানুষের জন্যে কিন্তু আর কিছুই হতে পারে না।

আমি : আমি মিথ্যা বলছি না। মিথ্যা বলা আমরা বৈধও মনে করি না।

আবদ : আমি মনে করি, সম্রাট হেরাক্লিয়াস নাজ্জাশীর ইসলাম গ্রহণের কথা জানেন না

আমি : অবশ্যই জানেন।

আবদ : আপনি বুঝলেন কি করে?

আমি : নাজ্জাশী হেরাক্লিয়াসকে আয়কর পরিশোধ করতেন, কিন্তু ইসলামের মাধ্যমে তিনি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা মেনে নেয়ার পর বললেন, আল্লাহর শপথ, এখন থেকে হেরাক্লিয়াস যদি আমার কাছে একটি দিরহামও চান তবু আমি তাকে দেব না। এ খবর হেরাক্লিয়াসের দরবারে পৌঁছার পর তার ভাই ইয়ানাক তাকে বলেছিলো, আপনি কি খারাজ দিতে নারাজ আপনার এমন একজন ভৃত্যকে ছেড়ে দেবেন? আপনার ধর্ম বিশ্বাস ত্যাগ করে অন্য একজনের ধর্ম বিশ্বাস গ্রহণ করবে, এটাও কি আপনি মেনে নেবেন? হেরাক্লিয়াস বললেন, এই লোক একটি ধর্ম বিশ্বাস পছন্দ করেছে এবং তা গ্রহণ করেছে, আমি তাকে কি করতে পারি? খোদার কসম, রাজত্বের লোভ না হলে আমি নিজেও তাই করতাম, নাজ্জাশী যা করেছেন।

আবদ : আমর ভেবে দেখুন, আপনি কি বলছেন?

আমি : আল্লাহর শপথ, আমি সত্য কথাই বলছি।

আবদ : আচ্ছা বলুন, তিনি কি কাজের আদেশ দেন আর কি কাজ করতে নিষেধ করেন?

আমি : আল্লাহ তায়ালা-এর আনুগত্যের আদেশ প্রদান করেন এবং তাঁর নাফরমানী করতে নিষেধ করেন। নেকী করার এবং আত্মীয় স্বজনদের সাথে ভালো ব্যবহার করার আদেশ প্রদান করেন। যুলুম, অত্যাচার, বাড়াবাড়ি, ব্যাভিচার, মদ পান, পাথর, মূর্তি এবং ক্রুশ-এর উপাসনা করতে নিষেধ করেন।

আবদ : তিনি যেসব কাজের আদেশ করেন এর সবই তো ভালো কাজ। আমার ভাই যদি আমার অনুসরণ করবেন বলে ভরসা পেতাম, তবে আমরা সওয়ার হয়ে মদীনায় ছুটে যেতাম এবং মোহাম্মদ (সঃ-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতাম।

কিন্তু আমার ভাই-এর রাজত্বের ওপর প্রবল লোভ, তিনি রাজত্ব হারানোর ভয়ে অন্য কারো আনুগত্য মেনে নেবেন কিনা, সন্দেহ রয়েছে।

আমি : যদি তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন, তবে আল্লাহর রসূল তাকেই তার বাদশাহীতে বহাল রাখবেন। তবে তাকে একটা কাজ করতে হবে যে, ধনীদের কাছ থেকে সদকা আদায় করে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে।

আবদ : এটাতো বড় ভালো কথা। আচ্ছা বলুনতো, সদকা কি জিনিস?

আমি বিভিন্ন দ্রব্যের ওপর আল্লাহর রসূলের নির্ধারণ করা সদকার বিবরণ উল্লেখ করলাম। উটের প্রসঙ্গ এলে তিনি বললেন, হে আমর, আমাদের ওসব পশুপাল থেকেও কি সদকা নেয়া হবে, যারা নিজেরাই চারণ ভূমিতে চরে বেড়ায়?

আমি : হাঁ।

আবদ : আল্লাহর শপথ আমি জানি না, আমাদের দেশের মানুষ দেশের বিশালতা এবং উটের সংখ্যাধিক্যের কথা ভেবে এটা মেনে নেবে কি না।

আমর ইবনুল আস বলেন, আমি রাজ দরবারের দেউড়িতে কয়েক দিন কাটালাম। আবদ তাঁর ভাইয়ের কাছে গিয়ে আমার বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন। একদিন আমাকে ডাকলেন, আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম। প্রহরীরা আমার বাহু আঁকড়ে ধরলো। আবদ বললেন, ছেড়ে দাও, ওরা তখন আমাকে ছেড়ে দিলো। আমি বসতে চাইলে প্রহরীরা আমাকে বসতে দিলো না। আমি বাদশাহর দিকে তাকালে তিনি বললেন, বলুন, কি বলতে চান? আমি মুখবন্ধ খামের চিঠি তার হাতে তুলে দিলাম। তিনি খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠিখানা পড়লেন। সব পড়ার পর তাঁর ভাইয়ের হাতে দিলেন। আমি লক্ষ্য করলাম যে, বাদশাহর চেয়ে তার ভাই আবদ অপেক্ষাকৃত নরম মেজাজের মানুষ।

বাদশাহ জিজ্ঞাসা করলেন, কোরায়শ কি ধরনের ব্যবহার করেছিলো, বলুন।

আমি : সবাই তাঁর আনুগত্য মেনে নিয়েছে। কেউ দ্বীনের প্রতি ভালোবাসার কারণে, আবার দু'একজন তলোয়ারের ভয়ে।

বাদশাহ : তাঁর সাথে কি ধরনের লোক রয়েছে?

আমি : সব ধরনের লোকই রয়েছে। তারা ইসলামকে আগ্রহের সাথে গ্রহণ করেছে। ইসলামকে অন্য সকল ধর্ম বিশ্বাসের ওপর প্রাধান্য দিয়েছে। আল্লাহর হেদায়াত এবং বিবেকের পথ-নির্দেশনায় তারা বুঝতে পেরেছে যে, এ যাবত তারা ছিলো পথভ্রষ্ট। আমার জানামতে এই এলাকায় আপনিই শুধু এখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ না করেন এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ না করেন, তবে ঘোড়া ও উটের পিঠে সওয়ার হয়ে আসা লোকেরা আপনাকে তছনছ করে দেবে। আপনার সজীবতা নিশ্চিহ্ন করে দেবে। কাজেই ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনাকেই আপনার কওমের শাসনকর্তা হিসাবে বহাল রাখবেন। আপনার এলাকায় কোন হামলাকারী প্রবেশ করবেন না।

বাদশাহ বললেন, আপনি, আগামীকাল আমার সাথে দেখা করুন।

এরপর আমি বাদশাহর ভাইয়ের কাছে ফিরে এলাম।

আবদ বললেন, আমর, আমার ধারণা, বাদশাহীর লোভ প্রবল না হলে আমার ভাই ইসলাম গ্রহণ করবেন।

পরদিন পুনরায় বাদশাহর কাছে যেতে চাইলাম। কিন্তু ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দিলেন না। ফিরে এসে তার ভাইকে সে কথা জানালাম। তার ভাই আমাকে তার কাছে পৌঁছে দিলো। বাদশাহ বললেন, আপনার উপস্থাপিত দাওয়াত সম্পর্কে আমি ভেবে দেখেছি। আমি যদি বাদশাহী এমন একজনের কাছে ন্যস্ত করি, যার সেনাদল এখনো পৌঁছেইনি, তবে আমি আরবে সবচেয়ে দুর্বল এবং ভীরু বলে পরিচিত হবো। যদি তার সৈন্যরা এখানে এসেই পড়ে, তবে আমরা তাদের যুদ্ধের সাধ মিটিয়ে দেব।

আমি বললাম, ঠিক আছে, আমি আগামীকাল ফিরে যাচ্ছি।

আমার যাওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়ার পর বাদশাহ তার ভাইয়ের সাথে নির্জনে মতবিনিময় করলেন। বাদশাহ তার ভাইকে বললেন, এই পয়গাম্বর যাদের ওপর বিজয়ী হয়েছে, তাদের তুলনায় আমরা কিছুই না। তিনি যার কাছেই পয়গাম পাঠিয়েছেন তিনিই দাওয়াত কবুল করেছেন।

পরদিন সকালে পুনরায় আমাকে বাদশাহের দরবারে ডাকা হলো। বাদশাহ এবং তার ভাই উভয়েই ইসলাম গ্রহণ করলেন। তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলেন। সদকা আদায় এবং বাদী বিবাদীর মধ্যে ফয়সালা করতে আমাকে দায়িত্ব দেয়া হলো। এ ব্যাপারে তারা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য সহযোগিতা করলেন।[২১]

এ ঘটনার বিবরণ ও প্রকৃতি দেখে মনে হয়, অন্যান্য বাদশাহের পরে উভয়ের কাছে আল্লাহর রসূল চিঠি প্রেরণ করেছিলেন। সম্ভবত মক্কা বিজয়ের পর এ চিঠি প্রেরণ করা হয়।

এ সকল চিঠির মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বে অধিকাংশ এলাকায় তাঁর দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলেন। জবাবে কেউ ঈমান এনেছে, কেউ কুফুরীর ওপরই অটল থেকেছে। তবে এ সকল চিঠির প্রভাব এটুকু হয়েছে যে, যারা কুফুরী, করেছে তাদের মনোযোগও এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে এবং তাদের কাছে আল্লাহর রসূলের নাম এবং তাঁর প্রচারিত দ্বীন একটি পরিচিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

---

[২১]. যাদুল মায়াদ, ৩য় খন্ড, পৃ. ৬২, ৬৩

হোদায়বিয়ার সন্ধির পর

সামরিক তৎপরতা

গোযওয়ায়ে যী কারাদ

এ অভিযান বনু ফাজারার একটি অংশের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। এরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পশুপালের ওপর হামলা করেছিলো। এই হামলার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যেই সাহাবাদেরসহ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অভিযান পরিচালনা করেন।

হোদায়বিয়ার সন্ধির পর এবং খয়বর অভিযানের আগে এটি ছিলো প্রথম ও একমাত্র অভিযান। ইমাম বোখারী (রা.) উল্লেখ করেছেন, খয়বর অভিযানের মাত্র তিনদিন আগে এটি পরিচালিত হয়। হযরত সালমা ইবনে আকওয়া (রা.) থেকে এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ রয়েছে। সহীহ মুসলিম শরীফেও তার বর্ণনা রয়েছে। সীরাত রচয়িতারা লিখেছেন, এ ঘটনা ঘটেছিলো হোদায়বিয়ার সন্ধির আগে। কিন্তু একথা ঠিক নয়। বরং হাদীস সঙ্কলনসমূহে উল্লেখিত বিবরণই যথার্থ।[১]

এ অভিযানে হযরত সালমা ইবনে আকওয়া (রা.) যে ভূমিকা পালন করেছিলেন, তার বিবরণ তাঁর বর্ণনায়ই উল্লেখ রয়েছে। ঘটনার বিবরণ এই যে, হযরত সালমা বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সওয়ারীর উট তাঁর নওকর রেবাহ-এর হাতে দিয়ে চারণভূমিতে পাঠিয়েছিলেন। আমিও আবু তালহার ঘোড়াসহ তাদের সাথে ছিলাম। হঠাৎ ভোরের দিকে আবদুর রহমান ফাজারি উটগুলোর ওপর হামলা চালায়, রাখালকে হত্যা করে এবং উটগুলো তাড়িয়ে নিয়ে যায়। আমি রেবাহকে বললাম বেরাহ, এই ঘোড়া নাও, এটি আবু তালহাকে পৌঁছে দিয়ো এবং ঘটনা আল্লাহর রসূলকে জানিয়ে দিয়ো। অতপর আমি একটি টিলার ওপর উঠে মদীনার দিকে মুখ করে চিৎকার করে তিনবার আওয়ায দিলাম, ইয়া ছবা হাহ্ অর্থাৎ হায় সকাল বেলার হামলা। এরপরই আমি হামলাকারীদের পিছনে ছুটে চললাম। তাদের উদ্দেশ্যে তীর নিক্ষেপ করছিলাম আর আবৃত্তি করছিলাম,

'আনা ইবনুল আকওয়ায়ে অলইয়াওমু ইয়াওমুররুজ্জয়ে'

আর কেহ নই আমি আকওয়ার সন্তান, আজকে হবে মায়ের দুধ পানের প্রমাণ।

সালমা ইবনে আকওয়া বলেন, আমি তাদের প্রতি ক্রমাগত তীর নিক্ষেপ করতে লাগলাম। কোন সওয়ার আমার দিকে প্রতি আক্রমণের উদ্দেশ্যে আসতে থাকলে আমি কোন গাছের আড়ালে আত্মগোপন করতাম। গাছের আড়াল থেকে তীর নিক্ষেপ করে তাকে আহত করে দিতাম। ওরা পাহাড়ের সরু পথে প্রবেশ করলে আমি পাহাড়ের উপর উঠে পাথর নিক্ষেপ করতে লাগলাম। এমনি করে ক্রমাগত তাদের অনুসরণ করছিলাম। এক সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

১. সহীহ বোখারী, বাবে গোযওয়ায়ে জাতে কারদ, ২য় খন্ড, পৃ. ৬০৩, সহীহ মুসলিম, বাবে গোযওয়ায়ে যি কারদ, ২য় খন্ড, পৃ. ১১৩, ১১৪, ১১৫, ফতহুল বারী, সপ্তম খন্ড পৃ. ৪৬০, ৪৬১, ৪৬২, যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড; পৃ. ১২০

আলাইহি ওয়া সাল্লামের সবগুলো উট নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এলাম। এরপরও তাদের ধাওয়া অব্যাহত রাখলাম। তারা তখন বোঝা হালকা করতে ৩০টি চাদর এবং ৩০টিরও বেশী বর্শা ফেলে রেখে সামনে অগ্রসর হলো। তারা যা কিছুই ফেলে রেখে যেতো আমি তার পাশে চিহ্ন স্বরূপ কয়েকটা পাথর জড়ো করে রাখতাম। আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সঙ্গীদের চেনার সুবিধার্থে এরূপ করতাম। এরপর ওরা একটি ঘাঁটির সংকীর্ণ মোড়ে বসে দুপুরের খাবার খেতে লাগলো। আমিও এক জায়গায় বসলাম। ওদের মধ্যে চারজন আমার দিকে আসছিলো। আমি তাদের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম। আমি তাদের বললাম, তোমরা আমাকে চেনো? আমার নাম সালমা ইবনে আকওয়া। তোমাদের যে কাউকে ধাওয়া করতে শুরু করলে অনায়াসে ধরে ফেলবো। তোমরা যদি আমাকে ধাওয়া করো কিছুতেই ধরতে পারবে না। আমার একথা শুনে ওরা চারজন ফিরে চলে গেলো। আমি নিজের জায়গায় বসে রইলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আল্লাহর রসূলের সওয়ারদের গাছের ফাঁক দিয়ে আসতে দেখলাম। সবার আগে ছিলেন আখরাম। তার পিছনে যথাক্রমে আবু কাতাদা এবং মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ। হঠাৎ করে আবদুর রহমান এবং আখরামের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে গেলো। হযরত আখরাম আবদুর রহমানের ঘোড়াকে আহত করে ফেললেন। আবদুর রহমান ক্রুদ্ধ হয়ে বর্শা দিয়ে হযরত আখরামকে হত্যা করলেন। ইতিমধ্যে হযরত আবু কাতাদা আবদুর রহমানের মাথার কাছে গিয়ে পৌঁছুলেন এবং তাকে বর্শা দিয়ে আহত করলেন। অন্য আততায়ীরা পালিয়ে গেলো। ওদের দিকে আমি দ্রুত দৌড়াতে লাগলাম। সূর্য অস্ত যাওয়ার একটু আগে ওরা একটি ঘাঁটির দিকে মোড় দিলো। সেখানে যি কারদ নামক জলাশয় ছিলো। ওরা ছিলো পিপাসার্ত এবং সেখানে পানি পান করতে চাচ্ছিলো। কিন্তু আমি তাদের জলাশয় থেকে দূরে রাখলাম। ফলে তারা এক ফোটা পানিও পান করতে সক্ষম হলো না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম সূর্যাস্তের পরে আমার কাছে পৌঁছুলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল, ওরা সবাই পিপাসিত ছিলো। আপনি যদি একশত জন সাহাবাকে আমার সঙ্গে দেন তবে আমি জিনসহ ওদের ঘোড়া কেড়ে নিতে পারবো। এছাড়া ওদের সবাইর ঘাড় আপনার কাছে হাযির করবো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আক্ওয়ার পুত্র তুমি কাবু করে ফেলেছ, এবার একটু সহনশীল হও। এরপর তিনি বললেন, বনু গাতফানে এক্ষণে ওদের মেহমানদারি করা হচ্ছে।

এ অভিযান সম্পর্কে পর্যালোচনা প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আজ আমাদের শ্রেষ্ঠ সওয়ার হচ্ছে আবু কাতাদা, আর শ্রেষ্ঠ পদাতিক সৈন্য হচ্ছে সালমা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দুই অংশ প্রদান করলেন, একটি পদাতিকের, অন্যটি সওয়ারীর। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফেরার সময় আমাকে সম্মানিত করলেন। তিনি তাঁর আজবা নামক উটনীর পেছনে বসিয়ে আমাকে নিয়ে মদীনায় এলেন।

এ সামরিক অভিযানের সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার দায়িত্ব হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমের ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। এ অভিযানের পতাকা বহন করছিলেন হযরত মেকদাদ ইবনে আমর (রা.)।

খয়বর এবং ওয়াদিউল কুরার যুদ্ধ

সপ্তম হিজরীর মহরম মাস। মদীনা থেকে ৬০ অথবা ৮০ মাইল দূরে খয়বর শহর অবস্থিত। বেশ বড় শহর। এখানে দুর্গ এবং খেত খামারও ছিলো। আবহাওয়া তেমন স্বাস্থ্যকর নয়। বর্তমানে এটি একটি জনপদ।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হোদায়বিয়ার সন্ধির ফলে খন্দকের যুদ্ধের ত্রিমুখী শক্তির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী কোরায়শদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হলেন। অন্য দু'টি শাখা

ছিলো শক্তিশালী ইহুদী এবং নজদ-এর কয়েকটি গোত্র। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদের সাথেও হিসাব-নিকাশ মিটিয়ে নেয়া প্রয়োজন মনে করলেন। এতে সব দিক থেকে নিরাপত্তা লাভ সম্ভব হবে। সমগ্র এলাকায় শান্তি ও স্থিতিশীলতার পরিবেশ কায়েম হবে। ফলে মুসলমানরা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাদ দিয়ে আল্লাহর পয়গাম পৌঁছাতে এবং তাঁর দ্বীনের দাওয়াতের কাজে আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হবে।

খয়বর ছিলো ইহুদীদের ষড়যন্ত্রের ও চক্রান্তের আখড়া। মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদীদের সামরিক প্রস্তুতির কেন্দ্রস্থলও ছিলো এই স্থান। এ কারণে সর্বপ্রথম মুসলমানরা এদিকে মনোযোগী হলেন।

খয়বর প্রকৃতই কি ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের আখড়া ছিলো? এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, খয়বরের অধিবাসীরাই খন্দকের যুদ্ধে মোশরেকদের সকল দলকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়ে সমবেত করেছিলো। এরাই বনু কোরায়যা গোত্রের লোকদের বিশ্বাসঘাতকতায় উদ্দীপিত করেছিলো। এরাই ইসলামী সমাজের পঞ্চম বাহিনী মোনাফেকদের সাথে এবং খন্দকের যুদ্ধের সময় বনু গাতফান ও বেদুইনদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলো। এরা নিজেরাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। মুসলমানদের তারা নানাভাবে উত্যক্ত ও বিরক্ত করেছিলো। এরাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যার ষড়যন্ত্রও করেছিলো। এ সকল কারণে বাধ্য হয়েই মুসলমানদের সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে হচ্ছিলো। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে নেতৃত্বদানকারী সালাম ইবনে আবুল হাকিক এবং উসাইর ইবনে যারেমকে নিশ্চিহ্ন করতে হয়েছিলো। ইহুদীদের ব্যাপারে মুসলমানদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিলো প্রকৃতপক্ষে এর চেয়েও বেশী। কিন্তু এ কর্তব্য পালনে দেরী করা হচ্ছিলো। কেননা কোরায়শরা ছিলো ইহুদীদের চেয়ে অধিক শক্তিশালী, সংগঠিত যুদ্ধবাজ এবং দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষ।

কোরায়শদের উপেক্ষা করে ইহুদীদের মোকাবেলা করা সম্ভব ছিলো না। কোরায়শদের সাথে সন্ধি স্থাপনের পর ইহুদীদের সাথে যোগাযোগ করার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো। এবার তাদের হিসাব নিকাশের দিন ঘনিয়ে এলো।

খয়বরের পথে যাত্রা

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হোদায়বিয়া থেকে ফিরে এসে জিলহজ্জ মাস পুরো এবং মহররম মাসে কয়েকদিন মদীনায় অবস্থান করেন। এরপর মহররম মাসের অবশিষ্ট দিনগুলোতে খয়বরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

তাফসীরকাররা লিখেছেন, খয়বর বিজয় ছিলো আল্লাহর ওয়াদা। তিনি বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যুদ্ধেলব্ধ বিপুল সম্পদের, যার অধিকারী হবে তোমরা। তিনি তা তোমাদের জন্যে ত্বরান্বিত করেছিলেন।' (সূরা ফাতহ, আয়াত ২০)

তা তোমাদের জন্যে ত্বরান্বিত করেছেন বলে হোদায়বিয়ার সন্ধির কথা বোঝানো হয়েছে। আর যুদ্ধলভ্য বিপুল সম্পদ বলতে খয়বরের কথা বোঝানো হয়েছে।

ইসলামী সৈন্যদের সংখ্যা

মোনাফেক এবং দুর্বল ঈমানের অধিকারী লোকেরা হোদায়বিয়ার সফরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে না গিয়ে নিজেদের ঘরে বসে থাকে। এ কারণে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর রসূলকে সে সম্পর্কে আদেশ দিয়ে বলেন, 'তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহের জন্যে যাবে, তখন যারা ঘরে রয়ে গিয়েছিলো, তারা বলবে, আমাদেরকে তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও। ওরা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করতে চায়। বল, তোমরা কিছুতেই আমাদের সঙ্গী হতে

পারবে না। আল্লাহ তায়ালা পূর্বেই এরূপ ঘোষণা করেছেন। ওরা বলবে, তোমরা তো আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছো। বস্তুত ওদের বোধশক্তি সামান্য।' (সূরা ফাতহ, আয়াত ১৫)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খয়বর অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার সময় ঘোষণা করলেন যে, তাঁর সাথে শুধু ওসকল লোকই যেতে পারবে, যাদের প্রকৃতই জেহাদের প্রতি আগ্রহ রয়েছে। এ ঘোষণার ফলে শুধুমাত্র যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলো, যারা হোদায়বিয়ার গাছের নীচে বাইয়াতে রেযোয়ানে অংশ নিয়েছিলো। এদের সংখ্যা ছিলো চৌদ্দশত।

এ অভিযানের সময় মদীনার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ছাবা ইবনে আরফাতা গেফারীর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিলো। অন্যদিকে ইবনে ইসহাক বলেছেন, নুমাইলা ইবনে আবদুল্লাহ লায়ছীর ওপর ন্যস্ত করা হয়েছিলো। কিন্তু গবেষক ও বিশেষজ্ঞদের মতে প্রথমোক্ত কথাই অধিক নির্ভরযোগ্য।[১]

এ সময়ে হযরত আবু হোরায়রা (রা.)-ও মদীনায় আগমন করেছিলেন। হযরত ছাবা ইবনে আরাফাতা (রা.) ফযরের নামায পড়ছিলেন। নামায শেষে আবু হোরায়রা (রা.) তার কাছে যান। তিনি পাথেয় ব্যবস্থা করে দিলেন। হযরত আবু হোরায়রা (রা.) প্রিয় নবীর কাছে যাওয়ার জন্যে খয়বর রওয়ানা হলেন। সেখানে গিয়ে শুনতে পেলেন যে, খয়বর মুসলমানদের অধিকারে এসেছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের সাথে আলোচনা করে আবু হোরায়রা এবং তাঁর সঙ্গীদেরও গনীমতের অংশ দিলেন।

ইহুদীদের জন্যে মোনাফেকদের তৎপরতা

এ সময়ে ইহুদীদের সাহায্যার্থে মোনাফেকরা যথেষ্ট ছুটোছুটি করেছে। মোনাফেক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই আগেই খয়বরে খবর পাঠিয়েছিলো যে, মোহাম্মদ তোমাদের ওদিকে যাচ্ছেন, সতর্ক হয়ে যাও। প্রস্তুত হও, ভয় পেয়ো না যেন। তোমাদের সংখ্যা এবং অস্ত্র শস্ত্র তো অনেক। মোহাম্মদের সঙ্গীদের সংখ্যা বেশী নয়, তাও তারা নিঃস্ব, তাদের কাছে যেসব অস্ত্র রয়েছে, তাও খুব সামান্য। খয়বরের অধিবাসীরা এ খবর পাওয়ার পর বনু গাতফান গোত্রের কাছে কেনানা ইবনে আবুল হাকিক এবং হাওজা ইবনে কয়েসকে সাহায্য লাভের জন্যে প্রেরণ করলো। বনু গাতফান গোত্র ছিলো খয়বরের ইহুদীদের মিত্র এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিত্রদের মদদগার। ইহুদীরা বনু গাতফানকে এ ধরনের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলো যে, মুসলমানদের ওপর জয়লাভে সক্ষম হলে খয়বরের মোট উৎপাদনের অর্ধেক বনু গাতফানকে দেয়া হবে।

পথের অবস্থার বিবরণ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খয়বর যাওয়ার পথে 'এছর' পাহাড় অতিক্রম করলেন। এটি 'আছার' পাহাড় নামেও পরিচিত। এরপর ছাবহা প্রান্তর অতিক্রম করে রাজিঈ প্রান্তরে উপনীত হলেন। কিন্তু এই রাজিঈ সেই রাজিঈ, নয় যেখানে আদল ও কারাহর বিশ্বাসঘাতকতার কারণে বনু লেহইয়ানের হাতে আটজন সাহাবা শাহাদাত বরণ করেন।

রাজিঈ থেকে বনু গাতফান গোত্রের বসতি এলাকা একদিনও এক রাতের পথের দূরত্বে অবস্থিত। বনু গাতফান ইহুদীদের ডাকে সাড়া দিয়ে খয়বরের পথে রওয়ানাও হয়েছিলো। তারা চলে আসার পর পেছনের দিকে শোরগোল শোনা গেলো। তারা ভেবেছিলো যে, মুসলমানরা তাদের পরিবার-পরিজন এবং পশুপালের ওপর হামলা করেছে। এ কারণে তারা ফিরে যায় এবং খয়বরকে মুসলমানদের জন্যে খালি রেখে দেয়।

পথ-নির্দেশক দুইজন সাহাবীকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসতে বললেন। এদের একজনের নাম হুছাইল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এদের কাছে এমন সমীচীন

---

১. ফতহুল বারী, সপ্তম খন্ড, পৃ. ৪৬৫, যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ১৩৩

পথের সন্ধান জানতে চাইলেন, যে পথ ধরে খয়বরে মদীনার পরিবর্তে সিরিয়ার দিক থেকে প্রবেশ করা যায়। এতে করে ইহুদীদের সিরিয়ায় পালিয়ে যাওয়ার পথ বন্ধ হবে। অন্যদিকে বনু গাতফানের কাছ থেকে সম্ভাব্য সাহায্যও এদিক দিয়েই আসবে। এরূপ অবস্থায় বনু গাতফান এবং ইহুদীদের মাঝখানে মুসলমানরা থাকবেন এবং বনু গাতফানের সাহায্য এলেও তা ইহুদীদের কাছে পৌঁছুতে পারবে না।

একজন পথপ্রদর্শক বললো, হে আল্লাহর রসূল, আপনাকে আমি আপনার ঈপ্সিত পথেই নিয়ে যাব। সেই পথ প্রদর্শক আগে আগে যেতে লাগলেন। এক চৌরাস্তায় গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, এ চারটি পথের প্রত্যেকটিই খয়বরে গিয়ে মিলিত হয়েছে। যে কোন পথ ধরেই আপনি সেখানে পৌঁছুতে পারেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পথগুলোর নাম জানতে চাইলেন। হুছাইল বললেন, একটি পথের নাম হাজন, দ্বিতীয়টির নাম শাশ, তৃতীয়টির নাম হাতাব এবং চতুর্থটি হলো মারহাব। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ নাম অর্থাৎ মারহাব পছন্দ করলেন। অন্য তিনটি পথের নামের অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে সেসব পথ বাদ দিলেন। অবশেষে মারহাব পথেই যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলো।

পথের কতিপয় ঘটনা

এক) হযরত সালমা ইবনে আকওয়া (রা.) বলেন, আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে খয়বর রওয়ানা হয়েছি। রাত্রিকালে সফরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। একজন লোক এসে আমেরকে বললেন, আমের, কিছু শোনাও তো। আমের ছিলেন কবি। তিনি সওয়ারী থেকে নীচে নেমে এসে নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন।

'তুমি যদি না থাকিতে ওগো আল্লাহ
আমরাতো কেউ পেতাম না হেদায়াত
নামায আদায় করতাম না, দিতাম না যাকাত।
তোমার জন্যে এ জীবন কোরবান
ক্ষমা করে দাও তুমি আমাদের
অটল চরণ রাখবে মোকাবেলায় শত্রুদের।
তুমি আমাদের শান্তি দাও ওহে আল্লাহ তায়ালা
রণ হুঙ্কার দিলে দুশমন কাঁপে না তো মন
এ বিষয়ে আস্থা আমরা করেছি অর্জন।'

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কবিতা শুনে কবির পরিচয় জানতে চাইলেন। তাঁকে জানানো হলো যে, তিনি আমের ইবনে আকওয়া। আল্লাহর রসূল বললেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে রহমত করুন। একজন সাহাবা মন্তব্য করলেন, এবার তো আমেরের শাহাদাত অনিবার্য। কিন্তু আমরা তো আরো বেশীদিন তার সাহচর্য লাভের জন্যে আগ্রহী।[২] সাহাবায়ে কেরাম জানতেন যে, যুদ্ধের সময়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন সাহাবার জন্যে বিশেষভাবে মাগফেরাতের দোয়া করলে তিনি শহীদ হয়ে যান।[৩] খয়বরের যুদ্ধে হযরত আমেরের (রা.) ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। এ কারণেই সাহাবারা বলেছেন, তাঁর দীর্ঘায়ুর জন্যে দোয়া করলেই তো আমরা আরো বেশীদিন আমাদের মধ্যে পেতাম।

---

২. সহীহ বোখারী, বাবে গাজওয়ায়ে খয়বর ২য় খন্ড ৬০৩, সহীহ মুসলিম বাবে গোযওয়ায়ে যি কারদ, ২য় খন্ড পৃ. ১১৫

৩. সহীহ মুসলিম ২য় খন্ড, পৃ. ১১৫

দুই) খয়বরের খুব কাছে ছাবহা প্রান্তরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আছরের নামায আদায় করেন। পরে খাবার চান। শুধু ছাতু দেয়া হয়। তাঁর আদেশে ছাতু খাদ্যোপযোগী করা হয়। তারপর তিনি নিজে আহার করলেন এবং সাহাবাদেরও খেতে দিলেন। আহারের পর মাগরেবের নামাযের জন্যে উঠলেন। সে সময় তিনি নতুন করে ওযু করলেন না, শুধু কুলি করলেন। সাহাবারাও তাই করলেন।[৪] এরপর তিনি এশার নামায আদায় করলেন।

খয়বরের উপকণ্ঠে ইসলামী বাহিনী

যুদ্ধ শুরুর সকালের আগের রাত মুসলমানরা খয়বরের উপকণ্ঠে যাপন করেন। ইহুদীরা তা জানতেও পারেনি। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিয়ম ছিলো, তিনি যখন রাতের বেলা কোন কওমের কাছে পৌঁছুতেন, তখন অপেক্ষা করতেন, সকাল হওয়ার আগে তাদের কাছে যেতেন না। সেদিন খুব ভোরে কিছুটা অন্ধকার থাকতে তিনি ফজরের নামায আদায় করেন। এরপর মুসলমানরা সওয়ার হয়ে খয়বরের দিকে অগ্রসর হন। খয়বরের অধিবাসীদের অনেকেই কাঁধে কোদাল নিয়ে খেতে খামারে কাজ করতে বেরিয়েছিলো। হঠাৎ মুসলিম সেনাদের দেখে চিৎকার করে পালাতে লাগলো। চিৎকার করে করে তারা বলছিলো, খোদার কসম, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সসৈন্যে হাজির হয়েছেন।[৬]

এই অবস্থা দেখে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহু আকবর, খয়বর বরবাদ হয়েছে, আল্লাহু আকবর, খয়বর বরবাদ হয়েছে। আমরা যখন কোন কওমের ময়দানে নেমে পড়ি, তখন কওমের ভয়ার্ত লোকদের সকাল মন্দ হয়ে যায়।[৬]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৈন্যদের অবতরণের জন্যে একটি জায়গা নির্ধারণ করলেন। হাব্বাব ইবনে মুনজের এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহর আদেশে আপনি এখানে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন নাকি রণ-কৌশলগত কারণে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন? তিনি বললেন, রণকৌশলগত কারণে সিদ্ধান্ত নিয়েছি। একথা শুনে হযরত হাব্বাব (রা.) বললেন, এই স্থান নাজাত দুর্গের খুব কাছে। খয়বরের সকল যোদ্ধা এই দুর্গেই থাকে। ওরা আমাদের অবস্থা সম্পর্কে পুরোপুরি জানতে পারবে, অথচ আমরা তাদের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারব না। ফলে তারা তাদের কৌশল আমাদের ওপর প্রয়োগ করতে পারবে, তাদের নিক্ষিপ্ত তীর আমাদের কাছে পৌঁছুবে অথচ আমাদের নিক্ষিপ্ত তীর তাদের কাছে পৌঁছুবে না। রাতের বেলা তারা আমাদের ওপর আকস্মিক হামলা চালাতে পারে, এ আশঙ্কাও পুরোপুরি থেকে যাবে। এছাড়া এ জায়গার চারিদিকে খেজুর বাগান, জায়গাটা নিচু। কাজেই এসব সমস্যা যেখানে নেই, সেই রকম একটা জায়গায় অবস্থানের ব্যবস্থা করলে ভালো হতো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি যে অভিমত প্রকাশ করেছ, তা সঠিক। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের নিয়ে অন্য জায়গায় অবস্থান গ্রহণ করলেন।

শহর দেখা যাওয়ার কাছাকাছি এক জায়গায় পৌঁছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের থামতে বললেন। এরপর তিনি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের দরবারে এ মোনাজাত করলেন যে আল্লাহ তায়ালা, তুমি সাত আসমান এবং যেসব জিনিসের ওপর সেই আকাশসমূহ ছায়া বিস্তার করে রয়েছে, সেসব কিছুর প্রতিপালক। সাত যমিন এবং তার উপরে নিচে যা কিছু রয়েছে, সেসব কিছুর প্রতিপালক, শয়তানসমূহ এবং যাদেরকে তারা পথভ্রষ্ট

৪. সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, ৬০৩

৬. মাগাযি, আল ওয়াকেদী, খয়বর যুদ্ধ পৃ. ১১২ সহীহ বোখারী, খয়বরের যুদ্ধ অধ্যায় ২য় খন্ড, পৃ. ৬০৩, ৬০৪

৬. সহীহ বোখারী, খয়বরের যুদ্ধ অধ্যায়, ২য় খন্ড, পৃ. ৬০৩, ৬০৪

করেছে তাদের প্রতিপালক, তোমার কাছে আমরা এই জনপদের কল্যাণ এবং জনপদের অধিবাসীদের কল্যাণ এবং এতে যা কিছু রয়েছে সেসব কিছুর কল্যাণের আবেদন জানাচ্ছি। এই জনপদের অকল্যাণ এবং এর অধিবাসীদের অকল্যাণ এবং এতে যা কিছু রয়েছে সেসব কিছুর অকল্যাণ থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই।'

আল্লাহর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর বললেন, আল্লাহর নাম নিয়ে সামনে অগ্রসর হও।[৭]

যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং খয়বরের দুর্গ

খয়বরের সীমানায় যে রাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রবেশ করেছিলেন, সে রাতে তিনি বললেন, আমি আগামীকাল এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা দেব যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ এবং তার রসূলও তাকে ভালোবাসেন। সকালে সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রসূলের সামনে হাযির হলেন। সবাই পতাকা পাওয়ার জন্যে মনে মনে আকাঙ্খা করছিলেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আলী ইবনে আবু তালেব কোথায়? সাহাবারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল তার চোখ উঠেছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাকে নিয়ে এসো। হযরত আলী (রা.)-কে নিয়ে আসা হলো।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চোখে সামান্য থু থু লাগিয়ে দোয়া করে দিলেন। হযরত আলী (রা.) এমন সুস্থ হয়ে গেলেন যে, মনে হয় কখনো তাঁর চোখের অসুখ ছিলোই না। এরপর হযরত আলীকে (রা.) পতাকা প্রদান করা হয়। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমি ওদের সাথে ততোক্ষণ পর্যন্ত লড়বো, যতক্ষণ তারা আমাদের মতো হয়ে যায়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নিশ্চিন্তে যাও, যতোক্ষণ পর্যন্ত তাদের ময়দানে অবতরণ না করো। এরপর ওদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিয়ো। ইসলামে আল্লাহর যে অধিকার ওদের ওপর ওয়াজিব হয়, সে সম্পর্কে ওদের অবহিত করো। যদি তোমার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা ওদের একজনকেও হেদায়াত দেন তবে তোমার জন্যে সেটা হবে বহুসংখ্যক লাল উটের চেয়ে উত্তম।[৯]

খয়বরের জনবসতি ছিলো দুইভাগে বিভক্ত। এক ভাগে নিচে উল্লেখিত পাঁচটি দুর্গ ছিলো। ● হেছনে নায়েম। ● হেছনে ছা'ব ইবনে মায়া'য। ● হেছনে কিল্লা যোবায়ের। ● হেছনে উবাই। এবং ● হেছনে নাজার।

উল্লিখিত পাঁচটি দুর্গের মধ্যে প্রথম তিনটি দুর্গসম্বলিত এলাকাকে 'নাতাত' বলা হয়। অন্য দু'টি দুর্গসম্বলিত এলাকা 'শেক' নামে পরিচিত।

খয়বরের দ্বিতীয় ভাগের জনবসতি কোতায়রা নামে পরিচিত ছিলো। এর মধ্যে ছিলো তিনটি দুর্গ। এক, হেছনে কামুস। এ দুর্গের অধিবাসীরা বনু নাযির গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলো এবং বনু নাযিরের আবুল হাকিক দুর্গে তারা অবস্থান করতো। দুই, হেছনে অতীহ। তিন, হেছনে সালালেম।

উল্লিখিত আটটি দুর্গ ছাড়া খয়বরে অন্যান্য দুর্গ এবং ভবনও ছিলো। কিন্তু সেগুলো ছিলো অপেক্ষাকৃত ছোট। শক্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় পূর্বোক্ত দুর্গগুলোর মতো সুরক্ষিত ছিলো না।

৭.এই চোখের অসুখের কারণে তিনি পিছিয়ে পড়েন এবং পরে সকলের সাথে মিলিত হন।

৯. সহীহ বোখারী, খয়বর যুদ্ধ অধ্যায়, পৃ. ৬০৫, ৬০৬, কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, খয়বরের একটি দুর্গ বিজয়ে একাধিকবারের চেষ্টা ব্যর্থ হয় এরপর হযরত আলীর হাতে পতাকা প্রদান করা হয়। কিন্তু সেটা সত্য

প্রথম ভাগের দুর্গগুলোতেই যুদ্ধ হয়েছে। অন্যান্য দুর্গের তিনটি দুর্গ যোদ্ধা থাকা সত্তেও যুদ্ধ ছাড়াই মুসলমানদের হাতে তুলে দেয়া হয়েছিলো।

সংঘাতের সূচনা এবং নায়েম দুর্গ বিজয়

উল্লিখিত আটটি দুর্গের মধ্যে প্রথমে নায়েম দুর্গের ওপর হামলা করা হয়। এ সকল দুর্গ অবস্থান এবং কৌশলগত দিক থেকে ইহুদীদের প্রথম লাইনের প্রতিরক্ষাব্যূহ হিসেবে বিবেচিত হতো। এ দুর্গের মালিক ছিলো মারহাব নামে এক দুর্ধর্ষ ইহুদী তাকে এক হাজার পুরুষের শক্তি-সামর্থসম্পন্ন বীর মনে করা হতো।

হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা.) মুসলমান সৈন্যদের সঙ্গে নিয়ে এ দুর্গের সামনে গিয়ে ইহুদীদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা ইসলামের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করলো। নিজেদের বাদশাহ মারহাবের নেতৃত্বে তারা মুসলমানদের মোকাবেলায় এসে দাঁড়ালো।

রণাঙ্গনে এসে মারহাব নামের এক বীর এককভাবে মুখোমুখি যুদ্ধের আহ্বান জানালো। সালমা ইবনে আকওয়ার বর্ণনায় এভাবে উল্লেখ রয়েছে, আমরা খয়বরে পৌঁছার পর খয়বরের অধিবাসীদের বাদশাহ মারহাব তলোয়ার নিয়ে অহংকার প্রকাশ করতে করতে এগিয়ে এলো। তার কণ্ঠে ছিলো স্পর্ধিত আবৃত্তিসম্বলিত এ কবিতা,

'খয়বর জানে মারহাব আমি
অস্ত্র সাজে সজ্জিত অনন্য আমি বীর রণকৌশলে
অভিজ্ঞতা কাজে লাগাই যুদ্ধের আগুন উঠলে জ্বলে।'

তা মোকাবেলায় আমার চাচা হযরত আমের (রা.) এগিয়ে গেলেন। তিনি আবৃত্তি করলেন,

'খয়বর জানে আমার নাম আমের
অস্ত্র সাজে সজ্জিত বীর সেনানী যুদ্ধের।'

মুখোমুখি হওয়ার পর একজন অন্যজনের ওপর আঘাত হানলো। মারহাবের শাণিত তলোয়ার আমার চাচা আমেরের ঢালের ওপর আঘাত করলো। ইহুদী মারহাবকেও আমার চাচা নীচের দিকে আঘাত করতে চাইলেন কিন্তু তার তলোয়ার ছিলো ছোট। তিনি মারহাবের উরুতে আঘাত করতে চাইলে তলোয়ার ধাক্কা খেয়ে তাঁর নিজের হাঁটুতে লাগলো। অবশেষে এই আঘাতেই তিনি ইন্তেকাল করেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দু'টি পবিত্র আঙ্গুল তুলে বললেন, ওর জন্যে রয়েছে দুই রকমের পুরস্কার। হযরত আমের (রা.) ছিলেন অনন্য রণকুশল মোজাহিদ। তার মতো আরব বীর পৃথিবীতে কমই এসেছেন।[১০]

হযরত আমের (রা.) আহত হওয়ার পর মারহাবের মোকাবেলায় এগিয়ে গেলেন হযরত আলী (রা.)। তিনি আবৃত্তি করছিলেন এ কবিতা,

'জানো আমি কে, আমার নাম আমার মা
রেখেছেন হায়দর
বনের বাঘের মতোই আমি ভয়ঙ্কর
হানবো আমি আঘাত পূর্ণতর।'

---

১০. সহীহ মুসলিম, খয়বর যুদ্ধ অধ্যায়, ২য় খন্ড, পৃ. ১২২ গাজওয়া জিকারদ, ২য় কন্ড, পৃ. ১১৫, সহীহ বোখারী, খয়বর যুদ্ধ অধ্যায় ২য় খন্ড, ৬০৩

এরপর হযরত আলী (রা.) মারহাবের ঘাড় লক্ষ্য করে এমন আঘাত করলেন যে, কমিনা ইহুদী সেখানেই শেষ হলো। হযরত আলীর (রা.) হাতেই বিজয় অর্জিত হলো।[১১]

যুদ্ধের সময় হযরত আলী (রা.) ইহুদীদের একটি দুর্গের কাছে গেলে একজন ইহুদী দুর্গের ওপর থেকে জিজ্ঞাসা করলো যে, তুমি কে? হযরত আলী (রা.) বললেন, আমি আলী ইবনে আবু তালেব। ইহুদী বললো, হযরত মূসার ওপর অবতীর্ণ কেতাবের শপথ, তোমরা বুলন্দ হয়েছ। এরপর মারহাবের ভাই ইয়াসের এগিয়ে এসে বললো, কে আছো যে আমার মোকাবেলা করবে? এ চ্যালেঞ্জে সাড়া দিলেন হযরত যোবায়ের (রা.)।

এ দৃশ্য দেখে হযরত যোবায়েরের (রা.) মা হযরত ছফিয়া (রা.) বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমার পুত্র কি নিহত হবে? আল্লাহর রসূল বললেন, না বরং তোমার পুত্র তাকে হত্যা করবে। অবশেষে হযরত যোবায়ের (রা.) ইয়াসেরকে হত্যা করলেন।

এরপর হেছনে নায়েমের কাছে তুমুল যুদ্ধ হলো। অন্য ইহুদীরা মুসলমানদের মোকাবেলায় সাহসী হলো না। কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, এ যুদ্ধ কয়েকদিনব্যাপী চলেছিলো এবং মুসলমানদের যথেষ্ট কষ্ট করতে হয়েছিলো। তবুও ইহুদীরা মুসলমানদের পরাস্ত করতে ব্যর্থ হলো। ফলে চুপিসারে তারা দুর্গ ছেড়ে ছা'ব দুর্গে পালিয়ে গেলো। মুসলমানরা তখন সহজেই নায়েম দুর্গ অধিকার করলেন।

সায়াব ইবনে মোয়ায দুর্গ জয়

নায়েম দুর্গ জয়ের পর সায়াব দুর্গ ছিলো নিরাপত্তা ও শক্তির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় দুর্ভেদ্য দুর্গ। মুসলমানরা হযরত হোবাব ইবনে মুনযের আনসারীর (রা.) নেতৃত্বে এ দুর্গে হামলা করেন এবং তিনদিন যাবত অবরোধ করে রাখেন। তৃতীয় দিনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দুর্গ জয়ের জন্যে বিশেষভাবে দোয়া করেন।

ইবনে ইসহাক বর্ণনা করেছেন যে, আসলাম গোত্রের শাখা বনু ছাহামের লোকেরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে আরজ করলো যে, আমরা চূর চূর হয়ে গেছি, আমাদের কাছে কিছু নেই। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরম করুণাময়ের কাছে বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, তুমি ওদের অবস্থা জানো। তুমি জানো যে, ওদের মধ্যে শক্তি নেই, আর আমার কাছে এমন কিছু নেই যে ওদের দেবো। হে আল্লাহ তায়ালা, ইহুদীদের এমন দুর্গ জয় করিয়ে আমাদের সাহায্য করো যে দুর্গ জয় আমাদের জন্যে সর্বাধিক ফলপ্রসূ হয়, যে দুর্গে সবচেয়ে বেশী খাদ্য-সামগ্রী ও চর্বি পাওয়া যায়। আল্লাহর রসূলের এই দোয়ার পর সাহাবারা হামলা করলেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন ছা'ব ইবনে মায়া'য দুর্গ জয়ের গৌরব মুসলমানদের দান করলেন। এ দুর্গের চেয়ে অধিক খাদ্য দ্রব্য এবং চর্বি খয়বরের অন্য কোন দুর্গে ছিলো না।[১২]

দোয়া করার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে এই দুর্গের ব্যাপারে নির্দেশ দেন। নির্দেশ পালনে বনু আসলাম গোত্রের লোকেরা ছিলেন অগ্রণী। এখানে

---

১১. মারহাবের হত্যাকারী সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। সে কত তারিখে নিহত হয়েছিলো এবং সে দুর্গ কত তারিখে জয় হয়েছিলো সে সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। বোখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনার প্রক্রিয়ায় পার্থক্য বিদ্যমান। উপরোল্লিখিত বিবরণ সহীহ বোখারী অনুযায়ী উল্লেখ করা হয়েছে।

১২. ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ২৩২

দুর্গের সামনে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। তবুও সেদিনই সূর্যাস্তের আগে দুর্গ জয় করা সম্ভব হয়। মুসলমানরা সেই দুর্গে ক্ষেপণাস্ত্র এবং কাঠের তৈরী ট্যাঙ্ক লাভ করেন।[১৩]

ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় এক্ষেত্রে প্রচন্ড লড়াই এর বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। দুর্গ জয়ের পর মুসলমানরা গাধা যবাই করেন এবং উনুনে কড়াই চাপিয়ে দেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর পাওয়ার পর পালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেন।

যোবায়ের দুর্গ জয়

নায়েম এবং ছাবা দুর্গ জয়ের পর ইহুদীরা নাজাতের সকল দুর্গ থেকে বেরিয়ে যোবায়ের দুর্গে সমবেত হয়। এটি ছিলো একটি নিরাপদ ও সংরক্ষিত দুর্গ। পাহাড় চূড়ায় অবস্থিত এই দুর্গে ওঠার পথ ছিলো খুবই বন্ধুর। কোন সওয়ারী নিয়ে ওঠাতো সম্ভবই ছিলো না পায়ে হেঁটে ওঠাও ছিলো খুবই কষ্টসাধ্য। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনদিন পর্যন্ত দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। এরপর একজন হৃদয়বান ইহুদী এসে বললো, হে আবুল কাশেম, আপনি যদি একমাস যাবত দুর্গ অবরোধ করে রাখেন তবুও ইহুদীরা পরোয়া করবে না। তবে তাদের পানির ঝর্ণা নীচে রয়েছে। রাতের বেলা তারা এসে পানি পান করে এবং সারাদিনের প্রয়োজনীয় পানি তুলে নিয়ে যায়। আপনি যদি ওদের পানি বন্ধ করে দিতে পারেন, তবে তারা নত হবে। এ খবর পেয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওদের পানি বন্ধ করে দিলেন। ইহুদীদের তখন টনক নড়লো। তারা নীচে নেমে এসে প্রচন্ড যুদ্ধে লিপ্ত হলো। এতে কয়েকজন মুসলমানও শাহাদাত বরণ করলেন এবং দশজন ইহুদী দুর্বৃত্ত নিহত হলো। সবশেষে এ দুর্গেরও পতন হলো।

উবাই দুর্গ জয়

যোবায়ের দুর্গের পতনের পর ইহুদীরা উবাই দুর্গে গিয়ে সমবেত হয়। মুসলমানরা সেই দুর্গও অবরোধ করেন। এবার শক্তিগর্বে গর্বিত দুইজন ইহুদী পর্যায়ক্রমে প্রতিপক্ষকে মোকাবেলার আহবান জানায়। উভয়েই মুসলমানদের হাতে নিহত হয়। দ্বিতীয় ইহুদীর হত্যাকারী ছিলেন লাল পট্টিধারী বিখ্যাত যোদ্ধা সাহাবী হযরত আবু দোজানা সাম্মাক ইবনে খারশা আনসারী (রা.)। তিনি দ্বিতীয় ইহুদীকে হত্যা করে দ্রুত বেগে দুর্গে প্রবেশ করেন।

তাঁর সাথে সাহাবারাও ভেতরে গিয়ে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে। কিছুক্ষণ তুমুল যুদ্ধের পর ইহুদীরা দুর্গ থেকে সরে যেতে শুরু করে। অবশেষে সবাই গিয়ে নেযার দুর্গে সমবেত হয়। নেযার দুর্গ ছিলো খয়বরের প্রথম ভাগের সর্বশেষ দুর্গ।

নেজার দুর্গ জয়

এ দুর্গও ছিলো সুরক্ষিত ও নিরাপদ। ইহুদীদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, মুসলমানরা সর্বাত্মক চেষ্টা করেও এ দুর্গে প্রবেশ করতে পারবে না। তাই এতে তারা নারী ও শিশুদের সমবেত করেছিলো, অন্য কোন দুর্গে রাখেনি।

মুসলমানরা এ দুর্গে কঠোর অবরোধ আরোপ এবং ইহুদীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। একটি উঁচু পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত এ দুর্গে প্রবেশে মুসলমানরা সুবিধা করতে পারলেন না। ইহুদীরা দুর্গ থেকে বেরিয়ে মুসলমানদের সাথে মোকাবেলা করতেও সাহস পাচ্ছিলো না। তবে উপর থেকে তীর নিক্ষেপ এবং পাথর নিক্ষেপ করে তীব্র মোকাবেলা করে যাচ্ছিলো।

---

১৩. এখানে 'দাবাবে' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ শব্দের অর্থ হচ্ছে ট্যাঙ্ক। কাঠের তৈরী নিরাপদ বন্ধ গাড়ীর ভেতর দিয়ে লোক প্রবেশ করে দুর্গের দেয়ালের কাছে পৌঁছুতে পারে এবং শত্রুর হামলা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারে। এছাড়া দেয়ালে বড় ছিদ্র করারও ব্যবস্থা রয়েছে।

নেজার দুর্গ জয় কঠিন হওয়ায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েনের নির্দেশ দেন। কয়েকটি গোলা নিক্ষেপও করা হয়। এতে দুর্গ দেয়ালে ছিদ্র হয়ে যায়। সেই ছিদ্রপথে মুসলমানরা ভেতরে প্রবেশ করেন। এরপর দুর্গের ভেতরে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ইহুদীরা পরাজিত হয়। অন্যান্য দুর্গের মতোই এ দুর্গ থেকেও ইহুদীরা চুপিসারে সটকে পড়ে। নারী ও শিশুদেরকে মুসলমানদের দয়ার ওপর ছেড়ে দিয়ে তারা নিজেদের প্রাণ রক্ষা করে।

এ মজবুত দুর্গ জয়ের মাধ্যমে মুসলমানরা খয়বরের প্রথম অর্ধেক অর্থাৎ নাজাত ও শেক এলাকা জয় করেন। এখানে ছোট ছোট অন্য কয়েকটি দুর্গও ছিলো। কিন্তু এ দুর্গের পতনের পর ইহুদীরা অন্যান্য দুর্গও খালি করে দেয় এবং খয়বরের দ্বিতীয় অংশ কাতীবার দিকে পালিয়ে যায়।

খয়বরের দ্বিতীয় ভাগ জয়

নাতাত এবং শেক এলাকা জয়ের পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোতায়বা, অতীহ এবং সালালেম এলাকা অভিমুখে রওয়ানা হন। সালালেম ছিলো বনু নাজিরের কুখ্যাত ইহুদী আবুল হাকিকের দুর্গ। এদিকে নাতাত এবং শেক এলাকা থেকে পলায়নকারী সকল ইহুদীও এখানে এসে পৌঁছে দুর্গদ্বার বন্ধ করে দিয়েছিলো।

যুদ্ধ বিষয়ক বিবরণ সম্বলিত গ্রন্থাবলীতে মতভেদ রয়েছে যে, এখানের তিনটি দুর্গের কোন দুর্গে যুদ্ধ হয়েছিলো। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, কামুস দুর্গ জয় করতে যুদ্ধ হয়েছিলো। বর্ণনা দ্বারাও বোঝা যায় যে, এ দুর্গ যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করা হয়েছে। ইহুদীদের পক্ষ থেকে আত্মসমর্পণের জন্যে এখানে আলাপ আলোচনাও হয়নি।[১৪]

ওয়াকেদী সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যে, এ এলাকার তিনটি দুর্গই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মুসলমানদের হাতে অর্পণ করা হয়। সম্ভবত কামুস দুর্গ অর্পণের জন্যে কিছুটা যুদ্ধের পর আলাপ-আলোচনা হয়। অবশ্য অন্য দুটি দুর্গ যুদ্ধ ছাড়াই মুসলমানদের হাতে দেয়া হয়।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই এলাকায় অর্থাৎ কোতায়বায় আগমনের পর সেখানের অধিবাসীদের কঠোরভাবে অবরোধ করেন। চৌদ্দদিন যাবত এ অবরোধ অব্যাহত থাকে। ইহুদীরা তাদের দুর্গ থেকে বেরোচ্ছিলো না। পরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েনের নির্দেশ দেন। ইহুদীরা যখন বুঝতে পারলো যে, ক্ষেপণাস্ত্রের গোলা বর্ষণে তাদের ধ্বংস অনিবার্য, তখন তারা আল্লাহর রসূলের সাথে সন্ধির জন্যে আলোচনায় এগিয়ে আসে।

সন্ধির আলোচনা

প্রথমে ইবনে আবুল হাকিক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পয়গাম পাঠায় যে, আমি কি আপনার কাছে এসে কথা বলতে পারি? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাঁ। অনুমতি পাওয়ার পর আবুল হাকিক এই শর্তে সন্ধি প্রস্তাব পেশ করে যে, দুর্গে যেসকল সৈন্য রয়েছে তাদের প্রাণ ভিক্ষা দেয়া হবে এবং তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাও তাদের কাছেই থাকবে। অর্থাৎ তারা মুসলমানদের দাস-দাসী হিসেবে বন্দী থাকবে না। তারা নিজেদের অর্থ-সম্পদ সোনা-রূপা, জায়গা-জমি, ঘোড়া, বর্ম ইত্যাদি সব কিছু আল্লাহর রসূলের কাছে অর্পণ করবে, শুধু পরিধানের পোশাক নিয়ে বেরিয়ে যাবে।[১৫] রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ

---

১৪. ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৩১, ৩৩৬, ৩৩৭

১৫. সুনানে আবু দাউদে উল্লেখ রয়েছে যে, আল্লাহর রসূল এ শর্তে রাজি হয়েছিলেন যে, ইহুদীরা তাদের সওয়ারীর ওপর যতোটা সম্ভব অর্থ-সম্পদ নিয়ে যাবে। দেখুন আবু দাউদ, ২য় খন্ড, খয়বর প্রসঙ্গ। পৃ. ৭৬।

প্রস্তাব শুনে বললেন, যদি তোমরা কিছু লুকাও, তবে সে জন্যে আল্লাহ তায়ালা এবং তার রসূল দায়ী হবেন না। ইহুদীরা এ শর্ত মেনে নেয় এবং সন্ধি হয়ে যায়। এভাবে খয়বর জয় চূড়ান্তরূপ লাভ করে।

বিশ্বাসঘাতকতা ও তার শাস্তি

সন্ধির শর্ত লংঘন করে আবুল হাকিকের উভয় পুত্র প্রচুর ধন-সম্পদ লুকিয়ে রাখে। একটি চামড়া তারা লুকিয়ে রাখে, সেই চামড়ায় সম্পদ এবং হুয়াই ইবনে আখতারের অলংকারসমূহ ছিলো। হুয়াই ইবনে আখতার মদীনা থেকে বনু নাযিরের বহিষ্কারের সময় এসব অলংকার নিজের সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো।

ইবনে ইসহাক লিখেছেন, আল্লাহর রসূলের সামনে কেনানা ইবনে আবুল হাকিককে হাযির করা হয়। তার কাছে ছিলো বনু নাযিরের ধন-ভান্ডার। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে সরাসরি অস্বীকার করে। ধন-সম্পদ কোথায় লুকানো রয়েছে জানতে চাইলে সে বলে, সে জানে না। পরে একজন ইহুদী এসে জানায় যে, আমি কেনানাকে প্রতিদিন একটি পরিত্যক্ত এলাকায় ঘোরাফেরা করতে দেখি। এ খবর পাওয়ার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেনানাকে বললেন, যদি তোমার কাছে ধন-ভান্ডার পাওয়া যায়, তবে আমরা তোমাকে হত্যা করবো, বলো, এতে তুমি রাজি কিনা। কেনানা বললো, হাঁ রাজি। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দিষ্ট পরিত্যক্ত এলাকা খননের নির্দেশ দিলেন। সেখানে কিছু অর্থ-সম্পদ পাওয়া গেলো। অবশিষ্ট ধন-সম্পদ সম্পর্কে আল্লাহর রসূলের জিজ্ঞাসার জবাবে সে কিছু জানে না বলে জানালো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেনানাকে হযরত যোবায়ের এর (রা.) হাতে দিয়ে বললেন, ওকে শাস্তি দাও, যাতে করে ওর কাছে যা কিছু রয়েছে, সব আমাদের হাতে আসে। হযরত যোবায়ের (রা.) কেনানাকে কঠোর শাস্তি দিলেন। প্রাণ ওষ্ঠাগত হলো, তবু সে মুখ খুলল না। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুর্বৃত্তকে মোহাম্মদ ইবনে মাসলামার হাতে দিলেন। তিনি তাঁর ভাই মাহমুদ ইবনে মাসলামার হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে তাকে হত্যা করলেন। উল্লেখ্য মাহমুদ নায়েম দুর্গের কাছে এক গাছের ছায়ায় বসেছিলেন, হঠাৎ এই দুর্বৃত্ত ইহুদী কেনানা ওপর থেকে চাক্কি ফেলে মাহমুদকে হত্যা করে।

ইবনে কাইয়েম বর্ণনা করেছেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবুল হাকিকের উভয় পুত্রকে হত্যা করিয়েছিলেন। উভয়ের বিরুদ্ধে সম্পদ লুকানোর সাক্ষী দিয়েছিলেন কেনানার চাচাতো ভাই।

এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুয়াই ইবনে আখতারের কন্যা সাফিয়্যাকে বন্দী করেন। তিনি কেনানা ইবনে আবুল হাকিকের অধীনে ছিলেন। তখনো সে ছিলো নববধূ। সেই অবস্থায়ই তাকে বিদায় দেয়া হয়েছিলো।[১৬]

গনীমতের সম্পদ বন্টন

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীদের খয়বর থেকে বহিষ্কারের ইচ্ছা করেন। চুক্তির মধ্যেও এটা অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু ইহুদীরা বললো, হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনি আমাদের এই যমিনেই থাকতে দিন আমরা এর তত্ত্বাবধান করবো। এই ভূখন্ড সম্পর্কে আমরা আপনাদের চেয়ে বেশী অবগত।

এদিকে আল্লাহর রসূলের কাছে পর্যাপ্তসংখ্যক দাস ছিলো না, যারা এ জমি আবাদ এবং দেখাশোনা করতে পারে। এ কাজ করার মতো সময় সাহাবায়ে কেরামেরও ছিলো না। এসব

---

১৬. যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড,

কারণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীদের কাছে খয়বরের জমি বর্গা হিসেবে দেন। উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক মুসলমানরা পাবেন এ শর্ত দেয়া হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতোদিন চাইবেন, ততোদিন ইহুদীদের এ সুযোগ দেবেন। আবার যখন ইচ্ছা করবেন তাদের বহিষ্কার করবেন। এরপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহাকে খয়বরের জমির তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়।

খয়বরের বন্টন এভাবে করা হয়েছিলো যে, মোট জমি ৩৬ ভাগে ভাগ করা হয়। প্রতি অংশ ছিলো একশত ভাগের সমন্বয়। এভাবে মোট জমি তিন হাজার ছয়শত অংশে ভাগ করা হয়। এর অর্ধেক অর্থাৎ আঠারশ ভাগ ছিলো মুসলমানদের। সাধারণ মুসলমানদের মতোই আল্লাহর রসূলেরও শুধু একটিমাত্র অংশ ছিলো। বাকি আঠারশ ভাগ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের জাতীয় প্রয়োজন এবং আকস্মিক কোন সমস্যা মোকাবেলার জন্যে পৃথক করে রেখেছিলেন। আঠারশত ভাগে বিভক্ত করার উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, খয়বরের জমি ছিলো হোদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের জন্যে আল্লাহর একটি বিশেষ দান।

উপস্থিত অনুপস্থিত সকলের জন্যেই এ দান ছিলো প্রযোজ্য। হোদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিলো চৌদ্দশত। খয়বর আসার সময় তারা দুইশত ঘোড়া সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। সওয়ার ছাড়া ঘোড়ার জন্যেও একাংশ বরাদ্দ থাকে। ঘোড়ার অংশ একজন সৈনিকের দ্বিগুণ। এ কারণে খয়বরকে আঠারশ ভাগে ভাগ করা হয়। এর ফলে প্রত্যেক ঘোড় সওয়ার তিনভাগ হিসেবে ছয়শত ভাগ পান। আর বারোশত পদব্রজের সৈনিক বারোশত অংশ পান।[১৭]

খয়বরে প্রাপ্ত গনীমতের প্রাচুর্যের বিবরণ বোখারী শরীফের একটি হাদীসে পাওয়া যায়। মারবি ইবনে ওমর (রা.) বলেন, খয়বর জয়ের আগ পর্যন্ত আমরা পরিতৃপ্ত হতে পারিনি। হযরত আয়শা (রা.) বলেন, খয়বর বিজয়ের পর আমরা বলাবলি করলাম যে, এখন থেকে আমরা পেটভরে খেজুর খেতে পারবো।[১৮]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় ফিরে আসার পর মোহাজেররা তাদেরকে আনসারদের প্রদত্ত খেজুর গাছ ফিরিয়ে দেন। কেননা খয়বরে তারা ধন-সম্পদ এবং খেজুর গাছের মালিকানা লাভ করেছিলো।[১৯]

কতিপয় সাহাবার আগমন

এই যুদ্ধে হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হন। তাঁর সাথে আশআরি মুসলমান অর্থাৎ হযরত আবু মূসা আশআরি (রা.) এবং তাঁর বন্ধু-বান্ধবও ছিলেন।

হযরত আবু মূসা আশআরি (রা.) বলেন, ইয়েমেনে থাকার সময়ে আমি আল্লাহর রসূলের আবির্ভাবের খবর পেয়েছিলাম। আমি এবং আমার দুই ভাই আমাদের গোত্রের ৫০ জন সহ একটি নৌকায় আরোহণ করে আল্লাহর রসূলের কাছে হাযির হওয়ার জন্যে রওয়ানা হলাম। কিন্তু নৌকা আমাদেরকে হাবশায় নিয়ে পৌঁছাল। সেখানে হযরত জাফর (রা.) এবং তাঁর বন্ধুদের সাথে দেখা হলো। তারা জানালেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের পাঠিয়েছেন এবং হাবশায় থাকতে বলেছেন, আপনারাও আমার সাথে থাকুন। আমরা তখন সেখানে থাকলাম।

---

১৭. যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ১৩৭-১৩৮

১৮. সহীহ বোখারী, ৩য় খন্ড, পৃ. ৬০৯

১৯. যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ১২৮ সহীহ মুসলিম, ২য খন্ড, পৃ. ৯৬

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খয়বর জয় করার পর তাঁর কাছে হাযির হলাম। তিনি আমাদেরকেও অংশ দিলেন। আমরা ব্যতীত খয়বরে অনুপস্থিত অন্য কোন মুসলমান খয়বরের অংশ পাননি। যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীরাই শুধু গনীমতের মালের অংশ পেয়েছিলেন। হযরত জাফর এবং তাঁর সঙ্গীদের সাথে আমাদের নৌকার মাঝিরাও ভাগ পেয়েছিলেন। এদের সকলের মধ্যেই গনীমতের মাল বন্টন করা হয়েছিলো।[২০]

হযরত সফিয়্যার সাথে বিবাহ

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বামীকে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে হত্যা করার পর হযরত সফিয়্যা বন্দী মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত হন। বন্দী মহিলাদের একত্রিত করার পর হযরত দেহইয়া ইবনে খলিফা কালবী (রা.) আল্লাহর রসূলের কাছে একজন দাসী চান। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যাও একজনকে পছন্দ করো। হযরত দেহিয়া হযরত সফিয়্যাকে পছন্দ করলেন। এরপর একজন লোক এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আপনি বনু কোরায়যা এবং বনু নাযির গোত্রের নেত্রীকে দেহিয়্যার জন্যে মনোনীত করেছেন অথচ তিনি একমাত্র আপনারই উপযুক্ত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, উভয়কে ডেকে নিয়ে এসো। উভয়ে হাযির হলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত দেহইয়াকে বললেন, অন্য কোন দাসীকে তুমি পছন্দ করো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সফিয়্যাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি হৃষ্ট চিত্তে ইসলাম কবুল করেন। এরপর তিনি হযরত সফিয়্যাকে আযাদ করে দেন এবং তার আযাদীকে মোহরানা নির্ধারণ করে তাকে বিবাহ করেন। মদীনায় পৌছার পথে হযরত উম্মে ছুলাইই (রা.) হযরত সফিয়্যাকে সজ্জিত করেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরদিন সকালে খেজুর, ঘি এবং ছাতু দিয়ে সাহাবাদের মেহমানদারী করেন।[২৩] হযরত সফিয়্যার চেহারায় দাগ দেখে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কারণ জানত চান। হযরত সফিয়্যা বলেন, হে আল্লাহর রসূল আপনার খয়বরে যাওয়ার আগে আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম যে, চাঁদ আকাশ থেকে আমার কোলে এসে পড়েছে। আমার স্বামীর কাছে সকালে এই স্বপ্নের কথা বললে তিনি আমাকে চড় দিয়ে বললেন, তুমি কি মদীনার বাদশাহকে পেতে চাও।[২৪]

বিষ মিশ্রিত গোশতের ঘটনা

খয়বর বিজয়ের পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চিত হলেন। এ সময় সালাম ইবনে মুশকিম এর স্ত্রী যয়নব বিনতে হারেছ তাঁর কাছে বকরির ভুনা গোশত উপঢৌকন হিসেবে পাঠায়। সেই মহিলা আগেই খবর নিয়েছিলো যে, আল্লাহর রসূল বকরির কোন অংশ বেশী পছন্দ করেন। শোনার পর পছন্দনীয় অংশে বেশী করে বিষ মেশায়। অন্যান্য অংশেও বিষ মেশায়। এরপর আল্লাহর রসূলের সামনে এনে সেই বিষ মিশ্রিত গোশত রেখে দেয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পছন্দনীয় অংশের একটুকরো মুখে দেন। কিন্তু চিবিয়েই তিনি ফেলে দেন। তিনি এরপর বললেন, এই যে হাড় দেখছো এই হাড় আমাকে বলছে যে, আমার মধ্যে বিষ মেশানো রয়েছে। যয়নবকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করা হলো, সে স্বীকার করলো। তিনি বললেন, তুমি কেন একাজ করেছ? মহিলা বললো, আমি ভেবেছিলাম যদি এই ব্যক্তি বাদশাহ হন, তবে আমরা তার শাসন থেকে মুক্তি পাবো, আর যদি এই ব্যক্তি নবী হন, তবে আমার বিষ মেশানোর

---

[২০]. বোখারী, ১ম খন্ড, ফতহুল বারী, ৪র্থ খন্ড।

[২৩]. সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ৫৪, যাদুল মায়াদ ২য় খন্ড, পৃ. ১'৩৭

[২৪]. সহীহ বোখারী, যাদুল মায়াদ ইবনে হিশাম।

খবর তাকে জানিয়ে দেয়া হবে। এ নির্জলা স্বীকারোক্তি শুনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই মহিলাকে ক্ষমা করে দিলেন।

এ ঘটনার সময় আল্লার রসূলের সাথে হযরত বাশার ইবনে বারা ইবনে মারুরও ছিলেন। তিনি এক লোকমা খেয়েছিলেন। এতে তিনি বিষক্রিয়ায় ইন্তেকাল করেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই মহিলাকে ক্ষমা না হত্যা করেছিলেন, এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। একাধিক বর্ণনার সমন্বয় এভাবে করা হয়েছে যে, প্রথমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ক্ষমা করলেও, হযরত বাশার-এর ইন্তেকালের পর কেসাসস্বরূপ তাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[২৫]

খয়বরের যুদ্ধে নিহত ব্যক্তিরা

এ অভিযানে বিভিন্ন সময়ে ১৬জন শহীদ হয়েছিলেন। তন্মধ্যে ৪ জন কোরায়শ, একজন আশজা গোত্রের, একজন আসলাম গোত্রের, একজন খয়বরের অধিবাসী এবং ৯ জন আনসার।

অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী এ অভিযানে মোট ১৮জন শহীদ হন। আল্লামা মনসুরপুরী ১৯ জনের কথা লিখেছেন। অবশ্য, তিনি একথাও উল্লেখ করেছেন যে, সীরাত রচয়িতারা ১৫ জনের কথা লিখেছেন। অনুসন্ধান করে আমি ২৩ জনের নাম পেয়েছি। জানিফ ইবনে ওয়ায়েলার নাম শুধু ওয়াকেদী উল্লেখ করেছেন। আর জানিফ ইবনে হানিফের নাম তিবরি উল্লেখ করেন। বাশার ইবনে বারা ইবনে মারুর এর ইন্তেকাল হয়েছিলো যুদ্ধশেষে বিষ মেশানো গোশত খাওয়ায়। বাশার ইবনে আবদুল মোনযের সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা রয়েছে। এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি বদর যুদ্ধে শহীদ হন, অন্য বর্ণনায় রয়েছে তিনি খয়বর যুদ্ধে শহীদ হন। আমার মতে প্রথমোক্ত বর্ণনাই নির্ভরযোগ্য।[২৬] আর নিহত ইহুদীদের সংখ্যা ছিলো ৯৩।

ফেদেক

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খয়বর পৌঁছে মোহাইয়াসা ইবনে মাসউদকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্যে মোহাইয়াসা পাঠান। কিন্তু ফেদেকের অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করতে দেরী করে। খয়বর মুসলমানদের অধিকারে আসার পর ফেদেকের অধিবাসীদের মধ্যে এর প্রভাব বিস্তার করে, তারা আল্লাহর রসূলের কাছে প্রতিনিধি পাঠিয়ে খয়বরের মতো উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক প্রদানের শর্তে সমঝোতার প্রস্তাব পেশ করে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা গ্রহণ করেন। এতে করে ফেদেকের জমি বিশেষভাবে আল্লাহর রসূলের জন্যে নির্ধারিত থাকে। কেননা, মুসলমানরা ফেদেক অভিযানের জন্যে যাননি অর্থাৎ তলোয়ারের জোরে ফেদেক জয় করা হয়নি।[২৭]

ওয়াদিউল কোরা

খয়বর অভিযান শেষে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়াদিউল কোরা অভিমুখে রওয়ানা হন। সেখানেও ছিলো একদল ইহুদী। তাদের সাথে একদল আরবও যোগ দেয়। মুসলমানরা সেখানে পৌঁছার পর ইহুদীরা তীর দিয়ে অভ্যর্থনা জানায়। তারা আগে থেকেই সারিবদ্ধ অবস্থায় ছিলো। ইহুদীদের তীর নিক্ষেপে আল্লাহর রসূলের একজন ভৃত্য মারা যান। সাহাবারা বললেন, তার জন্যে জান্নাত মোবারক হোক। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কিছুতেই নয়। সেই জাতের শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, সে ভৃত্য খয়বর যুদ্ধের

---

[২৫]. যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ১৩৯, ফতহুল বারী, সপ্তম খন্ড, পৃ. ৪৯৭ ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৩৭

[২৬]. যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ১৩৯, ফতহুল বারী সপ্তম খন্ড, পৃ. ৪৯৭ ইবনে হিশাম ২য় খন্ড পৃ. ৩৩৭

[২৭]. ইবনে হিশাম, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৩৭

গনীমতের মাল বন্টন হওয়ার আগে যে চাদর চুরি করেছিলো সেই চাদর আগুন হয়ে তাকে ঘিরে আছে।[২৮]

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর যুদ্ধের জন্যে সাহাবাদের বিন্যস্ত করেন। হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাকে সেনাপতি করা হয়। হোবাব ইবনে মানযারকে একটি পতাকা এবং ওবাদা ইবনে বাশারকে অপর একটি পতাকা প্রদান করা হয়। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহুদীদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেন। তারা গ্রহণ করেনি। ওদের একজন যুদ্ধের জন্যে এগিয়ে আসে। মুসলমানদের পক্ষ থেকে হযরত যোবায়ের ইবনে আওয়াম (রা.) এগিয়ে যান এবং ইহুদীকে হত্যা করেন। অন্য একজন ইহুদী এগিয়ে এলে হযরত যোবায়ের তাকেও হত্যা করেন। তৃতীয় একজন ইহুদী এগিয়ে এলে তার সাথে মোকাবেলার জন্যে হযরত আলী (রা.) এগিয়ে গিয়ে তাকেও হত্যা করেন। এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে ১১ জন ইহুদী নিহত হয়। একজন ইহুদী নিহত হলেই আল্লাহর রসূল অন্য ইহুদীদের কাছে ইসলামের দাওয়াত দিতেন।

নামাযের সময় হলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে নামায আদায় করতেন এরপর ইহুদীদের মুখোমুখি হয়ে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। এমনিভাবে লড়াই করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। পরদিন সকালে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের সঙ্গে নিয়ে ইহুদীদের সাথে মোকাবেলার জন্যে পুনরায় হাযির হন। সূর্য তখনো বেশী ওপরে ওঠেনি। এ সময়েই ইহুদীরা আত্মসমর্পণ করে। গনীমতের মাল দান করেন।

আল্লাহর রসূল ওয়াদিউল কোরায় চারদিন অবস্থান করেন। যুদ্ধলব্ধ অর্থ-সম্পদ সাহাবাদের মধ্যে বন্টন করে দেন। তবে, জমি এবং খেজুর বাগান ইহুদীদের কাছে রেখে দেন। সেই বিষয়ে খয়বরের ইহুদীদের অনুরূপ চুক্তি করা হয়।[২৯]

তায়মা

তায়মার ইহুদীরা খয়বর ফেদেক ওয়াদিউল কোরা বা কোরা প্রান্তরে ইহুদীদের পরাজয় ও আত্মসমর্পণের খবর পায়। এরপর তারা নিজেরাই প্রতিনিধি পাঠিয়ে সন্ধির প্রস্তাব করে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[৩০] আল্লাহর রসূল এ সম্পর্কে একটি চুক্তিও লেখান। চুক্তির কথা ছিলো এই যে, এই লেখা আল্লাহর রসূল মোহাম্মদের পক্ষ থেকে বনু তায়মার জন্যে। তাদের জন্যে দায়িত্ব রয়েছে। তাদেরকে জিযিয়া কর দিতে হবে। তাদের সাথে বাড়াবাড়ি করা হবে না এবং দেশ থেকে বহিষ্কারও করা হবে না। এ চুক্তি স্থায়ী বলে বিবেচিত হবে। চুক্তিপত্রের কথাগুলো লিখেছিলেন হযরত খালেদ ইবনে সাঈদ (রা.)।

মদীনায় প্রত্যাবর্তন

এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার পথে রওয়ানা হন। ফেরার সময়ে এক প্রান্তরের কাছে পৌঁছে সাহাবারা উচ্চস্বরে তকবির ধ্বনি দেন। তারা বলেন, আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, অতো জোরে বলার দরকার নেই। তোমরা কোন বধির বা অনুপস্থিত সত্তাকে ডাকছো না, বরং এমন এক সত্তাকে ডাকছো, যিনি শোনেন এবং কাছেই রয়েছেন।

---

২৮. সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৬০৭

২৯ যাদুল মায়াদ ২য় খন্ড, পৃ. ১৪৬-১৪৭

৩০. একই গ্রন্থ একই পৃষ্ঠা,

ফেরার পথে সারারাত সফর শেষে শেষরাতে একস্থানে বিশ্রাম নেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত বেলালকে বলেছিলেন, তুমি জেগে থাকবে এবং ফজরের নামাযের সময় আমাদের জাগিয়ে দেবে। হযরত বেলাল (রা.) পূর্বদিকে মুখ করে তাঁর সওয়ারীর সাথে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু পথশ্রমের ক্লান্তিতে এক সময় তিনিও ঘুমিয়ে পড়েন। কেউই নামাযের সময়ে জাগতে পারেননি। সর্বপ্রথম আল্লাহর রসুলের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তিনি সাহাবাদের জাগিয়ে সেই স্থান থেকে কিছু সামনে এগিয়ে যান। এরপর সাহাবাদের নিয়ে ফজরের নামায আদায় করেন। বলা হয়ে থাকে যে, এ ঘটনা দ্বিতীয় সফরের সময় ঘটেছিলো।[৩৩]

খয়বরের ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আল্লাহর রসূল সপ্তম হিজরীর সফর মাসের শেষ দিকে রবিউল আউয়াল মাসে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

ছ্যারিয়্যা আবান ইবনে সাঈদ

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা ভালোভাবে জানতেন যে, হারাম মাসসমূহ শেষ হওয়ার পর মদীনাকে অরক্ষিত অবস্থায় রাখা দূরদর্শিতা এবং প্রজ্ঞার পরিচায়ক নয়। কেননা মদীনার আশে পাশে এমন অনেক বেদুইন রয়েছে, যারা লুটতরাজ এবং ডাকাতির জন্যে মুসলমানদের অমনোযোগিতার অপেক্ষায় থাকে। এ কারণে খয়বর অভিযানে যাওয়ার সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেদুইনদের ভীত সন্ত্রস্ত রাখার জন্যে আবান ইবনে সাঈদের (রা.) নেতৃত্বে নজদের দিকে এক সামরিক বাহিনী প্রেরণ করেন। আবান ইবনে সাঈদ তার দায়িত্ব পালন শেষে ফেরার সময়ে আল্লাহর রসূলের সাথে খয়বরে মোলাকাত হয়। সেই সময় খয়বর জয় হয়েছিলো।

ছারিয়্যা বা ছোট ধরনের এ সামরিক অভিযান সপ্তম হিজরীর সফর মাসে পাঠানো হয়েছিলো। সহীহ বোখারীতে এ ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।[৩৪] অবশ্য, হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি লিখেছেন, 'এই সামরিক অভিযান সম্পর্কে আমি কিছু জানতে পারিনি।'[৩৫]

---

[৩৩]. ইবনে হিশাম, ২য় কন্ড, পৃ. ৩৪০

[৩৪].বোখারী, খয়বর যুদ্ধ অধ্যায় ২য় খন্ড, পৃ. ৬০৮, ৬০৯

[৩৫]. ফতহুল বারী, সপ্তম খন্ড, পৃ. ৪৯১

যাতুর রেকা অভিযান

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খন্দকের তিনটি শক্তির মধ্যে দু'টি শক্তি নিজ নিয়ন্ত্রণে আনার পর তৃতীয় শক্তির প্রতি মনোযোগী হওয়ার সুযোগ পেলেন। এরা ছিলো বেদুইন। নজদের প্রান্তরে তাঁবুতে তারা জীবন কাটাতো। লুটতরাজই ছিলো তাদের জীবিকার উৎস।

বেদুইনরা কোন জনপদ বা শহরের অধিবাসী ছিলো না। বাড়ীঘর বা দুর্গের মধ্যে তারা বসবাস করতো না। এ কারণে মক্কা এবং খয়বরের অধিবাসীদের মতো তাদের নিয়ন্ত্রণ এবং দস্যুবৃত্তির আগুন পুরোপুরি নির্বাপিত করা ছিলো কষ্টসাধ্য। তাদের শুধু ভীত-সন্ত্রস্ত করার মতো কাজ করাই ছিলো প্রয়োজনীয়।

এ সকল বেদুইনকে প্রভাবিত মদীনার আশে পাশে সমবেত বেদুইনদের ছত্রভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে রসূলুল্লাল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক শিক্ষাদানমূলক অভিযান পরিচালনা করেন। এ অভিযানই যাতুর রেকা অভিযান নামে পরিচিত।

সীরাত রচয়িতারা উল্লেখ করেছেন যে, চতুর্থ হিজরীতে এ অভিযান পরিচালিত হয়েছিলো। কিন্তু ইমাম বোখারী (রা.) উল্লেখ করেছেন যে, সপ্তম হিজরীতে এ অভিযান চালানো হয়। এ অভিযানে হযরত আবু হোরায়রা (রা.) এবং হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা.) অংশগ্রহণ করেছিলেন এ কারণে সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, খয়বর যুদ্ধের পরই এ ঘটনা ঘটেছিলো। কেননা হযরত আবু হোরায়রা (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খয়বর অভিযানে রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর মদীনায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি খয়বরে গিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দেখা করেন। ততোদিনে খয়বর বিজয় সমাপ্ত হয়ে গেছে। হযরত আবু মূসা আশয়ারীও হাবশা থেকে সেই সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে খয়বরে পৌঁছেছিলেন যখন খয়বর বিজিত হয়েছে। এ কারণে যাতুর রেকা অভিযানে উল্লিখিত দু'জন সাহাবীর অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে, এ অভিযান খয়বর বিজয়ের পর কোন এক সময় ঘটেছিলো।

সীরাত রচয়িতারা এ অভিযান সম্পর্কে যা কিছু উল্লেখ করেছেন তার সার কথা হচ্ছে এই যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসার বা বনু গাতফানের দু'টি শাখা বনি ছালাবা এবং বনি মাহারেবের সমবেত হওয়ার খবর পেয়ে মদীনায় ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব হযরত আবু যর গেফারী (রা.) মতান্তরে হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.)-এর ওপর ন্যস্ত করেন। পরে চারশত মতান্তরে সাতশত সাহাবাকে নিয়ে নজদ অভিমুখে যাত্রা করেন। মদীনা থেকে দুইদিনের পথের নাখলা নামক জায়গায় পৌঁছার পর তারা বনু গাতফানের একদল লোকের মুখোমুখি হন। কিন্তু তাদের সাথে যুদ্ধ হয়নি। তবে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে খওফ নামায আদায় করেন।

সহীহ বোখারী শরীফে হযরত আবু মূসা আশয়ারী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে বেরুলাম। আমরা ছিলাম ছয়জন। মাত্র একটি উট ছিলো। পালাক্রমে আমরা সেই উটের পিঠে সওয়ার হচ্ছিলাম। ফলে হাঁটতে হাঁটতে পায়ে ফোস্কা পড়ে যায়। আমার নিজের দুই পা যখম হয়ে যায়, নখে আঘাত পাই। ফলে আমরা পায়ে পট্টি বেঁধেছিলাম। যাতুর রেকা মানে হচ্ছে পট্টিওয়ালা। কেননা এ অভিযানের সময় আমরা পায়ে পট্টি বেঁধে রেখেছিলাম।[১]

১. সহীহ বোখারী, যাতুর রেকা অভিযান অধ্যায়, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৯২, সহীহ মুসলিম যাতুর রেকা অধায় ২য় খন্ড, পৃ. ১১৮

সহীহ বোখারীতে হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমরা যাতুর রেকা অভিযানের সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। নিয়ম ছিলো যখন আমরা কোন ছায়াদানকারী গাছের নীচে যেতাম তখন সেই গাছের ছায়া রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যে রাখতাম। একবার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ছায়াদানকারী গাছের নীচে বিশ্রাম করছিলেন, সাহাবারা এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে গিয়েছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গাছের শাখায় তলোয়ার ঝুলিয়ে বিশ্রাম নেয়ার এক পর্যায়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। হযরত যাবের বলেন, আমরা সকলেও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ইত্যবসরে একজন পৌত্তলিক এসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তলোয়ার হাতে নিয়ে বললো, তুমি আমাকে ভয় পাও? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, না, মোটেই না। পৌত্তলিক বললো, তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তায়ালা।

হযরত জাবের (রা.) বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ডাকলেন। আমরা তাঁর কাছে গিয়ে দেখি একজন অপরিচিত লোক তলোয়ার হাতে নিয়ে বসে আছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি শুয়েছিলাম, এমন সময় এই লোকটি আমার তলোয়ার হাতে নিয়েছে এরপর আমাকে বলেছে, তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? আমি বলেছি, আল্লাহ রক্ষা করবেন। এই সেই লোক। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কোন কটু কথা বলেননি।

আবু আওয়ানার বর্ণনায় আরো উল্লেখ রয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই বললেন যে, আল্লাহ তায়ালা রক্ষা করবেন তখনই তার হাত থেকে তলোয়ার খসে পড়ে যায়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তলোয়ার হাতে নিয়ে লোকটিকে বললেন, এবার বলো, তোমাকে কে রক্ষা করবে? লোকটি বললো, আপনার দয়াই আমার ভরসা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই এবং মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রসূল। লোকটি বললো, আমি আপনার সাথে অঙ্গীকার করছি যে, আপনার সাথে লড়াই করবো না এবং যারা আপনার সাথে লড়াই করে তাদের কোন প্রকার সাহায্য করবো না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরে লোকটিকে ছেড়ে দিয়েছিলেন বলে হযরত জাবের (রা.) উল্লেখ করেছেন। লোকটি নিজের কওমের কাছে গিয়ে বললো, আমি সবচেয়ে ভালো মানুষের কাছ থেকে তোমাদের কাছে এসেছি।[২]

সহীহ বোখারীর এক বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, নামাযের একামত বলা হয়েছে এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদল সাহাবাকে দুই রাকাত নামায পড়ালেন। এরপর তারা পেছনে চলে যান এবং তিনি অন্য একদল সাহাবাকে দুই রাকাত নামায পড়ান। এতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চার রাকাত এবং সাহাবাদের দুই রাকাত নামায আদায় হয়।[৩] এই বর্ণনার বর্ণনাক্রম থেকে বোঝা যায় যে, এই নামায উল্লিখিত ঘটনার পরেই আদায় করা হয়।

সহীহ বোখারীর বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, এ লোকটির নাম গোওরেস ইবনে হারেছ। উক্ত বর্ণনা মোসাদ্দাদ আবু আওয়ানা থেকে এবং আবু আওয়ানা আবু বিশর থেকে উল্লেখ করেছেন।[৪]

---

২. মুখতাছারুছ সিরাত, শেখ আবদুল্লাহ নজদী। পৃ. ২৬৪, ফতুহুল বারী, সপ্তম খন্ড, পৃ. ৪১৬
৩. সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ৪০৭, ৪০৮, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৯৩
৪. সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৯৩

ইবনে হাজার আসকালানি বলেন, ওয়াকেদী এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করতে গিয়ে বলেছেন, সেই বেদুইনের নাম ছিলো দাসুর এবং সে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো। কিন্তু ওয়াকেদীর কথা থেকে বোঝা যায় যে, ঘটনা দু'টি পৃথক সময়ে ঘটেছিলো। পৃথক পৃথক দু'টি যুদ্ধের সময় এ ঘটনা দু'টি ঘটে। আল্লাহই ভালো জানেন।[৫]

এ অভিযান থেকে ফিরে আসার সময় সাহাবায়ে কেরাম একজন মোশরেক নারীকে আটক করেন। এ খবর পেয়ে সেই মহিলার স্বামী প্রতিজ্ঞা করে যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে থেকে সে একজনের রক্ত প্রবাহিত করবে। প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্যে যে রাত্রিকালে এলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে শত্রুদের হাত থেকে হেফাযত করতে ওব্বাদ ইবনে বাশার এবং আম্মার ইবনে ইয়াসেরকে নিযুক্ত রেখেছিলেন। লোকটি আসার সময়ে হযরত ওব্বাদ নামায আদায় করছিলেন। সে অবস্থায় শত্রু তাঁকে তীর নিক্ষেপ করে। তিনি নামায না ছেড়ে এক ঝটকায় তীর বের করে ফেলেন। লোকটি দ্বিতীয়বার তীর নিক্ষেপ করলো এরপর তৃতীয়বার তীর নিক্ষেপ করলো। প্রতিবারই তিনি তীর খুলে ফেলেন। ছালাম ফিরায়ে নামায শেষ করার পর সঙ্গীকে জাগালেন এবং সব কথা জানালেন। সঙ্গী হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের বিস্মিত হয়ে বললেন, আপনি আমাকে কেন জাগালেন না? তিনি বললেন, আমি একটি সূরা তেলাওয়াত করছিলোম, সূরাটি শেষ না করে নামায শেষ করতে আমার ইচ্ছা হচ্ছিলো না।[৬]

কঠিন হৃদয় আরব বেদুইনদের অর্থাৎ যাযাবরদের প্রভাবিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত করতে এ যুদ্ধ ছিলো খুবই কার্যকর। এই অভিযানের পরবর্তী সময়ের অভিযানসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এই অভিযানের পর গাতফানের গোত্রসমূহ মাথা তোলার সাহস পায়নি। তারা ধীরে ধীরে নিস্তেজ এবং হীনবল হয়ে এক সময় ইসলাম গ্রহণ করে। এ সকল আরব গোত্রের কয়েকটিকে মক্কা বিজয় এবং হোনায়েনের যুদ্ধের সময় মুসলমানদের সাথে দেখা গেছে। তাদেরকে গনীমতের মালের অংশও প্রদান করা হয়েছে। মক্কা বিজয় থেকে ফিরে আসার পর তাদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করতে ইসলামী রাষ্ট্রের কর্মচারীদের প্রেরণ করা হয়েছিলো এবং তারা যথারীতি যাকাত পরিশোধ করেছিলো। মোটকথা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্মপদ্ধতির ফলে খন্দকের যুদ্ধের সময়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো তিনটি শক্তিই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। এর ফলে সমগ্র এলাকায় শান্তি ও নিরাপত্তার বিস্তার ঘটে। এরপরে বিভিন্ন এলাকায় কিছু কিছু গোত্র হৈ চৈ করেছিলো কিন্তু মুসলমানরা সহজেই তাদেরকে কাবু করে ফেলেন। এই অভিযানের পরই বড় বড় শহর ও দেশ জয়ের অভিযানের পথ মুসলমানদের জন্যে প্রশস্ত হতে শুরু করে। কেননা, এ অভিযানের পর দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ইসলাম ও মুসলমানদের অনুকূলে আসে।

সপ্তম হিজরীর কয়েকটি ছারিয়্যা

উল্লিখিত অভিযান থেকে ফিরে আসার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সপ্তম হিজরীর সওয়াল মাসে মদীনায় অবস্থান করেন এবং এ সময়ে কয়েকটি ছ্যারিয়্যায় সাহাবাদের প্রেরণ করেন। ছারিয়্যা ক'টির বিবরণ নিম্নরূপ।

---

৫. ফতহুল বারী, সপ্তম, খন্ড, পৃ. ৪২৮

৬. যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ১১২, এই যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ২০৩, ২০৯, যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ১১০, ১১১, ১১২, ফতহুল বারী, সপ্তম খন্ড, পৃ. ৪১৭, ৪২৮

১. ছারিয়্যা কোদাইদ

সপ্তম হিজরীর সফর বা রবিউল আউয়াল মাস

গালিব ইবনে আবদুল্লাহ লাইসি (রা.)-এর নেতৃত্বে এই ছারিয়্যা কোদাইদ এলাকায় বনি মালুহ গোত্রের লোকদের কৃতকর্মের শিক্ষা দেয়ার জন্যে প্রেরণ করা হয়। বনি মালুহ বিশর ইবনে ছুয়াইদের বন্ধুদের হত্যা করেছিলো। এই হত্যাকান্ডের প্রতিশোধের জন্যে এ অভিযান প্রেরণ করা হয়। প্রেরিত সাহাবারা রাতের বেলা আকস্মিক অভিযান চালিয়ে বেশ কিছু লোককে হত্যা করেন। শত্রুরা এক বিরাট দল নিয়ে মুসলমানদের মোকাবেলায় অনুসরণ করেছিলো কিন্তু তারা মুসলমানদের কাছে এলে বৃষ্টি শুরু হয়। কিছুক্ষণ পর পানির সয়লাব দেখা দেয়। এই সয়লাব উভয় দলের মাঝে হওয়ায় শত্রুরা কাছে আসতে পারেনি। ফলে মুসলমানরা নিরাপদে বাকি পথ অতিক্রম করে।

২. ছ্যারিয়া হাছমি

সপ্তম হিজরীর জমাদিউস সানি মাস

বিশ্ব নেতৃবৃন্দের নামে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিঠি শীর্ষক অধ্যায়ে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. ছারিয়্যা তোরবা

সপ্তম হিজরীর শাবান মাস

এ ছারিয়্যা হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর নেতৃত্বে পরিচালনা করা হয়। তাঁর সাথে ছিলেন তিরিশ জন সাহাবা। তারা রাতের বেলা সফর এবং দিনের বেলায় লুকিয়ে থাকতেন। বনু হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা এ খবর পাওয়ার পর পালিয়ে যায়। হযরত ওমর (রা.) এবং তাঁর সঙ্গীরা তখন মদীনায় ফিরে আসেন।

৪. ফেদেক অঞ্চলে ছারিয়্যা

সপ্তম হিজরীর শাবান মাস

হযরত বশীর ইবনে সা'দ আনসারী (রা.)-এর নেতৃত্বে তিরিশজন সাহাবার একটি দল অভিযানে বের হন। বনু মাররা গোত্রের লোকদের শিক্ষা দিতেই এটি প্রেরণ করা হয়।

হযরত বশীর তাঁর এলাকায় পৌঁছে ভেড়া, বকরি এবং অন্য পশুপাল তাড়িয়ে নিয়ে আসেন। রাতে শত্রুরা এসে তাদের ঘিরে ধরে। মুসলমানরা তীর নিক্ষেপ করেন। একপর্যায়ে বশীর এবং তার সঙ্গীদের তীর শেষ হয়ে যায়। ফলে নিরস্ত্র মুসলমানদের শত্রুরা একে একে হত্যা করে। একমাত্র বশীর বেঁচেছিলেন। তাঁকে আহত অবস্থায় উঠিয়ে ফেদেকে নিয়ে আসা হয় এবং তিনি ইহুদীদের কাছেই অবস্থান করেন। দুই মাস পর ক্ষত শুকালে তিনি মদীনায় ফিরে আসেন।

৫. ছারিয়্যা মাইফাআ

সপ্তম হিজরীর রমযান মাস

গালিব ইবনে আবদুল্লাহর নেতৃত্বে এই ছারিয়্যা বনু আউয়াল এবং বনু আবদ ইবনে ছালাবা গোত্রকে শিক্ষা দেয়ার জন্যে পাঠানো হয়। অপর এক বর্ণনায় জুহাইনা গোত্রের হারকাত শাখার লোকদের শিক্ষা দেয়ার জন্যে পাঠানো হয় বলে উল্লেখ রয়েছে। এতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো একশত ত্রিশ। এরা শত্রুদের ওপর একযোগে হামলা করেন। যারা মাথা তুলছিলো তাদেরই হত্যা করা হচ্ছিলো। এরপর ভেড়া ও বকরিসহ পশুপাল হাঁকিয়ে নিয়ে আসেন। এই অভিযানেই হযরত উছামা ইবনে যায়েদ (রা.) নুহায়েক ইবনে মারদাস নামক এক ব্যক্তিকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলা সত্ত্বেও হত্যা করেছিলেন। এ খবর শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, তুমি কেন তার বুক চিরে জেনে নাওনি, সে সত্য ছিলো, নাকি মিথ্যা ছিলো?

৬. ছারিয়্যা খয়বর

সপ্তম হিজরীর শওয়াল মাস

ত্রিশ সাহাবার সমন্বয়ে এই ছারিয়্যা প্রেরণ পরিচালনা করা হয়েছিলো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রা.) এ অভিযানের নেতৃত্বে দেন। কারণ ছিলো এই যে, আসীর, মতান্তরে বশীর ইবনে যারাম বনু গাতফান গোত্রের লোকদেরকে মুসলমানদের ওপর হামলা করতে সমবেত করেছিলো। মুসলমানরা আসীরকে আশ্বাস দেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে খয়বরের গবর্নর নিযুক্ত করবেন। এ আশ্বাস দেয়ায় আসীর এবং তার তিরিশ জন সঙ্গী মুসলমানদের সাথে মদীনায় যেতে রাজি হয়। কারকারানিয়ার নামক জায়গায় পৌঁছে উভয় পক্ষে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এর ফলে আছির এবং তার সঙ্গীদের প্রাণ হারাতে হয়েছিলো।

৭. ছারিয়্যা ইয়ামান অজাবার

সপ্তম হিজরীর শওয়াল মাস

জাবার বনু গাতফান, মতান্তরে বনু ফাজায়া এবং বনু আজারার এলাকার নাম। হযরত বশীর ইবনে কা'ব আনসারীকে তিনশত মুসলমানসহ সেখানে প্রেরণ করা হয়। মদীনায় হামলা করতে সমবেত এক বিরাট শত্রু সৈন্যের মোকাবেলার জন্যে এদের প্রেরণ করা হয়। মুসলমানরা রাতে সফর করতেন এবং দিনে আত্মগোপন করে থাকতেন। শত্রুরা হযরত বশীরের (রা.) আগমনের খবর পেয়ে পালিয়ে যায়। হযরত বশীর (রা.) বহু পশু মদীনায় নিয়ে আসেন। এছাড়া দু'জন লোককে বন্দী করে মদীনায় এনেছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে নেয়ার পর তারা ইসলাম গ্রহণ করেন।

৮. ছারিয়্যা গাবা

ইমাম ইবনে কাইয়েম ওমরায়ে কাজার আগে সপ্তম হিজরীতে সংঘটিত ছারিয়্যা অর্থাৎ শুধু মাত্র সাহাবায়ে কেরামের সমন্বয়ে প্রেরিত সামরিক অভিযানসমূহের মধ্যে এই অভিযানকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। এই অভিযানের সারকথা হচ্ছে এই যে, জাশম ইবনে মাবিয়া গোত্রের একজন লোক বহুসংখ্যক লোককে সঙ্গে নিয়ে গাবায় এসেছিলেন। সে বনু কায়েসকে মুসলমানদের সাথে লড়াই করতে সমবেত করতে চাচ্ছিল। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবু হাদরাওকে মাত্র দুইজন লোকসহ প্রেরণ করেন। হযরত হাদরাও এমন সামরিক কৌশল গ্রহণ করেন যে, শত্রুরা পরাজয় বরণ করে এবং বহু উট বকরি মুসলমানদের অধিকারে আসে।[১]

কাজা ওমরাহ পালন

ইমাম হাকেম বলেছেন, এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, যিলকদ এর চাঁদ ওঠার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামদের কাজা ওমরাহ পালনের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দেন। হোদায়বিয়ার সন্ধির সময়ে যে সকল সাহাবা উপস্থিত ছিলেন, তাদের কেউ যেন অনুপস্থিত না থাকেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে কথাও উল্লেখ করেন। সন্ধির পর শাহাদাত বরণকারীরা ব্যতীত অন্যসব সাহাবা এবং সন্ধির সময়ে অনুপস্থিত ছিলেন এমন বেশ কিছু সাহাবাও ওমরাহ পালনের প্রস্তুতি নেন। মহিলা ও শিশু ছাড়া সাহাবাদের সংখ্যা ছিলো দুই হাজার।[২]

---

১. যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ১৪৯, ১৫০, রহতুল লিল আলামীল, ২য় খন্ড, পৃ. ২২৯, ২৩০, ২৩১, যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, তালকিহুল ফুহুম পৃ. ৩১, মুখতাছারুছ সিয়ার শেখ আবদুল্লাহ নজদী, পৃ. ৩২২, ৩২৩, ৩২৪

২. ফতহুল বারী, সপ্তম খন্ড, পৃ. ৫০০

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু রেহম গেফারীকে মদীনায় তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। ষাটটি উট সঙ্গে নেয়া হয় এবং সেসব উটের দেখাশোনার দায়িত্ব নাজিয়া ইবনে জুন্দব আসলামির ওপর ন্যস্ত করা হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম যুল হোলাইফা থেকে ওমরাহর এহরাম বাঁধেন এবং লাব্বায়েক ধ্বনি দেন। কোরায়শদের পক্ষ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কায় মুসলমানরা অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে নেন। এসব অস্ত্রের মধ্যে ছিলো ঢাল, তীর, বর্শা তলোয়ার। ইয়াজেজ প্রান্তরে পৌঁছার পর সকল অস্ত্র আওস ইবনে খাওলি আনসারীর নেতৃত্বে রেখে মুসলমানরা অগ্রসর হন। মুসলমানরা তাদের তলোয়ার কোষবদ্ধ করে রেখেছিলেন।[৩]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় প্রবেশের সময় তাঁর কাসওয়া নামক উটনীতে আরোহণ করেন। মুসলমানরা কোষবদ্ধ তলোয়ার তুলে ধরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মাঝখানে নিয়ে লাব্বায়ক আল্লাহুমা লাব্বায়ক ধ্বনি দিচ্ছিলো।

মক্কার পৌত্তলিকরা তামাশা দেখার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে উত্তর দিকে অবস্থিত কায়াইকায়ান পাহাড়ে উঠে দাঁড়ালো। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলো যে, তোমাদের কাছে এমন এক দল লোক আসছে, যাদের মদীনায় জ্বর কাবু করে ফেলেছে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা শুনে সাহাবাদের বললেন, তারা যেন তিনবার খুব জোরে দৌড় দেন। তবে রুকনে ইয়ামানী এবং হাজরে আসওয়াদের মাঝামাঝি এলাকায় স্বাভাবিক গতিতে যেতে হবে। সাত সাঈর মধ্যে পুরো সাতবারই দৌড় না দেয়ার জন্যে বলা হয়নি। আল্লাহর রহমত ও বরকত লাভের প্রত্যাশাই ছিলো এর কারণ। মোশরেকদের মুসলমানদের শক্তি দেখানোই ছিলো এর উদ্দেশ্য।[৪] এছাড়া রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাহাবাদেরকে এজতেবা করারও আদেশ প্রদান করেন। এর অর্থ হচ্ছে ডান কাঁধ খোলা রেখে চাদর ডান বগলের নীচে দিয়ে নিচের দিক থেকে পেঁচিয়ে দেয়া। সামনে পিছনে উভয় দিক থেকে চাদরের অপর প্রান্ত বাঁ কাঁধের ওপর ফেলে রাখা।

রসূলুল্লাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার পাহাড়ী ঘাঁটির পথ ধরে অগ্রসর হন। তাঁকে দেখার জন্যে মোশরেকরা লাইন লাগিয়ে রেখেছিলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রমাগতভাবে লাব্বায়ক ধ্বনি দিচ্ছিলেন। হারাম শরীফে পৌঁছে তিনি নিজের ছড়ি দিয়ে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করেন। এরপর তওয়াফ করলেন। মুসলমানরাও তওয়াফ করেন। সেই সময় আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রা.) তলোয়ার উঁচু করে ধরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং এই কবিতা আবৃত্তি করছিলেন,

'কাফেরের সন্তানরা ছেড়ে দাও তাঁর পথ
তাঁকে ঘিরে রেখেছে আল্লাহর রহমত।
রহমানুর রহীমের কেতাবে রয়েছে তাঁর কথা
সেই সকল সহীফা তেলাওয়াত করা হয় সদা।
হে আল্লাহ, তাঁর এ কথায় করেছি বিশ্বাস
আল্লাহর রাহে দেবো কোরবান আমার নিশ্বাস
আল্লাহর নির্দেশ মেনে দেবো এমন মার
মাথার খুলি যাবে উড়ে বন্ধুর খবর রবে না আর।'

---

৩. ফতহুল বারী, ৭ম খন্ড, পৃ. ৫০০, যাদুল মায়াদ ২য় খন্ড, পৃ. ১৫১

৪. সহীহ সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, ২১৮, ২য় খন্ড, ৬১০, ৬১১, সহীহ মুসলিম ১ম খন্ড, পৃ. ৪১২

হযরত আনাস (রা.)-এর বর্ণনায় একথাও উল্লেখ রয়েছে যে, কবিতা আবৃত্তি শুনে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) বলেন, ওহে রওয়াহার পুত্র, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে হারাম শরীফে কবিতা আবৃত্তি করা হচ্ছে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওহে ওমর, তাকে আবৃত্তি করতে দাও। ওদের মধ্যে এর প্রভাব তীরের চেয়ে অধিক কার্যকর।[৫]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানরা তিন চক্কর দৌড় দিলেন। মোশরেকরা দেখে বললো, মদীনার জ্বর যাদের কাবু করেছে মনে করেছিলাম, ওরা তো এমন এমন লোকের চেয়েও বেশী শক্তি রাখে দেখছি।[৬]

তওয়াফ শেষ করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা-মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করলেন। সেই সময় তাঁর হাদী অর্থাৎ কোরবানীর পশু মারওয়া পাহাড়ের কাছ দাঁড়ানো ছিলো। সাঈ শেষ করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটি কোরবানীর জায়গা, মক্কার সকল জায়গাই কোরবানীর জায়গা এরপর মারওয়া পাহাড়ের পাদদেশে সবাই পশু কোরবানী করেন। কোরবানীর পর সেখানেই মাথার চুল কামিয়ে ফেলেন। সাহাবায়ে কেরাম প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুসরণ করেন। এরপর অস্ত্র পাহারা দেয়ার জন্যে কিছুসংখ্যক সাহাবাকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াজেজে প্রেরণ করেন। সেখানে যারা অস্ত্র পাহারা দিচ্ছিলো এরা যাওয়ার পর তাদের ওমরাহর জন্যে পাঠিয়ে দিতে বলে দেন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় তিনদিন অবস্থান করেন। চতুর্থদিন সকালে মোশরেকরা হযরত আলী (রা.)-কে বললো, তোমাদের সাথীকে যেতে বলো, কারণ সময় শেষ হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে বেরিয়ে সরফ নামক জায়গায় গিয়ে অবস্থান করলেন।

মক্কা থেকে তাঁর রওয়ানা হওয়ার সময় হযরত হামযা (রা.)-এর কন্যা চাচা চাচা বলতে বলতে তাঁর পিছনে যাচ্ছিল। হযরত আলী (রা.) তাকে সঙ্গে নিয়ে নিলেন। তাকে লালন-পালন করার প্রসঙ্গ নিয়ে হযরত আলী (রা.), হযরত জাফর (রা.) এবং হযরত যায়েদ (রা.)-এর মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। কারণ প্রত্যেকে দাবী করছিলেন, তিনি লালন-পালনের অধিক হকদার। অবশেষে আল্লার রসূল হযরত জাফরের পক্ষে ফয়সালা দেন। কেননা, এই শিশুর খালা ছিলেন হযরত জাফরের সহধর্মিণী।

এই ওমরাহ পালনের সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মায়মুনা বিনতে হারেছ আমেরিয়াকে বিয়ে করেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় পৌঁছার আগে এ উদ্দেশ্যে জাফর ইবনে আবু তালেবকে মায়মুনার কাছে পাঠান। মায়মুনা হযরত আব্বাসের ওপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত করেন। কেননা, তিনি ছিলেন মায়মুনার দুলাভাই। তার স্ত্রী উম্মুল ফযল ছিলেন মায়মুনার বোন। হযরত আব্বাস (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মায়মুনার বিয়ে দেন। মায়মুনাকে আনতে আবু রাফেকে দায়িত্ব দেয়া হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছরফ নামক জায়গায় পৌঁছার পর মায়মুনাকে তাঁর কাছে পৌঁছে দেয়া হয়।[৭]

এই ওমরাহর নাম ওমরাহে কাযা কেন রাখা হয়েছে? এর কারণ হচ্ছে, এই ওমরাহ ছিলো হোদায়বিয়ার সন্ধির সময়ের কাজা ওমরাহ। হোদায়বিয়ার সন্ধি অনুযায়ী এই ওমরাহ পালন করা

---

৫. জামে তিরমিযি, ২য় খন্ড, পৃ. ১০৭
৬. সহীহ মুসলিম, ১ম খন্ড, পৃ. ৪১২
৭. যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ১৫২

হয়। উল্লেখিত কারণটিই প্রণিধানযোগ্য।[৮] এছাড়া, এই ওমরাহকে চারটি নামে অভিহিত করা হয়। যথা ওমরায়ে কাযা, ওমরায়ে কাযিয়া, ওমরায়ে কেছাছ এবং ওমরাহে ছোলেহ।[৯]

আরো কয়েকটি ছারিয়্যা

১. ছারিয়্যা আবুল আওজা

সপ্তম হিজরী জিলহজ্জ মাস

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবুল আওজার নেতৃত্বে ৫০ জন সাহাবাকে ইসলামের দাওয়াতসহ বনু সালিম গোত্রের কাছে প্রেরণ করেন। ইসলামের দাওয়াত দেয়ার পর তারা বললো যে, তোমরা যে জিনিসের দাওয়াত দিচ্ছ, তার কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। এরপর তারা প্রচন্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়। সেনাপতি আবুল আওজা এ যুদ্ধে আহত হন। শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা দুইজন শত্রু সৈন্যকে বন্দী করে নিয়ে আসেন।

২. ছারিয়্যা গালেব ইবনে আব্দুল্লাহ

অষ্টম হিজরীর সফর মাস

দুইশত সাহাবাকে গালেব ইবনে আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে ফেদেক এলাকায় বশীর ইবনে সা'দ-এর সঙ্গীদের হত্যাকান্ডের স্থানে প্রেরণ করা হয়। এরা শত্রুদের পশুপাল কব্জা এবং কয়েকজন শত্রু সৈন্যকে হত্যা করেন।

৩. ছারিয়্যা যাতে-আতলাহ

অষ্টম হিজরীর রবিউল আউয়াল

এই ছারিয়্যার বিবরণ এই যে, বনু কাযাআ গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের ওপর হামলা করতে বহুসংখ্যক লোক সমবেত করে রেখেছিলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর পাওয়ার পর কা'ব ইবনে ওমায়েরের নেতৃত্বে পনেরজন সাহাবাকে প্রেরণ করেন। সাহাবায়ে কেরাম তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণের পরিবর্তে সাহাবাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলো। ফলে সাহাবারা শহীদ হয়ে গেলেন। মাত্র একজন সাহাবীকে নিহতদের মধ্য থেকে জীবিত অবস্থায় তুলে নিয়ে আসা হয়।[১০]

৪. ছারিয়্যা যাতে এরক

অষ্টম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাস

এই অভিযানের কারণ এই যে, বনু হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা বারবার বিরক্ত করছিলো। এ কারণে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুজা ইবনে ওয়াহাব আছাদীর নেতৃত্বে ২৫ জন সাহাবাকে প্রেরণ করেন। এরা শত্রুদের পশুপাল হাঁকিয়ে নিয়ে আসেন। তবে, কোন সংঘর্ষ হয়নি।[১১]

---

৮. যাদুল মায়াদ, ১ম খন্ড, পৃ, ১৭২, ফতহুল বারী, ৭ম খন্ড, পৃ ৫০০।

৯. ফতহুল বারী, ৭ম খন্ড, পৃ. ৫০০

১০. রহমতুল লিল আলামীন, ২য় খন্ড, পৃ. ২৩১

১১. ঐ, তালাকিহুল ফুহুম, পৃ. ৩৩

মুতার যুদ্ধ

মুতা জর্দানের বালকা এলাকার নিকটবর্তী একটি জনপদ। এই জায়গা থেকে বায়তুল মাকদেসের দূরত্ব মাত্র দুই মনযিল। মুতার যুদ্ধ এখানেই সংঘটিত হয়েছিলো।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় মুসলমানরা যেসব যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এ যুদ্ধ ছিলো সেসবের মধ্যে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী। এই যুদ্ধই খৃষ্টান অধ্যুষিত দেশসমূহ জয়ের পথ খুলে দেয়। অষ্টম হিজরীর জমাদিউল আউয়াল অর্থাৎ ৬২৯ খৃষ্টাব্দ বা সেপ্টেম্বর মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

যুদ্ধের কারণ

এই অভিযানের কারণ এই যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হারেছ ইবনে ওমায়ের আযদীকে একখানি চিঠিসহ বসরায় গবর্ণরের কাছে প্রেরণ করেন। রোমের কায়সারের গবর্ণর শরহাবিল ইবনে আমর গাস্‌সানি সেই সময় বালক এলাকায় নিযুক্ত ছিলো। এই দুর্বৃত্ত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দূতকে গ্রেফতার করে এবং শক্তভাবে বেঁধে হত্যা করে। স্মরণ করা যেতে পারে যে, রাষ্ট্রদূত বা সাধারণ দূতদের হত্যা করা গুরুতর অপরাধ। এটা যুদ্ধ ঘোষণার শামিল, এমনকি এর চেয়েও গুরুতর মনে করা হয়।

এ কারণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রেরিত দূতের হত্যার খবর শোনার পর খুবই মর্মাহত হন। তিনি সেই এলাকায় মোতায়েনের জন্যে সৈন্যদের প্রস্তুতির নির্দেশ দেন। সে অনুযায়ী তিন হাজার সৈন্য তৈরী করা হয়।[১] খন্দকের যুদ্ধ ছাড়া ইতিপূর্বে অন্য কোন যুদ্ধেই মুসলমানরা তিন হাজার সৈন্য সমাবেশ করেননি।

সেনানায়কদের প্রতি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.)-কে এই সেনাদলের সেনাপতি মনোনীত করেন। এরপর বলেন যে, যায়েদ যদি নিহত হন তবে জাফর এবং জাফর যদি নিহত হন, তবে আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রা.) সিপাহসালার নিযুক্ত হবেন।[২]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম সেনাদলের জন্যে সাদা পতাকা তৈরী করে তা হযরত যায়েদ ইবনে হারেছার কাছে দেন।[৩] সৈন্যদলকে তিনি ওসিয়ত করেন যে, হারেছ ইবনে ওমায়েরের হত্যাকান্ডের জায়গায় তারা যেন স্থানীয় লোকদের ইসলামের দাওয়াত দেন। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তো ভালো যদি ইসলাম গ্রহণ না করে তবে আল্লাহর দরবারে সাহায্য চাইবে এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তিনি আরো বলেন, আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর পথে, আল্লাহর সাথে কুফুরকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, খেয়ানত

---

[১]. যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ১৫৫, ফতহুল বারী, ৭ম খন্ড, পৃ. ৫১১

[২]. সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৬১১

৩. মুখতাছারুছ সিরাত শেখ আবদুল্লাহ পৃ. ৩২৭

করবে না, কোন নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং গীর্জায় অবস্থানকারী দুনিয়া পরিত্যাগকারীকে হত্যা করবে না। খেজুর এবং অন্য কোন গাছ কাটবে না, কোন অট্টালিকা ধ্বংস করবে না।[৪]

ইসলামী বাহিনীর রওয়ানা

ইসলামী বাহিনী রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে সাধারণ মুসলমানরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনোনীত সেনানায়কদের সালাম এবং বিদায় জানান। সেই সময় অন্যতম সেনানায়ক হযরত আবুদল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রা.) কাঁদছিলেন। তাঁকে এ সময়ে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ, দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ বা তোমাদের সাথে সম্পর্কের কারণে আমি কাঁদছি না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাক কোরআনের একটি আয়াত তেলাওয়াত করতে শুনে জাহান্নামের ভয়ে আমি কাঁদছি। সেই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'এবং তোমাদের প্রত্যেকেই তা অতিক্রম করবে, এটা তোমাদের প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত।' (সূরা মরিয়ম, আয়াত ৭১)

আমি জানি না যে, জাহান্নামে পেশ করার পর ফিরে আসব কিভাবে? মুসলমানরা বললেন, আল্লাহ তায়ালা সালামতির সাথে আপনাদের সঙ্গী হোন। আল্লাহ তায়ালা আপনাদের হেফাযত করুন এবং গনীমতের মালসহ আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনুন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রা.) তখন এই কবিতা আবৃত্তি করেন,

'রহমানের কাছে মাগফেরাতের জন্যে
মগয বের করা তলোয়ারের আঘাতের জন্যে
বর্শা নিক্ষেপকারীর হাত, অন্ত্র কলিজা
চিরে ফেলা আঘাত করার শক্তি দানের জন্যে
সাহায্য চাই। আমার কবরের পাশ দিয়ে
যাবে যারা তারা বলবে এই সেই গাজী
যাকে আল্লাহ হেদায়াত দিয়েছেন এবং
যিনি হেদায়াত প্রাপ্ত।'

মুসলিম সৈন্যরা এরপর রওয়ানা হয়ে যান। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছানিয়াতুল অদা পর্যন্ত সেনাদলের সঙ্গে গিয়ে সৈন্যদের বিদায় জানান।[৫]

মুসলিম বাহিনীর সঙ্কট

উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে মুসলিম সৈন্যরা মাআন নামক এলাকায় পৌঁছুলেন। এ স্থান ছিলো হেজাজের সাথে সংশ্লিষ্ট জর্দানী এলাকায়। মুসলিম বাহিনী এখানে এসে অবস্থান নেন। মুসলিম গুপ্তচররা এসে খবর দিলেন যে, রোমের কায়সার বালকা অঞ্চলের মাআব এলাকায় এক লাখ রোমক সৈন্য সমাবেশ করে রেখেছে। এছাড়া তাদের পতাকাতলে লাখাম, জাজাম, বলকিন, বাহরা এবং বালা গোত্রের আরো এক লাখ সৈন্য সমবেত হয়েছিলো। উল্লিখিত শেষোক্ত এক লাখ ছিলো আরব গোত্রসমূহের সমন্বিত সেনাদল।

মজলিসে শূরার বৈঠক

মুসলমানরা ধারণাই করতে পারেননি যে, তারা কোন দুর্ধর্ষ সেনাদলের সম্মুখীন হবেন। দূরবর্তী এলাকায় তারা সত্যিই সঙ্কটজনক অবস্থার সম্মুখীন হলেন। তাদের সামনে এ প্রশ্ন মূর্ত

---

৪. রহমতুল লিল আলামীন, ২য় খন্ড, পৃ. ২৭১
৫. ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ, ৩৭৩, ৩৭৪ যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ, ১৫৬, মুখতাছারুস্ সিরাত, পৃ. ৩২৭

হয়ে দেখা দিল যে, তারা কি তিন হাজার সৈন্যসহ দুই লাখ সৈন্যের দুর্ধর্ষ সৈন্যের সাথে মোকাবেলা করবেন? বিস্মিত চিন্তিত মুসলমানরা দুইরাত পর্যন্ত পরামর্শ করলেন। কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিঠি লিখে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা হোক। এরপর তিনি হয়তো বাড়তি সৈন্য পাঠাবেন অথবা অন্য কোন নির্দেশ দেবেন। সেই নির্দেশ তখন পালন করা যাবে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রা.) দৃঢ়তার সাথে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি বললেন, 'হে লোক সকল, আপনারা যা এড়াতে চাইছেন এটাতো সেই শাহাদাত, যার জন্যে আপনারা বেরিয়েছেন। স্মরণ রাখবেন যে, শত্রুদের সাথে আমাদের মোকাবেলার মাপকাঠি সৈন্যদল, শক্তি এবং সংখ্যাধিক্যের নিরিখে বিচার্য নয়। আমরা সেই দ্বীনের জন্যেই লড়াই করি, যে দ্বীন দ্বারা আল্লাহ রব্বুল আলামীন আমাদেরকে গৌরবান্বিত করেছেন। কাজেই সামনের দিকে চলুন। আমরা দুইটি কল্যাণের মধ্যে একটি অবশ্যই লাভ করবো। হয়তো আমরা জয়লাভ করবো অথবা শাহাদাত বরণ করে জীবন ধন্য হবে। অবশেষে আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহার মতামতের প্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

মুসলিম বাহিনীর অগ্রযাত্রা

মাআন নামক এলাকায় দুই রাত অতিবাহিত করার পর মুসলিম বাহিনী শত্রুদের প্রতি অগ্রসর হলেন। বালকার মাশারেফ নামক জায়গায় তারা হিরাক্লিয়াসের সৈন্যদের মুখোমুখি হলেন। শত্রুরা আরো এগিয়ে এলে মুসলমানরা মুতা নামক জায়গায় গিয়ে সমবেত হন। এরপর যুদ্ধের জন্যে সৈন্যদের বিন্যস্ত করা হয়। ডানদিকে কোতাবা ইবনে কাতাদা আজরিকে এবং বামদিকে ওবাদা ইবনে মালেক আনসারী (রা.)-কে নিযুক্ত করা হয়।

সেনা নায়কদের শাহাদাত

মুতা নামক জায়গায় উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে অত্যন্ত তিক্ত লড়াই হয়। মাত্র তিন হাজার মুসলিম সৈন্য দুই লাখ অমুসলিম সৈন্যের সাথে এক অসম যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। বিস্ময়কর ছিলো এ যুদ্ধ। দুনিয়ার মানুষ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো। ঈমানের বাহাদুরি চলতে থাকলে এ ধরনের বিস্ময়কর ঘটনাও ঘটে।

সর্বপ্রথম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় পাত্র হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.) পতাকা গ্রহণ করেন। অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়ে তিনি শাহাদাত করণ করেন। এ ধরনের বীরত্বের পরিচয় মুসলমান ব্যতীত অন্য কারো ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়নি।

হযরত যায়েদ-এর শাহাদাতের পর পতাকা তুলে নেন হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব। তিনিও তুলনাহীন বীরত্বের পরিচয় দিয়ে লড়াই করতে থাকেন। তীব্র লড়াইয়ের এক পর্যায়ে তিনি নিজের সাদাকালো ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে শত্রুদের ওপর আঘাত করতে থাকেন। শত্রুদের আঘাতে তাঁর ডানহাত কেটে গেলে তিনি বাঁ হাতে যুদ্ধ শুরু করেন। বাঁ হাত কেটে গেলে দুই বাহু দিয়ে ইসলামের পতাকা বুকের সাথে জড়িয়ে রাখেন। শাহাদাত বরণ করা পর্যন্ত এভাবে পতাকা ধরে রাখেন।

বলা হয়ে থাকে যে, একজন রোমক সৈন্য তরবারি দিয়ে তাকে এমন আঘাত করে যে, তার দেহ দ্বিখন্ডিত হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে বেহেশতে দুটি পাখা দান করেছিলেন। সেই পাখার সাহায্যে তিনি জান্নাতে যেখানে ইচ্ছা উড়ে বেড়ান। এ কারণে তাঁর উপাধি 'জাফর

তাইয়ার' এবং জাফর যুল জানাহাইন। তাইয়ার অর্থ উড্ডয়নকারী আর যুল জানাহাইন অর্থ দুই পাখাওয়ালা।

ইমাম বোখারী নাফে-এর মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, মুতার যুদ্ধের দিনে হযরত জাফর শহীদ হওয়ার পর আমি তার দেহে আঘাতের চিহ্নগুলো গুণে দেখেছি। তাঁর দেহে তীর ও তলোয়ারের পঞ্চাশটি আঘাত ছিলো। এ সব আঘাতের একটিরও পেছনের দিকে ছিলো না।[৬]

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি মুতার যুদ্ধে মুসলমানদের সঙ্গে ছিলাম। জাফর ইবনে আবু তালেবকে সন্ধান করে নিহতদের মধ্যে তাদেরকে পেয়ে যাই। তাঁর দেহে বর্শা ও তীরের ৯০টির বেশী আঘাত দেখেছি।[৭] নাফে থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, ইবনে ওমরের বর্ণনায় এও আছে যে, আমি এসকল জখম লক্ষ্য করেছি তাঁর দেহের সম্মুখভাগে।[৮]

বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের মাধ্যমে হযরত জাফর (রা.)-এর শাহাদাত বরণের পর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রা.) পতাকা গ্রহণ করে ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করে সামনে অগ্রসর হন। কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর তিনি এ কবিতা আবৃত্তি করেন,

'ওরে মন খুশী বেজার যেভাবে হোক
মোকাবেলা কর। যুদ্ধের আগুন জ্বেলেছে ওরা
বর্শা রেখেছে খাড়া। জান্নাত থেকে
কেনরে তুই থাকতে চাস দূরে?'

এরপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা (রা.) বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে থাকেন। তাঁর চাচাতো ভাই গোশত লেগে থাকা একটা হাড় তাঁর হাতে দেন। তিনি এক কামড় খেয়ে ছুঁড়ে ফেলেন। এরপর লড়াই করতে করতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন।

আল্লাহর তলোয়ার

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহার শাহাদাতের পর বনু আযলান গোত্রের ছাবেত ইবনে আরকাম নামক একজন সাহাবী পতাকা গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, হে মুসলমানরা, তোমরা উপযুক্ত একজনকে সেনাপতির দায়িত্ব দাও। সাহাবারা ছাবেতকেই সেনাপতির দায়িত্ব নিতে বললে তিনি বলেন, আমি একাজের উপযুক্ত নই। এরপর সাহাবারা হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রা.) সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি পতাকা গ্রহণের পর তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। সহীহ বোখারীতে স্বয়ং খালেদ ইবনে ওলীদ (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, মুতার যুদ্ধের দিনে আমার হাতে ৯টি তলোয়ার ভেঙ্গেছে। এরপর আমার হাতে একটি ইয়েমেনী ছোট তলোয়ার অবশিষ্ট ছিলো।[৯]

---

৬. ফতহুল বারী, ৭ম খন্ড, পৃ. ৫১২, উভয় বর্ণনায় সংখ্যার পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্য নিরসন এভাবে করা হয় যে, তীরের আঘাতের সংখ্যাসহ ৯০টি।

৭. একই গ্রন্থ একই পৃষ্ঠা,

৮. ফহতুল বারী, ৭ম খন্ড, পৃ. ৫১২, উভয় বর্ণনার সংখ্যায় পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্য এভাবে নিরসন করা হয় যে, তীরের আঘাতের সংখ্যাসহ ৯০টি।

৯. সহীহ বোখারী, মুতা যুদ্ধ অধ্যায় ২য় খন্ড, পৃ. ৬১১

অপর এক বর্ণনায় তাঁর যবানীতে এভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, আমার হাতে মুতার যুদ্ধের দিনে ৯টি তলোয়ার ভেঙ্গেছে এবং একটি ছোট সাইজের ইয়েমেনী তলোয়ার অবশিষ্ট ছিলো।[১০]

এদিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রণক্ষেত্রের খবর লোক মারফত পৌঁছার আগেই ওহীর মাধ্যমে পান। তিনি বলেন, যায়েদ পতাকা গ্রহণ করেছিলেন, তিনি শহীদ হন। এরপর জাফর পতাকা গ্রহণ করেছিলেন তিনি শহীদ হন। এরপর আবদুল্লাহ ইবনে রওয়াহা পতাকা গ্রহণ করেছিলেন, তিনিও শহীদ হন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোখ এ সময় অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, এরপর পতাকা গ্রহণ করেন আল্লাহর তলোয়ারসমূহের মধ্যে একটি তলোয়ার। তাঁর যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের জয়যুক্ত করেন।[১১]

যুদ্ধের সমাপ্তি

বীরত্ব, বাহাদুরি ও নিবেদিত চিত্ততা সত্তেও মুসলমানদের মাত্র তিন হাজার সৈন্য দুই লাখ অমুসলিম সৈন্যের সামনে টিকে থাকা ছিলো এক বিস্ময়কর ঘটনা। হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রা.) এ সময়ে যে বীরত্বের পরিচয় দেন, ইতিহাসে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না।

এ যুদ্ধের পরিণতি সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। সকল বর্ণনা পাঠ করার পর জানা যায় যে, যুদ্ধের প্রথম দিন শেষ পর্যায়ে হযরত খালেদ (রা.) রোমক সৈন্যদের মোকাবেলায় অবিচল ছিলেন। তিনি সেই সময় এক নতুন যুদ্ধকৌশলের কথা ভাবছিলেন, যাতে রোমকদের প্রভাবিত করা যায়। সেই কৌশলের মাধ্যমে ধীরে ধীরে মুসলমানদের পিছিয়ে নেয়াই ছিলো উদ্দেশ্য। তবে, কোন অবস্থায়ই রোমকরা যেন ধাওয়া করতে না পারে, সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা রোমকরা ধাওয়া করলে তাদের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া হবে খুবই কঠিন।

পরদিন সকালে হযরত খালেদ (রা.) সেনাদল রদবদল করে বিন্যস্ত করলেন। ডানদিকের সৈন্যদের বাঁ দিকে এবং বাঁদিকের সৈন্যদের ডানদিকে মোতায়েন করলেন। পেছনের সৈন্যদের সামনে আর সামনের সৈন্যদের পেছনে নিয়ে গেলেন। এরূপ অদল বদলের দৃশ্য থেকে শত্রুরা বলাবলি করতে লাগলো যে, মুসলমানরা সহায়ক সৈন্য পেয়েছে, তাদের শক্তি পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে।

সেনা বিন্যাস অদল বদল করে হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রা.) মুসলমানদের ধীরে ধীরে পিছিয়ে নিলেন। রোমক সৈন্যরা মুসলমানদের আক্রমণ করতে এগিয়ে গেলো না কারণ তারা তখন ভাবছিলো যে, মুসলমানরা ধোঁকা দিচ্ছে। তারা মরুপ্রান্তরে নিয়ে পাল্টা হামলা করে পর্যুদস্ত করবে। এরূপ চিন্তা করে রোমক সৈন্যরা মুসলমানদের ধাওয়া না করে নিজেদের এলাকায় ফিরে গেলো। এদিকে মুসলমানরা পিছাতে পিছাতে মদীনায় গিয়ে পৌঁছালেন।[১২]

হতাহতের সংখ্যা

মুতার যুদ্ধে ১২ জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। রোমকদের মধ্যে কতোসংখ্যক হতাহত হয়েছে তার বিবরণ জানা যায়নি। তবে যুদ্ধের বিবরণ পাঠে বোঝা যায় যে, তাদের বহু হতাহত হয়েছে। কেননা, একমাত্র হযরত খালেদের হাতেই ৯টি তলোয়ার ভেঙ্গেছিলো। এতেই শত্রু সৈন্যদের হতাহতের সংখ্যা সহজেই আন্দাজ করা যায়।

---

১০. ঐ পৃষ্ঠা নং, ৬১২
১১. ঐ পৃ. ৬১১
১২. ফতহুল বারী, ৭ম খন্ড, পৃ. ৫১৩, ৫১৪, যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ১৫৬।

মুতার যুদ্ধের প্রভাব

যে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে মুতা অভিযান পরিচালিত হয়েছিলো, সেটা সম্ভব না হলেও এ যুদ্ধের ফলে মুসলমানদের সুনাম সুখ্যাতি বহু দূর বিস্তার লাভ করে। সমগ্র আরব জগত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। কেননা, রোমকরা ছিলো সে সময়ের শ্রেষ্ঠ শক্তি। আরবরা মনে করতো যে, রোমকদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হওয়া মানে আত্মহত্যার শামিল। কাজেই, উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া তিনহাজার সৈন্য দুই লাখ সৈন্যের মোকাবেলায় সাহসিকতাপূর্ণ বিজয় গৌরব সহজ কথা নয়। আরবের জনগণ বুঝতে সক্ষম হয়েছিলো যে, ইতিপূর্বে পরিচিত সকল শক্তির চেয়ে মুসলমানরা সম্পূর্ণ আলাদা। আল্লাহর সাহায্য মুসলমানদের সাথে রয়েছে। তাদের নেতা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিঃসন্দেহে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এ কারণেই দেখা যায় যে, মুসলমানদের চিরশত্রু জেদী ও অহংকারী হিসেবে পরিচিত বেশ কিছুসংখ্যক গোত্র মুতার যুদ্ধের পর ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। এসব গোত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গোত্র হচ্ছে, বনু ছালিম, আশজা, গাতফান, জিবান ও ফাজারাহ।

মুতার যুদ্ধের প্রাক্কালে রোমকদের সাথে যে রক্তক্ষয়ী সংঘাত শুরু হয়েছিলো এর ফলেই পরবর্তীকালে মুসলমানদের বিজয় গৌরব দূরদূরান্তে বিস্তার লাভ করে।

ছ্যারিয়্যা যাতে-ছালাছেল

মুতার যুদ্ধে রোমক সৈন্যদের সাথে আরবদের বিভিন্ন গোত্রের সহযোগিতামূলক ভূমিকার কথা জেনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী মনে করেন যাতে, রোমক ও আরবদের গোত্রগুলো মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের হাত প্রসারিত করে এবং ভবিষ্যতেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার সৈন্য সমাবেশের চিন্তা না করে।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ উদ্দেশ্যে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-কে মনোনীত করেন। তাঁর দাদী ছিলেন বালা গোত্রের মহিলা। মুতার যুদ্ধের পর অষ্টম হিজরীর জমাদিউস সানিতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-কে প্রেরণ করেন। বলা হয়ে থাকে যে, গুপ্তচরদের মাধ্যমে খবর পাওয়া গেছে যে, বনু কাজাআ গোত্র হামলা করতে মদীনার উপকণ্ঠে বহু সৈন্য প্রস্তুত করেছে। এসব কারণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমর ইবনুল আস (রা.)-কে প্রেরণ করেন।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমর ইবনুল আস (রা.)-এর জন্যে সাদাকালো পতাকা তৈরী করেন। এরপর তার নেতৃত্বে তিনশত সাহাবাকে প্রেরণ করেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলো তিরিশটি ঘোড়া।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, মুসলিম সেনাদল বলি, আজরা এবং বলকিন এলাকার লোকদের কাছে দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের কাছে যেন সাহায্য চান। মুসলিম সেনাদল রাত্রিকালে সফর করতেন এবং দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতেন। শত্রুদের কাছাকাছি পৌঁছার পর জানা গেলো যে, শত্রুরা দলে ভারি। হযরত আমর তখন রাফে ইবনে মাকিছ জাহনিকে সাহায্যের চিঠিসহ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রেরণ করেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুইশত সৈন্য হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। এদের মধ্যে হযরত আবু বকর হযরত ওমর সহ আনসার ও

মোহাজেরদের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দও ছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেনাপতি আবু ওবায়দা (রা.)-কে নির্দেশ দেন, তিনি যেন আমর ইবনুল আস-এর সাথে মিলিত হয়ে উভয়ে মিলেমিশে কাজ করেন। কোন প্রকার মতানৈক্য যেন না করেন। আবু ওবায়দা অকুস্থলে যাওয়ার পর পুরো বাহিনীর অধিনায়কত্ব চান। কিন্তু হযরত আমর ইবনুল আস বললেন, অধিনায়ক তো আমি, আপনিতো সহায়ক সৈন্য নিয়ে এসেছেন। আবু ওবায়দা একথা মেনে নেন। এরপর নামাযের ইমামতিও সেনাদল প্রধান হযরত আমর ইবনুল আসই করতে থাকেন।

সহায়ক সেনাদল পৌঁছার পর কাজাআ এলাকায় পৌঁছেন এবং সেখান থেকে দূরবর্তী স্থানে যান। একপর্যায়ে শত্রুদের সাথে মোকাবেলা হওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু মুসলমানদের হামলার উদ্যোগের মুখে তারা দ্রুত পালিয়ে যায়।

এরপর আওফ ইবনে মালেক আশজায়ীকে দূত হিসাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রেরণ করা হয়। তিনি মুসলমানদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন এবং অভিযানের বিবরণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শোনান।

যাতে-ছালাছেল ওয়াদিউল কোরা প্রান্তরের সামনের একটি জায়গা। এটি মদীনা থেকে ১০ দিনের দূরত্বে অবস্থিত। ইবনে ইসহাক বলেন, মুসলমানরা জাজাম গোত্রের ছালাছেল নামের একটি জলাশয়ের পাশে অবতরণ করেন। তাই এ অভিযানের নাম করা হয় যাতে-ছালাছেল।[১৩]

ছারিয়্যা খাজারাহ

অষ্টম হিজরীর শাবান মাস

এ অভিযানের কারণ ছিলো এই যে, নজদের অভ্যন্তরে মুহারিব গোত্রের এলাকায় খাজরাহ নামের জায়গায় বনু গাতফান গোত্র সৈন্য সমাবেশ করছিলো। এদের দমন করতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পনেরজন সাহাবীকে হযরত আবু ওবায়দার নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। এই সেনাদল শত্রুদের কয়েকজনকে হত্যা, কয়েকজনকে বন্দী এবং গনীমতের মাল লাভ করেন। এই অভিযানে প্রেরিত সেনাদল হযরত আবু ওবায়দার নেতৃত্বে পনের দিন মদীনার বাইরে অবস্থান করেন।[১৪]

---

১৩. ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ৬২৩-৬২৬, যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ১৫৭
১৪. রহমতুল লিল আলামীন ২য় খন্ড, পৃ. ২৩৩, তালকীহুল ফুহুম পৃ. ৩৩

সে বললো, (বিজয় লাভ করা (সত্ত্বেও) আজ তোমাদের
বিরুদ্ধে (আমার) কোনো প্রতিশোধ নেই,
আল্লাহ তায়ালা (অতীত আচরণের জন্যে)
তোমাদের ক্ষমা করে দিন, (কেননা)
তিনি সব দয়ালুদের
মধ্যে শ্রেষ্ঠ।
(সূরা ইউসুফ ৯২)

মহা বিজয়ের দার প্রান্তে

আজ কোনো প্রতিশোধ নয়

মক্কা বিজয়

ইমাম ইবনে কাইয়েম লিখেছেন, এটা সেই মহান বিজয়, যার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাঁর দ্বীন, রসূল তাঁর বাহিনী এবং দ্বীনের আমানতদারদের মর্যাদা দান করেছেন। এছাড়া তাঁর শহর ও ঘর- যে ঘরকে দুনিয়ার মানুষের হেদায়াতের মাধ্যম করেছিলেন, সেই ঘরকে কাফের, মোশরেকদের হাত থেকে মুক্ত করেন। এই বিজয়ের দরুন আকাশের অধিবাসীদের মধ্যে আনন্দের ঢল বয়ে যায়। এই বিজয়ের ফলে আল্লাহর দ্বীনে মানুষ দলে দলে প্রবেশ করতে শুরু করে এবং বিশ্বজগতের চেহারা খুশীতে চক চক করে ওঠে।[১]

অভিযানের কারণ

হোদায়বিয়ার সন্ধি সম্পর্কিত আলোচনায় একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই সন্ধির একটি ধারা এরূপ ছিলো যে, যে কেউ ইচ্ছা করলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা কোরায়শদের সাথে মিত্রতায় আবদ্ধ হতে পারবে।

যিনি যে দলে যুক্ত হবেন তিনি সেই দলের অংশ বলেই বিবেচিত হবেন। কেউ যদি হামলা বা অন্য কোন প্রকার বাড়াবাড়ি করে তা সেই দলের ওপর হামলা বলে গণ্য হবে।

এই চুক্তির মাধ্যমে বনু খোজাআ গোত্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিত্রতার বন্ধনে আবন্ধ হয়েছিলো। আবু বকর গোত্র আবদ্ধ হয়েছিলো কোরায়শদের মিত্রতার বন্ধনে। এমনি করে উভয় গোত্র পরস্পর থেকে নিরাপদ হয়েছিলো। কিন্তু আইয়ামে জাহেলিয়াতের সময় থেকেই উভয় গোত্রের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিবাদ বিসম্বাদ চলে আসছিলো। পরবর্তীকালে ইসলামের আবির্ভাব এবং হোদায়বিয়ার সন্ধির পর বিবদমান উভয় গোত্র পরস্পরের ব্যাপারে নিরাপদ ও নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলো। বনু বকর গোত্র এই চুক্তির সুযোগকে গণীমত মনে করে বনু খোযাআ গোত্রের ওপর থেকে পুরনো শত্রুতার প্রতিশোধ গ্রহণে প্রস্তুত হলো। নওফেল ইবনে মাবিয়া দয়লি বনু বকরের একটি দলের সাথে শাবান মাসের ৮ তারিখে বনু খোযাআ গোত্রের ওপর হামলা চালায়। সেই সময় বনু খোযাআ গোত্রের লোকেরা ওয়াতের নামে একটি জলাশয়ের পাশে অবস্থান করছিলো। আকস্মিক হামলায় বনু খোযাআ গোত্রের কয়েকজন লোক মারা যায়। উভয়ের মধ্যে পরে সংঘর্ষও হয়। কোরায়শরা এই হামলায় বনু বকর গোত্রকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে। কোরায়শদের কিছু লোক রাতে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে বনু বকর গোত্রের সাথে মিশে গিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর হামলাও করে। আততায়ীরা বনু খোযাআ গোত্রের লোকদের তাড়িয়ে হরমের কাছাকাছি নিয়ে যায়। সেখানে বনু বকর গোত্রের লোকেরা বললো, হে নওফেল, এবার তো আমরা হরম শরীফে প্রবেশ করবো। তোমাদের মাবুদ, তোমাদের এবাদত। একথার জবাবে নওফেল বললো, 'আজ কোন মাবুদ নেই। তোমাদের প্রতিশোধ নিয়ে নাও। আমার বয়সের কসম তোমরা হরম শরীফে চুরি করতে পারো, তবে কি নিজেদের প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারো না?'

---

[১]. যাদুল মায়াদ ২য় কন্ড, পৃ. ১৬০

এদিকে বনু খোজাআ গোত্রের লোকেরা মক্কায় পৌছে বুদায়েল ইবনে ওরাকা, খোযায়ী এবং তার একজন মুক্ত করা ক্রীতদাস রাফের ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করলো। আমর ইবনে সালেম খাযায়ী সেখান থেকে বেরিয়ে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সেই সময় তিনি মসজিদে নববীতে সাহাবাদের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। আমর ইবনে সালেম বললেন, 'হে পরওয়ারদেগার, আমি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাঁর চুক্তি এবং তাঁর পিতার প্রাচীন অঙ্গীকারের[২] দোহাই দিচ্ছি। হে রসূল, আপনারা ছিলেন সন্তান আর আমরা ছিলাম জন্মদানকারী।[৩] এরপর আমরা আনুগত্য গ্রহণ করেছি এবং কখনো অবাধ্যতা প্রদর্শন করিনি। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে হেদায়াত দান করুন। আপনি সর্বাত্মক সাহায্য করুন, আল্লাহর বান্দাদের ডাকুন, তারা সাহায্যের জন্যে আসবে। এদের মধ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও থাকবেন,, উদিত চতুর্দশীর চাঁদের মতো সুন্দর। যদি তাঁর ওপর অত্যাচার করা হয়, তবে তাঁর চেহারা রক্তিম থমথমে হয়ে যায়। আপনি এমন এক দুর্ধর্ষ বাহিনীর মধ্যে যাবেন, যারা ফেনিল উচ্ছ্বাস সমুদ্রের মতো তরঙ্গায়িত থাকবে। নিশ্চিত জেনে রাখুন, কোরায়শরা আপনাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির বরখেলাফ করেছে, অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। তারা আমার জন্যে কোদা নামক জায়গায় ফাঁদ পেতেছে এবং ধারণা করেছে যে, আমি কাউকে সাহায্যের জন্যে ডাকব না। অথচ তারা বড়ই কমিনা এবং সংখ্যায় অল্প। তারা আতর নামক জায়গায় রাতের অন্ধকারে হামলা করেছে এবং আমাদেরকে রুকু সেজদারত অবস্থায় হত্যা করেছে। অর্থাৎ আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, অথচ আমাদের হত্যা করা হয়েছে।'

রসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই অভিযোগ শোনার পর বললেন, হে আমর ইবনে সালেম, তোমায় সাহায্য করা হয়েছে। এরপর আকাশে এক টুকরো মেঘ দেখা গেলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই মেঘ বনু কা'ব এর সাহায্যের সুসংবাদ স্বরূপ আবির্ভূত হয়েছে।

এরপর বুদাইল ইবনে ওরাকা খোযায়ীর নেতৃত্বে বনু খোযাআ গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় এসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানায়, কারা কারা নিহত হয়েছে। তারা আরো জানায় যে, কিভাবে কোরায়শরা বনু বকর গোত্রকে সাহায্য করেছে। এরপর তারা মক্কায় ফিরে যায়।

সন্ধি নবায়নের চেষ্টা

কোরায়শ এবং তার মিত্ররা যা করেছিলো সেটা ছিলো হোদায়বিয়ায় সন্ধির সুস্পষ্ট লংঘন এবং বিশ্বাসঘাতকতা। এর কোন বৈধতার অজুহাত দেখানো যাবে না। কোরায়শরাও সন্ধির বরখেলাফ করার কথা খুব শীঘ্র বুঝতে পেরেছিলো। তারা এই বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম চিন্তা করে এক পরামর্শ সভা আহ্বান করলো। সেই সভায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো যে, তারা তাদের নেতা আবু সুফিয়ানকে হোদায়বিয়ার সন্ধির নবায়নের জন্যে মদীনায় পাঠাবে।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোরায়শদের সন্ধি লংঘন পরবর্তী কার্যক্রম সম্পর্কে সাহাবাদের আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি যে, আবু সুফিয়ান সন্ধি পোক্ত এবং মেয়াদ বাড়ানোর জন্যে মদীনায় এসে পৌঁছেছে।

---

২. বনু খোজায়া এবং বনু আবদুল মুত্তালিবের মধ্যে বহু পূর্ব থেকে চলে আসা অঙ্গীকারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আবদে মান্নাফের মা অর্থাৎ কুসাইএর স্ত্রী হাব্বি ছিলেন বনু খোজাআ গোত্রের মেয়ে। এ কারণে সমগ্র নবী পরিবারকে বনু খোজাআ গোত্রের সন্তান বলা হয়েছে।

এদিকে আবু সুফিয়ান মদীনার উদ্দেশ্যে ওসফান নামক জায়গায় পৌঁছার পর বুদাইল ইবনে ওরাকার সাথে তার দেখা হলো। বুদাইল মদীনা থেকে মক্কা যাচ্ছিলো।

আবু সুফিয়ান ভেবেছিলো বুদাইল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে আসছে। তবু জিজ্ঞাসা করলো, কোথা থেকে আসছো বুদাইল? বুদাইল বললেন, আমি খোযাআর সাথে ওই উপকূলে গিয়েছিলাম। আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করলো, 'তুমি কি মোহাম্মদের কাছে যাওনি?' বুদাইল বললেন, 'না তো।' বুদাইল মক্কার পথে যাওয়ার পর আবু সুফিয়ান বললো, বুদাইল যদি মদীনায় গিয়ে থাকে, তবে তো তার উটকে মদীনার খেজুর খাইয়েছে। এরপর আবু সুফিয়ান বুদাইলের উট বসানোর জায়গায় গিয়ে উটের পরিত্যক্ত মল ভেঙ্গে সেখানে মদীনার খেজুরের বীচি দেখতে পেলো। এরপর বললো, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি যে, বুদাইল মোহাম্মদের কাছে গিয়েছিলো।

মোটকথা আবু সুফিয়ান মদীনায় গেলো এবং তার কন্যা উম্মে হাবিবার ঘরে গিয়ে উঠলো। আবু সুফিয়ান রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিছানায় বসতে যাচ্ছিলো। এটা লক্ষ্য করে হযরত উম্মে হাবিবা (রা.) সাথে সাথে বিছানা গুটিয়ে ফেললেন। আবু সুফিয়ান বললো, মা, তুমি আমাকে এ বিছানার উপযুক্ত মনে করোনি না এ বিছানাকে আমার উপযুক্ত মনে করোনি?

হযরত উম্মে হাবিবা (রা.) বললেন, এটি হচ্ছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিছানা আর আপনি হচ্ছেন একজন নাপাক মোশরেক। আবু সুফিয়ান বললেন, খোদার কসম, আমার কাছে থেকে আসার পর তুমি খারাপ হয়ে গেছো।

এরপর আবু সুফিয়ান সেখান থেকে বেরিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে কোন জবাব দিলেন না। আবু সুফিয়ান হযরত আবু বকরের কাছে গিয়ে তাকে অনুরোধ করলো, তিনি যেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আলোচনা করেন। হযরত আবু বকর (রা.) অসম্মতি প্রকাশ করলেন। আবু সুফিয়ান হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে গিয়ে তাকে বললো তিনি যেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে তাদের ব্যাপারে কথা বলেন। হযরত ওমর বললেন,(রা.), আমি কেন তোমাদের জন্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সুপারিশ করবো। আল্লাহর শপথ, যদি আমি কাঠের টুকরো ছাড়া অন্য কিছু নাও পাই তবুও সেই কাষ্টখন্ড দিয়ে তোমাদের সাথে জেহাদ করবো। আবু সুফিয়ান এরপর হযরত আলীর (রা.) কাছে গেলেন। হযরত ফাতেমা (রা.) সেখানে ছিলেন। হযরত হাসানও ছিলেন। তিনি ছিলেন তখন ছোট। হাঁটাচলা করছিলেন। আবু সুফিয়ান বললেন, হে আলী, তোমার সাথে আমার বংশগত সম্পর্ক সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। আমি একটা প্রয়োজনে এসেছি। হতাশ হয়ে এসেছি, হতাশ হয়ে ফিরে যেতে চাই না। তুমি আমার জন্যে মোহাম্মদের কাছে একটু সুপারিশ করো। হযরত আলী (রা.) বললেন, আবু সুফিয়ান, তোমার জন্যে আফসোস হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটা ব্যাপারে সংকল্প করেছেন, এ ব্যাপারে আমরা তাঁর সাথে কোন কথা বলতে পারি না। আবু সুফিয়ান বিবি ফাতেমার (রা.) প্রতি তাকিয়ে বললেন, তুমি কি তোমার এ সন্তানকে এ মর্মে আদেশ করতে পারো যে, সে লোকদের মধ্যে আশ্রয়দানের ঘোষণা দিয়ে সব সময়ের জন্যে আরবদের সর্দার হবে? হযরত ফাতেমা (রা.) বললেন, আল্লাহর শপথ, আমার সন্তান লোকদের মধ্যে নেতা হওয়ার মতো ঘোষণা দেয়ার যোগ্য হয়নি। তাছাড়া রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতে কেউ আশ্রয় দিতে পারে না।

সকল চেষ্টার ব্যর্থতার পর আবু সুফিয়ানের দু'চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে গেলো। তিনি সংশয় দোলায়িত চিত্তে কম্পিত কণ্ঠে হযরত আলীকে (রা.) বললেন, আবুল হাসান আমি

লক্ষ্য করছি যে, বিষয়টা জটিল হয়ে পড়েছে। কাজেই আমাকে একটা উপায় বলে দাও। হযরত আলী (রা.) বললেন, আল্লাহর শপথ, আমি তোমার জন্যে কল্যাণকর কিছু জানি না। তুমি বনু কেনানা গোত্রের নেতা। তুমি দাঁড়িয়ে লোকদের মধ্যে নিরাপত্তার কথা ঘোষণা করে দাও, এরপর নিজের দেশে ফিরে যাও। আবু সুফিয়ান বললেন, তুমি কি মনে করো যে, এটা আমার জন্যে কল্যাণকর হবে? হযরত আলী (রা.) বললেন না, আমি তা মনে করি না। তবে, এছাড়া অন্য কোন উপায়ও আছে বলে মনে হয় না। এরপর আবু সুফিয়ান মসজিদে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, হে লোকসকল, আমি তোমাদের মধ্যে নিরাপত্তার কথা ঘোষণা করছি। এরপর নিজের উটের পিঠে চড়ে মক্কায় চলে গেলেন।

কোরায়শদের কাছে গেলে তারা তাকে ঘিরে ধরে এবং মদীনার খবর জানতে চাইল। আবু সুফিয়ান বললেন, কথা বলেছি কিন্তু তিনি কোন জবাব দেননি। আবু কোহাফার পুত্রের কাছে গেছি তার মধ্যে ভালো কিছু পাইনি। ওমর ইবনে খাত্তাবের কাছে গেছি, তাকে মনে হয়েছে সবচেয়ে কট্টর দুশমন। আলীর কাছে গেলাম, তাকে সবচেয়ে নরম মনে হলো। তিনি আমাকে একটা পরামর্শ দিলেন আমি সে অনুযায়ী কাজ করলাম। জানি না সেটা কল্যাণকর হবে কিনা। লোকেরা জানতে চাইল সেটা কি? আবু সুফিয়ান বললেন, আলী পরামর্শ দিলেন আমি যেন নিরাপত্তার কথা ঘোষণা করি, অবশেষে আমি তাই করলাম।

কোরায়শরা বললো, মোহাম্মদ কি তোমার নিরাপত্তার ঘোষণাকে কার্যকর বলে ঘোষণা করেছে? আবু সুফিয়ান বললো, না তা করেনি। কোরায়শরা বললো, তোমার সর্বনাশ হোক। আলী তোমার সাথে স্রেফ রসিকতা করেছে। আবু সুফিয়ান বললো, আল্লাহর শপথ, এছাড়া অন্য কোন উপায় ছিলো না।

মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি তিবরানির বর্ণনা থেকে জানা যায়, কোরায়শদের বিশ্বাসঘাতকতার খবর আসার তিনদিন আগেই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা (রা.)-কে তাঁর সাজ-সরঞ্জাম প্রস্তুত করতে বলেছিলেন। তবে, বিষয়টি গোপন রাখার জন্যে তিনি পরামর্শ দেন। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) হযরত আয়েশার (রা.) কাছে বললেন, মা এ প্রস্তুতি কিসের? হযরত আয়েশা (রা.) বললেন, আমি জানি না আব্বা। হযরত আবু বকর বললেন, এটাতো রোমকদের সাথে যুদ্ধের সময় নয়। তাহলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন দিকে যাওয়ার ইচ্ছা করছেন? হযরত আয়েশা বললেন, আমি জানি না আব্বা। তৃতীয় দিন সকালে হযরত আমর ইবনে সালেম খাযায়ী ৪০ জন সওয়ারসহ এসে পৌঁছুলেন। তিনি কয়েক লাইন কবিতা আবৃত্তি করলেন। এতে শ্রোতারা বুঝতে পারলেন যে, কোরায়শরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এরপর বুদাইল এলেন। এরপর এলো আবু সুফিয়ান। এর ফলে সাহাবারা পরিস্থিতি উপলব্ধি করলেন। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের বললেন, মক্কায় যেতে হবে। সাথে সাথে এ দোয়া করলেন, হে আল্লাহ তায়ালা গোয়েন্দা এবং কোরায়শদের কাছে আমাদের যাওয়ার খবর যেন পৌঁছাতে না পারে, তুমি তার ব্যবস্থা করো। আমরা যেন মক্কাবাসীদের কাছাকাছি যাওয়ার আগে তারা বুঝতে না পারে, জানতেও না পারে।

গোপনীয়তা রক্ষার জন্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অষ্টম হিজরীর রমযান মাসে হযরত আবু কাতাদা ইবনে রাবঈর নেতৃত্বে আটজন সাহাবীকে এক ছারিয়্যায় বাতনে আযাম নামক জায়গায় প্রেরণ করেন। এই জায়গা যি খাশাব এবং যিল মাররার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এর দূরত্ব মদীনা থেকে ৩৬ মাইল।

এই ক্ষুদ্র সেনাদল প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, যারা বোঝার তারা বুঝবে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লিখিত জায়গায় যাবেন। চারিদিকে এই খবরই ছড়িয়ে পড়বে।

এ ক্ষুদ্র সেনাদল উল্লিখিত জায়গায় পৌঁছার পর খবর পেলো যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেছেন। এ খবর পাওয়ার পর তারাও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে কাফেলার সাথে গিয়ে মিলিত হলো।[৪]

এদিকে হাতেব ইবনে আবু বালতাআ কোরায়শদের এক খানি চিঠি লিখে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কা অভিযানের কথা জানানোর চেষ্টা করেন। সেই চিঠি মক্কায় কোরায়শদের হাতে পৌঁছানোর জন্যে অর্থের বিনিময়ে একজন মহিলাকে নিয়োগ করেন। সেই মহিলা খোঁপার ভেতর চিঠিখানি লুকিয়ে মক্কায় রওয়ানা হন। এদিকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় রসূলকে এ খবর জানিয়ে দেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলী, হযরত মেকদাদ, হযরত যোবায়ের এবং হযরত আবু মারছাদ গুনুবিকে ডেকে বলেন, তোমরা চারজন রওজা খাখ-এ যাও। সেখানে উটের পিঠে আরোহণকারিনী একজন মহিলাকে পাবে। তার কাছে একখানি চিঠি পাবে। সেই চিঠি কোরায়শদের কাছে পাঠানো হয়েছে। চারজন সাহাবী রওযা খাখ-এ পৌঁছে সেই মহিলাকে পেলেন। মহিলাকে জিজ্ঞাসা করা হলো তোমার কাছে কি কোন চিঠি আছে? মহিলা অস্বীকার করলো। সাহাবারা উটের হাওদাজে খুঁজে দেখলেন কিন্তু চিঠি পেলেন না। এরপর হযরত আলী (রা.) বললেন, আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও মিথ্যা বলেননি, আমরাও মিথ্যা বলছি না। তুমি হয়তো চিঠি দাও, না হয় আমরা তোমাকে উলঙ্গ করবো। একথা শুনে মহিলা বললো, আচ্ছা আপনারা একটু ঘুরে দাঁড়ান। সাহাবারা ঘুরে দাঁড়ালে মহিলা তার খোঁপা খুলে চিঠি বের করে সাহাবাদের হাতে দিলেন। তারা চিঠি নিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিঠিখানা পড়িয়ে দেখলেন যে, 'ওতে লেখা রয়েছে, হাতেব ইবনে আবু বালতাআর পক্ষ থেকে কোরায়শদের প্রতি।' এতে কোরায়শদেরকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কা অভিযানের খবর দেয়া হয়েছিলো।[৫]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, হাতেব, এটা কি? হাতেব বললেন, আমার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করবেন না। আল্লাহর কসম, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর আমার ঈমান রয়েছে। আমি মোরতাদ হয়ে যাইনি বা আমার মধ্যে কোন পরিবর্তনও আসেনি। কথা হচ্ছে যে, আমি কোরায়শ বংশের লোক নই। আমি

---

৪. এটি সেই ছারিয়্যা যার সাথে আমের ইবনে আজবাতের সাক্ষাৎ হয়েছিল। আমের ইসলামী রীতি অনুযায়ী সালাম করেছিলেন। কিন্তু পূর্বতন কোন শত্রুতার কারণে মাহলাম ইবনে জাশামা আমেরকে হত্যা করেন এবং তার উট ও অন্যান্য জিনিস আত্মসাৎ করেন। এরপর কোরআনের এই আয়াত নাযিল হয়, 'যে তোমাকে সালাম করে, তাকে বলো না যে, তুমি মোমেন নও।' এরপর সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহর রসূলের কাছে মাহলাম ইবনে জাশামের মাগফেরাতের দোয়া করার আবেদন জানান। আল্লাহর রসূলের সামনে মাহলাম হাযির হলে তিনি বলেন, হে আল্লাহ পাক, মাহলাম যেন ক্ষমা না পায়। তিনি এ কথা তিনবার উচ্চারণ করেন। এ কথা শুনে মাহলাম কাপড়ে চোখ মুছে উঠে পড়েন। ইবনে ইসহাক বলেন, মাহলামের গোত্রের লোকেরা বলেছে, পরবর্তীকালে আল্লাহর রসূল মাহলামের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করেছিলেন। দেখুন, যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ১৫১

৫. ইমাম সোহায়লী বিভিন্ন যুদ্ধের ঘটনার বিবরণ উল্লেখ করেছেন। তিনি চিঠির বিষয়বস্তু উদ্ধৃত করেছেন। চিঠিতে লেখা ছিল, আম্মা বাদ, হে কোরায়েশরা, আল্লাহর রসূল তোমাদের উদ্দেশ্যে সৈন্যসহ হাযির হচ্ছেন। যদি তিনি একাও হাযির হন তবে আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সাহায্য করবেন এবং তাঁকে দেয়া ওয়াদা পূরণ করবেন। কাজেই তোমরা নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা করো। ওয়াসসালাম।'
ওয়াকেদী লিখেছেন, হাতেব সোহায়েল ইবনে আমর সফওয়ান ইবনে উমাইয়া এবং একরামার কাছে একথা লিখেছেন যে, আল্লাহর রসূল লোকদের মধ্যে যুদ্ধের কথা ঘোষণা করেছেন। বুঝতে পরি না তোমাদের উদ্দেশ্যে যাবেন, নাকি অন্য কোথাও। আমি চাই যে, তোমাদের প্রতি এটা আমার এহসান হিসাবে গণ্য হবে।

তাদের মধ্যে আত্মগোপন করেছিলাম। বর্তমানে আমার পরিবার পরিজন তাদের কাছে রয়েছে। কোরায়শদের সাথে আমার এমন কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই, যে কারণে তারা আমার পরিবার পরিজনের তত্ত্বাবধান করবে। তাই আমি চিন্তা করলাম যে, তাদের একটা উপকার করবো এর ফলে তারা আমার পরিবার-পরিজনের হেফাযত করবে। আমি ছাড়া আপনার সঙ্গে অন্য যারা রয়েছেন মক্কায় তাদের প্রত্যেকেরই আত্মীয়-স্বজন রয়েছেন। সেসব আত্মীয়স্বজন তাদের পরিবার-পরিজনের হেফাযত করবেন। হযরত ওমর (রা.) হযরত হাতেবের কথা শুনে বললেন, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনি অনুমতি দিন, আমি তার শিরশ্ছেদ করবো। এই লোকটি আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেয়ানত করেছে। সে মোনাফেক হয়ে গেছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, দেখো, সে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। হে ওমর (রা.), তুমি কি করে জানবে, এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এসে বলবেন, তোমরা যা ইচ্ছা করো, আমি তোমাদের মাফ করে দিয়েছি। একথা শুনে হযরত ওমরের (রা.) দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূলই ভালো জানেন।[৬]

এমনি করে আল্লাহ তায়ালা রব্বুল আলামীন গুপ্তচরদের ধরিয়ে দিলেন। ফলে মুসলমানদের যুদ্ধ প্রস্তুতির কোন খবরই কোরায়শদের কাছে পৌঁছুতে পারেনি।

মক্কা অভিমুখে মুসলিম বাহিনী

অষ্টম হিজরীর ১০ই রমযান। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ১০ হাজার সাহাবা। মদীনার তত্ত্বাবধানের জন্যে আবু রাহাম গেফারীকে নিযুক্ত করা হয়।

জাহাফা বা তার আরো কিছু এগিয়ে যাওয়ার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা হযরত আব্বাসের সাথে দেখা। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে সপরিবারে মদীনায় হিজরত করে যাচ্ছিলেন। আবওয়া নামক জায়গায় পৌঁছে তাঁর চাচাতো ভাই আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস এবং ফুফাতো ভাই আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়ার সাথে দেখা হলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরা উভয়ে তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছিলো এবং কবিতা রচনা করে তাঁর নিন্দা করে বেড়াতো। এ অবস্থা দেখে হযরত উম্মে সালমা (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, আপনার চাচাতো ভাই ফুফাতো ভাই আপনার কাছে সবচেয়ে খারাপ হবে এটা সমীচীন নয়।

হযরত আলী (রা.) আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস এবং আবদুল্লাহ ইবনে উমাইয়াকে বললেন, তোমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাও এবং হযরত ইউসুফকে তাঁর ভাইয়েরা যে কথা বলেছিলেন সেকথা বলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিশ্চয়ই এটা পছন্দ করবেন না যে, অন্য কারো জবাব তাঁর চেয়ে উত্তম হবে। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভাইয়েরা তাঁকে বলেছিলেন, 'আল্লাহর শপথ, আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই আপনাকে আমাদের ওপর প্রাধ্যান্য দিয়েছেন এবং আমরা নিশ্চয়ই অপরাধী ছিলাম।' (সূরা ইউসুফ, আয়াত ৯১)

আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস তাই করলেন। এই আয়াত শুনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাবে বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই। 'তিনি দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু।' (সূরা ইউসুফ আয়াত, ৯২)

---

৬. সহীহ বোখারী, প্রথম খন্ড, পৃ. ৪২২

আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস এরপর কয়েক লাইন কবিতা আবৃত্তি করলেন, তার অর্থ হচ্ছে, 'তোমার বয়সের শপথ, আমি যখন লাত-এর শাহ সওয়ারকে মোহাম্মাদের শাহ সওয়ারের ওপর বিজয়ী করার উদ্দেশ্যে পতাকা তুলেছিলাম সে সময় আমার অবস্থা ছিলো রাতের পথহারা পথিকের মত। কিন্তু এখন আমাকে হেদায়াত দেয়ার সময় এসেছে, এখন আমি হেদায়াত পাওয়ার উপযুক্ত হয়েছি। আমার প্রবৃত্তির পরিবর্তে একজন হাদী আমাকে হেদায়াত দিয়েছেন এবং তিনি আমাকে আল্লাহর পথ দেখিয়েছেন। অথচ এই পথকে আমি ইতিপূর্বে সব সময় উপেক্ষা করেছিলাম।'

একথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবেগে আবু সুফিয়ানের বুকে চাপড় মেরে বললেন, তুমি আমাকে সব ক্ষেত্রে উপেক্ষা করেছিলে।[৭]

মাররুজ যাহারানে মুসলিম সেনাদল

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সফর অব্যাহত রাখলেন। তিনি এবং সাহাবায়ে কেরাম সকলেই রোযা রেখেছিলেন। আসফান ও কোদায়েদের মধ্যবর্তী কোদায়েদ জলাশয়ের কাছে পৌঁছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোযা ভেঙ্গে ফেললেন।[৮] তাঁর দেখাদেখি সাহাবায়ে কেরামও রোযা ভাঙ্গলেন।

এরপর পুনরায় তাঁরা সফর করতে শুরু করলেন। রাতের প্রথম প্রহরে তাঁরা মারুরুজ জাহারান অর্থাৎ ফাতেমা প্রান্তরে গিয়ে পৌঁছুলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশে সাহাবারা পৃথকভাবে আগুন জ্বালালেন। এতে দশ হাজার চুলায় রান্না হচ্ছিলো। আল্লাহর রসুল পাহারার কাজে হযরত ওমরকে (রা.) নিযুক্ত করলেন।

আল্লাহর রসূলের সমীপে আবু সুফিয়ান

মাররুজ জাহরানে অবতরণের পর হযরত আব্বাস (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাদা খচ্চরের পিঠে আরোহণ করে ঘোরাফেরা করতে বেরোলেন। তিনি চাচ্ছিলেন যে, কাউকে পেলে মক্কায় খবর পাঠাবেন, যাতে করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কায় প্রবেশের আগেই কোরায়শরা তাঁর কাছে এসে নিজেদের নিরাপত্তার আবেদন জানায়।

এদিকে আল্লাহ তায়ালা, কোরায়শদের কাছে কোন প্রকার খবর পৌঁছা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এ কারণে মক্কাবাসীরা কিছুই জানতে পারেনি। তবে তারা ভীতি-বিহ্বলতার মধ্যে এবং আশঙ্কার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল। আবু সুফিয়ান বাইরে এসে কোন নতুন খবর জানা যায় কিনা সে চেষ্টা করছিলো। সে সময় তিনি হাকিম বিন হাজাম এবং বুদাইল বিন ওরাকাকে সঙ্গে নিয়ে নতুন খবর সংগ্রহের চেষ্টায় বেরিয়েছিলেন।

হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, আমি হযরত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খচ্চরের পিঠে সওয়ার হয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ আবু সুফিয়ান এবং বুদাইল ইবনে ওরাকার কথা শুনতে পেলাম। আবু সুফিয়ান বলছিলেন, আল্লাহর শপথ, আমি আজকের মতো আগুন এবং সৈন্যবাহিনী অতীতে কখনো দেখিনি। বুদাইল ইবনে ওরাকা বললো, আল্লাহর শপথ, ওরা হচ্ছে বনু খোযাআ।

---

৭. পরবর্তীকালে আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস একজন ভালো মুসলমান হয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে ইসলাম গ্রহণের পর লজ্জার কারণে তিনি রসূলের প্রতি চোখ তুলে তাকাননি। আল্লাহর রসূলও তাকে ভালোবাসতেন এবং তাকে বেহেশতের সুসংবাদ দিতেন। তিনি বলতেন, আমি আশা করি আবু সুফিয়ান হামজার মতো হবে। ইন্তেকালের সময় উপস্থিত হলে বললেন, আমার জন্য কেঁদো না। ইসলাম গ্রহণের পর আমি পাপ হওয়ার মতো কোন কথা বলিনি। (যাদুল মায়াদ ২য় খন্ড, পৃ. ১৬২-১৬৩)

৮. সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড

যুদ্ধ ওদের লন্ড ভন্ড করে দিয়েছে। আবু সুফিয়ান বললেন, এতো আগুন এবং এতো বিরাট বাহিনী বনু খোযাআর থাকতেই পারে না।

হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, আমি আবু সুফিয়ানের কণ্ঠস্বর শুনে বললাম, আবু হানজালা নাকি? আবু সুফিয়ান আমার কণ্ঠস্বর চিনে বললেন, আবুল ফযল নাকি? আমি বললাম, হাঁ। আবু সুফিয়ান বললেন, কি ব্যাপার? আমার পিতামাতা তোমার জন্যে কোরবান হোন। আমি বললাম, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদলবলে এসেছেন। হায়রে কোরায়শদের সর্বনাশা অবস্থা। আবু সুফিয়ান বললেন, এখন কি উপায়? আমার পিতামাতা তোমার জন্যে কোরবান হোক। আমি বললাম, ওরা তোমাকে পেলে তোমার গর্দান উড়িয়ে দেবে। তুমি এই খচ্চরের পিছনে উঠে বসো। আমি তোমাকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে যাবো। তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে দেবো। আবু সুফিয়ান তখন খচ্চরে উঠে আমার পিছনে বসলেন। তার অন্য দু'জন সাথী ফিরে গেলো।

হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, আমি আবু সুফিয়ানকে নিয়ে চললাম, কোন জটলার কাছে গেলে লোকেরা বলতো, কে যায়? কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খচ্চরের পিঠে আমাকে দেখে বলতো, ইনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা, তাঁরই খচ্চরের পিঠে রয়েছেন। ওমর ইবনে খাত্তাবের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন, কে? একথা বলেই আমার দিকে এগিয়ে এলেন। আমার পিছনে আবু সুফিয়ানকে দেখে বললেন, আবু সুফিয়ান? আল্লাহর দুশমন? আল্লাহর প্রশংসা করি, কোন প্রকার সংঘাত ছাড়াই আবু সুফিয়ান আমাদের কবযায় এসে গেছে। একথা বলেই হযরত ওমর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছুটে গেলেন। আমিও খচ্চরকে জোরে তাড়িয়ে নিলাম। খচ্চর থেকে নেমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলাম। ইতিমধ্যে হযরত ওমর (রা.) এলেন। তিনি এসেই বললেন, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ওই দেখুন আবু সুফিয়ান। আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, আমি বললাম, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমি সুফিয়ানকে নিরাপত্তা দিয়েছি। পরে আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথা স্পর্শ করে বললাম, আল্লাহর শপথ, আজ রাতে আমি ছাড়া আপনার সাথে কেউ গোপন কথা বলতে পারবে না। আবু সুফিয়ানকে হত্যা করার অনুমতির জন্যে হযরত ওমর বারবার আবেদন জানালে আমি বললাম, থামো ওমর। আবু সুফিয়ান যদি বনি আদী ইবনে কা'ব এর লোক হতো, তবে এমন কথা বলতে না। হযরত ওমর বললেন, আব্বাস থামো। আল্লাহর শপথ, তোমার ইসলাম গ্রহণ আমার কাছে আমার পিতা খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণের চেয়ে অধিক পছন্দনীয় এবং এর একমাত্র কারণ এই যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তোমার ইসলাম গ্রহণ আমার পিতা খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণের চেয়ে অধিক পছন্দনীয়।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আব্বাস, আবু সুফিয়ানকে তোমার ডেরায় নিয়ে যাও। সকালে আমার কাছে নিয়ে এসো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ মতো আমি আবু সুফিয়ানকে আমার তাঁবুতে নিয়ে গেলাম। সকাল বেলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে আবু সুফিয়ানকে নিয়ে গেলাম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আবু সুফিয়ান, তোমার জন্যে আফসোস, তোমার জন্যে কি এখনো একথা বোঝার সময় আসেনি যে, আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই? আবু সুফিয়ান বললো, আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কোরবান হোন, আপনি কতো উদার, কতো মহানুভব, কতো দয়ালু। আমি ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ থাকলে এই সময়ে আমার কিছু কাজে আসতো।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আবু সুফিয়ান, তোমার জন্যে আফসোস, তোমার জন্যে কি এখনো একথা বোঝার সময় আসেনি যে, আমি আল্লাহর রসূল? আবু সুফিয়ান বললো, আমার পিতামাতা আপনার ওপর নিবেদিত হোন। আপনি কতো মহৎ, কতো দয়ালু, আত্মীয়স্বজনের প্রতি কতো যে সমবেদনশীল। আপনি যে প্রশ্ন করলেন, এ সম্পর্কে এখানো আমার মনে কিছু না কিছু খটকা রয়েছে। হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, আরে শিরশ্ছেদ হওয়ার মতো অবস্থা হওয়ার আগে ইসলাম কবুল করো। একথা সাক্ষী দাও যে, আল্লাহ ব্যতীত এবাদাতের যোগ্য কেউ নেই এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল। হযরত আব্বাস (রা.)-এর একথা বলার পর আবু সুফিয়ান ইসলাম কবুল করে এবং সত্যের সাক্ষী হলেন।

হযরত আব্বাস বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আবু সুফিয়ান মর্যাদাবান লোক, কাজেই তাকে কোন মর্যাদা দেয়ার আবেদন জানাচ্ছি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঠিক আছে, যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। যে ব্যক্তি নিজের ঘরে দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে রাখবে সে নিরাপদ যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করবে, সেও নিরাপদ।

মক্কা অভিমুখে ইসলামী বাহিনী

অষ্টম হিজরীর ১৭ই রমযান সকাল বেলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাররুজ জাহারান থেকে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। তাঁর চাচা হযরত আব্বাসকে বললেন, আবু সুফিয়ানকে যেন প্রান্তরের পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড় করিয়ে রাখে। এতে সেপথ অতিক্রমকারী আল্লাহর সৈনিকদের আবু সুফিয়ান দেখতে পাবে। হযরত আব্বাস (রা.) তাই করলেন। এদিকে বিভিন্ন গোত্র তাদের পতাকা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। কোন গোত্র অতিক্রমের সময় আবু সুফিয়ান জিজ্ঞাসা করতেন, আব্বাস এরা কারা? জবাবে হযরত আব্বাস যেমন বলতেন, ওরা বনু সালিম। আবু সুফিয়ান বলতেন, বুন সালিমের সাথে আমার কি সম্পর্ক? অন্য কেউ সেই পথ অতিক্রমের সময় আবু সুফিয়ান বলতেন, এরা কারা? হযরত আব্বাস যেমন বলতেন, এরা মোযায়না গোত্র। আবু সুফিয়ান বলতেন, মাজনিয়াহ গোত্রের সাথে আমার কি সম্পর্ক? একে একে সকল গোত্র আবু সুফিয়ানের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলো। যে কোন গোত্র যাওয়ার সময় আবু সুফিয়ান তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন এবং পরিচয় জানায় পর বলতেন, ওদের সাথে আমার কি সম্পর্ক? এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোহাজের ও আনসারদের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেখানে দেখা যাচ্ছিল শুধু লৌহ শিরস্ত্রাণ। আবু সুফিয়ান বললেন, সুবহানাল্লাহ, এরা কারা? হযরত আব্বাস বললেন, আনসার ও মোহাজেরদের সঙ্গে নিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাচ্ছেন। আবু সুফিয়ান বললেন, এদের সাথে যুদ্ধ করার শক্তি কার আছে? আবুল ফযল, তোমার ভাতিজার বাদশাহী তো বড়ো জবরদস্ত হয়ে গেছে। হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, আবু সুফিয়ান এটা হচ্ছে নবুয়ত। আবু সুফিয়ান বললেন, হাঁ, এখন তো তাই বলা হবে।

এ সময় আরো একটা ঘটনা ঘটলো। আনসারদের পতাকা হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.) বহন করছিলেন। আবু সুফিয়ানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় হযরত সা'দ (রা.) বললেন, আজ রক্তপাত এবং মারধোর করার দিন। আজ হারামকে হালাল করা হবে। আল্লাহ তায়ালা আজ কোরায়শদেব জন্যে অবমাননা নির্ধারণ করে রেখেছেন। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাওয়ার সময় আবু সুফিয়ান বললেন, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সা'দ যা বলেছে, আপনি কি সে কথা শুনেছেন? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন যে, সা'দ কি বলেছে? আবু সুফিয়ান বললেন, এই এই কথা বলেছে। একথা শুনে হযরত ওসমান

এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ বললেন, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমরা আশঙ্কা করছি যে, সা'দ কোরায়শদের মধ্যে খুন-খারাবি শুরু না করে? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না আজতো এমন দিন যে, কাবার তাযিম করা হবে। আজ এমন দিন যে, আল্লাহ তায়ালা কোরায়শদের সম্মান দেবেন। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন সাহাবীকে পাঠিয়ে হযরত সা'দ এর হাত থেকে পতাকা নিয়ে নিলেন এবং তাঁর পুত্র কয়েস এর হাতে দিলেন। এতে মনে হলো পতাকা যেন হযরত সা'দ-এর হাতেই রয়ে গেছে। অন্য বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পতাকা হযরত যোবায়ের (রা.) এর হাতে দিয়েছিলেন।

কোরায়শদের দোরগোড়ায়

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু সুফিয়ানের সামনে দিয়ে যাওয়ার পর হযরত আব্বাস (রা.) বললেন, আবু সুফিয়ান, এবার তুমি কওমের কাছে যাও। আবু সুফিয়ান দ্রুত মক্কায় গিয়ে পৌঁছালো এবং উচ্চ কণ্ঠে বললো, হে কোরায়শরা, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের কাছে এতো সৈন্য নিয়ে এসেছেন যে, মোকাবেলা করা অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই যে ব্যক্তি আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপত্তা পাবে। একথা শুনে আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দ বিনতে ওতবা উঠে দাঁড়িয়ে সামনে এসে আবু সুফিয়ানের গোঁফ নেড়ে বললো, তোমরা এই বুড়োকে মেরে ফেলো। খারাপ খবর নিয়ে আসা এই বুড়োর অকল্যাণ হোক।

আবু সুফিয়ান বললেন, তোমাদের সর্বনাশ হোক। দেখো তোমাদের জীবন বাঁচানোর ব্যাপারে এই মেয়েলোক তোমাদের যেন ধোঁকায় না ফেলে। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতো বিরাট বাহিনী নিয়ে এসেছেন যার মোকাবেলা করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। কাজেই, যারা আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, তারা নিরাপদ। লোকেরা বললো, আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। আমরা কয়জন তোমার ঘরে যেতে পারবো? আবু সুফিয়ান বললেন, যারা নিজের ঘরের দরোজা ভেতর থেকে বন্ধ করে রাখবে, তারাও নিরাপত্তা পাবে। যারা মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে, তারাও নিরাপত্তা পাবে। একথা শুনে লোকেরা নিজেদের ঘর এবং মসজিদে হারাম অর্থাৎ কাবাঘরের দিকে দৌড়াতে লাগলো। তবে মতলববাজ কোরায়শরা কিছু সংখ্যক মাস্তানজাতীয় উচ্ছৃঙ্খল লোককে লেলিয়ে দিয়ে বললো, আমরা এদের সামনে ঠেলে দিলাম। যদি কোরায়শরা কিছুটা সাফল্য লাভ করে, তবে আমরা এদের সাথে গিয়ে মিলিত হব। যদি এরা আহত হয়, তবে আমাদের কাছে তারা যা কিছু চাইবে, আমরা তাই দেবো। মুসলমানদের সাথে লড়াই করতে কোরায়শদের যেসব মাস্তান ও উচ্ছৃঙ্খল লোকেরা প্রস্তুত হলো সেসব নির্বোধ লোকের নেতা মনোনীত করা হলো একরামা ইবনে আবু জেহেল, সফওয়ান ইবনে উমাইয়া এবং সোহায়েল ইবনে আমরকে। এ তিনজনের নেতৃত্বে একদল কোরায়শ খান্দামায় সমবেত হলো। এদের মধ্যে বনু বকর গোত্রের হাম্মাস ইবনে কয়েস নামে একজন লোকও ছিলো। এর আগে সে অস্ত্র মেরামতের কাজ করতো। একদিন নিজ অস্ত্র মেরামতের সময় তার স্ত্রী বললো, তোমার এ প্রস্তুতি কিসের গো? হাম্মাস বললো, মোহাম্মদ এবং তার সঙ্গীদের সাথে মোকাবেলা করার প্রস্তুতি। একথা শুনে তার স্ত্রী বললো, আল্লাহর শপথ, মোহাম্মদ এবং তার সঙ্গীদের মোকাবেলা করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। হাম্মাস বললো, আল্লাহর শপথ, আমি আশা করি যে, তাঁর কয়েকজন সঙ্গীকে আমি তোমার দাস হিসাবে হাযির করতে পারব। ওরা যদি আজ মোকাবেলার জন্যে আসে, তবে ওদের মোকাবেলার জন্যে আমার কোন অজুহাত থাকবে না। পূর্ণাঙ্গ হাতিয়ার রয়েছে। ধারালো বর্শা, দু'ধারি তলোয়ার। খান্দামার যুদ্ধে এ লোকটিও উপস্থিত হয়েছিলো।

যি-তুবায়

এদিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাররাজ জাহরান থেকে রওয়ানা হয়ে যি-তুবায় পৌঁছুলেন। এ সময়ে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত মর্যাদার কারণে বিনয় ও কৃতজ্ঞতায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথা নীচু করে রেখেছিলেন। যি-তুবায় তিনি সৈন্য সমাবেশ করলেন। খালেদ ইবনে ওলীদকে নিজের ডানদিকে রাখলেন। এখানে আসলাম, সোলায়েম, গেফার, মোজাইনা এবং কয়েকটি আরব গোত্র ছিলো। খালেদ ইবনে ওলীদকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন মক্কার ঢালু এলাকায় প্রবেশ করেন। খালেদকে বললেন, যদি কোরায়শদের কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তবে তাকে হত্যা করবে। এরপর তুমি সাফায় গিয়ে আমার সাথে দেখা করবে।

হযরত যোবায়ের ইবনে আওয়ামকে বামদিকে রাখলেন। তাঁর হাতে ছিলো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পতাকা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আদেশ দিলেন, তিনি যেন মক্কার উঁচু এলাকা অর্থাৎ কোদায় প্রবেশ করেন এবং হাজুনে তাঁর দেয়া পতাকা স্থাপন করে তাঁর আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করেন।

পদব্রজে যারা এসেছিলেন তাদের পরিচালনার দায়িত্ব পালন করছিলেন হযরত আবু ওবায়দা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ দিলেন, তিনি যেন প্রান্তরের প্রান্তসীমার পথ ধরে অগ্রসর হন এবং মক্কায় তাঁরা অবতরণ করেন।

ইসলামী বাহিনীর মক্কায় প্রবেশ

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পাওয়ার পর সেনাপতিরা নিজ নিজ সৈন্যদের নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় চলে গেলেন।

হযরত খালেদ এবং তাঁর সঙ্গীদের পথে যেসব পৌত্তলিক আসছিলো, তাদের সাথে মোকাবেলা করে তাদের হত্যা করা হলো। হযরত খালেদের সাথী কারয ইবনে জাবের ফাহরি এবং খুনায়েস ইবনে খালেদ ইবনে রবিয়া শাহাদাত বরণ করেন। এরা দু'জন সেনাদল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য রাস্তায় চলে গিয়েছিলেন। সেখানে তাদের হত্যা করা হয়। খান্দামায় হযরত খালেদ এবং তাঁর সঙ্গীদের সাথে উচ্ছৃঙ্খল কোরায়শরা মুখোমুখি হলো। কিছুক্ষণ উভয় পক্ষে সংঘর্ষ হলো। এতে ১২ জন পৌত্তলিক নিহত হলো। এ ঘটনায় কোরায়শদের মনে আতঙ্ক ছেয়ে গেলো। মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে সংকল্পবদ্ধ হাম্মাস ইবনে কয়েস দ্রুত ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো। তাঁর স্ত্রীকে বললো, দরোজা বন্ধ রাখবে, খুলবে না। তার স্ত্রী বললো, আপনার সেই বাগাড়ম্বর গেলো কোথায়? হাম্মাস ইবনে কয়েস বললো, হায়রে, তুমি যদি খান্দামায় যুদ্ধের অবস্থা দেখতে, তবে এমন কথা বলতে না। তোমাকে কি আর বলবো, সফওয়ান আর একরামা ছুটে পলায়ন করলো। নাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করা হলো। সেই তলোয়ার গলা এবং মাথা এমনভাবে কাটছিলো যে, নিহতদের হৃদয়বিদায়ক চিৎকার এবং হৈহল্লা ছাড়া কিছুই শোনা যাচ্ছিল না।

হযরত খালেদ (রা.) খান্দামায় শত্রুদের মোকাবেলার পর মক্কার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে সাফায় গিয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিলিত হলেন।

এদিকে হযরত যোবায়ের (রা.) সামনে অগ্রসর হয়ে হাজুল-এর মসজিদে ফতেহ-এর কাছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পতাকা স্থাপন করলেন এবং তাঁর অবস্থানের জন্যে একটি কোব্বা তৈরী করলেন। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যাওয়া পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করলেন।

বায়তুল্লায় প্রবেশ এবং মূর্তি অপসারণ

এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসার ও মোহাজেরদের সঙ্গে নিয়ে মসজিদে হারাম— বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করলেন। প্রথমে তিনি হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করলেন। এরপর কাবাঘর তওয়াফ করলেন। সে সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে একটি ছড়ি ছিলো।

কাবাঘরের আশেপাশে এবং ছাদের ওপর সেই সময় তিনশত ষাটটি মূর্তি ছিলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর হাতের লাঠি দিয়ে সেসব মূর্তিকে গুঁতো দিচ্ছিলেন আর উচ্চারণ করছিলেন, সত্য এসেছে, অসত্য চলে গেছে, নিশ্চয়ই অসত্য চলে যাওয়ার মতো।

পবিত্র কোরআনের এই আয়াতও তিনি উচ্চারণ করছিলেন, 'সত্য এসেছে এবং অসত্যের চলাফেরা শেষ হয়ে গেছে।'

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উটনীর উপর বসে তওয়াফ করলেন এবং এহ্‌রাম অবস্থায় না থাকার কারণে শুধু তওয়াফই করলেন। তওয়াফ শেষ করার পর হযরত ওসমান ইবনে তালহা (রাঃ)-কে ডেকে তাঁর কাছ থেকে কাবা ঘরের চাবি নিলেন। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে কাবাঘর খোলা হলো। ভেতরে প্রবেশ করে তিনি দেখলেন অনেকগুলো ছবি। এ সব ছবির মধ্যে হযরত ইবরাহীম এবং হযরত ইসমাইলের ছবিও ছিলো। তাঁদের হাতে ছিলো ভাগ্য গননার তীর। এ দৃশ্য দেখে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহ তায়ালা এই সব পৌত্তলিককে ধ্বংস করুন। আল্লাহর শপথ, এই দুইজন পয়গাম্বর কখনোই গণনায়-এর তীর ব্যবহার করেননি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবাঘরের ভেতর কাঠের তৈরী একটি কবুতরও দেখলেন। নিজ হাতে তিনি সেটি ভেঙ্গে ফেললেন। তাঁর নির্দেশে ছবিগুলো নষ্ট করে ফেলা হলো।

কাবাঘরে নামায আদায় এবং কোরায়শদের উদ্দেশ্যে ভাষণ

এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভেতর থেকে কাবাঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। হযরত উসামা এবং হযরত বেলাল ভেতরেই ছিলেন। দরজা বন্ধ করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরজার মুখোমুখি দেয়ালের কাছে গিয়ে দেয়াল থেকে তিন হাত দূরে দাঁড়ালেন। এ সময় দুটি খাম্বা ছিলো বাম দিকে। একটি খাম্বা ছিলো ডানদিকে। তিনটি খাম্বা ছিলো পেছনে। সেই সময়ে কাবাঘরে ছয়টি খাম্বা বা খুঁটি ছিলো। এরপর তিনি সেখানে নামায আদায় করলেন। নামায শেষে তিনি কাবাঘরের ভেতরের অংশ ঘুরলেন। সকল অংশে তকবীর এবং তওহীদের বাণী উচ্চারণ করলেন। এরপর পুনরায় কাবা ঘরের দরজা খুলে দিলেন। কোরায়শরা সামনে অর্থাৎ মসজিদে হারামে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিলো। তারা অপেক্ষা করছিলো যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি করেন। দুহাতে দরজার দুই পাল্লা ধরে তিনি কোরায়শদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। সেই ভাষণে তিনি বললেন, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা সত্য করে দেখিয়েছেন। তাঁর বান্দাদের মাধ্যমে তিনি একাই সকল বিরুদ্ধ শক্তিকে পরাজিত করেছেন। শোনো, কাবাঘরের তত্ত্বাবধান এবং হাজীদের পানি পান করানো ছাড়া অন্য সকল সম্মান বা সাফল্য আমার এই দুই পায়ের নীচে। মনে রেখো, যে কোন রকমের হত্যাকান্ডের দায়িত্ব বা ক্ষতিপূরণ একশত উট। এর মধ্যে চল্লিশটি উট হতে হবে গর্ভবতী।

হে কোরায়শরা, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের মধ্য থেকে জাহেলিয়াত এবং পিতা ও পিতামহের অহংকার নিঃশেষ করে দিয়েছেন। সকল মানুষ আদমের সন্তান আর আদম মাটি থেকে তৈরী। এরপর তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, 'হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী থেকে। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে করে, তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক মোত্তাকী। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।

আজ কোন অভিযোগ নেই

এরপর তিনি বললেন, হে কোরায়শরা, তোমাদের ধারণা, আমি তোমাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবো? সবাই বললো, ভালো ব্যবহার করবেন, এটাই আমাদের ধারণা। আপনি দয়ালু। দয়ালু ভাইয়ের পুত্র। এরপর তিনি বলেন, তাহলে আমি তোমাদেরকে সেই কথাই বলছি, যে কথা হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁর ভাইদের বলেছিলেন, 'লা তাছরিবা আলাইকুমুল ইয়াওমা।' আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। তোমরা সবাই মুক্ত।

কাবাঘরের চাবি

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর মসজিদে হারামে বসলেন। হযরত আলীর হাতে ছিলো কাবাঘরের চাবি। তিনি বললেন, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হাজীদের পানি পান করানোর মর্যাদার পাশাপাশি কাবাঘরের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও আমাদের ওপর ন্যস্ত করুন। আল্লাহ তায়ালা আপনার ওপর রহমত করুন। অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী এই আবেদন হযরত আব্বাস জানিয়েছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওসমান ইবনে তালহা কোথায়? তাঁকে ডাকা হলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ওসমান এই নাও চাবি। আজকের দিন হচ্ছে আনুগত্যের দিন। তবাকতে ইবনে সা'দ-এর বর্ণনা অনুযায়ী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই চাবি সবসময়ের জন্যে নাও। তোমাদের কাছ থেকে এ চাবি সেই কেড়ে নেবে যে যালেম। হে ওসমান (রা.), আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে তার ঘরের তত্ত্বাধায়ক নিযুক্ত করেছেন। কাজেই বায়তুল্লাহ থেকে যা কিছু পাও, তা ভক্ষণ করবে।

কাবার ছাদে বেলালের আযান

নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেলালকে কাবার ছাদে উঠে আযান দেয়ার আদেশ দিলেন। সে সময় আবু সুফিয়ান ইবনে হরব, আত্তাব ইবনে আছিদ এবং হাবেছ ইবনে হেশাম কাবার আঙ্গিনায় বসেছিলো। সেখানে অন্য কেউ ছিলো না। আত্তাব বললো, আল্লাহ তায়ালা আছিদকে এ মর্যাদা দিয়েছেন যে, তাকে এই আযান শুনতে হয়নি। নতুবা তাকে এক অপ্রীতিকর জিনিস শুনতে হতো। একথা শুনে হারেস বললো শোনো, আল্লাহর শপথ, যদি আমি শুনতে পারি যে, তিনি সত্য তবে আমি তার আনুগত্যকারী হয়ে যাব। আবু সুফিয়ান বললেন, দেখো, আমি কিছু বলব না। যদি কিছু বলি আল্লাহর শপথ, তবে এই পাথরের টুকরোগুলোও আমার সম্পর্কে খবর দেবে। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সামনে হাযির হয়ে বললেন, এ মাত্র তোমরা যা বলেছ, আমি সব জানি। এরপর তিনি তাদের কথা তাদের শোনালেন। এ বিস্ময়কর ঘটনায় হারেছ এবং আত্তাব বললেন, আমরা সাক্ষ্য দিতেছি যে, আপনি আল্লাহর রসূল। আল্লাহর শপথ, আমাদের কথা শোনার মতো কেউ আমাদের সঙ্গে ছিলো না। আমরা বলছি যে, আপনাকে আমাদের কথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

বিজয় বা শোকরানার নামায

সেদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে হানি বিনতে আবু তালেবের ঘরে গিয়ে গোসল করলেন। এরপর সেখানে আট রাকাত নামায আদায় করলেন।

তখন ছিলো চাশত-এর সময়। এ কারণে কেউ বললো, এটা চাশত-এর নামায, কেউ বললো, ফতেহ বা বিজয়ের পর শোকরানার নামায। উম্মে হানি তার দু'জন দেবরকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, উম্মে হানি, তুমি যাদের আশ্রয় দিয়েছো, তাদের আমিও আশ্রয় দিলাম। একথা বলার কারণ ছিলো এই যে, উম্মে হানির দুই দেবরকে হযরত আলী (রা.) হত্যা করতে চাচ্ছিলেন। উম্মে হানি ছিলেন হযরত আলীর বোন। উম্মে হানি তার দুই দেবরকে লুকিয়ে রেখে দরজা বন্ধ করে রেখেছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে গেলে উম্মে হানি তাকে দেবরদের সমস্যা সম্পর্কে বললে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

চিহ্নিত কয়েকজন শত্রু

মক্কা বিজয়ের দিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নয়জন কুখ্যাত চিহ্নিত অপরাধীকে হত্যা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলে এদের ব্যাপারে বলা হয় যে, এরা কাবাঘরের পর্দার নীচে আত্মগোপন করলেও যেন হত্যা করা হয়। এরা হলো:

১. আবদুল ওজ্জা ইবনে খাতাল ২. আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে আবু ছারাহ। ৩. একরামা ইবনে আবু জেহেল। ৪. হারেছ ইবনে নুফায়েল ইবনে ওয়াহাব ৫. মাকিছ ইবনে ছাবাবা ৬. হাব্বার ইবনে আসওয়াদ ৭. ইবনে খাতালের দুই দাসী, যারা কবিতার মাধ্যমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বদনাম রটাতো ৯. সারাহ সে ছিলো আবদুল মোত্তালেবের সন্তানদের একজনের দাসী। সে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কুৎসা রটনা করতো অধিকন্তু তার কাছেই মক্কায় প্রেরিত হাতেবের চিঠি পাওয়া গিয়েছিলো।

আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ ইবনে আবু ছারাহকে হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে গিয়ে তার প্রাণ ভিক্ষার সুপরিশ করলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রাণভিক্ষা দিয়ে তার ইসলাম গ্রহণ মেনে নিলেন। কিন্তু এর আগে তিনি কিছুক্ষণ নীরব ছিলেন। তিনি চাচ্ছিলেন যে, ইতিমধ্যে কোন একজন সাহাবী আবদুল্লাহকে হত্যা করুক। কেননা এই লোকটি আগেও একবার ইসলাম গ্রহণ করেছিলো এবং হিজরত করে মদীনায় গিয়েছিলো কিন্তু পরে মোরতাদ অর্থাৎ ধর্মান্তরিত হয়ে মক্কায় পালিয়ে এসেছিলো। দ্বিতীয়বার ইসলাম গ্রহণের পর অবশ্য তিনি ইসলামের ওপর অটল অবিচল ছিলেন।

একরামা ইবনে আবু জেহেল ইয়েমেনের পথে পালিয়ে গিয়েছিলো। তার স্ত্রী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাইলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মঞ্জুর করলেন। এরপর সেই মহিলা স্বামীর পথের অনুসরণ করে তাকে ফিরিয়ে আনলো। একরামা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং তার ইসলাম খাঁটি ইসলামই প্রমাণিত হয়েছিলো।

ইবনে খাতাল কাবাঘরের পর্দা ধরে ঝুলছিলো। একজন সাহাবী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে খবর দিলেন। তিনি বললেন, ওকে হত্যা করো। সেই সাহাবী গিয়ে তাকে হত্যা করলেন।

মাকিছ ইবনে ছাবাবাকে হযরত নোমাইলা ইবনে আবদুল্লাহ হত্যা করলেন। মাকিছ প্রথমে মুসলমান হয়েছিলেন। কিন্তু পরে ধর্মান্তরিত হয় এবং একজন আনসার সাহাবীকে হত্যাও করে। এরপর মক্কায় মোশরেকদের কাছে ফিরে যান।

হারেছ মক্কায় রসূলকে নানাভাবে কষ্ট দিতো। হযরত আলী (রা.) তাকে হত্যা করেন।

হাব্বাব ইবনে আসওয়াদ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা হযরত যয়নব (রা.)-কে তাঁর হিজরতের সময়ে এমন জোরে ধাক্কা মেরেছিলেন যে, তিনি হাওদায় থেকে শক্ত প্রান্তরে গিয়ে পড়ে যান। এতে তাঁর গর্ভপাত হয়ে যায়। মক্কা বিজয়ের দিন এ লোকটি পালিয়ে যায়। পরে মুসলমান হয়ে ফিরে আসে। পরবর্তীতে তার ইসলামও যথার্থ প্রমাণিত হয়েছিলো।

ইবনে খাতালের দুইজন দাসীর মধ্যে একজনকে হত্যা করা হয়। অন্যজনের জন্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রাণভিক্ষা করা হয় এবং সে ইসলাম গ্রহণ করে।

হাতেবের পত্রবাহক সারাহর জন্যেও প্রাণভিক্ষা চাওয়া হয় এবং সে ইসলাম গ্রহণ করে।

বাকি পাঁচজনের প্রাণভিক্ষা দেয়া হয় এবং তারা ইসলাম গ্রহণ করেন।

❒ ইবনে হাজার লিখেছেন, যাদেরকে হত্যা তালিকায় রাখা হয়েছিলো তাদের প্রসঙ্গে আবু মা'শাব আরো একজনের নাম উল্লেখ করেন। সে হচ্ছে হারেস ইবনে তালাল খাযায়ী। হযরত আলী (রা.) তাকে হত্যা করেন। ❒ ইমাম হাকেম এই তালিকায় কা'ব ইবনে যুহাইর-এর নামও উল্লেখ করেন। কা'ব এর ঘটনা বিখ্যাত। তিনি পরে এসে ইসলাম গ্রহণ করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসায় কবিতা রচনা করেন। ❒ এই তালিকায় ওয়াহশী ইবনে হারব এবং আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দ বিনতে ওতবার নামও ছিলো। তারা পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। ❒ ইবনে খাতালের দাসী আরনবকে হত্যা করা হয়। ❒ উম্মে সা'দকেও হত্যা করা হয়। ইবনে ইসহাক এরূপ উল্লেখ করেছেন। এই হিসাবে পুরুষদের সংখ্যা আট এবং মহিলাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ছয়। এমনও হতে পারে যে, আরনব এবং উম্মে সা'দ একই দাসীর নাম। লকব এবং কুনিয়তের ক্ষেত্রেই শুধু পার্থক্য রয়েছে।

❒ সফওয়ান ইবনে উমাইয়াকে যদিও হত্যা তালিকায় রাখা হয় নাই কিন্তু বিশিষ্ট কোরায়শ নেতা হিসাবে তার মনে নিজের জীবনের আশঙ্কা ছিলো। এ কারণে সে পালিয়ে গিয়েছিলো। ওমায়ের ইবনে ওহাব জুহমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে তার নিরাপত্তার আবেদন জানান। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে নিরাপত্তা দেন। নিরাপত্তার নিদর্শন স্বরূপ তিনি ওমায়েরকে নিজের পাগড়ি প্রদান করেন। উল্লেখ্য মক্কায় প্রবেশের সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পাগড়ি মাথায় দিয়েছিলেন। ওমায়ের সফওয়ানের কাছে গেলেন। সে সময় সফওয়ান জেদ্দা থেকে ইয়েমেনে সমুদ্রপথে পালিয়ে যেতে নৌকায় আরোহণ করতে যাচ্ছিলেন। ওমায়ের সেখান থেকে সফওয়ানকে নিয়ে এলেন। রসূলুল্লাহর কাছে এসে সফওয়ান দুই মাসের সময় চাইলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে চার মাসের সময় দিলেন। এরপর সফওয়ান ইসলাম গ্রহণ করেন। তার স্ত্রী আগেই মুসলমান হয়েছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয়কে প্রথম বিয়ের ওপর অটুট রাখলেন।

❒ ফোযালা ছিলো একজন অপরাধী। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তওয়াফ করার সময় সে তাঁকে হত্যার কুমতলবে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ায়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

তাকে তার মনের ষড়যন্ত্রের কথা বলে দিলেন। এতে ফোযালার বিস্ময়ের সীমা রইল না। সাথে সাথে সে পাঠ করলো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।

মক্কা বিজয়ের পরদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষণ

মক্কা বিজয়ের পরদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাষণ দেয়ার জন্যে দাঁড়ালেন। তিনি আল্লাহর যথাযথ প্রশংসা করার পর বললেন, 'হে লোকসকল, আল্লাহ তায়ালা যে তারিখে আসমান যমিন সৃষ্টি করেছিলেন সেদিনই মক্কাকে মর্যাদা সম্পন্ন শহর হিসেবে নির্ধারণ করেন। একারণে এই শহরের মর্যাদা কেয়ামত পর্যন্ত অটুট থাকবে। আল্লাহ তায়ালা এবং রোয কেয়ামতের ওপর বিশ্বাসী কোন মানুষের জন্যেই এই শহরে রক্তপাত করা বা কোন গাছ কাটা বৈধ নয়। যদি কেউ প্রশ্ন তোলে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে রক্তপাত করেছেন তবে তাকে বলবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে অনুমতি দিয়েছিলেন, কিন্তু তোমাদের সে অনুমতি দেয়া হয়নি। আর আমার জন্যে নির্দিষ্ট সময়েই রক্তপাত বৈধ করা হয়েছিলো। অতীতে যেমন এখানে রক্তপাত খুন খারাবি নিষিদ্ধ ছিলো ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। যারা এখানে উপস্থিত রয়েছো তারা অনুপস্থিতিদের এ খবর জানিয়ে দেবে।'

এক বর্ণনায় আরো উল্লেখ্য রয়েছে যে, এখানের কাঁটা যেন কাটা না হয়, শিকার যেন তাড়ানো না হয়, পথে পড়া পরিত্যক্ত জিনিস যেন তোলা না হয়। তবে, সেই ব্যক্তি তুলতে পারবে, যে সেই জিনিসের পরিচয় করাবে। এখানে ঘাস যেন তোলা না হয়। হযরত আব্বাস (রা.) ইযখির ঘাসের প্রসঙ্গ তুললে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাঁ ইযখির ঘাস তোলা যাবে। বনু খাযাআ গোত্রের লোকেরা সেদিন বনু লাইসের একজনকে হত্যা করলো। কারণ বনু লাইসের লোকেরা আইয়ামে জাহেলিয়াতের সময়ে বনু খাযাআ গোত্রের একজন লোককে হত্যা করেছিলো। রসূলে খোদা এ সম্পর্কে বললেন, খাযাআ গোত্রের লোকেরা তোমরা হত্যাকান্ড থেকে নিজেদের বিরত রাখো। হত্যাকান্ড যদি কল্যাণকর প্রমাণিত হতো, তবে আগেই হতো। অনেক হত্যাকান্ড ঘটেছে। তোমরা এমন একজন লোককে হত্যা করেছো, যার ক্ষতিপূরণ অবশ্যই আমি আদায় করবো। এখন থেকে কেউ যদি কাউকে হত্যা করে তবে নিহত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন ইচ্ছা করলে ঘাতকদের কাউকে হত্যা করতে পারবে আর ইচ্ছা করলে ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে।

এক বর্ণনায় রয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই ঘোষণার পর আবু শাহ নামে ইয়েমেনের একজন লোক উঠে দাঁড়িয়ে বললো, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনার এই ঘোষণা আমার জন্যে লিখিয়ে দিন। তিনি লিখে দেয়ার নির্দেশ দিলেন।[১০]

আনসারদের সংশয়

মক্কা বিজয়ের পর আনসাররা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মাতৃভূমি অধিকার করার পর কি মক্কাই থাকবেন? সেই সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পর্বতে হাত তুলে দোয়া করছিলেন। দোয়া শেষ করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা নিজেদের মধ্যে কি কথা বলাবলি করছিলে?' আনসাররা অস্বীকার করলেন। বার বার জিজ্ঞাসার

১০. সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ২২, ২১৬

পর তারা নিজেদের সংশয়ের কথা জানালেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহর পানাহ, এখন জীবন মরণ তোমাদের সাথে।

বাইয়াত

আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানদের মক্কার বিজয় দেয়ার পর মক্কার অধিবাসীদের সামনে সত্য পরিষ্কার হয়ে গেলো। তারা বুঝতে পারলো যে, ইসলাম ব্যতীত সাফল্যের কোন পথ নেই। এ কারণে ইসলামের অনুসারী হওয়ার উদ্দেশ্যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে বাইয়াতের জন্যে হাযির হলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফার ওপরে বসে লোকদের কাছ থেকে বাইয়াত নিতে শুরু করলেন। হযরত ওমর (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নীচে ছিলেন এবং লোকদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করছিলেন। উপস্থিত লোকেরা এ মর্মে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ হলো যে, তারা যতোটা সম্ভব তাঁর কথা শুনবে এবং মেনে চলবে।

তাফসীরে মাদারেকে উল্লেখ রয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষদের কাছ থেকে বাইয়াত গ্রহণের পর মহিলাদের কাছ থেকেও বাইয়াত নেন। হযরত ওমর (রা.) নীচে ছিলেন এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশে বাইয়াত নিচ্ছিলেন, মহিলাদের তাঁর কথা শোনাচ্ছিলেন।

সে সময় আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হেন্দা ভিন্ন পোশাকে হাযির হলেন। আসলে হযরত হামযার (রা.) লাশের সাথে তিনি যে আচরণ করেছিলেন সে কারণে ভীত ছিলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে চিনে ফেলেন কিনা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বলে বাইয়াত নিচ্ছিলেন যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না। হযরত ওমর (রা.) সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করে বললেন, মহিলারা তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তোমরা চুরি করবে না। একথা বলার পরই হেন্দা বললো, আবু সুফিয়ান আস্ত কৃপণ, আমি যদি তার ধন-সম্পদ থেকে কিছু নেই, তখন কি হবে? আবু সুফিয়ান সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বললেন, তুমি যা কিছু নেবে সেসব তোমার জন্যে হালাল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসলেন। এরপর বললেন, আচ্ছা, তুমি কি হেন্দা? আবু সুফিয়ানের স্ত্রী বললো, হাঁ, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যা কিছু হয়ে গেছে, সেসব মাফ করে দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ তায়ালা তোমাকে মার্জনা করুন।'

এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা যেনা করবে না। একথা শুনে হেন্দা বললেন, স্বাধীন কোন নারী কি যেনা করতে পারে? এরপর তিনি বললেন, নিজের সন্তানকে হত্যা করবে না। হেন্দা বললেন, শৈশবে আমি তাদের লালন-পালন করেছি, বড় হওয়ার পর আপনার লোকেরা তাদের হত্যা করেছে। কাজেই তাদের বিষয়ে আপনি এবং তারা ভালো জানেন।

উল্লেখ্য, হেন্দার পুত্র হানযালা ইবনে আবু সুফিয়ান বদরের যুদ্ধের দিনে নিহত হয়েছিলো। হেন্দার কথা শুনে হযরত ওমর (রা.) হেসে কুটি কুটি হলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও হাসলেন।

এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কারো নামে অপবাদ দেবে না। হেন্দা বললেন, আল্লাহর শপথ, অপবাদ বড় খারাপ জিনিস। আপনি প্রকৃতই হেদায়াত এবং উন্নত চরিত্রের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কোন স্থিরিকৃত বিষয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাফরমানি করবেন না। হেন্দা বললেন, আল্লাহর শপথ, এই মজলিসে আমি মনে এমন ভাব নিয়ে বসিনি যে, আপনার নাফরমানী করবো।

এরপর ফিরে এসে হেন্দা তার বাড়ীর মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ফেলল। মূর্তি ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে হেন্দা বলছিলেন, 'তোমাদের ব্যাপারে আমরা ধোঁকার মধ্যে ছিলাম।'[১১]

মক্কায় নবী (স.)-এর অবস্থান

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় উনিশ দিন অবস্থান করেন। এই সময়ে ইসলাম শিক্ষা, তাকওয়া ও হেদায়াত সম্পর্কে পথ নির্দেশ দিচ্ছিলেন। সেই সময়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে আবু উছায়েদ খাযায়ি (রা.) নতুন করে হরম শরীফের খুঁটি স্থাপন করলেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লিখিত সময়ে ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি ছারিয়্যা অর্থাৎ ছোট ধরনের সেনাদল প্রেরণ করলেন। এমনি করে সকল মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা হলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে একজন ঘোষণা করলেন যে, কেউ যদি আল্লাহ তায়ালা এবং আখেরাতের ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন নিজের ঘরে মূর্তি না রাখে, বরং মূর্তি যেন ভেঙ্গে ফেলে।

সেনাদল এবং প্রতিনিধি দল প্রেরণ

১. মক্কা বিজয়ের পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৮ হিজরীর রমযানের ২৫ তারিখে খালেদ ইবনে ওলীদ (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি ছারিয়্যা প্রেরণ করেন। ওযযা নির্মূল করতে এ অভিযান প্রেরণ করা হয়। ওযযা ছিলো নাখলায়। কোরায়শ এবং সমগ্র বনু কেনানা গোত্র এ মূর্তির পূজা করতো। এটি ছিলো তাদের সবেচেয়ে বড় মূর্তি। বনু শায়বান গোত্র এ মূর্তির তত্ত্বাবধান করতো। হযরত খালেদ ত্রিশ জন সওয়ারী সৈন্যসহ নাখলায় গিয়ে এ মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেন। ফিরে আসার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খালেদকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কিছু দেখেছ? তিনি বলেন, কই না তো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তবে তো তুমি মূর্তিই ভাঙ্গতে পারোনি?

হযরত খালেদ পুনরায় নাঙ্গা তলোয়ার উঁচিয়ে গেলেন। এবার তিনি দেখলেন তাঁর দিকে এক কালো নগ্ন মাথা ন্যাড়া মহিলা এগিয়ে আসছে। হযরত খালেদ তরবারি দিয়ে আঘাত করলেন। এতে সেই মহিলা দুই টুকরো হয়ে গেলো। হযরত খালেদ এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এসে খবর দিলেন। তিনি বললেন, হাঁ, সেই ছিলো ওযযা। এবার সে তোমাদের দেশে তার পূজার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে।

২. এরপর সেই মাসেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সোয়া নামক অন্য একটি মূর্তি ধ্বংস করতে আমর ইবনুল আসকে পাঠালেন। এটা ছিলো মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে। রেহাত এলাকায় বনু হোযাইল গোত্র এর পূজা করতো। হযরত আমর সেখানে যাওয়ার পর পুরোহিত বললো, তুমি কি চাও? তিনি বললেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে এ মূর্তি

---

১১. মাদাবেকুত তানযিল।

ধ্বংস করতে এসেছি। পুরোহিত বললো, তুমি সেটা পারবে না। তিনি বললেন, কেন? পুরোহিত বললো, অদৃশ্য থেকে তোমাকে বাধা দেয়া হবে। তিনি বললেন, তোমার জন্যে আফসোস। এই মূর্তি কি দেখতে পায়? শুনতে পায়? তুমি এখনো মিথ্যার ওপর রয়েছো? এরপর তিনি মূর্তি ভেঙ্গে সঙ্গীদের মূর্তিঘরে অনুসন্ধান চালাতে বললেন। কিন্তু কোন জিনিস পাওয়া গেলো না। হযরত আমরের নির্দেশে মূর্তিঘরও ধ্বংস করে দেয় হলো। এরপর তিনি পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করলেন কি, কেমন বুঝলে, পুরোহিত বললো, আমি লা শারিক আল্লাহর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম।

৩. সেই মাসেই হযরত সা'দ ইবনে যায়েদ আশহালির নেতৃত্বে বিশজন সৈন্য প্রেরণ করা হলো। এরা মানাত মূর্তি ধ্বংস করতে গেলেন। কোদায়েদের কাছে মাশাল নামক এলাকায় এ মূর্তি ছিলো। গাসসান, আওস এবং খাযরাজ গোত্রে এর পূজা করতো। হযরত সা'দ সেখানে পৌছার পর পুরোহিত বললো, কি চাও? তিনি বললেন মানাতকে ধ্বংস করতে চাই।

পুরোহিত বললো, তুমি জানো আর তোমার কাজ জানে। হযরত সা'দ লক্ষ্য করলেন, বীভৎস চেহারার কালো ন্যাড়া মাথা এক মহিলা বেরিয়ে এসেছে। সে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে সে হায় হায় করছিলো। পুরোহিত বললো, মানাত তোমার কিছু নাফরমানকে ধরো। ইত্যবসরে হযরত সা'দ তলোয়ার দিয়ে মানাতকে দ্বিখন্ডিত করে ফেললেন। এরপর মূর্তিঘর ধ্বংস করা হলো। কিন্তু সেখানে কোন কিছু পাওয়া গেলো না।

৪. ওজ্জা ধ্বংস করে ফিরে আসার পর সেই মাসেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খালেদ (রা.)-কে বনু জাজিমার কাছে পাঠালেন। ইসলামের দাওয়াত নিয়ে তাঁকে পাঠানো হয়েছিলো। হযরত খালেদ (রা.) মোহাজের আনসার এবং বনু সালিম গোত্রের সাড়ে তিন শত লোক নিয়ে রওয়ানা হলেন। বনু জাজিমা গোত্রের কাছে পৌছে তারা ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা 'আসলামনা' অর্থাৎ আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম বলার পরিবর্তে বললো, ছাব্বানা ছাব্বানা অর্থাৎ আমরা নিজেদের দ্বীন ত্যাগ করলাম। এতে হযরত খালেদ তাদের হত্যা এবং গ্রেফতার শুরু করলেন। তারপর একজন করে বন্দীকে নিজের প্রত্যেক সঙ্গীর কাছে দিয়ে তাদের হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর এবং তাঁর সঙ্গীরা সেনাপতির আদেশ পালনে অস্বীকৃতি জানালেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে এ ঘটনা উল্লেখ করা হলো। তিনি দুইহাত আকাশের দিকে তুলে দুই বার বললেন, 'হে আল্লাহ তায়ালা খালেদ যা কিছু করেছে, আমি তা থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই।'[১২]

হযরত খালেদের নির্দেশে বনু সালিম গোত্রের লোকেরা নিজেদের বন্দীদের হত্যা করেন। আনসার এবং মোহাজেররা তাদের বন্দীদের হত্যা করেননি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ঘটনার পর হযরত আলী (রা.)-কে পাঠিয়ে নিহতদের ক্ষতিপূরণ এবং তাদের অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি পূরণের ব্যবস্থা করেন। এই ঘটনায় হযরত খালেদ এবং হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)-এর মধ্যে তীব্র কথা কাটাকাটি হয়েছিলো। এ খবর শোনার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, খালেদ, থামো, আমার সাথীদের কিছু বলা থেকে বিরত হও। আল্লাহর শপথ, যদি ওহুদ পাহাড় সোনা হয়ে যায় এবং তার সবটুকু তুমি আল্লাহর পথে ব্যয়

---

[১২]. সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ৪৫০

করো তবু আমার সাথীদের মধ্যে কারো এক সকাল বা এক বিকেলের এবাদাতের সমমর্যাদাতেও তুমি পৌঁছুতে পারবে না।[১৩]

মক্কা বিজয়ের যুদ্ধই ছিলো প্রকৃত মীমাংসাকারী যুদ্ধ এবং মক্কা বিজয়ই ছিলো প্রকৃত বিজয়, যা মোশরেকদের শক্তিমত্তা ও অহংঙ্কারকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছিলো। আরব উপদ্বীপে শেরক বা মূর্তিপূজার আর কোন অবকাশই থাকলো না। কেননা মুসলমান ও মোশরেক ছাড়া সাধারণ শ্রেণীর মানুষরা অত্যন্ত কৌতুহলের সঙ্গে ব্যাপারটি দেখতে চাচ্ছিল যে, এই সংঘাতের পরিণতিটা কি রূপ নেয়। সাধারণ মানুষ এটা ভালভাবেই জানতো যে, যে শক্তি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, কেবলমাত্র সেই শক্তিই কাবার ওপর স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে। তাদের বিশ্বাসকে অধিক বলীয়ান করেছিলো অর্ধশতাব্দী পূর্বে সংঘটিত আবরাহা ও তার হস্তী বাহিনীর ঘটনা। আল্লাহর ঘরের ওপর আক্রমণ চালানোর উদ্দেশ্যে অগ্রসরমান হস্তীবাহিনী কিভাবে ধ্বংস নিশ্চিহ্ন হয়েছিলো তা তৎকালীন আরববাসীরা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছিলো।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, হোদায়বিয়ার সন্ধি ছিলো মক্কা বিজয়ের সূচনা বা ভূমিকা স্বরূপ। এ সন্ধির ফলে শান্তি ও নিরাপত্তার ঝর্ণা চারিদিকে প্রবাহিত হচ্ছিলো। মানুষ একে অন্যের সাথে খোলাখুলি আলাপ করার সুযোগ পাচ্ছিলো। ইসলাম সম্পর্কে তারা মতবিনিময় ও তর্ক বিতর্ক করছিলো। মক্কায় যেসব লোক গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো তারাও দ্বীন সম্পর্কে মত বিনিময়ের সুযোগ পেলো। ফলে বহু লোক ইসলামে দীক্ষিত হলো। ইতিপূর্বে বিভিন্ন যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা তিন হাজারের বেশী ছিলো না। অথচ মক্কা বিজয়ের সময় তাদের সংখ্যা ছিলো ১০ হাজার।

এ সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধে লোকদের দৃষ্টি খুলে গেলো। তাদের চোখের ওপর পড়ে থাকা সর্বশেষ পর্দাও অপসারিত হলো। দ্বীন ইসলাম গ্রহণের পথে আর কোন বাধাই রইল না। মক্কা বিজয়ের পর মক্কার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আকাশে মুসলমানদের সূর্য চমকাতে লাগলো। দ্বীনী কর্তৃত্ব দুনিয়াবী আধিপত্য উভয়েই পুরোপুরি মুসলমানদের হাতে এসে গেলো।

হোদায়বিয়ার সন্ধির ফলে মুসলমানদের যে অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিলো মক্কা বিজয়ের পর তা পূর্ণতা লাভ করলো। পরবর্তী অধ্যায় ছিলো শুধু মুসলমানদের জন্যে এবং পরিস্থিতি ছিলো মুসলমানদের একক নিয়ন্ত্রণে। এরপরে আরবদের বিভিন্ন গোত্রের সামনে একটা পথই খোলা ছিলো তারা প্রতিনিধিদলসহ গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে এবং দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে। আর বাস্তবেপরবর্তী দু'বছর ধরে একাজই চলেছিলো।

---

[১৩]. ইবনে হিশাম, সহীহ বোখারী, ফতহুল বারী, সহীহ মুসলিম, যাদুল মায়াদ।

তৃতীয় পর্যায়
হোনায়েনের যুদ্ধ

এটা ছিলো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়তী জীবনের শেষ পর্যায়। প্রায় তেইশ বছরের শ্রম সাধনায় তিনি যে কষ্ট করেছিলেন তাঁর জীবনের এই পর্যায় ছিলো সেই স্বীকৃতি।

এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে মক্কা বিজয় ছিলো নবী (সাঃ)-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। এ বিজয়ের ফলে পরিস্থিতির যুগান্তকারী পরিবর্তন হয় এবং আরবের পরিবেশ পরিস্থিতিতে পরিবর্তন দেখা দেয়। এ বিজয় ছিলো পূর্বাপর সময়ের মধ্যে সেতুবন্ধন। আরব জনগণের দৃষ্টিতে কোরায়শ ছিলো দ্বীনের হেফাযতকারী ও সাহায্যকারী। সমগ্র আরব ছিলো এ ক্ষেত্রে তাদের অধীনস্থ। কোরায়শদের পরাজয়ের অর্থ হচ্ছে এই যে, সমগ্র আরব ভূখন্ড মূর্তিপূজা সমূলে উৎপাটিত হয়েছে চিরদিনের জন্যে।

উল্লিখিত শেষ পর্যায়টি দুইভাগে বিভক্ত। **এক.** মোজাহাদা ও যুদ্ধ। **দুই.** ইসলাম গ্রহণের জন্যে বিভিন্ন কওম ও গোত্রের ছুটে আসা। এ উভয় অবস্থা পরস্পরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

হোনায়েনের যুদ্ধ

আকস্মিক অভিযানে মক্কা বিজয় সংঘটিত হয়েছিলো। এতে আরবের জনগণ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলো। প্রতিবেশী গোত্রসমূহের মধ্যে এ অপ্রতাশিত অভিযানের মোকাবেলা করার শক্তি ছিলো না। এ কারণে শক্তিশালী অহংকারী উচ্ছৃঙ্খল কিছু গোত্র ছাড়া অন্য সবাই আত্মসমর্পণ করেছিলো। উচ্ছৃঙ্খল গোত্রসমূহের মধ্যে হাওয়াযেন এবং ছাকিফ ছিলো নেতৃস্থানীয়। তাদের সাথে মুযার জোশাম সাদ ইবনে বকর-এর গোত্রসমূহ এবং বনু বেলালের কিছু লোক শামিল হয়েছিলো। এসব গোত্রের সম্পর্ক ছিলো কাইসে আইলানের সাথে। মুসলমানদের কাছে আত্মসমর্পণ করা তারা আত্মমর্যাদার পরিপন্থী মনে করছিলো। তাই তারা মালেক ইবনে আওফ নসরীর কাছে গিয়ে মুসলমানদের ওপর হামলার সিদ্ধান্ত নিলো।

শত্রুদের রওয়ানা এবং আওতাস-এ উপস্থিতি

সিদ্ধান্তের পর মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করতে মালেক ইবনে আওফের নেতৃত্বে সকল সমবেত সকল অমুসলিম রওয়ানা হলো। তারা তাদের পরিবার-পরিজন এবং পশুপাল নিজেদের সঙ্গে নিয়ে চললো। আওতাস প্রান্তরে তারা উপস্থিত হলো। আওতাস হচ্ছে হোনায়েনের কাছে বনু হাওয়াযেন এলাকার একটি প্রান্তর। কিন্তু এ প্রান্তর হোনায়েন থেকে পৃথক। হোনায়েন একটি পৃথক প্রান্তর। এটি যুল মাজাজ-এর সন্নিকটে অবস্থিত। সেখান থেকে আরাফাত হয়ে মক্কার দূরত্ব দশ মাইলের বেশী।[১]

---

[১]. ফতহুল বারী, অষ্টম খন্ড, পৃ. ২৭. ৪২

শত্রুদের সৈন্য সমাবেশ

আওতাস-এর অবতরণের পর লোকেরা কমান্ডার মালেক ইবনে আওফের সামনে হাযির হলো। এদের মধ্যে প্রবীণ সমর বিশারদ দুরাইদ ইবনে ছোম্মাও ছিলো। এই লোকটি বয়সের ভারে ছিলো ন্যুজ। বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ছিলো তার। এক সময় সে ছিলো বীর যোদ্ধা। এখন অভিজ্ঞতা বর্ণনা এবং সে আলোকে পরামর্শ দেয়া ছাড়া তার কিছু করার নেই। সে মালেককে জিজ্ঞাসা করলো যে, তোমরা কোন প্রান্তরে রয়েছো? তাকে বলা হলো, আওতাস প্রান্তরে। সে বললো, এটা সৈন্য সমাবেশের উপযুক্ত জায়গা। কিন্তু গাধা, উট, ঘোড়ার ডাকাডাকি, শিশু সন্তানের কান্না মেয়েদের গলার আওয়ায পাচ্ছি। তাকে জানানো হলো যে, কমান্ডার মালেক ইবনে আওফ সৈন্যদের সাথে তাদের পরিবার-পরিজন এবং পশুপালও নিয়ে এসেছে। দুরাইদ এর কারণ জানতে চাইলে তাকে বলা হলো যে, প্রত্যেক যোদ্ধা তার কাছে মজুদ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এবং পশুপালের আকর্ষণে বীরত্বের সাথে লড়াই করবে।

মালেক ইবনে আওফের এ জবাব শুনে দুরাইদ বললো, আল্লাহর কসম, তুমি ভেড়ার রাখাল। পরাজিত ব্যক্তিকে কোন কিছু কি ধরে রাখতে পারে? দেখো, যুদ্ধে যদি তুমি জয়ী হও, তবে তলোয়ার এবং বর্শা দ্বারাই উপকৃত হবে। আর যদি পরাজিত হও তবে অপমানিত হবে। কারণ পরাজিত যোদ্ধার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার এবং পশুপাল কিছুই নিরাপদ থাকবে না। দুরাইদ বিভিন্ন গোত্রের সর্দারদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। সব কথা শোনার পর কমান্ডারকে বললো, হে মালেক, তুমি বনু হাওয়াযেন গোত্রের পরিবার-পরিজন ও পশুদল নিয়ে এসে ভালো কাজ করোনি। তাদেরকে নিজ নিজ এলাকার নিরাপদ জায়গায় পাঠিয়ে দাও। পরে ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে তোমরা বে-দ্বীনদের সাথে লড়াই করো। যদি তুমি জয়লাভ করো তবে পেছনের যারা থাকবে তারা এসে তোমার সাথে মিলিত হবে। যদি পরাজিত হও, তবে ওরা নিরাপদ থাকবে।

কমান্ডার মালেক ইবনে আওফ এ পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে বললো, খোদার কসম, আমি তা করতে পারি না। তুমি বুড়ো হয়েছো তোমার বুদ্ধিও বুড়ো হয়ে গেছে। হয়তো হাওয়াযেন গোত্র আমার আনুগত্য করবে অথবা আমি তলোয়ারের ওপর হেলান দিয় আত্মহত্যা করবো। মোটকথা, দুরাইদের নাম বা তার পরামর্শ এ যুদ্ধে শামিল হোক, এটা মালেক পছন্দ করলো না। হাওয়াজেন গোত্রের লোকেরা বললো, আমরা তোমার আনুগত্যে অটল রয়েছি। দুরাইদ বললো, আমি এ যুদ্ধের সাথে নাই। এ যুদ্ধের কোন দায়দায়িত্ব আমার নাই। হায়, আজ যদি আমি জওয়ান হতাম, যদি আমার ছুটোছুটি করার মতো বয়স থাকতো, তবে আমি লম্বা পশমের মাঝারি সাইজের বকরির মতো ঘোড়ার নেতৃত্ব করতাম।

শত্রুদের গুপ্তচর

মুসলমানদের খবর সংগ্রহে মালেক ইবনে আওফ দু'জন গুপ্তচর পাঠালো। তারা গন্তব্যে পৌঁছার আগেই ফিরে এলো। তারা ছিলো চলৎশক্তিহীন। কমান্ডারের কাছে তাদের হাযির করার পর কমান্ডার বললো, তোমাদের সর্বনাশ হোক, এ অবস্থা হলো কেন? তারা বললো, আমরা কয়েকটি চিত্রল ঘোড়া এবং মানুষ দেখেছি, এরপরই আমাদের এ অবস্থা হয়েছে।

একদিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শত্রুদের নানারকম খবর পাচ্ছিলেন। তিনি আবু হাদরাদ আসলামিকে বললেন, তুমি যাও, শত্রুদের মাঝে গিয়ে অবস্থান করে তাদের খবরাখবর এনে দাও। তিনি তাই করলেন।

মক্কা থেকে হোনায়েনের পথে যাত্রা

অষ্টম হিজরীর ৬ই শওয়াল রোববার দিনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা থেকে হোনায়েনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। এটা ছিলো তাঁর মক্কায় আগমনের উনিশতম দিন। তাঁর

সঙ্গে ছিলো ১২ হাজার সৈন্য। এদের মধ্যে ১০ হাজার মদীনা থেকে মক্কায় এসেছিলেন, বাকি ২ হাজার মক্কা থেকে রওয়ানা হন। মক্কার ২ হাজারের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন নও মুসলিম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফওয়ান ইবনে উমাইয়ার কাছ থেকে অস্ত্রসহ একশত বর্ম ধার নিলেন। আত্তাব ইবনে আছিদকে মক্কার গবর্নর নিযুক্ত করলেন।

দুপুরের পরে একজন সাহাবী এসে বললেন, আমি অমুক অমুক পাহাড়ে উঠে দেখেছি বনু হাওয়াযেন সপরিবারে যুদ্ধ করতে এসেছে। তারা নিজেদের পশুপালও সঙ্গে এনেছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেসে বললেন, ইনশাল্লাহ আগামীকাল এগুলো মুসলমানদের গনীমতের মাল হবে। রাতের বেলা হযরত আনাস ইবনে মারছাদ প্রহরীর দায়িত্ব পালন করলেন।

পথে সাহাবারা যাতে আনওয়াত নামে একটি কূল গাছ দেখলেন। মক্কার মোশরেকরা এ গাছের সাথে নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ঝুলিয়ে রাখতো। এর পাশে পশু যবাই করতো এবং এর নীচে মেলা বসাতো। কয়েকজন সহযোদ্ধা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, ওদের যেমন যাতে-আনওয়াত নামে গাছ রয়েছে আপনি আমাদের জন্যেও ওরকম একটি গাছ তৈরী করে দিন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহু আকবর, সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তোমরাতো সেইরকম কথা বলছো, যে রকম কথা হযরত মূসার কওম তাঁকে বলেছিলো। তারা বলেছিলো, 'এজআল লানা এলাহান কামা লাহুম আলেহাতুন।' অর্থাৎ আমাদের জন্যে একজন মাবুদ বানিয়ে দিন, যেমন ওদের জন্যে মাবুদ রয়েছে। তোমরা তো দেখছি পূর্ববর্তীদের তরিকার ওপরই উঠে পড়েছো।[৩]

কিছু লোক সৈন্য সংখ্যার আধিক্য দেখে বললেন, আমরা আজ কিছুতেই পরাজিত হব না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথাটিও পছন্দ করলেন না।

মুসলমানদের আকস্মিক হামলা

১০ই শওয়াল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে ইসলামী বাহিনী হোনায়েনে পৌঁছুলো। মালেক ইবনে আওফ আগেই এ জায়গায় পৌঁছে রাতের অন্ধকারে তার সৈন্যদের বিভিন্ন স্থানে গোপনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছিলো। তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো যে, মুসলমানরা আসা মাত্র তাদের ওপর তীর নিক্ষেপ করবে এবং কিছুক্ষণ পর একজোটে হামলা করবে।

এদিকে খুব প্রত্যুষে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৈন্যদের বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন করলেন। খুব ভোরে মুসলিম সৈন্যরা হোনায়েনের প্রান্তরে পদার্পণ করলেন। শত্রুসৈন্য সম্পর্কে তারা কিছুই জানতেন না। শত্রুরা যে ওঁৎ পেতে রয়েছে এ সম্পর্কে অনবহিত মুসলমান সৈন্যরা নিশ্চিন্তে অবস্থান নেয়ার সময় হঠাৎ করে তাদের ওপর তীরবৃষ্টি শুরু হলো। কিছুক্ষণ পরই শত্রুরা একযোগে মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। মুসলমানরা ভ্যাবাচেকা খেয়ে ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করলেন। এটা ছিলো সুস্পষ্ট পরাজয়। নও মসুলিম আবু সুফিয়ান বললেন, ওরা সমুদ্রপারে না গিয়ে থামবে না। জাবালা অথবা কালদা ইবনে জোনায়েদ বললো, দেখো আজ যাদু বাতিল হয়ে গেছে। ইবনে ইসহাক এটা বর্ণনা করছেন। বারা ইবনে আযেব বলেন, সহীহ বোখারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, বনু হাওয়াযেন ছিলো তীরন্দাজ, আমরা হামলা করলে তারা পালিয়ে গেলো। এরপর আমরা গনীমতের মাল সংগ্রহ করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে শত্রুরা তীর বৃষ্টি দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানালো।[৪]

---

৩. তিরমিযি, ফেতান, মোসনাদে আহমদ ৫ম খন্ড,. ২৮১
৪. সহীহ বোখারী, ইয়ওমে হোনায়েন অধ্যায়

সহীহ মুসলিম শরিফে হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আনাস বলেন, আমরা মক্কা জয় করেছি। পরে হোনায়েনে অভিযান চালিয়েছি। মোশরেকরা চমৎকার সারিবদ্ধভাবে এসেছিলো। অমন সুশৃঙ্খল অবস্থা আমি কখনো দেখিনি। প্রথমে সওয়ারদের সারি, এরপর পদব্রজীদের সারি, তাদের পেছনে মহিলারা এর পেছেনে ভেড়া বকরি, তারপর পশুপাল। আমরা সংখ্যায় ছিলাম অনেক। আমাদের সৈন্যদের ডানদিকে ছিলেন হযরত খালেদ (রা.)। কিন্তু আমাদের সওয়ার আমাদের পেছনে আত্মগোপন করতে লাগলেন, কিছুক্ষণ পর তারা পলায়ন করলেন। আরবরাও পলায়ন করলো। ওরাও পলায়ন করলো, যাদের সম্পর্কে তোমরা জানো।[৫]

সাহাবারা ছত্রভঙ্গ হতে শুরু করলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডানদিকে আহবান জানিয়ে বলেন, হে লোক সকল, তোমরা আমার দিকে এসো, আমি আবদুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদ। সেই সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কয়েকজন মোহাজের এবং তাঁর বংশের সাহাবারা ছাড়া অন্য কেউ ছিলো না।[৬]

সেই নাযুক সময়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নযিরবিহীন বীরত্ব ও সাহসিকতার পরিচয় দিলেন। তিনি শত্রুদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন এবং উচ্চস্বরে বলছিলেন, আনান্নাবিউ লা কাযেব আনা ইবনু আবদুল মোত্তালেব অর্থাৎ আমি নবী, আমি মিথ্যাবাদী নই, আমি আবদুল মোত্তালেবের পুত্র।

সেই সময় আবু সুফিয়ান এবং হযরত আব্বাস রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খচ্চর ধরে রেখেছিলেন যাতে করে খচ্চর সামনের দিকে ছুটে যেতে না পারে। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচা হযরত আব্বাসকে বললেন, লোকদের যেন তিনি উচ্চস্বরে ডাকতে শুরু করেন। হযরত আব্বাসের ছিলো দরাজ গলা। হযরত আব্বাস বলেন, আমি উচ্চ কণ্ঠে ডাকলাম, কোথায় তোমরা বৃক্ষওয়ালা, বাইয়াতে রেদওয়ানওয়ালা। সাহাবারা আমার কণ্ঠ শুনে এমনভাবে ছুটে আসতে শুরু করলেন যেমন গাভীর আওয়ায শুনে বাছুর ছুটে আসে। সাহাবরা বললেন, আমরা আসছি।[৭]

সাহাবারা ছুটে আসতে শুরু করলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারিদিকে একশত সাহাবী সমবেত হলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শত্রুর মোকাবেলা করলেন। যুদ্ধ শুরু হলো।

এরপর আনসারদের ডাকা হলো। ক্রমে বনু হারেস ইবনে খাযরাজের মধ্যে এই ডাক সীমিত হয়ে পড়লো। এদিকে সাহাবারা রণাঙ্গন থেকে যেভাবে দ্রুত চলে গিয়েছিলেন, তেমনি দ্রুত ফিরে আসতে লাগলেন। দেখতে দেখতে প্রচন্ড যুদ্ধ শুরু হলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রণাঙ্গনের দিকে তাকিয়ে বললেন, এবার চুলো গরম হয়েছে। এরপর একমুঠো ধুলো তুলে 'শাহাতুল উজুহ' বলে শত্রুদের উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করলেন। এর অর্থ হচ্ছে চোহারা বিগড়ে যাক। নিক্ষিপ্ত ধুলোর ফলে প্রত্যেক শত্রুর চোখ ধুলি ধুসরিত হলো। তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে প্রাণ নিয়ে পালাতে শুরু করলো।

---

৫. ফতহুল বারী, অষ্টম খন্ড, পৃ. ৮

৬. ইবনে ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী তাদের সংখ্যা ছিলো নয় বা দশজন। নববী বলেন, আল্লাহ রসূলের সাথে বারোজন দৃঢ়পদ ছিলেন। ইমাম আহমদ এবং হাকেম ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, হোনয়েনের দিনে আমি আল্লাহর রসূলের সাথে ছিলাম। সাহাবারা নিরাপদে আশ্রয়ের জন্য চলে গিয়েছিলেন। আল্লাহর রসূলের সঙ্গে আশিজন দৃঢ়ভাবে অবস্থান করেন। আমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিনি। তিরমিযি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি দেখলাম, নিজের লোকেরা হোনায়েনের দিনে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো। আল্লাহর রসূলের সাথে একশ জন সাহাবীও ছিলেন না।

৭. সহীহ মুসলিম, ২য় খন্ড, পৃ. ১০০

শত্রুদের পরাজয়

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধূলো নিক্ষেপের পরই যুদ্ধের চেহারা পাল্টে গেলো শত্রুরা পরাজিত হলো। ছাকিফা গোত্রের ৭০ জন কাফের নিহত হলো। তাদের নিয়ে আসা অস্ত্র ধন-সম্পদ, রসদ, সামগ্রী, নারী, শিশু, পশুপাল সবকিছু মুসলমানদের হস্তগত হলো।

আল্লাহ রব্বুল আলামীন এ সম্পর্কে বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা তোমাদেরকে সাহায্য করেছেন বহু ক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে হোনায়েনের যুদ্ধের দিনে, যখন তোমাদেরকে উৎফুল্ল করেছিলো তোমাদের সংখ্যাধিক্য এবং তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং বিস্তৃত হওয়া সত্তেও পৃথিবী তোমাদের জন্যে সঙ্কুচিত হয়েছিলো এবং পরে তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে অতপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর কাছ থেকে তাঁর রসূল এবং মোমেনদের ওপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং এমন এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন যা তোমরা দেখতে পাওনি এবং তিনি কাফেরদের শাস্তি প্রদান করেন। এটা কাফেরদের কর্মফল।' (সূরা তাওবা, আয়াত ২৫-২৬)

শত্রুদের গমন পথে ধাওয়া

উভয় পক্ষে কিছুক্ষণ মোকাবেলার পরই মোশরেকরা পলায়নের পথ ধরলো। পরাজয়ের পর একদল শত্রু তায়েফের পথে অগ্রসর হলো। একদল নাখলার দিকে এবং একদল আওতাসের পথে অগ্রসর হলো। উভয় পক্ষের সংঘর্ষে সাহাবাদের মধ্যে হযরত আবু আমের আশআরী (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। তিনি একটি দলের নেতৃত্বে ছিলেন।

একদল সাহাবী নাখলার পথে গমনকারী অমুসলিমদের ধাওয়া করলেন। দুরাইদ ইবনে ছোম্মাকে পাকড়াও করা হলো। হযরত রাবিয়া ইবনে রফি তাকে হত্যা করলেন।

পরাজিত শত্রুদের সবচেয়ে বড় দল তায়েফের দিকে অগ্রসর হলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গনীমতের মাল জমা করার পর তায়েফের পথে রওয়ানা হলেন।

গনীমত

গনীমতের মালের বিবরণ নিম্নরূপ। যুদ্ধবন্দী ৬ হাজার, উট ২৪ হাজার। বকরি ৪০ হাজারের বেশী। চাঁদি ৪ হাজার উকিয়া। অর্থাৎ ১ লাখ ৬০ হাজার দিরহাম। এর ওজন ৬ কুইন্টালের চেয়ে কয়েক কিলো কম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমুদয় মালামাল জমা করার নির্দেশ দিলেন। যেরানা নামক জায়গায় সমদুয় সম্পদ একত্রিত করে হযরত মাসউদ ইবনে আমর গেফারী (রা.)-এর নিয়ন্ত্রণে রাখলেন। তায়েফ যুদ্ধ থেকে অবসর না পাওয়া পর্যন্ত এগুলো বন্টন করা হয়নি।

বন্দীদের মধ্যে শায়মা বিনতে হারেস সাদিয়াও ছিলেন। ইনি ছিলেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুধবোন। তাঁকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে এসে তাঁর পরিচয় দেয়ার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি চিহ্নের দ্বারা তাকে চিনতে পারেন। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে যথেষ্ট সম্মান করেন। নিজের চাদর বিছিয়ে তাকে বসতে দেন। সাদিয়ার মতামত অনুসারে তার প্রতি অনুগ্রহ দেখিয়ে তিনি তাকে নিজের গোত্রের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেন।

তায়েফের যুদ্ধ

এ যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে হোনায়েনের যুদ্ধেরই অংশ। হাওয়াযেন ও ছাকিফ গোত্রের পরাজিত লোকদের অধিকাংশই তাদের কমান্ডার মালেক ইবনে আওফ নসরীর সাথে তায়েফে চলে গিয়ে আত্মগোপন করেছিলো তাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফের পথে রওয়ানা হলেন।

প্রথমে খালেদ ইবনে ওলীদের নেতৃত্বে এক হাজার সৈন্য পাঠানো হয়, এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে রওয়ানা হন। পথে নাখলা, ইমানিয়া এবং কারণ মনযিল অতিক্রম করেন। লিয়াহ নামক জায়গায় মালেক ইবনে আওফের একটি দুর্গ ছিলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে সেই দুর্গ ধ্বংস করে দেয়া হয়। এরপর সফর অব্যাহত রেখে তায়েফ পৌঁছার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফ দুর্গ অবরোধ করেন।

অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আনাসের (রা.) বর্ণনা অনুযায়ী এই অবরোধ ৪০ দিন স্থায়ী হয়। কোন কোন সীরাত রচয়িতা ২০ দিন বলেও উল্লেখ করেছেন। কেউ ১০ কেউ ১৫ আবার কেউ ১৮ দিন উল্লেখ করেছেন।[৮]

অবরোধকালে উভয় পক্ষের মধ্যে তীর ও পাথর নিক্ষেপের ঘটনাও ঘটেছে। মুসলমানদের প্রথম অবরোধকালে তাদের ওপর লাগাতার তীর নিক্ষেপ করা হয়। প্রথম অবস্থায় মুসলমানরা অবরোধ শুরু করলে দূর্গের ভেতর থেকে তাদের ওপর এতো বেশী তীর নিক্ষেপ করা হয়েছিলো যে মনে হয়েছিলো পঙ্গপাল ছায়া বিস্তার করেছে। এতে কয়েকজন মুসলমান আহত এবং ১২ জন শহীদ হন। ফলে মুসলমানরা তাঁবু সরিয়ে কিছুটা দূরে নিয়ে যান।

এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ যন্ত্র স্থাপন করেন এবং দুর্গ লক্ষ্য করে কয়েকটি গোলা নিক্ষেপ করেন। এতে দেয়ালে ফাটল ধরে ছিদ্র হয়ে যায়। সাহাবারা সেই ছিদ্র দিয়ে তাদের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করেন। কিন্তু শত্রুদের পক্ষ থেকে বৃষ্টির মতো তীর নিক্ষেপ করা হয়, এতে কয়েকজন মুসলমান শহীদ হন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শত্রুদের কাবু করতে কৌশল হিসাবে আঙ্গুর গাছ কেটে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন। এতে বিচলিত ছকিফ গোত্র আল্লাহ তায়ালা এবং আত্মীয়তার সম্পর্কের দোহাই দিয়ে এ কাজ থেকে বিরত থাকার আবেদন জানালো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা মঞ্জুর করলেন।

অবরোধের সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে একজন ঘোষক ঘোষণা করলো যে, যে ক্রীতদাস দুর্গ থেকে নেমে আমাদের কাছে আসবে, সে মুক্ত। এতে ত্রিশজন লোক দুর্গ থেকে এসে মুসলমানদের সাথে শামিল হয়।[৯]

আগত ক্রীতদাসদের মধ্যে হযরত আবু বকরাহও ছিলেন। দুর্গের দেয়ালে উঠে ঘূর্ণায়মান চরকার মাধ্যমে তিনি নীচের দিকে ঝুলে পড়েন এবং মুসলমানদের কাছে এসে আত্মসমর্পণ করেন। আরবী ভাষায় ঘারাবিকে বকরাহ বলা হয়। এ কারণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগন্তুক এ ক্রীতদাসের উপাধি দিলেন আবু বকরাহ। কথা অনুযায়ী মুসলমানের কাছে এসে আত্মসমর্পণকারী ক্রীতদাসদের রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুক্ত করে দিলেন এবং তাদেরকে ত্রিশজন সাহাবীর দায়িত্বে দিয়ে বললেন, তাদেরকে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে দাও। এ ঘটনা দুর্গের শত্রুদের জন্যে বড়োই মারাত্মক হয়ে দাঁড়ালো।

অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পড়লো এবং শত্রুদের আত্মসমর্পণের কোন লক্ষণ দেখা গেলো না। তারা বছরের খাদ্য দুর্গের ভেতরে মজুদ করে রেখেছিলো। এ সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নওফেল বিনে মাবিয়া দয়লির সাথে পরামর্শ করেন। নওফেল বললেন, শৃগাল তার গর্তে গিয়ে ঢুকেছে। যদি আপনি অবরোধ দীর্ঘায়িত করেন, তবে তাদের পাকড়াও করতে পারবেন। আর যদি ফিরে যান, তবে তারা আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। একথা শুনে রসূল

---

[৮]. ফতহুল বারী, অষ্টম খন্ড, পৃ. ৪৫

[৯] সহীহ বোখারী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ২৬০

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবরোধ অবসানের সিদ্ধান্ত নিলেন। হযরত ওমর (রা.) সাহাবাদের মধ্যে ঘোষণা প্রচার করলেন যে, ইনশাল্লাহ আগামী কাল আমরা ফিরে যাব সাহাবারা এ ঘোষণার সমালোচনা করলেন। তারা বললেন, এটা কেমন কথা? তায়েফ জয় না করে আমরা ফিরে যাব? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের ভিন্নমত শুনে বললেন আচ্ছা তাহলে কাল সকালে যুদ্ধে চলো। পরদিন সাহাবারা যুদ্ধে গেলেন, কিন্তু আঘাত খেয়ে ফিরে আসা ছাড়া অন্য কোন লাভ হলো না। এ অবস্থা দেখে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইনশাল্লাহ আগামী কাল আমরা ফিরে যাবো। সর্বস্তরের সাহাবারা এ সিদ্ধান্তে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। তারা চুপচাপ জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে শুরু করলেন। এ অবস্থা দেখে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃদু হাসতে লাগলেন।

সাহাবায়ে কেরাম ফিরে যাওয়ার পথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন. 'আয়েবুনা তায়েবুনা আবেদুনা লেরাব্বেনা হামেদুন।' অর্থাৎ তোমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তওবাকারী. এবাদাতগুজার এবং তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রশংসা করে থাকো।

সাহাবারা বললেন, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ছাকিফের লোকদের জন্যে বদদোয়া করুন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা ছাকিফকে হেদায়াত করুন এবং তাদের নিয়ে আসুন।

যেরানায় গনীমতের মাল বন্টন

তায়েফ থেকে অবরোধ তুলে আসার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জেরানায় সঞ্চিত গনীমতের মাল ভাগ বাটোয়ারা করা থেকে বিরত থাকলেন। এ দেরীর কারণ ছিলো এই যে, তিনি চাচ্ছিলেন, হাওয়াযেন গোত্রের লোকেরা ফিরে এসে তওবা করলে তিনি তাদের সবকিছু ফিরিয়ে দেবেন। কিন্তু অপেক্ষা করার পরও কেউ আসলো না। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গনীমতের মাল বন্টন করতে শুরু করলেন। বিভিন্ন গোত্রের সর্দার এবং মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ গনীমতের মাল পাওয়ার আশায় উন্মুখ ছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ সকল নবদীক্ষিত মুসলমানকে পর্যাপ্ত পরিমাণে গনীমতের মাল প্রদান করলেন।[১০]

আবু সুফিয়ান ইবনে হারবকে ৪০ উকিয়া অর্থাৎ প্রায় ৬ কিলো রূপা অর্থাৎ চাঁদি এবং একশত উট দেয়া হলো। আবু সুফিয়ান বললেন, আমার পুত্র ইয়াযিদ? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াযিদেকেও অনুরূপ প্রদান করলেন। আবু সুফিয়ান বললেন, আমার পুত্র মুয়াবিয়া? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকেও অনুরূপ প্রদান করলেন। মোটকথা একমাত্র আবু সুফিয়ান এবং তার দুইপুত্রকে প্রদান করা হলো ১৮ কিলো চাঁদি এবং তিনশত উট।

হাকিম ইবনে হাজামকে একশত উট প্রদান করা হলো। এরপর আরো চাইলে আরো একশত উট দেয়া হলো। সফওয়ান ইবনে উমাইয়াকে তিনবার একশত করে উট দেয়া হলো। অর্থাৎ তাকে তিনশত উট দেয়া হলো।

হারেছ ইবনে কালদাকে একশত উট দেয়া হলো। কোরায়শ এবং কোরায়শ নয় এমন সকল গোত্রীয় নেতাকে কাউকে একশত, কাউকে পঞ্চাশ এবং কাউকে চল্লিশটি করে উট দেয়া হলো। লোকদের মধ্যে এ খবর ছড়িয়ে পড়লো যে, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতো এতো দান করেন যে, তিনি দারিদ্র্যের আশঙ্কা করেন না। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার পর বেদুইনরা এসে আল্লাহ রসূলকে ঘিরে ধরলো এবং তাঁকে একটি গাছের কাছে নিয়ে গেলো। তাদের ভিড়ের

---

১০. যাতে তারা ইসলামের ওপর দৃঢ় থাকে।

চোটে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাদর গাছের মধ্যে থেকে গেলো। তিনি বললেন, হে লোক সকল, আমার চাদর দিয়ে দাও।

সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যদি তোহামার বৃক্ষরাজির সংখ্যার সমান চতুষ্পদ জন্তুও আমার কাছে থাকে, তবুও আমি সব বন্টন করে দেবো। এরপর তোমরা দেখবে, আমি কৃপণ নই, ভীত নই, মিথ্যাবাদী নই।[১১]

এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর নিজের উটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং তার কয়েকটি লোম তুলে নিয়ে দেখিয়ে বললেন, হে লোক সকল, তোমাদের 'ফাঈ' মালামালের মধ্য থেকে আমার জন্যে কিছু নেই। এমনকি এই যে উটের পশম দেখছো, এই পরিমাণও নেই শুধুমাত্র খুমুস রয়েছে, অর্থাৎ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের মাথাপিছু বন্টনে এক পঞ্চমাংশের অংশ বিশেষ সেই খুমুসও তোমাদের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

নবদীক্ষিত মুসলমানদের দেয়া হলো, যাদেরকে কোরআনে 'মোয়াল্লেফাতুল কুলুব' বলা হয়েছে। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেতকে বললেন, তিনি যেন গনীমতের মাল এবং সৈন্যদের এক জায়গায় করে বন্টনের হিসাব করেন। তিনি তাই করলেন। এতে প্রত্যেক সৈন্যের ভাগে চারটি উট এবং ৪০টি বকরি পড়লো। বিশিষ্ট যোদ্ধারা পেলেন ১২টি করে উট এবং ১২টি করে বকরি।

এ বন্টনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ কৌশল অবলম্বন করেন। কেননা, পৃথিবীতে বহু লোক এমন রয়েছে যারা নিজের বিবেকের পথে নয় বরং পেটের পথে চলে। পশুর সামনে একমুঠো তাজা ঘাস ঝুলিয়ে পিছনে সরে গিয়ে গিয়ে তাকে যেমন নিরাপদ ঠিকানায় নিয়ে যাওয়া যায় তেমনি উল্লিখিত সম্পদ বন্টনের দ্বারা নবদীক্ষিত মুসলমানদের মন জয়ের চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে তারা ঈমান শেখার সুযোগ পায় এবং ইসলামের প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত হয়।[১২]

আনসারদের মানসিক অবস্থা

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিতরণে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাজনৈতিক কৌশল প্রথমে বোঝা যায়নি। এ কারণে কিছু লোক সমালোচনা করছিলেন। বিশেষত আনসারদের মন খারাপ হয়েছিলো। কেননা তাদেরকে কিছুই দেয়া হয়নি। অথচ সঙ্কটকালে তাদের ডাকা হয়েছিলো এবং তারা দ্রুত হাযির হয়েছিলেন। তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশে দাঁড়িয়ে এমনভাবে যুদ্ধ করেছিলেন যে, দৃশ্যমান পরাজয় বিজয়ে পরিণত হয়েছিলো। কিন্তু গনীমতের মাল বন্টনের ক্ষেত্রে তারা লক্ষ্য করলেন যে, সঙ্কটের সময় পলায়নকারীদের হাত পরিপূর্ণ, অথচ তাদের হাত খালি।[১৩]

ইবনে ইসহাক আবু সাইদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোরায়শ এবং আরবের গোত্রীয় নেতাদের অধিক দান করলেন অথচ আনসারদের কিছুই দিলেন না, তখন তাদের মন খারাপ হয়ে গেলো। তারা নিজেদের মধ্যে কানাঘুষা করলেন। কেউ কেউ প্রকাশ্যেই বলে ফেললেন, আল্লাহর কসম, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কওমের সাথে মিশে গেছেন। হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ব্যাপারে আপনি যা করেছেন, এতে আনসাররা খুশী হয়নি। তারা সমালোচনা

[১১] আশশেফা, কাযী আয়ায, ১ম খন্ড, পৃ. ৮৬
[১২] মোঃ গাযালী, ফেকহুস সিরাহ, পৃ. ২৯৮-২৯৯
[১৩] একই গ্রন্থ একই পৃষ্ঠা

করছে। তারা বলছে, আপনি শুধু নিজের কওমের মধ্যেই সম্পদ বন্টন করেছেন। আরব গোত্রদের বিশেষভাবে দান করেছেন। অথচ আনসারদের কিছুই দেননি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, হে সা'দ, এ সম্পর্কে তোমার অভিমত কি? তিনি বললেন, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমিও তো আমার কওমেরই একজন। প্রিয় নবী বললেন, যাও তোমার কওমের লোকদের এক জায়গায় একত্রিত করো। সা'দ তাই করলেন। কয়েকজন মোহাজের এলেন, তাদেরও বসতে দেয়া হলো। অন্য কিছু লোক এলো, তাদের ফিরিয়ে দেয়া হলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরপর জানানো হলো যে, ওরা হাযির হয়েছেন। তিনি তখন তাদের কাছে গেলেন।

আল্লাহর যথোচিত প্রশংসা করার পর প্রিয়নবী বললেন, 'হে আনসাররা, তোমাদের অসন্তোষ তোমাদের সমালোচনার কারণ কি? আমি কি তোমাদের কাছে এমন অবস্থায় যাইনি যখন তোমরা পথভ্রষ্ট ছিলে? আল্লাহ তায়ালা এরপর তোমাদের হেদায়াত দিলেন। তোমরা ছিলে পরমুখাপেক্ষি, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন। তোমাদের পরস্পর অন্তর জোড়া লাগিয়ে দিয়েছেন। এসব কি ঠিক নয়? তারা বললেন, হাঁ, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনেক দয়া। তিনি বললেন, আনসাররা জবাব দিচ্ছ না কেন? তারা বললেন আমরা কি জবাব দেবো? আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বড় দয়া আমাদের ওপর। তিনি বললেন, যদি তোমরা ইচ্ছা করো তবে একথা বলতে পারো যে, আপনি আমাদের কাছে এমন সময়ে এসেছিলেন যখন আপনাকে অবিশ্বাস করা হয়েছিলো, সে সময় আমরা আপনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আপনাকে বন্ধুহীন নিঃসঙ্গ অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো সে সময় আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি। আপনাকে উপেক্ষা করা হয়েছিলো, আমরা আপনাকে ঠিকানা দিয়েছি। আপনি মোহতাজ ছিলেন, আমরা আপনার দুঃখ লাঘব করেছি।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আনসাররা, তোমরা দুনিয়ায় তুচ্ছ একটা জিনিসের জন্যে মনে মনে নাখোশ হয়েছো। সেই জিনিসের মাধ্যমে আমি কিছু লোকের মনে প্রবোধ দিয়েছি, যেন তারা মুসলমান হয়ে যায়। তোমাদেরকে তোমাদের গৃহীত ইসলামের ওপর ছেড়ে দিয়েছি। হে আনসাররা, তোমরা কি এতে খুশী নও যে, অন্যরা উট বকরি নিয়ে ঘরে ফিরবে আর তোমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ফিরবে? সেই যাতে-পাকের শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে, যদি হিজরতের ঘটনা ঘটতো, তবে আমিও একজন আনসার হতাম। যদি সব লোক এক পথে চলে, আর আনসাররা অন্য পথে চলে, তবে আমি আনসারদের পথেই চলবো। হে আল্লাহ তায়ালা, আনসারদের ওপর, তাদের সন্তানদের ওপর এবং তাদের পৌত্র-পোত্রীদের প্রতি রহমত করুন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষণ শুনে লোকেরা এতোবেশী কান্নাকাটি করলেন যে, তাদের দাড়ি ভিজে গেলো। তারা বলতে লাগলেন, আমাদের অংশে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থাকবেন, এতে আমরা সন্তুষ্ট। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে গেলেন এবং সাহাবারা নিজ নিজ জায়গায় চলে গেলেন।[১৪]

হাওয়াযেন প্রতিনিধি দলের আগমন

গনীমতের মালামাল বন্টনের পর হাওয়াযেন গোত্রের একদল প্রতিনিধি মুসলমান হয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। তারা ছিলেন চৌদ্দজন। যোহায়ের ইবনে ছুরাদ

১৪. ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ৪৯৯-৫০০, সহীহ বোখারী ২য় খন্ড, পৃ. ৬২০-৬২১

ছিলেন তাদের নেতা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেজায়ী চাচা আবু বারকানও তাদের মধ্যে ছিলেন। তারা এসে যুদ্ধবন্দী এবং মালামাল ফেরত চাইলেন। তারা এমনভাবে কথা বললেন যে, সকলের মন নরম হয়ে গেলো।[১৫] রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার সাথে যেসব লোক রয়েছে, তোমরা তাদের দেখতে পাচ্ছো। সত্য কথা আমি বেশী পছন্দ করি। সত্যি করে বলো, তোমরা নিজের সন্তান-সন্তুতিকে বেশী ভালোবাসো নাকি ধন-সম্পদ?

তারা বললেন, পারিবারিক মর্যাদার মূল্যই আমাদের কাছে বেশী। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ঠিক আছে, আমি যোহরের নামায আদায়ের পর তোমরা উঠে বলবে যে, আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মোমেনীনদের পক্ষে সুপারিশকারী এবং মোমেনীনদের রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষে সুপারিশকারী বানাচ্ছি। কাজেই আমাদের কয়েদীদের ফিরিয়ে দিন।

যোহরের নামাযের পর তারা সেকথা বললেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার নিজের এবং বনু আবদুল মোত্তালেবের অংশ তোমাদের জন্যে। আমি এখনই অন্য লোকদের জিজ্ঞাসা করে নিচ্ছি। সাথে সাথে আনসার এবং মোহাজেররা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, আমাদের যা কিছু রয়েছে, সেইসবও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যে। এরপর আকরা ইবনে হাবেস উঠে দাঁড়িয়ে বললো, যা কিছু আমার এবং বনু তামিমের রয়েছে সেসব আপনার জন্যে নয়। উত্তায়না বিন হিস্‌ন বললো, যা কিছু আমার এবং বনু ফাজারাদের রয়েছে সেসব আপনার জন্যে নয়। আব্বাস ইবনে মায়দাস বললো, যা কিছু আমার এবং বনু সালিমের রয়েছে সেসবও আপনার জন্যে নয়। বনু সালিম গোত্রের লোকেরা দাঁড়িয়ে বললো, জ্বী না; বরং যা কিছু আমাদের রয়েছে, সেসবই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যে। একথা শুনে আব্বাস ইবনে মারদাস বললো, তোমরা আমাকে অপমান করেছো।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, দেখো ওরা মুসলমান হয়ে এসেছে। এ কারণে আমি তাদের বন্দীদের বন্টনে দেরী করেছি। এরপর আমি তাদের মতামত জানতে চেয়েছি তারা নিজেদের সন্তান-সন্ততিকে অধিক প্রাধ্যান্য দিয়েছে। কাজেই যাদের কাছে বন্দী রয়েছে তারা যেন ফিরিয়ে দেয়। এটা খুব ভালো হবে। যে ব্যক্তি নিজের প্রাপ্য অংশ রাখতে চায়, সেও যেন অন্তত কয়েদীদের ফিরিয়ে দেয়। ভবিষ্যতে যখন 'ফাঈ'-এর মাল পাওয়া যাবে, এর বিনিময়ে তাদের ছয়গুণ দেয়া হবে। লোকেরা বললো, আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যে সব কিছু সানন্দে দিতে রাযি আছি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি জানতে পারিনি—কারা রাযি, আর কারা নারায।

এরপর বললেন, আপনারা বরং ফিরে যান, আপনাদের নেতাকে পাঠিয়ে দিন। এরপর সাহাবারা বন্দী শিশু ও মহিলাদের ফেরত দিলেন। উয়াইনা ইবনে হাসানের ভাগে একজন বৃদ্ধা পড়েছিলেন, তিনি তাকে ফিরিয়ে দিতে রাযি হলেন না, পরে তিনিও ফেরত দিলেন। রসূল

---

১৫ ইবনে ইসহাক বলেন, প্রতিনিধিদলে গোত্রের ৯ জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করেন, বাইয়াত করেন এবং আল্লাহ রসূলের সাথে কথা বলেন। তারা বলেন, যে, হে আল্লাহর রসূল, আপনি যাদের বন্দী করেছেন, এদের মধ্যে আমাদের মা বোন রয়েছেন, ফুফু খালা রয়েছেন। এটা আমাদের কওমের জন্য অবমাননাকর। (ফতহুল বারী ৮ম খন্ড, পৃ. ৩৩)। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মা বোন ইত্যাদির দ্বারা আল্লাহর রসূলের রেজায়ী মা-খালা-ফুফু-বোন বুঝানো হয়েছে। প্রতিনিধি দলের পক্ষে কথা বলছিলেন যোবায়ের ইবনে ছুরাদ। আবু বারকানের নামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, কেউ কেউ আবু মারওয়ান এবং আবু ছারওয়ান বলে উল্লেখ করেছেন।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক বন্দীকে একখানি করে কিবতি চাদর উপহার দিয়ে বিদায় করলেন।

ওমরাহ এবং মদীনায় প্রত্যাবর্তন

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গনীমতের মাল বন্টন শেষে যেরানা থেকে ওমরাহর জন্যে এহরাম বাঁধেন এবং ওমরাহ আদায় করেন। এরপর আত্তাব ইবনে আছিদকে মক্কার গবর্নর নিযুক্ত করে মদীনায় রওয়ানা হন। অষ্টম হিজরীর ২৪ শে জিলকদ তিনি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

মোহাম্মদ গাযালী বলেন, এই বিজয়ের সময় যখন আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাথায় ফতহে আযিমের মুকুট পরালেন, এই সময়ে এবং আট বছর আগে এই শহরে আসার সময়ের মধ্যে কতো ব্যবধান।

তিনি এই শহরে এমনভাবে এসেছিলেন যে, তিনি ছিলেন নিরাপত্তার প্রত্যাশী। সেই সময় তিনি ছিলেন অচেনা, অপরিচিত, সংশয় ছিলো তাঁর মনে। সে সময় স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁকে মর্যাদা দিয়েছিলো আশ্রয় দিয়েছিলো, সাহায্য করেছিলো, তিনি যে নূর সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন তারা সেই নূরের আনুগত্য করেছিলো। শুধু তাই নয় তার জন্যেই তারা অন্যদের সব রকমের শত্রুতা তুচ্ছ মনে করেছিলো। আট বছর আগে এই মদীনায় হিজরত করার পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে সম্বর্ধনা দেয়া হয়েছিলো তারাই আজ তাঁকে পুনরায় সম্বর্ধনা দিচ্ছে। আজ মক্কা তাঁর করতলগত, তাঁর নিয়ন্ত্রণে। মক্কার জনগণ তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও মূর্খতা দয়াল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পদতলে বিসর্জন দিয়েছে। তিনি তাদের অতীত দিনের সকল অন্যায় ক্ষমা করে দিয়ে তাদেরকে ইসলামের মাধ্যমে গৌরব ও সাফল্য দান করেছেন।

আল্লাহ তায়ালা কোরআনে হাকিমে বলেন, 'নিশ্চয়ই যে বক্তি সত্যবাদিতা এবং ধৈর্য অবলম্বন করে, তবে আল্লাহ তায়ালা পুন্যশীলদের বিনিময় নষ্ট করেন না।'[১৬]

মক্কা বিজয়ের পরবর্তী ছারিয়্যাসমূহ

এই দীর্ঘ এবং সফল সফরের পর মদীনায় ফিরে এসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় বেশ কিছুকাল অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি বিভিন্ন প্রতিনিধিদলকে অভ্যর্থনা জানান, প্রশাসন পরিচালনার জন্যে কর্মকর্তা প্রেরণ করেন এবং দ্বীনের প্রচারের জন্যে দাঈ প্রেরণ করেন।

এছাড়া, যারা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হওয়ার পরও তা মেনে নিতে পারেনি, বরং নানাভাবে ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতার পরিচয় দিচ্ছিলো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের মোকাবেলা করেন। নিচে সেসব বিবরণ উল্লেখ করা যাচ্ছে।

যাকাতের জন্যে তহশিলদার প্রেরণ

ইতিপূর্বের আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, মক্কা বিজয়ের পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অষ্টম হিজরীর শেষদিকে মদীনায় ফিরে আসেন। নবম হিজরীতে মহররমের চাঁদ ওঠার পর পরই নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন গোত্র থেকে যাকাত আদায়ের জন্যে তহশীলদার প্রেরণ করেন। নিচে তাদের তালিকা দেয়া হলো।

---

১৬. ফেকহুস সিরাহ পৃ. ৩০৬, মক্কা বিজয় এবং তায়েফের যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ১৬০-২০১, ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ৩৮৯-৫০১, সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৬১২-৬২৩, ফতহুল বারী, ৮ম খন্ড, পৃ. ৩-৮৫

	তহশীলদারের নাম	গোত্রের কাছে পাঠানো হয়
১	উয়াইনা ইবনে হাসান	বনু তামিম
২	ইয়াযিদ ইবনে হোসাইন	আসলাম ও গেফার
৩	ওব্বাদ ইবনে বশীর আশহালি	সোলাইম ও মুযাইনা
৪	রাফে ইবনে মাকিছ	যুহাইনা
৫	আমর ইবনুল আস	বনু ফাযারাহ
৬	যাহহাক ইবনে সুফিয়ান	বনু কেলাব
৭	বশীর ইবনে সুফিয়ান	বনু কা'ব
৮	ইবনুল লুতবিয়াহ আযদি	বনু যাবিয়ান
৯	মোহাজের ইবনে আবু উমাইয়া	সনআ শহর
১০	যিয়াদ ইবনে লবিদ	হাদরামাউত
১১	আদী ইবনে হাতেম	তাঈ এবং বনু আছাদ
১২	মালেক ইবনে নোয়াইরাহ	বনু হানযালা
১৩	যবরকান ইবনে বদর	বনু সা'দ এর একটি অংশ
১৪	কাইস ইবনে আসেম	বনু সা'দ এর অন্য অংশ
১৫	আলা ইবনে হাদরামি	বাহরাইন
১৬	আলী ইবনে আবু তালেব	নাযরান

এ সকল সাহাবাকে তহশীলদারের দায়িত্ব দিয়ে নবম হিজরীর মহররম মাসে প্রেরণ করা হয়। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকার গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। মহররম মাসের প্রথম দিকে অনেকে এবং পরে অনেকে রওয়ানা হয়ে যান। এর দ্বারা হোদায়বিয়ার সন্ধির পরে ইসলামের দাওয়াতের সাফল্যের ব্যাপকতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। মক্কা বিজয়ের পর দলে দলে লোক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে শুরু করেন।

এ সময়কার কয়েকটি ছারিয়্যা

বিভিন্ন গোত্রের কাছে যাকাত আদায়ের জন্যে তহশীলদার প্রেরণ করা হয়। কিন্তু জাযিরাতুল আরবের বিভিন্ন এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা সত্তেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সেসব দমনে সৈন্য প্রেরণ করা হয়। নীচে এমন কিছু ছারিয়্যার বিবরণ উল্লেখ করা যাচ্ছে।

(এক) ছারিয়্যা উয়াইনা ইবনে হাসান ফাজারি

নবম হিজরীর মহররম মাস

উয়াইনাকে ৫০জন সওয়ারের নেতৃত্ব দিয়ে বনু তামিম গোত্রের কাছে প্রেরণ করা হয়। কারণ হচ্ছে যে, বনু তামিম বিভিন্ন গোত্রকে উস্কানি দিয়ে জিযিয়া আদায় থেকে বিরত রেখেছিলো। এ অভিযানে কোন মোহাজের বা আনসার ছিলেন না।

উয়াইনা ইবনে হানান রাত্রিকালে পথ চলতেন এবং দিনের বেলায় আত্মগোপন করে থাকতেন। এভাবে চলার পর নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে বনু তামিম গোত্রের লোকদের ধাওয়া করলেন। তারা উর্ধশ্বাসে ছুটে পালালো। তবে, ১১জন পুরুষ ২১ জন নারী এবং ৩০টি শিশুকে মুসলমানরা গ্রেফতার করলেন। এদের মদীনায় নিয়ে এনে রামলা বিনতে হারেসের ঘরে আটক রাখা হলো।

পরে বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে আলোচনা করতে বনু তামিম গোত্রের ১০ জন সর্দার এলেন। তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরের দরজায় গিয়ে এভাবে হাঁক দিলেন হে মোহাম্মদ, আমাদের কাছে আসুন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইরে এলেন। তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জড়িয়ে ধরে কথা বলতে লাগলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সঙ্গে কাটালেন। ইতিমধ্যে যোহরের নামাযের সময় হলো। তিনি নামায পড়ালেন। নামায শেষে মসজিদের আঙ্গিনায় বসলেন। বনু তামিমের সর্দাররা নিজেদের গর্ব অহংকার প্রকাশক বিতর্কের ইচ্ছা প্রকাশ করে তাদের বক্তা আতা ইবনে হাজেবকে সামনে এগিয়ে দিলেন। তিনি বক্তৃতা করলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার মোকাবেলার জন্যে খতীব ইসলাম হযরত ছাবেত ইবনে কয়েস শাম্মাসকে আদেশ দিলেন। তিনি জবাবী বক্তৃতা দিলেন। বনু তামিম সর্দাররা এরপর তাদের গোত্রের কবি জায়কাল ইবনে বদরকে সামনে এগিয়ে দিলেন। তিনি অহংকার প্রকাশক কিছু কবিতা আবৃত্তি করলেন। শায়েরে ইসলাম হযরত হাস্‌সান ইবনে ছাবেত তার জবাব দিলেন।

উভয় বক্তা ও কবি বক্তৃতা ও কবিতা আবৃত্তি শেষ করলে আকরা ইবনে হাবেছ বললেন, ওদের বক্তা আমাদের বক্তার চেয়ে জোরালো বক্তৃতা এবং ওদের কবি আমাদের কবির চেয়ে ভালো কবিতা আবৃত্তি করেছেন। ওদের বক্তা এবং কবির আওয়ায আমাদের বক্তা ও কবির আওয়াযের চেয়ে বুলন্দ। এরপর আগন্তুক বনু তামিম সর্দাররা ইসলাম গ্রহণ করেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে দামী উপহার প্রদান করেন এবং বন্দি নারী ও শিশুদের ফিরিয়ে দেন।[১]

২. ছারিয়্যা কুতবাহ ইবনে আমের

নবম হিজরীর সফর মাস

এই ছারিয়্যা তোরবার কাছে তাবালা এলাকায় খাশআম গোত্রের একটি শাখার দিকে রওয়ানা হয়েছিলো। কোতবা ২০ জন লোকের সমন্বয়ে যাত্রা করেন। ১০টি ছিলো উট। পর্যায়ক্রমে সেসব উটে এরা সওয়ার হন। মুসলমানরা আকস্মিক হামলা করেন। এতে প্রচন্ড সংঘর্ষ শুরু হয়। উভয় পক্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়। কোতবা অন্য কয়েকজন সঙ্গীসহ নিহত হন। তবুও মুসলমানরা ভেড়া, বকরি এবং শিশুদের মদীনায় নিয়ে আসেন।

৩. ছারিয়্যা যাহহাক ইবনে সুফিয়ান কেলাবী

নবম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাস

এই ছারিয়্যা বনু কেলাব গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্যে রওয়ানা করা হয়েছিলো। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে যুদ্ধ শুরু হয়। মুসলমানরা তাদের পরাজিত করে তাদের একজন লোককে হত্যা করেন।

৪. ছারিয়্যা আলকামা ইবনে মুজবের মাদলাযি

নবম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাস। আলকামাকে তিনশত সৈন্যের সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে জেদ্দা উপকূলের দিকে প্রেরণ করা হয়। কারণ ছিলো এই যে, কিছুসংখ্যক হাবশী জেদ্দা উপকূলের কাছে সমবেত হয়েছিলো। তারা মক্কার জনগণের ওপর ডাকাতি রাহাজানি করতে চাচ্ছিলো। আলকামা সমুদ্রে অভিযান চালিয়ে একটি দ্বীপ পর্যন্ত অগ্রসর হন। হাবশীরা মুসলমানদের আগমন সংবাদ পেয়ে পলায়ন করে।[২]

---

[১]. যুদ্ধ বিষয়ে বিশারদ লেখকরা বর্ণনা করেছেন যে, নবম হিজরীর মহররম মাসে এ ঘটনা ঘটে। এতে বোঝা যায় যে, আকরা ইবনে হাবেছ সে সময়েই মুসলমান হন। কিন্তু সীরাত রচয়িতারা লিখেছেন, আল্লাহর রসূল বনু হাওয়াযেন গোত্রের বন্দীদের ফিরিয়ে দেয়ার কথা বলেছিলেন। তখন আকরা ইবনে হাবেছ বলেন, আমি এবং বনু তামিম ফিরিয়ে দেব না। এ দ্বারা বোঝা যায় যে, আকরা ইবনে হারেছ নবম হিজরীর মহররম মাসের আগেই মুসলমান হয়েছিলেন।

[২]. ফতহুল বারী, ৮ম খন্ড, পৃ. ৫৯

৫. ছারিয়্যা আলী ইবনে আবু তালেব

নবম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাস। হযরত আলী (রা.)-কে তাঈ গোত্রের কালাস বা কলিসা নামের একট মূর্তি ভাঙ্গার জন্যে প্রেরণ করা হয়েছিলো। হযরত আলীর নেতৃত্বে একশত উট এবং পঞ্চাশটি ঘোড়াসহ দেড়শত সৈন্য রওয়ানা হন। তারা সাদা কালো পতাকা বহন করেন। ফজরের সময় মুসলমানরা হাতেম তাঈয়ের মহল্লায় হামলা চালিয়ে কালাস মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে। এরপর বহু লোক, চতুষ্পদ জন্তু এবং ভেড়া, বকরি আটক করা হয়। এসব বন্দীর মধ্যে হাতেম তাঈয়ের কন্যাও ছিলেন। হাতেমের পুত্র আদী ইবনে হাতেম সিরিয়ার পথে পালিয়ে যায়। মুসলমানরা কালাস মূর্তির ঘরে তিনটি তলোয়ার এবং তিনটি বর্ম পান। ফেরার পথে গনীমতের মাল বন্টন করা হয়। বাছাই করা কিছু জিনিস রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যে পৃথক করে রাখা হয়। হাতেম তাঈয়ের কন্যাকে কারো ভাগে দেয়া হয়নি।

মদীনায় পৌঁছার পর হাতেম তাঈয়ের কন্যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দয়ার আবেদন জানিয়ে বললেন, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, এখানে যে আসতে পারতো, সে আজ নিখোঁজ। পিতা মারা গেছেন। আমি বৃদ্ধা। খেদমত করার শক্তি নাই। আপনি আমার প্রতি দয়া করুন, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে দয়া করবেন। নবী মোস্তফা জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার জন্যে কে আসতে পারতো? বললেন, আমার ভাই আদী ইবনে হাতেম। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে লোক— যে আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে পালিয়ে গেছে। একথা বলে নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলে গেলেন। তিনদিন একই প্রশ্নোত্তর হলো। তৃতীয় দিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দয়া করে হাতেমের মেয়েকে আযাদ করে দিলেন। সে সময় সেখানে একজন সাহাবী ছিলেন, সম্ভবত হযরত আলী, তিনি মহিলাকে বললেন, দয়াল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে সওয়ারীর জন্যেও আবেদন জানাও। মহিলা তাই করলেন। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতেমের কন্যার জন্যে সওয়ারী ব্যবস্থা করারও নির্দেশ দিলেন।

হাতেমের কন্যা মদীনা থেকে ছাড়া পেয়ে সোজা সিরিয়ায় চলে যান। ভাইয়ের সাথে দেখা করে তিনি বলেন, দয়াল নবী এমন দয়া দেখিয়েছেন, যে দয়া তোমার বাবাও দেখাতে পারতেন না। তাঁর কাছে তুমি ভয় এবং আশার সাথে যাও। এরপর আদী ইবনে হাতেম মদীনা গিয়ে সরাসরি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দেখা করলেন। নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সামনে বসিয়ে বললেন, তুমি কোথায় পালাচ্ছ? আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল থেকে পালাচ্ছ? যদি তাই হয়ে থাকে তবে বলো আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কোন উপাস্যের কথা তুমি কি জানো? তিনি বললেন, জানি না। নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহু আকবর অর্থাৎ আল্লাহ মহান। তুমি এ কথা থেকে পালাচ্ছ। কিন্তু আল্লাহর চেয়ে বড় কারো সম্পর্কে কি তোমার জানা আছে? আদী বললেন, জ্বী না। নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, শোনো ইহুদীদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ রয়েছে, খৃষ্টানরা হচ্ছে পথভ্রষ্ট। আদী বললেন, তবে আমি একজন একরোখা মুসলমান। একথা শুনে নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা খুশীতে চিকচিক করে উঠলো। তিনি হাতেমের পুত্রকে একজন আনসারীর বাড়ীতে রাখলেন। এরপর আদী ইবনে হাতেম সকাল বিকাল নবী মোস্তফার কাছে হাযির হতেন।[৩]

[৩] যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড, পৃ. ২০৫

ইবনে ইসহাক হযরত আদী ইবনে হাতেম থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘরে তাঁর সামনে আদী ইবনে হাতেমকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আদী ইবনে হাতেম, তুমি কি পুরোহিত ছিলে না? আদী বলেন, আমি বলেছিলাম জ্বী তাই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি তোমার কওমের গনীমতের মাল এক চতুর্থাংশ গ্রহণ করতে না? আমি বলেছিলাম, জ্বী হাঁ তাই। তিনি বললেন, অথচ এটা তোমাদের দ্বীনে হালাল নয়। আমি বললাম, হাঁ তাই। সেই সময়েই আমি বুঝেছিলাম যে, তিনি হাদী বরহক, তিনি আল্লাহর প্রেরিত রসূল। কারণ, তিনি এমন বিষয় আমাকে বলেছেন, যা তার পক্ষে জানা স্বাভাবিক ছিলো না।[৪]

মোসনাদে আহমদ-এর বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হে আদী, ইসলাম গ্রহণ করো শান্তিতে থাকবে। আমি বললাম, আমি তো একটা দ্বীন অনুসরণ করি। তিনি বললেন, তোমার দ্বীন সম্পর্কে আমি তোমার চেয়ে বেশী জানি। আমি বললাম, আপনি আমার দ্বীন সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশী জানেন? তিনি বললেন, হাঁ। এটা কি ঠিক নয় যে, তুমি পুরোহিত? তুমি তোমার কওমের গনীমতের মালের এক চতুর্থাংশ ভোগ-ব্যবহার করো? আমি বললাম, হাঁ, তাই। নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা তোমাদের ধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে হালাল নয়। নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একথায় আমার মাথা নত হয়ে গেলো।[৫]

সহীহ বোখারী শরীফে হযরত আদী ইবনে হাতেম থেকে বর্ণিত আছে যে, আমি নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এ সামনে বসেছিলাম। এমন সময় একজন লোক এসে তার ক্ষুধার্ত অবস্থার কথা জানালো। অন্য একজন এসে ডাকাতি রাহাযানির অভিযোগ করলো। নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আদী, তুমি হীরা শহর দেখেছো? যদি তোমার আয়ু বেশী হয়, বেশীদিন বাঁচো, তবে দেখতে পাবে যে, ঘোড়ার পিঠে চড়ে একজন মহিলা হীরা থেকে আসবে এবং কাবাঘর তওয়াফ করবে। এ সময়ে আল্লাহর ভয় ছাড়া তার অন্য কোন ভয় থাকবে না। যদি তুমি দীর্ঘজীবী হও, তবে তোমরা কেসরার ধনভান্ডার অধিকার করবে। যদি তুমি দীর্ঘজীবী হও, তবে দেখবে, আঁচল ভরে সোনা বিতরণের জন্যে নেয়া হবে, কিন্তু গ্রহণ করার লোক পাওয়া যাবে না। সেই বর্ণনা শেষে রয়েছে যে, আদী বলেন, আমি দেখেছি, হাওদাজে চড়ে আসা একজন মহিলা হীরা থেকে এসে কাবাঘর তওয়াফ করেছে কিন্তু আল্লাহ ছাড়া তার অন্য কারো ভয় ছিলো না। কেসরার ধন ভান্ডার যারা জয় করেছিলেন, আমি নিজেই ছিলাম তাদের মধ্যে একজন। তোমরা যদি দীর্ঘজীবী হও, তবে আবুল কাসেমের সেই কথার সত্যতার প্রমাণও পাবে, তিনি যে বলেছেন, আঁচল ভরে বিতরণের জন্যে সোনা নেয়া হবে, কিন্তু তা গ্রহণের লোক পাওয়া যাবে না।[৬]

---

৪. ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ৫৮১
৫. মোসনাদে আহমদ, সপ্তম খন্ড, পৃ. ২৫৮-২৭৮
৬. সহীহ বোখারী, ১ম ভম পৃ. ৫০৭

তবুকের যুদ্ধ

মক্কা বিজয় ছিলো সত্য ও মিথ্যার মধ্যে এক সিদ্ধান্তমূলক অভিযান। এ অভিযানের পর মক্কাবাসীদের মনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুয়ত ও রেসালাত সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ অবশিষ্ট ছিলো না। তাই পরিস্থিতির বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটেছিলো। জনগণ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছিলো। প্রতিনিধিদল প্রেরণ শীর্ষক অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করবো। বিদায় হজ্জের সময়ে উপস্থিত মুসলমানদের সংখ্যা থেকেও এ বিষয়ে আন্দাজ করা যায়। মোটকথা অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান প্রায় হয়ে গিয়েছিলো বিধায়, মুসলমানরা ইসলামী শরীয়তের শিক্ষা সার্বজনীন করা এবং ইসলামের প্রচার প্রসারে ঐকান্তিকভাবে মনোযোগী হয়ে পড়েছিলো।

যুদ্ধের কারণ

ওই সময়ে এমন একটি শক্তি মদীনার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলো, যারা কোন প্রকার উস্কানি ছাড়াই মুসলমানদের গায়ে পড়ে বিবাদ বাধাতে চাচ্ছিলো। এরা ছিলো রোমক শক্তি। সমকালীন বিশ্বে এরা ছিলো সর্ববৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ বিবাদের ভূমিকা তৈরী হয়েছিলো শেরহাবিল ইবনে আমর গাস্সানির হাতে। এই ব্যক্তি নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দূত হারেস ইবনে ওমায়ের আযদিকে হত্যা করেছিলো। বসরার গবর্নরের কাছে সে দূত পাঠানো হয়েছিলো। এরপর হযরত যায়েদ ইবনে হারেসার নেতৃত্বে নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সৈন্যদল প্রেরণ করেন। ফলে রোমক ভূমিতে মূতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কিন্তু মুসলিম বাহিনী শত্রুদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণে সক্ষম হয়নি। তবুও এ অভিযান কাছে ও দূরবর্তী আরব অধিবাসীদের মনে সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিলো।

কায়সারে রোম এ সকল প্রভাব প্রতিক্রিয়া এবং এর পরিণাম উপেক্ষা করতে পারেনি। মুসলিম অভিযানের ফলে আরবের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে স্বাধীনতা চেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো। এটা ছিলো তার জন্যে একটা বিপজ্জনক অবস্থা। অথচ জনগণের স্বাধীনতার চেতনা সীমান্তবর্তী এলাকায় রোমকদের জন্যে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। বিশেষ করে সিরিয়ার সীমান্তে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এ কারণে কায়সারে রোম ভাবলো যে, মুসলমানদের শক্তি বিপজ্জনক হয়ে ওঠার আগেই এদের দমন ও নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। এতে করে রোমের সাথে সংশ্লিষ্ট আরব এলাকাসমূহে ফেতনা এবং হাঙ্গামা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সুযোগ পাবে না।

এসব কারণে মূতার যুদ্ধের পর এক বছর যেতে না যেতেই কায়সারে রোম, রোমের অধিবাসী এবং রোমের অধীনস্থ আরব এলাকাসমূহ থেকে সৈন্য সমাবেশ শুরু করলেন। এটা ছিলো মুসলমানদের সাথে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পূর্ব প্রস্তুতি।

রোম ও গাসসানের প্রস্তুতির সাধারণ খবর

এদিকে মদীনায় পর্যায়ক্রমে খবর আসছিলো যে, রোমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক সিদ্ধান্তমূলক যুদ্ধের প্রস্তুতি চলছে। এ খবর পেয়ে মুসলমানরা অস্বস্তি এবং উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। হঠাৎ কোন শব্দ শুনলেই তারা চমকে উঠতেন। তারা ভাবতেন, রোমকরা বুঝি

এসে পড়েছে। নবম হিজরীতে একটি ঘটনা ঘটলো। এ ঘটনা থেকেই মুসলমানদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। এ সময়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের সাথে ঈলা[১] করে তাঁদের ছেড়ে একটি পৃথক ঘরে উঠেছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম প্রথম দিকে কিছু বুঝে উঠতে পারেননি। তারা ভেবেছিলেন, নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন। এতে সাহাবাদের মধ্যে গভীর চিন্তা ও মনোবেদনা ছড়িয়ে পড়েছিলো। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) এ ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমার একজন আনসার সঙ্গী ছিলো। নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে আমি অনুপস্থিত থাকলে তিনি আমার কাছে খবর নিয়ে আসতেন, যখন তিনি অনুপস্থিত থাকতেন, তখন আমি তার কাছে খবর নিয়ে আসতাম। এরা দু'জন মদীনার উপকণ্ঠে বসবাস করতেন। একজন অন্যজনের প্রতিবেশী ছিলেন। পর্যায়ক্রমে নবী (আ.)-এর খেদমতে হাযির হতেন। হযরত ওমর বলেন, সেই সময়ে গাস্সান অধিপতির ব্যাপারে আমরা আশঙ্কা করছিলাম। আমাদের বলা হয়েছিলো যে, গাস্সান রাজ আমাদের ওপর হামলা করতে পারেন। এ কারণে সব সময় উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাতাম। আমার আনসার সাথী একদিন হঠাৎ এসে দরজায় করাঘাত করে বললেন, খোলো খোলো। আমি বললাম, গাস্সানী কি এসে পড়েছে? তিনি বললেন, না, বরং তার চেয়ে বড় ঘটনা ঘটেছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের থেকে আলাদা হয়ে গেছেন।[২]

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত ওমর (রা.) বলেন, আমাদের মধ্যে এ মর্মে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, গাস্সান সম্রাট আমাদের ওপর হামলা করতে ঘোড়া প্রস্তুত করছেন। আমার সাথী নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে একদিন এসে দরজায় জোরে জোরে আঘাত করতে লাগলেন। তিনি বাইরে থেকে বললেন, ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি? আমি উৎকণ্ঠিতভাবে বাইরে এলাম। তিনি বললেন, বড় দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। আমি বললাম, কি হয়েছে? গাস্সানি কি এসে পড়েছে? তিনি বললেন, না এর চেড়ে বড় ঘটনা ঘটেছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীদের তালাক দিয়েছেন।[৩]

এ ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, সে সময় মুসলমানদের ওপর রোমকদের হামলার হুমকি ছিলো কতো মারাত্মক। নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনায় পৌঁছার পর মোনাফেকরা রোমকদের যুদ্ধ প্রস্তুতির অতিরঞ্জিত খবর মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করছিলো। কিন্তু মোনাফেকরা লক্ষ্য করছিলো যে, সব ক্ষেত্রেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সফল হচ্ছেন এবং তিনি বিশ্বের কোন শক্তিকেই ভয় পান না। তাঁর সামনে যে কোন বাধা এলেই তা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। এসব সত্ত্বেও মোনাফেকরা মনে মনে আশা করছিলো যে, মুসলমানরা এবার আর রক্ষা পাবে না, তারা নাকানি চুবানি খাবেই। সেই প্রত্যাশিত তামাশা দেখার দিন আর বেশী দূরে নয়। এরূপ চিন্তা-ভাবনার প্রেক্ষিতে তারা একটি মসজিদ তৈরী করলো, যা 'মসজিদে দেরার' নামে পরিচিত। উক্ত মসজিদে মোনাফেকরা বসে আড্ডা দিত এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার ষড়যন্ত্র করতো। মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, মুসলিম উম্মার ঐক্যে ফাটল

---

১. নারীর কাছে না যাওয়ার কসম করা। এই কসম চার মাস বা তার চেয়ে কম মেয়াদের জন্য হলে শরীয়ত অনুযায়ী এর জন্য কোন বিধান প্রযোজ্য হবে না। আর যদি চার মাসের বেশী মেয়াদের জন্য কসম করা হলে চার মাস পুরো হওয়ার সাথে সাথে শরয়ী আদালতে বিষয়টি রুজু হবে এবং আদালত বলবে যে, আপনি হয় স্ত্রীকে স্ত্রীর মর্যাদা দিন অথবা তাকে তালাক দিন। অবশ্য কোন কোন সাহাবার মতে চার মাস কেটে যাওয়ার পর আপনা আপনি তালাক হয়ে যায়।

২. সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৭৩০

৩. সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ৩৩৪

ধরানো এবং শত্রুদের সাহায্য করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার লক্ষ্যেই এটি তৈরী করা হয়েছিলো। অসৎ উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সেই মসজিদে তারা শুধু ইসলাম বিরোধী কাজে লিপ্ত থেকেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং সে মসজিদে নামায আদায়ের জন্যে নবী শ্রেষ্ঠকেও আবেদন জানিয়েছিলো। এর মাধ্যমে মোনাফেকরা সরল প্রাণ মুসলমানদের ধোঁকা দিতে চাচ্ছিল। নবী শ্রেষ্ঠ যদি একবার নামায আদায় করেন, তাহলে সাধারণ মুসলমানরা মোনাফেকদের প্রতিষ্ঠিত সেই মসজিদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্য বুঝতে পারবে না। তাঁরা ধারণাও করতে পারবেন না যে, মসজিদ নামের এ ঘরে বসে তাদের বিরুদ্ধে কিরূপ ভয়ানক ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করা হচ্ছে। তাছাড়া এ মসজিদে কারা যাতায়াত করছে মুসলমানরা সেদিকেও লক্ষ্য রাখবে না। এ মসজিদ এমনি করে মোনাফেক এবং তাদের বাইরের মিত্রদের ষড়যন্ত্রের একটা আখড়ায় পরিণত হবে। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই মসজিদে সাথে সাথে নামায আদায় করতে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে সেই মসজিদে নামায আদায় করবো। সে সময়ে তিনি যুদ্ধের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ছিলেন। কিন্তু মোনাফেকরা তাদের উদ্দেশ্য সফল করতে পারেনি। আল্লাহ তায়ালা তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দেন। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে নবী শ্রেষ্ঠ সেই মসজিদে নামায আদায়ের পরিবর্তে সেটি ধ্বংস করে দেন।

রোম ও গাস্সানের প্রস্তুতির বিশেষ খবর

এ সময়ে সিরিয়া থেকে তেল আনতে যাওয়া নাবেতিদের[৪] কাছে হঠাৎ জানা গেলো যে, হিরাক্লিয়াস ৪০ হাজার দুর্ধর্ষ সৈন্যের এক বাহিনী তৈরী করেছেন এবং রোমের এক বিখ্যাত যোদ্ধা সেই বাহিনীর নেতৃত্ব করছেন। সেই কমান্ডার তার অধীনে খৃষ্টান গোত্র লাখাম জাযাম প্রভৃতিকে সমবেত করেছে এবং অগ্রবর্তী বাহিনী বালকা নামক জায়গায় পৌঁছে গেছে। এমনিভাবে এক গুরুতর সমস্যা মুসলমানদের সামনে দেখা দিলো।

পরিস্থিতির নাযুকতা

সেই সময় প্রচন্ড গরম পড়েছিলো। দেশে অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা এবং দুর্ভিক্ষপ্রায় অবস্থা বিরাজ করছিলো। উট ঘোড়া প্রভৃতি যানবাহনের সংখ্যা ছিলো কম। গাছের ফল পেকে আসছিলো। এ কারণে অনেকেই ছায়ায় এবং ফলের কাছাকাছি থাকতে চাচ্ছিলো। তারা তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধে যেতে চাচ্ছিলেন না। তদুপরি পথের দূরত্ব ছিলো অনেক, পথ ছিলো দুর্গম ও বন্ধুর। সব কিছু মিলিয়ে পরিস্থিতি ছিলো বড়োই নাযুক।

তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত

আল্লাহর নবী এ পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, এমনি সঙ্কট সময়ে যদি রোমকদের সাথে যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে শৈথিল্য ও অলসতার পরিচয় দেয়া হয় তাহলে রোমকরা মুসলিম অধিকৃত ও অধ্যুষিত এলাকাসমূহে প্রবেশ করবে। ফলে ইসলামের দাওয়াত, প্রচার এবং প্রসারে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। মুসলমানরা সামরিক শক্তির স্বাতন্ত্র হারাবে। হোনায়েনের যুদ্ধে পর্যুদস্ত, বাতিল ও কুফুরী শক্তি পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে। বাইরের শক্তির সাথে গোপনে যোগাযোগ রক্ষাকারী মোনাফেকরা যারা সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করছিলো তারা মুসলমানদের পিঠে ছুরিকাঘাত করবে। পেছনে থাকবে শত্রুদল মোনাফেক আর সামনে থাকবে বিধর্মী রোমক সৈন্যদল। এতে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত শ্রম-সাধনা ব্যর্থতার মুখোমুখি হয়ে পড়বে। নবী এবং সাহাবাদের

---

৪. এরা নাবেত ইবনে ইসমাইল(আঃ)-এর বংশধর। এক সময় এরা পাটরা এবং হেজাযের উত্তরাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। কিন্তু কালক্রমে শক্তিহীন হয়ে কৃষক ও ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়।

দীর্ঘদিনের কষ্ট বিফলে যাবে। অনেক কষ্টে অর্জিত সাফল্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। অথচ এই সাফল্যের পেছনে মুসলমানদের ত্যাগ তিতিক্ষার ইতিহাস বড়োই দীর্ঘ।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসব সম্ভাবনা ভালোভাবে অনুধাবন করছিলেন। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, মুসলিম অধিকৃত ও অধ্যুষিত এলাকায় বিধর্মীদের প্রবেশের সুযোগ দেয়ার তো দূরে থাক বরং ওদের এলাকায় গিয়েই আঘাত করা হবে।

রোমকদের সাথে যুদ্ধ প্রস্তুতির ঘোষণা

উল্লিখিত বিষয়সমূহ পর্যালোচনার পর নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের মধ্যে যুদ্ধ প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। মক্কাবাসী এবং আরবের বিভিন্ন গোত্রকেও যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। অন্য সময়ে নবী শ্রেষ্ঠ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের ক্ষেত্রে ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতেন গন্তব্যের কথা গোপন রাখতেন। কিন্তু এবার তা করলেন না। প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, রোমকদের সাথে যুদ্ধ হবে।

মুসলমানরা যেন যুদ্ধের জন্যে ভালোভাবে প্রস্তুত হতে পারেন এ জন্যেই প্রকাশ্যে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হয়েছিলো। যুদ্ধের জন্যে মুসলমানদের প্রস্তুতিতে উদ্বুদ্ধ করতে সূরা তাওবার একাংশও নাযিল হয়েছিলো। সাথে সাথে তিনি সদকা খয়রাত করার ফযিলত বর্ণনা করেন এবং আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয়ে মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করেন।

যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্যে মুসলমানদের প্রচেষ্টা

সাহাবায়ে কেরাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ পাওয়ার পরই যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি শুরু করেন। মদীনার চারিদিক থেকে আগ্রহী মুসলমানরা আসতে থাকেন। যাদের মনে মোনাফেকী অর্থাৎ নেফাকের অসুখ রয়েছে, তারা ছাড়া কেউ এ যুদ্ধ থেকে দূরে থাকার কথা ভাবতেই পারেননি। তবে তিন শ্রেণীর মুসলমান ছিলেন পৃথক। তাদের ঈমান ও আমলে কোন প্রকার ক্রুটি ছিলো না। গরীব ক্ষুধাতুর মুসলমানরা আসছিলেন এবং যানবাহনের ব্যবস্থা করার আবেদন জানাচ্ছিলেন কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অক্ষমতা প্রকাশ করছিলেন। সূরা তাওবায় এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'ওদের কোন অপরাধ নেই, যারা তোমার কাছে বাহনের জন্যে এলে তুমি বলেছিলে, 'তোমাদের জন্যে কোন বাহন আমি পাচ্ছি না। ওরা অর্থ ব্যয়ে অসামর্থতাজনিত দুঃখে অশ্রু বিগলিত চোখে ফিরে গেলো।'

মুসলমানরা সদকা–খয়রাতের দিক থেকে একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। হযরত ওসমান (রা.) সিরিয়ায় ব্যবসার জন্যে প্রেরণের উদ্দেশ্যে একটি কাফেলা তৈরী করেছিলেন। এতে সুসজ্জিত দুইশত উট ছিলো। দুশো উকিয়া অর্থাৎ প্রায় সাড়ে উনত্রিশ কিলো রৌপ্য ছিলো। তিনি এইসবই সদকা করে দিলেন। এরপর পুনরায় একশত উট সুসজ্জিত অবস্থায় দান করলেন। তিনি এক হাজার দীনার অর্থাৎ প্রায় ৫ কিলো সোনা নিয়ে এলেন এবং তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে রাখলেন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেসব উল্টেপাল্টে দেখছিলেন আর বলছিলেন, আজকের পর থেকে ওসমান যা কিছুই করুক না কেন, তার কোন ক্ষতি হবে না।[৫] এরপরও হযরত ওসমান (রা.) সদকা করেন। সব মিলিয়ে দেখা গেলো যে, তাঁর সদকার পরিমাণ নগদ অর্থ ছাড়াও ছিলো নয়শত উট এবং একশত ঘোড়া।

এদিকে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) দু'শো উকিয়া অর্থাৎ প্রায় সাড়ে উনত্রিশ কিলো চাঁদি নিয়ে আসেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তাঁর ঘরের সবকিছু নিয়ে আসেন এবং ঘরে শুধু আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূলকে রেখে আসেন। তাঁর সদকার পরিমাণ ছিলো চার

---

[৫]. জামে তিরিমিয, মানাকেবে ওসমান ইবনে আফফান, ২য় খন্ড, পৃ. ২১১

হাজার দিরহাম। তিনিই প্রথমে তার সদকা নিয়ে হাযির হয়েছিলেন। হযরত ওমর (রা.) তার অর্ধেক ধন-সম্পদ নিয়ে হাযির হন। হযরত আব্বাস (রা.) তাঁর বহু ধন-সম্পদ নিয়ে আসেন। হযরত তালহা হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা এবং মোহাম্মদ ইবনে মোসলমাও অনেক ধন-সম্পদ নিয়ে হাযির হন। হযরত আসেম ইবনে আদী নব্বই ওয়াসক অর্থাৎ সাড়ে ১৩ হাজার কিলো বা সোয়া তের টন খেজুর নিয়ে আসেন। অন্যান্য সাহাবারাও সাধ্যমত সদকা নিয়ে আসেন। কেউ এক মুঠো কেউ দুই মুঠোও দেন, তাদের এর বেশী দেয়ার সামর্থ ছিলো না।

মহিলারা তাদের হার, বাজুবন্দ, ঝুমকা, পা-জেব, বালি, আংটি ইত্যাদি সাধ্যমাফিক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে প্রেরণ করেন। কেউ বিরত থাকেননি, কেউ পিছিয়ে থাকেননি। কৃপণতার চিন্তা কারো মনে আসেনি। বেশী বেশী যারা সদকা দিচ্ছিলেন, মোনাফেকরা তাদের খোঁটা দিচ্ছিলো যে, ওরা অহংকারী। যারা সামান্য কিছু দান করছিলেন, তাদের নিয়ে উপহাস করছিলো যে, ওরা একটি দু'টি খেজুর দিয়ে কায়সারের দেশ জয় করতে চলেছে। কোরআনের সূরা তাওবায় এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'মোমেনদের মধ্যে যারা স্বতস্ফূর্তভাবে সদকা দেয় এবং যারা নিজ শ্রম ব্যতীত কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ ও বিদ্রূপ করে, আল্লাহ তায়ালা তাদের বিদ্রূপ করেন, ওদের জন্যে আছে মর্মন্তুদ শাস্তি।'

তবুকের পথে মুসলিম সেনাদল

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে ইসলামী বাহিনী প্রস্তুত হলো। প্রিয় নবী এরপর মোহাম্মদ ইবনে মোসলমা মতান্তরে ছাবা ইবনে আরফাতাকে মদীনার গবর্নর নিযুক্ত করেন এবং পরিবার পরিজনের তত্ত্বাবধানের জন্যে হযরত আলীকে (রা.) মদীনায় অবস্থানের নির্দেশ দেন। কিন্তু মোনাফেকরা সমালোচনা করে। এর ফলে হযরত আলী (রা.) মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে মিলিত হন। নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে পুনরায় মদীনায় ফেরত পাঠান তিনি বলেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার সাথে আমার সম্পর্ক মূসা এবং হারুনের সম্পর্কের মতো। অবশ্য, আমার পরে কোন নবী আসবে না।

নবী আল আমিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ব্যবস্থাপনার পর উত্তরদিকে রওয়ানা হন। নাসাঈ-এর বর্ণনা অনুযায়ী সেদিন ছিলো শনিবার। গন্তব্য ছিলো তবুক। মুসলিম সৈন্যদের সংখ্যা ছিলো ত্রিশ হাজার। ইতিপূর্বে এতো বড় সেনাদল তৈরী হয়নি। এতো বড় সৈন্যদলের জন্যে মুসলমানদের সর্বাত্মক চেষ্টা সত্তেও পুরো সাজ-সজ্জা সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি। যানবাহন এবং পাথেয় ছিলো অপ্রতুল। প্রতি আঠার জন সৈন্যের জন্যে ছিলো একটি উট, সেই উটে উক্ত আঠারো জন পর্যায়ক্রমে সওয়ার হতেন। খাদ্য সামগ্রীর অপ্রতুলতার কারণে অনেক সময় গাছের পাতা খেতে হচ্ছিলো এবং উটের সংখ্যা কম হওয়া সত্তেও ক্ষুধার প্রয়োজনে উট যবাই করতে হচ্ছিলো। এ সব কারণে এ বাহিনীর নাম হয়েছিলো 'জায়শে উছরত' অর্থাৎ অভাব অনটনের বাহিনী।

তবুক যাওয়ার পথে ইসলামী বাহিনী 'হেজ' অর্থাৎ সামুদ জাতির অবস্থান এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। সামুদ জাতি 'ওয়াদিউল কোরার' ভেতরে পাথর খুঁড়ে বাড়ী তৈরী করেছিলো। সাহাবায়ে কেরাম সেখানে কূপ থেকে পানি উত্তোলন করেন। পানি তুলে রওয়ানা হওয়ার সময় নবী আল আমিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তোমরা এ জায়গার পানি পান করো না এবং সে পানি ওযুর জন্যেও ব্যবহার করো না। এখানে পানি দিয়ে যে আটা মাখিয়েছো সেসব পশুদের খেতে দাও, নিজেরা খেয়ো না। তোমরা সেই কূপ থেকে পানি নাও, যে কূপে হযরত সালেহ (আ.)-এর উটনী পান পান করতো।'

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী আল আমিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেজর অর্থাৎ দিয়ারে সামুদ অতিক্রমের সময় বললেন, সে যালিমদের অবস্থান স্থলে প্রবেশ করো না, তাদের ওপর যে বিপদ এসেছিলো সে বিপদ তোমাদের ওপর যেন না আসে। তবে হাঁ, কাঁদতে কাঁদতে প্রবেশ করতে পারো। এরপর তিনি নিজের মাথা আবৃত করে দ্রুত সেই স্থান অতিক্রম করে গেলেন।[৬]

পথে পানির ভীষণ সমস্যা দেখা দিল। শেষ পর্যন্ত সাহাবারা নবী আল আমিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন জানালেন। তিনি দোয়া করলেন। আল্লাহ তায়ালা মেঘ পাঠিয়ে দিলেন। প্রচুর বৃষ্টি হলো। সাহাবারা তৃপ্তির সাথে পানি পান করলেন এবং প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণও করলেন।

তবুকের কাছাকাছি পৌঁছার পর নবী আল আমিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইনশাআল্লাহ আগামীকাল তোমরা তবুকের জলাশয়ের কাছে পৌঁছে যাবে। তবে চাশত-এর সময়ের আগে পৌঁছুতে পারবে না। যারা আগে পৌঁছুবে তারা যেন আমি না যাওয়া পর্যন্ত ওখানের পানিতে হাত না দেয়।

হযরত মায়া'য (রা.) বলেন, তবুকে আমরা পৌঁছে দেখি আমাদের দু'জন সঙ্গী আগেই সেখানে পৌঁছেছেন। ঝর্ণা থেকে অল্প অল্প পানি উঠছিলো। নবী আল আমিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এখানের পানিতে হাত লাগিয়েছো? তারা বললো, হাঁ। নবী একথা শুনে আল্লাহ তায়ালা যা চেয়েছিলেন তাই বললেন। এরপর ঝর্ণা থেকে আজলার সামান্য পানি নিলেন। ধীরগতিতে আসা পানি হাতের তালুতে জমা হওয়ার পর তিনি সে পানি দিয়ে হাতমুখ ধুলেন তারপর সেই পানিও ঝর্ণায় ফেলে দিলেন। এরপর ঝর্ণায় প্রচুর পানি উঠতে লাগলো। সাহাবারা তৃপ্তির সাথে সে পানি পান করলেন। এরপর নবী আমাকে বললেন, হে মায়া'য, যদি তুমি দীর্ঘজীবী হও, তবে দেখতে পাবে যে, এখানে বাগান সজীব হয়ে উঠেছে।[৭]

তবুক যাওয়ার পথে, মতান্তরে তবুক পৌঁছার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আজ রাতে প্রচন্ড ঝড় হবে, তোমরা কেউ উঠে দাঁড়াবে না। যাদের কাছে উট থাকবে, তারা উটের রশি শক্ত করে ধরে রাখবে। রাতে প্রচন্ড ঝড় হলো। একজন সাহাবী উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, ঝড়ের তান্ডব তাকে উড়িয়ে নিয়ে দুই পাহাড়ের মাঝখানে ফেলে দিয়েছিলো।[১]

এই সফরের সময় নবী যোহর ও আছরের নামায একত্রে এবং মাগরেবের ও এশার নামায একত্রে আদায় করতেন। জমে তাকদিম জমে তাখির দু'টোই করেছিলেন। জমে তাকদিম অর্থাৎ কখনো যোহর ও আছরের নামায যোহরের সময়েই আদায় করতেন এবং মাগরেব এশার নামায মাগরেবের সময়েই আদায় করতেন। জমে তাখির অর্থ কখনো যোহর ও আছরের নামায আছরের সময় আদায় করতেন। কখনো মাগরেব ও এশার নামায এশার সময়ে আদায় করতেন।

তবুকে ইসলামী বাহিনী

ইসলামী বাহিনী তবুকে অবতরণের পর তাঁবু স্থাপন করলেন। তারা রোমক সৈন্যদের সাথে লড়াই করতে প্রস্তুত ছিলেন। নবী আল আমিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেজস্বিনী ভাষায় সাহাবাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। সে ভাষণে তিনি দুনিয়া ও আখরাতের কল্যাণের জন্যে সাহাবাদের অনুপ্রাণিত করলেন, সুসংবাদ দিলেন। এই ভাষণে সৈন্যদের মনোবল বেড়ে গেলো।

৬. সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৬৩৭
৭. মুসলিম শরীফ, ২য় খন্ড, পৃ. ২৪৬
১. ঐ

কোন কিছুর অভাবই তাদের মুখ্য মনে হলো না। অন্যদিকে রোম এবং তাদের বাহিনীর অবস্থা এমন হলো যে, তারা বিশাল মুসলিম বাহিনীর আগমনের খবর পেয়ে ভীত হয়ে পড়লো, সামনে এগিয়ে মোকাবেলা করার সাহস করতে পারল না। তারা নিজেদের শহরে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো। বিধর্মীদের এ পিছুটান মুসলমানদের জন্যে কল্যাণকর প্রমাণিত হলো। আরব এবং আরবের বাইরে মুসলমানদের সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্বের আলোচনা হতে লাগলো। এ অভিযানে মুসলমানরা যে রাজনৈতিক সাফল্য লাভ করে রোমকদের সাথে যুদ্ধ করলে সেই সাফল্য অর্জন সম্ভব হতো না।

বিস্তারিত বিবরণ এই যে, আয়েলার শাসনকর্তা ইয়াহনা ইবনে রওবা নবী আল আমিনের কাছে এসে জিজিয়া আদায়ের শর্ত মেনে নিয়ে সন্ধি চুক্তি করলেন। জাররা এবং আজরুহ-এর অধিবাসীরাও হাযির হয়ে জিযিয়া দেয়ার শর্ত মেনে নিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে একটি চুক্তিপত্র লিখে দিলেন, তারা সেটি কাছে রাখলো। আয়েলার শাসনকর্তাকে লিখে দেয়া চুক্তি বা সন্ধিপত্র ছিলো নিম্নরূপ, 'পরম করুণাময় ও অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। এ শান্তি পরওয়ানা আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পক্ষ থেকে ইয়াহনা ইবনে রওবা এবং আয়েলার অধিবাসীদের জন্যে লেখা হচ্ছে। জলেস্থলে তাদের কিশতি এবং কাফেলার জন্যে আল্লাহর জিম্মা এবং নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিম্মা এবং এই জিম্মা সেইসব সিরীয় ও সমুদ্রের বাসিন্দাদের জন্যে যারা ইয়াহনার সাথে থাকবে। তবে হাঁ, এদের মধ্যে যদি কেউ গোলমাল পাকায়, তবে তার অর্থ-সম্পদ তার জীবনের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে মোহাম্মদ পারবে না। এ ধরনের ব্যক্তির ধন-সম্পদ যে কেউ গ্রহণ করবে, সেটা গৃহীতার জন্যে বৈধ হবে। ওদের কোন কূপে অবতরণ এবং জলেস্থলে কোন পথে চলাচলের ক্ষেত্রে নিষেধ করা যাবে না।'

এছাড়া রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত খালেদ ইবনে ওলীদকে ৪২০ জন সৈন্যের একটি দল দিয়ে দওমাতুল জন্দলের শাসনকর্তা আকিদের-এর কাছে পাঠালেন। খালেদকে বলে দেয়া হলো যে, তুমি দেখবে যে, সে নীল গাভী শিকার করছে। হযরত খালেদ গেলেন। শাসনকর্তার দুর্গ যখন দেখা যাচ্ছিলো হঠাৎ একটি নীল গাভী বের হলো এবং দুর্গের দরজায় গুঁতো মারতে লাগলো। আকিদের সেই গাভী শিকারে বের হলেন। হযরত খালেদ (রা.) তাঁর সৈন্যসহ আকিদেরকে গ্রেফতার করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে নিয়ে এলেন। তিনি আকিদের প্রাণ ভিক্ষা দিলেন এবং দুই হাজার উট, আটশত ক্রীতদাস, চারশত বর্ম এবং চারশত বর্শা পাওয়ার শর্তে চুক্তি করলেন।

আকিদের জিজিয়া দেয়ার কথাও স্বীকার করলেন। নবী আকিদের-এর সাথে ইয়াহনাসহ দওমা, তবুক, আয়লা এবং তায়মার শর্তে সন্ধি স্থাপন করলেন।

এ অবস্থা দেখে রোমকদের ক্রীড়নক গোত্রসমূহ বুঝতে পারলো যে, রোমকদের পায়ের তলায় আর মাটি নেই। এবার প্রভু বদল হয়ে গেছে। রোমকদের আনুগত্যের প্রয়োজন নেই, তাদের কর্তৃত্বের দিন শেষ। এ কারণে তারাও মুসলমানদের মিত্র হয়ে গেলো। এমনি করে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা বিস্তৃত হয়ে রোমক সীমান্তের সাথে মিলিত হলো এবং রোমকদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বহুলাংশে লোপ পেয়ে গেলো।

মদীনায় প্রত্যাবর্তন

ইসলামী বাহিনী তবুক থেকে সফল ও বিজয়ীর বেশে ফিরে আসে। কোন সংঘর্ষ হয়নি। যুদ্ধের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ছিলেন মোমেনীনদের জন্যে যথেষ্ট। পথে এক জায়গায় একটি ঘাঁটিতে ১২ জন মোনাফেক নবী আল আমিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করার

চেষ্টা করে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলেন হযরত আম্মার (রা.)। তিনি উটের রশি ধরে এগুচ্ছিলেন। পেছনে ছিলেন হযরত হোযায়ফা ইবনে ইয়ামান (রা.)। তিনি উট হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। অন্য সাহাবারা তখন ছিলেন দূরে। মোনাফেক কুচক্রীরা এ সময়কে সুবর্ণ সুযোগ মনে করে নাপাক ইচ্ছা চরিতার্থ করতে সামনে অগ্রসর হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সফরসঙ্গী দুইজন সাহাবী মোনাফেকদের পায়ের আওয়ায শুনতে পেলেন। ১২জন মোনাফেক নিজেদের চেহারা ঢেকে অগ্রসর হচ্ছিল। প্রিয় নবী ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। তিনি হযরত হোযায়ফাকে পাঠালেন। হযরত হোযায়ফা পেছনের দিকে গিয়ে মোনাফেকদের বাহন উটগুলোকে এলোপাতাড়ি আঘাত করতে লাগলেন। এই আঘাতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রভাবিত করলেন। তারা দ্রুত পেছনের দিকে গিয়ে সাহাবায়ে কেরামের সাথে মিশে গেলো। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নাম প্রকাশ করে চক্রান্ত ফাঁস করে দিলেন। এ কারণ হযরত হোযায়ফাকে বলা হয় 'রাযদান' অর্থাৎ গোপনীয়তা রক্ষাকারী। এ ঘটনা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'অ হাম্মু বেমা লাম ইয়া নালু' অর্থাৎ তারা এ কাজের জন্যে ইচ্ছা করেছিলো কিন্তু তারা তা করতে পারেনি।

সফরের শেষ পর্যায়ে নবী আল আমিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দূর থেকে মদীনা দেখে বললেন, ওই হচ্ছে তাবা ওই হচ্ছে ওহুদ। এটি সেই পাহাড় যে পাহাড় আমাকে ভালোবাসে এবং যে পাহাড়কে আমিও ভালোবাসি। এদিকে তার আগমন সংবাদ মদীনায় ছড়িয়ে পড়লে আবাল বৃদ্ধ বনিতা বেরিয়ে পড়ে বিপুল উষ্ণতায় তাঁকে অভ্যর্থনা জানালো। তারা তখন গাইছিলো[৯] 'আমাদের ওপর ছানিয়াতুল বেদা থেকে চতুর্দশীর চাঁদের উদয় হয়েছে। যতোক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহকে যারা ডাকার তারা ডাকবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত শোকর করা আমাদের জন্যে ওয়াজেব।'

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তবুকের উদ্দেশ্যে রজব মাসে রওয়ানা হয়েছিলেন এবং রমযান মাসে ফিরে এসেছিলেন। এই সফরে পুরো ৫০ দিন সময় অতিবাহিত হয়েছিলো। তন্মধ্যে ২০ দিন তিনি তবুকে ছিলেন আর ৩০ দিন লেগেছিলো যাওয়া আসায়। জীবদ্দশায় সশরীরে উপস্থিত থেকে এটাই ছিলো নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ জেহাদ।

বিরোধীদের বিবরণ

তবুকের যুদ্ধ ছিলো বিশেষ অবস্থার কারণে আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে কঠিন পরীক্ষা। এর মাধ্যমে ঈমানদার এবং অন্য লোকদের পার্থক্য প্রমাণিত হয়েছিলো। এ ধরনের কঠিন সময়ে আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদের পরীক্ষা করেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা সূরা আল ইমরানে বলেন, 'অসৎকে সৎ থেকে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় রয়েছো আল্লাহ তায়ালা মোমেনদের সে অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারেন না। অদৃশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অবহিত করার নন। তবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন।'

এই যুদ্ধে সকল মোনেনীন সাদেকীন অংশগ্রহণ করেন এবং যুদ্ধে অনুপস্থিতি নেফাকের নিদর্শনরূপে বিবেচিত হয়। কেউ পেছনে থেকে গেলে তার সম্পর্কে নবী আল আমিনের কাছে উল্লেখ করা হলে তিনি বলেছিলেন, ওর কথা ছাড়ো। যদি তার মধ্যে কল্যাণ থাকে তবে আল্লাহ শীঘ্র তাকে তোমাদের কাছে পৌঁছে দেবেন আর যদি না থাকে তবে, অচিরেই তার থেকে তোমাদের নাজাত দেবেন। মোটকথা এই যুদ্ধ থেকে দুই শ্রেণীর লোক দূরে ছিলো। এক শ্রেণীর

---

৯. এটি ইবনে কাইয়েমের কথা। ইতিপূর্বে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

লোক মা'যুর বা অক্ষম, অন্য শ্রেণী মোনাফেক। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনার দাবীতে ছিলো মিথ্যা, তারাই ছিলো মোনাফেক, তারা মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে যুদ্ধে না যাওয়ার জন্যে ওযর খাড়া করেছিলো। এদের কেউ কেউ যুদ্ধে না যাওয়ার জন্যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতিও নেয়নি। তবে এদের মধ্যে তিনজন ছিলেন পাক্কা মোমেন এবং ঈমানদার। তারা যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ ছাড়াই যুদ্ধ থেকে দূরে ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদের তওবা কবুল করেন।

এ ঘটনার বিবরণ এই যে, যুদ্ধ থেকে নবী মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভ্যাস মোতাবেক প্রথমে মসজিদে নববীতে গিয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। এরপর তিনি সেখানে বসলেন। মোনাফেকদের সংখ্যা ছিলো ৮০ বা এর চেয়ে কিছু বেশী।[১০] তারা মসজিদে নববীতে এসে যুদ্ধে যেতে না পারার নানা ওযর বর্ণনা এবং কসমের পর কসম করছিলো।

নবী মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বাইরের অভিব্যক্তি গ্রহণ করে বাইয়াত গ্রহণ করলেন, তাদের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করেন এবং তাদের ভেতরের অবস্থা আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিলেন।

তিনজন মোমেনীন সাদেকীনের প্রসঙ্গ বাকি থাকলো। এরা হচ্ছেন কা'ব ইবনে মালেক মারারা ইবনে রবি এবং হেলাল ইবনে উমাইয়া। তারা সত্যতার সাথে বললেন, আমাদের যুদ্ধে না যাওয়ার মতো কোন কারণ ছিলো না। এ কথা শুনে নবী মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদের বললেন, তারা যেন ওদের সাথে বাক্যালাপ না করেন। ফলে তাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক বয়কট করা হলো। চেনা মানুষ অচেনা হয়ে গেলেন, যমিন ভয়ানক হয়ে উঠলো, পৃথিবী তার প্রশস্ততা সত্তেও সংকীর্ণ হয়ে গেলো। তাদের জীবন মারাত্মক সঙ্কটের সম্মুখীন হলো। কঠোরতা এমন বেড়ে গেলো যে, ৪০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর নির্দেশ দেয়া হলো তারা যেন তাদের স্ত্রীদের থেকেও আলাদা থাকে। ৫০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা তাদের তওবা কবুল করলেন। সূরা তাওবার এই আয়াত নাযিল হলো 'এবং তিনি ক্ষমা করলেন, অপর তিনজনকেও তাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিলো, যে পর্যন্ত না পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্তেও যাদের জন্যে সঙ্কুচিত হয়েছিলো এবং তারা উপলব্ধি করেছিলো যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন আশ্রয়স্থল নেই। পরে তিনি ওদের প্রতি অনুগ্রহ পরায়ণ হলেন, যাতে ওরা তওবা করে। আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ঘোষণায় সাধারণভাবে সকল মুসলমান এবং বিশেষভাবে উক্ত তিনজন সাহাবা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। সাহাবারা ছুটোছুটি করে পরস্পরকে এ খবর দিতে লাগলেন। একে অন্যকে মিষ্টি খাওয়াতে লাগলেন, দান খয়রাত করতে লাগলেন। প্রকৃতপক্ষে এই আয়াত নাযিলের দিন ছিলো তাদের জীবনের সবচেয়ে আনন্দ এবং সৌভাগের দিন।

যেসব লোক অক্ষমতা ও অপারগতাহেতু যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যারা দুর্বল যারা পীড়িত তাদের কোন অপরাধ নেই, যদি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তাদের অবিমিশ্র আনুগত্য থাকে। যারা সৎ কর্মপরায়ণ, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কোন কারণ নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

এদের সম্পর্কে নবী মুরসালিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার কাছে পৌঁছে বলেছিলেন, 'মদীনায় এমন কিছু লোক রয়েছে, তোমরা যেখানেই সফর করেছো এবং যেখানেই

---

১০. ওয়াকেদী লিখেছেন, এই সংখ্যা মদীনার মোনাফেকদের। এছাড়া বনু গেফার এবং অন্যান্য গোত্রের মোনাফেকদের সংখ্যা ছিল ৮২। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এবং তার অনুসারীদের হিসাব এর মধ্যে ধরা হয়নি। তাদের সংখ্যাও ছিল অনেক। দেখুন ফতহুল বারী, ৮ম খন্ড, পৃ. ১১৯

গিয়েছো তারা তোমাদের সঙ্গে ছিলো। অপরাগতার কারণ অর্থাৎ সঙ্গত ওযরের কারণে তারা যুদ্ধে যেতে পারেনি।' সাহাবারা বললেন, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তারা মদীনায় থেকে বুঝি আমাদের সঙ্গে ছিলেন? নবী মুরসালিন বললেন, 'হাঁ, মদীনায় থেকেও তারা তোমাদের সঙ্গে ছিলেন।'

এ যুদ্ধের প্রভাব

তবুক যুদ্ধ জাযিরাতুল আরবের ওপর মুসলমানদের প্রভাব বিস্তার এবং শক্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলো। জনসাধারণ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলো যে, এখন থেকে জাযিরাতুল আরবে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন শক্তির অস্তিত্ব থাকবে না। পৌত্তলিক এবং মোনাফেকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অব্যাহত ষড়যন্ত্র চালিয়ে নিজেদের প্রত্যাশিত যে সুযোগের স্বপ্ন দেখছিলো সে স্বপ্নও ভেঙ্গে খান খান হয়ে গিয়েছিলো। কেননা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূল কেন্দ্র ছিলো রোমক শক্তি। এ যুদ্ধের ফলে সে আশাও ধূলিসাৎ হয়ে গেলো। এতে কাফের ও মোনাফেকদের মনোবল ভেঙ্গে যোয়। তারা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছিলো যে, ইসলাম থেকে পলায়ন বা নিষ্কৃতি পাওয়ার কোন উপায় নেই।

এমতাবস্থায় মোনাফেকদের সাথে নরম ব্যবহার করার কোন প্রয়োজনীয়তা মুসলমানদের ছিলো না। মোনাফেকদের সাথে কঠোর ব্যবহার করতে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিলেন। এমনকি তাদের দেয়া দান-খয়রাত গ্রহণ, তাদের জানাযার নামায আদায়, তাদের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া এবং তাদের কবর যেয়ারত করতেও নিষেধ করা হলো। মসজিদের নামে তারা ষড়যন্ত্রের যে আখড়া তৈরী করেছিলো, সেটিও ধ্বংস করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হলো। মোনাফেকদের সম্পর্কে এমন আয়াত নাযিল হলো যে, এতে তারা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে পড়লো। তাদের চিনতে আর কোন অসুবিধাই রইলো না। কোরআনের আয়াতের দ্বারা মোনাফেকদের যেন অঙ্গুলি নির্দেশ করে চিনিয়ে দেয়া হলো।

তবুকের যুদ্ধের প্রভাব এ থেকেও বোঝা যায় যে, মক্কা বিজয়ের পর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদল মদীনায় আসতে শুরু করলেও এ যুদ্ধের পর সে সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেলো।[১১]

এই সম্পর্কে কোরআনের আয়াত

এই যুদ্ধ সম্পর্কে সূরা তাওবায় বহুসংখ্যক আয়াত নাযিল হয়েছিলো। কিছু হয়েছে যুদ্ধে রওয়ানা হওয়ার আগে এবং কিছু কিছু মদীনায় ফিরে আসার পরে। এসব আয়াতে যুদ্ধের অবস্থা বিস্তারিত প্রকাশ করা হয়েছিলো। মোনাফেকদের পর্দা উন্মোচন করে দেয়া হয়েছিলো। সরলপ্রাণ মোজাহেদদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে তাদের প্রশংসা করা হয়েছিলো। মোমেনীন এবং সাদেকীন যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং যারা করেননি, তাদের তওবা কবুল করার কথা বলা হয়েছে।

এই সময়ের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা

নবম হিজরীতে ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পন্ন বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছিলো।

(১) তবুক থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফিরে আসার পর উওয়ায়মের আজলানি এবং তার স্ত্রীর মধ্যে 'লেআন' হয়েছিলো। উল্লেখ্য স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া হয় অথচ সাক্ষী নেই, তাকে লেআন বলে।

---

১১. এ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ যেসব গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে সেগুলোর নাম, ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃ. ৫১৫-৫৩৭, যাদুল মায়াদ ৩য় খন্ড, পৃ. ২-১৩, সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, পৃ. ৩১৩-৩৩৭, ফতহুল বারী, ৮ম খন্ড, পৃ. ১১০-১২৬ ও তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন, সূরা তাওবা।

(২) যেনাকারিনী একজন মহিলা নবী মুরসালিনের দরবারে এসে নিজের পাপের কথা স্বীকার করে শাস্তির আবেদন জানিয়েছিলেন। তাকে সন্তান প্রসবের পর আসতে বলা হয়েছিলো। সন্তানের দুধ ছাড়ানোর পর তাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা অর্থাৎ রজম করা হয়।

(৩) হাবশার সম্রাট আসহামা নাজ্জাশী ইন্তেকাল করেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার গায়েবানা জানাযা আদায় করেন।

(৪) নবী নন্দিনী উম্মে কুলসুম (রা.) ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইন্তেকালে প্রিয় নবী শোকে কাতর হয়ে পড়েন। তিনি হযরত ওসমানকে (রা.) বলেছিলেন, যদি আমার তৃতীয় কোন মেয়ে থাকতো তবে তাকেও আমি তোমার সাথে বিয়ে দিতাম।

(৫) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তবুক থেকে ফিরে আসার পর মোনাফেক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নবী তার জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করেন এবং হযরত ওমর (রা.)-এর নিষেধ সত্ত্বেও তার জানাযার নামায আদায় করেন। এরপর কোরআনের আয়াত নাযিল হয় তাতে এবং হযরত ওমর (রা.)-এর বক্তব্যের সমর্থনে মোনাফেকদের জানাযা করতে নিষেধ করা হয়।

হযরত আবু বকরের (রা.) নেতৃত্বে হজ্জ পালন

নবম হিজরীতে যিলকদ বা যিলহজ্জ মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সিদ্দিকে আকবর হযরত আবু বকরকে (রা.) আমিরুল হজ্জ করে মক্কায় প্রেরণ করেন।

এরপর সূরা তাওবার প্রথমাংশ নাযিল হয়। এতে মোশরেকদের সাথে কৃত অঙ্গীকার সমতার ভিত্তিতে শেষ করার নির্দেশ দেয়া হয়। এ নির্দেশ আসার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলীকে (রা.) এ ঘোষণা প্রকাশের জন্যে প্রেরণ করেন। আরবদের মধ্যে অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে এটাই ছিলো রীতি। হযরত আবু বকরের সাথে হযরত আলীর সাক্ষাৎ হয়েছিলো দাজনান মতান্তরে আরজ প্রান্তরে। হযরত আবু বকর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন তুমি আমীর নাকি মামুর? হযরত আলী বললেন, মামুর। এরপর উভয়ে সামনে অগ্রসর হন। হযরত আবু বকর লোকদের হজ্জ করান। ১০ই যিলহজ্জ অর্থাৎ কোরবানীর দিনে হযরত আলী (রা.) হাজীদের পাশে দাঁড়িয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ অনুযায়ী ঘোষণা দেন। অর্থাৎ সকল প্রকার অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির সমাপ্তির কথা ঘোষণা করেন। চার মাসের সময় দেয়া হয়। যাদের সাথে কোন অঙ্গীকার ছিলো না, তাদেরকেও চার মাস সময় দেয়া হয় তবে মুসলমানদের সাথে যেসব মোশরেক অঙ্গীকার পালনে ত্রুটি করেনি এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্যদের সাহায্য করেনি, তাদের চুক্তিপত্র নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত বলবৎ রাখা হয়।

হযরত আবু বকর (রা.) কয়েকজন সাহাবাকে পাঠিয়ে এ ঘোষণা করান যে, ভবিষ্যতে কোন মোশরেক হজ্জ করতে এবং নগ্নাবস্থায় কেউ কাবাঘর তওয়াফ করতে পারবে না।

এ ঘোষণা ছিলো প্রকৃতপক্ষে জাযিরাতুল আরব থেকে মূর্তি পূজার অবসানের চূড়ান্ত পদক্ষেপ। অর্থাৎ এ বছরের পর থেকে মূর্তি পূজার উদ্দেশ্যে আসার জন্যে কোন সুযোগই আর থাকলো না।[১]

---

১. বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য, সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃ. ২২০, ৪৫১, ২য় খন্ড ৬২৬, ৬৭১, যাদুল মায়াদ ৩য় খন্ড, পৃ. ৫৪৩-৫৪৬, তাফসীর গ্রন্থাবলী সূরা বারাআতের প্রথমাংশ

যুদ্ধসমূহের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

রসূলে করিম হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে যে কেউ একথা স্বীকার করতে নৈতিকভাবে বাধ্য হবে যে, তিনি ছিলেন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সফল সামরিক কমান্ডার। পরিবেশ পরিস্থিতি, পটভূমি প্রাসঙ্গিক লক্ষণসমূহ এবং পরিণতি ইত্যাদি বিবেচনায় তিনি ছিলেন অতুলনীয় মেধার অধিকারী। তাঁর বুদ্ধি বিবেচনা ছিলো নির্ভুল এবং বিবেকের জাগ্রতাবস্থা ছিলো গভীর তাৎপর্যমন্ডিত। নবুয়ত ও রেসালাতের গুণে তিনি ছিলেন সাইয়েদুল মুরসালিন বা প্রেরিত সকল নবীর নেতা অন্যদিকে সামরিক নেতৃত্বের গুণবৈশিষ্টে তিনি ছিলেন অসাধারণ এবং অদ্বিতীয়। যে সকল যুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বা অন্যদের প্রেরণ করেছিলেন সব ক্ষেত্রেই তিনি কার্যকারণ পরিবেশ পরিস্থিতি ও পর্যালোচনা করে সঠিক কৌশল ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হন। তাঁর দক্ষতা সমর কুশলতা, সাহসিকতা ছিলো অনন্য। সৈন্য সমাবেশ, যুদ্ধ পরিকল্পনা, অবস্থান নির্ণয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাঁকে কেউ ডিঙ্গিয়ে যেতে পারেনি। তাঁর সমরকুশলতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, বিশ্বের সেরা যুদ্ধ বিশারদের চেয়েও তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তাঁর যুদ্ধ পরিকল্পনায় পরাজয় বরণের কোন সম্ভাবনাই ছিলো না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ওহুদ এবং হোনায়েনের যুদ্ধে যা কিছু ঘটেছিলো এর কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিকল্পনার ত্রুটি বা ভুল নয়। কিছু সংখ্যক মুসলিম সৈন্যের ব্যাক্তিগত দূর্বলতাই দায়ী। আর ওহুদের যুদ্ধে তো তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ও সুস্পষ্ট নির্দেশ এবং সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করা হয়েছিলো।

উভয় যুদ্ধেই মুসলমানরা পরাজয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিলো। সে সময়ে তিনি যে সাহসিকতা ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন তার উদাহরণ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি শত্রু বেষ্টনীতেও ছিলেন অটল অবিচল এবং তুলনাহীন সমর কুশলতায় শত্রুদের সব চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। ওহুদের যুদ্ধে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিলো। এ ছাড়া হোনায়েনের যুদ্ধে তাঁর সমর কুশলতায় মুসলমানদের পরাজয় চূড়ান্ত বিজয়ে পরিণত হয়েছিলো। অথচ ওহুদের মতো বিপজ্জনক পরিস্থিতি এবং হোনায়েনের মতো লাগামহীন ভয়কাতরতা ও অস্থিরতা সেনানায়কদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তি লোপ করে দেয়। তাঁদের স্নায়ুর ওপর এতো বেশী চাপ সৃষ্টি হয় যে, তখন আত্মরক্ষার চেষ্টাই বড় হয়ে দেখা দেয়।

এটা তো হচ্ছে উল্লিখিত যুদ্ধের সামরিক দিক। অন্য একটি দিক আরো বেশী গুরত্বপূর্ণ। এ সকল যুদ্ধের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেন। ফেতনা ফাসাদের আগুন নিভিয়ে দেন। ইসলাম ও পৌত্তলিকতার সংঘর্ষে শত্রুর শক্তি-সামর্থ্য ও অহংকার নস্যাৎ করে দেন। ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগ সম্পর্কে স্বাধীনভাবে চিন্তা করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে তাদের বাধ্য করেন। এছাড়া এসব যুদ্ধের মাধ্যমে তিনি শত্রু মিত্র চিনেছেন। প্রকৃত মুসলমান এবং মোনাফেকদের পার্থক্য নির্ণিত হয়।

সামরিক অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম সেনানায়কদের এক অপরাজেয় শক্তি গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে তাঁর সৃষ্ট সেনাদল ইরাক, সিরিয়ায়, পারস্য ও রোমে যুদ্ধ করে এবং যুদ্ধ পরিকল্পনা ও কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে বড় বড় যুদ্ধবাযদের হার মানিয়ে দেয়। শুধু তাই নয় শত্রুদের তাদের ভূখন্ড, ধন-সম্পদ, ক্ষেত-খামার, বাগান, জলাশয় ইত্যাদি থেকেও বহিষ্কার করে। এইসব যুদ্ধের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদের জন্যে বাসস্থান, ক্ষেত-খামার এবং কর্মসংস্থানের মতো প্রয়োজনীয় কাজ সম্পাদন করেন। বাস্তুহীন ও ঠিকানাহীন উদ্বাস্তুদের সমস্যার সমাধান করেন। অস্ত্র, ঘোড়া, সামরিক সরঞ্জামের বহুবিধ উপকরণের ব্যবস্থা করেন। অথচ প্রতিপক্ষের ওপর কোন প্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন এবং বাড়াবাড়ি না করেই তিনি এসব কিছু করেছিলেন।

অন্ধকার যুগে যেসব কারণে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠতো, প্রিয় নবী সেসব কারণও পরিবর্তন করেন। আইয়ামে জাহেলিয়াতে যুদ্ধ মানে ছিলো লুট-তরায, হত্যা-ধ্বংস, যুলুম-অত্যাচার, অবিশ্বাস্য রকমের বাড়াবাড়ি, প্রতিশোধ গ্রহণ, দুর্বলের ওপর অত্যাচার, জনপদ বিরান করা, বাড়ীঘর, অট্টালিকা ভেঙ্গে ফেলা, মহিলাদের সম্মান নষ্ট করা, শিশু ও বৃদ্ধদের সাথে নিষ্ঠুর নৃশংস ব্যবহার করা। এছাড়া ক্ষেত-খামারের ফসল নষ্ট এবং পশুপাল হত্যা করা মোটকথা সর্বাত্মক ক্ষতিও ধ্বংস ছিলো সেসব যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। ইসলাম যুদ্ধের এসব ঘৃণ্য কার্যকলাপ প্রতিরোধ করে যুদ্ধকে এক পবিত্র জেহাদে পরিণত করেছে। যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায্য কারণে এ যুদ্ধ শুরু করা হয় এবং তার ফলাফল হয় সকল কালের মানুষের জন্যে কল্যাণকর। পরবর্তী সকল কালেই এর সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এসব জেহাদের পরে মানুষ বুঝতে পেরেছে যে, জেহাদ হচ্ছে মানুষকে মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়া, যুলুম-অত্যাচার নির্যাতন থেকে বের করে এনে ন্যায় ও সুবিচারমূলক ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসার সশস্ত্র প্রচেষ্টা। অর্থাৎ এমন একটা ব্যবস্থা করা যাতে শক্তিশালীরা দুর্বলদের ওপর অত্যাচার না করতে পারে বরং সেসব স্বৈরাচারী ও অত্যাচারীদের দূর্বল করে উৎপীড়িত ও দরিদ্রের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এমনি করে ইসলামের জেহাদের অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, সেইসব দুর্বল নারী-পুরুষ শিশুকে রক্ষা করতে হবে যারা এই বলে দোয়া করেন, হে প্রতিপালক, তুমি আমাদেরকে এই জনপদ থেকে বের করো, যেখানের অধিবাসীরা অত্যাচারী। তুমি তোমার কাছ থেকে আমাদের জন্যে নেতা ও পৃষ্ঠপোষকতা প্রেরণ করো এবং নেতা এবং তার মাধ্যমে আমাদের সাহায্য করো। এছাড়া মুসলমানদের যুদ্ধের অর্থ এই দাঁড়িয়েছে যে, আল্লাহর যমিনকে খেয়ানত, যুলুম-অত্যাচার, পাপাচার থেকে মুক্ত করে তার স্থলে শান্তি-নিরাপত্তা, দয়াশীলতাও মানবতা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধের জন্যে উন্নত নীতিমালা প্রণয়ন করেন। মুসলিম সৈন্য এবং সেনাপতিদেরকে সেই নীতিমালার বাইরে যেতে দেননি। হযরত সালমান ইবনে যোয়াইদা বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন ব্যক্তিকে সেনাপতির দায়িত্ব দিতেন তখন তাকে তাকওয়া পরহেজগারি এবং মুসলমান সঙ্গীদের সাথে উত্তম ব্যবহারের উপদেশ দিতেন। এরপর বলতেন আল্লাহর নামে, আল্লাহর পথে যুদ্ধ করো। লড়াই করো, খেয়ানত করো না, অঙ্গীকার লংঘন বা বিশ্বাসঘাতকতা করো না, কারো নাক, কান ইত্যাদি কেটো না, কোন শিশুকে হত্যা করো না।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনোনীত সেনাপতিকে আরো উপদেশ দিতেন যে, সহজ সরল ব্যবহার করবে, কঠোরতার আশ্রয় নেবে না, মানুষকে শান্তি দেবে, কাউকে ঘৃণা করবে না।[১]

রাত্রিকালে কোন এলাকায় পৌঁছার পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকাল হওয়ার আগে হামলা করতেন না। তাছাড়া তিনি আগুন লাগানো অর্থাৎ কোন জিনিসে অগ্নিসংযোগ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। কাউকে বেঁধে হত্যা করা, মহিলাদের প্রহার করা এবং তাদের হত্যা করতেও তিনি নিষেধ করেন। লুট-তরায করতে নিষেধ করেন। তিনি বলেছেন, লুটের মাল মৃতজন্তুর চেয়ে বেশী হালাল নয়, ক্ষেত-খামার ধ্বংস করা, চতুষ্পদ জন্তু হত্যা করা এবং গাছপালা কেটে ফেলতেও তিনি নিষেধ করেন। তবে বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে সেটা ভিন্ন কথা।

মক্কা বিজয়ের সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, কোন আহত ব্যক্তির ওপর হামলা করবে না, কোন পলায়নকারী ব্যক্তিকে ধাওয়া করবে না, কোন বন্দীকে হত্যা করবে না। তিনি এ রীতিও প্রবর্তন করেন যে, কোন দূতকে হত্যা করা যাবে না, তিনি একথাও বলেছেন যে, কোন অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করা যাবে না। এমনকি তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন অমুসলিম নাগরিককে বিনা কারণে হত্যা করবে, সে বেহেশতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ বেহেশতের সুবাস চল্লিশ বছরের পথের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।

উল্লেখিত কারণসমূহ এবং আরো অনেক উন্নততর রীতিনীতি ছিলো যার কারণে যুদ্ধ জাহেলিয়াত যুগের নোংরামী থেকে পাকসাফ হয়ে পবিত্র জেহাদে পরিবর্তিত হয়েছে।

---

১. সহীহ মুসলিম , ১ম খন্ড, পৃ. ৮২-৮৩

দলে দলে মানুষদের আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে চিরতরে যে, মক্কা বিজয়ের ঘটনা ছিলো একটি সিদ্ধান্তমূলক অভিযান। এর ফলে মূর্তি পূজার অসারতা আরববাসীদের সামনে প্রতিভাত হয়ে ওঠে এবং মূর্তিপূজার অবসান ঘটে। সমগ্র আরবের জন্যে সত্য ও মিথ্যা চিহ্নিত হয়ে যায়। তারা দ্রুত ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করেন। হযরত আমর ইবনে সালমা (রা.) বলেন, আমরা একটি জলাশয়ের ধারে বাস করতাম। সেই জলাশয়ের পাশ দিয়ে লোক চলাচল করতো। পথচারীদের আমরা সেই ব্যক্তির অর্থাৎ নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম। পথচারীরা বলতো, তিনি মনে করেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে পয়গাম্বর করে পাঠিয়েছেন তাঁর কাছে ওহী পাঠানো হয় এবং সেই ওহীতে আল্লাহ তায়ালা এরূপ এরূপ বলেছেন। হযরত আমর ইবনে সালমা (রা.) বলেন, আমি সেসব কথা শুনতাম এবং ওহীতে বর্ণিত কথাগুলো মনে রাখতাম। আরবের লোকেরা ইসলাম গ্রহণের পর মক্কা বিজয়ের অপেক্ষায় ছিলেন। তারা বলতো, ওকে এবং তার কওমকে ছেড়ে দাও। যদি তিনি নিজের কওমের ওপর জয়লাভ করেন তাহলে বোঝা যাবে যে, তিনি সত্য নবী। অতপর মক্কা বিজয়ের ঘটনা ঘটলো।

সকল কওম ইসলাম গ্রহণের জন্যে অগ্রসর হলো। আমার পিতাও আমার কওমের কাছে ইসলামের শিক্ষা নিয়ে এলেন। তিনি বললেন, আমি সত্য নবীর কাছ থেকে এসেছি। নবী বলেছেন, অমুক অমুক সময়ে অমুক অমুক নামায আদায় করো। নামাযের সময় হলে তোমাদের মধ্য থেকে একজন যেন আযান দেয়। এরপর তোমাদের মধ্যেকার যে ব্যক্তি বেশী পরিমাণ কোরআন জানেন তিনি যেন ইমামতি করেন।

এই হাদীস থেকে স্পষ্টত বোঝা যায় যে, মক্কা বিজয়ের ঘটনা পরিস্থিতির পরিবর্তনে ইসলামকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে, আরববাসীদের ভূমিকা নির্ধারণে এবং ইসলামের সামনে তাদেরকে উৎসর্গীকৃত করার ব্যাপারে কতোটা প্রভাব বিস্তার করেছিলো। তবুকের যুদ্ধের পর এ অবস্থা আরো চরম রূপ নেয়। এ কারণে আমরা দেখতে পাই যে, সেই দুই বছরে অর্থাৎ নবম ও দশম হিজরীতে মদীনায় বহু প্রতিনিধি দলের আগমন ঘটেছিলো। সেই সময়ে মানুষ দলে দলে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলো। ফলে মক্কা বিজয়ের সময়ে মুসলমানদের সংখ্যা ছিলো দশ হাজার, অথচ এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে তবুকের যুদ্ধের সময় সেই সংখ্যা ত্রিশ হাজারে উন্নীত হয়।

বিদায় হজ্জের সময় দেখা যায় যে, মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ২৪ হাজার মতান্তরে ১ লাখ ৪৪ হাজার। রসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারপাশে তাঁরা লাব্বায়েক ধ্বনি দিচ্ছিলেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রশংসাধ্বনিতে তারা আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলছিলেন। পাহাড়-পর্বতে মাঠে-প্রান্তরে তওহীদের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো।

প্রতিনিধি দলের আগমন

ঐতিহাসিকগণ ৭০টির বেশী প্রতিনিধিদলের কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নয়। এ কারণে আমরা শুধু ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিনিধিদল সম্পর্কে আলোকপাত করছি। পাঠকদের এটা স্মরণ রাখতে হবে যে, মক্কা বিজয়ের পরই যদিও বিভিন্ন প্রতিনিধিদল নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরবারে আসতে শুরু করেছিলো কিন্তু কিছু কিছু গোত্রের প্রতিনিধিদল মক্কা বিজয়ের আগেও মদীনায় নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কছে হাযির হয়েছিলেন। নীচে আমরা সেসব গোত্রের পরিচয় ও আগমনের ঘটনা উল্লেখ করছি।

(১) আবদুল কায়েসের প্রতিনিধিদল, এ গোত্রের প্রতিনিধিদল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাজির হয়েছিলো, প্রথমবার পঞ্চম হিজরীতে এবং দ্বিতীয়বার নবম হিজরীতে। প্রথমবার উক্ত গোত্রের মুনকেজ ইবনে হাব্বান নামক এক ব্যক্তি বাণিজ্যিক সরঞ্জাম নিয়ে মদীনায় এসেছিলেন। এরপরও তিনি কয়েকবার মদীনায় যাওয়া আসা করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মদীনায় হিজরতের পর তিনি মদীনায় আসেন এবং ইসলাম সম্পর্কে অবহিত হন এবং ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করেন ইসলাম গ্রহণের পর নবী করিমের (রা.) তরফ থেকে একখানি চিঠি নিয়ে তিনি নিজ গোত্রের লোকদের কাছে যান। ইসলামের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তার গোত্রের লোকেরাও ইসলাম গ্রহণ করেন।

এরপর উক্ত গোত্রের তেরো-চৌদ্দজনের একটি প্রতিনিধিদল নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খেদমতে হাযির হন। এই প্রতিনিধিদল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ঈমান এবং পানীয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। এই প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন আল আশাজ্জ আল আসরি।[২] এই ব্যক্তি সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মন্তব্য করেছিলেন, তোমার মধ্যে দু'টি এমন গুণ রয়েছে যা আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন। একটি হচ্ছে দূরদর্শিতা ও আন্যটি সহিষ্ণুতা।

দ্বিতীয়বার এই গোত্রের প্রতিনিধিদল নবম হিজরীতে মদীনায় এসেছিলেন। এতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন চল্লিশজন। এদের মধ্যে আলা ইবনে জারুদ আবদী নামে একজন খৃষ্টানও এসেছিলেন। তিনি মদীনায় এসে মুসলমান হন এবং পরে ইসলামের বিশেষ খেদমত করেন।[৩]

(২) দাওস প্রতিনিধিদল, সপ্তম হিজরীর শুরুতে এই প্রতিনিধিদল মদীনায় আসে। সেই সময় নবী (সাঃ) খয়বরে ছিলেন। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তোফায়েল ইবনে আমর দাওসী (রা.) মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজ কওমের প্রতি গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু তাঁর কওম টালবাহানা করতে থাকে। হতাশ হয়ে তিনি নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরবারে এসে আবেদন করেন যে, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আমার কওমের জন্যে বদদোয়া করুন। নবী সঃ) বদদোয়া না করে বললেন, হে

---

২. মারাআতুল মাফাতিহ, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৭১

৩. সরহে সহীহ মুসলিম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৩, ফতহুন করী অষ্টম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৫-৮৬

আল্লাহ তায়ালা দাওস কওমকে হেদায়াত দান করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই দোয়ার পরই দাওস কওমের সকলে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতপর হযরত তোফায়েল (রা.) তাঁর কওমের সত্তর অথবা আশিটি পরিবারের লোকদের নিয়ে সপ্তম হিজরীর শুরুতে মদীনায় হিজরত করেন। সেই সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খয়বরে ছিলেন। হযরত তোফায়েল (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে খয়বরে সাক্ষাৎ করেন।

(৩) ফারওয়াহ ইবনে আমর জোযামির পয়গাম প্রেরণ, ফারওয়াহ রোমক সৈন্যদের মধ্যে একজন আরব কমান্ডার ছিলেন। রোমক সম্রাট তাকে অধিকৃত আরব এলাকায় গবর্নর নিযুক্ত করেন। তাঁর রাজ্যের রাজধানী ছিলো জর্দানের দক্ষিণাঞ্চলে মাআন নামক জায়গায়। অষ্টম হিজরীতে সংঘটিত মূতার যুদ্ধে মুসলমানদের অসাধারণ বীরত্ব দেখে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। একজন দূত পাঠিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের ইসলাম গ্রহণের খবর জানান এবং সেই সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যে একটি সাদা খচ্চর উপহার হিসাবে প্রেরণ করেন। রোমক সম্রাটের উর্ধতন কর্তারা তাদের নিযুক্ত গর্বনরের ইসলাম গ্রহণের খবরে ক্রুদ্ধ হয়। তারা হযরত ফারাওয়াহকে গ্রেফতার করে পরে ইসলাম ত্যাগ করার নির্দেশ দেয়। অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয়। হযরত ফারওয়াহ ইসলাম ত্যাগ করার চেয়ে শহীদ হওয়া সমীচীন মনে করেন। অতপর ফিলিস্তিনের আফরা নামক জায়গায় একটি ঝর্ণার তীরে শূলীকাষ্ঠে তাঁর মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়।[৪]

(৪) ছাদা প্রতিনিধি দল, অষ্টম হিজরীতে এই প্রতিনিধিদল জেরানা থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফিরে আসার পর তাঁর কাছে হাযির হন। তাঁর আসার কারণ ছিলো এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারশত মুসলমানের একটি বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা যেন ইয়েমেনের সেই এলাকায় গিয়ে অভিযান চালায় যেখানে ছাদা গোত্র বসবাস করে। মুসলিম বাহিনী কানাত প্রান্তরে পৌঁছে তাঁবু স্থাপন করেছিলো, সেই সময় হযরত যিয়াদ ইবনে হারেছ (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছুটে এসে বললেন, আমার পেছনে যারা আসছে আমি তাদের নেতা হিসাবে হাযির হয়েছি কাজেই আপনি মুসলিম বাহিনীকে ফিরিয়ে আনুন। আমার কওমের লোকদের জন্যে আমি যামিন হচ্ছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলিম বাহিনীকে মদীনায় ফিরিয়ে আনলেন। এরপর হযরত যিয়াদ (রা.) তাঁর কওমের কাছে হাযির হয়ে বললেন, আপনারা কয়েকজন আমার সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে চলুন। অতপর সব কথা তাদের খুলে বললেন। হযরত যিয়াদের (রা.) কথা শোনার পর তাঁর কওমের পনের জন লোকের একটি প্রতিনিধিদল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করলেন। এরপর তারা নিজ কওমের কাছে ফিরে গিয়ে দ্বীনের তাবলীগ করলেন এবং ইসলাম প্রচার করলেন। বিদায় হজ্জের সময় এই কওমের একশত জন মুসলমান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হন।

(পাঁচ) কা'ব ইবনে যুহাইর ইবনে আবি সালমার আগমন, কা'ব ছিলো কবি পরিবারের সন্তান এবং আরবের বিশিষ্ট কবি। সে ছিলো কাফের। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কুৎসা রটনা করতো। ইমাম হাকেম -এর বর্ণনা মতে কা'ব সেইসব অপরাধীদের তালিকাভুক্ত ছিলো, যাদের সম্পর্কে মক্কা বিজয়ের সময় নির্দেশ ছিলো যে, যদি তারা কাবাঘরের পর্দা আঁকড়ে ধরা অবস্থায়ও থাকে তবু তাদের হত্যা করতে হবে। কিন্তু কা'ব পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম

৪ যাদুল মায়াদ, তৃতীয় খন্ড, পৃ. ৪৫

হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তায়েফের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর কা'ব এর ভাই বুজাইর ইবনে যুহাইর এক চিঠি লিখলেন যে,নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কুৎসা রটনাকারী কয়েক ব্যক্তিকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সেই নির্দেশ কার্যকর করা হয়েছে। কোরায়শ বংশের স্বল্পসংখ্যক কবি এদিকে সেদিক পালিয়ে প্রাণে বেঁচেছে। যদি জীবনের জন্যে তোমার মায়া থাকে, তবে নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরবারে আসো, কেননা তিনি তওবাকারীদের হত্যা করেন না। যদি আমার এই প্রস্তাব তোমার পছন্দ না হয়, তবে যেখানে নিরাপত্তা পাওয়া যাবে মনে করো সেখানে পালিয়ে যাও। এ চিঠির পর উভয় ভাইয়ের মধ্যে একাধিক পত্র বিনিময় হয়েছে। মোটকথা কা'ব নিজের জীবনাশঙ্কা উপলব্ধি করে মদীনায় এসে পৌঁছুলেন এবং জুহাইনা নামক এক ব্যক্তির মেহমান হলেন। পরদিন সকালে সেই ব্যক্তির সাথে ফজরের নামায আদায় করলেন। নামায শেষে জুহাইনা কা'বকে ইশারায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে চিনিয়ে দিলেন কা'ব তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গিয়ে বসে তাঁর হাতে নিজের হাত রাখলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'বকে চিনেতেন না। কা'ব বললেন, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'ব ইবনে যুহাইর যদি তওবা করে মুসলমান হয়, নিরাপত্তার আবেদন জানায় এবং আমি যদি তাকে আপনার কাছে হাযির করি তবে কি আপনি তাকে গ্রহণ করবেন? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাঁ। কা'ব বললেন, আমিই কা'ব ইবনে যুহাইর। একথা শুনে একজন আনসারী ছুটে এসে কা'বকে ঝাপটে ধরে তাকে হত্যা করতে নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি চাইলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই সাহাবীকে বললেন, ওকে ছেড়ে দাও। সে তওবা করেছে এবং অতীতের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত হয়েছে।

এরপর সে জায়গাতেই কা'ব ইবনে যুহাইর তাঁর বিখ্যাত কাসীদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠ করে শোনান। সেই কাসীদায় কা'ব নিজের অতীতের কৃতকর্মের জন্যে নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা করেন। কবিতার অর্থ নিম্নরূপ।

'ছোয়াদ দূর হয়ে গেছে, কাজেই এখন আমার মনে অস্থিরতা বিদ্যমান। মনের পেছনে শিকল বাঁধা। এর ফিদিয়া দেয়া হয়নি। আমাকে বলা হয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে হুমকি দিয়েছেন। অথচ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে ক্ষমার প্রত্যাশা রয়েছে। আপনি স্থির থাকুন, চোগলখোরদের কথা কানে তুলবেন না। সেই সত্তা আপনাকে পথ প্রদর্শন করুন, যিনি আপনাকে উপদেশপূর্ণ এবং বিস্তারিত বিবরণসম্বলিত কোরআন দিয়েছেন। যদিও আমার সম্পর্কে অনেক কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু আমি অপরাধ করিনি। আমি এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি এবং এমন সব কথা শুনতে পাচ্ছি এবং এমন অবস্থা দেখছি যে, যদি আমার জায়গায় একটা হাতী দাঁড়ানো থাকতো তবে সেই হাতী থমকে দাঁড়াতো। অবশ্য যদি আল্লাহর অনুগ্রহে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমতি হতো সেটা ছিলো ভিন্ন কথা। আমি নিজের হাত অকপটে সেই সম্মানিত ব্যক্তিত্বের হাতে রেখেছি যাঁর প্রতিশোধ গ্রহণের পূর্ণ শক্তি রয়েছে এবং যাঁর কথাই সবার ওপরে। অথচ আমাকে বলা হয়েছে তোমার নামে এরূপ এরূপ নালিশ রয়েছে এবং তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। নিশ্চয়ই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন একটি নূর, যে নূর থেকে আলো পাওয়া যায়। তিনি আল্লাহর তলোয়ারসমূহের মধ্যে একটি তলোয়ার।'

এরপর কা'ব ইবনে যুহাইর কোরায়শ মোহাজেরদের প্রশংসা করেন। কেননা কা'ব-এর আসার পর কোন মোহাজের তাঁকে বিরক্ত করেননি। মোহাজেরদের প্রশংসা করার সময় কা'ব

আনসারদের প্রতি শ্লেষাত্মক মন্তব্য করেন। কেননা একজন আনসার কা'বকে হত্যা করার অনুমতি চেয়েছিলেন। কা'ব তাঁর কবিতায় বললেন, কোরায়শরা সৌন্দর্যমন্ডিত উটের মতো চলাচল করেন এবং ধারালো তলোয়ার তাদেরকে সেই সময় রক্ষা করে, যখন বেটে-খাটো কালো কুৎসিত লোক পথ ছেড়ে পালায়।

কা'ব মুসলমান হওয়ার পর একটি কবিতায় আনসারদের প্রশংসাও করেছিলেন। তিনি সেই কবিতায় লিখলেন, 'যে ব্যক্তি সম্মানজনক জীবন পছন্দ করে, সে যেন সব সময় আনসারদের কোন বাহিনীর মধ্যে থাকে। আনসাররা উত্তরাধিকার সূত্রে সৌন্দর্য লাভ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তারাই ভালো লোক, যারা ভালো লোকের সন্তান।'

(৬) **আজরা প্রতিনিধিদল,** নবম হিজরীতে এই প্রতিনিধিদল মদীনায় আসেন। তারা ১২ জন ছিলেন। এদের মধ্যে হামযা ইবনে নোমানও ছিলেন। পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বললেন, আমরা বনু আজরা, কুসাইদের সাথে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে। আমরা কুসাইদের সাহায্য করেছি এবং খাযাআ বনু বকরকে মক্কা থেকে বের করেছিলাম। এখানে আমাদের আত্মীয়স্বজন রয়েছেন। এই পরিচয় জানার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বাগত জানান এবং সিরিয়া বিজিত হওয়ার সুসংবাদ প্রদান করেন। তাদেরকে জ্যোতিষী মহিলাদের কাছ থেকে কোন তথ্য জানতে নিষেধ করেন। এছাড়া শেরেক করার সময়ে ওরা যে সকল পশু যবাই করে খেতো সেই সব পশু যবাই করতে নিষেধ করেন। এই প্রতিনিধিদল ইসলাম গ্রহণ করেন এবং কয়েকদিন মদীনায় অবস্থানের পর মক্কায় ফিরে যান।

(৭) **বিলি প্রতিনিধিদল,** নবম হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে এই প্রতিনিধিদল মদীনায় আসে এবং ইসলাম গ্রহণের পর তিনদিন অবস্থান করে। এই সময়ে প্রতিনিধিদলের নেতা আবু জাবির জিজ্ঞাসা করেন যে, যেয়াফতের মধ্যে কি সওয়াব রয়েছে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হাঁ। কোন বিত্তবান বা গরীবের সাথে ভালো ব্যবহার করা হলে সেই ব্যবহার সদকা হিসাবে গণ্য করা হবে। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন যে, যেয়াফতের মেয়াদ কতোদিনের হতে হবে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তিনদিন। তিনি বললেন, কোন লোক যদি নিরুদ্দেশ কোন বকরি পায় তখন সেই বকরির ব্যাপারে কি নির্দেশ রয়েছে? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সেই বকরি তোমার, তোমার ভাইদের বা নেকড়ের জন্যে। এরপর সেই লোক হারানো উট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সেই উটের সাথে তোমার কি সম্পর্ক? ওকে ছেড়ে দাও, মালিক তাকে পেয়ে যাবে।

(৮) **সাকীফ প্রতিনিধি দল,** নবম হিজরীর রমযান মাসে এই প্রতিনিধিদল তবুক থেকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রত্যাবর্তনের পর হাযির হন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অষ্টম হিজরীতে যিলকদ মাসে তায়েফ যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময়ে তাঁর মদীনায় পৌঁছার আগেই এই প্রতিনিধিদলের সর্দার ওরওয়া ইবনে মাসউদ নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে দেখা করে ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর তারা নিজ গোত্রে ফিরে গিয়ে লোকদের ইসলামের দাওয়াত দেন। গোত্রের লোকেরা তাকে গভীরভাবে ভালোবাসতো। শোনা যায় তারা নিজ সন্তান এবং পরিবার-পরিজনের চেয়ে ওরওয়াকে বেশী পছন্দ করতো। ওরওয়া ধারণা করেছিলেন যে, তার দেয়া ইসলামের দাওয়াত সবাই গ্রহণ করবে এবং তার কথা মেনে নেবে। কিন্তু তার এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। ইসলামের দাওয়াত দেয়ার পরই তার গোত্রের লোকেরা চারিদিক থেকে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করলো এবং মারাত্মকভাবে যখম করার পর তাকে হত্যা করলো। কয়েক মাস কেটে যাওয়ার পর গোত্রের লোকেরা উপলব্ধি করলো যে, চারিদিকে মুসলমানদের প্রভাব যেভাবে বাড়ছে এতে তাদের নিরাপদ থাকা সম্ভব হবে না।

মুসলমানদের মোকাবেলা করাও তাদের সম্ভব নয়। তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলো যে, নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে একজন লোক পাঠাবে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আবদে ইয়ালিল ইবনে আমরকে মদীনায় যাওয়ার প্রস্তাব দেয়া হলো কিন্তু ওরওয়ার পরিণাম প্রত্যক্ষ করায় আবদে ইয়ালিল মদীনায় যাওয়ার জন্যে শর্ত আরোপ করলেন। তিনি বললেন, আমার সাথে আরো কয়েকজনকে দিতে হবে, আমি একা যেতে রাযি নই। গোত্রের লোকেরা প্রস্তাব অনুযায়ী পাঁচজনকে সঙ্গে দিলেন। অবশেষে ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল মদীনায় রওয়ানা হলেন। এদের মধ্যে ওসমান ইবনে আবুল আস সাকাফী ছিলেন সবচেয়ে বয়োকনিষ্ঠ। এই প্রতিনিধিদল মদীনায় পৌঁছার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে নববীর এক কোণে তাদের থাকতে দিলেন যাতে করে তারা সাহাবাদের কোরআন পাঠ শুনতে পারে এবং নামায আদায় দেখতে পারে। মসজিদে অবস্থানের সময় তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যাওয়া আসা শুরু করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের ইসলামের দাওয়াত দিতে লাগলেন। একদিন তাদের নেতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন, আপনি সাকীফ এবং আপনার মধ্যে এ মর্মে একটি চুক্তিপত্র লিখে দিন যাতে ব্যভিচার, মদপান, সুদ খাওয়া, তাদের মাবুদ লাতকে পূজার অধিকার, নামায থেকে মুক্তি এবং তাদের মূর্তিকে তাদের হাতে না ভাঙ্গার কথা উল্লেখ থাকবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উল্লিখিত শর্তাবলীর একটিও গ্রহণ করলেন না। প্রতিনিধিদল এরপর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মেনে নেয়া ছাড়া তাদের কোন উপায় ছিলো না। তারা তাই করলো এবং ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নিলো। তবে পুনরায় শর্তরোপ করলো যে, তাদের মূর্তি লাতকে তারা নিজের হাতে ভাঙ্গতে পারবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই শর্ত মেনে নিলেন এবং এ মর্মে লিখে দিলেন। তিনি ওসমান ইবনে আবুল আস সাকাফীকে প্রতিনিধি দলের নেতা নিযুক্ত করলেন। কেননা ইসলামের প্রতি তার আগ্রহই ছিলো সবার চাইতে বেশী। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা প্রতিদিন সকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে যেতো কিন্তু ওসমানকে সঙ্গে নিয়ে যেতো না। দুপুরে অন্যরা যখন বিশ্রাম করতো সেই সময় হযরত ওসমান (রা.) নবী করিমের দরবারে যেতেন এবং ইসলাম সম্পর্কে খুঁটিনাটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঘুমে যদি দেখতেন তখন হযরত ওসমান (রা.) দ্বীন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন হযরত আবুবকর (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করতেন। হযরত ওসমানের (রা.) গবর্নর হিসাবে দায়িত্ব পালন ছিলো খুব বকরতপূর্ণ। হযরত আবু বকরের (রা.) খেলাফতের সময় কিছু লোক ধর্মান্তরিত হয়ে যায়, সেই সময় ছকিফ গোত্রের লোকেরাও ধর্মান্তরিত হওয়ার জন্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করে। হযরত ওসমান ইবনে আবুল আস (রা.) সেই নাযুক সময়ে তাদের সম্বোধন করে বললেন, ছাকিফ গোত্রের লোকেরা শোনো, তোমরা সকলের শেষে ইসলাম গ্রহণ করেছ কাজেই সবার আগে মুরতাদ হয়ো না। একথা শুনে ছকিফ গোত্রের লোকেরা ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করা থেকে বিরত থাকে এবং ইসলামের ওপর অবিচল থাকে।

মোটকথা প্রতিনিধিদল নিজ কওমের কাছে ফিরে এসে প্রকৃত সত্য গোপন করে রাখে। তারা দুঃখ ভারাক্রান্তভাবে বলে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি দাবী করেছেন তারা যেন ইসলাম গ্রহণ করে এবং ব্যাভিচার করা, মদ পান করা, সুদ খাওয়া ছেড়ে দেয়। যদি তা না করে তবে তাদের সাথে যুদ্ধ করা হবে। ছকিফ গোত্রের লোক একথা শুনে যুদ্ধ করার কথা দুতিন দিন যাবত চিন্তা ভাবনা করলো। পরে আল্লাহ তায়ালা তাদের অন্তর পরিবর্তন করে দিলেন, তারা ইসলাম গ্রহণের জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করলো। প্রতিনিধিদলকে তারা

বললো যে, তোমরা মদীনায় ফিরে যাও এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলো যে, আমরা তাঁর শর্তাবলী মেনে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করতে রাজি আছি। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা তখন নিজেদের ইসলাম গ্রহণের কথা জানালেন এবং গোত্রের লোকদের ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন। ছকিফ গোত্রের লোকেরা তখনই ইসলাম গ্রহণ করলো।

এদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'লাত' মূর্তি ভাঙ্গার জন্যে হযরত খালেদ ইবনে ওলীদের (রা.) নেতৃত্বে কয়েকজন সাহাবীকে সাকীফ গোত্রে প্রেরণ করলেন। হযরত মুগিরা ইবনে শোবা (রা.) মূর্তি ভাঙ্গার জন্যে লৌহ নির্মিত গদা তুলে সঙ্গীদের বললেন, আমি একটু রসিকতা করে আপনাদের হাসাবো। একথা বলে মূর্তিকে আঘাত করেই তিনি হাঁটু ধরে বসে পড়লেন। কৃত্রিম এ দৃশ্য দেখে তায়েফের সাকীফ গোত্রের লোকেরা প্রভাবিত হলো। তারা বললো, আল্লাহ তায়ালা মুগিরাকে ধ্বংস করুন, 'লাত' দেবী তাকে মেরে ফেলেছে। হযরত মুগিরা (রা.) গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের অমঙ্গল করুন, ওই মূর্তিতো পাথর আর মাটি দিয়ে তৈরী। এরপর হযরত মুগিরা (রা.) দরজায় আঘাত করলেন এবং মূর্তি ভেঙ্গে ফেললেন। হযরত মুগিরা (রা.) এরপর উঁচু দেয়ালে আরোহণ করলেন। কয়েকজন সাহাবীও উঁচু দেয়ালে আরোহণ করলেন। মূর্তি ভেঙ্গে মাটিতে মিশিয়ে দিলেন এরপর মাটি খুঁড়ে মূর্তিকে দেয়া অলঙ্কার এবং পোশাক বের করলেন। এ দৃশ্য দেখে সাকীফ গোত্রের লোকেরা বিস্মিত এবং বিচলিত হলো। হযরত খালেদ (রা.) মূর্তির অলঙ্কার ও পোশাক মদীনায় নিয়ে নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সামনে হাযির করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবকিছু সেইদিনই বন্টন করে আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।[৫]

(৯) সাকীফ ইয়েমেনের বাদশাহদের চিঠি, তবুক থেকে নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে আসার পর ইয়েমেনের বাদশাহরা চিঠি লিখলেন। হারেস ইবনে আবদে কালাল, নঈম ইবনে আবদে কালাল, রাঈন এবং হামদান ও মাআফেরএর শাসনকর্তা নোমান ইবনে কাইলের চিঠি এলো। সকলের পক্ষ থেকে মালেক ইবনে মাররা পত্র প্রেরণ করেন। এ সকল বাদশাহ ইসলাম গ্রহণ এবং শেরেক ও কুফুরী পরিত্যাগের কথা উল্লেখ করে পত্র প্রেরণ করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি জবাব পাঠিয়ে ইয়েমেনবাসীদের অধিকার এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য উল্লেখ করেন। যারা ইসলাম গ্রহণ করবে আল্লাহ তায়ালা এবং তার রসূল তাদের যিম্মাদার হবেন বলেও তিনি পত্রে উল্লেখ করেন। তবে শর্ত এই যে, তাদেরকে জিজিয়া পরিশোধ করতে হবে। এছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মায়া'য ইবনে জাবালের (রা.) নেতৃত্বে কয়েকজন সাহাবাকে ইয়েমেনে প্রেরণ করেন।

(১০) হামদান প্রতিনিধিদল, এই প্রতিনিধিদল তবুক থেকে নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে আসার পর তাঁর খেদমতে হাযির হন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিনিধি দলের কওমের জন্যে একটি নির্দেশ সম্বলিত পত্র লিখে তারা যা কিছু চেয়েছিলো তা প্রদান করেন। মালেক ইবনে নামতকে আমীর নিযুক্ত করা হয় এবং তাকে তার কওমের ইসলাম গ্রহণকারীদের গবর্নর নিযুক্ত করা হয়। অন্য লোকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্যে হযরত খালেদ ইবনে ওলীদকে (রা.) প্রেরণ করেন। তিনি ছয়মাস হামদানে অবস্থান করে ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর হযরত আলীকে (রা.) হামদানে প্রেরণ করেন এবং হযরত খালেদকে (রা.) ফেরত পাঠাতে বলে দেন। হযরত আলী (রা.) হামদান গোত্রের লোকদের কাছে

৫. যাদউল মায়াদ, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৬, ২৭, ২৮। ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৭

গিয়ে রসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিঠি পড়ে শোনান এবং ইসলামের দাওয়াত দেন। এতে সবাই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে। হযরত আলী (রা.) রসূল (রা.)-এর দরবারে এই খবর পাঠিয়ে দেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সুসংবাদ সম্বলিত চিঠি পড়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়েন এবং বলেন হামদানের উপর সালাম, হামদানের উপর সালাম।

(১১) বনি ফাজারা প্রতিনিধিদল, নবম হিজরীতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তবুক থেকে ফেরার পর এই প্রতিনিধিদল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দেখা করে। এই প্রতিনিধিদলে দশজন অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তারা তাদের এলাকায় দুর্ভিক্ষের ব্যাপারে অভিযোগ করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরে উঠে উভয় হাত উপরে তুলে মোনাজাত করেন যে, হে আল্লাহ তায়ালা নিজের সৃষ্ট যমিন এবং চতুষ্পদ প্রাণীদের পরিতৃপ্ত করো। তোমার রহমত প্রসারিত করো। তোমার মৃত শহরকে জীবিত করো। হে আল্লাহ তায়ালা, আমাদের ওপর এমন বৃষ্টি বর্ষণ করো, যে বৃষ্টি আমাদের কাম্য। সেই বৃষ্টি দ্বারা আমাদের শান্তি দান করো আরাম দান করো। প্রসারিত কালোমেঘ যেন তাড়াতাড়ি আসে—দেরী না করে। সেই বৃষ্টি যেন কল্যাণকর হয়, ক্ষতিকর না হয়। হে আল্লাহ তায়ালা, রহমতের বৃষ্টি– যেন আযাবের বৃষ্টি না হয়। ধ্বংসকর যেন না হয়। হে আল্লাহ তায়ালা, আমাদেরকে বৃষ্টি দ্বারা পরিতৃপ্ত করো এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো।[৬]

(১২) নাজরান প্রতিনিধিদল, মক্কা থেকে ইয়েমেনে যাওয়ার পথে এই এলাকার অধিবাসীরা বসবাস করে। ৭৩টি জনপদ অর্থাৎ বসতি নিয়ে এই নাজরান সম্প্রদায়। একজন দ্রুতগামী ঘোড়া সওয়ার পুরো একদিন সময়ে সমগ্র জনপদ প্রদক্ষিণ করতে পারে।[৭] এই এলাকায় একলাখ যোদ্ধা পুরুষ ছিলো। এরা সবাই ছিলো খৃষ্টান ধর্মের অনুসারী।

নাজরান প্রতিনিধিদলও নবম হিজরীতে আসে। এতে ষাট ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিলো। এদের মধ্যে চব্বিশজন ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর। তিনজন ছিলেন নাজরানবাসীদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা। আবদুল মসীহ নামে এক ব্যক্তি সরকার প্রধান, শারহাবিল নামে এক ব্যক্তি রাজনীতি বিষয়ক উপদেষ্টা এবং আবু হারেসা ইবনে আলকামা নামে এক ব্যক্তি ধর্মীয় বিষয়ের নেতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করতেন।

প্রতিনিধিদল মদীনায় পৌঁছে নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে সাক্ষাৎ করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তারাও নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। এরপর নবী সঃ) তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং কোরআন পাঠ করে শোনান। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণ করেনি।

তারা জিজ্ঞাসা করলো, আপনি মসীহ (আ.) সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করেন? তার সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিন এই প্রশ্নের জবাব দিলেন না। আল্লাহ রব্বুল আলামীন ওহী নাযিল করলেন।

'অর্থাৎ আল্লাহর কাছে ঈসা (আ.)-এর দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন অত:পর তাকে বলেছিলেন হও, ফলে সে হয়ে গেলো। এই সত্য তোমার প্রতিপালকের কাছে হতে সুতরাং সংশয়বাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। তোমার কাছে জ্ঞান আসবার পর যে কেউ এ বিষয়ে তোমার সাথে তর্ক করে তাকে বল, এসো আমরা আহ্বান করি আমাদের

---

[৬]. যাদু-উল মা'দ, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৪০
[৭]. ফতহুল বারী, অষ্টম খন্ড, পৃষ্ঠা ৯৪

পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের, আমাদের নারীদের এবং তোমাদের নারীদের, আমাদের নিজেদের এবং তোমাদের নিজদের। অতপর আমরা বিনীত আবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের উপর দেই আল্লাহর লানত।' (সূরা আলে এমরান, আয়াত ৫৯-৬০,৬১)।

সকাল বেলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লিখিত আয়াতে কারিমার আলোকে আগন্তুকদের হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে অবহিত করলেন। অতপর এ ব্যাপারে সারাদিন চিন্তা-ভাবনা করতে বললেন। কিন্তু তারা হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বক্তব্য মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানালো। তারা তাদের এ অস্বীকৃতির ওপর অটল থাকলো। পরদিন সকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওদেরকে মোবাহালার অর্থাৎ দুই পক্ষের পরস্পরের জন্যে বদদোয়ার প্রস্তাব জানালেন। এই আহ্বান জানানোর পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত হাসান হোসেন (রা.) সহ একটি চাদর গায়ে জড়িয়ে আগমন করলেন। হযরত ফাতেমা (রা.) তাদের পেছনে ছিলেন। প্রতিনিধিদল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মোবাহালার জন্যে প্রস্তুত দেখে নিভৃতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করলো। নিজেদের মধ্যে পরামর্শের একপর্যায়ে এক পক্ষ বললো, মোবাহালার ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না। আল্লাহর শপথ এই হচ্ছেন নবী। যদি আমরা তাঁর সাথে মোবাহালা করি তবে আমরা এবং আমাদের সন্তানরা কিছুতেই সফল হতে পারবে না। আমরা সবংশে নির্মূল হয়ে যাব। পরামর্শক্রমে তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজেদের ব্যাপারে সালিস মানলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে গিয়ে তারা বললো, আপনার দাবী মেনে নিতে আমরা প্রস্তুত রয়েছি। এ প্রস্তাবের পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ করতে রাযি হলেন। দু'হাজার জোড়া কাপড়ের ওপর সমঝোতা হলো। এক হাজার জোড়া রজব মাসে এবং অন্য এক হাজার সফর মাসে তারা দিতে রাযি হলো। এছাড়া প্রতি জোড়া কাপড়ের সাথে এক উকিয়া অর্থাৎ ১৫২ গ্রাম রূপা দিতেও সম্মত হলো। এর বিনিময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে আল্লাহতায়ালা এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যিম্মায় গ্রহণ করলেন। ধর্মীয় ব্যাপারে তারা ছিলো স্বাধীন। উল্লিখিত বিষয়ে তাদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি চুক্তি সম্পাদন করলেন। প্রতিনিধিদল দাবী করলো যে, তাদের সাথে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে যেন প্রেরণ করা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুক্তি অনুযায়ী মালামাল সংগ্রহের জন্যে বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু ওবায়দা ইবনে জাররাহকে প্রেরণ করলেন।

অতপর নাজরান গোত্রে ইসলামের বিস্তার ঘটতে থাকে। সীরাত রচয়িতারা লিখেছেন প্রতিনিধিদলের নেতা এবং তার অনুসারীরা নাজরান যাওয়ার পর ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করলো। অতপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদাকাত এবং জিযিয়া গ্রহণ করতে হযরত আলীকে (রা.) প্রেরণ করেন। উল্লেখ্য যে, সাদাকা মুসলমানদের থেকেই উসুল করা হয়।[৮]

---

৮. ফতহুল বারী, অষ্টম খন্ড, পৃষ্ঠা, ৯৪-৯৫। যাদুল মায়াদ, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৮ থেকে ৪১। নাজরান প্রতিনিধিদলের বিস্তারিত বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, নাজরান প্রতিনিধিদল এ দ্বিতীয়বার মদীনায় গমন করেন কেউ কেউ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেননি।

(১৩) বনি হানিফা প্রতিনিধিদল, এ প্রতিনিধিদল নবম হিজরীতে মদীনায় আগমন করে। এতে মোসায়লামা কাযযাবসহ সতের ব্যক্তি ছিলেন।[৯] মোসায়লামার বংশধারা এরূপর মোসায়লামা ইবনে ছামামা ইবনে কারিব ইবনে হাবিব ইবনে হারেস।

এ প্রতিনিধিদল একজন আনসার সাহাবীর বাসভবনে গিয়ে ওঠেন। অতপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। তবে মোসায়লামা কাযযাব সম্পর্কে ভিন্ন কথা জানা যায়। সকল বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় মোসায়লামা হঠকারিতা ও অহংকার এবং ক্ষমতা পাওয়ার লোভ প্রকাশ করে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যদের সাথে সে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হয়নি। পরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে গেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে শান্ত মধুর স্বরে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু লক্ষ্য করলেন যে, তার মধুর ব্যবহারে কোন শুভ প্রতিক্রিয়াই দেখা যাচ্ছে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বুঝতে পারলেন যে, এ লোকটির কোন কল্যাণ হবে না। তার মনের ভেতর পঙ্কিলতা ও কালিমা রয়েছে।

এর আগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক রাতে স্বপ্নে দেখেন যে, সমগ্র বিশ্বের ধনভান্ডার তার দরবারে এনে রাখা হয়েছে। হঠাৎ সে ধন ভান্ডার থেকে দুটি সোনার কাঁকন তার হাতে উড়ে এসে পড়লো। কাঁকন দু'খানি ছিলো বেশ ভারি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিব্রত বোধ করছিলেন। এসময় হযরত জিবরাঈলের (আ.) মাধ্যমে ওহী এলো যে. কাঁকন দুখানিতে ফুঁ দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফুঁ দিলেন। সাথে সাথে কাঁকন দু'খানি উড়ে চলে গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন যে, তার পরে দুজন লোক নবুয়তের মিথ্যা দাবীদার হবে। মোসায়লামা কাযযাবের দুর্বিনীত ব্যবহার দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরক্ত হলেন। সে দুর্বৃত্ত বলছিলো, মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি শাসন ক্ষমতা তার পরবর্তী সময়ে আমাকে ন্যস্ত করেন তবে আমি তার আনুগত্য করতে প্রস্তুত রয়েছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মোসায়লামার কাছে গেলেন। সে সময় তার হাতে একটি খেজুর গাছের শাখা ছিলো এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখপাত্র হযরত ছাবেত ইবনে কয়েস ইবনে শামাস (রা.) তার সাথে ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার শিয়রের কাছে গিয়ে হাযির হলেন। মোসায়লামা বললো, যদি আপনি রাজি থাকেন, তবে শাসনক্ষমতার ব্যাপারে আমি আপনাকে ছাড় দিতে রাজি আছি। কিন্তু ক্ষমতার ব্যাপারে আপনার উত্তরাধিকারী আমাকে মনোনীত করতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতের খেজুর শাখার প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, যদি তুমি আমার কাছে এটি চাও এটিও আমি তোমাকে দেবো না, তোমার ব্যাপারে আল্লাহর যে ফয়সালা রয়েছে তুমি তার বাইরে যেতে পারবে না। যদি তুমি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যাও তবে আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ধ্বংস করে দেবেন। আল্লাহর শপথ, আমার মনে হয় তুমিই সেই ব্যক্তি যার ব্যাপারে আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে। ছাবেত ইবনে কয়েস এখানে রইলো সে তোমাকে আমার পক্ষ থেকে জবাব দেবে। একথা বলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিরে এলেন।[১০]

---

৯. ফতহুল বারী, অষ্টম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৭
১০. সহীহ বোখারী, বনি হানিফা এবং আসওাদ আনাসির কিসসা বিষয়ক অধ্যায়। দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬২৭, ৬২৮ এবং ফতহুল বারী অষ্টম খন্ড পৃষ্ঠা ৮৭ থেকে ৯৩

অবশেষে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথাই সত্য প্রমাণিত হলো। মোসায়লামা কাযয়াব ইয়ামামা ফিরে গিয়ে প্রথমে কয়েকদিন নিজের সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করলো। তারপর হঠাৎ দাবী করলো যে, নবুয়তের ক্ষেত্রে মোহাম্মদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে তাকেও অংশীদার করা হয়েছে। অতপর সে প্রকাশ্যে নবুয়তের দাবী প্রচার করতে লাগলো। স্বজাতির লোকদের জন্যে সে ব্যভিচার এবং মদ্যপান বৈধ বলে প্রচার করলো।

মোসায়লামা কাযয়াব দশম হিজরীতে নবুয়ত দাবী করেছিলো। দ্বাদশ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা.) খেলাফতের সময়ে ইয়ামামায় সে নিহত হয়। হযরত হামযার (রা.) হত্যাকারী হযরত ওয়াহশী (রা.) মোসায়লামা কাযয়াবকে হত্যা করেন।

নবুয়তের একজন দাবীদারের পরিণাম জানা গেলো। অন্য একজন দাবীদার আসওয়াদ আনাসী ইয়েমেনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রেখেছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের একরাত একদিন আগে হযরত ফিরোজ (রা.) এই ভন্ড নবীকে হত্যা করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহীর মাধ্যমে এ হত্যাকান্ডের খবর জেনে সাহাবাদের তা জানিয়ে দেন। এরপর ইয়েমেন থেকে হযরত আবু বকরের (রা.) কাছে যথারীতি খবর এসে পৌঁছায়।[১৩]

(১৪) বনি আমের ইবনে সা'সাআ প্রতিনিধিদল, এই প্রতিনিধিদলে আল্লাহর দুশমন আমের ইবনে তোফায়েল হযরত লাবিদের বৈমাত্রেয় ভাই আরবাদ ইবনে কয়েস, খালেদ ইবনে জাফর এবং জব্বার ইবনে আসলাম অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এরা নিজ নিজ গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং শয়তান স্বভাব সম্পন্ন ছিলো। আমের ইবনে তোফায়েল নামক এক ব্যক্তি বে'র মাউনায় সত্তরজন সাহাবীকে শহীদ করিয়েছিলো। এই প্রতিনিধিদল মদীনা আসার ইচ্ছা করার সময়ে আমের ইবনে তোফায়েল এবং আরবাদ ষড়যন্ত্র করেছিলো যে, তারা ধোঁকা দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আকস্মিকভাবে হত্যা করবে।

এ প্রতিনিধিদল মীনায় পৌঁছার পর আমের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আলাপ করছিলো। এ সময়ে আরবাদ ঘুরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেছনে গেলো এবং তলোয়ার বের করতে লাগলো। কিন্তু তলোয়ার এক বিঘতের বেশী বের করতে সক্ষম হলো না, আল্লাহ তায়ালা তার হাত অসাড় করে দিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবীকে হেফাযত করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উভয় দুর্বৃত্তের জন্যে বদদোয়া করলেন। ফলে ফেরার পথে আরবাদের উপর বজ্রপাত হলো। সাথে সাথে উটসহ এই কাফের মৃত্যুবরণ করলো এদিকে আমের একজন সেলুলিয়া মহিলার ঘরে আশ্রয় নিলো। সেখানে তার ঘাড়ে গলগন্ড রোগ দেখা দিলো। এ রোগেই সেখানে তার মৃত্যু হলো। মৃত্যুর সময় আমের বলছিলো হায় উটের ঘাড়ের মতো গলগন্ড রোগ আর সেলুলিয়া মহিলার ঘরে মৃত্যুবরণ?

সহীহ বোখারীর রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে আমের বললো, আপনাকে আমি তিনটি শর্ত দিচ্ছি, এর যে কোন একটি মেনে নিন। (১) উপত্যকার অধিবাসীরা আপনার উৎপন্ন দ্রব্য আমার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। (২) আমি আপনার পরে খলীফা হবো। (৩) বনি গাতফান গোত্রের এক হাজার নর এবং এক হাজার মাদী ঘোড়াসহ আপনার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবো

১৩ ফতহুল বারী অষ্টম খন্ড পৃষ্ঠা [illegible]

অতপর সে এক মহিলার ঘরে প্লেগ রোগে আক্রান্ত হলো। সে সময় গভীর হতাশায় দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে সে বললো, হায় উটের উঁচু ঘাড়ের মতো গলগন্ড রোগ। তাও অমুক গোত্রের মহিলার ঘরে? তারপর বললো, আমার কাছে আমার ঘোড়া নিয়ে এসো। ঘোড়া নিয়ে আসা হলো। ঘোড়ার পিঠে অতপর আল্লাহর এ দুশমন মৃত্যুবরণ করলো।

(১৫) তাজিব প্রতিনিধিদল, এই প্রতিনিধিদল নিজেদের গোত্রের গরীব লোকদের মধ্যে বন্টনের পর অবশিষ্ট সাদাকা নিয়ে মদীনায় হাযির হলো। এ প্রতিনিধিদলে মোট তেরো ব্যক্তি ছিলেন। এরা কোরআন সুন্নাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন এবং শিক্ষা করতেন। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কিছু কথা জিজ্ঞাসা করলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেসব কথা তাদের লিখে দিলেন। এরা বেশীদিন মদীনায় অবস্থান করেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিনিধি দলের সদস্যদের কিছু জিনিস উপঢৌকন হিসাবে প্রদান করেন। যাওয়ার পর ওরা পেছনে পড়ে থাকা একজন সঙ্গী যুবককে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রেরণ করলো। যুবক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে বললো, হুজুর আল্লাহর শপথ, আমি নিজের এলাকা থেকে অন্য কোন উদ্দেশ্যে আসিনি, শুধু এ উদ্দেশ্যে এসেছি যে, আপনি আমার জন্যে সর্বশক্তিমান পরম করুণাময় আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তিনি যেন আমাকে রহমত এবং তাঁর দ্বীনের উপর অবিচল থাকার শক্তি দান করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবকের জন্যে দোয়া করলেন। পরবর্তীকালে বহু নও মুসলিম ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলেও এ যুবক ইসলামের ওপর ছিলো অটল অবিচল। নিজ কওমের লোকদের কাছে সে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে ওয়ায নসিহত করলো। ফলে তার কওমের লোকেরাও ইসলামের ওপর অবিচল থাকলো। দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সময় এই প্রতিনিধিদল পুনরায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করলো।

(১৬) তাঈ প্রতিনিধিদল, এই প্রতিনিধিদলে আরবের বিখ্যাত বীর যায়েদ আল-খায়েলও ছিলেন। এরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আলোচনায় মিলিত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা ইসলাম গ্রহণ করে খুব ভালো মুসলমান হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যায়েদ আল খায়েল এর প্রশংসা করলেন। তিনি বললেন, আরববের যে কোন লোকের প্রশংসাই আমার কাছে করা হয়েছে, তারা আমার সামনে আসার পর বাস্তবে আমি তাদের খ্যাতির চেয়ে কমই পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু যায়েদ তার ব্যতিক্রম। তার গুণ বৈশিষ্ট্য তার খ্যাতির চেয়ে অধিক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নামকরণ করলেন যায়েদ আল খায়ের।

একই নিয়মে নবম এবং দশম হিজরীতে বহুসংখ্যক প্রতিনিধিদল মদীনায় আগমন করে। সীরাত রচয়িতারা ইয়ামান, আযাদ, কোযাআর বনু সা'দ, হোযাইম বনু আমের ইবনে কয়েস, বনু আসাদ, বাহরা, খাওলান, মাহারেব, বনু হারেস ইবনে কা'ব, গামেদ, বনু মোনতাফেক, সালমান,বনি আবাস, মাজিনা, মোরাদ, জোবায়েদ, কুন্দাহ, জি-মাররাহ, গাস্‌সান, বু আয়েশ এবং নাখ প্রতিনিধিদলের কথা উল্লেখ করেছেন। নাখ-এর প্রতিনিধিদল এসেছিলো সর্বশেষে। একাদশ হিজরীর মহররম মাসে এ প্রতিনিধিদল মদীনায় আসে

এতে দু'শো ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অন্য প্রায় সকল প্রতিনিধিদল নবম এবং দশম হিজরীতে আগমন করেন। অল্প কয়েকটি প্রতিনিধি দল একাদশ হিজরীতে আগমন করে।

উল্লিখিত প্রতিনিধিদলসমূহের মদীনায় আগমনের ঘটনায় স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের প্রচার প্রসার কতোটা হয়েছিলো। এছাড়া এটাও বোঝা যায় যে, আরবের জনগণের দৃষ্টিতে মদীনার গুরুত্ব ছিলো কতো বেশী। মদীনায় গিয়ে আত্মসমর্পন ব্যতীত তারা অন্য কোন উপায় দেখতে পায়নি। প্রকৃতপক্ষে মদীনা জাযিরাতুল আরবের রাজধানীর মর্যাদা লাভ করেছিলো। মদীনাকে উপেক্ষা করা কারো পক্ষেই সম্ভব ছিলো না। তবে, আমরা এমন কথা বলতে পারব না যে, আগন্তুকদের সকলের মনেই ইসলামের প্রভাব পড়েছিলো এবং বিশেষভাবে রেখাপাত করেছিলো। কেননা উল্লিখিত প্রতিনিধিদলসমূহের সদস্যদের মধ্যে বহু আরব বেদুইন এমনও ছিলো যারা নিজেদের গোত্র সর্দারের আনুগত্য করতে মুসলমান হয়েছিলো। হত্যা, লুটতরাজ ইত্যাদি অভ্যাস তারা তখনো পুরোপুরি ত্যাগ করতে সক্ষম হয়নি। এবং ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্যের কারণে তারা সভ্য মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতেও পারেনি। সূরা তওবায় এ ধরনের লোকদের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'কুফুরী ও কপটতায় মক্কাবাসীরা কঠোরতর এবং আল্লাহ তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন, তার সীমারেখা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার যোগ্যতা এদের অধিক। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। মরুবাসীদের কেউ কেউ যা তারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে তা অর্থদন্ড বলে গণ্য করে এবং তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের প্রতীক্ষা করে। মন্দ ভাগ্যচক্র ওদেরই হোক। আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ।'

তবে কিছুসংখ্যক লোকের প্রশংসাও করা হয়েছে। সূরা তওবায় আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'মরুবাসীদের কেউ কেউ আল্লাহর প্রতি এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে এবং যা ব্যয় করে তাকে আল্লাহর সান্নিধ্য ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোয়া লাভের উপায় মনে করে। বাস্তবিকই তা আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপায়। আল্লাহ তাদেরকে নিজ রহমতে দাখিল করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

মক্কা, মদীনা, ছাকিফ, ইয়েমেন এবং বাহরাইনের বহু নাগরিকের অন্তকরণে ইসলাম দৃঢ়ভাবে গেঁথে গিয়েছিলো। তাঁদের অনেকেই ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবা এবং পুণ্যশীল মুসলমান।[১৪]

---

১৪. খাযরামি তাঁর মোহাযেরাত গ্রন্থের প্রথম খন্ডের ১৪৪ পৃষ্ঠায় একথা লিখেছেন। যেসব প্রতিনিধি দলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং যেসব প্রতিনিধিদল সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, সেসব সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন সহীহ বোখারী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১২ দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬২৬ থেকে ৬৩০। ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড পৃষ্ঠা ৫০১ থেকে ৫০৩। ৫৩৭ থেকে ৫৪২, ৫৬০ থেকে ৬০১। যাদুল মায়াদ তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৬ থেকে ৬০। ফতহুল বারী, অষ্টম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৩ থেকে ১০৩। রহমতুল লিল আলামীন প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৪ থেকে ২১৭

রসূলের দাওয়াতের ব্যাপক সফলতা

এবার আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবনের শেষ দিক সম্পর্কে আলোচনা করবো। কিন্তু সেদিকে অগ্রসর হওয়ার আগে নবী জীবনের অনন্য সাধারণ কার্যাবলীর প্রতি একটুখানি আলোকপাত করা দরকার। মূলত সেটাই হচ্ছে নবী জীবনের সারকথা। সেই বৈশিষ্টের কারণেই তিনি সকল নবী-পয়গাম্বরের মধ্যে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আল্লাহ রব্বুল আলামীন তাঁকে সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ এর অনন্য মর্যাদার মুকুট দান করেছেন। নবীকে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 'হে বস্ত্রাবৃত, রাত্রি জাগরণ কর, কিছু অংশ ব্যতীত'। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, 'হে বস্ত্রাচ্ছাদিত, উঠ, সতর্ক বাণী প্রচার কর।'

এরপর কি হয়েছে? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উঠলেন, নিজ কাঁধে বিশ্বজগতের সবচেয়ে বড় আমানতের বোঝা তুলে নিলেন এবং একাধারে দাঁড়িয়ে রইলেন। সমগ্র মানবতার বোঝা সকল আকিদার বোঝা এবং বিভিন্ন ময়দানে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার বোঝা।

তিনি মানুষের বিবেকের ময়দানে জেহাদের দায়িত্ব তুলে দিয়েছেন এসব বিবেক ছিলো অজ্ঞতার যুগের কল্পনা এবং নানাবিধ উদ্ভট ধারণায় নিমজ্জিত।

মানুষের বিবেক সে সময় পৃথিবীর নানা আকর্ষণীয় বস্তুর কারণে আচ্ছাদিত হয়ে পড়েছিলো। মানুষের বিবেক খাহেশাতে নফসানীর শেকল ও ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কতিপয় নিবেদিত প্রাণ সাহাবার সহযোগিতায় জাহেলিয়াত এবং বিশ্বজগতের আকর্ষণ থেকে মানুষের বিবেককে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন করার পর অন্য একটি সংগ্রাম শুরু করলেন। বরং একটির পর আরকেটি সংগ্রাম শুরু হলো। অর্থাৎ দাওয়াতে এলাহীর সেসব শত্রু যারা দাওয়াত এবং তার প্রতি বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে প্রচন্ড আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, দাওয়াতের পবিত্র চারাগাছকে মাটির নিচে শেকড় বিস্তারের আগে শূন্যে শাখা প্রশাখা বিস্তারের এবং ফলে ফুলে সুশোভিত হবার আগেই নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাচ্ছিলো। দাওয়াতের এ সকল শত্রুর সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংগ্রাম শুরু করলেন। জাযিরাতুল আরবের বিভিন্ন প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে না উঠতেই রোমক সাম্রাজ্য এ নয়া জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে সীমান্তে প্রস্তুতি শুরু করে।

অবশেষে সকল সংগ্রাম শেষ হলো কিন্তু বিবেকের সংগ্রাম সংঘাত শেষ হয়নি। কারণ এটি হচ্ছে চিরস্থায়ী সংঘাতের বিষয়। এতে শয়তানের সাথে মোকাবেলা করতে হয়। শয়তান মানব মনের গভীরে প্রবেশ করে তার তৎপরতা অব্যাহত রাখে এবং মুহূর্তের জন্যেও তা বন্ধ করে না। মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত থেকে বিভিন্ন

ময়দানে যথোচিত সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। দুনিয়া তাঁর চরণে এসে লুটিয়ে পড়েছিলো কিন্তু তিনি দুঃখকষ্ট এবং দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছিলেন। ঈমানদাররা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চারিপাশে শান্তি ও নিরাপত্তার ছায়া বিস্তার করে রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি দুঃখ দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের পথে সাধনা অব্যাহত রাখেন। যে কোন অবস্থায় দুঃখকষ্টের মধ্যে তিনি অভূতপূর্ব ধৈর্যধারণ করছিলেন। রাত্রিকালে তিনি নামাযে দাঁড়াতেন। প্রিয় প্রতিপালকের এবাদাত এবং পবিত্র কোরআন ধীরে ধীরে তেলাওয়াত করতেন। সমগ্র বিশ্ব থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহর প্রতি তিনি মনোযোগী হয়ে উঠেছিলেন। অবশ্য তাঁকে এ রকম করতে নির্দেশও প্রদান করা হয়েছিলো।[১]

এমনিভাবে সুদীর্ঘ বিশ বছরের বেশী সময় যাবত রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সংগ্রাম চালিয়ে যান। এই সময়ের মধ্যে একটি কাজে আত্মনিয়োগ করে অন্য কাজ তিনি ভুলে থাকেননি। পরিশেষে ইসলামী দাওয়াত এমন ব্যাপক সাফল্য লাভ করলো যে, সবাইকে অবাক হতে হলো। সমগ্র জাযিরাতুল আরব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুগত হলো। আরবের দিগন্ত থেকে জাহেলিয়াতের মেঘ কেটে গেলো। অসুস্থ বিবেকসমূহ সুস্থ হয়ে গেলো। এমনকি মূর্তিসমূহকে তারা ছেড়ে দিল বরং ভেঙ্গে ফেলল। তওহীদের আওয়াযে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো। ঈমানের তেজে নতুন জীবনীশক্তি লাভ করে মরু বিয়াবান আযানের সুমধুর ধ্বনিতে প্রকম্পিত হলো। দিক দিগন্তে আল্লাহু আকবর ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হলো। কোরআনের ক্বারীরা পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করতেন এবং আল্লাহর হুকুম আহকাম কায়েম করতে উত্তর দক্ষিণে ছড়িয়ে পড়লেন।

বিচ্ছিন্ন গোত্রসমূহ একত্রিত হলো, মানুষ মানুষের দাসত্ব ছেড়ে আল্লাহর দাসত্বে আত্মনিয়োগ করলো। এখন আর কেউ শোষক নয়, কেউ শোষিত নয়, কারো রক্তচক্ষু কাউকে এখন আর ভীতসন্ত্রস্ত করে না, কেউ যালেম নয়, কেউ মযলুম নয়, কেউ মালিক নয়, কেউ গোলাম নয়, কেউ শাসক নয়, কেউ শাসিত নয় বরং সকল মানুষ আল্লাহর বান্দা এবং পরস্পর ভাই ভাই। তারা একে অন্যকে ভালোবাসে এবং আল্লাহর হুকুম আহকাম পালন করে। আল্লাহ তায়ালা তাদের মধ্য থেকে জাহেলিয়াতের সময়ের গর্ব অহঙ্কার এবং পিতা পিতামহের নামে আত্মম্ভরিতার অবসান ঘটালেন। এখন আর অনারবদের ওপর আরবদের এবং কৃষ্ণাঙ্গদের ওপর শ্বেতাঙ্গদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। এখানে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া। অন্যথায় সকল মানুষ আদমের সন্তান। আর আদম হচ্ছে মাটির তৈরী।

মোটকথা এই দাওয়াতের ফলে আরব ঐক্য মানবীয় ঐক্য সম্মিলিত ন্যায়নীতি ও সুবিচার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলো। মানব জাতি দুনিয়ার বিভিন্ন সমস্যা এবং আখেরাতের বিভিন্ন কাজে সৌভাগ্যের পথের সন্ধান পেলো। অন্য কথায় ইতিহাসের ধারাই পাল্টে গেলো।

এই দাওয়াতের আগে পৃথিবীতে জাহেলিয়াতের জয়-জয়াকার চলছিলো। মানুষের বিবেক অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। আত্মা দুর্গন্ধময় হয়ে পড়েছিলো। মূল্যবোধে চরম অবক্ষয় ঘটেছিলো।

---

১. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, তাফসীর ফি যিলালিল কোরআন, উনত্রিশতম খন্ড পৃষ্ঠা ১৬৮, ১৬৯

অত্যাচার এবং দাসত্বের প্রবল প্রতাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। উচ্ছৃঙ্খলতাপূর্ণ এবং লজ্জাকর সাচ্ছন্দ্য এবং ধ্বংসাত্মক বঞ্চনার ঢেউ বিশ্বকে অবনতির অতলে পৌঁছে দিয়েছিলো। এর ওপর কুফুরী এবং পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে মোটা পর্দা হয়ে পড়ে গিয়েছিলো। অথচ সে সময়ও আসমানী মাযহাব এবং ধর্ম বিশ্বাস বিদ্যমান ছিলো। কিন্তু মানুষ সেসবকে বিকৃত করে দিয়েছিলো। ফলে ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দূর্বলতা চরমে পৌঁছে গিয়েছিলো। ধর্মের বন্ধন ছিলো শিথিল। ধর্ম হয়ে পড়েছিলো প্রাণহীন দেহের মতো দূর্বল এবং অল্পকিছু আচার অনুষ্ঠানসর্বস্ব।

উল্লিখিত দাওয়াত যখন মানব জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করলো, তখন মানবাত্মা অলীক ধ্যান-ধারণা, প্রবৃত্তির দাসত্ব নোংরামি, অন্যায়, অত্যাচার, নৈরাজ্য এবং অরাজকতা থেকে মুক্তি লাভ করলো। মানব সমাজকে যুলুম, অত্যাচার, হঠকারিতা, ঔদ্ধত্য, ধ্বংস, শ্রেণী বৈষম্য, শাসকদের অত্যাচার, জ্যোতিষীদের অবমাননাকর ও স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্তি দান করলো। বিশ্ব তখন দয়া, ক্ষমা, বিনয়, নম্রতা, আবিষ্কার, নির্মাণ, স্বাধীনতা, সংস্কার, মারেফাত, ঈমান, ন্যায়পরায়ণতা, সুবিচার এবং আমলের ভিত্তিতে জীবনের উন্নতি ও অগ্রগতি এবং হকদারের অধিকার লাভের নিশ্চয়তার কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হলো।[২]

এসকল পরিবর্তনের কারণে জাযিরাতুল আরব এমন একটি বরকতপূর্ণ জনবসতিতে পরিণত হলো যার উদাহরণ মানব ইতিহাসের কোন যুগে অথবা কোন দেশে দেখা যায়নি এবং যাবেও না। জাযিরাতুল আরব তার ইতিহাসে এমন জৌলুসপূর্ণ এবং ঝলমলে হয়ে উঠলো যে, এর আগে কখনোই, কোথাও ওরকম দেখা যায়নি।

২. সাইয়েদ কুতুব শহীদ, তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪

বিদায় হজ্জ

দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ পূর্ণ হয়েছে। আল্লাহর রবুবিয়ত এবং অন্য সকল মতাদর্শের বিলোপ সাধন করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রেসালাতের ভিত্তিতে একটি নতুন সমাজ গঠন করা হয়েছে। এরপর যেন এর অদৃশ্য ঘোষক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিন্তা ও চেতনায় এ ধারণা বদ্ধমূল করেছিলো যে, পৃথিবীতে তাঁর অবস্থানের মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত মায়া'য (রা.)-কে ইয়েমেনের গবর্নর নিযুক্ত করে প্রেরণ করার সময় অন্যান্য প্রয়োজনীয় কথার পর বললেন, হে মায়া'য সম্ভবত এই বছরের পর আমার সাথে তোমার আর সাক্ষাৎ হবে না। হয়তো এরপর তুমি আমার মসজিদ এবং কবরের কাছে দিয়ে অতিক্রম করবে। হযরত মায়া'য (রা.) একথা শুনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিরবিদায়ের কথা ভেবে কাঁদতে শুরু করলেন।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তায়ালা চাচ্ছিলেন যে, তাঁর রসূলকে দীর্ঘ বিশ বছরের দুঃখকষ্ট ও নির্যাতনের সুফল প্রত্যক্ষ করাবেন। হজ্জের সময় মক্কার বিভিন্ন এলাকা থেকে জনসাধারণ এবং জন প্রতিনিধিদল মক্কায় সমবেত হবেন এরপর তারা নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছ থেকে শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছ থেকে এ মর্মে সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন যে, আমি আমার ওপর অর্পিত আমানত পূর্ণ করেছি, আল্লাহর পয়গাম মানুষের কাছে পৌছে দিয়েছি এবং উম্মতের কল্যাণের হক আদায় করেছি। আল্লাহর এইরূপ ইচ্ছা অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐতিহাসিক হজ্জের তারিখ ঘোষণা করলেন তখন নির্দিষ্ট দিনে দলে দলে মুসলমান মক্কায় পৌছুতে শুরু করলেন। সমবেত সকলেই মনে-প্রাণে চাচ্ছিলেন যে, তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ গ্রহণ করে তাঁর আনুগত্য মেনে নেবেন।[১]

অতপর শনিবার দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কার পথে রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। যিলকদ মাসের তখনো চারদিন বাকি ছিলো।[২] তিনি মাথায় তেল দিলেন, চুল আঁচড়ালেন, তহবন্দ পরলেন, চাদর গায়ে জড়ালেন, কোরবানীর পশুকে সজ্জিত করলেন এবং যোহরের পর রওয়ানা হলেন। আছরের আগেই তিনি যুল হুলাইফা নামক জায়গায় পৌছুলেন। সেখানে আছরের দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। রাত যাপনের জন্যে তাঁবু স্থাপন করলেন। সেখানে রাত কাটালেন। সকালে তিনি সাহাবাদের বললেন, রাতে আমার পরওয়াদেগারের কাছ থেকে একজন আগন্তুক এসে বলেছে, হে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই পবিত্র প্রান্তরে নামায আদায় করুন এবং বলুন যে, হজ্জের মধ্যে ওমরাহ রয়েছে।[৩]

---

১. এই হাদীস সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে। দ্রষ্টব্য প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৪, হুজ্জাতুল নবী অধ্যায়।

২. হাফেজ ইবনে হাজর এ ব্যাপারে চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন। কোন কোন বর্ণনায় জিলকদ মাসের ৫ দিন বাকি থাকার যে কথা রয়েছে তা সংশোধন করেছেন। দ্রষ্টব্য ফতহুল বারী, অষ্টম খন্ড, পৃষ্ঠা ১০৪

৩. বোখারী শরীফে হযরত ওমর (রাঃ) থেকে এই বর্ণনা সঙ্কলিত হয়েছে। প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ২০৭।

এরপর যোহর নামাযের আগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এহরামের জন্যে গোসল করলেন। হযরত আয়েশা (রা.) নিজ হাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দেহে জারিরা ও মেশক মিশ্রিত খুশবু লাগালেন। খুশবুর চমক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিঁথি এবং পবিত্র দাড়িতে দেখা যাচ্ছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই খুশবু ধৌত করেননি। যেমন ছিলো তেমনই রেখে দিলেন। এরপর তিনি তহবন্দ চাদর পরিধান করলেন। যোহরের দুই রাকাত নামায আদায় করলেন। পরে মোসাল্লায় বসেই হজ্জ এবং ওমরাহর একত্রে এহরাম বেঁধে লাব্বায়েক আওয়ায দিয়ে বাইরে এলেন। পরে উটনীতে আরোহণ করে দু'বার লাব্বায়েক বললেন। উটনীতে চড়ে খোলা ময়দানে গিয়ে সেখানেও লাব্বায়েক ধ্বনি দিলেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর তাঁর সফর অব্যাহত রাখলেন। এক সপ্তাহ পর তিনি এক বিকেলে মক্কার কাছে পৌঁছে যি তুবা নামক জায়গায় অবস্থান করলেন এবং ফজরের নামায আদায়ের পর গোসল করলেন। এরপর মক্কায় প্রবেশ করলেন। সেদিন ছিলো দশম হিজরীর যিলহজ্জ মাসের চার তারিখ রোববার। মদীনা থেকে রওয়ানা হওয়ার পর পথে আট রাত অতিবাহিত হয়েছিলো। স্বাভাবিক গতিতে পথ চললে এরূপ সময়ই প্রয়োজন হয়। মসজিদে হারামে পৌঁছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে কাবাঘর তওয়াফ করেন। এরপর সাফা মারওয়ার মধ্যবর্তী জায়গায় সাঈ করেন। কিন্তু এহরাম খোলেননি। কেননা তিনি হজ্জ ও ওমরাহর এহরাম একত্রে বেঁধেছিলেন।

নিজের সাথে কোরবানীর পশুও নিয়ে এনেছিলেন। তওয়াফ এবং সাঈ শেষে তিনি মক্কার হাজ্জন নামক স্থানে অবস্থান করেন। কিন্তু দ্বিতীয় হজ্জের তওয়াফ ছাড়া কোন তওয়াফ করেননি।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আসা যে সকল সাহাবা কোরবানীর পশু সঙ্গে নিয়ে আসেননি তিনি তাদের আদেশ দিলেন, তারা যেন নিজেদের এহরাম ওমরায় পরিবর্তিত করে দেয় এবং কাবাঘর তওয়াফ, সাফা মারওয়ার সাঈ শেষ করে পুরোপুরি হালাল হয়ে যায়। কিন্তু যেহেতু তিনি নিজে হালাল হননি, এ কারণে সাহাবারা সংশয়াচ্ছন্ন হয়েছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি যা পরে জেনেছি, সেটা যদি আগে জানতাম, তবে আমি কোরবানীর পশু সঙ্গে নিয়ে আসতাম না। যদি আমার সাথে কোরবানীর পশু না থাকতো, তবে আমিও হালাল হয়ে যেতাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একথা শোনার পর সাহাবারা আনুগত্যের মাথা নত করলেন। যাদের কাছে কোরবানীর পশু ছিলো না তারা হালাল হয়ে গেলেন।

যিলহজ্জ মাসের আট তারিখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনায় গমন করলেন। সেখানে ৯ই যিলহজ্জ তারিখ পর্যন্ত অবস্থান করলেন। যোহর, আছর, মাগরেব, এশা এবং ফযর এই পাঁচ ওয়াক্ত নামায সেখানে আদায় করে সেখানে সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। পরে আরাফাতের ময়দানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। সেখানে পৌঁছে দেখেন নেমরাহ প্রান্তরে তাঁবু প্রস্তুত রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে উপবেশন করলেন। সূর্য ঢলে পড়লে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশে উটনীর পিঠে আসন লাগানো হলো। তিনি প্রান্তরের মাঝামাঝি স্থানে গমন করলেন। সেই সময় নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চারিদিকে এক লাখ চব্বিশ হাজার মতান্তরে এক লাখ চুয়াল্লিশ হাজার মানুষের সমুদ্র বিদ্যমান ছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমবেত জনসমুদ্রের উদ্দেশে এক

ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তিনি বলেন, 'হে লোক সকল, আমার কথা শোনো, আমি জানি না, এবারের পর তোমাদের সাথে এই জায়গায় আর মিলিত হতে পারবো কি না।'[৪]

তোমাদের রক্ত এবং ধন-সম্পদ পরস্পরের জন্যে আজকের দিন, বর্তমান মাস এবং বর্তমান শহরের মতোই নিষিদ্ধ। শোনো, জাহেলিয়াতের সময়ের সবকিছু আমার পদতলে পিষ্ট করা হয়েছে। জাহেলিয়াতের খুনও খতম করে দেয়া হয়েছে। আমাদের মধ্যেকার যে প্রথম রক্ত আমি শেষ করছি তা হচ্ছে, রবিয়া ইবনে হারেসের পুত্রের রক্ত। এই শিশু বনি সা'দ গোত্রে দুধ পান করছিলো সেই সময়ে হোযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। জাহেলী যুগের সুদ খতম করে দেয়া হয়েছে। আমাদের মধ্যেকার প্রথম যে সুদ আমি খতম করছি তা হচ্ছে আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালেবের সুদ। এখন থেকে সকল প্রকার সুদ শেষ করে দেয়া হলো।

মেয়েদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো, কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহ র আমানতের সাথে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর কালেমার মাধ্যমে হালাল করেছ। তাদের ওপর তোমাদের অধিকার রয়েছে যে, তারা তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে আসতে দেবে না যাদের তোমরা পছন্দ করো না। যদি তারা এরূপ করে তবে তোমরা তাদের প্রহার করতে পারো। কিন্তু বেশী কঠোরভাবে প্রহার করো না। তোমাদের ওপর তাদের অধিকার হচ্ছে এই যে, তোমরা তাদের ভালোভাবে পানাহার করাবে এবং পোশাক দেবে।

তোমাদের কাছে আমি এমন জিনিস রেখে যাচ্ছি যে, যদি তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকো তবে এরপর কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। সেই জিনিস হচ্ছে আল্লাহর কেতাব।[৫] হে লোক সকল, মনে রেখো আমার পরে কোন নবী নেই। তোমাদের পরে কোন উম্মত নেই। কাজেই নিজ প্রতিপালকের এবাদাত করবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করবে। রমযান মাসে রোযা রাখবে। সানন্দ চিত্তে নিজের ধন-সম্পদের যাকাত দেবে। নিজ পরওয়ারদেগারের ঘরে হজ্জ করবে। নিজের শাসকদের আনুগত্য করবে। যদি এরূপ করো তবে তোমাদের পরওয়ারদেগারের জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।[৬]

তোমাদের সাথে আমার সম্পর্কের ব্যাপারে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে। তোমরা তখন কি বলবে? সাহাবারা বললেন, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি তাবলীগ করেছেন, পয়গাম পৌঁছে দিয়েছেন। কল্যাণকারিতার ব্যাপারে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেছেন।

একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাহাদাত আঙ্গুল আকাশের দিকে তুলে এরপর লোকদের দিকে ঝুঁকিয়ে তিনবার বললেন, ইয়া রাব্বুল আলামীন, তুমি সাক্ষী থেকো।[৭]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণীসমূহ রবিয়া ইবনে উমাইয়া ইবনে খালফ উচ্চকণ্ঠে মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছিলেন।[৮]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাষণ শেষ করার পর আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনের এই আয়াত নাযিল করেন। 'আজ তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ

---

৪. ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৬০৩

৫. সহী মুসলিম, হুজ্জাতুল নবী অধ্যায়। প্রথম খন্ড, পৃ. ৩৯৭

৬. ইবনে মাজা, ইবনে আসাকের, রহমতুল লিল আলামিন, প্রথম খন্ড, পৃ. ২৬৩

৭. সহীহ মসলিম, প্রথম খন্ড, পৃ. ৩৯৭

৮. ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৬০৫

করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।' (সূরা মায়েদা, আয়াত ৩)

হযরত ওমর (রা.) এই আয়াত শুনে কাঁদতে শুরু করেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি বলেন, কাঁদছি এ জন্যে যে, পূর্ণতার পর তো অপূর্ণতাই শুধু বাকি থাকে।[৯]

নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাষণের পর হযরত বেলাল (রা.) আযান ও একামত দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যোহরের নামায পড়ালেন। এরপর হযরত বেলাল একামত দিলেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আছরের নামায পড়ালেন। উল্লিখিত উভয় নামাযের মাঝামাঝি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য কোন নামায আদায় করেননি। এরপর সওয়ারীতে আরোহণ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অবস্থানস্থলে গমন করলেন। সেখানে তিনি উটনীর পিঠেই অপেক্ষা করলেন। কিছুক্ষণ পর সূর্যাস্ত হলো। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উসামাকে (রা.) পেছনে বসালেন এবং সেখানে থেকে রওয়ানা হয়ে মোযদালেফা গমন করলেন। সেখানে মাগরেব ও এশার নামায এক আযানে দুই একামতে আদায় করলেন। মাঝখানে কোন নফল নামায আদায় করেননি। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শয়ন করলেন। ফজরের নামাযের সময় হওয়া পর্যন্ত তিনি শায়িত থাকলেন। ফযরের সময় হওয়ার পর আযান ও একামতের সাথে ফজরের নামায আদায় করলেন। এরপর উটনীতে সওয়ার হয়ে 'মাশআরে হারামে' গমন করে কেবলার দিকে ফিরে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। আল্লাহর নামে তাকবীর ধ্বনি দিলেন এবং তওহীদের কালেমা উচ্চারণ করলেন। সেখানে সকালে চারিদিক ভালোভাবে ফর্সা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। এরপর সূর্য ওঠার আগে আগেই মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। এবার হযরত ফযল ইবনে আব্বাসকে (রা.) নিজের পেছনে বসালেন। 'বাৎনে মোহাচ্ছারে' (আবরাহার সৈন্যদের ওপর গযব আসার জায়গায়) পৌঁছে সওয়ারীকে জোর ছোটালেন। জামরায়ে কোবরার পথে রওয়ানা হয়ে সেখানে পৌঁছুলেন। সেই আমলে সেখানে একটি গাছ ছিলো। সেই গাছের পরিচয়েও জামরায়ে কোবরার পরিচিতি ছিলো। জামরায়ে কোবরাকে জামরায়ে আকাবা এবং জামরায়ে উলাও বলা হয়ে থাকে। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে সাতটি পাথর নিক্ষেপ করেন। প্রতিবারের পাথর নিক্ষেপের সময় তিনি তকবির ধ্বনি দিচ্ছিলেন। ছোট ছোট পাথরের টুকরো ছিলো সেগুলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে এসব পাথর নিক্ষেপ করেন।

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বধ্যভূমিতে গমন করে তাঁর পবিত্র হাতে ৬৩টি উট যবাই করেন। এরপর বাকি ৩৭টি উট হযরত আলী (রা.)-কে যবাই করতে দেয়া হয়। এভাবে একশত উট কোরবানী করা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আলীকেও তাঁর কোরবানীর মধ্যে শামিল করে নেন। এরপর তাঁর আদেশে প্রত্যেক উট থেকে এক টুকরো করে গোশত নিয়ে একটি হাড়িতে রান্না করা হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হযরত আলী (রা.) সেই গোশত থেকে কিছু আহার করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছু সুরুয়াও পান করেন।

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সওয়ারীতে আরোহণ করে মক্কা মোয়াযযামায় গমন করলেন। বায়তুল্লাহ শরীফ তওয়াফ করলেন। এই তওয়াফকে বলা হয় তওয়াফে এফাযা।

---

[৯]. বোখারী, ইবনে ওমরের (রাঃ) বর্ণনা দ্রষ্টব্য। প্রথম খন্ড, পৃ. ২৬৫

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় যোহরের নামায আদায় করলেন। যমযম কূপের কাছে বনু আবদুল মোত্তালেবের কাছে গমন করলেন। তারা হাজীদের যমযমের পানি পান করাচ্ছিলেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে বনু আবদুল মোত্তালেব তোমরা পানি উত্তোলন করো। যদি এ আশঙ্কা পোষণ না করতাম যে পানি উত্তোলনের কাজে অন্য লোকেরা তোমাদের পরাজিত করে দেবে তবে আমিও তোমাদের সাথে পানি উত্তোলন করতাম। অর্থাৎ সাহাবারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পানি তুলতে দেখলে তারা সবাই পানি তোলার জন্যে চেষ্টা করবেন। এর ফলে হাজীদের পানি পান করানোর যে গৌরব এককভাবে বনু আবদুল মোত্তালেবের রয়েছে তা আর থাকবে না। অতপর বনু আবদুল মোত্তালেবের লোকেরা নবী (রা.)-কে এক বালতি পানি দিল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই পানি প্রয়োজন মতো পান করলেন।[১০]

আজ কোরবানীর দিন। যিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজও চাশ্ত এর সময়ে একটি খোতবা প্রদান করেন। সেই সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খচ্চরের পিঠে আরোহণ করেছিলেন। হযরত আলী (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য সমবেত সাহাবাদের শোনাচ্ছিলেন। সাহাবাদের মধ্যে কেউ বসেছিলেন কেউ দাঁড়িয়েছিলেন।[১১] আজকের ভাষণেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগের দিনের বক্তব্যের কিছু কিছু পুনরুল্লেখ করেন। সহীহ বোখারী এবং সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আবু বকরের (রা.) এই বর্ণনা সঙ্কলিত রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াওমে নহর অর্থাৎ ১০ই যিলহজ্জ তারিখে আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। সেই ভাষণে তিনি বলেন, **'যুগের আবর্তনের ফলে বর্তমান সময় এসে পৌঁছে গেছে। এ দিনেই আল্লাহ তায়ালা আসমান যমিন সৃষ্টি করেছেন। বারো মাসে এক বছর। এর মধ্যে চার মাস হচ্ছে মাহে হারাম। তিনটি মাস পর্যায়ক্রমে আসে। যথা যিলকদ, যিলহজ্জ এবং মহররম। অন্য একটি মাস হচ্ছে জমাদিউস সানি এবং শাবান মাসের মাঝামাঝি। সেই মাসের নাম রযব।'**

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথাও বললেন যে, এটি কোন মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূলই ভালো জানেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নীরব রইলেন। আমরা তখন বুঝলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই মাসের অন্য কোন নাম রাখবেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটি কি যিলহজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম, কেন নয়? তিনি বললেন এটা কোন শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূলই ভালো জানেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। আমরা ভাবলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই শহরের অন্য কোন নাম রাখবেন। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটি কি মক্কা শহর নয়? আমরা তখন বললাম, কেন নয়? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই দিনের পরিচয় কি? আমরা বললাম, আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূলই ভালো জানেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। আমরা ভাবলাম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দিনের অন্য কোন নাম রাখবেন। কিন্তু তিনি বললেন, এই দিন কি ইয়াওমুন নহর অর্থা কোরবানীর দিন নয়? অর্থাৎ ১০ই যিলহজ্জ নয়? আমরা

---

১০. মুসলিম শরীফে হযরত জাবের (রাঃ) থেকে এ হাদীস বর্ণিত রয়েছে। হুজ্জাতুন নবী অধ্যায়, প্রথম খন্ড, পৃ. ৩৯৭-৪০০

১১. আবু দাউদ, ইয়াওমে নহর অধ্যায় প্রথম খন্ড পৃ. ২৭০।

বললাম, কেন নয়? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আচ্ছা তবে শোনো, তোমাদের রক্ত, তোমাদের অর্থ-সম্পদ এবং তোমাদের ইযযত আবরু পরস্পরের জন্যে এরূপ নিষিদ্ধ ও সম্মানীয়, যেমন তোমাদের এ শহর তোমাদের এ মাস এবং তোমাদের আজকের দিন তোমাদের জন্যে সম্মানীয়। তোমরা তোমাদের পরওয়ারদেগারের সাথে শীঘ্রই মিলিত হবে এবং তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। কাজেই লক্ষ্য রেখো, আমার পরে তোমরা পথভ্রষ্ট হয়ো না।'

'এমন পথভ্রষ্ট হয়ো না যে, একে অন্যের ঘাড় মটকাতে শুরু করবে। বলো, আমি কি তাবলীগ করেছি? সাহাবারা বললেন, হাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ তায়ালা, তুমি সাক্ষী থেকো। যে ব্যক্তি এখানে উপস্থিত রয়েছে তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দেবে। কেননা উপস্থিত অনেকের চেয়ে অনেক অনুপস্থিত ব্যক্তি আমার এ বক্তব্যের অধিক গুরুত্ব দেবে এবং সত্য বলে মনে করবে।[১২]

এক বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই ভাষণে একথাও বলেছেন যে, 'স্মরণ রেখো অপরাধ যারা করে তারা নিজের ওপরই অপরাধ করে। অর্থাৎ সে নিজেই সে জন্যে দায়ী হবে। স্মরণ রেখো, কোন অপরাধী পুত্র নিজের পিতার ওপর বা কোন অপরাধী পিতা নিজের পুত্রের ওপর অপরাধ করতে পারে না। অর্থাৎ পিতার অপরাধের জন্যে পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধের জন্যে পিতাকে পাকড়াও করা হবে না। স্মরণ রেখো, শয়তান এ মর্মে হতাশ হয়ে গেছে যে, এই শহরে আর কখনো তার উপাসনা করা হবে না। তবে নিজেদের যেসব কাজকে তোমরা তুচ্ছ মনে করবে সেই সব ধারণার মাধ্যমে শয়তানের আনুগত্য সম্পন্ন হবে এবং তার দ্বারাই শয়তান সন্তুষ্টি লাভ করবে।[১৩]

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আইয়ামে তাশরীক অর্থাৎ ১১, ১২ ও ১৩ই যিলহজ্জ তারিখে মিনায় অবস্থান করেন। এই সময়ে তিনি হজ্জের রীতিসমূহও পালন করছিলেন। সেই সাথে জনসাধারণকে শরীয়তের হুকুম-আহকামও শিক্ষা দিচ্ছিলেন। আল্লাহর যেকেরও করছিলেন। মিল্লাতে ইবরাহীমের সুন্নতসমূহও কায়েম করছিলেন। শেরেকের নিদর্শনসমূহ নির্মূল করছিলেন। আইয়ামে তাশরীকে অর্থাৎ উল্লিখিত তিনদিনের একদিনে একটি ভাষণ দেন। আবু দাউদে 'হাছান' সনদসহ এই বর্ণনা রয়েছে যে, হযরত ছারা বিনতে বিনহান (রা.) বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রউসের দিনে[১৪] আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন এবং বলেন, এই দিন আইয়ামে তাশরীকের মাঝখানের দিন নয়।[১৫] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আজকের ভাষণও ছিলো গতকালের অর্থাৎ কোরবানীর দিনের ভাষণের অনুরূপ। এই ভাষণ সূরা নসর নাযিল হওয়ার পর দেয়া হয়েছিলো।

সর্বশেষ সামরিক অভিযান

সুবিস্তৃত রোমক সাম্রাজ্যের শাসকবর্গ ইসলাম এবং ইসলাম গ্রহণকারীদের বেঁচে থাকার অধিকার মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলো না। এ কারণে রোমক সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় কারো ইসলাম গ্রহণ করা ছিলো বিপজ্জনক। রোমক গবর্নর হযরত ফারওয়াহ ইবনে আমর জোযামীর ঘটনার পুনরাবৃত্তির আশঙ্কা ছিলো অন্যদের জন্যেও প্রবল।

---

[১২]. সহীহ বোখারী, খোত্তবাতে আইয়ামে মিনা অধ্যায়। প্রথম খন্ড, পৃ. ২৩৪।
[১৩]. তিরমিযি, [illegible] খন্ড, পৃ, ৩৮, ১৩৫। ইবনে মাজা কিতাবুল রজ্জম, মেশকাত প্রথম খন্ড, পৃ, ২৩৪
[১৪]. অর্থাৎ ১২ই [illegible]হজ্জ। আউনুল মা'বুদ দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ১৪৩
[১৫]. আবু দাউদ ইয়াওমু ইয়াখতাবু বে মিনা প্রথম খন্ড, পৃ. ২৬৯

রোমক সাম্রাজ্যের শাসকদের এ ধরনের ঔদ্ধত্য এবং অহঙ্কারপূর্ণ আচরণের প্রেক্ষিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাদশ হিজরীর সফর মাসে এক বিরাট বাহিনী তৈরীর কাজ শুরু করলেন। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.)-কে সেই বাহিনীর সিপাহসালার নিযুক্ত করে তিনি আদেশ দিলেন যে, বালকা এলাকা এবং দারুমের ফিলিস্তিনী ভূখন্ড সওয়ারদের মাধ্যমে নাস্তানাবুদ করে এসো। রোমকদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় বসবাসকারী আরব গোত্রসমূহের মনে সাহস সঞ্চার করাই ছিলো এ পদক্ষেপের উদ্দেশ্য। এর ফলে কেউ একথা ভাবতে পারবে না যে, গীর্জার বাড়াবাড়ি ও স্বেচ্ছাচারিতার সামনে কথা বলার কেউ নেই। তাছাড়া একথাও কেউ মনে করতে পারবে না যে, ইসলাম গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে নিজের মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানানো।

হযরত উসামা (রা.)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করার কারণে কেউ কেউ সমালোচনা করে এ অভিযানের প্রস্তুতিও অংশগ্রহণে ইতস্তত করলেন। এ অবস্থা লক্ষ্য করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা যদি উসামার সেনাপতিত্বের প্রশ্নে সমালোচনা মুখর হও তবে তো বলতেই হয় যে, ইতিপূর্বে তার পিতাকে সেনাপতি নিযুক্ত করায় তোমরা সমালোচনা মুখর হয়েছিলে। অথচ আল্লাহর শপথ, যায়েদ ছিলো সেনাপতি হওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন। এছাড়া সে ছিলো আমার প্রিয় ভাজনদের অন্যতম। উসামাও যায়েদের পর আমার প্রিয় ভাজনদের অন্যতম।[১]

তখন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হযরত উসামা (রা.)-এর আশপাশে সমবেত হয়ে তাঁর সেনাবাহিনীতে শামিল হলেন। এই সেনাবাহিনী রওয়ানা হয়ে মদীনা থেকে তিন মাইল দূরে মাকামে যরফ নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসুখ সম্পর্কে উদ্বেগজনক খবর পেতে থাকায় তারা সামনে অগ্রসর হননি। আল্লাহর ফয়সালার অপেক্ষায় তারা সেখানেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। আল্লাহর ফয়সালা ছিলো এই যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর খেলাফতের প্রথম সামরিক অভিযান হিসাবে এটি আখ্যায়িত হবে।[২]

---

১. সহীহ বোখারী, উসামাকে প্রেরণ অধ্যায়, উসামা দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৬১২

২. সহীহ বোখারী, এবং ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৬০৬-৬৫০।

মোহাম্মদ তো রসূল ছাড়া কিছুই নয়, তার আগেও বহু রসূল গত হয়ে গেছে। সে যদি মরে যায় অথবা তাকে যদি কেউ মেরে ফেলে, তাহলে তোমরা কি (তার আদর্শ থেকে) মুখ ফিরিয়ে নেবে? (জেনে রেখো) যে ব্যক্তিই (এভাবে) মুখ ফিরিয়ে নেয় সে আল্লাহর কোনো রকম ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

(সূরা আল ইমরান ১৪৪)

বিদায় হে আমার বন্ধু

অন্তিম যাত্রার পথে মহানবী

বিদায় ইয়া রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত পূর্ণতা লাভ করেছে, আরব জাহান এখন ইসলামের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। এ সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিন্তা-চেতনা, অনুভব-অনুভূতি, বাহ্যিক আচার-আচরণ ও কথা বার্তায় এমনসব নিদর্শন প্রকাশ পেতে লাগলো যা থেকে স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছিলো যে, তিনি এ পৃথিবীর অধিবাসীদের শীঘ্রই বিদায় জানাবেন।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, দশম হিজরীর রমযান মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ দিন এ'তেকাফ পালন করেন অথচ অন্যান্য রমযানে পালন করতেন দশদিন। হযরত জিবরাঈল (আ.) এ বছর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমগ্র কোরআন শরীফ দু'বার পাঠ করে শোনালেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেছিলেন, আমি জানি না, সম্ভবত এ বছরের পর এই জায়গায় তোমাদের সাথে আমি আর কখনো মিলিত হতে পারব না। জামরায়ে আকাবার কাছে তিনি বলেন, আমার কাছ থেকে হজ্জ এর নিয়মাবলী শিখে নাও, কেননা আমি এ বছরের পর সম্ভবত আর কখনো হজ্জ করতে পারব না। আইয়ামে তাশরীকের মাঝামাঝি অর্থাৎ ১০, ১১, ১২ই যিলহজ্জের সময়ে সূরা নসর নাযিল হয়েছিলো। এরপর তিনি বুঝে ফেলেছিলেন যে, এবার এ দুনিয়া থেকে তার বিদায় নেয়ার পালা। এই সূরা নাযিল হওয়া মানে হচ্ছে তার মৃত্যুবরণের একটা আগাম ইত্তেলা (সংবাদ) দেয়া।

একাদশ হিজরীর সফর মাসের শুরুতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহুদ প্রান্তরে গমন করেন। সেখানে তিনি শহীদানদের জন্যে এমনভাবে দোয়া করলেন যেন জীবিতরা মৃতদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করছে। এরপর ফিরে এসে তিনি মিম্বরে বসে বললেন, আমি তোমাদের কর্মতৎপরতার আমীর এবং তোমাদের জন্যে সাক্ষী। আল্লাহর শপথ এখন আমি আমার হাউয অর্থাৎ হাউযে কাওছার দেখতে পাচ্ছি। আমাকে সমগ্র বিশ্ব জাহান এবং এর ধন-ভান্ডারের চাবি প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহর শপথ, আমি এ আশঙ্কা পোষণ করি না যে, তোমরা আমার পরে শেরেক করবে বরং এ আশঙ্কা করছি যে, তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে।

একদিন মধ্য রাতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতুল বাকির কবরস্থানে যান এবং সেখানে মুর্দাদের জন্যে দোয়া করেন। সে দোয়ায় তিনি বলেন, হে কবরবাসীরা, তোমাদের প্রতি সালাম। মানুষ যে অবস্থায় রয়েছে তার চেয়ে তোমরা যে অবস্থায় রয়েছো তা তোমাদের জন্যে শুভ হোক। ফেতনা আঁধার রাতের অংশের মতো একের পর এক চলে আসছে। পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের চেয়ে মন্দ। এরপর কবরবাসীদের এ সুখবর প্রদান করেন যে, আমিও তোমাদের সাথে এসে মিলিত হবো।'

অসুখের শুরু

একাদশ হিজরীর ২৯শে সফর, রোববার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতুল বাকিতে একটি জানাযায় অংশগ্রহণ করেন। ফেরার পথে মাথাব্যথা শুরু হয় এবং উত্তাপ এতো বেড়ে যায় যে, মাথায় বাঁধা পট্টির ওপর দিয়েও তাপ অনুভব করা গেছে। এটা ছিলো মরণ অসুখের শুরু। তিনি সেই অসুস্থ অবস্থায় এগার দিন নামায পড়ান। অসুখের মোট মেয়াদ ছিলো তের অথবা চৌদ্দ দিন।

জীবনের শেষ সপ্তাহ

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। এ সময়ে তিনি পবিত্র সহধর্মিনীদের কাছে জিজ্ঞাসা করতেন যে, আমি আগামীকাল কোথায় থাকবো? আমি আগামীকাল কোথায় থাকবো? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ জিজ্ঞাসার তাৎপর্য তাঁর সহধর্মিনীরা বুঝে ফেললেন তাই তাঁরা বললেন, আপনি যেখানে থাকতে ইচ্ছা করেন হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সেখানেই থাকবেন। এরপর তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঘরে স্থানান্তরিত হলেন। স্থানান্তরের সময় হযরত ফযল ইবনে আব্বাস এবং হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা.) প্রিয় নবীকে ভর দিয়ে নিয়ে গেলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাথায় পট্টি বাঁধা, পবিত্র চরণযুগল মাটিতে হেঁচড়ে যাচ্ছে। এ অবস্থায় তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঘরে স্থানান্তরিত হলেন এবং জীবনের শেষ সপ্তাহ সেখানেই কাটালেন।

হযরত আয়েশা (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছ থেকে শিক্ষা করা দোয়াসমূহ পাঠ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দেহে ফুঁ দিতেন এবং বরকতের আশায় তাঁর পবিত্র হাত নিজের দেহে ফেরাতেন।

মৃত্যুর পাঁচদিন আগে

মৃত্যুর পাঁচদিন আগে চাহার শোম্বা অর্থাৎ বুধবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহের উত্তাপ অস্বাভাবিক বেড়ে গেলো। এতে তাঁর কষ্টও বাড়লো। তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। এ সময় বললেন, বিভিন্ন কূপের সাত মশক পানি আমার ওপর ঢালো, আমি যেন লোকদের কাছে গিয়ে ওসিয়ত করতে পারি। এ জন্যে বসিয়ে দেয়া হলো এবং দেহে এতো পরিমাণ পানি ঢালা করা হলো যে, তিনি বললেন, ব্যস, ব্যস, অর্থাৎ আর প্রয়োজন নেই।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর কিছুটা সুস্থ বোধ করলেন এবং মসজিদে গেলেন। মাথায় পট্টি বাঁধা ছিলো। মিম্বরে আরোহণ করে বসে কিছু ভাষণ দিলেন। সাহাবায়ে কেরাম আশেপাশে সমবেত ছিলেন। তিনি বললেন, ইহুদী নাছারাদের ওপর আল্লাহর লানত, কেননা তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, ইহুদী নাছারাদের ওপর আল্লাহর মার, কেননা তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে।[২] তিনি আরো বললেন, তোমরা আমার কবরকে পূজা করার উদ্দেশ্যে মূর্তিতে পরিণত করো না।[৩]

---

২. সহীহ বোখারী, প্রথম খন্ড, পৃ. ৫২, মুয়াত্তা ইমাম মালেক, পৃ ৩৬০

৩. মুয়াত্তা ইমাম মালেক, পৃ. ৬৫।

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদলার জন্যে নিজেকে পেশ করে বললেন, আমি যদি কারো পিঠে চাবুকের দ্বারা আঘাত করে থাকি তবে এই হচ্ছে আমার পিঠ সে যেন বদলা নিয়ে নেয়। যদি কাউকে অসম্মান করে থাকি তবে সে যেন আমার কাছ থেকে বদলা গ্রহণ করে।

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বরের ওপর থেকে নীচে নেমে এলেন এবং যোহরের নামায পড়ালেন। এরপর তিনি পুনরায় মিম্বরে উপবেশন করলেন এবং শত্রুতা ইত্যাদি সম্পর্কে ইতিপূর্বে বলা কথা পুনরায় বললেন। একজন লোক বললেন, আপনার কাছে আমি তিন দেরহাম পাওনা রয়েছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফযল ইবনে আব্বাস (রা.)-কে সেই ঋণ পরিশোধের আদেশ দিলেন।

এরপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আনসারদের সম্পর্কে ওসিয়ত করলেন। তিনি বললেন, আমি তোমাদেরকে আনসারদের ব্যাপারে ওসিয়ত করছি, কেননা তারা আমার অন্তর ও কলিজা। তারা নিজেদের যিম্মাদারী পূর্ণ করেছে কিন্তু তাদের অধিকারসমূহ বাকি রয়ে গেছে। কাজেই তাদের মধ্যেকার নেককারদের গ্রহণ করবে এবং বদকারদের ক্ষমা করবে। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন, মানুষ বাড়তে থাকবে কিন্তু আনসারদের সংখ্যা কমতে থাকবে, এমনকি তারা খাবারে লবণের পরিমাণের মত হয়ে পড়বে। কাজেই তোমাদের মধ্যেকার যারা কোন লাভজনক বা ক্ষতিকর কাজের দায়িত্ব পাবে তারা আনসারদের মধ্যেকার নেককারদের গ্রহণ করবে এবং বদকারদের ক্ষমা করবে।[৪]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরপর বললেন, একজন বান্দাকে আল্লাহ তায়ালা এ এখতিয়ার দিয়েছেন যে, বান্দাহ ইচ্ছে করলে দুনিয়ার শান শওকত থেকে যা চাইবো আল্লাহ তায়ালা তাকে দেবেন অথবা আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা থেকে যা কিছু ইচ্ছা নিতে পারবে। সেই বান্দা আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা গ্রহণ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন যে, একথা শোনার পর হযরত আবু বকর সিদ্দিক রা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁদতে শুরু করলেন এবং বললেন, আমি নিজের মা'বাপসহ আপনার ওপর কোরবান হচ্ছি। একথা শুনে আমরা অবাক হলাম। লোকেরা বললো, এই বুড়োকে দেখো, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো একজন বান্দা সম্পর্কে বলছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাকে এখতিয়ার দিয়েছেন সেই বান্দা দুনিয়ার শান শওকত থেকে যা ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারে অথবা আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা থেকে যা ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারে অথচ এই বুড়ো বলছে, আমি নিজের মা বাবাসহ আপনার ওপর কোরবান হচ্ছি। কিন্তু কয়েকদিন পরেই এটা সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে পড়ে যে, আল্লাহ তায়ালা যে বান্দাকে এখতিয়ার দিয়েছেন তিনি ছিলেন স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। সেদিন এটাও কারো বুঝতে বাকি থাকেনি যে, হযরত আবু বকর (রা.) হচ্ছেন আমাদের মধ্যেকার সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি।[৫]

এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, বন্ধুত্ব এবং অর্থ সম্পদের ত্যাগ স্বীকারে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশী এহসান রয়েছে আবু বকরের। যদি আমি আমার প্রতিপালক

---

[৪]. সহীহ বোখারী, প্রথম খন্ড. পৃ. ৫২৬

[৫]. সহীহ বোখারী, প্রথম খন্ড, পৃ. ৫৩৬

ব্যতীত অন্য কাউকে খলিল/বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতাম, তবে আবু বকরকে গ্রহণ করতাম। কিন্তু তার সাথে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক বিদ্যমান। মসজিদে কোন দরজা যেন খোলা রাখা না হয়, সকল দরজা যেন বন্ধ করা হয় শুধু আবু বকরের দরজা বন্ধ করা যাবে না।[৬]

মৃত্যুর চার দিন আগে

রসূলসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের চারদিন আগে বৃহস্পতিবার, তিনি খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন। সেই সময় তিনি বললেন, আমি তোমাদের একটি লিখন লিখে দিচ্ছি, এরপর তোমরা কখনো গোমরাহ হবে না। সেই সময় ঘরে কয়েকজন লোক উপস্থিত ছিলেন। তাদের মধ্যে হযরত ওমর (রা.)-ও ছিলেন। তিনি বললেন, আপনি অসুখে খুবই কষ্ট পাচ্ছেন এবং আমাদের কাছে পবিত্র কোরআন রয়েছে। আমাদের জন্যে এই কেতাবই যথেষ্ট। একথা শুনে ঘরে উপস্থিত সাহাবাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলো। কেউ কেউ বললেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা লিখে দিতে চাচ্ছিলেন, তা লিখিয়ে নেয়া হোক। কেউ কেউ বলছিলেন, না দরকার নেই। হযরত ওমর (রা.) যা বলছেন, সেটাই ঠিক। মতভেদ এক সময়ে কথা কাটাকাটিতে পরিণত হলো এবং শোরগোল বেড়ে গেলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরক্ত হয়ে বললেন, তোমরা আমার কাছ থেকে উঠে যাও।[৭]

সেদিনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনটি ব্যাপারে ওসিয়ত করলেন। প্রথমত ইহুদী, নাছারা এবং মোশরেকদের জাযিরাতুল আরব থেকে বের করে দেবে। দ্বিতীয়ত আগন্তুক প্রতিনিধিদলের সাথে আমি যে রকম ব্যবহার করতাম সেই রকম ব্যবহার করবে। তৃতীয় কথাটি বর্ণনাকারী ভুলে গেছেন, সম্ভবত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোরআন সুন্নাহ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা অথবা উসামা বাহিনীকে প্রেরণ করার কথা বলেছেন, অথবা তিনি বলেছিলেন, নামায এবং তোমাদের অধীনস্থ অর্থাৎ দাসদাসীদের প্রতি খেয়াল রাখবে।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুখের তীব্রতা সত্তেও ওফাতের চারদিন আগে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত সকল নামাযে নিজেই ইমামতি করেন। সেদিনের মাগরেবের নামাযেও তিনিই ইমামতি করেছিলেন। সেই নামাযে তিনি সূরা মুরসালাত পাঠ করেন।[৮]

এশার সময় রোগ এতো বেড়ে গেলো যে, মসজিদে যাওয়ার শক্তি রইল না। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা কি নামায আদায় করে ফেলেছে? আমরা বললাম, জ্বী না হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ওরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমার জন্যে পাত্রে পানি লও। আমরা তাই করলাম। তিনি গোসল করলেন। এরপর উঠতে চাইলেন কিন্তু বেহুঁশ হয়ে গেলেন। জ্ঞান ফিরে এলে জিজ্ঞাসা করলেন, লোকেরা কি নামায আদায় করে ফেলেছে? তাঁকে জানানো হলো যে, জ্বী না, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ওরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে। এরপর দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার একই অবস্থা হলো। তিনি গোসল করলেন এরপর উঠতে চাইলেন, কিন্তু বেহুঁশ হয়ে গেলেন। এরপর তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে খবর

---

[৬]. বোখারী, মুসলিম, প্রথম খন্ড, পৃ. ৫১৬, মেশকাত দ্বিতীয় খন্ড পৃ. ৫৪৬-৫৫৪

৭. বোখারী ও মুসলিম। বোখারী প্রথম খন্ড পৃ. ২২, ৪২৭, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৬৩৮

[৮]. বোখারী ও মুসলিম। মেশকাত প্রথম খন্ড, পৃ. ১০২

পাঠালেন, তিনি যেন নামায পড়িয়ে দেন। এরপর নবী করিমের অসুস্থতার অন্য দিনগুলোতেও হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) নামায পড়ালেন।[৯] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) সতের ওয়াক্ত নামাযে ইমামতি করেছিলেন।

হযরত আয়েশা (রা.) তিন অথবা চারবার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ মর্মে আরয করেন যে, ইমামতির দায়িত্ব হযরত আবু বকর (রা.) ব্যতীত অন্য কাউকে দেয়া হোক। তিনি ভাবছিলেন, লোকেরা হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ব্যাপারে মন্দ ধারণা পোষণ না করুক। কিন্তু নবী স্যাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতিবারই সহধর্মিনীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করে বলেন, তোমরা সবাই ইউসুফ (আ.)-এর সাথীদের মত হয়ে গিয়েছো।[১০] আবু বকরকে আদেশ দাও, তিনি যেন নামায পড়ান।

মৃত্যুর দু'দিন আগে

শনি অথবা রোববার দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুটা সুস্থ বোধ করলেন। দু'জন লোকের কাঁধে ভর দিয়ে যোহরের নামাযের জন্যে মসজিদে গেলেন। সে সময় হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) সাহাবাদের নামায পড়াচ্ছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে তিনি পেছনে সরে আসতে লাগলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশারা করলেন যে পেছনে সরে আসার দরকার নেই। যাদের কাঁধে ভর দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে এসেছিলেন তাদের বললেন, আমাকে আবু বকরের পাশে বসিয়ে দাও। এরপর তাঁকে হযরত আবু বকরের ডানপাশে বসিয়ে দেয়া হলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তখন নামাযে নবী করিমের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একতেদা করছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে তাকবির শোনাচ্ছিলেন।[১২]

মৃত্যুর আর মাত্র একদিন আগে

ওফাতের একদিন আগে রোববার দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সব দাস দাসীকে মুক্ত করে দিলেন। তাঁর কাছে সে সময় সাত দিনার ছিলো, সদকা করলেন। তাঁর অস্ত্র শস্ত্র মুসলমানদের হেবা করে দিলেন। রাতের বেলা চেরাগ জ্বালানোর জন্যে হযরত আয়েশা (রা.) এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে তেল ধার আনলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি বর্ম একজন ইহুদীর কাছে তিরিশ সাআ অর্থাৎ ৭৫ কিলো যবের বিনিময়ে বন্ধক ছিলো।

৯. বোখারী ও মুসলিম। মেশকাত প্রথম খন্ড, পৃ. ১০২

১০. হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনায় যে সকল মহিলা আজিজ মেছেরের স্ত্রীকে অভিযুক্ত করছিল তারা দৃশ্যত এরূপ করছিল কিন্তু হযরত ইউসুফকে দেখে যখন তারা আঙ্গুল কেটে ফেলল তখন বোঝা গেল যে, ওরা সবাই হযরত ইউসুফ (আ)-এর প্রতি নিবেদিত প্রাণ। অর্থাৎ তাদের মুখে এক মনে এক। এখানেও অবস্থা সেরকম। দৃশ্যত বলা হচ্ছিল যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিকের মন নরম, আপনার জায়গায় দাঁড়িয়ে নামায পড়াতে শুরু করলে কান্নার প্রকোপে কেরাত পাঠ করতে পারবেন না। কিন্তু মনে মনে ঠিকই একথা ছিল যে, যদি খোদা না করুন রসূলে করিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেন তাহলে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) সম্পর্কে সবাই মন্দ ধারণা পোষণ করবে এবং তাকে অপয়া বলে অপবাদ দেবে। এসব কারণে হযরত আয়েশা সিদ্দিকার আবেদনের সাথে অন্যান্য নবী সহধর্মিনীরাও নবীকরিম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের কাছে একই আবেদন জানান। এ কারণে নবী (সঃ) বলেন যে, তোমরা সবাই হচ্ছো নবী ইউসুফের ভাইদের মতো।

১২. সহীহ বোখারী, প্রথম খন্ড, পৃ. ৯৮-৯৯

মহা জীবনের শেষ দিন

হযরত আনাস (রা.) বলেন, সেদিন ছিলো সোমবার মুসলমানরা ফযরের নামায আদায় করছিলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) ইমামতির দায়িত্বে ছিলেন। হঠাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা সিদ্দিকার হুজরার পর্দা সরালেন এবং সাহাবাদের কাতারবাঁধা অবস্থায় নামায আদায় করতে দেখে মৃদু হাসলেন। এদিকে হযরত আবু বকর (রা.) কিছুটা পেছনে সরে গেলেন যেন নামাযের কাতারে রসূল শামিল হতে পারে। তিনি ভেবেছিলেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শামিল হতে পারেন এবং হয়তো নামাযে আসতে চান। হযরত আনাস (রা.) বলেন, হঠাৎ করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে সাহাবারা এতো আনন্দিত হলেন যে, নামাযের মধ্যেই ফেতনায় পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হলো অর্থাৎ তারা নামায ছেড়ে দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শারীরিক অবস্থার খবর নিতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত দিয়ে সাহাবাদের ইশারা করলেন, তারা যেন নামায পুরা করেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুজরার ভেতর চলে গিয়ে পর্দা ফেলে দিলেন।

এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অন্য কোন নামাযের সময় আসেনি। দিনের শুরুতে চাশত এর নামাযের সময়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রিয় কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.)-কে কাছে ডেকে কানে কানে কিছু কথা বললেন। তা শুনে হযরত ফাতেমা যোহরা কাঁদতে লাগলেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় ফাতেমার কানে কিছু কথা বললেন, এবারে হযরত ফাতেমা (রা.) হাসতে লাগলেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, পরবর্তী সময়ে আমি হযরত ফাতেমাকে তাঁর কান্না ও হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, প্রথমবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, এই অসুখেই আমার মৃত্যু হবে। একথা শুনে আমি কাঁদলাম। এরপর তিনি আমাকে কানে কানে বললেন, আমার পরিবার-পরিজনের মধ্যে সর্ব প্রথম তুমিই আমার অনুসারী হয়ে পরলোকে যাবে। একথা শুনে আমি হাসলাম।[১৪]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ফাতেমা (রা.)-কে এ সুসংবাদ প্রদান করেন যে, তিনি হলেন বিশ্বের সকল মহিলাদের নেত্রী।[১৫]

সেই সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যন্ত্রণার তীব্রতা দেখে হযরত ফাতেমা (রা.) হঠাৎ বলে ফেললেন, হায় আব্বাজানের কষ্ট। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার আব্বার আজকের পরে আর কোন কষ্ট নেই।[১৬]

নবী (সাঃ) হযরত হাসান ও হোসেন (রা.)-কে ডেকে চুম্বন করলেন এবং তাদের ব্যাপারে কল্যাণের ওসিয়ত করলেন। সহধর্মিনীদের ডাকলেন এবং তাদেরকেও ওয়ায-নসিয়ত করলেন।

---

১৪. বোখারী দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৬৩৮

১৫. কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, আলোচনা এবং সুসংবাদ দেয়ার এ ঘটনা নবী জীবনের শেষ দিনে নয় বরং শেস সপ্তাহে ঘটেছিল। দেখুন, রহমতুল লিল আলামীন প্রথম খন্ড, পৃ. ২৮২

১৬. সহীহ বোখারী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৬৪১

এদিকে কষ্ট ক্রমেই বাড়ছিলো। বিষ-এর প্রভাবও প্রকাশ পাচ্ছিলো। খয়বরে তাঁকে এই বিষ খাওয়ানো হয়েছিলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলতেন, হে আয়েশা খয়বরে আমি যে বিষ মিশ্রিত খাবার খেয়েছিলাম তার প্রতিক্রিয়ার কষ্ট সব সময় অনুভব করছি। এখন মনে হচ্ছে, সেই বিষের প্রভাবে যেন আমার প্রাণের শিরা কাটা যাচ্ছে।[১৭]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের উদ্দেশ্যেও ওসিয়ত করেন। তাদের তিনি বলেন, 'আস সালাত, আস্ সালাত অমা মালাকাত আইমানুকুম। অর্থাৎ নামায নামায এবং তোমাদের অধীনস্থ দাসদাসী।' নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একথা কয়েকবার উচ্চারণ করলেন।[১৮]

মৃত্যুকালীন অবস্থা

ওফাতকালীন অবস্থা শুরু হলো। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেহে ঠেস দিয়ে ধরে রাখলেন। তিনি বলেন, আল্লাহর একটি নেয়ামত আমার ওপর এই যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে, আমার হিসেবের দিনে, আমার কোলের ওপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর ওফাতের সময়ে আল্লাহ তায়ালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এবং আমার থুথু একত্রিত করেন। ঘটনা ছিলো এই যে, আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা.) এসেছিলেন, সে সময় তার হাতে ছিলো মেসওয়াক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার গায়ের ওপর হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন। আমি লক্ষ্য করলাম যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মেসওয়াকের প্রতি তাকিয়ে আছেন। আমি বুঝলাম যে, তিনি মেসওয়াক চান। বললাম আপনার জন্যে নেব কি? তিনি মাথা নেড়ে ইশারা করলেন। আমি মেসওয়াক এনে তাঁকে দিলাম। কিন্তু শক্ত অনুভুত হলো। বললাম, আপনার জন্যে নরম করে দেবো? তিনি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন। আমি দাঁত দিয়ে নরম করে দিলাম। এরপর তিনি বেশ ভালোভাবে মেসওয়াক করলেন। তাঁর সামনে একটি পাত্রে পানি ছিলো। তিনি হাত ভিজিয়ে চেহারা মুছছিলেন এবং বলছিলেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। মৃত্যু বড় কঠিন।[১৯]

মেসওয়াক শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাত অথবা আঙ্গুল তুললেন। এ সময় তাঁর দৃষ্টি ছিলো ছাদের দিকে। উভয় ঠোঁট তখনো নড়ছিলো। তিনি বিড় বিড় করে কি যেন বলছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) মুখের কাছে কান পাতলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বলছিলেন, হে আল্লাহ তায়ালা! নবী, সিদ্দিক, শহীদ ও সৎ ব্যক্তি যাদের তুমি পুরস্কৃত করেছ, আমাকে তাদের দলর্ভুক্ত কর, আমাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ তায়ালা আমাকে মার্জনা করো, আমার ওপর রহম করো এবং আমাকে 'রফিকে আলায়' পৌছে দাও। হে আল্লাহ তায়ালা! রফিকে আলা![২০]

---

[১৭]. সহীহ বোখারী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৬৩৭
[১৮]. সহীহ বোখারী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৬৩৭
[১৯]. সহীহ বোখারী, দ্বীয় খন্ড, পৃ. ৬৪০
[২০]. সহীহ বোখারী, মরযে নবী অধ্যায় এবং নবী জীবনের শেষ কথা অধ্যায়, দ্বিতীয় খন্ড পৃ. ৬৩৮-৬৪১

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ কথাটি তিনবার উচ্চারণ করেন। এর পরপরই তাঁর হাত ঝুঁকে পড়লো এবং তিনি পরম প্রিয়ের সন্নিদ্ধে চলে গেলেন। 'ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।' অর্থাৎ আমরা সবাই আল্লাহর জন্যে এবং তাঁর কাছেই আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

এ ঘটনা ঘটেছিলো একাদশ হিজরীর ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার চাশত এর নামাযের শেষ সময়ে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স ছিলো তখন তেষট্টি বছর চারদিন।

চারদিকে শোকের ছায়া

হৃদয়বিদারক এ শোক সংবাদ অল্পক্ষণের মধ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। মদীনার জনগণ শোকে অভিভূত হয়ে গেলেন। চারদিকে ছেয়ে গেলো শোকের কালো ছায়া। হযরত আনাস (রা.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেদিন আমাদের মাঝে আগমন করেছিলেন সেদিনের চেয়ে সমুজ্জল দিন আমি আর কখনো দেখিনি। আর যেদিন তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন, তার চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন দিন আমি আর কখনো দেখিনি।[২১] প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর হযরত ফাতেমা (রা.) শোকে কাতর হয়ে বললেন, 'হায় আব্বাজান, যিনি পরওয়ারদেগারের ডাকে লাব্বায়ক বলেছিলেন। হায় আব্বাজান, যাঁর ঠিকানা হচ্ছে জান্নাতুল ফেরদাউস। হায় আব্বাজান, আমি জিবরাঈল (আ.)-কে আপনার ওফাতের খবর জানাচ্ছি।'[২২]

হযরত ওমর ও হযরত আবু বকরের প্রতিক্রিয়া

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের খবর শুনে হযরত ওমর (রা.) জ্ঞানহারা হয়ে পড়লেন। তিনি দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, কিছু কিছু মোনাফেক মনে করে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত হয়েছে, কিন্তু আসলে তাঁর ওফাত হয়নি। তিনি তাঁর প্রতিপালকের কাছে ঠিক সেইভাবে গেছেন যেভাবে হযরত মূসা ইবনে এমরান (আ.) গিয়েছিলেন। হযরত মূসা (আ.) তাঁর কওমের কাছ থেকে চল্লিশ দিন অনুপস্থিত থাকার পর পুনরায় ফিরে এসেছিলেন অথচ তাঁর ফিরে আসার আগে তাঁর স্বজাতীয়রা বলাবলি করছিলো যে, মূসা (আ.)-এর ওফাত হয়েছে। আল্লাহর শপথ, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও ফিরে আসবেন এবং যারা মনে করছে তিনি মারা গেছেন তিনি তাদের হাত পা কেটে ফেলবেন।[২৩]

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) সানহা নামক জায়গায় নিজের বাড়ীতে ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের খবর শুনে ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত ছুটে এলেন এবং মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলেন। এরপর কাউকে কোন কথা না বলে সোজা হযরত আয়েশা (রা.)-এর ঘরে গেলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহ মোবারক তখন ডোরাকাটা ইয়েমেনী চাদরে ঢাকা ছিলো। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) পবিত্র চেহারা থেকে চাদর সরালেন, চুম্বন করলেন এবং কাঁদলেন। এরপর বললেন, আমার মা বাবা আপনার ওপর কোরবান

---

[২১]. দারেমী, মেশকাত, দ্বিতীয় খন্ড , পৃ. ৫৪৭
[২২]. সহীহ বোখারী, মরযে নবী অধ্যায় দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৬৪১
[২৩]. ইবনে হিশাম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৬৫৫

হোক, আল্লাহ তায়ালা আপনার জন্যে দু'টি মৃত্যু একত্রিত করবেন না। যে মৃত্যু আপনার জন্যে লেখা ছিলো তা আপনার হয়েছে।

এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বাইরে এলেন। হযরত ওমর (রা.) সমবেত লোকেদের সাথে কথা বলছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁকে বললেন, ওমর বসে পড়ো। হযরত ওমর (রা.) বসতে অস্বীকৃতি জানালেন। এদিকে সাহাবারা হযরত ওমরকে ছেড়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রতি মনোযোগী হলেন। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, তোমাদের মধ্যেকার যে ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূজা করতো সে যেন জেনে রাখে যে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাত হয়নি। আর তোমাদের মধ্যেকার যে ব্যক্তি আল্লাহর এবাদাত করতো তারা যেন জেনে রাখে যে, আল্লাহ তায়ালা চিরঞ্জীব, তিনি কখনো, মৃত্যুবরণ করবেন না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ রব্বুল আলামীন বলেছেন, 'মোহাম্মদ কেবল রসূল মাত্র, তাঁর পূর্বে বহু রসূল গত হয়ে গেছে। সুতরাং যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন তবে কি তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহর ক্ষতি করবে না বরং আল্লাহ তায়ালা শীঘ্রই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন।' (সূরা আলে এমরান, আয়াত ১৪৪)

মানসিক যন্ত্রণায় দিশেহারা এবং অস্থির সাহাবারা আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর বক্তব্য শুনে বিশ্বাস করলেন যে, রসূলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রকৃতই ইন্তেকাল করেছেন।

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহর শপথ, কেউ যেন জানতোই না যে, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে এই আয়াত নাযিল করে রেখেছেন। আবু বকর (রা.)-এর তেলাওয়াতের পর সবাই এই আয়াত মুখস্থ করলেন। সবার মুখে মুখে তখন এই আয়াত ফিরছিলো।

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব (রা.) বলেন, হযরত ওমর (রা.) বলেছেন, আল্লাহর শপথ, হযরত আবু বকর (রা.)-কে পবিত্র কোরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করতে শুনে আমি যেন মাটি হয়ে গেলাম। আমি দাঁড়াতে পারছিলাম না। হযরত আবু বকরকে এই আয়াত তেলাওয়াত করতে শুনে আমি মাটিতে ঢলে পড়ে যাচ্ছিলাম। কেননা তখন স্পষ্টতই বুঝতে পারছিলাম যে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্যি সত্যিই ইন্তেকাল করেছেন।[২৪]

দাফনের প্রস্তুতি

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাফনের জন্যে কাফন পরানোর আগেই তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়নের প্রশ্নে সাহাবাদের মধ্যে কিছুটা মতবিরোধ দেখা দিলো। ছাকিফা বনি সাআদায় মোহাজের ও আনসারদের মধ্যে বাদানুবাদ হলো। অবশেষে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর খেলাফতের ব্যাপারে সবাই একমত হলেন। একাজে সোমবারের বাকি দিন কেটে গেলো। রাত এসে গেলো। সবাই কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। পরদিন সকাল হলো, সেদিন ছিলো মঙ্গলবার। তখনো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র দেহ সেই ইয়েমেনী চাদরে আবৃত ছিলো। ঘরের লোকেরা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

---

[২৪] সহীহ বোখারী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৬৪০-৬৪১

পরদিন মঙ্গলবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহ অনাবৃত না করেই তাঁকে গোসল দেয়া হলো। যারা গোসল করিয়েছিলেন তারা হলেন হযরত আব্বাস, হযরত আলী, হযরত আব্বাসের দুই পুত্র ফযল এবং ছাকাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মুক্ত করে দেয়া দাস শাকরান, হযরত উসামা ইবনে যায়েদ এবং আওস ইবনে খাওলা (রা.)। হযরত আব্বাস ও তাঁর দুই পুত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাশ ফেরাচ্ছিলেন। হযরত উসামা এবং হযরত শাকরান পানি ঢেলে দিচ্ছিলেন। হযরত আলী (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গোসল দিচ্ছিলেন। হযরত আওস (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের বুকের সাথে চেপে রাখছিলেন।

গোসল দেয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনখানি ইয়েমেনী সাদা চাদর দিয়ে কাফন দেয়া হয়। এতে কোর্তা এবং পাগড়ি ছিলো না।[২৫] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুধু চাদর দিয়েই জড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোথায় দাফন করা হবে, সে সম্পর্কেও সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, সকল নবীকেই যেখান থেকে তুলে নেয়া হয়েছে, সেই জায়গায় দাফন করা হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত হওয়ার পর হযরত আবু তালহা (রা.) সেই বিছানা ওঠালেন, যে বিছানায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেন। সেই বিছানার নীচে কবর খনন করা হয়।

এরপর দশজন দশজন করে সাহাবা হুজরায় প্রবেশ করে পর্যায়ক্রমে জানাযার নামায আদায় করেন। এ নামাযে কেউ ইমাম হননি। সর্বপ্রথম বনু হাশেম গোত্রের লোকেরা নামায আদায় করেন। এরপর মোহাজের এরপর আনসারা, এরপর অন্যান্য পুরুষ এরপর মহিলা, এবং সবশেষে শিশুরা জানাযার নামায আদায় করেন।

জানাযার নামায আদায়ে মঙ্গলবার পুরো দিন অতিবাহিত হয়। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দাফন করা হয়। তাঁর পবিত্র দেহ কবরের ভেতর রাখা হয়।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ঠিক কখন দাফন করা হয় আমরা জানতে পারিনি। তবে বুধবার রাতের মাঝামাঝি সময়ে কিছু শব্দ পেয়েছিলাম।[২৬]

---

২৫. সহীহ বোখারী, প্রথম খন্ড, পৃ. ১৬৯, সহীহ মুসলিম প্রথম খন্ড, পৃ. ৩০৬

২৬. শেখ আবদুল্লাহ রচিত মুখতাছার সীরাতে রসূল পৃ. ৪৭১ এ ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন বোখারী শরিফের মরজুন নবী অধ্যায়। আরো দেখুন ফতহুল বারী, সহীহ মুসলিম, মেশকাত। এছাড়া ইবনে হিশাম দ্বিতীয় খন্ড, পৃ. ৬৪৯-৬৬৫, তালকীহ, পৃ. ৩৮-৩৯, রহমতুল লিল আলামীন প্রথম খন্ড, পৃ. ২৭৭-২৮৬

নবী পরিবারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

(১) হযরত খাদিজা (রা.)

হিজরতের আগে মক্কায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরিবার ছিলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর স্ত্রী হযরত খাদিজা (রা.)-এর সমন্বয়ে গঠিত। এই বিয়ের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স ছিলো পঁচিশ এবং বিবি খাদিজার বয়স ছিলো চল্লিশ বছর। হযরত খাদিজা (রা.) ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথমা স্ত্রী। তাঁর জীবদ্দশায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্য কোন বিয়ে করেননি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তানদের মধ্যে একমাত্র হযরত ইব্রাহীম ছাড়া অন্য সবাই ছিলেন বিবি খাদিজার গর্ভজাত। পুত্রদের মধ্যে কেউই জীবিত ছিলেন না। তবে কন্যারা জীবিত ছিলেন। তাঁদের নাম হচ্ছে হযরত যয়নব, হযরত রোকাইয়া, হযরত উম্মে কুলসুম এবং হযরত ফাতেমা (রা.)। যয়নবের বিয়ে হিজরতের আগে তাঁর ফুফাত ভাই হযরত আবুল আস ইবনে রবির সাথে হয়েছিলো। রোকাইয়া এবং উম্মে কুলসুমের বিয়ে পর্যায়ক্রমে হযরত ওসমান (রা.)-এর সাথে সম্পন্ন হয়। হযরত ফাতেমা (রা.)-এর বিয়ে বদর এবং ওহুদ যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা.)-এর সাথে হয়। তাঁদের চার সন্তান হলেন হযরত হাসান, হযরত হোসাইন, হযরত যয়নব এবং হযরত উম্মে কুলসুম (রা.)।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতের চেয়ে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্টের অধিকারী ছিলেন। তিনি বিভিন্ন উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে চারটির বেশী বিয়ে করার অনুমতি পান, একথা সকলেরই জানা আছে। যে সকল মহিলার সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন তাঁদের সংখ্যা ছিলো এগারো। নবী (স)-এর ইন্তেকালের সময় তাদের নয়জন জীবিত ছিলেন। দু'জন তাঁর জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেন। এঁরা হচ্ছেন হযরত খাদিজা এবং উম্মুল মাসাকিন হযরত যয়নব বিনতে খোজায়মা (রা.)। এছাড়া অন্য দু'জন মহিলার সাথেও তিনি বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন বলে বলা হয়ে থাকে, কিন্তু তাদের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে হয়েছিলো কিনা সে ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। তবে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, উল্লিখিত দু'জন মহিলাকে তাঁর কাছে রোখসত করা হয়নি। নীচে আমরা হযরত খাদিজার পর নবী সহধর্মিনীদের নাম এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পর্যায়ক্রমে তুলে ধরছি।

(২) হযরত সওদা বিনতে জামআ

বিবি খাদিজা (রা.)-এর ইন্তেকালের কয়েক দিন পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়তের দশম বছরের শওয়াল মাসে এ বিধবার সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন। উল্লেখ্য এর আগে হযরত সওদা তাঁর চাচাতো ভাই সাকরান ইবনে আমবের সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

(৩) হযরত আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা.)

নবুয়তের একাদশ বর্ষের শওয়াল মাসে তাঁর সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে হয়। অর্থাৎ হযরত সওদার সাথে বিয়ের এক বছর পর এবং হিজরতের দুই বছর পাঁচ মাস আগে। সে সময় হযরত আয়েশার বয়স ছিলো মাত্র ছয় বছর। হিজরতের সাত মাস পরে শওয়াল মাসের পয়লা তারিখে হযরত আয়েশাকে স্বামীর বাড়ীতে পাঠানো হয়। সে সময় তাঁর নয় বছর এবং তিনি ছিলেন কুমারী। হযরত আয়েশা (রা.) ব্যতীত অন্য কোন কুমারী মেয়েকে নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিয়ে করেননি। হযরত আয়েশা ছিলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী। উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাধিক জ্ঞানসম্পন্ন ফকীহ।

(৪) হযরত হাফসা বিনতে ওমর (রা.)

তাঁর প্রথম স্বামী ছিলেন খুনায়েস ইবনে হাযাফা সাহমি (রা.)। বদর ও ওহুদ যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে তার স্বামী ইন্তেকাল করেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তেসরা হিজরী সালে তাঁর সাথে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হন।

(৫) হযরত যয়নব বিনতে খোযায়মা (রা.)

তিনি ছিলেন বনু হেলাল ইবনে আমের ইবনে সাআসাআর সাথে সম্পর্কিত। গরীব মিসকিনদের প্রতি তাঁর অসামান্য মমত্ববোধ এবং ভালোবাসার কারণে তাঁকে উম্মুল মাসাকিন উপাধি প্রদান করা হয়। তিনি ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ (রা.)-এর স্ত্রী। জঙ্গে ওহুদে উক্ত সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চতুর্থ হিজরীতে তাঁর সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন। আট মাস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী হিসাবে থাকার পর তিনি ইন্তেকাল করেন।

(৬) উম্মে সালমা হিন্দ বিনতে আবি উমাইয়া (রা.)

তিনি আবু সালমা (রা.)-এর স্ত্রী ছিলেন। চতুর্থ হিজরীর জমাদিউস সানিতে তিনি বিধবা হন। একই হিজরী সালের শওয়াল মাসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন।

(৭) যয়নব বিনতে জাহাশ ইবনে রিয়াব (রা.)

তিনি ছিলেন বনু আছাদ ইবনে খোযায়মা গোত্রের মহিলা এবং রসূলে খোদার ফুফাতো বোন। তাঁর বিয়ে প্রথমে হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রা.)-এর সাথে হয়েছিলো। হযরত যায়েদকে মনে করা হতো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছেলে। কিন্তু হযরত যায়েদের সাথে যয়নবের বনিবনা হয়নি, ফলে হযরত যায়েদ তাঁকে তালাক দেন। যয়নবের ইদ্দত শেষ হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা রব্বুল আলামীন এই আয়াত নাযিল করেন। 'অতপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে বিয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করলো, তখন আমি তাকে আপনার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম। (সূরা আহযাব, আয়াত, ৭)

এ সম্পর্কে সূরা আহযাবে আরো কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে। এসব আয়াতে পালক পুত্র সম্পর্কিত বিতর্কের সুষ্ঠু ফয়সালা করে দেয়া হয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হবে। হযরত যয়নবের সাথে পঞ্চম হিজরীর জিলকদ মাসে বা এর কিছু আগে রসূলের বিয়ে হয়।

(৮) যুয়াইরিয়া বিনতে হারেস (রা.)

তার পিতা ছিলেন খোযাআ গোত্রের শাখা বনু মুস্তালিকের সর্দার। বনু মুস্তালিকের যুদ্ধবন্দীদের সাথে হযরত জুয়াইরিয়াকেও হাযির করা হয়। তিনি হযরত ছাবেত ইবনে কয়েস ইবনে শাম্মাস (রা.)-এর ভাগে পড়েছিলেন। হযরত ছাবেত (রা.) শর্ত সাপেক্ষে তাঁকে মুক্তি দেয়ার কথা জানান। শর্ত হিসাবে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের কথা বলা হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ খবর জানার পর হযরত জুয়াইরিয়ার পক্ষ থেকে নির্ধারিত অর্থ পরিশোধ করে তার মুক্তির ব্যবস্থা করে তাকে বিয়ে করেন। এটা পঞ্চম হিজরীর শাবান মাসের ঘটনা।

(৯) উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান (রা.)

তিনি ছিলেন উবায়দুল্লাহ ইবনে জাহাশের স্ত্রী। স্বামীর সাথে হিজরত করে তিনি হাবশা অর্থাৎ আবিসিনিয়া গমন করেন। সেখানে যাওয়ার পর উবায়দুল্লাহ ধর্মান্তরিত হয়ে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। পরে সেখানে তার মৃত্যু হয়। কিন্তু উম্মে হাবিবা নিজের ধর্ম বিশ্বাস এবং হিজরতের ওপর অটল থাকেন। সপ্তম হিজরীর মহররম মাসে রসূলে খোদা আমর ইবনে উমাইয়া জামিরিকে একখানি চিঠিসহ আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশির কাছে প্রেরণ করেন। সে চিঠিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে হাবিবাকে বিয়ে করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। নাজ্জাশী উম্মে

হাবিবার সম্মতি সাপেক্ষে রসূলে খোদার সাথে তার বিয়ে দেন এবং তাকে শরহাবিল ইবনে হাসানার সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে প্রেরণ করেন।

(১০) হযরত সফিয়া বিনতে হুয়াই (রা.)

তিনি ছিলেন বনু ইসরাইল সম্প্রদায়ের এবং তিনি খয়বরে বন্দী হন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে নিজের জন্যে পছন্দ করায় মুক্ত করে বিয়ে করেন। সপ্তম হিজরীতে খয়বর বিজয়ের পর এ ঘটনা ঘটে।

(১১) হযরত মায়মুনা বিনতে হারেস (রা.)

তিনি ছিলেন উম্মুল ফযল লোবাবা বিনতে হারেসের বোন। সপ্তম হিজরীর যিলকদ মাসে 'ওমরায়ে কাযা' শেষ করে এবং সঠিক কথা অনুযায়ী এহরাম থেকে হালাল হওয়ার পর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বিয়ে করেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লিখিত ১১ জন মহিলাকে বিয়ে করেন। অন্য দু'জন মহিলা যাদেরকে তাঁর কাছে রোখসত করা হয়নি তাদের একজন বনু কেলাব গোত্রের এবং অন্যজন কেন্দাহ গোত্রের অধিবাসী ছিলেন। কেন্দাহ গোত্রের এ মহিলার সাথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে হয়েছিলো কিনা এবং তাঁর প্রকৃত নাম ও বংশ পরিচয় কি সে সম্পর্কে সীরাত রচয়িতাদের মধ্যে অনেক মতভেদ রয়েছে। সেসব উল্লেখ করার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

দাসীদের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'জন দাসী ছিলেন। এদের একজন হচ্ছেন মারিয়া কিবতিয়া। মিসরের শাসনকর্তা মোকাওকিস তাকে উপঢৌকন হিসাবে প্রেরণ করেন। তার গর্ভ থেকে রসূলে খোদার সন্তান হযরত ইব্রাহীম জন্ম নেন। তিনি দশম হিজরীর ২৮ অথবা ২৯ শে শওয়াল মোতাবেক ৬৩২ ঈসায়ী সালের ২৭ শে জানুয়ারী ইন্তেকাল করেন।

অন্য একজন দাসীর নাম ছিলো রায়হানা, তিনি বনু নাযির বা বনু কোরায়যা গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। বনু কোরায়যা গোত্রের যুদ্ধবন্দীদের সাথে তিনি মদীনায় আসেন। রসূলে খোদা রায়হানাকে পছন্দ করে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখেন। তাঁর সম্পর্কে গবেষকদের ধারণা এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মুক্ত করে বিয়ে করেন। আল্লামা ইবনে কাইয়েম লিখেছেন যে, রায়হানাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাসী হিসাবেই রেখেছিলেন। আবু ওবায়দা লিখেছেন, উল্লিখিত দু'জন দাসী ছাড়াও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আরো দুজন দাসীও ছিলো, এদের এক জনের নাম ছিলো জামিলা। তিনি একটি যুদ্ধে যুদ্ধবন্দী হিসাবে গ্রেফতার হন। অন্য একজন দাসীকে নবী সহধর্মিনী হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হেবা করে দেন।[১]

এখানে আমরা রসূলে খোদার জীবনের একটি বিশেষ দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা খুবই প্রয়োজন মনে করছি। যৌবনের এক বিরাট অংশ অর্থাৎ প্রায় তিরিশ বছরকাল তিনি মাত্র একজন স্ত্রীর সাথে অতিবাহিত করেন। তাও তিনি ছিলেন এমন এক স্ত্রী, যাকে বলা যায় প্রায় বৃদ্ধা। তার মৃত্যুর পর আরেকজন বৃদ্ধা মহিলাকে তিনি বিয়ে করেন। প্রথমে হযরত খাদিজা এরপর হযরত সওদা (রা.)। এভাবে জীবন কাটানোর পর বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পর হঠাৎ করে কি তার মধ্যে যৌনশক্তি এতো বেড়ে গিয়েছিলো যে, তাকে এতোগুলো বিয়ে করতে হলো? নায়ূযুবিল্লাহ তা নয়। নবী জীবনের উল্লিখিত দু'টি অধ্যায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন কোনো মানুষই এমন অপবাদ দিতে পারবে না। আসলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতেই এতোগুলো বিয়ে করেছিলেন। সাধারণ বিয়ের নির্দিষ্ট সংখ্যার উদ্দেশ্যের চাইতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উদ্দেশ্য ছিলো অনেক মহৎ।

---

১. দেখুন যাদুল মায়াদ, প্রথম খন্ড, পৃ. ২৯

এর ব্যাখ্যা এই যে, রসূলে খোদা হযরত আয়েশা এবং হযরত হাফসাকে বিয়ে করে হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমরের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করেছিলেন। একই ভাবে হযরত ওসমান (রা.)-এর হাতে পরপর দুই কন্যাকে তুলে দিয়ে এবং হযরত আলীর সাথে প্রিয় কন্যা হযরত ফাতেমার বিয়ে দিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লিখিত চারজন সাহাবীর সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হন। কেননা উক্ত চারজন সাহাবী ইসলামের ক্রান্তিকালে ইসলামের সৈনিক হিসাবে অতুলনীয় ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দিয়েছিলেন। ইসলামের জন্যে তাঁদের সেবা ও আত্মত্যাগের ঘটনা তো সবার জানা।

আরবের নিয়ম ছিলো যে, তারা আত্মীয়তার সম্পর্ককে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। জামাতা সম্পর্ক আরবদের দৃষ্টিতে বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্পর্ক সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। জামাতার সাথে যুদ্ধ করাকে তারা মনে করে লজ্জাজনক। এই নিয়মের কারণে রসূলে খোদা বিভিন্ন গোত্রের ইসলামের প্রতি শত্রুতার শক্তি খর্ব করতে বিভিন্ন গোত্রের মহিলাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, হযরত উম্মে সালমা ছিলেন বনু মাখযুম গোত্রের অধিবাসী। এই গোত্রের অধিবাসী ছিলো আবু জেহেল এবং খালেদ ইবনে ওলীদ। এই গোত্রে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পর খালেদ ইবনে ওলীদের মধ্যে ইসলামের প্রতি তেমন প্রবল শত্রুতা লক্ষ্য করা যায়নি। বরং কিছুকাল পর তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এমনিভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু সুফিয়ানের কন্যা উম্মে হাবিবাকে বিয়ে করার পর আবু সুফিয়ান ইসলামের শত্রুতা করলেও কখনো রসূলে খোদার সামনে আসেননি। হযরত যোয়াইরিয়া এবং হযরত সফিয়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বিয়ে হওয়ার পর বনু মুস্তালেক এবং বনু নাযির গোত্র ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছেড়ে দেয়। এই দু'টি গোত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পর এরা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

হযরত যোয়াইরিয়া তো তাঁর গোত্রের মধ্যে গোত্রের সকল মহিলার চেয়ে অধিক বরকতসম্পন্না বলে বিবেচিত হন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বিয়ে করার পর সাহাবায়ে কেরাম উক্ত গোত্রের একশত যুদ্ধবন্দী পরিবারকে বিনাশর্তে মুক্তি দেন। তারা বলছিলেন যে, এরা তো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শ্বশুর পক্ষের লোক। গোত্রের লোকদের মনে এই দয়ার অসামান্য প্রভাব পড়েছিলো।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি উচ্ছৃঙ্খল জাতিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের মানসিক পরিশুদ্ধির ব্যবস্থা করে সভ্যতা-সংস্কৃতির আলোয় আলোকিত করার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন। ওরা ছিলো সভ্যতা-সংস্কৃতির সকল উপায় উপকরণ এবং সমাজ বিকাশের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে অনভিজ্ঞ। যে সকল নীতির ভিত্তিতে ইসলামী সমাজ গড়ে তোলা দরকার ছিলো তার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ ভেদাভেদ করার কোন সুযোগ ছিলো না। কিন্তু ভেদাভেদমুক্ত চিন্তাধারার আলোকে মহিলাদের সরাসরি শিক্ষা দেয়াও সম্ভব ছিলো না। অথচ তাদেরকে শিক্ষা দেয়ার প্রয়োজনীয়তা কোন অংশেই পুরুষদের চেয়ে কম ছিলো না বরং বলা যায় বেশীই ছিলো।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এ উদ্দেশ্যের একটি পথই খোলা ছিলো, তা হচ্ছে বিভিন্ন বয়স ও যোগ্যতার মহিলাদের মনোনীত করা এবং তাদের মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বৃহত্তর উদ্দেশ্যের বাস্তবায়ন করা। মনোনীত মহিলাদেরকে তিনি শিক্ষা দিতে এবং মানসিক পরিশুদ্ধি ঘটাতে পারবেন। তাদের শরীয়তের হুকুম-আহকাম শেখাবেন। তাছাড়া তাদেরকে ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি এমনভাবে শিক্ষা দেবেন যাতে করে তারা গ্রাম ও শহরের যুবতী বৃদ্ধা নির্বিশেষে সকল মহিলাকে শরীয়তের বিধি-বিধান শেখাতে পারেন। ফলে মহিলাদের মধ্যে তাবলীগে দ্বীনের দায়িত্ব পূর্ণতা লাভ করবে।

এ কারণেই আমরা লক্ষ্য করি যে, দাম্পত্য জীবন তথা পারিবারিক জীবনের রীতিনীতি শিক্ষা দিতে উম্মুল মোমেনীনরা বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন। বিশেষত যাঁরা দীর্ঘায়ু হয়েছিলেন তারা এ দায়িত্ব পালনের সুযোগ বেশী পেয়েছিলেন। যেমন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রঃ)-এর কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি নবী জীবনের কথা ও কাজের বর্ণনা ব্যাপকভাবে উল্লেখ করেছেন।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি বিষয় জাহেলী যুগের রীতি-নীতি নস্যাৎ করে দিয়েছিলো। আরব সমাজে এই কুসংস্কার যুগ যুগ ধরে চলে আসছিলো। নিয়ম ছিলো যে, পালকপুত্র হিসাবে কাউকে গ্রহণ করলে সে আসল পুত্রের মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করবে। এই নিয়ম আরব সমাজে এমন দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয়ে বসেছিলো যে, তা বিলোপ করা মোটেই সহজ ছিলো না। অথচ এই নিয়ম ইসলামের বিয়ে, তালাক, সম্পত্তি আইন এবং অন্যান্য বিষয়ের সাথে ছিলো মারাত্মকভাবে সংঘাতপূর্ণ। এছাড়া জাহেলী যুগের এই কুসংস্কার এমন সব নির্লজ্জ কার্যকলাপ এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছিলো যে, সেসব থেকে সমাজদেহকে মুক্ত করা ইসলামের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। জাহেলী যুগের এই কুসংস্কার নির্মূল করার উদ্দেশ্যেই স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামীন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের বিয়ে করান।

উল্লেখ্য হযরত যয়নব প্রথমে হযরত যায়েদের স্ত্রী ছিলেন। আর যায়েদ ছিলেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পালকপুত্র। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হওয়ায় হযরত যায়েদ স্ত্রীকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এটা ছিলো সে সময়ের কথা যখন সকল কাফের ছিলো আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ। কাফেররা সেই সময় খন্দকের যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। এদিকে পালকপুত্র বিষয়ক সমস্যা সমাধানের জন্যে আল্লাহর নির্দেশ ঘোষিত হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ধারণা করলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে যদি যায়েদ তার স্ত্রীকে তালাক দেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যদি যায়েদের পরিত্যক্ত স্ত্রীকে বিয়ে করতে হয়, তাহলে বিধর্মীরা সুযোগ পাবে। মোনাফেক মোশরেক এবং ইহুদীরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে প্রবল প্রোপাগান্ডা শুরু করবে ও সরল প্রাণ মুসলমানদের মন বিষিয়ে তোলার চেষ্টা করবে। তাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ চেষ্টাই করলেন যেন হযরত যায়েদ তার স্ত্রীকে তালাক না দেন। এতে যায়েদের স্ত্রীকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে করার প্রশ্নও উঠবে না। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এটা পছন্দ করলেন না। আল্লাহ তায়ালা তার রসূলের প্রতি রূঢ় বক্তব্য সম্বলিত এই আয়াত নাযিল করলেন, 'স্মরণ কর, আল্লাহ তায়ালা যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও যার প্রতি অনুগ্রহ করেছো তুমি তাকে বলছিলে, তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখো এবং আল্লাহকে ভয় করো। তুমি তোমার অন্তরে যা গোপন করছো আল্লাহ তায়ালা তা প্রকাশ করে দিচ্ছেন, তুমি লোকভয় করছিলে, অথচ আল্লাহকে ভয় করাই তোমার পক্ষে অধিকতর সঙ্গত।' (সূরা আহযাব, আয়াত ৩৭)

অবশেষে হযরত যায়েদ হযরত যয়নবকে তালাক দেন। এরপরে ইদ্দতকাল শেষ হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা তখন হযরত যয়নবকে বিয়ে করতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম--এর প্রতি নিজ ফয়সালা জানিয়ে দেন। আল্লাহ তায়ালা তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যে এই বিয়ে অত্যাবশ্যকীয় করেন। দেরী করার কোন অবকাশও রাখা হয়নি। পবিত্র কোরআনের বক্তব্য এরূপ, 'অতপর যায়েদ যখন তার সাথে বিয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করলো তখন আমি তাকে তোমার সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করলাম যাতে মোমেনদের পোষ্যপুত্ররা নিজ স্ত্রীর সাথে বিয়ে ছিন্ন করলে সেই সব রমণীকে বিয়ে করা মোমেনদের কোন বিঘ্ন না হয়। আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে।' (সূরা আহযাব, আয়াত ৩৭)

এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, পালিতপুত্রের ব্যাপারে জাহেলী যুগের রীতি নীতি তথা বদ্ধমূল কুসংস্কারের মূলোৎপাটন। এর আগেই কোরআনের আয়াতে এই কুসংস্কারের মূলোৎপাটন

করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমরা ওদের ডাকো ওদের পিতৃ পরিচয়ে, আল্লাহর দৃষ্টিতে এটাই ন্যায়সঙ্গত।' (সূরা আহযাব, আয়াত ৫)

আল্লাহ তায়ালা অন্য এক আয়াতে বলেন, 'মোহাম্মদ তোমাদের মধ্যেকার পুরুষদের কারো পিতা নন, বরং তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং খাতামুন নবী।'

এখানে একটা কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, সমাজ জীবনে কোন রেওয়ায বদ্ধমূল হয়ে গেলে তখন শুধুমাত্র কথা দিয়ে তার মূলোউৎপাটন করা যায় না। সেই রেওয়াজের পরিবর্তন সাধনের জন্যে শুধু কথাই যথেষ্ট নয় বরং যিনি পরিবর্তন চান তাকে কাজের মাধ্যমে বাস্তব দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে হয়। এপর্যায়ে একটা উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় মুসলমানদের পক্ষ থেকে যে তৎপরতা প্রকাশ পেয়েছিলো তার দ্বারা প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করা যায়। সেই সময়ে মুসলমানদের নিবেদিত চিত্ততা ছিলো বিস্ময়কর। ওরওয়া ইবনে মাসউদ ছাকাফি লক্ষ্য করেছিলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখের থুথু কফ মুসলমানরা মাটিতে পড়তে দিচ্ছিলেন না। কেউ না কেউ হাত পেতে নিচ্ছিলেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওযু করার সময়ে পরিত্যক্ত পানি গ্রহণের জন্যে সাহাবাদের মধ্যে কাড়াকাড়ি লেগে যেতো। এই সাহবারাই বাইয়াতে রেদোয়ানের সময় গাছের ছায়ায় মৃত্যুবরণ করা এবং পলায়ন না করার জন্যে বাইয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিযেগিতা করছিলেন, এসব সাহাবাদের মধ্যে হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমরের মতো বিশিষ্ট সাহাবাও ছিলেন। এসব সাহাবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যে জীবন দেয়াও তার জন্যে বেঁচে থাকাকে সৌভাগ্য এবং সাফল্য মনে করছিলেন। অথচ হোদায়বিয়ার চুক্তি সম্পাদনের পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাহাবাদের বললেন তাদের নিজ নিজ কোরবানীর পশু যবাই করতে, তখন কেউ সাড়া দিলেন না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন ভীষণ মনোকষ্টে ভুগছিলেন। নবীপত্নী হযরত উম্মে সালমা (রা.) তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরামর্শ দিলেন যে, আপনি নিজের কোরবানীর পশু চুপচাপ যবাই করুন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই করলেন। সাহাবারা তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণের জন্যে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিলেন। তারা ছুটে গিয়ে নিজেদের কোরবানীর পশু যবাই করলেন। এ ঘটনা থেকে স্পষ্টতই একথা বোঝা যায় যে, প্রচলিত নিয়মের পরিবর্তন সাধনের ক্ষেত্রে কথা ও কাজের পার্থক্য কতো বেশী। আর জাহেলী যুগের প্রচলিত পালিতপুত্র বিষয়ক জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যেই আল্লাহ তায়ালা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পালিত পুত্রের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর সাথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিয়ে দেন।

এ বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পর মোনাফেকরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার ও প্রোপাগান্ডা চালাতে শুরু করে। তারা নানা ধরনের গুজব রটাতে থাকে। এর কিছুটা প্রভাব সরলপ্রাণ মুসলমানদের ওপরও এসে পড়ে। এ প্রোপাগান্ডকে শক্তিশালী করতে মোনাফেকরা শরীয়াতের একটি যুক্তিও খুঁজে নেয়। তারা প্রচার করে যে, ইসলাম চারটি বিয়ে বৈধ করেছে অথচ রসূল তার পালিত পুত্র যায়েদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে পঞ্চম স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। একজন মুসলমানের জন্যে চারের বেশী স্ত্রী গ্রহণ তো ইসলামেই বৈধ নয়। প্রচার-প্রোপাগান্ডার মূল বিষয় ছিলো এই যে, হযরত যায়েদ তো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পালিতপুত্র, নিজের পালিতপুত্রের স্ত্রীকে নিজের স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করাতো নির্লজ্জতাপূর্ণ ঘৃণ্য কাজ। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা সূরা আহযাবে উল্লিখিত উভয় বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করে আয়াত নাযিল করেন। সাহাবারা তখন বুঝতে পারেন যে, ইসলামে পালিতপুত্রের কোন মূল্য নেই। এছাড়া আল্লাহ তায়ালা মহৎ কোন উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতেই নিজ রসূলকে বিয়ের সংখ্যার ক্ষেত্রে ব্যাপকতা দিয়েছেন। এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট অন্য কাউকে দেয়া হয়নি।

উম্মাহাতুল মোমেনীনদের সাথে প্রিয় নবী অত্যন্ত আভিজাত্যপূর্ণ, সম্মানজনক উচ্চ পর্যায়ের এবং উন্নত জীবন যাপন করেন। নবীসহধর্মিনীরা নম্রতা, ভদ্রতা, শালীনতা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা,

সেবা পরায়ণতা, স্বামীর অধিকার পূরণ ইত্যাদি সকল বিষয়েই ছিলেন প্রশংসনীয় ভূমিকা পালনকারিণী। অথচ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বড়ই নীরস নির্বিলাস জীবন যাপন করতেন। সে জীবনের সাথে তাল মিলিয়ে চলা অন্যদের জন্যে মোটেই সহজ ছিলো না।

হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি জানিনা যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো ময়দার নরম রুটি খেয়েছেন। এমন করেই তিনি আল্লাহর সাথে মিলিত হয়েছেন। এছাড়া তিনি কখনো ভূনা করা বকরি চোখে দেখেননি।[২]

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) বলেন, দুই দুই মাস কেটে যেতো, তৃতীয় মাসের চাঁদ দেখা যেতো অথচ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরের চুলোয় আগুন জ্বলতো না। হযরত ওরওয়া জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে আপনারা কি খেতেন? তিনি বললেন ব্যস, দুটি কালো জিনিস। খেজুর এবং পানি।[৩]

এ বিষয়ের হাদীস বহু রয়েছে। এমন কঠোর দারিদ্রতা সত্তেও নবীসহধর্মিনীদের কোন আপত্তিকর আচরণ লক্ষ্য করা যায়নি।

সহজাত স্বভাব দূর্বলতার কারণে একবার কিছু ত্রুটি হয়ে পড়েছিলো। তাছাড়া এক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন ছিলো। একারণে এই আয়াত নাযিল হয়, 'হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদের বলে দাও, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার ভূষণ কামনা করো তবে এসো আমি তোমাদের ভোগ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় দিই। আর যদি তোমরা আল্লাহ তায়ালা, তাঁর রসূল ও আখেরাত কামনা করো তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ তায়ালা তাদের জন্যে মহা প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন।' (সূরা আহযাব, আয়াত ২৮-২৯)

নবী সহধর্মিনীরা সকলেই আল্লাহ তায়ালা এবং তাঁর রসূলকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাদের শ্রেষ্ঠত্ব মর্যাদা এ থেকেই, অনুমান করা যায়, তাদের মধ্যে কেউই দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়েননি।

সতীনদের মধ্যে যেসব ঘটনা সচরাচর প্রকাশ পায়, নবীসহধর্মিনীরা অধিক সংখ্যক হওয়া সত্তেও ওই ধরনের ঘটনা খুব কমই ঘটেছে। সামান্য কিছু ঘটে থাকলেও যখন সাবধান করে দেয়া হয়েছে তখন কারো পক্ষ থেকেই প্রশ্ন তোলার মতো কোন ঘটনা প্রকাশ পায়নি। সূরা তাহরীমের প্রথম পাঁচটি আয়াতে এসম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে।

পরিশেষে একথা বলা অসমীচীন হবে না যে, এখানে আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীদের সংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করি না। কেননা এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী সোচ্চার হচ্ছে পাশ্চাত্যের অধিবাসীরা। তারা কি ধরনের জীবন যাপন করছে? দুর্ভাগ্যও তিক্ততার শিকার তারা অহরহ হচ্ছে। অবমাননাকর জীবন যাপন এবং অপরাধের মধ্যে তারা আগাগোড়া ডুবে আছে। স্ত্রীদের সংখ্যাধিক্যের নীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে ও এ ব্যাপারে সমালোচনায় সোচ্চার হয়ে তারা যে দুঃখ, কষ্ট ও হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে রয়েছে, সে ব্যাপারে কি আলোচনার কোন প্রয়োজন আছে?[৪] তাদের দুর্ভাগ্যজনক জীবন যাপন পদ্ধতি দেখেই প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রী সংখ্যাধিক্যের ইসলামী নীতি বিজ্ঞানসম্মত। জ্ঞানী, গুণী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্যে এতে রয়েছে চমৎকার মীমাংসা।

---

[২]. সহীহ বোখারী, দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ৯৫৬

[৩] একই গ্রন্থ একই পৃষ্ঠা,

৪. একাধীক স্ত্রীর তুলনায় একাধীক গার্লফ্রেন্ড কি অধিক রুচিসম্মত?

তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট ও শারীরিক সৌন্দর্য

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামএমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট ও শারীরিক সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন, যা বলে শেষ করা যাবে না। এসব কারণে তাঁর প্রতি মন আপনা থেকেই নিবেদিত হয়ে যেতো। ফলে তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং মর্যাদা বিধানে মানুষ এমন নিবেদিত চিত্ততার পরিচয় দিতো যার উদাহরণ দুনিয়ার অন্য কোন ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রেই পেশ করা সম্ভব নয়। তাঁর বন্ধু ও সহচররা তাঁকে প্রাণের চেয়ে বেশী ভালোবাসতেন। তারা চাইতেন যে, যদি প্রয়োজন হয় তবে নিজের মাথা কাটিয়ে দেবেন তবু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহ মোবারকে একটি আঁচড়ও যেন না লাগে। এ ধরনের ভালোবাসার কারণ ছিলো এই যে, স্বভাবসম্মত যেসব গুণের প্রতি মনপ্রাণ উজাড় করে দেয়ার ইচ্ছে জাগে সেসব গুণের সমাবেশ তাঁর মধ্যে এতো বেশী ছিলো যে, অন্য কারো মধ্যেই সে রকম ছিলো না। নিচে আমরা বিনয়ের সাথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সৌন্দর্য সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহের সারকথা উল্লেখ করছি।

প্রিয় নবীর দৈহিক গঠনপ্রকৃতি

হিজরতের সময়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে মাবাদ খোযাইয়ার তাঁবুতে কিছুক্ষণ অবস্থানের পর মদীনার পথে রওয়ানা হয়ে যান। তাঁর চলে যাওয়ার পর উম্মে মাবাদ স্বামীর কাছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে পরিচয় তুলে ধরেন তা ছিলো এরূপ। চমকানো রং, উজ্জ্বল চেহারা, সুন্দর গঠন, সটান সোজাও নয়, আবার ঝুঁকে পড়াও নয়, অসাধারণ সৌন্দর্যের পাশাপাশি চিত্তাকর্ষক দৈহিক গঠন, সুর্মারাঙা চোখ, লম্বা পলক, ঋজু কণ্ঠস্বর, লম্বা ঘাড়, সাদা কালো চোখ, সুর্মাকালো তার পলক, সূক্ষ্ম এবং পরস্পর সম্পৃক্ত ভ্রু, চমকানো কালো চুল, চুপচাপ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, কথা বলার সময়ে আকর্ষণীয়, দূর থেকে দেখে মনে হয় সবার চেয়ে উজ্জল ও সৌন্দর্যপূর্ণ, কাছে থেকে দেখে মনে হয় তিনি সুমহান এবং প্রিয় সুন্দর, কথায় মিষ্টিতা, প্রকাশভঙ্গি সুস্পষ্ট, কথা খুব সংক্ষিপ্তও নয় আবার দীর্ঘায়িতও নয়, কথা বলার সময় মনে হয় যেন মুক্তো ঝরছে, মাঝারি উচ্চতাসম্পন্ন, বেঁটেও নয় লম্বাও নয় যে, দেখে খারাপ মনে হবে। সহচররা তাঁকে ঘিরে যদি কিছু বলে, তবে তিনি সেকথা গভীর মনযোগের সাথে শোনেন। তিনি কোন আদেশ করলে সাথে সাথে তারা সে আদেশ পালন করেন, সহচররা তাঁর অত্যন্ত অনুগত এবং তাঁর প্রতি গভীর সম্মান ও শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করেন, কেউ উদ্ধত ও দুর্বিনীত নয়, কেউ বাহুল্য কথাও বলেন না।[১]

হযরত আলী (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈশিষ্ট বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন যে, তিনি অস্বাভাবিক লম্বা ছিলেন না, আবার বেঁটেও ছিলেন না। তিনি ছিলেন মাঝারি ধরনের গঠন বৈশিষ্টসম্পন্ন। তাঁর চুল কোকড়ানোও ছিলো না, আবার খাড়া খাড়াও ছিলো না—

---

[১] যাদুল মায়াদ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা নং ৫৪।

ছিলো উভয়ের মাঝামাঝি ধরনের। তাঁর কপোল মাংসলও ছিলো না আবার শুকনোও ছিলো না; বরং উভয়ের মাঝামাঝি ধরনের ছিলো। তাঁর কপাল ছিলো প্রশস্ত, গায়ের রং ছিলো গোলাপী গৌর-এর মিশ্ররূপ। চোখ সুর্মারাঙা লালচে, ঘন পল্লব বিশিষ্ট। বুকের ওপর নাভি থেকে হালকা চুলের রেখা, দেহের অন্য অংশ লোমশূন্য। হাত পা মাংসল। চলার সময় স্পন্দিত ভঙ্গিতে পা তুলতেন। তাঁকে হেটে যেতে দেখে মনে হতো তিনি যেন ওপর থেকে নীচের দিকে যাচ্ছেন। কোন দিকে লক্ষ্য করলে পুরো মনোযোগের সাথেই লক্ষ্য করতেন। উভয় কাঁধের মাঝখানে তাঁর মোহরে নবুয়ত ছিলো। তিনি ছিলেন সকল নবীর শেষ নবী। তিনি ছিলেন সর্বাধিক দানশীল, সর্বাধিক সাহসী, সর্বাধিক সত্যবাদী, সর্বাধিক অঙ্গীকার পালনকারী। সর্বাধিক কোমল প্রাণ এবং সর্বাধিক আভিজাত্যসম্পন্ন। হঠাৎ করে কেউ তাঁকে দেখলে ভীতি-বিহবল হয়ে পড়তো, পরিচিত কেউ তাঁর সামনে গেলে ভালোবাসায় ব্যাকুল হতো। তাঁর গুণ বৈশিষ্ট বর্ণনাকারীকে বলতে হতো যে, আমি তাঁর আগে এবং তার পরে তার মতো অন্য কাউকে দেখিনি।[২]

হযরত আলী (রা.)-এর অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তাঁর মাথা ছিলো বড়, জোড়ার হাড় ছিলো ভারি, বুকের মাঝখানে লোমের হালকা রেখা ছিলো। তিনি চলার সময়ে এমনভাবে চলতেন, তখন মনে হতো কেউ যেন উঁচু থেকে নীচুতে অবতরণ করছে।[৩]

হযরত জাবের ইবনে ছামুরা (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পেশী ছিলো চওড়া, চোখ ছিলো লালচে, পায়ের গোড়ালী ছিলো সরু ধরনের।[৪]

হযরত আবু তোফায়েল বলেন, তিনি ছিলেন গৌর রং-এর, চেহারা ছিলো মোলায়েম। তাঁর উচ্চতা ছিলো মাঝামাঝি ধরনের।[৫]

হযরত আনাস ইবনে মালেক বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতের তালু ছিলো প্রশস্ত, রং ছিলো চমকদার, একেবারে সাদাও ছিলো না, একেবারে গম-এর রং ও ছিলো না। ওফাতের সময় পর্যন্ত তাঁর মাথা এবং চেহারার বিশটি চুলও সাদা হয়নি।[৬] শুধু কানের কয়েকটি লোম সাদা হয়েছিলো, এছাড়া মাথার কয়েকটি চুলও সাদা হয়ে গিয়েছিলো।[৭]

হযরত আবু হোযায়ফা বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নীচের ঠোট সংলগ্ন দাড়ি সাদা দেখেছি।[৮]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বাছার (রা.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নীচের ঠোঁটের সংলগ্ন দাড়িতে কয়েকটি সাদা হয়ে গিয়েছিলো।[৯]

হযরত বারা (রা.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন মাঝারি ধরনের উচ্চতাসম্পন্ন। উভয় কাঁধের মাঝখানে দূরত্ব ছিলো। মাথার চুল ছিলো উভয় কানের লতিকা

---

[২] ইবনে হিশাম, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪০১, ৪০২ তিরমিযি শরহে তোহফাতুল আহওয়াযি, চতুর্থ খন্ড পৃষ্ঠা ৩০৩
[৩] তিরমিযি, শরহে তোহফাতুল আহওয়াজি, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩০৩
[৪] সহীহ মুসলিম দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৫৮
[৫] সহীহ মুসলিম দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৫৮
[৬] সহীহ বোখারী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫০২
[৭] সহীহ বোখারী প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ৫০২
[৮] সহীহ বোখারী প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫০১, ৫০২
[৯] ঐ পৃষ্ঠা ৫০২

পর্যন্ত। আমি তাঁকে লাল পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। কখনো কোন জিনিস তাঁর চেয়ে অধিক সৌন্দর্যসম্পন্ন দেখিনি।[১০]

তিনি প্রথমে আহলে কেতাবদের মতো চুল আঁচড়াতে পছন্দ করতেন। একারণে আঁচড়ালে সিঁথি করতেন না, কিন্তু পরবর্তীতে সিঁথি করতেন।[১১]

হযরত বারা ইবনে আজেব (রা.) বলেন, তাঁর চেহারা ছিলো সবচেয়ে সুন্দর এবং তাঁর চেহারা ছিলো সকলের চেয়ে উৎকৃষ্ট।[১২]

হযরত বারা ইবনে আযেব (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা কি তলোয়ারের মতো ছিলো? তিনি বললেন, না বরং তাঁর চেহারা ছিলো চাঁদের মতো। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা ছিলো গোলাকার।[১৩]

রবি বিনতে মোয়াওয়েয (রা.) বলেন, তোমরা যদি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–কে দেখতে, তখন মনে হতো যে, যেন উদিত সূর্যকে দেখছো।[১৪]

হযরত জাবের ইবনে ছামুরা (রা.) বলেন, এক চাঁদনী রাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখেছিলাম। সেই সময় তাঁর পরিধানে ছিলো লাল পোশাক। আমি একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এবং একবার চাঁদের প্রতি তাকাচ্ছিলাম। অবশেষে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাঁদের চেয়েও অধিক সুন্দর।[১৫]

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে অধিক সুন্দর কোন মানুষ কিন্তু আমি দেখিনি। মনে হতো, সূর্য যেন তাঁর চেহারায় জ্বলজ্বল করছে। আমি তাঁর চেয়ে দ্রুত গতিসম্পন্ন কাউকে দেখিনি। তিনি হাঁটতে শুরু করলে যমিন যেন তাঁর পায়ে সঙ্কুচিত হয়ে আসতো। হাঁটার সময়ে ক্লান্ত হয়ে পড়তাম, কিন্তু তিনি থাকতেন নির্বিকার।[১৬]

হযরত কা'ব ইবনে মালেক (রা.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খুশী হতেন, তখন তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। দেখে মনে হতো যেন, এক টুকরো চাঁদ।[১৭]

একবার তিনি হযরত আয়েশার (রা.) কাছে অবস্থান করছিলেন। ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠার পর তাঁর চেহারা আরো উজ্জ্বল সুন্দর দেখাচ্ছিলো। এ অবস্থা দেখে হযরত আয়েশা (রা.) আবু কোবায়ের হাজলির এই কবিতা আবৃত্তি করলেন,[১৮]

'তাঁর চেহারায় তাকিয়ে দেখতে পেলাম
চমকানো মেঘ যেন চমকায় অবিরাম।'

---

[১০] ঐ পৃষ্ঠা ৫০২
[১১] ঐ পৃষ্ঠা ৫০২
[১২] ঐ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ৫০২, সহীহ মুসলিম দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৫৮
[১৩] সহীহ বোখারী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫০২, সহীহ মুসলিম দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৫৯
[১৪] মোসনাদে দারেমী, মেশকাত দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫১৭
[১৫] শামায়েনে তিরমিযি, দারেমী, মেলকাত দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫১৭
[১৬] জামে তিরমিযি, শরহে তোহফাতুল আহওয়াযি, চতুর্থ খন্ড পৃষ্ঠা ৩০৬, মেশকাত দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫১৮
১৭ সহীহ বোখারী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫০২
[১৮] রহমতুল লিল আলামীন দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭২

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) তাঁকে দেখে এই কবিতা আবৃত্তি করতেন।[১৯]

'ভালোর পথে দেন দাওয়াত পূরণ করেন অঙ্গীকার
চতুর্দশীর চাঁদ, লুকোচুরি খেলে যেন অন্ধকার।'

হযরত ওমর (রা.) তাঁর সম্পর্কে যোহাইর-এর এ কবিতা আবৃত্তি করতেন। এ কবিতা হরম ইবনে ছিনাল সম্পর্কে লেখা হয়েছিলো।[২০]

'মানুষ যদি না হতেন এই আল্লার প্রিয়জন
চতুর্দশীর রাত তিনি করতেন তবে রওশন।'

তিনি যখন ক্রোধান্বিত হতেন, তখন তাঁর চেহারা লাল হয়ে যেতো, মনে হতো উভয় কপালে আঙ্গুরের দানা যেন নিংড়ে দেয়া হয়েছে।[২১]

হযরত জাবের ইবনে ছামুরা বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হাসতেন মৃদু হাসতেন, তাঁর চোখ দেখে মনে হতো যেন সুর্মা লাগানো, অথচ সুর্মা লাগানো ছিলো না।[২২]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনের দুটি দাঁত পৃথক পৃথক ছিলো। তাঁর কথা বলার সময় উভয় দাঁতের মধ্য থেকে আলোকআভা বিচ্ছুরিত হতো।[২৩]

তাঁর গ্রীবা ছিলো রৌপ্যের নির্মিত পাত্রের মত পরিচ্ছন্ন, চোখের পলক ছিলো দীর্ঘ, দাড়ি ছিলো ঘন, ললাট ছিলো প্রশস্ত, ভ্রূ পৃথক, নাসিকা উন্নত, নাভি থেকে বক্ষ পর্যন্ত হালকা লোমের রেখা, বাহুতে কিছু লোম ছিলো। পেট এবং বুক ছিলো সমান্তরাল, বুক প্রশস্ত, হাতের তালু প্রশস্ত। পথ চলার সময় তিনি কিছুটা ঝুঁকে পথ চলতেন। মধ্যম গতিতে তিনি পথ চলতেন।[২৪]

হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি এমন কোন রেশম দেখিনি, যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতের তালুর চেয়ে বেশী নরম ছিলো। এমন কোন মেশক আম্বর শুকিনি যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুগন্ধির চেয়ে অধিক সুবাসিত ছিলো।[২৫]

হযরত আবু যোহায়রা (রা.) বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত আমার চেহারার ওপর রেখেছিলাম। সেই সময় আমি অনুভব করলাম যে, সেই হাত বরফের চেয়ে বেশী ঠান্ডা এবং মেশকের চেয়ে বেশী খুশবুদার।[২৬]

কিশোর বয়স্ক হযরত জাবের ইবনে ছামুরা (রা.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার কপোলে হাত রেখেছিলেন, এতে আমি এমন শীতলতা ও সুবাস অনুভব করলাম যে, মনে হলো, তিনি তাঁর পবিত্র হাত আত্তারের আতর দান থেকে বের করেছেন।[২৭]

---

[১৯] খোলাসাতুস সিয়ার পৃষ্ঠা ২০
[২০] খোলাসাতুস সিয়ার পৃষ্ঠা ২০
[২১] মেশকাত ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২২, তিরমিযি আরওয়াবুল কদর, ২য় খন্ড পৃঃ ৩৫
[২২] জামে তিরমিযি শরহে তোহফাতুল আহওয়াযি, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৩০৬
[২৩] তিরমিযি, মেশকাত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫১৮
[২৪] খোলাসাতুস সিয়ার, পৃষ্ঠা ১৯-২০
[২৫] সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড ৫০৩, সহীহ মুসলিম ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৫৮
[২৬] সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৫০২
[২৭] সহীহ মুসলিম, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ২৫৬

হযরত আনাস (রা.) বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘাম ছিলো মুক্তোর মতো। হযরত উম্মে সুলাইম (রা.) বলেন, এই ঘামেই ছিলো সবচেয়ে উত্তম খুশবু।[২৮]

হযরত জাবের (রা.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন রাস্তা দিয়ে পথ চলার পর অন্য কেউ সেই পথে, সেই রাস্তা দিয়ে গেলে বুঝতে পারতো যে, তিনি এ পথে দিয়ে গমন করেছিলেন।[২৯]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উভয় কাঁধের মাঝামাঝি জায়গায় ছিলো মোহরে নবুয়ত। কবুতরের ডিমের মতো দেখতে এই মোহরে নবুয়তের রং ছিলো তাঁর দেহ বর্ণের মতো। এটি বাম কাঁধের নরম হাড়ের পাশে অবস্থিত ছিলো।[৩০]

চারিত্রিক বৈশিষ্ট

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কথা বলতেন। অসঙ্কোচ, অনাড়ষ্ট, দ্ব্যর্থবোধক ও অর্থপূর্ণ কথা। তিনি দূর্লভ বৈশিষ্ট এবং আরবের সকল ভাষার জ্ঞান লাভ করেছিলেন। এ কারণে তিনি যে কোন গোত্রের সাথে সেই গোত্রের ভাষা ও পরিভাষায় কথা বলতেন। বেদুইনদের মতো দৃঢ়তাব্যঞ্জক বাকভঙ্গি, সম্বোধন প্রকৃতি এবং শহরের নাগরিক জীবনের বিশুদ্ধ ভাষা ছিলো তাঁর আয়ত্বাধীন। উপরন্তু ছিলো ওহীভিত্তিক আল্লাহর সাহায্য।

সহিষ্ণুতা, ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতার গুণবৈশিষ্ট তার মধ্যে ছিলো। এসবই ছিলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাক থেকে পাওয়া। সাধারণত সকল ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণুতার অধিকারী মানুষের মধ্যেই কোন না কোন ত্রুটি দেখা যায়, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট এমন উন্নত ও সুন্দর ছিলো যে, তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুদের উদ্যোগ আয়োজন এবং তাঁকে কষ্ট দেয়ার জন্যে দুর্বৃত্তদের তৎপরতা যতো বেড়েছে, তাঁর ধৈর্যও ততো বেড়েছে।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, প্রিয় নবীকে দু'টি কাজের মধ্যে একটি বেছে নিতে বলা হলে তিনি সহজ কাজটিই নিতেন। পাপের সাথে সম্পৃক্ত কাজ থেকে তিনি দূরে থাকতেন। তিনি কখনো নিজের জন্যে কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে, আল্লাহর সম্মান ক্ষুণ্ন করা হলে তিনি আল্লাহর জন্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন।[৩১]

তিনি ক্রোধ ও দুর্বিনীত ব্যবস্থা থেকে দূরে ছিলেন। সকলের প্রতি সহজেই তিনি রাযি হয়ে যেতেন। তাঁর দান ও দয়াশীলতা পরিমাপ করা ছিলো অসম্ভব। দারিদ্রের আশঙ্কা থেকে মুক্ত মানসিকতা নিয়ে তিনি দান খয়রাত করতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সবার চেয়ে বেশী দানশীল। তাঁর দানশীলতা রমযান মাসে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর সাথে সাথে সময় অধিক বেড়ে যেতো। রমযান মাসে প্রতি রাতে হযরত জিবরাঈল (আ.) তার সাথে সাক্ষাৎ করে কোরআন তেলাওয়াত করে শোনাতেন। তিনি কল্যাণ ও দানশীলতায় পরিপূর্ণ বাতাসের চেয়ে অগ্রণী ছিলেন।[৩২]

---

[২৮] সহীহ মুসলিম, ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ২৫৬
[২৯] দায়েমী মেশকাত, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৭
[৩০] সহীহ মুসলিম ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৫৯-২৬০
[৩১] সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৫০৩
[৩২] সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫১৭

হযরত জাবের (রা.) বলেন, কখনোই এমন হয়নি যে, কেউ তাঁর কাছে কিছু চেয়েছে অথচ তিনি তা দিতে অসম্মতি জানিয়েছেন।[৩৩]

বীরত্ব ও বাহাদুরির ক্ষেত্রে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্থান ছিলো সবার ওপরে। তিনি ছিলেন সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বীর। কঠিন পরিস্থিতিতে বিশিষ্ট বীর পুরুষদের যখন পদস্খলন হয়ে যেতো, সেই সময়েও রসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অটল দৃঢ়তায় টিকে থাকতেন। তিনি সেই সুকঠিন সময়েও পশ্চাদপসারণ না করে সামনে এগিয়ে যেতেন। তাঁর দৃঢ়চিত্ততায় এতটুকু বিচলিত ভাব আসত না। হযরত আলী (রা.) বলেন, যে সময় যুদ্ধের বিভীষিকা দেখা যেতো এবং সুকঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো সে সময়ে আমরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছত্র ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করতাম। তাঁর চেয়ে বেশী দৃঢ়তার সাথে অন্য কেউ শত্রুর মোকাবেলা করতে সক্ষম হতো না।[৩৪]

হযরত আনাস (রা.) বলেন, একরাতে মদীনাবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। সবাই আওয়ায লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করলো। পথে নবীজীর সাথে দেখা হলো। তিনি কোলাহল লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলেন। সেই সময় তিনি হযরত আবু তালহার (রা.) একটি ঘোড়ার খালি পিঠে সওয়ার হয়েছিলেন। তাঁর গলায় তরবারি ঝুলানো ছিলো। তিনি লোকদের বলছিলেন, ভয় পেয়ো না, ভয় পেয়ো না।[৩৫]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বাধিক লাজুক প্রকৃতির। তিনি সাধারণত মাটির দিকে দৃষ্টি রাখতেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন পর্দানসীন কুমারী মেয়ের চেয়ে অধিক লজ্জাশীল। কোন কিছু তাঁর পছন্দ না হলে চেহারা দেখেই বোঝা যেতো।[৩৬] কারো চেহারার প্রতি তিনি অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন না। দৃষ্টি নিচু রাখতেন এবং ওপরের দিকের চেয়ে নীচের দিকেই বেশী সময় তাকিয়ে থাকতেন। সাধারণত তাকানোর সময়ে নিচু দৃষ্টিতে তাকাতেন। লজ্জাশীলতা ও আত্মসম্মান বোধ এতো প্রবল ছিলো যে, কারো মুখের ওপর সরাসরি অপ্রিয় কথা বলতেন না। কারো ব্যাপারে কোন অপ্রিয় কথা তাঁর কাছে পৌঁছুলে সেই লোকের নাম উল্লেখ করে তাকে বিব্রত করতেন না। বরং এভাবে বলতেন যে, কিছু লোক এভাবে বলাবলি করছে। বিখ্যাত আরব কবি ফারাযদাক-এর কবিতায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই বৈশিষ্ট চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

'লজ্জাশীল তিনি তাই দৃষ্টি নত তাঁর
তাঁকে দেখে চোখের নযর নত যে সবার'
তাঁর সাথে কথা বলা সম্ভব হয় তখন
অধরে তাঁর মৃদু হাসি ফোটে যখন।'

তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশী ন্যায়পরায়ণ পাক পবিত্র, সত্যবাদী এবং বিশিষ্ট আমানতদার। বন্ধু শত্রু সকলেই এটা স্বীকার করতেন। নবুয়ত লাভের আগে তাঁকে 'আল আমিন' উপাধি দেয়া হয়েছিলো। আইয়ামে জাহেলিয়াতে তাঁর কাছে বিচার-ফায়সালার জন্যে বাদী বিবাদী উভয় পক্ষই

---

[৩৩] সহীহ বোখারী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫১৭
[৩৪] শাফী, কাজী আয়ায প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৮৯, ছেহাহ
[৩৫] সহীহ মুসলিম, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা ২৫২, সহীহ বোখারী, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪০৭
[৩৬] সহীহ বোখারী, ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৫০৪

হাযির হতো। তিরমিযি শরীফে হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার আবু জেহেল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো, আমরা তো আপনাকে মিথ্যাবাদী বলি না, কিন্তু আপনি যা কিছু প্রচার করছেন, তাকে মিথ্যা বলি। একথার পর আল্লাহ তায়ালা এই আয়াত নাযিল করেন। 'তারা তোমাকে তো মিথ্যাবাদী বলে না, বরং সীমা লংঘনকারীগণ আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে।'[৩৭] (আনআম, আয়াত ৩৩)

সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, সেই নবী যেসব কথা বলেন, সেই সব কথা বলার আগে তাকে মিথ্যাবাদী বলে অভিহিত করার মত কোন ঘটনা ঘটেছিলো কি? আবু সুফিয়ান বললেন, 'না'।

নবীসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন অতি বিনয়ী ও নিরহংকার। বাদশাহদের সম্মানে তাদের সেবক ও গুণগ্রাহীরা যে রকম বিনয়াবনত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সম্মানে সাহাবাদের সেভাবে দাঁড়াতে নিষেধ করতেন। তিনি মিসকিন গরীবদের সেবা এবং ফকিরদের সাথে উঠাবসা করতেন। ক্রীতদাসদেরও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন। সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে সাধারণ মানুষের মতোই বসতেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, তিনি নিজের জুতো নিজেই সেলাই করতেন। নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন। ঘরের সাধারণ কাজ কর্ম নিজের হাতে করতেন। তিনি ছিলেন অন্য সব সাধারণ মানুষের মতোই একজন মানুষ। নিজের ব্যবহৃত কাপড়ে উকুন থাকলে তিনি নিজে তা বের করতেন, নিজ হাতে বকরি দোহন করতেন, নিজের কাজ নিজেই করতেন।[৩৮]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অঙ্গীকার পালনে ছিলেন অগ্রণী। তিনি আত্মীয়স্বজনের প্রতি অতিমাত্রায় খেয়াল রাখতেন। মানুষের সাথে সহৃদয়তা ও আন্তরিকতার সাথে মেলামেশা করতেন। বিনয় ও নম্রতায় তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তাঁর চরিত্র ছিলো অনন্য সুন্দর। অসচ্চরিত্রতার এক বিন্দুও তাঁর মধ্যে ছিলো না। স্বভাবগতভাবেই তিনি কখনো অশালীন কথা বলতেন না। অনিচ্ছাকৃতভাবেও তিনি কখনো অশালীন কথা বলেননি। কাউকে কখনো অভিশাপ দিতেন না। বাজারে গেলে উচ্চস্বরে চিল্লাচিল্লি করতেন না। মন্দের বদলা তিনি মন্দ দিয়ে দিতেন না। বরং তিনি মন্দের জন্যে দায়ী লোককেও ক্ষমা করে দিতেন। কেউ তার পেছনে আসতে শুরু করলে তাকে পেছনে ফেলে চলে আসতেন না। পানাহারের ক্ষেত্রে দাসীবাদীদের চেয়ে নিজেকে পৃথক মনে করতেন না। তাঁর খাদেমের কাজও তিনি করে দিতেন। খাদেমের প্রতি তিনি কখনো বিরক্তি প্রকাশ করেননি। কোন কাজ করা না করা প্রসঙ্গে কখনো তাঁর খাদেমের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করেননি। তিনি গরীব মিসকিনদের ভালোবাসতেন। তাদের সাথে উঠাবসা করতেন এবং জানাযায় হাযির হতেন। কোন গরীবকে তার দারিদ্রের কারণে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতেন না। একবার তিনি সফরে ছিলেন। সেই সময় একটি বকরি যবাই করার পরামর্শ হয়। একজন বললেন, যবাই করার দায়িত্ব আমার, অন্যজন বললেন, চামড়া ছাড়ানোর দায়িত্ব আমার। তৃতীয় জন বললেন, রান্নার দায়িত্ব আমি পালন করবো। এসব কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কাঠ সংগ্রহ করার দায়িত্ব আমি পালন করবো। সাহাবারা বললেন, হে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমরা আপনার কাজ করে দেবো। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাযি

---

[৩৭] মেশকাত ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫২১
[৩৮] মেশকাত ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫২০

হলেন না। তিনি বললেন, আমি জানি, তোমরা আমার কাজ করে দেবে, কিন্তু আমি চাই না যে, আমি তোমাদের চাইতে নিজেকে পৃথক অবস্থানে রেখে স্বাতন্ত্রতা অর্জন করবো। কেননা আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের মধ্যে বন্ধুদের নিজেকে পৃথক করে প্রমাণ দেয়ার চেষ্টা পছন্দ করেন না। এরপর তিনি উঠে লাকড়ি জমা করতে চলে গেলেন।[৩৯]

আসুন, এবার হেন্দ ইবনে আবু হালার যবানীতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গুণ বৈশিষ্ট শ্রবণ করি। হেন্দ তাঁর এক দীর্ঘ বর্ণনায় বলেন, প্রিয় নবী গভীর চিন্তায় চিন্তিত ছিলেন। সব সময় চিন্তা-ভাবনা করতেন। আরাম আয়েশের চিন্তা করতেন না। অপ্রয়োজনে কথা বলতেন না। দীর্ঘ সময় যাবত নীরব থাকতেন। কথার শুরু ও শেষে সুস্পষ্ট উচ্চারণ করতেন। অস্পষ্ট উচ্চারণে কোন কথা বলতেন না। অর্থবহ দ্ব্যর্থহীন কথা বলতেন, সেই কথায় কোন বাহুল্য থাকত না। তিনি ছিলেন নরম মেযাজের অধিকারী। সামান্য পরিমাণ নেয়ামত হলেও তার অমর্যাদা করতেন না। কোন কিছুর নিন্দা সমালোচনা করতেন না। পানাহারের জিনিসের সমালোচনা করতেন না। সত্য ও ন্যায়ের পরিপন্থী কোন আচরণ কারো দ্বারা প্রকাশিত হলে তার প্রতি তিনি বিরক্ত হতেন। সেই লোকের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত নিবৃত্ত হতেন না। তবে, তাঁর মন ছিলো উদার। নিজের জন্যে কারো ওপর ক্রুদ্ধ হতেন না এবং কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না। কারো প্রতি ইশারা করতে হাতের পুরো তালু ব্যবহার করতেন। বিস্ময়ের সময় হাত ওল্টাতেন। ক্রুদ্ধ হলে অন্য দিকে মুখ ফেরাতেন এবং খুশী হলে দৃষ্টি নিচু করতেন। অধিকাংশ সময়েই তিনি মৃদু হাসতেন। মৃদু হাসির সময় দাঁতের কিয়দংশ ঝকমক করতো।

অর্থহীন কথা থেকে বিরত থাকতেন। সাথীদের একত্রিত করে রাখার চেষ্টা করতেন, পৃথক করার চেষ্টা করতেন না। সকল সম্প্রদায়ের সম্মানিত লোকদের সম্মান করতেন। সম্মানিত লোককেই নেতা নিযুক্ত করতেন। মানুষের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকতেন।

সাহাবাদের খবরাখবর নিতেন। তাদের কুশল জিজ্ঞাসা করতেন। ভালো জিনিসের প্রশংসা এবং খারাপ জিনিসের সমালোচনা করতেন। সব বিষয়েই মধ্যমপন্থা পছন্দ করতেন। কোন বিষয়ে অমনোযোগী থাকা ছিলো তাঁর অপছন্দ। যে কোন অবস্থার জন্যে মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতেন। সত্য ও ন্যায় থেকে দূরে থাকা পছন্দ করতেন না। অসত্য থেকে দূরে থাকতেন। তার সন্নিকটে যারা থাকতেন, তারা ছিলেন সবচেয়ে ভালো মানুষ। ওদের মধ্যে তারাই ছিলেন তার কাছে ভালো, যারা ছিলেন পরোপকারী। তাঁর কাছে ওদের মর্যাদাই ছিলো অধিক অর্থাৎ তার দৃষ্টিতে তারাই ছিলেন সর্বোত্তম, যারা ছিলেন অন্যের দুঃখে কাতর, স্বভাবতই গম্ভীর এবং অন্যের সাহায্যকারী।

তিনি উঠতে বসতে সর্বদাই আল্লাহকে স্মরণ করতেন। তাঁর বসার জন্যে নির্ধারিত কোন জায়গা ছিলো না। কোন জনসমাবেশে গেলে যেখানে জায়গা খালি পেতেন সেখানেই বসতেন। উপস্থিত সবাইকে সমান দৃষ্টিতে দেখতেন। কারো মনে একথা জাগত না যে, অমুককে আমার চেয়ে বেশী মর্যাদা দেয়া হচ্ছে এবং এজন্যে তার মনে কোন ক্ষোভ বা দুঃখ সৃষ্টি হতো না। কেউ কোন প্রয়োজনে তাঁর কাছে বসলে বা দাঁড়ালে সেই লোকের প্রয়োজন পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতেন। তার ধৈর্যের কোন বিচ্যুতি দেখা যেত না। কেউ তাঁর কাছে কোন কিছু চাইলে

---

৩৯. খোলাছাতুস সিয়ার, পৃষ্ঠা ২৩

তিনি অকাতরে দান করতেন। প্রার্থিত বস্তু প্রদান অথবা ভালো কথা বলে তাকে খুশী না করা পর্যন্ত প্রার্থীকে বিদায় করতেন না। তিনি নিজের উন্নত চরিত্র বৈশিষ্টের মাধ্যমে সবাইকে সন্তুষ্ট করতেন। তিনি ছিলেন সকলের জন্যে পিতৃতুল্য। তাঁর দৃষ্টিতে সবাই ছিলো সমান। কারো শ্রেষ্ঠত্ব বা মর্যাদার আধিক্য নির্ণিত হলে সেটা তাকওয়ার ভিত্তিতে নির্ণিত হতো। তাঁর মজলিস বা সমাবেশ ছিলো জ্ঞান, ধৈর্য, লজ্জাশীলতা ও আমানতদারীর মজলিস। সেখানে কেউ উচ্চস্বরে কথা বলতো না, কারো মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হতো না। তাকওয়ার ভিত্তিতে সকলেই সকলের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করতো। বয়োজ্যেষ্ঠকে সবাই সম্মান এবং ছোটকে স্নেহ করতো। কারো কোন প্রয়োজন দেখা দিলে সেই প্রয়োজন পূরণ করা হতো। অপরিচিত লোককে অবজ্ঞা বা উপেক্ষা করা হতো না, বরং তার সাথে পরিচিত হয়ে আন্তরিকতা প্রকাশ করা হতো।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারায় সবসময় স্মিতভাব বিরাজ করতো। তিনি ছিলেন নরম মেজাযের। রুক্ষতা ছিলো তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। বেশী জোরে কথা বলতেন না। অশালীন কোন কথা তাঁর মুখে উচ্চারিত হতো না। কারো প্রতি রুষ্ট হলেও তাকে ধমক দিয়ে কথা বলতেন না। কারো প্রশংসা করার সময়ে অতি মাত্রায় প্রশংসা করতেন না। যে জিনিসের প্রতি আগ্রহী না হতেন, সেটা সহজেই ভুলে থাকতেন। কোন ব্যাপারেই কেউ তাঁর কাছে হতাশ হতেন না। তিনটি বিষয় থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত রাখতেন। এগুলো হচ্ছে. (১) অহঙ্কার। (২) কোন জিনিসের বাহুল্য এবং (৩) অর্থহীন কথা। আর তিনটি বিষয় থেকে লোকদের নিরাপদ রাখতেন। এগুলো হচ্ছে, (১) পরের নিন্দা (২) কাউকে লজ্জা দেয়া এবং (৩) অন্যের দোষ প্রকাশ করা।

তিনি এমন কথাই শুধু মুখে আনতেন যে কথায় সওয়াব লাভের আশা থাকতো। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন তার সাহাবীরা এমনভাবে মাথা নিচু করে বসতেন যে, দেখে মনে হতো তাদের মাথার ওপর চড়ুই পাখী বসে আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথা শেষ করে নীরব হলে সাহাবারা নিজেদের মধ্যে কথা বলতেন। কোন সাহাবী প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে বাহুল্য কোন কথা বলতেন না। কোন সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কোন কথা বলতে শুরু করলে উপস্থিত অন্য সবাই মনোযোগ দিয়ে সেকথা শুনতেন। কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত নীরবতা বজায় থাকতো। যে কথা শুনে সাহাবারা হাসতেন, সে কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হাসতেন। যে কথা শুনে সাহাবারা অবাক হতেন, সে কথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-ও অবাক হতেন। অপরিচিত লোক কথা বলার ক্ষেত্রে অসংযমী হলে নবী ধৈর্য হারাতেন না। তিনি বলতেন, কাউকে পরমুখাপেক্ষী দেখলে তার প্রয়োজন পূরণ করে দাও। ইহসানের পারিশ্রমিক ছাড়া অন্য কারো প্রশংসা কোন ব্যাপারেই তাঁর পছন্দনীয় ছিলো না।[৪০]

হযরত খারেজা ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মজলিসে সবচেয়ে সম্মানিত ও মর্যাদাশীল ছিলেন। পোশাক পরিধানে তিনি ছিলেন শালীন। অধিকাংশ সময়ে নীরবতা পালন করতেন। বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। যে ব্যক্তি অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক কথা বলতো, তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। তিনি যখন হাসতেন, মৃদু হাসতেন, সুস্পষ্টভাবে কথা বলতেন, ফালতু ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলতেন না।

---

[৪০] শাফা, কাযী আয়ায, ১ম খন্ড, ১২১-১২৬ শামায়েলে তিরমিযি।

সাহাবারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে উচ্চ স্বরে হাসতেন না, তাঁরা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতে হাসি সংযত রাখতেন এবং মৃদু হাসতেন।[৪১]

মোটকথা, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তুলনাহীন গুণবৈশিষ্টের অধিকারী একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ ছিলেন। রব্বুল আলামীন আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অতুলনীয় বৈশিষ্ট দান করেছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবীর সম্মানে বলেছেন, 'ইন্নাকা লা আলা খুলুকিন আযীম', অর্থাৎ নিসন্দেহে আপনি সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী।

এটি ছিলো এমন তুলনাবিহীন গুণ যার কারণে মানুষ তার প্রতি ছুটে আসতো। তাঁর প্রতি মানুষের মনে ভালোবাসা ছিলো বদ্ধমূল। তাঁর নেতৃত্ব এমন অবিসম্বাদিত ছিলো যে, মানুষ ছিলো তাঁর প্রতি নিবেদিত প্রাণ।

মানবীয় গুণাবলীর সর্বোত্তম বৈশিষ্টের কারণে তাঁর স্বজাতির রুক্ষতা, একেবারে নমনীয়তায় পরিবর্তিত হয়েছিলো। পরিশেষে মানুষ দলে দলে আল্লাহর মনোনীত দ্বীনের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে ধন্য হয়েছিলো।

স্মরণ রাখতে হবে যে, ইতিপূর্বে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে সকল গুণাবলী আলোচনা করেছিলাম সেসব ছিলো তার অসাধারণ ও অতুলনীয় গুণাবলীর সামান্য রেখাচিত্র। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর গুণাবলী এতো ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিলো যে, সেসব গুণাবলীর আলোচনা করে শেষ করা সম্ভব নয় এবং তাঁর চরিত্র বৈশিষ্টের ব্যাপকতা ও গভীরতা নিরূপণ করাও সম্ভব নয়।

মানবেতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব নিরূপণ কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। পূর্ণতার শ্রেষ্ঠতম আদর্শ এ মহান মানুষের পরিচয় এই যে, তিনি মানবতার সর্বোচ্চ চূড়ায় সমাসীন ছিলেন। তিনি মহান রব্বুল আলামীনের পবিত্র আলোক আভায় এমনভাবে আলোকিত ছিলেন যে, কোরআনে করিমকেই তাঁর চরিত্রের পরিচয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর চরিত্র বৈশিষ্ট ছিলো পবিত্র কোরআনেরই বাস্তব ও পূর্ণাঙ্গ প্রতিফলন।

'হে আল্লাহ তা[illegible] মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর তুমি শান্তি ও বরকত নাযিল করো, যেমন শান্তি ও বরকত নাযিল করেছিলে হযরত ইবরাহীম (আ.) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসা ও মর্যাদার অধিকারী।

১৬ই রমযান ১৪০৪ হিজরী মোতাবেক ১৭ই রমযান ১৯৮৪ ইং

---

[৪১] শাফা, কাযী আয়ায, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১২১-১২৬

সে ব্যক্তির জন্যে ততোটুকুই (পুরস্কার) রয়েছে যতোটুকু সে
(এ দুনিয়ায়) করে এসেছে, আবার (শাস্তিও) তার
জন্যে ততোটুকু রয়েছে, যতোটুকু অন্যায় সে
করেছে, (অতএব) হে আমাদের মালিক,
যদি আমরা কিছু ভুলে যাই, কোথায়ও
যদি আমরা কোনো ভুল করে বসি,
তার জন্যে তুমি আমাদের
পাকড়াও করো না।

(সূরা বাকারা ২৮৬)

সহায়ক গ্রন্থসমূহ

যে ফুল দিয়ে গেথেছি মালা

সহায়ক গ্রন্থসমূহ

নাম্বার	গ্রন্থের নাম	লেখকের নাম	মৃত্যুর সাল	প্রকাশনা সংস্থা	প্রকাশ কাল
১	আখবারুল কেরাম বা আখবারুল মাসজিদিল হারাম	শেহাবউদ্দিন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল আছাদি আল মক্কী	১০৬৬ হিঃ	আল মাতবা সালাফিয়া বেনারস	১৩৯৬ হিঃ
২.	আল আদাবুল মুফরাদ	মোহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল বোখারী	৩৫৬ হিঃ	ইস্তাম্বুল	১৩০৪ হিঃ
৩.	আল আলাম	খায়রুদ্দিন আয যারকালি		কায়রো	১৯৫৪ খৃঃ
৪.	আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া	ইসমাইল ইবনে কাছির দামেশকী		আস সায়াদা, মিশর	১৩৩২ খৃঃ
৫.	বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম	আহমদ ইবনে হাজার আসকালানি	৮৫৬ হিঃ	কাইউমি প্রেস, কানপুর ভারত	১৩২৩ হিঃ
৬.	তারীখে আরদিল কোরআন	সাইয়েদ সোলায়মান নদভী	১৩৭৩ হিঃ	মা আরেফ প্রেস, আযমগড়	১৯৫৫ খৃঃ
৭.	তারীখে ইসলাম	আকবর খান শাহ নযীরাবাদী		মাকতাবে রহমত, দেওবন্দ	
৮.	তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক	ইবনে জবির আত তাবারী		আল হাসিনাতু মিসরিয়া	
৯.	তারীখে ওমর ইবনে খাত্তাব	আবুল ফারাহ আবদুর রহমান ইবনে জওযি		আত তওফীক আল আদিবা, মিশর	
১০.	তোহফাতুল আহওয়াযি	আবুল আলা আবদুর রহমান মোবারকপুরী	১৩৫৩ হিঃ	বার্কি প্রেস দিল্লী, ভারত	১৩৪৬ হিঃ
১১.	তাফসীরে ইবনে কাছীর	ইসমাইল ইবনে কাছীর দামেশকী		দারুল আন্দালুস বৈরুত	
১২.	তাফহীমুল কোরআন	ওস্তাদ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রাঃ)		মারকাযি মাকতাবা জামায়াতে ইসলামী	
১৩.	তালকীহে ফুহুমে আহলিল আছার	আবুল ফারায আবদুর রহমান ইবনে জওযি	৫৯৭ হিঃ	জাইয়েদ বারকি প্রেস. দিল্লী ভারত	
১৪.	জামে তিরমিযি	আবু ঈসা মোহাম্মদ ইবনে ঈসা তিরমিযি	২৭৯ হিঃ	মাকতাবায়ে রশীদিয়া দিল্লী, ভারত	
১৫.	আল জেহাদু ফিল ইসলাম	ওস্তাদ সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী (রঃ)		ইসলামিক পাবলিকেশন্স	১৯৬৭ খৃঃ
১৬.	খোলাছাতুস সিয়ার	ইবনে আবদুল্লাহ আত তাবারী	৬৭৪ হিঃ	দিল্লী প্রিন্টি দিল্লী, ভারত	[illegible]

মাযার গ্রন্থের নাম	লেখকের নাম	মৃত্যু সাল	প্রকাশনা সংস্থা	প্রকাশ কাল
১৭. রহমতুল লিল আলামীন	মোহাম্মদ সোলায়মান মনসুরপুরী	১৯৩০ খৃঃ	হানিফ বুক ডিপো, দিল্লী, ভারত	
১৮. রসূলে করিম কি সিয়াসি যিন্দেগী	ডক্টর হামিদুল্লাহ, প্যারিস		সালেম কোম্পানী, দেওবন্দ	১৯৬৩ খৃঃ
১৯. আর রওযুল উনুফ	আবুল কাসেম আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ সোহায়লী	৫৮১ হিঃ	আল জামালিয়া, মিশর	১৩৩২ হিঃ
২০. যাদুল মায়াদ	হাফেজ ইবনে কাইয়েম	৭৫১ হিঃ	আল মিসরিয়া	১৩৪৭ হিঃ
২১. সফরুত তাকওয়ীন				
২২. সুনানে ইবনে মাজা	ইবনে ইয়াযিদ ইবনে মাজা	২৭৩ হিঃ		
২৩. সুনানে আবি দাউদ	আবু দাউদ সোলায়মান আল আসসাজেস্তানী	২৭৫ হিঃ	আল মাকতাবা রহীমি, দেওবন্দ	১৩৭৫ হিঃ
২৪. সুনানে নাছাঈ	আহমদ ইবনে শোয়ায়েব নাছাঈ	৩০৩ হিঃ	আল মাকতাবা সালাফিয়া, লাহোর	
২৫. সিরাতুল হালিবিয়া	ইবনে বোরহান উদ্দীন			
২৬. সীরাতুন নবুবিয়াহ	আবু মোহাম্মদ আবদুল মালেক ইবনে হিশাম	২১৮ হিঃ		১৩৭৫ হিঃ
২৭. শরহে শুযুরুয যাহাব	জামাল উদ্দিন ইবনে আল মারুফ ইবনে হিশাম আনসারী	৭৬১ হিঃ	মাকতাবা আসসায়াদা, মিসর	
২৮. শরহে সহীহ মুসলিম	আবু যাকারিয়া মহীউদ্দীন ইয়াহিয়া ইবনে শরীফ আননববী	৬৭৬ হিঃ	মাকতাবা রশীদিয়া, দিল্লী	১৩৭৬ হিঃ
২৯. শরহে মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া	আয যারকানি		দুস্প্রাপ্য	১৩১২ হিঃ
৩০. আশ শাফা বেতারিফে হকুকিল মোস্তফা	কাযী আয়ায		মাকতাবায়ে ওসমানিয়া ইস্তাম্বুল	১৩১২ হিঃ
৩১. সহীহ বোখারী	মোহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বোখারী	২৫৬ হিঃ	মাকতাবায়ে রহীমিয়া, দেওবন্দ	১৩৮৭ হিঃ
৩২. সহীহ মুসলিম	মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ আল কুশাইরি		মাকতাবায়ে রশীদিয়া, দিল্লী, ভারত	১৩৭৬ হিঃ

মাসাদের	গ্রন্থের নাম	লেখকের নাম	মৃত্যুর সাল	প্রকাশনা সংস্থা	প্রকাশ কাল
৩৩.সহীফাতু হাম্মাম					
৩৪.সোলহে হোদায়বিয়া		মোহাম্মদ আহমদ বা-শমিল		দারুল ফেকের, মিশর	১৩৯১ হিঃ
৩৫.আত তাবাকাতুল কোবরা		মোহাম্মদ ইবনে সা'দ		মাতাবাআ বোরিল	১৩২২ হিঃ
৩৬.আওনুল মাবুদ শরহে আবু দাউদ		আবু তৈয়ব শামসুল হক আযিমআবাদী		প্রথম মুদ্রণ	
৩৭.গোযওয়ায়ে ওহুদ		মোহাম্মদ আহমদ বা-শমিল		দ্বিতীয় মুদ্রণ	
৩৮. গোযওয়ায়ে বদর আল কোবরা		মোহাম্মদ আহমদ বা-শমিল			১৩৭৬ হিঃ
৩৯.গোযওয়ায়ে খায়বর		মোহাম্মদ আহমদ বা-শমিল		দারুল ফেকের	১৩৯১ হিঃ
৪০.গোযওয়ায়ে বনি কোরায়যা		মোহাম্মদ আহমদ বা-শমিল			১৩৭৬ হিঃ
৪১.ফতহুল বারী		আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজর আসকালানী	৮৫২ হিঃ	মাতবায়ে সালাফিয়া	
৪২.ফেকহুস সিরাত		মোহাম্মদ আল গাজ্জালী		দারুল কেতাব আল আরাবী	১৩৭০ হিঃ
৪৩.তাফসীর ফী যিলালিল কোরআন		সাইয়েদ কুতুব শহীদ		দারু এহইয়ায়ুত তুরাছুল আরাবী	

এই তাফসীরের বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছেন আল কোরআন একাডেমী লন্ডন

মাসাদের	গ্রন্থের নাম	লেখকের নাম	মৃত্যুর সাল	প্রকাশনা সংস্থা	প্রকাশ কাল
৪৪.আল কোরআনুল করিম					
৪৫.কালবে জাযিরাতুল আরব		ফুয়াদ হামযা		আল মাকতবা সালাফিয়া, মিসর	১৩৫২ হিঃ
৪৬. মাযা খাছেরাল আলমু বে এনহেতাতিল মুসলেমিন		সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী		মাকতাবা দারুল আরুবা, কায়রো	১৩৮১ হিঃ
৪৭.মাহাদেরাতে তারিখে আল উমামুল ইসলামিয়া		শায়খ মোহাম্মদ আল খাযরামি		আল মাকতাবাতু তুজ্জারিয়া, মিসর	১৩৮২ হিঃ

গ্রন্থের নাম	লেখকের নাম	মৃত্যুর সাল	প্রকাশনা সংস্থা	প্রকাশ কাল
৪৮.মোখ[illegible]ার সীরাতে রাসূ[illegible]	শায়খুল ইসলাম মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব নজদী	১২০৬ হিঃ	মাতবা সুন্নাত আল মোহাম্মদীয়া	১৩৭৫ হিঃ
৪৯.মোখতাছার সীরাতে রাসূল	শেখ আবদুল্লাহ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব নজদী	১২৪২ হিঃ	মাতবায়ে সালাফিয়া মিসর	১৬৭৯ হিঃ
৫০.মাদারেকুত তানযিল লিলনাসাফি				১৩৭৮ হিঃ
৫১.মেরআতুল মাফাতেহ (দ্বিতীয় খন্ড)	শেখ ওবায়দুল্লাহ রহমানী মোবারকপুরী		নামী প্রেস, লাখনৌ	১৩৭৮ হিঃ
৫২.মরুজুয যাহাব	আবুল হাসান আলী মাসউদী		আশ শারকাতুল ইসলামিয়া	
৫৩.আল মোস্ত[illegible]রা	আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ আল হাকেম নিশাপুরী		দায়েরাতুল মাআরেফ আল ওসমানিয়া, হায়দরাবাদ	
৫৪.মুসনাদে আহমদ	ইমাম আহমদ ইবনে মোহাম্মদ ইবনে হাম্বল	২৬৪ হিঃ		
৫৫.মুসনাদে দারেমী	ইবনে আবদুর রহমান দারেমী	২৫৫ হিঃ		
৫৬ . মেশকাতুল মাসাবিহ	ওলীউদ্দিন মোহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আত তাব্রিযী		মাকতাবায়ে রহীমিয়া দেওবন্দ	
৫৭.মাআজেমুল বোলদান	ইয়াকুত আল হামুতি			
৫৮.আল মাওয়াহেবু লাদুন্নিয়া	আল কাসতালানী		আল মাতবায়াতুশ শারফিয়া	১৩৩৬ হিঃ
৫৯.মুয়াত্তা ইমাম মালেক	ইমাম মালেক ইবনে আনাস আল আসবাহি	৬৯ হিঃ	মাকতাবায়ে রহীমিয়া দেওবন্দ	
৬০. ওফাউল ওফা	আলী ইবনে আহমদ আম সামহুদী			

পরিবেশনায়
আল কোরআন একাডেমী লন্ডন
বাংলাদেশ কার্যালয়